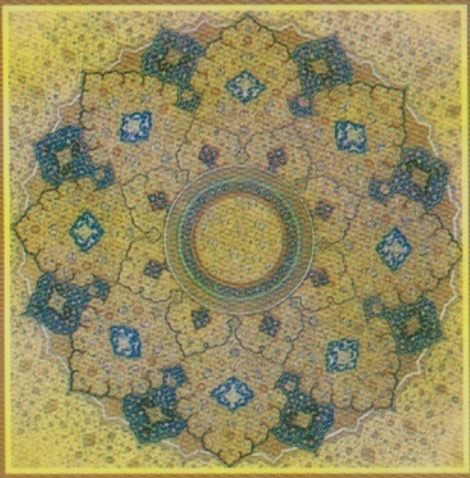

বেঞ্জামিন ওয়াকার

ফাউন্ডেশন অব ইসলাম

সা'দ উল্লাহ্ অনুদিত

ফাউন্ডেশন অব ইসলাম

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ফাউন্ডেশন অব ইসলাম

বেঞ্জামিন ওয়াকার

অনুবাদ

সা'দ উল্লাহ্

সময় প্রকাশন

www.pathagar.com

ফাউন্ডেশন অব ইসলাম
সা'দ উল্লাহ্ অনুবাদকৃত
© অনুবাদক

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি বইমেলা ২০০৬ উপলক্ষে
জুলাই ২০০৫

সময়

সময় ৪৮৯

প্রকাশক
ফরিদ আহ্‌মেদ
সময় প্রকাশন
৩৮/২-ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

কম্পোজ
সময় কম্পিউটার্স
৩৮/২-ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মুদ্রণ
সালমানী প্রিন্টার্স, নয়াবাজার, ঢাকা

মূল্য : ৩০০.০০ মাত্র

FOUNDATION OF ISLAM By Benzamin Walker. Translated by Saadullah. First Published : February Book Fair 2006 (Print on July 2005) by Farid Ahmed, Somoy Prakashan, 38/2Ka Banglabazar, Dhaka.
Website : www.somoy.com Email : f.ahmed@somoy.com

Price : Tk. 300.00 Only

ISBN 984-458-489-2 Code : 489

www.pathagar.com

উৎসর্গ

শ্রদ্ধেয় প্রয়াত শিক্ষক
আবু মুহাম্মদ হাবীবুল্লাহ
চেয়ারম্যান, ইসলামের ইতিহাস
ও সংস্কৃতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

মুখবন্ধ

এই গ্রন্থের প্রধান উদ্দেশ্য হলো ইসলাম ধর্ম সম্বন্ধে অমুসলিম পণ্ডিত ব্যক্তিরা যেসব গ্রন্থ রচনার মাধ্যমে অবদান রেখে গেছেন সেগুলোকে একঠাই করে উপস্থাপন করা। ঐসব গ্রন্থগুলোকে মৌলিক রচনা বলে দাবি করা হয়। গ্রন্থকার হিসাবে আমি তাদের কাছে ঋণী।

এই বিদেশী প্রভাবগুলোকে চিহ্নিত করা যায় প্রফেট মোহাম্মদের পূর্ব থেকে। প্যাগন আরবরা প্রাচীন বিশ্বের সাথে সংযোগ রেখেছিল মিসর, ব্যাবিলন থেকে গ্রিক ও রোমান পর্যন্ত এবং এইসব সংগৃহীত তথ্য ইসলামের ভিত রচনায় প্রাথমিকভাবে সাহায্য করেছে। আরবে বসবাসরত ইহুদি ও খ্রিস্টানদের সাথে আরব প্রফেটের নিকট ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক এবং পরবর্তীতে ইসলামী রাজ্যের বিস্তারের সময় বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মানুষের সাথে সংযোগ এই ধর্মকে শতাব্দিব্যাপী উৎসাহ জুগিয়েছে, আরও সমুন্নত করছে।

অন্যান্য গ্রন্থকারদের মতো আমাকেও প্রখ্যাত স্কলার ও বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের পাণ্ডিত্য ও জ্ঞানের ওপর নির্ভর করতে হয়েছে, যাঁরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁদের অবদান রেখে গেছেন। তাঁদের মধ্যে ইগনাজ গোল্ড-জিহার, মন্টোগোমারি ওয়াট, এইচ.এ.আর. গিব, আলফ্রেড গিয়োম, রিচার্ড বেল, টর আন্দ্রে, আর এ নিকোলসন, ম্যাক্সিম রডিনসন, সৈয়দ আমীর আলী এবং অন্যান্য পণ্ডিত ব্যক্তির নাম উল্লেখযোগ্য। এইসব পণ্ডিত ব্যক্তিদের নাম এই গ্রন্থের শেষে উল্লেখিত হয়েছে গ্রন্থপঞ্জিতে। আরবি শব্দ থেকে ভাষান্তর ব্যাপারে আমি অন্যান্য গ্রন্থকারদের ব্যবহৃত পদ্ধতি অবলম্বন করেছি। এ ব্যাপারে পাঠকদের ইনডেক্স দেখতে অনুরোধ করি যা আমার মূল গ্রন্থে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সমস্ত তারিখগুলোকে খ্রিস্টাব্দ ধরতে হবে, যদি অন্যভাবে উল্লেখ করা না হয়। তেমনি, যদি অন্যভাবে বলা না থাকে, তাহলে সব বিদেশী, ব্র্যাকেটে লিখিত, শব্দগুলো আরবি বা আরবি থেকে অনুসরণীয়।

ব্র্যাকেটে (৩ : ৩৫) এইসব ফিগার কোরানের সূরা ও আয়াত। যেহেতু সূরার আয়াত নম্বর অনেক ক্ষেত্রে অমিল থাকে, তাই পাঠকদের দু'তিন আয়াত নিচে-ওপরে দেখে নিতে অনুরোধ করছি।

—গ্রন্থকার

www.pathagar.com

অনুবাদকের কথা

বেঞ্জামিন ওয়াকার (Benjamin Walker)-এর গ্রন্থ 'Foundation of Islam' একটি মৌলিক ঐতিহাসিক গ্রন্থ বলে পরিচিত। এই গ্রন্থ রচনায় গ্রন্থকার বহু পণ্ডিত ব্যক্তি ও বিশেষজ্ঞদের রচিত গ্রন্থ আলোচনা করে এই পুস্তকটি রচনা করেছেন। অনূদিত গ্রন্থের শেষে গ্রন্থপঞ্জিতে আলোচিত পুস্তকের তালিকা ইংরেজি ভাষায় তুলে দেয়া হয়েছে।

মূল গ্রন্থটির অনুবাদ একেবারে আক্ষরিক নয়; বিষয়বস্তুর কোনো পরিবর্তন বা বিবর্জন হয়নি। যথাসম্ভব গ্রন্থকারের মূল বক্তব্য ও সূত্রসহ অনূদিত। অনুবাদকের এই রচনায় নিজস্ব কোনো ভূমিকা নেই এবং তাঁর একটিও নিজের বাক্য সংযোজিত হয়নি। মূল গ্রন্থে বর্ণিত তথ্যসহ বিষয়গুলি শুধু বাংলা ভাষায় বাঙালি পাঠকের সুবিধার জন্য ভাষান্তর করা হয়েছে।

গ্রন্থখানি তথ্যসমৃদ্ধ ইতিহাস গ্রন্থ এতে কোনো কিংবদন্তি নেই, অতিকথন নেই। ইসলাম ধর্ম ঐতিহাসিক ধর্ম এবং এই ধর্মের প্রবর্তকও ঐতিহাসিক ব্যক্তি। অতএব এই গ্রন্থকে ইসলামের ইতিহাস রূপে পাঠ করা উচিত। পরমতসহিষ্ণু হয়ে, আবেগতাড়িত হয়ে নয়। গ্রন্থটি ইসলামের ইতিহাস, থিওলজি নয়। প্রায় ৩৮০ পৃষ্ঠার বইটি অনুবাদ করতে আমার যথেষ্ট সময় ও শ্রম ব্যয় করতে হয়েছে এই বৃদ্ধ বয়সে। পাঠকের কাছে বইটি সমাদৃত হলে আমি আমার শ্রম ও শারীরিক অসুস্থতাকে ভুলে যাব।

বইটিকে আগ্রহ নিয়ে ও দৃষ্টিনন্দিত করে প্রকাশ করেছেন সময় প্রকাশন-এর জনাব ফরিদ আহমেদ; আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। আমি তাঁর প্রকাশনা শিল্প প্রতিষ্ঠানের উন্নতি কামনা করি।

সকলেই ভালো থাকুন, সুস্থ জীবনযাপন করে আপন কর্মকেই ধর্ম জ্ঞান করুন।

সা'দ উল্লাহ

উত্তরা, ঢাকা
জুন, ২০০৫

www.pathagar.com

সূচিপত্র

১। **প্রাচীন সংযোগ ১১-৩০**

মিশর, মেসোপটেমিয়া, ইহুদি জাতি, ভারত, পারস্য, আবিসিনিয়া, আরামায়েন, নাবাতিয়েন, গ্রিক, রোমান, সাসানিয়ান, বাইজানটিয়াম।

২। **প্রাচীন আরব জাতি ৩১-৫৬**

কাহতান আরব, আদনান আরব, গোত্র-কলহ, কোরেশ, মক্কা, কাবা, কালো পাথর, প্যাগনদের হজ, আল্লাহ, ঈশ্বরের উপাধি, আল্লাহর কন্যা, প্যাগন দেব-দেবী, প্রকৃতি পুজা, নারীপ্রীতি, ইসলাম-পূর্ব নারী, প্যাগন রীতি রয়ে গেছে, প্রচলিত আইন।

৩। **ইসলাম-পূর্ব একেশ্বরবাদীগণ ৫৭-৭৭**

হানিফ, ইসলাম-পূর্ব ইহুদি, ইসলাম-পূর্ব খ্রিস্টান, সন্ন্যাসী, খ্রিস্টান গোত্র।

৪। **ইসলাম-পূর্ব আরব ৭৮-৮৬**

আরবক ভাষা, আরাবিক হস্তলিপি, কবিতা।

৫। **মক্কার সময়কাল ৮৭-১২০**

মোহাম্মদের চরিতকারগণ, প্রফেটের পূর্বপুরুষ, শৈশব ও যৌবন। জায়েদ ইবন আমর, কস ইবন সাঈদা, তায়েফের উমাইয়া, খাদিজা, সওদাগর, হীরা পর্বতের গুহা, ওয়ারাকা, বিরতি (ফাত্‌রা), অশিক্ষিত প্রফেট, মৃগীরোগ, ভূতাবেশ, জায়েদ ইবন হারিথ, প্রথমে যারা ইসলাম গ্রহণ করেন। মক্কাবাসীদের প্রতিবাদ, আবু সুফিয়ান, আবু লাহাব, আবিসিনিয়ায় নির্বাসন, স্যাটানিক ভার্স, তায়েফে গমন, নৈশভ্রমণ (মিরাজ)।

৬। **মদিনা ও তারপর ১২১-১৫৫**

আকাবার শপথ, মক্কা থেকে মদিনায় আগমন (হিজরত), প্রথম মোহাম্মাডানস্‌, মোনাফেকগণ, হাসান ইবন থাবিত, প্রাথমিক যুদ্ধবিগ্রহ। পার্সি সলমন, প্রফেটের স্ত্রীগণ, আয়েশা, জয়নাব বিন্‌ত জাহাশ, মেরি দ্য কপ্‌ট, হেরেম সঙ্কট। হোদায়বিয়ার সন্ধি, বহির্দেশে যোগাযোগ, ওমরা হজ, অভিযানসমূহ, মক্কা বিজয়, তায়েফের পতন, প্রতিনিধি দলের বছর, বিদায় হজ, প্রফেটের মৃত্যু, দাফন।

৭। **কোরান ১৫৬-১৮৩**

জিব্রিল ফেরেশতা, কোরানের অবতরণ, ওহি লেখকগণ, মক্কার সূরা, মদিনার সূরা, কোরান সংকলন, সূরা প্রারম্ভে উল্লেখিত অক্ষরসমূহ, কোরানের সমালোচকগণ। কোরানের হস্তলিপি, কোরানের ভাষা, কোরানের স্টাইল, কোরানের দুর্বোধ্যতা, কোরানে পরিবর্তন, অসম্পূর্ণ কোরান, কবিতা রূপে কোরান, কোরানের গ্রন্থকারত্ব, পরিবর্তিত কোরান।

www.pathagar.com

৮। **হাদিস ১৮৪–১৯১**

হাদিসের গোঁড়ার কথা, মুসলিম আইন।

৯। **ইহুদি ও মোহাম্মদ ১৯২–২০১**

ইহুদিদের সাথে বিভেদ, ইহুদিদের বিনাশ সাধন।

১০। **খ্রিস্টান ও মোহাম্মদ ২০২–২২৬**

প্রাথমিক খ্রিস্টান প্রভাব, খ্রিস্টান শিক্ষকগণ, খ্রিস্টানদের প্রতি সহিষ্ণুতা, সমান্তরাল প্যাসেজ, পারিভাষিক শব্দ, রহমান, গসপেল, ত্রিত্ববাদ, পবিত্র আত্মা, মেরি, যিশু, ঈশ্বরের পুত্র, যিশুর অলৌকিক কাণ্ড, মৃত্যু ও পুনরুত্থান, প্যারাক্লিট, দ্বিতীয় আগমন, অসমর্থিত গসপেল, খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে অভিযান।

১১। **মোহাম্মদের ধর্মীয় পদ্ধতি ২২৭–২৪৭**

ঈশ্বরে বিশ্বাস, একটি আরব ধর্ম, মধ্যপন্থী মানুষ, খাদ্য ও রোজা, প্রার্থনা, হজ, ঐশী গ্রন্থ, প্রফেটগণ, ধর্মীয় সহিষ্ণুতা, মানুষ মোহাম্মদ, চরিত্রের পরিবর্তন, সিল অব দ্য প্রফেট। মোহাম্মদের পাপহীনতা, মোহাম্মদের মোজেজা, অবতার মোহাম্মদ।

১২। **ইসলামের প্রসার ২৪৮–২৭৭**

মদিনা খালিফেট (৬৩২-৬৬১), উমাইয়া বংশ (৬৬১-৭৫০), আব্বাসিয়া বংশ (৭৫০-১২৫৮), ফাতেমী বংশ (৯০৮-১১৭১), ক্রুসেড (১০৯৫-১২৯১), স্পেন দখল (৭১২-১৪৯২), তুর্কি ও তুরস্ক, মোগলগণ (১৫২৬-১৮৫৭), পতনের কারণ।

১৩। **বিদেশী প্রভাব ২৭৮–৩২২**

যুদ্ধবিগ্রহ, আরব জাতীয়তাবাদ, আন্তঃগোত্র বিবাহ, প্রশাসন, স্থাপত্য, পবিত্র নগরী, শিল্পকলা, সঙ্গীত, শিক্ষা, অনুবাদকগণ, সাহিত্য, ইতিহাস লিখন, ওষুধ ও চিকিৎসা, বিজ্ঞান, দর্শন, সুফিবাদ।

১৪। **ইসলামের সমালোচকগণ ৩২৩–৩৫৪**

প্রফেট ভণ্ড, অতিমাত্রায় গোঁড়ামি, রাজনৈতিক হত্যা, অভিযান, মালে-গণিমত, বিজয় ও কনভারশন, জিহাদ, প্যাক্স ইসলামিকা, কাফের, ইনকুইজিশন, শাস্তি, দাসত্ব, নারী, অদৃষ্টবাদ-নিয়তিবাদ, শেষ বিচারের দিন, নরক, স্বর্গ।

১৫। **ইসলামের উভয়-সঙ্কট ৩৫৫–৩৬১**

ইউরোপীয় জাতি, মৌলবাদী, সংস্কারকগণ।

১৬। **কোরেশের বংশ ৩৬২**

১৭। **গ্রন্থপঞ্জি ৩৬৩–৩৭৬**

www.pathagar.com

১

প্রাচীন সংযোগ

আরব পেনিনসুলার একটি বিরাট অংশ বালুময়, পতিত ভূমির মতো। ক্লাসিক্যাল ভাষায় বলা হয় আরারিয়া ডেজার্টা। দক্ষিণের একটি বিশাল শূন্য অঞ্চল এই মরুভূমির সাথে সংযুক্ত আরব দেশে। রাব আল খালি বলে পরিচিত। উত্তর দিকে একটি অঞ্চলকে বলা হয় 'নেফাদ'; আরও উত্তর দিকে আছে সিরিয়া মরুভূমি। কিন্তু এদেশের অনেক অংশ উর্বর ক্ষেত্র। প্রাচীনকাল থেকে এ দেশ অন্য দেশের সাথে বাণিজ্য করে বেশ ধনী হয়েছে।

ভৌগোলিকভাবে যদিও এদেশের বিরাট অংশ সিরিয়া মরুভূমি ও ভারত মহাসাগরের মধ্যে অবস্থিত, কিন্তু ঐতিহাসিকভাবে আরব অঞ্চল শুধু নয় আরাবিয়ান, পেনিনসুলা, সিরিয়া, প্যালেস্টাইন ও মেসোপটেমিয়ার অংশও এর সাথে সংযুক্ত।

যে অঞ্চলে আরবরা বাস করে তা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পথের দ্বারা ক্রুশাকারে ছেদন করা (Criss-crossed) এবং শতাব্দী ধরে মধ্যপ্রাচ্যের প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে লাগাতার সম্পর্কযুক্ত; ফলে বিভিন্ন দেশের সভ্যতার সংস্পর্শে আরবের সংস্কৃতি অন্তহীন প্রক্রিয়ায় পরিবর্তিত ও উন্নত। এই কারণে বিভিন্ন দেশের ব্যবসাদারদের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে। বিদেশী সওদাগরদের চলাচলের সুবিধার জন্য আরবরা উট এবং গাইড সরবরাহ করেছে, এমনকি সশস্ত্র প্রহরীও যোগান দিয়েছে, বেদুইনদের আক্রমণ প্রতিহত করে নিরাপদে গন্তব্য স্থানে পৌছানোর জন্য। এই সুবিধার জন্য অনেক জাতি এই অঞ্চলে বাণিজ্যের কারণে জড়িয়ে পড়ে। বাণিজ্য এজেন্ট এবং বিভিন্ন ধর্মের মিশনারি এই অঞ্চলে তাদের স্থায়ী আবাসস্থল স্থাপনও করতে পেরেছে।

আরবরা ভবঘুরে বেদুইন ছিল, স্থায়ী বাসিন্দাও ছিল। বাণিজ্যের সংস্পর্শে এসে প্রাচীন মিশর, মেসোপটেমিয়া ও পারস্যে ঐতিহাসিক তথ্য ও নথিপত্রের সাথে পরিচিত হয়ে ওঠে; ইহুদি, গ্রিক ও রোমানদের ইতিহাস ও সংস্কৃতির সংস্পর্শেও আসে। এই সব প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতি আরবের সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে উন্নত করে। সিরিয়াক ও বাইজানটাইন লেখন পদ্ধতির মাধ্যমে এসব দেশের সাথে নিগূঢ়ভাবে পরিচিত হয়। যাই হোক, মোসলেমদের রাজত্বকালে আরবীয় লেখক ও ঐতিহাসিকগণ এই সংস্পর্শের কথা বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ করার সুযোগ পাননি, হয়তো রাজনৈতিক বা অন্য কোনো কারণে। তবে এটা স্পষ্ট যে, এক সময়ে আরবরা বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ছিল তবে আরাবিয়া মধ্যপ্রাচ্যের একটি অংশবিশেষ বলে গণ্য হতো

www.pathagar.com

এবং সব সময়েই পার্শ্ববর্তী দেশসমূহের সংস্পর্শে এসে ধীরে ধীরে ব্যবসা-বাণিজ্যে জড়িয়ে পড়ে। বিদ্যমান নথিপত্র যা পাওয়া যায়, তার থেকে একটা অবস্থার ধারণা পাওয়া গেছে, নিম্নে বর্ণিত ইতিহাস থেকে সে সূত্র মিলে।

১.১ মিশর

প্রাচীনকাল থেকে মিশর 'মিসর' বলে পরিচিত। ওল্ড টেস্টামেন্টে এদেশ 'মিজরাইম' বলে চিহ্নিত। ঐতিহাসিকভাবে প্রামাণ্য সাক্ষ্য মিলে যে মিশর তখন উন্নত সংস্কৃতির দেশ এবং বিশ্বের সকল সভ্যতার মাতামহী (Grandma) বলে স্বীকৃত।

মিশরের ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারে লোহিত সাগরের মুখ্য ভূমিকা আছে।

প্রায় খ্রিঃপূর্ব ২৭৫০ সাল থেকে মিশরের শাসকবর্গ নৌ-পথে আক্রমণ শুরু করে; উদ্দেশ্য ছিল নুবিয়া থেকে হাতির দাঁত ও দাস-দাসী সংগ্রহ করা, কারণ অন্য পথের চেয়ে নদী পথেই নুবিয়া যাওয়া সহজতর ছিল। এছাড়া 'পুনট', ওল্ড টেস্টামেন্টে ফুট (Phut), সম্ভবত আফ্রিকার সোমালিয়া থেকে সোনা, সিনাই থেকে তামা, হাবিলা (সম্ভবত নাজরান) থেকে মশলাপাতি ও দামি মেটালদ্রব্য আনা। দক্ষিণ আরবের হিমিয়ার অঞ্চল থেকে মৃতদেহ সংরক্ষণের জন্য ও দেবতাদের পূজোর কারণে ধূপ ও অন্যান্য দ্রব্যাদি আমদানি হতো। মিশরির মন্দিরের নথিপত্র উদ্ধৃত করে গ্রিক ঐতিহাসিক হিরোডোটাস (মৃত খ্রিঃপূঃ ৪২৫) বলেছেন যে, প্রথম সিসোট্রিস (Sesostris I) বাণিজ্য পথের নিরাপত্তার কারণে লোহিত সাগরের তীরবর্তী অঞ্চলে অভিযান চালিয়ে তার দখলে আনেন।

১ম থুতমাসিসের সময়ে (মৃ. প্রায় খ্রিঃপূঃ ১৫১২) (১৮তম বংশের সম্রাট) প্যালেস্টাইন, উত্তর আরাবিয়া, মেসোপটেমিয়া ও সিরিয়ায় অভিযান চালিয়ে সেসব অঞ্চল করায়ত্ত করেন, এতে মিশরের ফেরাওরা তাদের সাম্রাজ্যের পূর্ব দিকে ইউফ্রেটিস পর্যন্ত সীমানা বিস্তৃত করে।

খ্রিঃপূঃ ১৪৯০-এ রানী হাটশেপসুট (Hatshepsut) সিনাই-এর তামার খনিকে পরিবর্ধন করেন, যা শতাব্দি পূর্বে মিশরীয়রা দখল করেছিল এবং এরপর থেকে এই খনি মিশরে তামা সরবরাহে মুখ্য ভূমিকা পালন করে। হাটশেপসুট লোহিত সাগর এলাকায় এবং পুনট-এ অভিযান চালিয়ে ঐ সব এলাকা সুরক্ষিত করেন নিরাপদ বাণিজ্যের কারণে। এই সময়েই মিশরীয়রা সিনাই, উত্তর আরব ও মেসোপটেমিয়ার মধ্য দিয়ে যাত্রার সুবিধার জন্য রাস্তাঘাট তৈরি করে। একটি রাস্তা আকাবা বন্দর থেকে তাইমার মধ্য দিয়ে ব্যাবিলনের উত্তর সীমানায় চলে যায়, যার কারণে মিশরের সম্রাটের সাথে মেসোপটেমিয়ার শাসকের বেশ কয়েকটি সংঘর্ষ সংঘটিত হয়। পরবর্তীতে একটি গুরুত্বপূর্ণ মিশরীয় হাইওয়ে তাইমিয়া থেকে হিজাজ ও সিমিয়ার পর্যন্ত চলে যায়, মাঝে স্থানে স্থানে বিরতির স্থান তৈরি হয় বিশ্রামের জন্য। এই হাইওয়ের এক বিরতি স্থানে এক সময় ইথরেব (মদিনা) শহর গজিয়ে ওঠে। এই শহরের ইথরেব নাম মূলত মিশরীয়, কারণ এর সাথে নীলনদের মুখে ব-দ্বীপে এবং আপার ইজিপ্টে অবস্থিত আথরিবিস (Athribis) শহরের সাথে মিল খুঁজে পাওয়া যায়। প্রাচীন ভূগোলবিদদের কাছে ইথরিব লাথরিপ্পা বলে পরিচিত ছিল।

www.pathagar.com

বিদেশীদের প্রভাব যে আরবে পড়েছিল তার নিদর্শন পাওয়া যায় দক্ষিণ আরবে সেচ কর্মের জন্য বিশালাকার ড্যামের (Dam) অস্তিত্ব নদীমাতৃক দেশের সংস্কৃতিতে এবং এই সংস্কৃতি হয় মিশরীয় নয়তো মেসোপটেমিয়ার (ইরাক)। তাছাড়া আরবে যে স্থাপত্য শিল্পের উপস্থিতি ছিল তার নিদর্শনও মিশর কিংবা মেসোপটেমিয়ার সাথে মিলে যায়। তাই এই সব নিদর্শন ও প্রভাব নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে দেয় আরবের ওপর এই দুই বিদেশী দেশের প্রভাব।

একেশ্বরবাদের প্রথম উত্থান হয় মিশরে ফেরাও আখেনাটেন-এর সময় (মৃ. খ্রিঃপূঃ ১৩৬২) এবং সেই সময় মিশরে যেসব ইহুদি বসবাস করছিল তাদের এই মিশরীয় ঈশ্বরবাদ প্রভাবিত করতে পারে। পণ্ডিত ব্যক্তিরা এই একেশ্বরবাদের চিহ্ন খুঁজে পান বেশ কিছু হিমিয়ারাইট (দক্ষিণ আরব) উৎকীর্ণ লিপিতে (Inscriptions); এ নিদর্শন হিব্রুদের সংস্পর্শে এসে তাদের একেশ্বরবাদে উৎসাহিত করতে পারে।

মিশরীয় সর্বেশ্বরবাদও মক্কার চারদিক জুড়ে যেসব দেব-দেবী বিরাজ করত সম্ভবত সেগুলোকেও প্রভাবিত করেছিল।

১.২ মেসোপটেমিয়া (ইরাক)

টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদী বেষ্টিত যে ভূমাঞ্চল আরবদের কাছে 'জেজিরা' (দ্বীপ) বলে পরিচিত ছিল, পরবর্তীতে উত্তর অঞ্চলের নদীবেষ্টিত এলাকাকে প্রাচীন পণ্ডিতরা দ্বীপ বলেই চিহ্নিত করেছেন।

মিশরের মতো এই অঞ্চল খ্রিঃপূঃ ২৫০০ সাল থেকে আরব দেশের সংস্পর্শে আসে, এর নিদর্শন পাওয়া যায় আক্কাদিয়ানদের উৎকীর্ণ কিলক লিপি (Cuneiform inscription) থেকে।

আক্কাদিয়ানরা উত্তরের সিমিটিক দলভুক্ত। মধ্য এশিয়া থেকে আগত নন-সিমিটিক সুমারিয়ানরা এদেশের উত্তরাঞ্চলে বসবাস করত।

এই সুমারিয়ান জাতি আস্তে আস্তে সারা মেসোপটেমিয়ার ওপর প্রভুত্ব বিস্তার করে। পরবর্তীতে এই কারণে এই অঞ্চলে সিমিটিক ও নন-সিমিটিক মিশ্র লোক সংখ্যায় পরিণত হয় এবং সেই থেকে আজ পর্যন্ত এই মিশ্র লোক সংখ্যায় এ দেশ পরিপূর্ণ। সুমারিয়ার একটি নগর রাজ্য ইরেক থেকেই আধুনিককালের ইরাক নামে স্থিতি লাভ করে। এরেকের দক্ষিণে আর একটি মেসোপটেমীয় শহর কলদীয় 'উর' নামে পরিচিত ছিল। প্রাচীন সেমিটিক শব্দ 'উর' অর্থ দুর্গ। এই উর শহর আব্রাহামের পৈত্রিক শহর। আব্রাহামই ইহুদিদের পূর্ব-পুরুষ এবং উত্তর-আরবদেরও।

এই মেসোপটেমিয়ায় আক্কাদিয়ান ও সুমারিয়ানদের পর আসে এসিরিয়ান ও ব্যাবিলনিয়ানরা। এরা পূর্বসূরিদের মতো স্থানীয় বাসীদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখলেও পার্শ্ববর্তী ও প্রতিবেশী জাতির সাথে ঘন ঘন বিরোধে জড়িয়ে পড়তো।

মেসোপটেমিয়ার শাসকবর্গ দিলমুন (বাহেরায়েন), হাসসা (প্রাচীন গেরহা)-এর ওমানের দক্ষিণ দিক পর্যন্ত তাদের বাণিজ্যতরী পাঠিয়েছিল। এসিরিয়ান রাজা তুকুলতি নিনিব (প্রায় খ্রিঃপূঃ ১২৬০)-এর নথিপত্র থেকে পাওয়া যায় যে, এসব অঞ্চল ও দেশ তার অধীনে ছিল, কিন্তু এওহতে পারে যে সেসব দেশ শুধু বাণিজ্য বন্ধু দেশ

www.pathagar.com

ছিল (Friendly trading countries)।

খ্রিঃপূঃ ৪৫৪-এ এসিরিয়ান উৎকীর্ণ লিপিতে আরিবি (আরব) নাম পাওয়া যায়। বর্ণিত যে, গিন্দিবু বলে এক আরব এসিরিয়ান রাজা তৃতীয় লাল শালমেনসের (Shalmaneser III)-এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে জড়িত ছিল এবং রাজার শত্রুদের সাহায্যে এক হাজার উট সরবরাহ করেছিল। ৭৩৮ খ্রিঃপূর্বে এক উৎকীর্ণ লিপিতে প্রকাশ যে আরিবির এক রাজা আরাবিয়ান কেদার গোষ্ঠীর পুরোহিত রানী জাবিবাকে পরাস্ত করে উত্তর হিজাজ দখল করে নেয়। এই উৎকীর্ণ লিপি পাওয়া যায় এসিরিয়ান কিং তৃতীয় তিগলাত পাইলেসার (Tiglath Pileser III)-এর সময়ে। কেদার গোষ্ঠী তাম্বুবাসী এবং যুদ্ধপ্রিয় আরব দল। তারা তীর-ধনুকে অতি পারদর্শী ছিল। এদের কথা বাইবেলে উল্লেখ আছে। আরবের এই কেদার গোষ্ঠীর আদি পুরুষ (Progenitor) ছিল কেদর, ইসমাইলের পুত্র (আদি পুস্তক ২৫:১৩)। দামেস্কের দক্ষিণ-পশ্চিমে একটা বিশাল এলাকা জুড়ে তারা বসবাস করত।

৭১৫ খ্রিঃপূর্বাব্দে এসিরিয়ার দ্বিতীয় সারগন (Sargan II) আরব গোষ্ঠীদের উচিত শিক্ষা দেয়ার মনস্থ করেন, ইয়েমেন থেকে হাদ্রামাত পর্যন্ত বাণিজ্য পথে আরবদের লুটতরাজ বন্ধ করার জন্য। এই আরব গোষ্ঠীতে থামুদ ও আরাবি অন্তর্ভুক্ত ছিল। এদের মধ্যে যারা সারগনকে শ্বেত উষ্ট্র উপহার দিয়েছিল, তাদের মধ্যে উত্তর মরুভূমির আরবি সম্রাজ্ঞী শমসি এবং দক্ষিণ আরবের সাবার রাজা ইয়াথামরের নাম উল্লেখযোগ্য।

খ্রিঃপূঃ ৭০৩ অব্দে আরিবির রানী ইয়াতি তার ভাইয়ের অধীনে একদল সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন ব্যাবিলনিয়ানদের সাহায্যে এসিরিয়ার সেনাচেরিবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রার; ফলে সেনাচেরিব ৬৯০ খ্রিঃপূর্বাব্দে আরিবিদের বিরুদ্ধে একটি পিটুনি অভিযাত্রার আয়োজন করেন তাদের সায়েস্তা করতে। কিন্তু আরবরা এতে বিচলিত না হয়ে তাদের কর্মকাণ্ড চালিয়ে যেতে থাকে। এর ফলশ্রুতিতে ৬৭৬ খ্রিঃপূর্বাব্দে এসিরিয়ার রাজা এসারহেডন (Esarhedon) আরবের রানী তাইল খুনুকে (Tayl Khunu) আটকে তার বোন তুববা (Tubwa)সহ নাইনেভে নির্বাসিত করেন। কেননা তারা সর্বদা এসিরিয়ার বিরুদ্ধে ব্যাবিলনকে সাহায্য জুগিয়ে চলছিল। কেদার গোষ্ঠীর রাজা হাজাইলের সাথে পরে তুববার বিয়ে দেয়া হয়। পরবর্তীতে কোনো এক আরব গোত্র প্রধান উয়াবুর (ওয়াহাব) অধীনে এক বিদ্রোহ দেখা দিলে এসিরিয়ানরা তা সমূলে উৎপাটন করে।

৬৬০ খ্রিঃপূর্বাব্দে এসিরিয়ার শেষ কৃতী সম্রাট অসুরবানিপাল (গ্রিকদের কাছে সারদানাপলাস) আরিবিদের বিরুদ্ধে অভিযান চালান। পরে, ৬৪৮ খ্রিঃপূর্বাব্দে তিনি উশু (Ushu) (পালমিরা) অঞ্চলে এক আরব বিদ্রোহ দমন করেন। এই বিদ্রোহীদের মধ্যে কেদারের রাজা আমুলাদি ও তার সহযোগী পার্শ্ববর্তী গোত্রের রানী আদিয়াসহ ধরা পড়েন।

৬১২ খ্রিঃপূর্বাব্দে ব্যাবিলনের নাবোপোলাসার (Nabopolassar) এসিরীয় রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং নিওব্যাবিলনীয় (কলদীয়) রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে ব্যাবিলনিয়া অধিকার করেন। ৬০৬ খ্রিঃপূর্বাব্দে তিনি মেডেস-এর সাথে বন্ধুত্ব করে এসিরীয় রাজধানী নাইনেভ দখলে নেন। তারপর থেকেই ব্যাবিলনের শক্তি

www.pathagar.com

ও বিক্রম বাড়তে থাকে।

৫৮০ খ্রিঃপূর্বাব্দে আবার আরবদের সাথে যোগ দিয়ে বিশৃংখলা সৃষ্টি করায় ব্যাবিলনীয় সম্রাট দ্বিতীয় নেবুচেদনজর (Nebuchadnezzar II) কেদারদের ধমক দিলে তারা কর দিতে প্রস্তাব করে। কিন্তু সম্রাট এই দুস্কৃতকারী আরবদের একটা উচিত শিক্ষা দেয়ার সিদ্ধান্ত নেন। এই অভিযানে যেসব আরব প্রাণ হারায় তাদের মধ্যে নেতৃত্বদানকারী যোদ্ধা আদনান অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই নেতার পুত্র মাআদ, হত্যাযজ্ঞ থেকে কোনো প্রকারে প্রাণ বাঁচিয়ে হেজাজে পলায়ন করে। এই মাআদ প্রফেট মোহাম্মদের দূরবর্তী পূর্বসূরিদের মধ্যে একজন বলে অনেকে ধারণা করেন।

৫৫২ খ্রিঃপূর্বাব্দে নাবোনিদাস (Nabonidus) ছিলেন ব্যাবিলনের শেষ রাজা। তিনি উত্তর হেজাজের এক শহর দখল করেন। এই শহরের নাম তাইমা, পরে তাঈ গোষ্ঠীর কেন্দ্রভূমিতে পরিণত হয়। রাজা নাবোনিদাস ব্যক্তিগতভাবে এই শহর পরিদর্শন করে একে তাঁর ক্ষমতার আসনে রূপান্তর করেন এবং ইথরিব (মদিনা) পর্যন্ত আরবদের দমন করেন ও পুত্র বেলশাহজারে (Belshazzar) হাতে ব্যাবিলনের ভার দেন। পরে ব্যাবিলন পারস্যদের দ্বারা ৩৫৯ খ্রিস্টাব্দে অধিকৃত হয়। বেলশাহজার পরাজিত ও নিহত হন।

১.৩ ইহুদি জাতি

প্রাচীন আরব ইতিহাসকে জানতে হলে ওল্ড টেস্টামেন্টের ওপর ভরসা করতে হয়। ঐতিহাসিকদের জন্য ওল্ড টেস্টামেন্ট শুধু সূত্র খোঁজার মূল কাঠামো নয়, ধর্মের উৎস খুঁজে যেসব ছাত্র হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়ায় তারাও এই গ্রন্থের সাহায্যপ্রার্থী হয়। আরবরা, যাদের পূর্ব-ইতিহাস নেই, তারাও বাইবেলনির্ভর হয় এবং উপযুক্তভাবে গ্রহণ করে আব্রাহাম ও তার বংশধরদের কাহিনী, আরবদের প্রাথমিক ইতিহাস গড়তে।

ইহুদিদের মতো আরবরাও আব্রাহামের বংশধর বলে দাবি করে। যদিও আব্রাহামের সম্পর্কে যে ট্রাডিশন বর্তমান তাতে ইহুদি ও আরবদের ভার্সানে ভিন্নতা আছে। সেই ভিন্নতাকে পরিষ্কার করা দরকার নয় কি?

আব্রাহাম (প্রায় খ্রিঃপূর্ব ১৮০০) মেসোপটেমিয়ার কলদিয়ার একটি শহর থেকে আগত। তিনি উর নগরী, স্ত্রী সারাহসহ পরিত্যাগ করেন জেরুজালেমে কেনান ভূমিতে বাস করার জন্য। দুর্ভিক্ষের কারণে তারা উভয়েই কেনান থেকে মিশরে চলে যান। যেখানে আব্রাহাম হ্যাগার নামে এক মিশরীয় উপপত্নী গ্রহণ করেন স্ত্রী সারাহর সেবা কর্মের জন্য। হ্যাগারের মধ্যে দিয়ে আব্রাহাম ইসমাইলের পিতা হন। এই ইসমাইল উত্তর আরবদের পূর্বপুরুষ। পরবর্তীতে সারাহ আব্রাহামকে একটি পুত্র সন্তান উপহার দেন যার নাম ইসহাক, ইনি ইহুদিদের পূর্বপুরুষ।

আরব ট্রাডিশন মতে, ঈশ্বরের আদেশে আব্রাহাম হ্যাগার ও পুত্র ইসমাইলকে সঙ্গে নিয়ে হেজাজে গিয়ে মক্কার কাছাকাছি আরাফাত পার্বত্যাঞ্চলে যান এবং সেখানে আব্রাহাম আল্লাহর প্রতি আনুগত্যে পুত্রকে কোরবানি (উৎসর্গ) করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। পুত্রকে নিয়ে উৎসর্গ করার স্থানে যাওয়ার পথে শয়তান সম্মুখে আবির্ভূত হয় মুজদালিফা পর্বতে এবং আব্রাহামকে তার কর্ম থেকে বিরত থাকার জন্য চেষ্টা করে। কিন্তু পিতামহ (Patriarch) আব্রাহাম শয়তানকে পাথর মেরে তাড়িয়ে দেন।

www.pathagar.com

আব্রাহাম মিনার কাছে থাবির (Thabir) পাহাড়ের দিকে এগিয়ে যান (মক্কার পূর্বে) পুত্রকে কোরবানি দেয়ার জন্য এবং খড়্গ উত্তোলন করে কোপ দেবার সময় স্বর্গীয় হস্তক্ষেপে অবিশ্বাস্যভাবে পুত্রের পরিবর্তে একটি ভেড়া কোরবানি হয়ে যায়। কোরআনে এই ঘটনার বিবরণ আছে (৩৭ঃ১০১)। কোরআনে যদিও আব্রাহামের কোনো পুত্রের নাম উল্লেখ নেই তবুও ইসমাইলকে অনুমান করা হয়।

মক্কাতে এক গৃহ কাঠামোকে কেন্দ্র করে বলা হয় যে এই কাঠামো আদম কর্তৃক তৈরিকৃত; কিন্তু প্লাবনে ধ্বংস হয়ে যায়। আব্রাহাম ও ইসমাইল এই গৃহকে মন্দির রূপে খাড়া করেন যা কাবাগৃহ বলে পরিচিত (২২ঃ২৭)। এই গৃহ নির্মাণ কর্ম শেষ করে আব্রাহাম হ্যাগর ও ইসমাইলকে মক্কার মরুভূমিতে ছেড়ে রেখে স্ত্রী সারাহর কাছে ফিরে যান।

ছাতিফাটা তৃষ্ণা নিয়ে পানির খোঁজে হ্যাগার মক্কার নিকটবর্তী সাফা ও মারওয়া পর্বতের মাঝে ছুটোছুটি করেন। হ্যাগার ও তার পুত্র তৃষ্ণায় মারা যেত যদি না এক দেবদূত তাদের কাছে জমজম কূপের সন্ধান দিত। জমজম কূপ এখন মক্কার কাবা ঘরের চার দেয়ালের মধ্যে। বলা হয় যে, হ্যাগর ও ইসমাইলের কবর কাবা ঘরের উত্তর দিকে অবস্থিত।

বাইবেলের মতে, (আদি পুস্তক ২১ : ১৪) আব্রাহাম হ্যাগার ও ইসমাইলকে কেনানের দক্ষিণ দিকে বীরশেবা মরুপ্রান্তরে ছেড়ে যান, মক্কার পর্বতের কাছে নয়। বাইবেল বলে যে, (আদি পুস্তক ২১ : ২১) পরানের মরু প্রান্তরে ইসমাইল বসবাস করতে থাকেন যা সিনানে অবস্থিত, হিজাজে নয়। বাইবেলের ভার্সানে আব্রাহাম যে পুত্রকে বলি দিতে চেয়েছিলেন তিনি ইসমাইল নন, সারাহর পুত্র আইজাক (ইসহাক)। স্থিরীকৃত বলির স্থান মক্কার নিকট থাবির পর্বত নয়, জেরুজালেমের কাছে মোরিয়া পর্বত।

বাইবেলে এমন কোনো বিশ্বাসযোগ্য কাহিনী বর্ণিত হয়নি যে, আব্রাহাম ও ইসমাইলের হিজাজের সাথে কোনো সম্পর্ক ছিল। অথবা মক্কা ও কাবার সাথে। প্রাক ইসলামী যুগের কোনো ট্রাডিশনে একথাও ছিল না যে হ্যাগার ও ইসমাইলের কবর কাবার পাশে। ইসমাইল ও তার মায়ের কাহিনী পরবর্তী সময়ে বের হয়ে আসে হিজরতের পরে।

এ বিষয়ে মুসলিম পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে, দুই দল আছে। ইবনে মাসুদ, আল বাইদাবি এবং অন্য তফসিরকারগণ বলেন যে, পুত্র ইসমাইলকে-ই কোরবানি দেয়ার কথা ছিল। কিন্তু ইবনে ওমর ইবনে আব্বাস ও আবদুল্লাহ ইবনে আহমদ-এর মতো তফসিরকারগণ বাইবেলের ভার্সানের সাথে একমত হয়ে বলেন যে, কোরবানির পুত্র ছিল আইজাক।

আধুনিককালে মিশরীয় পণ্ডিত ব্যক্তি তাহা হোসেন মন্তব্য করে প্রশ্ন তোলেন, আদতে আব্রাহাম মক্কায় গিয়েছিলেন কী না? (দ্রঃ গিয়োম, ১৯৮৩, পৃঃ ১৫৬)।

'আব্রাহামের ধর্ম'কে প্রফেট মোহাম্মদ প্রাধান্য দেন, যখন ইহুদিরা তাঁকে অস্বীকার করে প্রফেট বলে। ইসলাম ধর্মে আব্রাহাম নতুন ভূমিকায় উদয় হন (তিনি ইহুদি ছিলেন না, খ্রিস্টানও ছিলেন না, ছিলেন মুসলিম)।

www.pathagar.com

আব্রাহাম ও আরবদের মধ্যে যে সম্পর্কই থাক না কেন, এটা পরিষ্কার যে পরবর্তীতে আরব ও ইহুদিদের মধ্যে একটা বাণিজ্য সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। বাইবেলে বর্ণিত আছে যে আব্রাহামের দৌহিত্র জেকবের সময় আরব ব্যবসায়ীরা মশলাপাতি, মলম এবং গিলিড (Gilead) পর্বত থেকে সুগন্ধি দ্রব্য ইত্যাদি মিশরে বহন করে নিয়ে যেত বিক্রয়ের জন্য (আদিপুস্তক ৩৭ঃ২৫)। জর্ডনের পূর্ব দিকে গিলিড উল্লেখযোগ্য বাণিজ্য এলাকা ছিল। এই পার্বত্য অঞ্চলকে গাশান (Ghassan) গোত্র অধিকার করে।

দক্ষিণ আরবের ওফির (জোফার) থেকে বাদশা সলেমন কাঠের তক্তা, মশলা, সুগন্ধি দ্রব্য এবং মূল্যবান পাথর আমদানি করতেন (১ রাজাবলী ১০ঃ১১)। খ্রিঃপূঃ প্রায় ৯৯০-এ শেবার রানী (দক্ষিণ আরবে সাবা) কিং সলোমনের দরবারে যান রাজকীয় তোহফা সাথে করে (১ রাজাবলী ১০ঃ১-২)। বাইবেলের বর্ণনা মতে, সেই সময়ে আরবের সব রাজা ও গর্ভনরেরা কিং সলোমনকে সোনা-রুপা উপহারস্বরূপ প্রদান করেছিলেন।

খ্রিঃপূঃ আনুমানিক ৮৮০ অব্দে জুদার রাজা জেহোশাফট আরবদের কাছ থেকে ৭৭০০ ভেড়া ও ৭৭০০ ছাগল কর স্বরূপ গ্রহণ করেন। (২ ক্রনিকেল, ১৭ঃ১১)। এর কয়েক বছর পরে ৮৭০ খ্রিঃপূর্বাব্দে ইথোপিয়ার কাছে বসবাসকারী আরবরা (২ ক্রনিকেল-২১ঃ১৬) সম্ভবত হিজাজে জুদা আক্রমণ করে (তখন জুদার রাজা ছিলেন জেহারাম), রাজপ্রাসাদ তছনছ করে এবং তার স্ত্রীদের, পুত্রদের, কনিষ্ঠপুত্র ছাড়া তুলে নিয়ে গিয়েছিল। কনিষ্ঠ পুত্রের নাম ছিল জেহোয়াহাজ। এরপর কোনো এক সময় ইহুদিরা শক্তি সঞ্চয় করে এবং ৭৯০ খ্রিঃপূর্বাব্দে জুদার রাজা উজ্জিয়াহ, আরবদের পরাভূত করে। (২ ক্রনিকেল ১৭ঃ৭)

৭০১ খ্রিঃপূর্বাব্দে হেজেকিয়াহ রাজত্বের সময় কয়েকটি আরব গোত্র মিলে এসিরিয়ার সেনাচেরিবের সাথে জেরুজালেম আক্রমণ করে। কিন্তু এই এসিরিয়ান সৈন্য দলে প্লেগ আরম্ভ হলে অভিযান পরিত্যক্ত হয়, কয়েক হাজার সৈন্য রোগে মারা পড়ে (২ রাজাবলী ১৯ঃ৩৫)।

এক শতাব্দি পরে খ্রিঃপূঃ ৫৯৭ অব্দে ব্যাবিলনের নেবুচেদনজর (দ্বিতীয়) জুদা আক্রমণ করে অধিকার করে। জেরুজালেমের মন্দির ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং ব্যাবিলনে অধিকাংশ ইহুদি লোকজনকে বন্দি করে নিয়ে যান। বন্দিদের মধ্যে প্রফেট এজিকেলও ছিলেন। তিনি আরবের অনেক স্থানের কথা উল্লেখ করে বলেছেন– আরবরা অনেক মূল্যবান দ্রব্যাদি ব্যাবিলনে রপ্তানি করত। (এজিকেল ২৭ঃ১৯-২৪)

বাইবেলে আরবদের ব্যাপারে শেষ বক্তব্যটি হলো যে, ৪৪৫ খ্রিঃপূর্বাব্দে জেশেম বলে একজন আরব অন্যদের সাথে মিলে নেহেমিরাহকে জেরুজালেম শহর ও দেয়াল পুনঃনির্মাণে বাধা দিয়েছিল। (নেহে. ২ঃ১৯)।

১.৪ ভারত

সিন্ধু উপত্যকায় ও দক্ষিণ মেসোপটেমিয়ায় খনন করার ফলে যে সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া যায় তা থেকে প্রমাণিত হয় যে আদিকাল থেকে প্রাক এরিয়ান ভারত ও সুমেরিয়ার মধ্যে যোগাযোগ ছিল। ব্যাবিলনিয়ানকালে ভারতের বাণিজ্য জাহাজ

www.pathagar.com

পার্সিয়া ও পার্সিয়ান গালফের আরব তীর প্রান্ত, বাহরায়েন ও ওমান হয়ে শাতিল আরব যাত্রা করেছিল। বাহারায়েন (প্রাচীন দিলমুন) ছিল ট্রানজিট পোর্ট, আরব দেশ থেকে ভারতে বিলাসী দ্রব্যের রপ্তানির জন্য সমুদ্রগামী ভারতীয় জাহাজ সিন্ধু নদী ও অন্যান্য আর্যভাষী ভারত বন্দরের মুখ থেকে ছেড়ে যেত। ভারতের দক্ষিণ অঞ্চলে দ্রাবিড়ভাষী বন্দর তীর থেকেও জাহাজ ছাড়তো। দক্ষিণ আরাবিয়ার সাথেও বাণিজ্য ছিল ভারতের। এডেন বন্দর এই অঞ্চলে সবচেয়ে বড় বাণিজ্য বন্দর ছিল। দক্ষিণ আরব ও পারস্য উপসাগরের ওয়ার-হাউসগুলো ভারত ও শ্রীলঙ্কা থেকে আগত পণ্যদ্রব্যে ভর্তি থাকত।

আরব দেশ থেকে প্রধান রপ্তানি দ্রব্য হলো সুগন্ধি গুল্ম ও পারফিউম। ভারত থেকে আরবে রপ্তানি হতো মণিমানিক্য, হাতির দাঁত, দারুচিনি, গোলমরিচ, আদা, চাল, চন্দন, কর্পূর, রং ও দুস্প্রাপ্য প্রজাতির প্রাণী যেমন ময়ূর ও বানর। স্ট্রাবো (মৃ. খ্রিঃ ২১) উল্লেখ করেন যে, তৈরি মধু (মোমাছিজাত নয়) বা গুড়ও ভারত থেকে রপ্তানি হতো।

ভারতের তুলার কাপড়ের নাম ছিল। তাই সাদা কাপড়ের ও খুব রঙিন কাপড়ের চাহিদা ছিল আরব বিশ্বে। চীন ও ভারত থেকে সিল্ক রপ্তানি হতো। ভারতীয় তীর-ধনুকের গুণগত মানের কদর ছিল আরব দেশে এবং প্রখ্যাত আরবীয় তীরন্দাজরা এই সব তীর-ধনুক ব্যবহার করত যুদ্ধক্ষেত্রে। ভারত থেকে বাঁশও আমদানি হতো বর্শার ফলকের ওপর লাগানোর জন্য। বর্শার লম্বা হাতলটা ভারতীয় বাঁশের তৈরি।

আরবে শক্ত কাঠের অভাব ছিল। তাই ভারতীয় কাঠ ও তক্তার কদর ছিল ব্যাবিলনীয় সময় থেকেই এবং শতাব্দি ধরেই তা চলেছে। বলা হয় যে, তৃতীয় খলিফা ওসমান (৬৪৪-৬৫৬) মদিনাতে প্রফেটের মসজিদ পুনর্নির্মাণের জন্য ভারত থেকে টিক কাঠের তক্তা আমদানি করেন মসজিদের ছাদ তৈরির জন্য।

১.৫ পারস্য

খ্রিঃপূঃ ৫৩৯ অব্দে মহামতি সাইরাস-এর অধীনে পারস্য সৈন্যদল ব্যাবিলন জয় করে এবং পারস্য সাম্রাজ্যের (আকামেনিয়ান) সূচনা করা হয়। আরবের ভাড়াটে সৈন্যরা সাইরাসের সৈন্যদলে যোগ দিয়ে ব্যাবিলনের পতন ঘটায়। এই সংঘর্ষে ব্যাবিলনের শেষ যুবরাজ বেলশাজার নিহত হন। তারপর সাইরাস উত্তর আরাবিয়ার দিকে অগ্রসর হয়ে গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য কেন্দ্র তাইমা অধিকার করেন। এই তাইমা ছিল ব্যাবিলনের প্রতিরোধ দুর্গ। এটাও রক্ষা পেল না।

৫২৫ খ্রিঃপূর্বাব্দে সাইরাসের পুত্র কেমবাইসেস (Cambyses) আরব বেদুইনের সহযোগে মিশর বিজয় করেন। এই অভিযান সম্বন্ধে হিরোডোটাস মন্তব্য করেন যে, অভিযানকালে মরু প্রান্তরে আরবরা লাগাতার পানি সরবরাহ করেছিল পারস্য সৈন্যদের।

কেমবাইসের উত্তরাধিকার ১ম দারায়ুস মধ্যপ্রাচ্যের আরও কিছু অংশ অধিকার করে নেন ভূমধ্যসাগর থেকে সিন্ধুনদ পর্যন্ত। তিনি স্কাইলাক্স (Skylax) নামে এক গ্রিক কাপ্তানকে সিন্ধুনদ থেকে ভারত মহাসাগরের ওপর দিয়ে লোহিত সাগরে আধুনিক সুয়েজ খালের কাছে আর্সিনো (Arsinoe) পর্যন্ত সমুদ্রযাত্রায় পাঠান (খ্রিঃপূঃ

www.pathagar.com

৫১২-৫১০)। দারায়ুসের এক উৎকীর্ণ লিপি থেকে জানা যায় যে, আরব দেশ তখন পারস্যের এক করদ রাজ্যের মর্যাদায় ছিল এবং তা চলেছিল পরবর্তী দু'শতাব্দি ধরে।

৪৮০ খ্রিঃপূর্বাব্দে হেরোডেটাসের ভাষ্যমতে, আরবরা অন্যান্য ৫৬ জাতির মধ্যে একটি যারা পারস্য সম্রাট জারাক্সেসের সৈন্য দলে কাজ করেছিল এবং গ্রিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধও করেছে।

৩৩১ খ্রিঃপূর্বাব্দে গ্রিক বীর মহামতি আলেকজান্ডার পারস্য সম্রাট তৃতীয় দারায়ুসকে আরবেলার (Arbela) যুদ্ধে পরাজিত করে পারস্য দখল করেন। আলেকজান্ডারের মৃত্যুর পর পারস্য রাজ্য আলেকজান্ডারের সেনাপতি সেলুকাসের ভাগ্যে পড়ে।

খ্রিঃপূঃ আনুমানিক ২৫০ অব্দে উত্তর-পূর্ব পারস্যে পার্থিয়েন (Parthians) বাহিনী গড়ে ওঠে এবং প্রথম আরসাসের (Arsaces) দখলকারী সেলুসিডের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং পার্থিয়ান (আরসাসিড) বংশের পত্তন করে (খ্রিঃপূঃ ২৪৭-২৪)। এই পার্থিয়েনরা প্রাচীন পারস্য রাজা আকামেনিডদের বংশধর বলে দাবি করে। এই পার্থিয়েনদের নেতা প্রথম আরসাসেস আকামেনিয়ানদের মতো জোরাস্ত্রিয়ান ধর্ম পালন করে সেই ধর্ম চালু করে যান।

প্রথম মিথরিডেটস (Mithridates I)-এর সময় পার্সিয়ান সাম্রাজ্য বর্ধিত ছিল ইউফ্রেটিস থেকে সিন্ধুনদ পর্যন্ত, বলতে গেলে সেলুসিডদের সমগ্র রাজ্য সিরিয়া পর্যন্ত। এদের প্রাদেশিক রাজধানীর মধ্যে একটি ছিল স্টেসিফোন (Ctesiphion) বর্তমান মধ্য ইরাকের মাদায়েন। আধুনিক বাগদাদ থেকে দক্ষিণ-পূর্বে টাইগ্রিস নদীর তীরে সেলুসিয়া গ্রিক ক্যাম্পের বিপরীতে অবস্থিত।

খ্রিস্টাব্দ প্রথম শতাব্দিতে নিকট প্রাচ্যের অধিকাংশ অংশ রোমানরা গ্রিকদের সরিয়ে দখল করে নেয়, শুধু সেলুসিডরা বাকি থেকে যায় পুরানো শত্রু হিসাবে। অনেক দিন ধরে রোম ও পার্থিয়া প্রাধান্য পাওয়ার জন্য মুখোমুখি যুদ্ধ করেছে। দ্বিতীয় খ্রিস্টাব্দে যখন পারস্যে সাসানিয়ান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়, রোমকে এদের সাথেও পাঞ্জা লড়তে হয়েছে। সাসানিয়ানরাও জোরাস্ত্রিয়ান ধর্মধারী।

আরবে প্রাথমিকভাবে সম্পৃক্ত হয়ে পারসিয়ানরা উট দিয়ে পানি টেনে সেচের জন্য একটি নতুন পদ্ধতি চালু করে। একে পানি চাক্কা বলা হতো (Water-wheel)। এ ছাড়া পার্সিয়ানরা আরবে খাল কেটেও ভূমিতে সেচের ব্যবস্থা করে। উপরন্তু পার্সিয়ানরা তথাকথিত আরবি ঘোড়ার প্রজনন ও শিক্ষার বন্দোবস্ত করে। হাজার বছর পূর্বে ব্যাকট্রিয়ায় বন্য ঘোড়া পোষ মানানোর ব্যবস্থা ছিল। তাদের পূর্বপুরুষরা ছিল লিবিয়ান (আরাবিয়ান) এবং মঙ্গোলিয়ান ধারার। পারস্য ঘোড়া বেশি মূল্যায়িত হতো যুদ্ধক্ষেত্রে ও সন্ধির সময়। যুদ্ধ ও রেসের (দৌড়) জন্য বিশেষভাবে ঘোড়ার প্রজনন ও লালন হতো সেখানে।

ঘোড়দৌড় প্রাচীন আরবদের প্রিয় সখের জিনিস। ঘোড়াদের আরোহী ছাড়া দৌড়ানো হতো। যেমন রোমে করসকো (Corsco)তে করা হতো। অনেক পরে ঘোড়ার পিঠে আরোহী চাপানো হয়েছে। যুদ্ধে উটের পিঠে চড়ে যোদ্ধারা আরোহী শূন্য ঘোড়াদের তাড়িয়ে নিয়ে যেত যুদ্ধ ক্ষেত্রে পৌঁছানো পর্যন্ত। শত্রুদের মুখোমুখি হওয়ার

www.pathagar.com

অবস্থায় ঘোড়ার পিঠে সওয়ারী উঠতো। প্রফেট মোহাম্মদ তাদের নিন্দা করেছেন যারা স্থানীয় ঘোড়া ছেড়ে পার্সিয়ান ঘোড়া পছন্দ করত। (গোল্ডজিহার, ১৯৬৭ পৃঃ ১৫৬)।

পার্সিয়া থেকে আগত উৎকৃষ্ট মানের তরবারি ও তার খাপের প্রশংসা করেছে আরব কবিরা। বর্ম ও হেলমেটও পারস্য থেকে আমদানি করা হতো প্রাক ইসলামী যুগে। শুধু আরব নয়, তুর্কিরা ও ক্রুসেডাররাও এসব যুদ্ধাস্ত্র ব্যবহার করত।

১.৬ আবিসিনিয়া

ফ্যারাওদের সময় থেকে আবিসিনিয়ায় (বাইবেলে কুশ Cush) কুশেরা বাস করত। এরা সেমেটিক গোত্রের; মূল ও দক্ষিণ আরবীয়া থেকে লোহিত সাগর পার হয়ে আরবরা সেখানে ভিড় জমিয়েছিল।

মিশরীয় ধর্মগ্রন্থে প্রধান গোত্রকে বলা হতো হাবাশা অথবা আহাবিশ। আনুমানিক ৮০০ খ্রিঃপূর্বাব্দে একজন হাবাশা প্রধান দাবি করে যে কিং সলোমান ও শেবার রানীর পুত্র প্রথম মেনেলিক (Menelik I)-এর এরা বংশধর, যিনি আবিসিনিয়ায় রাজ্য স্থাপন করেন। (বলা হয় যে কিং সলোমন শেবার রানী বিলকিসকে বিয়ে করেছিলেন। ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত নয় : অনুবাদক)

খ্রিস্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দি থেকে আবিসিনিয়ানরা আরবে সাবা প্রদেশের সাথে যোগাযোগ বজায় রেখে চলেছে। সাবা ছাড়া হিমিয়ার ও হিজাজের সাথেও এদের যোগাযোগ ছিল। মিশরের সাথেও তাদের নিগূঢ় সম্পর্ক ছিল। তবে খ্রিঃপূর্বাব্দের শেষ শতাব্দি থেকে হেলেনাইজড মিশরীয়দের দ্বারা এরা প্রভাবিত হয়েছে।

খ্রিস্টাব্দের শুরুতে, নেগাস (আরবে নাজাসি) তার শাসনামলে বিভিন্ন গোত্রকে এক করে আকসুম (Aksum) রাজ্যের পত্তন করেন। লোহিত সাগর তীরে বন্দর আদুলিসে ভারত, পূর্ব আফ্রিকা ও পারস্য উপসাগর হতে আগত কার্গো ওঠানামা করেছে। আকস্সম ও আরবের দক্ষিণ-পশ্চিম রাজ্যের সাথে বাণিজ্য সম্পর্কও এই সময়ে জোরদার হয়।

এজানার (Ezana) রাজত্বকালে (খ্রিঃ ৩২৪-৪২) আকসুম ক্ষমতার শিখরে ওঠে। এজনাকে আবিসিনিয়ার কনস্ট্যানটাই বলা হয়। ৩৩০ খ্রিস্টাব্দে তিনি বিশপ ফ্রুমেন্টিয়াস (Frumentius)-এর হাতে খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করেন। ফ্রুমেন্টিয়াসকে আবিসিনিয়ানরা আব্বা সালামা বলে। আকসুমের প্রথম বিশপ আলেকজান্দ্রিয়ার সেন্ট আথানাসিয়াস এই উপাধি দেন। আবিসিনিয়ার খ্রিস্টানিটি মনোফিসাইট (কপটিক) ছিল এবং এই ধর্ম রাষ্ট্রধর্ম রূপে আবিসিনিয়ায় গৃহীত হয়। ফলে এদেশ বাইজানটিয়ানের কাছে বন্ধুদেশে দেশে পরিণত হয়।

৩৪৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে আলামিদার রাজত্বকালে হিমিয়ারের কিছু অংশ আক্রমণ করে এরা কর্তৃত্ব বিস্তার করে এবং সেখানে খ্রিস্ট ধর্ম প্রবর্তিত হয়। তিরিশ বছরের মতো, খ্রিঃ ৩৭৫ পর্যন্ত এই দখলদারি ও কর্তৃত্ব বজায় থাকে, এর পরেই এক আরব প্রধান হিমিয়ার থেকে আবিসিনিয়ানদের তাড়িয়ে দেশবাসীদের ইহুদি ধর্মে দীক্ষিত করে।

৫২৫ খ্রিস্টাব্দে আকসুমের কিং কালে (এলাসবেহা) এক সেনাবাহিনী প্রেরণ

www.pathagar.com

করেন ইহুদি রাজা ধু নুবাস (Dhu Nuwas)-এর অত্যাচার থেকে খ্রিস্টানদের রক্ষা করার জন্য। আবিসিমনিয়া নাজরেন দখল করে সেখানে (ঐ অঞ্চলে) একজন ভাইসরয় নিযুক্ত করে। প্রায় ৫০ বছর পরে ৫৭৬ খ্রিঃ সাসানিয়ান অন পারসিয়ারা নাজরেন অধিকার করে নেয়।

উল্লেখ্য যে, প্রফেট মোহাম্মদ-এর মিশন যখন শুরু হয় তখন মক্কাতে আবিসিনিয়ার একটি ছোট কলোনি ছিল সদাগর ও শ্রমিকদের। ৬১৫ খ্রিস্টাব্দে যখন প্রথম মুসলিমদের ওপর অত্যাচার শুরু হয় মক্কাতে, সেই সময় আবিসিনিয়ার শাসক আশামা (Ashama) (আরমা) নতুন ধর্ম গ্রহণকারী অনেক মুসলিমদের আশ্রয় দিয়েছিলেন।

১.৭ আরামায়েন

আনুমানিক খ্রিঃপূঃ ১৩০০ অব্দ থেকে সিরিয়াতে আরামায়েনরা বসবাস শুরু করে। বাইবেলের মতে তারা সেমেটিক জাতি এবং শেমের পুত্র আরামের বংশধর (আপুঃ ১০ঃ২২)। তারা উত্তর আরাবিয়া থেকে সিরিয়ায় চলে যায়। গ্রিকরা প্রথমে সিরিয়ানদের আরামায়েন বলে জানতো।

আরামায়েনরা দামেস্ক (প্রাচীনকালে আরাম নামে পরিচিত) পালমিরা (বাইবেলে ট্যাডমর), এলেপ্পো, এডেসা (আধুনিক তুর্কিস্তানে 'উরফা') ইউফ্রেটিস নদীর তীরে কারশেমিশ এবং অন্যান্য স্থানে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেছিল– এসবের কথা মিশরীয় আক্কাদীয়, এসিরীয় ও ব্যাবিলনীয় নথিপত্রে উল্লেখিত আছে। বাইবেলেও এ সম্বন্ধে ঘনঘন রেফারেন্স আছে। বহু বছর ধরে এসব রাজ্য এসিরীয়দের পথের কাঁটা ছিল। ফলে আরামীয়দের বিভিন্ন স্থানে নির্বাসনে যেতে হয় যখন এসিরীয়রা এ স্থান দখল করে। তারা ভ্রাম্যমাণ জাতি বলে পরিচিত ছিল এবং তাদের বিস্তৃত এলাকা জুড়ে বাণিজ্য কর্মকাণ্ড ছিল, কিন্তু মৌলিক ও সৃষ্টিশীল সংস্কৃতি কর্মে এরা পিছিয়ে ছিল। তাদের বিশাল ও মিশ্র সর্বদেবতার মন্দিরের ধারণা বিদেশী লোকদের কাছ থেকে ধার করা। তাদের প্রধান দেবতা ছিল ঝড়ের দেবতা হাদাদ, আকাশ দেবতা আলাহা, আর দেবীর নাম ছিল আথারগাটিস।

খ্রিঃপূঃ ৭০০ থেকে আরামায়েনদের ক্ষমতা দিন দিন কমতে লাগল যখন একের পর এক এসিরীয়, ব্যাবিলনীয়, পার্সিয়া, মেসিডোনিয়ান, সেলুসিড রোমানদের আক্রমণ প্রতিহিত করতে হলো।

মধ্যপ্রাচ্যের সংস্কৃতিতে তাদের শ্রেষ্ঠ অবদান লিপি (Script)। ফোনিশিয়ানদের বর্ণ লিপিকে গ্রহণ করে তারা খ্রিঃপূঃ ৮৫০ থেকে একে আরো সহজতর ও উন্নত করে একটা স্থায়ী ফরমে নিয়ে আসে। আরামায়েন ভাষা আরামাইক আশেপাশে অতি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং খ্রিঃপূঃ ৪০০ অব্দের মধ্যে আশপাশে বর্ডারে ছড়িয়ে পড়ে, তারপর পরিপার্শ্ব দেশের জাতীয় ভাষা মুখের ভাষায় পরিণত হয় এবং সিরিয়া থেকে মেসোপটেমিয়া, মিশর থেকে এশিয়া মাইনর ও ককেসাস, পার্সিয়া থেকে পাঞ্জাব পর্যন্ত দাপ্তরিক ও বাণিজ্যের ভাষার মর্যাদা পায়। ভারতীয় সম্রাট অশোক (প্রায় খ্রিঃপূঃ ২৩২) ও তার পাথরের রাজাজ্ঞা নির্দেশ ও ঘোষণায় তিনটি ভাষা ব্যবহার করতেন

www.pathagar.com

আরামাইক, গ্রিক ও প্রাকৃত।

ওল্ড টেস্টামেন্টের কিছু অংশ এই আরামাইক ভাষায় লিখিত হয়েছিল এবং যিশু এই ভাষা ব্যবহার করতেন আর প্যালেস্টাইন হিব্রুরা এই ভাষা বুঝতে পারত। হিব্রু, আরাবিক, পালমিরিন, নাবাটিয়েন এবং অন্য আঞ্চলিক ভাষা আরামাইক বর্ণ-লিপির কাছে ঋণী এবং তাদের শব্দকোষের অধিকাংশই ছিল আরামাইক ভাষা থেকে ধার করা।

সিরিয়াক ভাষা হলো খ্রিস্টান আরমাইক এবং মূল আরমাইক থেকে আহৃত ও সংশ্লিষ্ট। এই সিরিয়াক ভাষা সিরিয়ার কথ্যভাষা যা চালু ছিল দ্বিতীয় থেকে দ্বাদশ শতাব্দি পর্যন্ত। অনেক চার্চের ভাষা ছিল সিরিয়াক, যেমন হিব্রু স্বর্গীয় ভাষার মর্যাদা পেয়েছিল। কোনো কোনো পূর্বাঞ্চলীয় খ্রিস্টান চার্চে পুরোহিতদের ভাষা হিসাবে এখনো টিকে আছে আরমাইক ভাষা। আনুমানিক খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতাব্দির মধ্য থেকে গ্রিক, ল্যাটিন ও সিরিয়াক ভাষা থেকে অনেক ধর্ম পুস্তক, দর্শন পুস্তক, চিকিৎসাবিদ্যা পুস্তক ও বিজ্ঞান পুস্তক ভাষান্তর হয়েছে এবং এই ভাষান্তরিত পুস্তক থেকে প্রাথমিক মুসলিম যুগে আরবিতে রূপান্তর হয়ে মুসলিম বিশ্বে জ্ঞানের বর্তিকা প্রজ্বলিত করেছে।

১.৮ নাবাতিয়েন

বিতর্কিত হলেও প্রথাগতভাবে ধরা হয় যে ইসমাইলের প্রথম সন্তান নাবাজোথ তার বংশধর রেখে গেছেন নাবাতিয়ানদের মধ্যে। আদিপুস্তক ২৫ঃ১৩তে বলছে, আপনি আপন নাম ও গোষ্ঠী অনুসারে ইশ্মায়েলের সন্তানদের নাম এই। ইশ্মায়েলের জ্যেষ্ঠ পুত্র নাবাযোৎ পরে কেদার...। সেমেটিকদের মধ্যে নাবাতিয়েনরা উল্লেখযোগ্য। খ্রিঃপূর্ব ৫ম অব্দের পূর্বে কোনো এক সময়ে এরা আরবের পেট্রাতে বসবাস শুরু করে, সিনাই অঞ্চলে। সিনাই হচ্ছে ওল্ড টেস্টামেন্ট মতে এডোমাইটদের বাসস্থান, আর নিউ টেস্টামেন্ট মতে ইদুমিয়েনদের। এই সিনাই-এ প্রচুর তামা পাওয়া যায়। সিনাই থেকে ক্যারাভান পথে মিশর, প্যালেস্টাইন, সিরিয়া ও মেসোপটেমিয়া সহজেই যাওয়া চলে এবং শতাব্দিকাল ধরে মশলা, ধূপ ও রুপোর ব্যবসা করে অর্থনৈতিকভাবে এটা সমৃদ্ধশালী অঞ্চল ছিল। খ্রিঃপূঃ ৩১২ অব্দে আলেকজান্ডারের উত্তরসূরি প্রথম এন্টিগোনাস নাবিতিয়ানদের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে দখলের চেষ্টা করেন। কিন্তু পেরে ওঠেননি। নাবিতিয়ানদের সমুদ্রবন্দর ছিল আইলা (বাইবেলে এলাম; এখন আকাবা) এবং উল্লেখ্যযোগ্য বাণিজ্য শহর ছিল রসট্রা (বসরা), যেখানে বণিক মোহাম্মদের সাথে সাধু বাহিরার সাক্ষাৎ হয়। এই সাধু বাহিরা, প্রচলিত আছে, তার মিশনের ভবিষ্যদ্বাণী করেন।

নাবাতিয়ানের রাজধানী ছিল সেলা (Sela) (Rock of Edom) লাটিনে বলা হতো পেট্রা। জন বার্গেন (মৃ. ১৮৮২) এই পেট্রা শহরকে প্রায়ই উল্লেখ করে বলতেন A red rose city, half as old as time. পেট্রার বর্তমান ধ্বংসাবশেষে পাওয়া গেছে একটা বিশাল থিয়েটার মঞ্চ, আর এক মন্দির যার বেদী অর্ধচন্দ্রাকৃতি।

ইতিহাসে নাবাতিয়েনদের প্রতিভাধর বলা হতো। তাদের রাজ্য দামেস্ক থেকে হিজাজ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং হিজর, তাইমা, এল-ওলা, দুমা এবং দেদানের মতো স্থানগুলো ২৫ খ্রিঃপূর্বাব্দ পর্যন্ত তাদের অধিকারে ছিল। যে স্থান তারা শাসন করেছে

www.pathagar.com

সেখানেই তারা হেলেনিস্টিক (গ্রিক) সংস্কৃতির নিদর্শন রেখে গেছে যার ধ্বংসাবশেষ এখনও পর্যন্ত দেখা যায়। বহু স্থানে, যেমন নেগেভ। তারা সেচকর্মে যে টেকনিক ও দক্ষতা দেখিয়েছে তা আধুনিক ইঞ্জিনিয়ারদের তাক লাগিয়ে দেয়।

নামকরা শাসকদের মধ্যে ছিলেন চতুর্থ এরটাস (মৃ. ৪০ খ্রিঃ)। এ সময় দামেস্কর গভর্নর সেন্ট পলকে বন্দি করেন (২ করিস্থ. ১১ঃ৩১)। আর দ্বিতীয় রাব্বাল (Rabbal) (মৃ. ১০৬ খ্রিঃ) রোমান সম্রাট টাইটাসকে পেট্রা থেকে প্রসিদ্ধ আরাবিয়ান ধনুর্ধর পাঠিয়েছিলেন জেরুজালেম অধিকার করতে।

নাবিতিয়ানরা দৈনন্দিন কথাবার্তা আদান-প্রদানে আরবি বলত, এর জন্য আরামাইক বর্ণমালা থেকে মাত্র বাইশটা অক্ষর উদ্ভাবন করেছিল, যে অক্ষরগুলো আরবি লিখন পদ্ধতির উৎস হিসাবে কাজ করেছে।

নাবিতিয়ানরা প্রতিবেশী রাষ্ট্রের বা দেশের দেব-দেবীদের পূজা-অর্চনা করত, এদের মধ্যে ছিল সিরিয়ান গড হাদাদ; এল, আল অথবা আল্লাহ্; হুবাল; দেবী আল-লাত, উজ্জা ও মানাত; কাইস (Kayis) আজিজ, নসর, ওয়াদ সোয়া ধু-ঘাবত, He of the thicket; ধু-শারা He of the highlands'—একে পূজা করত কালো পাথরের (Black stone) আকারে; শাই আল কায়ুম; আরা, বালশামিম এবং রাহামানকে রহিমের সাথে শ্রদ্ধা করত।

এই সব দেব-দেবীদের মধ্যে কতকগুলো ধীরে ধীরে খ্রিস্টিয়ানিটি প্রবর্তনের সাথে রূপান্তরিত হলো। খ্রিস্টানদের দেব-দেবী রূপে চার্চ ঐতিহাসিক এপিফানিয়াস (মৃ. ৪০৩ খ্রিঃ) লিখেছেন যে, পেট্রাতে তারা মেরি মাতার জন্য আরবিতে বন্দনা-গীতি গাইতে শুরু করল। কুমারী মেরি মাতাকে আরবি নাম দিল ছাবোস (Chhabos)। আরবিতে কুমারীকে কাব বলা হয় এবং তার পুত্রকে নাম দিল দুসারেস (ধুসারা) অর্থাৎ একমাত্র পুত্র।

১০৬ খ্রিস্টাব্দে পোপের দূত (legate) কর্নেলিয়াস পালমা রোমে সম্রাট ট্রোজান-এর প্রতিনিধি রূপে সিরিয়াতে এসে নাবাতিয়াকে রোমের রাজ্যভুক্ত করেন। এর সাথেই নাবিতিয়েন রাজ্যের ইতি ঘটে। তখন থেকে আরবীয়াতে নাবেতিয়া রোমের একটি প্রদেশ বলে গণ্য হলো। রাজধানী হলো বসট্রন। এই রাজ্যের পতনের পর তিন শতাব্দি ধরে নাবিতিয়ান বর্ণ-লিপি আরবি ভাষাভাষীদের মধ্যে চলতে থাকলো।

১.৯ গ্রিক

প্রাচীন সাহিত্যে আরবদের নাম ঘনঘন উল্লেখিত হয়েছে। অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি মনে করেন হেমারের কাব্যে আরিময় ও এরেমবয় আরমানিয়ান ও আরবদের নির্দেশ করে।

ক্ষুদ্র কবিতা ও মুদ্রার সপ্রমাণে বোঝায় যে, প্রায় ৩৫০ খ্রিঃপূর্বাব্দে গ্রিক সংস্কৃতি সাবা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল এবং দক্ষিণ আরবেও এর প্রভাব যে পড়েছিল সে প্রমাণও পাওয়া যায়।

প্রায় ৩২৫ খ্রিঃপূর্বাব্দে মহামতি আলেকজান্ডার তার নৌ সেনাপতি নিয়ারকাসকে সিন্ধু ও পারস্য উপসাগরে পাঠিয়েছিলেন। নিয়ারকাস আধুনিক বসরার কাছে চ্যারাক্স (Charax) বন্দর নির্মাণ করে, অবশ্য এখন তার কোনো চিহ্ন নেই। আলেকজান্ডারের

www.pathagar.com

অন্য এক নৌসেনাপতি এনাক্সিরেটস (Anaxicrates) এরিথ্রিয়েন সাগর পর্যন্ত (আরাবিয়ান সাগর ও লোহিত সাগর) নৌযাত্রা করেন, এই যাত্রা করেছিলেন বাবেল মান্ডেবের মধ্য দিয়ে। বলা হয় যে, আলেকজান্ডার দক্ষিণ আরাবিয়া অভিযান করার প্ল্যান করেছিলেন এবং তার গুপ্তচর বাহিনীর ঐসব অঞ্চল ও বন্দরের অবস্থান অজানা ছিল না।

৩২৩ খ্রিঃপূর্বাব্দে আলেকজান্ডারের মৃত্যুর পর তার সাম্রাজ্য তার দুই সেনাপতির মধ্যে টলেমি ও সেলুকাস ভাগ-বন্টন করে দেয়া হয়। মিশর থেকে মধ্যপ্রাচ্য হয়ে সেন্ট্রাল এশিয়া পর্যন্ত টেলেমিরা (৩২৩-৩০ খ্রিঃপূঃ) এবং সেলুসিডরা (৩২৩-৬৪ খ্রিঃপূঃ) যে গ্রিসিয়ান সভ্যতা প্রচলন করেন তা হেলেনিস্টিক সভ্যতা বলে পরিচিত এবং এই সভ্যতা গ্রিসের হেলেনিক বা অ্যাট্রিক সভ্যতা থেকে ভিন্ন ছিল।

গ্রিকদের সাধারণ ফরম (কয়েন গ্রিক) পশ্চিম এশিয়া ও পূর্ব ভূমধ্যঅঞ্চলে আন্তর্জাতিক ভাষা রূপে গণ্য হয় এবং এর ফলে এই অঞ্চলে, আরব দেশসহ গ্রিক বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের অনেক মুদ্রা ব্যবহৃত হয়েছে বহু শতাব্দি ধরে। প্রথম টলেমি সতার (Soter) মৃত ২৮৩ খ্রিঃপূঃ মিশরের অধিকর্তা ছিলেন এবং তার রাজধানী ছিল আলেক্সান্দ্রিয়া এবং তার উত্তরসূরি টলেমিরা মিশর শাসন করেছে তিনশো বছর ধরে। এই সময়ের মধ্যে তারা আরবীয় শাসকদের সাথে নিকট সম্পর্ক বজায় রাখে এবং বাণিজ্য পথ উন্মুক্ত রেখে ইথরেবের (মদিনা) মধ্য দিয়ে দক্ষিণ আরব পর্যন্ত সুগন্ধি দ্রব্যের লাভজনক কারবার চালিয়ে যায়। প্রথম টলেমির রাজত্বকালে গ্রিক উদ্ভিদবিদ থিওফারসটাস আরবের সুগন্ধি গুল্মের বিস্তারিত বর্ণনা দিয়ে পুস্তক রচনা করেন, যে পুস্তকে আলেক্সান্ডারের নিজস্ব উদ্ভিদবিদদের সংগৃহীত তথ্যাদি সংযোজিত হয়েছিল।

দ্বিতীয় টলেমি ফিলাডেলফিয়াস আলেক্সান্দ্রিয়ায় জাদুঘর ও পুস্তকাগার প্রতিষ্ঠা করেন এবং তা হাজার হাজার শতেক পাণ্ডুলিপির দ্বারা পরিপূর্ণ করেন। এই বিশাল লাইব্রেরি পরে মুসলমানদের অধিকারে আসে। ২৬৫ খ্রিঃপূর্বাব্দে তিনি লোহিত সাগরে একটি নৌ অভিযান চালান ইথরেবের সমুদ্র বন্দরে ইয়েনরো কোস্টের (Coast) ওপর বেস নির্মাণ করার জন্য। এরই সূত্র ধরে দেদানের লিহিয়ানাইটসদের সাথে একটি বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদিত হয়। তিনি মিশরের থিবসের নিকটবর্তী কপটোস থেকে লোহিত সাগরের তীরে বেরেনিক বন্দর পর্যন্ত বিস্তৃত পথ পুনরুদ্ধার করেন। কপটোস স্ট্রাবোর মতে, আরব ও মিশরীয়দের মধ্যে একটা সাধারণ শহরে পরিণত হয়েছিল।

খ্রিঃপূঃ ১৯০ অব্দে আলেক্সান্দ্রিয়ার লাইব্রেরিয়ান ইরাটসথেনস্ আরব পেনিনসুলার বহিরাংশের গঠন, স্থলপথের বাণিজ্য পথগুলো এবং প্রধান গোত্রদের অবস্থান ও তাদের চলাফেরার সব খবরাখবর রাখতেন।

খ্রিঃপূর্ব ১৪০ অব্দে অষ্টম টলেমি ইউয়ারগেটস (Euergetes) সাইজিকাসের গ্রিক নেভিগেটর ইউডোকসাসের অধীন পিলর অব হারকিউলাস (জিব্রালটার প্রণালীর) মধ্য দিয়ে মিশর থেকে এক অভিযান প্রেরণ করেন এবং তারপর আফ্রিকার উপকূল ধরে ভারতের সাগর পথ খোঁজার চেষ্টা করেন। প্রথম যাত্রায় তিনি আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলে পৌঁছান এবং যাত্রা করার প্রমাণস্বরূপ সেখানকার কিছু আদিবাসী ও দ্রব্যাদি নিয়ে ফিরে আসেন। তিনি আরো একটি অভিযানের চেষ্টা করেন কিন্তু সফল হননি।

খ্রিঃপূঃ ১১৬ অব্দে একাদশ টলেমি ল্যাথিরোসের রাজত্বকালে ঐতিহাসিক ও

www.pathagar.com

বৈয়াকরণ আগাথারচাইডস লোহিত সাগরের একটি বিবরণ রেখে যান। দক্ষিণ আরবের লোকজন ও প্রাণীকুলেরও একটি বর্ণনা তিনি দিয়েছিলেন।

৩০ খ্রিঃপূর্বাব্দে ক্লিওপেট্রার মৃত্যুর সাথে টলেমি রাজ্য রোমানরা দখল করে নেয়।

প্রথম সেলুকাসের অন্য একটা নাম ছিল নিকাটর (Nicator)–মৃত ২৮০ খ্রিঃপূর্বাব্দে। আলেক্সকজন্ডারের এশিয়ায় বিজিত রাজ্যগুলো এর ভাগে পড়ে। তিনি সিরিয়া রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন ২৮০ খ্রিঃপূর্বাব্দে। এন্টিয়কে স্থাপন করেন একটি সামরিক ঘাঁটি এবং টাইগ্রিস নদীর তীরে সেলুসিয়া নগরী। এন্টিয়কওরনটেস এখন বর্তমানে বাগদাদ নগরী। এই বাগদাদ তখন গ্রিক সভ্যতার কেন্দ্রভূমি ছিল। সেলুকাসের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল সিরিয়া, প্যালেসটাইন, এশিয়া মাইনর, ব্যাবিলন, পারস্য, বেকটেরিয়া, মেডিয়া ও পার্থিয়া।

প্রায় ২৫০ খ্রিঃপূর্বাব্দে পার্থিয়ানরা সেলুসিড দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে পার্থিয়েন সাম্রাজ্য স্থাপন করে। এই রাজ্য আস্তে আস্তে সেলুসিড সাম্রাজ্যের অধিকাংশ গ্রাস করে শুধু সিরিয়া, প্যালেসটাইনের অংশ এবং কিছু ক্ষুদ্র গ্রাম ছাড়া।

৬৪ খ্রিঃপূর্বাব্দে রোমানরা পম্পির নেতৃত্বে ত্রয়োদশ এন্টিওকাস এশিয়াটিকাসকে পরাজিত করে সিরিয়া রোমান সাম্রাজ্যভুক্ত করে এবং পারস্য উপসাগরের গেরহা পর্যন্ত তাদের প্রভাব বিস্তার করে। এন্টিওকাস এশিয়াটিকাস সেলুসিডের শেষ সম্রাট।

পরে যেসব শহর ইসলামের প্রসিদ্ধ কেন্দ্রভূমি ছিল, যেমন দামেস্ক (পৃথিবীর একটি অতি প্রাচীন শহর যার কথা ওল্ড টেস্টামেন্ট উল্লেখ আছে। আদিপুস্তক ১৪ঃ১৫) আলেক্সান্দ্রিয়া, পালমিরা, মসুল, এমেসা (Homs) নিসিবিস, কারচেমিশ, এডেসা এন্টিয়ক, এলেপ্পো ও অন্যান্যের মধ্যে হিট্রাইটস এসিরিয়ান, মিশরীয় মিত্তান্নি আর্মেনিয়ান, পার্সিয়ান, গ্রিক (টেলেমি ও সেলুসিড) এবং রোমানদের সাথে ঐতিহাসিক যোগসূত্র ছিল।

খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দিতে আরবরা যখন তাদের বিজয় অভিযান শুরু করে তখন মিশর, প্যালেস্টাইন, সিরিয়া সম্পূর্ণরূপে গ্রিক সভ্যতায় ডুবে ছিল এবং প্রায় হাজার বছর ধরে এর প্রভাব মুক্ত হতে পারেনি। মেসোপটেমিয়া পুরোপুরি না হলেও গ্রিক সভ্যতা থেকে মুক্ত ছিল না।

খ্রিস্টানিটির শুরু থেকে এই শহরগুলোর অনেকই খ্রিস্টিয়ানইজড হয়েছিল বিশেষ করে দামেস্ক, নিসিবিস ও এন্টিওক। এই শহরগুলো ধর্মীয় ও সাধারণ শিক্ষার কেন্দ্রভূমি ছিল। ইসলামের অধীনে আসার ছয় শতাব্দি পূর্ব পর্যন্ত এই শহরগুলোর অধিবাসীরা খ্রিস্ট ধর্মে দীক্ষিত ছিল।

মেসোপটেমিয়ার ট্রাডিশনাল সুসমাচার প্রচারক সাধু আদ্দাই (Addai) রাজা পঞ্চম আবজারের সময় এডেসা চার্চ প্রতিষ্ঠা করেন। এটাই সর্বপ্রথম চার্চ ছিল এই অঞ্চলে। সিরিয়া ও প্যালেস্টাইনের অধিকাংশ অঞ্চল খ্রিস্টান বাইজানটাইন সম্রাটের অধীনে এসেছিল।

হেলেনিস্টিক সভ্যতার সংস্পর্শে ইসলামের শুধু বহিরাঙ্গ নয় ইসলামিক চিন্তাধারাকেও উন্নত করে। বানার্ড লুই বলেছেন হেলেনিস্টিক প্রভাব এত মহান ছিল যে, গ্রিক ও ল্যাটিন খ্রিস্টীয় রাজ্যের পর ইসলাম তৃতীয় জাতি হিসাবে হেলেনিস্টিক

www.pathagar.com

লিগ্যাসির ধারক ছিল। কোনো কোনো মুসলিম পণ্ডিত মনে করেন যে ক্রুসেড বা মঙ্গল আক্রমণ ইসলাম ধর্মের ওপর যতটা না সামরিক প্রভাব ফেলতে পেরেছে, হেলেনিস্টিক চিন্তাধারা ইসলামের গভীরে পৌঁছে সুদূরপ্রসারী অবদান রেখে গেছে।

১.১০ রোমান

রোমানরা ধীরে ধীরে তাদের সাম্রাজ্যের অন্তর্গত মধ্যপ্রাচ্যে শক্তি বাড়াতে লাগালা। তারা হেলেনাইজড বিশ্বে বিশেষ করে সেলুসিডে তাদের জয়ের ধারা অব্যাহত রেখে সিরিয়া ও আশপাশ এলাকা গ্রাস করল। তখন ৬৫ খ্রিঃপূঃ। কেবলমাত্র পার্থিয়ানরা বাধা হয়ে দাঁড়ায়। ৫৩ খ্রিঃপূর্বাব্দে উত্তর মেসোপটেমিয়ার বারহার (হারবান) যুদ্ধক্ষেত্রে রোমান কনসাল ক্রাশাস সম্পূর্ণরূপে পার্থিয়েনদের হাতে বিধ্বস্ত ও নিহত হন। রোমান সাম্রাজ্যের ইতিহাসে এ ধরনের পরাজয় আর হয়নি।

রোমানদের ভাগ্য অতি শীঘ্র ফিরে আসে এবং তারা সিরিয়া মরুভূমির আরবদের পার্থিয়া ও রোমানদের মাঝে নিরপেক্ষ জাতি হিসাবে পেয়ে খুশি হয়। তাছাড়া পশ্চিম দিকে মিশরের ক্লিওপেট্রার মৃত্যুর পর ৩০ খ্রিঃপূর্বাব্দে টলেমি সাম্রাজ্যের ওপর আধিপত্য বিস্তার করে।

প্রায় ২৪ খ্রিঃপূর্বাব্দে, অগাস্টাসের রাজত্বকালে মিশরের রোমান প্রিফেক্ট অলিয়াস গ্যালাস এক রোমান সেনাবাহিনী নিয়ে লোহিত সাগরের উত্তর তীর ধরে দক্ষিণে মারিব ও সানা পর্যন্ত চলে যান। ভূগোলবিদ স্ট্যারো এই অভিযানের সঙ্গী ছিলেন এবং এর এক বিস্তৃত বর্ণনা রেখে যান। রোমানদের নাবাতিয়ান গাইডের অজ্ঞতার কারণে ভুল পথ অতিক্রম করে নাজরেনের বর্ডারে পৌঁছতে ছয় মাস লেগে যায়। এক ধাক্কায় নাজরেন শহরের পতন হয় এবং অলিয়াস গ্যালাস সাবাতে চলে যান। তখন সেখানে শাসক ছিলেন ইলাসারাস। কিন্তু মাত্র দু'দিন যাত্রার পর আলিয়াস গ্যালাস সৈন্যদলে পানির অভাবে অভিযান পরিত্যাগ করেন। আর এই কারণে তিনি তার গন্তব্যস্থল প্রসিদ্ধ মশলা নগরী হাদ্রামাতে পৌঁছাতে পারেননি। তিনি নাজরেনে ফিরে আসেন এবং খাইবার-হিজর হয়ে মিশরে ফিরে আসেন। এই ফিরতি যাত্রায় তার দুই মাস লেগে যায়। রোমান সৈন্যদলের অধিকাংশ তৃষ্ণা, দুর্ভিক্ষ ও রোগে শেষ হয়ে যায়, কিন্তু মাত্র সাতজন মারা যায় যুদ্ধে।

খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দির শেষ দিকে রোমানগণ তাদের বাণিজ্যক্ষেত্র লোহিত সাগর ও ভারত মহাসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত করেছিল। এডেন (গ্রিকদের কাছে আরাবিয়া আর রোমানদের কাছে আট্রানা বলে পরিচিত) তখন প্রসিদ্ধ বাণিজ্য কেন্দ্র এবং লোহিত সাগর, সোমালিয়া উপকূল ও পারস্য উপসাগরের মুখ-পথ এই বাণিজ্য কেন্দ্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

স্থানীয় প্রশাসক রোমানদের এই বাণিজ্য প্রচেষ্টায় বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলে ১৫ খ্রিঃপূর্বাব্দে রোমানরা এডেনের ওয়ারহাউস অধিকার করে এবং বন্দর ভাঙ্গতে শুরু করে। এতে স্থানীয় প্রশাসক রোমানদের সেখানে বাণিজ্যকুঠি গ্যারিসনসহ স্থাপন করতে অনুমতি দেয়। এডেনের পূর্ব ও পশ্চিম উপকূলীয় ওসোলিস ও কেন (Kene) বন্দরের প্রশাসকদের সাথেও রোমানরা বাণিজ্য সম্পর্ক গড়ে তোলে ।

www.pathagar.com

শতাব্দি ধরে গ্রিসীয় প্রদেশগুলোর ওপর রোমানদের শাসনামলে, গ্রিক নাবিক ও পণ্ডিতরা তাদের অন্বেষণ কর্ম চালিয়ে যাচ্ছিল এবং কিছু অবদানও রেখেছে নিজ নিজ ক্ষেত্রে। খ্রিস্টীয় ৫০ শতাব্দির দিকে হিপ্পালাস নামে এক গ্রিক নাবিকের মাধ্যমে মৌসুমী বায়ুর নিয়মিত গতিপথ বদলের কথা পশ্চিম বিশ্ব জানতে পারে। এই আবিষ্কারের কারণে নিরাপদে নৌপথে ভারতে আসার পথ সহজ হয়। এর ফলে পূর্বাঞ্চলে ভারতের সাথে আরব বিশ্বের, বিশেষ করে আর একচেটে বাণিজ্য চালিয়ে যাওয়ার পথ বন্ধ হয়ে যায়।

৮০ খ্রিস্টাব্দের দিকে একজন অজ্ঞাতনামা গ্রিক সমুদ্র জাহাজের ক্যাপ্টেন মিশরে বসবাস করছিলেন। তিনি 'Periplus of the Erythraean sea' (আরবসাগর প্রদক্ষিণ) নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রিক ভাষায় লিখিত এটি নাবিকদের গাইড বুক আরব সাগর সম্বন্ধে যেমন প্রধান বন্দর, নদীর মুখ-পথ ও তথ্যাদি, পোতাশ্রয়, বাণিজ্য ও বাণিজ্যদ্রব্য ইত্যাদির বিস্তারিত বিবরণ এতে আছে। এলিজস (El-Azd)কে বলা হয়েছে 'হাদ্রামতের কিং'।

গ্রিক জ্যোতির্বিদ আলেক্সান্দ্রিয়ার টলেমির (মৃত ১৬০ খ্রিঃ) কাছে আরাবিয়া সম্বন্ধে বেশ কয়েকজন গ্রিক লেখকের গ্রন্থ ছিল। তিনি সেই গ্রন্থগুলি থেকে এবং আরও অন্যান্য তথ্যাদি সংগ্রহ করে বিশেষ করে পাঁচ খণ্ডে প্রকাশিত প্রসিদ্ধ রচনা আরাবিকা এবং চার খণ্ডে রচিত আরাবিয়া আর্কলজি–তাঁর বিখ্যাত ভৌগোলিক গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থের সাথে বিভিন্ন দেশের সকল স্থানের নাম, অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশসহ একটা ক্যাটালগও ঐ গ্রন্থের অংশ হিসাবে সংযোজন করেন। এছাড়া তিনি আরব দেশের নাম ও অবস্থাসহ পৃথিবীর একটি ম্যাপও অঙ্কিত করে ঐ পুস্তকের পরিশিষ্ট হিসাবে জুড়ে দেন। এখানে বলে রাখা ভালো যে, 'আরাবিকা' গ্রন্থটি পাঁচ খণ্ডে রচনা করেছিলেন কোনো এক গ্রিক পণ্ডিত ইউরেনাস (মৃ. প্রায় ৫০ খ্রিঃ) আর আরাবিয়ান আর্কলজি চার খণ্ডে রচিত হয়েছিল আর এক গ্রিক পণ্ডিত গ্লাকাস কর্তৃক (মৃ. ৯০ খ্রিঃ) লিখিত গ্রন্থের সূত্র ধরে।

ইত্যবসরে রোমানরা তাদের পূর্বাঞ্চলের রাজ্যসীমা বিস্তার করে চলেছে। সম্রাট ট্রাজন (মৃত ১১৭ খ্রিঃ) পার্থিয়ানদের বিরুদ্ধে এক অভিযান পরিচালনা করে আর্মেনিয়া ও মেসোপটেমিয়ার কিছু অংশ দখল করে নেয়, যদিও তারা মাঝে মাঝে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে।

সম্রাট সেপ্টেমিয়াস সেভারাস (মৃ. ২১১)-এর সাথে সিরিয়ান আরব বংশের এক সম্রাটকে যৌথভাবে অভিষিক্ত করা হয়। সেপ্টিমিয়াস সেভেরাস ছিলেন আফ্রিকান, জন্মেছিলেন লেপ্টিস শহরে (লিবিয়ার টিপোলিটানিয়া ফোনিশিয়ান শহর) এবং ইবোরেকাম-এ (ইংল্যান্ডের ইয়র্ক শহর) মারা যান। তিনি একটি সিরিয়ান রমণী জুলিয়া ডোমনাকে বিবাহ করেন। জুলিয়া এমেসার আরব পুরোহিত রাজার কন্যা। তাদের নিষ্ঠুর ও লম্পট পুত্র সারাকালা (মৃ. ২১৭ খ্রিঃ) এডেসাতেই রাজনৈতিক হত্যাযজ্ঞের শিকার হন।

সারাকালার মৃত্যুর পর তাঁর ভাতিজা হেলিওগাবালাস রাজা হন। তিনি সিরিয়াতে জন্মগ্রহণ করেন। সেপ্টিথিনাস সার্বাস ও জুলিয়া ডোমনা তার দাদা-দাদি ছিলেন গ্রান্ডসন নয়, গ্রান্ডনেফিউ। হেলিওগাবালাস এমেসাতে যে ফোনিশিয়ান দেবতা এলোগবালোর পূজা হতো, সে পূজার প্রচলন রোমেও প্রবর্তন করতে চান। এই

www.pathagar.com

দেবতার নামের সাথে মিল রেখে তার নাম হেলিওগাবাস হয়েছিল। দেবতা এলোগাবালোর প্রতীক ছিল কলার মোচার মতো (Conical) একখণ্ড কালো কর্কশ পাথর– শিবলিঙ্গের মতো। লাম্পট্যের কারণে প্রিটোরিয়ান গার্ডদের দ্বারা খুন হয়ে যান। তার মৃত্যুর পর কাজিন পালক পুত্র আলেক্সান্ডার সেভেরাস (Severus) রাজা হন। মারা যান ২৩৫ খ্রিস্টাব্দ। ইনি সিরিয়া আরব লাইনের শেষ রোম সম্রাট।

২৪৪ থেকে ২৪৯ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে মার্কাস জুলিয়াস ফিলিপাস রোমের সম্রাট ছিলেন। তিনি জন্মগতভাবে আরবের অধিবাসী– তাই তিনি 'আরবের ফিলিপ' বলে পরিচিত ছিলেন। খ্রিঃ ২৪৮-এর এপ্রিল মাসে রোমের হাজার বর্ষ পূর্তি উৎসব পালন করেন। তিনি পারস্যের সাথে সন্ধি করেন কিন্তু তিনি ও তার পুত্র উভয়েই খ্রিস্ট ধর্ম বিরোধী ডেসিয়াসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নিহত হন। ডোসিয়াস রোমের সম্রাট হন। চার্চ লেখকদের দ্বারা ফিলিপাস রোমের সর্বপ্রথম খ্রিস্টান সম্রাট বলে সম্মান লাভ করেন।

প্রায় এই সময়ের মধ্যে সাসানিয়ান পার্সিয়ানরা রোমানদের মধ্যপ্রাচ্যে প্রধান শত্রুরূপে আবির্ভূত হয়। খ্রিস্টীয় ২৬৫ অব্দে পালমিরার আরব নেতা ওদাইনা (Odenathus) সাসানি সম্রাট প্রথম শাহপুরকে পরাজিত করে তার রাজধানী স্টেসিফোন (Ctesiphon) পর্যন্ত তাড়িয়ে নিয়ে যান। পুরস্কার স্বরূপ রোম সম্রাট গ্যালিনাস রোম রাজ্যের পূর্বাঞ্চলে তাকে সর্বাধিনায়ক রূপে অধিষ্ঠিত করেন। ঐ অঞ্চলে তার স্ত্রী জেনোবিয়া (Zenobia) রাজত্ব করতেন। তিনি তার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করার জন্য স্বাধীন সাম্রাজ্য স্থাপনের চেষ্টা করেন কিন্তু ২৭২ খ্রিস্টাব্দে রোম সম্রাট অরেলিয়ান (Aurelian) তাকে আক্রমণ করে পরাস্ত করেন। জেনোবিয়া বন্দি হয়ে রোমে যান। তাকে সম্রাট তার রথের পেছনে রেখে বিজয়যাত্রা (Triumph) প্রদক্ষিণ করেন রোমের রাজপথে। তার পর তিনি বন্দি জীবনযাপন করেন। তার স্বামী ওদাইনা মধ্যপ্রাচ্যে স্ত্রীর স্থলাভিষিক্ত হন। এটাই তার পুরস্কার।

১.১১ সাসানিয়ান

২২৬ খ্রিস্টাব্দে সাসান নামে জোরাস্ত্রীয় পুরোহিতের দৌহিত্র আর্দেসির (Ardashir) একদল পারস্য উচ্চবংশীয় যুবককে নেতৃত্ব দিয়ে পার্থিয়েন শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তাদের পরাজিত করেন এবং পারস্যে সাসানিয়া বংশের গোড়াপত্তন করেন। জোরাস্ত্রীয় উত্তরসূরিদের এই বংশের ধারা আকামেনিয়ান ও পার্থিয়েনদের সূত্র টেনে অনেক দূর প্রবাহিত হয়েছিল।

সাসানিয়ানরা ইরানের সমতল ভূমিতে তাদের রাজধানী স্থাপন করেনি, করেছিল টাইগ্রিস নদীর তীরে স্টেসিফোনে (Ctesiphon)। পূর্বে এই স্টেসিফোন হেলেনিস্টিক সেলুসীয় স্থাপনায় পার্থিয়েনদের সামরিক ঘাঁটি ছিল। সেলুসিয়া ও স্টেসিফোন এই দুই শহর মিলে মাদায়েন রূপে পরিচিত হয় যার অর্থ নগরী।

সাসানিয়ানদের লিখিত ভাষা ছিল পহলেভী (মধ্যপারস্য) এবং ধর্ম ছিল জোরাস্ত্রীয়। এই ধর্মের অনুসারীদের সাধারণত ম্যাগি বলা হতো, কোরানের ভাষায় মাজুস (২২ঃ১৭)। প্রাথমিক ইসলামী যুগে এরা হানিফ শ্রেণীভুক্ত ছিল কারণ এরা পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করেছিল।

www.pathagar.com

প্রাচীনকাল থেকে আরবে জোরাস্ত্রীয় কওম বসবাস শুরু করে। প্রাচীন আরবি পুস্তকে এই গোত্রের অগ্নি মন্দিরের উল্লেখ পাওয়া যায়, তাদের মধ্যে একটি ছিল মুজদালিফায় যেখানে হজের সময় হাজীরা আশ্রয় নেয়। কাবার জমজম কূপ প্রাথমিক জোরাস্ত্রীয়দের কাছেও পবিত্র বস্তু ছিল। কাবাঘরের কালো পাথরকে স্মারক দ্রব্য রূপে তারা ছেড়ে যায় বলে কথিত। জোরাস্ত্রীয় দেবদূত ও দানব কাহিনী ইহুদি, খ্রিস্টান ও ইসলাম ধর্মকে প্রভাবিত করেছে।

শতাব্দি ধরে সাসানিয়ানরা রোমানদের পথের কাঁটা স্বরূপ ছিল। রোম সাম্রাজ্য বিভাজিত হওয়ার পর (৩৯৫ খ্রিঃ) মধ্যপ্রাচ্যে এরা বাইজানটাইনদের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ও জাতশত্রু। সাসানিয়ানরা যখন ক্ষমতার তুঙ্গে তখন তাদের রাজ্য বিস্তৃত ছিল ইরান থেকে মধ্য এশিয়া হয়ে মেসোপটেমিয়ার নিম্নভূমি পর্যন্ত। আরব গোত্রের রাজাদের মধ্যে হিরা ছিল সাসানিয়ানদের প্রধান মিত্র রাজ্য এবং এই রাজ্যের মধ্য দিয়ে তারা দক্ষিণ-পশ্চিম আরব পর্যন্ত তাদের কর্তৃত্ব ছড়িয়ে দিয়েছিল। ষষ্ঠ শতাব্দির (খ্রিঃ) মধ্যে মদিনার ওপর সাসানীয় সম্রাট তার নিয়ন্ত্রণ কায়েম করেছিলেন এবং সেখানে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা ও কর সংগ্রহের জন্য একজন প্রশাসকও নিযুক্ত করেছিলেন।

ইরানে সাসানিয়া বংশ এবং বাইজানটিয়ামের মধ্যে যে দীর্ঘ দ্বন্দ্ব ও বিরোধিতা ছিল তার সমাপ্তি ঘটে ৬২৭ খ্রিস্টাব্দে যখন সাসানিয়া সম্রাট খসরু দ্বিতীয় পারভেজ নিনেভে পরাজিত হন। খসরু যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পালান। কিন্তু আপন সৈন্যদের হাতে নিহত হন। তার পুত্র দ্বিতীয় কোবাদ সিংহাসনে আরোহণ করে সন্ধির প্রস্তাব করেন। পার্সিয়ানদের এই পরাজয়ের কারণে আরব সাম্রাজ্য বিস্তারের পথ প্রশস্ত হয়। সাসানীয় শেষ সম্রাট তৃতীয় ইয়াজদেগার্ড মুসলিম বাহিনীর দ্বারা ইউফ্রেটিস নদীর তীরে ৬৩৬ সালে কাদিসিয়ার যুদ্ধে এবং ৬৪১ সালে মিদিয়ায় নিহাবন্দের যুদ্ধে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হন। এর সাথেই মধ্যপ্রাচ্যে ইরানি প্রভুত্ব শেষ হয়।

১.১২ বাইজানটিয়াম

খ্রিস্টপূর্ব ৬৬৭ অব্দে গ্রিসের মেগারা থেকে কিছু উপনিবেশ স্থাপনকারী বাইজানের (By zan or By zas) নেতৃত্বে এশিয়া মাইনরের উত্তর-পূর্বে একটি ছোট স্থাপনা গড়ে তোলে। এই বাইজানের নাম থেকে ঐ স্থানের নাম হয় বাইজানটিয়াম। এক হাজার বছর পরে রোমান সম্রাট মহামতি কনস্ট্যানটাইন এই স্থানটিকে গুরুত্বপূর্ণ চিন্তা করে (কারণ এখানকার সপ্ত-পর্বত থেকে ইউরোপ ও এশিয়ার প্রবেশপথ নিয়ন্ত্রণ করা যায়) ৩২৮ খ্রিস্টাব্দে কনস্ট্যান্টিনোপল নগরীর ভিত্তি স্থাপন করেন। তিনি ৩১৩ খ্রিস্টাব্দে খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করেন এবং এই সাম্রাজ্যের ধর্মরূপে খ্রিস্টধর্ম গৃহীত হয়।

চতুর্থ শতাব্দির শেষ দিকে, রোমান রাজ্য দুই খণ্ডে ভাগ হয়ে যায়— রোমকে রাজধানী করে পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্য এবং কনস্ট্যান্টিনোপলকে রাজধানী করে পূর্ব রোমান সাম্রাজের উদয় হয়। সাধারণত রোম কনস্ট্যান্টিনোপলের বিরুদ্ধবাদী হয়ে ওঠে, কারণ ছিল অনেক, যেমন রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব, ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ে ঈর্ষা ও রেষারেষী এবং রোমের ল্যাটিন চার্চ ও কনস্ট্যান্টিনোপলের গ্রিক চার্চের ধর্ম বিধান নিয়ে মতপার্থক্য ইত্যাদি।

www.pathagar.com

জাস্টিনিয়নের সময় (রাজত্বকাল ৫২৭-৬৫ খ্রিঃ) বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল এশিয়া মাইনর, সিরিয়া, প্যালেস্টাইন, মিশর, উত্তর আফ্রিকা, মরক্কোর সীমান্ত, দক্ষিণ স্পেন, ইতালি (একাদশ শতাব্দি পর্যন্ত দক্ষিণ ইতালি বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের অংশ ছিল) এবং বল্কানস। স্থাপত্য শিল্পের অপূর্ব নিদর্শন বিশালাকার চার্চ সেন্ট সোফিয়া (হাগিয়া সোফিয়া-স্বর্গীয় জ্ঞান) জাস্টিনিয়নের নির্দেশে নির্মিত হয়। জাস্টিনিয়ন রোমান আইন গ্রন্থের রূপকার। এই রোমান আইন সারা ইউরোপে (কিছুটা মুসলিম সাম্রাজ্যেও) প্রভূত প্রভাব বিস্তার করেছিল।

মধ্যপ্রাচ্য মূলত বাইজানটাইন ও সাসানিয়ানদের মধ্যেই নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। বাইজনটাইনদের কর্তৃত্ব ছিল সিরিয়া, প্যালেস্টাইনও মেসোপটেমিয়ার উপরিভাগে। আনুমানিক পঞ্চম শতাব্দির মধ্যভাগ থেকে এই দুই পরাশক্তি তাদের রাজ্য সংলগ্ন আরবাঞ্চলগুলোকে বাগে আনবার জন্য লড়ালড়ি করত। এই কারণে দুই শক্তির মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বেড়েছিল যার ফলে ঘাসান রাজ্য বাইজানটাইনের অনুগত ছিল এবং হিরা ছিল সাসানিয়ানদের।

প্রত্যাশিতভাবে আরব দেশের ওপর আধিপত্যের কারণে এই দুই পরাশক্তির মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ বেধে যায় এবং তা প্রায় চলতে থাকে ৪৩০ খ্রিঃ থেকে ৬৩০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। এই দীর্ঘকালের বিরোধ শেষে ৬১৫ খ্রিস্টাব্দে তুঙ্গে পৌঁছে যখন সাসানিয়ান সম্রাট দ্বিতীয় খসরু বাইজানটিয়ান সম্রাট হেরাক্লিয়াসকে পরাজিত করে। পরে দুই শক্তির গুঁতোগুঁতির পর ৬২৫ খ্রিস্টাব্দে বাইজানটাইন সেনাবাহিনী সাসানিয়ানদের ওপর চড়াও হতে শুরু করে এবং ৬২৭ খ্রিস্টাব্দে বাইজানটাইন সম্রাট হেরাক্লিয়াস নিনেভে সাসানিয়ানদের ওপর চরম বিজয় লাভ করেন, সাসানিয়ান সম্রাট পরাজিত হন। এর কিছু পূর্বে ৩৩১ খ্রিঃ পূর্বাব্দে আরবেলাতে আলেক্সান্ডার তৃতীয় দারায়ুসকে পরাজিত করেছিলেন।

প্রফেট মোহাম্মদের প্রাথমিক প্রচারকালে এই ঘটনাগুলো ঘটেছিল। বাইজানটিয়ানদের প্রথম পরাজয় ও পরে বিজয়ের কাহিনী কোরানে উল্লেখ আছে (সূরা রুম) সাধারণত প্যাগন আরবরা সাসানিয়ানদের পক্ষে ছিল এবং প্রফেট মোহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা ছিল রোমানদের প্রতি।

বাইজানটাইন সাম্রাজ্য-কাঠামো থেকে বোঝা যায় যে মূলত এই রাজ্য বা সাম্রাজ্য পুরোপুরি হেলেস্টিক চিন্তাধারায় আবৃত ছিল, ফলে ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে ও তার পরেও মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহের সংস্কৃতি ছিল হেলেস্টিক প্রভাবিত। মুসলিম রাজত্বকালে বাইজানটাইন ছিল একমাত্র বিধর্মী শক্তি যার ওপর মুসলমানদের কিছুটা শ্রদ্ধাভক্তি ছিল। মুসলমানরা বাইজানটাইন সভ্যতার সৌকর্যে ছিল মুগ্ধ, তাদের প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা ব্যবস্থা, শিল্প ও স্থাপত্যে, বিজ্ঞান ও চিকিৎসাবিদ্যা, আইন ও প্রশাসনে যে বিস্ময়কর বিকাশ ঘটেছিল তা থেকে মুসলমানরা প্রভূত পরিমাণে সাহায্য গ্রহণ করতে কুণ্ঠা বোধ করেনি। ক্বচিৎ দু'একটি ক্ষেত্র ছিল যেখানে মুসলিম সংস্কৃতি এর প্রভাবমুক্ত ছিল বলা যেতে পারে।

www.pathagar.com

২

প্রাচীন আরব জাতি

কতকগুলো প্রাচীন গ্রন্থ হারিয়ে যাওয়া (Lost Arabs) আরব আধিবাসীদের কথা বলেছে– আরবিতে এদের বলা হতো আরব আল বাইদা। এরা মিশ্র হ্যামিটো সেমোটিক আদিম গোত্রের বংশধর। এদের মধ্যে কিছু গুহাবাসীও ছিল। এদের মধ্যে ছিল জাদিস (ক্ল্যাসিকেল লেখকরা এদের জোডিকটা বলত) আর ছিল উইবার (Wibar) জোবারিটা; এছাড়া ছিল তাসাম ও রাহম। এদের কথা প্রাচীন কবিরা তাদের কবিতায় উল্লেখ করেছে; আর ছিল রাআস, আদ ও ছামুদ, কোরানে এদের কথা উল্লেখ আছে (২৫ঃ৪১)। এই গোত্র সম্বন্ধে অতি অল্পই জানা গেছে। এখন তাদের কোনো চিহ্ন নেই, সম্ভবত তাদের নিশ্চিহ্ন করা হয়েছে কিংবা তারা আন্তঃবিবাহের (Inter marriage) কারণে আরবের অন্য গোত্রের সাথে মিশে গেছে।

ঐতিহাসিক যুগের আরবরা, ইহুদিদের মতো সেমেটিক জাতি নূহের পুত্র শেমের বংশধর। তারা দুটি প্রধান জাতিতে বিভক্ত কাহতান বা দক্ষিণ আরব বাইবেলের জোকতানের বংশধর এবং আদনান বা উত্তর আরব, ইব্রাহিম ও হ্যাগারের (হাজেরা) পুত্র ইসমাইলের বংশধর।

বিভিন্ন সময়ে আরবদের বেদুইন বা মরুবাসী বলা হয়েছে। তারা ভবঘুরে, উটের লোম দিয়ে তৈরি তাঁবুতে বাস করত (Houses of hair); স্কেনাইটস (গ্রিক ভাষায় তাঁবুবাসী) ইসমাইলটস ইসমাইলের বংশধর; হ্যাগারাইটস হ্যাগারের বংশধর এবং পরে স্যারাসেন বা মরুজাতি (desert folk)।

আরাবিয়ান পেনিনসুলার বাইরেও অনেক আরব গোত্র বাস করত। কিছু ছিল ভবঘুরে, ভেড়া-ছাগল চরিয়ে তাঁবুতে বাস করত। অন্যরা ছিল দল বেঁধে এক স্থানে, পরে যা শহরে পরিণত হয়েছে। এই শহরবাসীরা ব্যবসা-বাণিজ্য করে কালাতিপাত করত। অন্যান্য পার্শ্ববর্তী জাতির দ্বারা যদিও প্রভাবিত ছিল তবু নিজেদের একটা সংস্কৃতি গড়ে রক্ষণশীল জীবন ধারায় তাদের নিজস্ব ভুবন তৈরি করেছিল।

আরবদের বিভিন্ন দল বা গোত্র ছিল এবং প্রত্যেক গোত্রের আবার ক্ষুদ্র শাখা গোত্র বা ক্ল্যান থাকত। আরব সমাজ গোত্র বা ক্ল্যান দ্বন্দ্বে জর্জরিত ছিল এবং এই গোত্রে গোত্রে যুদ্ধ (গাজওয়া বা রাজিয়া) সাধারণ ব্যাপার বা ঘটনা ছিল। এছাড়া এক গোত্র আর এক গোত্রের তাঁবু বা ক্যাম্প ও বাণিজ্য ক্যারাভান আক্রমণ করে লুটপাট করে নিত। গোত্রীয় ট্র্যাডিশন প্রায় গোত্রীয় দ্বন্দ্বে চিহ্নিত ছিল এবং এ অবস্থা ইসলামের

www.pathagar.com

আবির্ভাবের শতাব্দি পূর্ব অবস্থা। যার পরবর্তী আরবীয় এমনকি ইসলাম আবির্ভাবের পরেও সমাজে ও জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

আরবে মানুষের নামের আগে যেমন ইবনে অর্থাৎ বাপের নাম জোড়া থাকত তেমনি গোত্রের আগে বানু শব্দটি লেগে থাকত। যেমন বানু কিন্দা অর্থাৎ কিন্দা গোত্র।

২.১ কাহ্তান আরব

আরবে কাহ্তান বংশ অতি প্রাচীন। ট্রাডিশন মতে এরা আব্রাহামের বংশধর নয়, কাহ্তানের। বাইবেলে বলা হতো নূহের বংশধর জোকতানের (আদিপুস্তক ১০ঃ২৫)। কাহ্তানদের মূল আরাবি-আরাবা-আল-আরিবা বা মুতারিবা বলা হয়।

কাহ্তানিরা মেসোপটেমিয়া থেকে দক্ষিণ আরবে উঠে আসে যাদের দক্ষিণ আরববাসী বলা হতো। এরা সাচ্চা সেমিটিক মূলধারা জাত এবং উত্তর আরবদের চেয়ে বর্ণে কালো। এই প্রজাতির আব্বাসিডিদের সুসময় পর্যন্ত (প্রায় ৮৫০ খ্রিঃ) আরব বংশধারায় নীতি বজায় ছিল এবং দক্ষিণ আরবের পরিবারভুক্ত বলে চিহ্নিত করা যেত।

বাইবেল বলে (আদিপুস্তক ১০ঃ৩০) যে জোকতান (কাহ্তান)-এর পুত্রেরা দক্ষিণ-পশ্চিমের মেশা (মেইন) এবং দক্ষিণ-পূর্বের সেফার (হিশিয়ার)-এর মধ্যেই বাস করত। সময়ের ব্যবধানে পরে তাদের বসতি লোহিত সাগরের তীরে ইয়েমেন থেকে ভারত মহাসাগরের ওমান পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল।

সাধারণভাবে তারা একটা ভাষা ব্যবহার করত যাকে হিমিয়ারাইট বলা হয়। এই ভাষা আক্কাদিয়ান ইথিওপিয়ান (আবিসিনিয়ান) এবং সার্বিয়েনের সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিল। এই লিপি দক্ষিণ আরাবিয়াতে উৎকীর্ণ পাওয়া যায়, যা উনবিংশ শতাব্দিতে ইয়োরোপিয়ান পণ্ডিতরা বোধগম্য ভাষায় রূপান্তর করছে। দক্ষিণ আরবের গোত্ররা সাধারণত চাষাবাদ করলেও শহরবাসী ছিল। তারা শস্য উৎপাদন ও গোধন পালন করে জীবিকা নির্বাহ করত। দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলের পর্বত শ্রেণী থেকে প্রচুর বৃষ্টিপাত হতো। যাতে চাষাবাদের বেশ ফলন ঘটতো। দক্ষিণ আরবের এই অর্থনৈতিক বৃদ্ধির কারণে রোমান লেখকরা এই অঞ্চলকে উর্বর আরব ভূমি-আরাবিয়া ফেলিক্স বলত।

প্রাচীন মিশরের সময় থেকে এ অঞ্চল মশলাপাতি ও সুগন্ধি দ্রব্যের জন্য বিখ্যাত ছিল। ঐতিহাসিক হেরোডোটাসও এ সম্বন্ধে বলে গেছেন। রোমানরাও এই অঞ্চলকে সুবাসিত অঞ্চল বলে অভিহিত করত।

শতাব্দি ধরে কাহ্তান অঞ্চল আন্তর্জাতিক ও দেশীয় ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য কেন্দ্রভূমি ও ট্রানজিট অঞ্চল ছিল। রোমান (সিরিয়ান) ঐতিহাসিক আম্পিয়ানাস মার্সেলিনাস (মৃত ৩৯০ খ্রিঃ)-এর মতে এই অঞ্চলের উপকূলে অনেক জাহাজের নোঙ্গর করার ব্যবস্থা ও পোতাশ্রয় ছিল। নিরাপত্তার দিক থেকে এসব নোঙ্গর স্থল ও পোতাশ্রয় খুব নিরাপদ ছিল। ব্যবসা-বাণিজ্যের সাথে মিশর, মেসোপটেমিয়া, পারস্য, ভারত ইত্যাদি দেশ জড়িত ছিল। অধুনা প্রকাশ পেয়েছে যে দক্ষিণ আরাবিয়ার সভ্যতার সাথে গ্রিক হেলেস্টিক ও রোমান বিশ্বের সাথে নিকট সম্পর্ক ছিল। ফিলবি (Philby) বলেন, প্রফেট মোহাম্মদের জন্মের দুই মিলিয়ান বর্ষ পূর্বে আরবের

www.pathagar.com

বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক সৌকর্য তুঙ্গে ছিল। শুরু থেকেই কাহ্তানিদের দক্ষিণ আরবে উচ্চ শ্রেণীর সংগঠিত আরব রাজ্য বিদ্যমান ছিল এবং গড়ে উঠেছিল। এসব রাজ্যের নাম বাইবেলে, মিশরীয়, মেসোপটেমীয় ও দক্ষিণ আরবীয় উৎকীর্ণ লিপিতে উল্লেখ আছে। এছাড়া রোমান ও গ্রিক দেশীয় বই-পুস্তকেও উল্লেখ আছে। কিন্তু ইসলাম-পূর্ব আরবের এই উৎকর্ষতার নিদর্শন ইসলাম আবির্ভাবের পর আর পাওয়া যায়নি।

প্রত্যেক নগর রাজ্য (City states) মুকাররিব (dignatary) দ্বারা শাসিত ছিল। এই শাসকরা একাধারে রাজা, বিচারক ও পুরোহিতের কাজ করত। এরা ছাড়া আরও আলাদা পুরোহিত ছিল যারা বিভিন্ন ধর্মস্থান ও মাজার (Shrines) তদারক করত। কোষাধ্যক্ষ (ট্রেজারার) পদ ছিল গুরুত্বপূর্ণ। এরা ব্যবসা-বাণিজ্য ও কর (Taxes) তদারক করত। আলোকিত কাজতান সমাজে নারীরা যথেষ্ট স্বাধীনতা ভোগ করতে পারত।

এই সব রাজ্যের রাজনৈতিক সম্পর্ক (একের সাথে অন্যের) পরিষ্কার ছিল না। তবে শতাব্দিকাল ধরে এই সব কাজের মধ্যে একচেটে বাণিজ্যাধিকার, বন্দর দখল ও ধর্মীয় কেন্দ্রের অধিকার নিয়ে দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষও হয়েছে। শাসক পরিবারের সদস্যদের মধ্যে বিবাহের প্রচলন ছিল; আর এক রাজ্য অন্য রাজ্যের স্থান অধিকার করলে রাজধানী ও সীমানার পরিবর্তন ঘটতো।

বর্তমানে প্রাপ্ত দলিল-দস্তাবেজ থেকে প্রাচীনকালের ইতিহাস রচনা করা সম্ভব নয়। তবে নিদর্শন পাওয়া যায় যে খ্রিঃপূর্ব দ্বাদশ শতাব্দি থেকে কাহতান গোত্রের সাংস্কৃতিক ধারা চলে এসেছে। প্রধান নগর রাজ্যের (City state) মধ্যে কয়েকটির নাম হলো :

মাইইন, বাইবেলে মেশা (আদি পুস্তক ১০ ঃ ৩০); ক্লাসিক্যাল লেখকদের মতে লোহিত সাগরের কাছে অবস্থিত মিনিয়া রাজ্য; উত্তরের প্রত্যন্ত অঞ্চল এই রাজ্য তার রাজধানী ছিল কর্ন (Karna) । সীমিত কালের জন্য এসব রাজ্যের মধ্যে রাজনৈতিক ঐক্যবন্ধন থাকলেও (খ্রিঃপূঃ ১২০০ থেকে ৭০০ পর্যন্ত) পরে তারা ক্ষমতার দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ে।

সাবা (বাইবেলে শেবা-আদিপুস্তক ১০ঃ২৮) তার বাণীর জন্য বিখ্যাত ছিল। এই রানী কিং সলেমনের রাজ্যে আমন্ত্রিত হন এবং দর্শন করেন, এ ঘটনার উল্লেখ হয়েছে খ্রিঃপূর্ব ১২০০ অব্দে। সাবা রাজ্য তার রাজত্ব বজায় রেখেছিল খ্রিঃপূর্ব ৭৫ পর্যন্ত। এর রাজধানী ছিল প্রথমে মারিক (গ্রিকদের মারিয়ারা) এবং পরে রাজধানী ছিল সানা (Sanaa); গুরুত্বপূর্ণ শহর ছিল সিরওয়া (Sirwa)। প্রায় ৬৫০ খ্রিঃপূর্বাব্দে সাবার এক যুবরাজ পুরানো সেচ ব্যবস্থার পরিবর্তে মিশরীয় ও ব্যাবিলনীয় ইঞ্জিনিয়ারদের সাহায্যে মারিবে এক বিশাল ড্যাম (dam) তৈরি করেন সেচকার্যের সুবিধার জন্য। এর স্লুইস গেট ও জলাধার ছিল আদানা (ডানা) নদীর গতিকে বর্ষা মৌসুমে নিয়ন্ত্রিত করার জন্য।

বংশানুক্রমে সাবিয়েন ও হিমিয়ারাইট শাসকরা এই damকে উন্নত করেন ও এর গতি বাড়িয়ে দেন সেচ কাজের জন্য। এটা আরবে কিংবদন্তি হয়ে আছে।

জোকতানের পুত্র থেকে ওফির (Ophir) নাম এসেছে (আদিপুস্তক ১০ঃ২৯)। যদিও আরবে বিশেষ করে ওফির নামে কোনো রাজ্য ছিল না। বাইবেলে এর উল্লেখ

www.pathagar.com

আছে এবং এখান থেকে কিং সলেমন সোনা ও মূল্যবান পাথর সংগ্রহ করতেন (১ কিং ১০ ঃ ১১)। ভারত, আফ্রিকা, পারস্য উপসাগর বিশেষ করে দক্ষিণ আরাবিয়ান স্থানসমূহের মধ্য থেকে এর অবস্থান চিহ্নিত করা হয়েছে। এদেশের বন্দরসমূহের মধ্য দিয়ে স্বর্ণ উৎপাদন বিভিন্ন দেশে পৌঁছানো যেত।

ওফির নামটা জোফার নামের সাথে জড়িত মনে করা হয় দক্ষিণ আরবের অনেকগুলো শহরের মধ্যে থেকে। যেমন, দোফর (বা জোফর বা শেফার) তাফার, তাফর, সাপ্পার, জাফির, শেফির ইত্যাদি। অনেকে মনে করেন শব্দগতভাবে এটা সেমেটিক শব্দ সেফারের সাথে সম্পর্কযুক্ত। তুলনীয় কিরজাত সেফার (Kirgath Sepher), পুস্তকের নগরী (City of books), প্রাচীন কেনান (জোশ ১৫ঃ১৫)। সাবার দক্ষিণে কাতাবানের রাজধানী ছিল জোফার (Zofar)। তিমনা (Timna) ধর্মীয় কেন্দ্রে ৬৫টি মন্দির ছিল; মূর্তি ছিল হেলোনস্টিক স্টাইলে। সাবা ও হিমিয়ারের সাথে কাতাবানের ঘন ঘন সংঘর্ষ বেধেছে।

প্লিনির আট্রামিটা হাদ্রামাত (বাইবেলে হাজার মাভেত-আদিপুস্তক ১০ ঃ ২৬) প্রথমে রাইদান বলে পরিচিত ছিল। এর রাজধানী ছিল সাবওয়া (Shabwa)। মাহরাব উপকূলে প্রধান বন্দর ছিল কেন (Kene)।

দোফার বা জোফার (বাইবেলে সেফর আদিপুস্তক ১০ঃ৩০)-এ ১২০০ খ্রিঃ পূর্বাব্দে বেশ কয়েকটি স্থাপনা ছিল। কিছু সময়ের জন্য এটা হাদ্রামাতের কলোনি ছিল, তবে ইতিহাসে বেশ ভালো করে উল্লেখ নেই; কিন্তু ১২০০ খ্রিস্টাব্দে এই অঞ্চল ওমানের রাজনৈতিক সীমানার অন্তর্ভুক্ত হয়।

হিমিয়ার (ক্ল্যাসিকেল লেখকদের কাছে হেমোরিটা) খ্রিঃপূর্ব প্রথম শতাব্দি থেকে কাহতান নামে পরিচিত হয় এবং সময় সময় কাতাবান, হাদ্রামাত ও সাবার ওপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখে। এর রাজধানী ছিল জোফার যা কাতাবান থেকে কেড়ে নেওয়া হয়। এডেনের কাছে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ শহর ছিল অসান (Ausan)। ক্ল্যাসিকেল ও আরব লেখক উভয়েই প্রায় হিমিয়ার বলে দক্ষিণ আরবকে সাধারণত উল্লেখ করেছে এবং আরব ট্রাডিশন হিমিয়ারকে 'আরবের দোলনা' (The cradle of Arab) বলে বিবেচনা করত। ৫২৫ খ্রিস্টাব্দে আবিসিনিয়ানরা এটা দখল করে এবং ৫৭৫ খ্রিস্টাব্দে দখল করে পার্সিয়ানরা।

অধুনা ইতিহাসে নগর রাজ্য (City State) থেকে গুরুত্ব তুলে নিয়ে কাহতান গোত্রের ওপর চাপানো হয়েছে। দক্ষিণ আরবীয় গোত্রদের একটা উপনাম ছিল, তাদের বলা হতো জেরাহ (আদি পুস্তক ১০ ঃ ২৬) জোকতানের পুত্র। আরবদের কাছে প্রথা মতে ইয়েরেব (Yereb) নামে পরিচিত। যে দেশে তারা বাস করত, গ্রিকদের কাছে আরাবিয়া বলে চিহ্নিত হয়েছে (Irivine, in Wiseman, 1971 P 290).

ইয়েরেবের এক বংশধরের নাম ছিল ইয়েশদ মারিবের প্রতিষ্ঠাতা। এই শহর ছিল সেই বিখ্যাত ড্যামের (Dam) কাছে। ইয়েশেদের পুত্র আব্‌দ শামস্ সাবার দুই পুত্র কুহলাম ও হিমিয়ার যাদের বংশধররা একের পর এক রাজত্ব করে গেছে। এরাই কাহতান গোত্রদের পূর্বপুরুষ (Progenitors)।

খ্রিস্টাব্দের প্রথম শতাব্দি থেকে মারিব ড্যামের দেয়ালে ফাটল ধরতে শুরু করে।

www.pathagar.com

ফলে এই ড্যাম নষ্ট হতে থাকে। কারণ ভালো মেরামত ও নজরদারি হয়নি। এই কারণে আবাদি জমি কমতে থাকে এবং পরবর্তীতে লোকজন মধ্য আরবে ও আরও উত্তর-পূর্বে উঠে যেতে শুরু করে। এই অভিবাসন চলতে থাকায় মেসোপটেমিয়া সিরিয়া ও প্যালেস্টাইনে দক্ষিণ অঞ্চলের বহু গোত্র বসবাস শুরু করে। দক্ষিণ অঞ্চলের লোকজন কমে যাওয়ায় লোহিত সাগরে রোমানদের বাণিজ্য জাহাজের যাতায়াত কমে যায় ও ব্যবসা মন্দা হয়।

প্রায় ৩৫০ খ্রিস্টাব্দে (এই তারিখ সম্বন্ধে পণ্ডিতদের মতভেদ আছে) সেই ড্যাম (dam) শেষ পর্যন্ত ধসে যাওয়ায় প্রবল বন্যা দেখা দেয়। এই বন্যার কথা কোরানে 'ইরিমের বন্যা' বলে উল্লেখ আছে (৩৪ : ১৫)। এর ফলে দক্ষিণের রাজ্য ও সিটি স্টেটসে ভাঙ্গন ধরে, কারণ গোত্ররা এদিক-ওদিক ছড়িয়ে যায়। আর এর জন্য ঐ অঞ্চলের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন ঘটে যায়।

২.২ আদনান আরব

আরাবিয়ান পেনিনসুলাতে আদনান গোত্র, ভবঘুরে বেদুইন গোত্র, মূলত প্যালেস্টাইন থেকে আগত। এই উত্তরবাসী আরব মিশরির ইহুদি ইসমাইলের বংশধর। এদের সাথে আরব ও অ-আরব উভয়ের সংমিশ্রণ ছিল; কিন্তু এদের মধ্যে বিয়েশাদিও হতো। কাহতান গোত্রদের চেয়ে এরা বর্ণে হালকা মিশ্র-আরব গোত্র (মুস্তারিবা)।

তাদের ভাষার সাথে ক্যানানাইট হিব্রু, আরামাইক ও সিরিয়াক ভাষার সম্পর্ক ছিল। বাইবেল অনুযায়ী (আদি পুস্তক ২৫:১৮) তারা হাবিলা (নাজরেন) ও শুর (সিরিয়ান মরুর)-এর মধ্যে বসবাস করত এবং মধ্য আরব ও উত্তর আরব জুড়ে তারা দখল করেছিল বসবাসের জন্য। ইয়ামামা ও নেজজের কিছু অংশও তাদের দখলে ছিল। এই গোত্রের শাখা ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল মধ্যপ্রাচ্যে, মিশর, সিরিয়া প্যালেস্টাইন ও মেসোপটেমিয়া অঞ্চলে; তাদের রাজনৈতিক সম্পর্ক ছিল প্যালেস্টাইন ও সিরিয়ার সাথে। পরে বাইজনাটিয়ামের সাথেও সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল।

আরব লোক কাহিনীতে আদনান গোত্রের উৎস বা গোড়ার কথা (Origin) লিপিবদ্ধ আছে। বলা হয় যে আব্রাহাম হেজাজের মক্কার আশপাশে এসেছিলেন এবং হ্যাগার (হাজেরা) ও ইসমাইলকে রেখে চলে যান। এই রূপে প্রাচীনকাল থেকে আদনান গোত্র মক্কা ও কাবা ঘরের সাথে জড়িত।

হ্যাগারের মৃত্যুর পর ইসমাইলকে লালনপালন করে বড় করে তোলে জুরহাম গোত্র। জুরহাম গোত্র জোকতান পুত্র হেদোরাম (জুরহাম)-এর বংশধর (আদি পুস্তক ১০ : ২৭)। এই গোত্র মক্কার আশপাশে বসবাস শুরু করে।

ইসমাইল রিলাহ্‌কে বিবাহ করেন। রিলাহ জুরহাম গোত্রের একটি শাখা আমর ইবনে আদি-র প্রধান, মুদাদের কন্যা ছিলেন।

বাইবেলে এবং পরে ইসলামী ট্রাডিশনে বর্ণিত যে ইসমাইলের বারোজন পুত্র ছিল এবং এই বারো জন পুত্র আদনান গোত্রের বারোটি শাখার পূর্বপুরুষ, যদিও এই গোত্রগুলোর নাম সম্বন্ধে দুটো মত প্রচলিত আছে এবং তাদের ইতিহাসও খুব পরিষ্কার নয়।

www.pathagar.com

ইসমাইলের পুত্রদের মধ্যে (আদি পুস্তক ২৫ ঃ ১৩-১৫) একজন ছিলেন নাবাজোত নাবাতিয়ানদের পূর্বপুরুষ আর হাদার নাকি ছিলেন প্রফেট হুদ; তেমা ছিলেন উত্তর হেজাজে তাইমা গোত্রের প্রতিষ্ঠাতা পরে তাঈ গোত্র দখল করে নেয়; দুমাহর নাম কালব গোত্রের রাজধানী দুমার সাথে জড়িত; জেতুর ছিলেন ইতুরাইমের পূর্বপুরুষ, এই গোত্র উত্তর প্যালেস্টাইনে তাদের আস্তানা গাড়ে। প্রধান আদনান গোত্রের পূর্বপুরুষ ছিলেন কেদার।

আদনান (প্রায় ৫৮০ খ্রিঃপূঃ) তার নামে আদনান জাতি (race) চালু করেন। ইনি কেদারের প্রত্যক্ষ বংশধর (direct discendant)। আদনানের পুত্র মাআদ দ্বিতীয় নেবুচেদনজরের হত্যাযজ্ঞ থেকে কোনো প্রকারে পালিয়ে হেজাজের কাছে মক্কাতে বসতি স্থাপন করেন। মাআদের পুত্র নিজারের মা ছিলেন জুরহাম রমণী।

মক্কার ওপর প্রাধান্য বিস্তার ও কাবাঘরের অভিভাবকত্ব নিয়ে শতাব্দি ধরে যে যুদ্ধ হয় নিজারের বংশধরেরা এই যুদ্ধে শামিল ছিল। এই যুদ্ধে প্রথমে যারা জয়ী হয়, কিছু সময়ের জন্য, তারা ছিল আমিলা গোত্র। এরপরে সিনাইয়ের বসতি স্থাপন করে। এদের সরিয়ে জুরহাম গোত্র মক্কায় ও কাবাঘরের ওপর প্রাধান্য পায় এবং অনেক দিন ধরে তারা ক্ষমতা ধরে রাখে।

নিজার এবং দক্ষিণের জুরহাম গোত্রের সাথে মিলে উত্তরের আদনান গোত্র কিননা (কোরেশ) গোত্রসহ— খাঁটি আরব রক্তের দাবিদার— নতুবা তারা ছিল ইহুদি গোত্র ও সম্প্রদায়ের সাথে আত্মীয়তায় সম্পৃক্ত। সত্যি বলতি কি, প্রাচীন বেদুইন ভবঘুরেরা তাদের গোত্র দাবি করত কেদার ও থাকিফ (Thakif) গোত্রকে যারা ইহুদি বলে পরিচিত ছিল।

যেহেতু ইসমাইল গোত্রভুক্তদের সাথে এই গোত্র (আদনান) সদস্যদের বৈবাহিক সম্পর্ক ছিল, সেই কারণে জুরহাম গোত্র কাবাঘরে উপযুক্ত অভিভাবকত্বের দাবিদার। তারা কাবাঘর আমিলা গোত্রের কাছ থেকে দখল করে নেয় এবং একে পুনঃনির্মাণ করে। ট্রাডিশন বলে যে জুরহাম গোত্র কয়েক শতাব্দি ধরে কাবাঘরের অভিভাবক ছিল। কিন্তু পরে তারা এই ঘরের পবিত্রতা রক্ষায় শিথিল ভাব দেখায়। তারা কাবাঘর থেকে কালো পাথর তুলে নিয়ে জমজম কূপে নিক্ষেপ করে কাবাঘরের তৈজসপত্র দিয়ে কূপটি বন্ধ করে দেয়।

শেষমেশ জুরহাম গোত্র মক্কা থেকে বিতাড়িত হয়েছিল। অন্য একটি কাহিনী মতে ৩৩০ খ্রিস্টাব্দে খোজা গোত্র জুরহামদের তাড়িয়ে মক্কা ও কাবাঘর দখল করে। জুরহাম গোত্র উত্তর দিকে সরে গিয়ে কোদা উপজাতির সাথে মিলে যায় এবং দক্ষিণ প্যালেস্টাইন ও সিনানে বসতি স্থাপন করে। পরে জুদহাম গোত্রের সাথে মিশে সম গোত্রে পরিণত হয়।

জুরহাম গোত্রকে যারা তাড়িয়েছিল সেই খোজা গোত্র কাহতান জাতিভুক্ত ছিল। খোজা গোত্রের নেতা ছিলেন লুহে ইবন আমর; তিনি মক্কা নগরী অবরোধ করে কাবাঘরের চার্জ গ্রহণ করেন। কাবাতে যেসব মূর্তি ছিল তার সাথে লুহে আরো কিছু বিদেশী দেবতার মূর্তি কাবাঘরে প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি কিংবা তার পুত্র নাবিতিয়ান থেকে হুবাল দেবতার মূর্তি এনে কাবা ঘরের প্রধান দেবতা হিসাবে প্রতিষ্ঠা করেন।

www.pathagar.com

এরপর কিভাবে খোজারা কোরেশ গোত্র দ্বারা বিতাড়িত সেকথা পরবর্তী পর্যায়ে আলোচিত হবে।

২.৩ গোত্র-কলহ

খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতাব্দিতে মারিবের বাঁধ (dam) ধসে যাওয়ার পর এ অঞ্চল থেকে সে অঞ্চলে গোত্রদের চলাচল ও বসতি বদল শুরু হয় হেজাজে; আর এই কারণে কোরেশ গোত্রের প্রাধান্য দেখা দেয়। এই স্থান বদলের কারণে উপজাতি ব্যবস্থার (সিসটেমে) একটা মৌলিক পরিবর্তন এনে দেয় আরবে এবং তার বাইরের অঞ্চলের উপজাতি কাঠামোতে। আরব গোত্রের ক্ষেত্রে এই পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী হয়ে দাঁড়ায় বেদুইন ভবঘুরে ও স্থানীয় অবস্থানকারী আরববাসী উভয়ের জন্য। এই পরিবর্তন প্যাগন, আরব; খ্রিস্টান ও ইহুদি সর্বক্ষেত্রেই প্রযোজ্য ছিল।

মারিবের বাঁধ ভেঙ্গে যাওয়ার পর অর্ধশতাব্দি ধরে একটা তুলনামূলক স্টাডি করলে দেখা যাবে এই লাগাতার স্থান বদলের কারণে গোত্রদের বাসস্থানের সীমানা মুছে গেছে, তাদের পূর্বের বন্ধনও টুটে গেছে, পরিবর্তে নতুন সীমানা ও গোত্র বন্ধন দানা বাঁধতে শুরু করেছে। এই ডামাডোলের মাঝে দক্ষিণ আরবের কাহতান ও উত্তর আরবের আদনান—এই দুই প্রধান আরব গোত্রের মধ্যে যে পার্থক্য ছিল সেই পার্থক্যের ঠিকানাও গোলযোগ হয়ে গেছে।

কোনো কোনো আঞ্চলিক আচার-ব্যবহার যেমন পোশাক-আশাক, খাওয়া-দাওয়া ও ভাষারও এলোমেলো মিশ্রণ হয়ে গেছে। উদাহরণস্বরূপ উত্তরের কোইস ও দক্ষিণের কিন্দা গোত্রে এই স্থান বদলের কারণে নিকট সম্পর্ক হওয়ায় তাদের আগেকার আচার-ব্যবহারের সমন্বয় ঘটে একটা মিশ্রিত উপজাতীয় পরিচিতি এনে দিয়েছে অর্থাৎ দুই ভিন্ন গোত্রের সংমিশ্রণে তাদের আচার-ব্যবহার ও সংস্কৃতির মিশ্র-সংস্কৃতির ও ব্যবহারিক পদ্ধতিতে নতুনত্ব এসেছে। এর ফলে গোত্রের পরিসর ও লোকসংখ্যা বেড়ে গিয়ে একক স্বার্থের কারণে এক নতুন কনফেডারেশনের (হিলফ) আবির্ভাব হয়।

উত্তর আরব গোত্রের মাআদ নাম দক্ষিণ আরবের সাথে মিশে এক হয়েছে। অনুরূপভাবে, কোদা ও খোজা গোত্র উত্তর ও দক্ষিণ যে দিকেই গেছে সেখানকার কৃষ্টি ও সংস্কৃতির সাথে মিশেছে। সুতরাং গোত্র শুধু সাধারণ বংশজাত নয়। সাধারণ বসতির কারণে নতুন ভাবে দেখা দিল এবং গোত্র দ্বন্দ্ব এই স্থান পরিবর্তনের কারণে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে শত্রুতা ভুলে বন্ধুত্বের বন্ধনে পরিণত হয়েছে। যেমন পূর্বে আদনান গোত্রের লোক পরে কাহতান গোত্রের সাথে মিশে দক্ষিণের কাহতানে পরিণত হয়েছে। এই সব কারণে আরব গোত্রের পূর্ব পরিচিতি (identity) ও আত্মীয়তা থাকেনি, একের সাথে অন্যে মিশে বংশ পরিচয় নির্ভুলভাবে গঠন করা তাৎক্ষণিকভাবে সম্ভব হয়নি।

এর মাঝেই কোরেশ গোত্র প্রাধান্য পেয়ে, খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দির শেষের দিকে মক্কা নগরী নিয়ন্ত্রণে আনে এবং আরবে শুধু মক্কার কাবাঘরের অভিভাবক হিসাবে ধর্মীয় কারণ ছাড়া ব্যবসা-বাণিজ্যে নিজেদের অবস্থান পাকাপোক্ত করে নেয়। ক্রমে

www.pathagar.com

ক্রমে মক্কা নগরীর গুরুত্ব বেড়ে যায়– বাণিজ্য কেন্দ্র হয়ে ওঠে ও ব্যবসার খাতিরে বহু বিদেশী রাষ্ট্রের সাথে জড়িয়ে পড়ে।

২.৪ কোরেশ

আনুমানিক ৩৫০ খ্রিস্টাব্দে আদনান গোত্রের এক প্রভাবশালী কনফেডারেসি কিনানা হেজাজে মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। এই কনফেডারেসির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও ক্ষমতাশালী গোত্র ছিল কোরেশ। নামের সাথে সমুদ্রের ভয়ঙ্কর জাতের প্রাণী শার্ক শ্রেণীর প্রাণী বোঝায়; সম্ভবত গোত্রের প্রতীক চিহ্ন থেকে এই নামের উদ্ভব হয়েছে। কেউ কেউ বলে পার্সিয়ান নাম সাইরাস (কুরাশ) থেকে এই নাম গ্রহণ করা হয়েছে।

এক শতাব্দি পরে অর্থাৎ প্রায় ৪৫০ খ্রিস্টাব্দে কোরেশী কিলাব ও ফাতেমার পুত্র কোসেই মক্কা ও কাবার ঘরের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করার মনস্থ করেন। কোসেই-এর মা ফাতেমা ছিলেন জাদারা গোত্রের রমণী। কাবাঘর শুরুতে ইসমাইলের বংশধরদের নিয়ন্ত্রণে ছিল। কিন্তু আনুমানিক চতুর্থ খ্রিঃ পূর্বাব্দ থেকে এই পবিত্র ঘর পর পর কাহতান, আমিলা, জুরহাম ও খোজা গোত্রের অধীনে চলে যায়।

কোসেই মক্কাতে জন্মগ্রহণ করেন কিন্তু নাবাতিয়ানদের মধ্যে বড় হয়ে ওঠেন। যৌবন ও বয়ঃপ্রাপ্তির সাথে তিনি মক্কা নগরী ও কাবাঘর উদ্ধারের পরিকল্পনা করেন যাতে এই নগরী ও পবিত্র ঘর আদনান জাতির নিয়ন্ত্রণে আসে। এই উদ্দেশ্যে তিনি নাবাতিয়া এবং কোদা গোত্রের কাছ থেকে সাহায্য ও সহযোগিতার আশ্বাস পান। কোদা গোত্র তখন সেখানে বাইজানটাইন সম্রাটের পক্ষে কাজ করছিল। এই সম্মিলিত শক্তি সহজেই খোজাদের মক্কা ও কাবা থেকে বিতাড়িত করে দখল করে নেয়। পরে মক্কা ও কাবাঘরে কোরেশ গোত্রের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

মক্কা ও কাবাঘরের প্রশাসনিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে কোসেই বেশ কিছু নিয়মকানুন প্রবর্তন করেন। তিনি নাবাতিয়ানদের কাছ থেকে লাত, মানাত ও উজ্জা দেবীদের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। জুরহাম গোত্র কাবাঘরের সংস্কার না করায় জরাজীর্ণ অবস্থা হয়ে ছিল। কোসেই পুরানো ঘর ভেঙ্গে নতুন করে, বেশ জাঁকজমকভাবে ভবনটি পুনঃনির্মাণ করেন।

কোসেই-এর পুত্র ও উত্তরাধিকারী আব্দুল মনাফ বিদেশীদের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্প্রসারণ করেন, ফলে মক্কা নগরী বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ শহরে পরিণত হয়। আব্দুল মনাফের বংশধরেরা মক্কাতে ক্ষমতা দখলের দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ে এবং এরাই ইসলামের প্রচার ও প্রসারে মুখ্য ভূমিকা পালন করে।

ঠিক এই সময়ে বাইজানটাইন ও সাসানিয়ান সম্রাটরা আরব গোত্রের সাথে সম্পর্ক উন্নত করার জন্য রাষ্ট্রনীতি পরিবর্তন করে নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য। যেহেতু বাইজানটিয়ানরা মক্কা নগরী দখল করতে কোরেশদের সাহায্য করেছিল, সেই কারণে আবদুল মনাফ বাইজানটিয়ানদের সাথে বন্ধুত্ব সম্পর্ক গড়ে তোলেন।

এই সময়ে সাসানিয়ান সম্রাট ছিলেন প্রথম কোবাদ; তার আরব বন্ধু ছিল ইউফ্রেটিস উপত্যকায় হিরার রাজা তৃতীয় মুনধির। কোবাদ পার্সিয়ান মাজদাক-এর সাম্যবাদ নীতির সমর্থক ছিলেন; তাই তিনি মুনধিরকে তার আরব রাজ্যে মাজদাকের

www.pathagar.com

সাম্যবাদনীতি প্রচার করতে বলেন এবং এ-ও বলেন যে এই নীতি প্রবর্তন করতে প্রয়োজনবোধে মক্কা দখল করো, কাবাঘরও ধ্বংস করো এবং আব্দুল মনাফকে হত্যা করো। কিন্তু কোবাদ এই সময়ে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সমস্যায় জড়িত হয়ে পড়লে তার মক্কা দখল ও কাবাঘর ধ্বংস করা হয়ে ওঠেনি। মক্কা বিদেশী আক্রমণ থেকে অব্যাহতি পেয়ে শান্তিপূর্ণভাবে তার বাণিজ্যকর্ম চালিয়ে গেছে।

২.৫ মক্কা

উন্নয়নশীল মক্কা নগরী দুইটি প্রধান বাণিজ্য পথের মিলন কেন্দ্রে একটি উপত্যকার ওপর অবস্থিত এবং উত্তর-দক্ষিণে হেজাজ হয়ে রাস্তা চলে গেছে লোহিত সাগরের উপকূল পর্যন্ত। এই পথের ওপর পড়ে হিমিয়ার, প্যালেস্টাইন ও সিরিয়া। অন্যদিকে পূর্ব-পশ্চিমে নেজদ সড়ক, সাথে যোগ হয়েছে ইয়েমেন, পারস্য উপসাগর ও ইরাক। এই নগরী ব্যস্ত বাণিজ্যকেন্দ্র এবং কারাভানদের আড্ডাস্থল, প্রচুর পানি সরবরাহের ব্যবস্থা আছে। ভারত মহাসাগর, পূর্ব আফ্রিকা ও ভূমধ্যসাগরের ট্রানজিট বাণিজ্য মক্কায় একচেটে ছিল। এই শহরের মধ্য দিয়ে প্রভূত পরিমাণে মিশর, সিরিয়া, রোম বাইজানটাইন, পারস্য ও ভারতীয় পণ্যদ্রব্য চলাচল করত।

চামড়া, আঠা, সুগন্ধি দ্রব্য, মশলাপাতি ও মূল্যবান পদার্থ মক্কা থেকে রপ্তানি হতো। ইথরেবের (মদিনা) মধ্য দিয়ে পারস্য ও ইরাকে পণ্যদ্রব্য—বিশেষ করে পারফিউম, চামড়া ও বস্ত্রাদির ট্রাফিক চলাচল হতো; মক্কার মধ্য দিয়েও এই সব দ্রব্যের যাতায়াত ছিল।

খ্রিঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দিতে প্রতিবেশী দেশগুলোর বাণিজ্য ডিপো মক্কাতে ছিল। একটি মিশরীয় কেন্দ্র (দার মিসর) প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ৫০০ খ্রিস্টাব্দে; তারপরেই বাইজানটাইন ট্রেড এজেন্সি খোলা হয়। আব্দুল মনাফের শাসনামলে খ্রিস্টান অধিকৃত এলাকা ঘাসান-এর সাথেও মক্কার নিকট বাণিজ্য সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ঘাসানের স্থানীয় এজেন্টকে মক্কাতে কেন্দ্রীয় স্থানে ব্যবসা কেন্দ্র ও বাসস্থান বরাদ্দ করা হয়।

২.৬ কাবা

প্রাক-ইসলাম যুগে প্যাগন আরবদের ধর্মীয় কর্মকাণ্ড কাবাঘরকে ঘিরেই আবর্তিত হতো। কথিত আছে এই কাবাঘর আদম কর্তৃক নির্মিত, পরে নূহের প্লাবনের সময় এ ঘর ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। তারপর পুনঃনির্মিত হয় আব্রাহাম ও তার পুত্র ইসমাইল দ্বারা। কাবার সাথে আব্রাহামের যোগসূত্র হয় ইসলাম আবির্ভাবের পর।

বলা হয় যে কাবাঘর প্রথমে তৈরি হয় পবিত্র কালো পাথরকে স্থান দেওয়ার জন্য। এই স্থান প্রাথমিকভাবে আরব গোত্রদের পূজা করার কেন্দ্র ভূমিরূপে পরিগণিত হয় এবং এই সব গোত্রই তাদের দেব-দেবীদের মূর্তি এই মন্দিরের চারদিকে প্রতিষ্ঠা করে। প্যাগন আরবদের এই পবিত্র ঘরে প্রধান দেবতা ছিল আল্লাহ এবং ইসলাম আবির্ভাবের পূর্বে এই পবিত্র ঘরকে আল্লাহর ঘর (House of Allah) বলা হতো।

কাবাঘর ৬৩০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্যাগন (ইহুদি, খ্রিস্টীয় ও ইসলাম ধর্মের লোক ছাড়া অন্য ধর্মের লোককে প্যাগন বা হিদেন বলা হতো) আরবদের ধর্মীয় কেন্দ্রভূমি

www.pathagar.com

ছিল। ৬৩০ খ্রিস্টাব্দে প্রফেট মোহাম্মদ মক্কা অধিকার করলে কাবাঘরের সব মূর্তি ভেঙ্গে ফেলা হয়, কিন্তু তারপরেও এই কাবাঘর মুসলিম জনগোষ্ঠীর পবিত্র ধর্মকেন্দ্র এবং মুসলিম বিশ্বের মুসলমানরা এই কাবাঘরের দিকে মুখ করে তাদের উপাসনা করে।

মক্কা উপত্যকা বেষ্টন করে এক প্রাচীন নদী বয়ে যায়, ফলে মাঝে মাঝে ঝড় বৃষ্টির কারণে শহরে ও কাবাঘরে বন্যা দেখা দেয়। এ ধরনের একটা বন্যা হয়েছিল ১৯৫০ সালে যখন হাজীদের বন্যার পানি মাড়াতে হয়েছিল।

৩০০ খ্রিস্টাব্দে এই ধরনের একটা বন্যায় কাবাঘরের ক্ষতি হয় এবং এর মেরামত করেন ওমর আল জারুদ। পরে তার বংশধরেরা জাদারা বা রাজমিস্ত্রি বলে পরিচিতি পায়।

কাবাঘরে শুধু বন্যায় ক্ষতি করেনি, মন্দিরের মধ্যে কুপি জ্বালানোর কারণে আগুনও লেগেছে। কাবাঘরের লম্বা ইতিহাসকালে অনেক বার বন্যায় ও অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতি হয়েছিল এবং এই কারণে প্রায় একে ঢেলে পুনঃনির্মাণ করতে হয়েছে। এই পবিত্র ঘরের অনেক বার পুনঃনির্মাণের কারণে এর কাঠামো ও সাইজের পরিবর্তন ঘটেছে প্রাক-ইসলাম যুগে ও ইসলাম আবির্ভাবের পরে।

কাবাঘরকে মূল্যবান চাঁদোয়া (Canopy) (কিসওয়া) দিয়ে সজ্জিত করা হয়েছে, যা প্রতি বছর (নতুন করে) নবায়ন করা হয়। এই অলঙ্কাবরণ শুরু হয় প্রফেট মোহাম্মদের জন্মের তিন শতাব্দি পূর্বে আসাদ আবু কারির দ্বারা (আনুমানিক ৪১৫ খ্রিস্টাব্দ)। আসাদ এটা করেন প্যাগন ধর্ম থেকে ইহুদি ধর্ম গ্রহণের পর।

প্রথমে যখন এই গৃহ নির্মাণ করা হয় এর দেয়াল ছিল সাড়ে তিন ফুট উঁচু এবং ছাদ ছিল না, এখন কাবাঘর প্রায় ৪০ ফিট উঁচু, লম্বা ও প্রশস্ত। বর্তমান নির্মাণ কাঠামো সপ্তম শতাব্দিতে তৈরি হয় (O' Leary, 1927, P 197)

২.৭ কালো পাথর

ইবনে আব্বাসের (মৃ. ৬৮৭) বর্ণনা মতে প্রফেট মোহাম্মদ বলেছেন; কালো পাথর স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে এবং নেমে আসার সময় এটা দুধের মতো সাদা ছিল, কিন্তু পাপী মানুষের স্পর্শে এবং চুম্বনে এটা কালো হয়ে গেছে। প্রাচীন পারস্য ট্রাডিশনের মতে, এই পাথর শনির প্রতীক ছিল এবং সে দেশের নায়ক মহাবাদের কাবাতে ফেলে যাওয়া একটা নিদর্শনের অংশ (Hughes 1977 P. 155)।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা বিশ্বাস করেন কালো পাথর একটা উল্কাপিণ্ড (meteorite) প্রাগৈতিহাসিক যুগে যা আকাশ থেকে কক্ষচ্যুত হয়েছিল এবং কাবা নির্মাণ করা হয়েছিল এই পাথরকে সংরক্ষণ করার জন্য। প্রাচীন আরবরা এটাকে পূজো করত এবং এখনো পর্যন্ত মুসলিম জাতি এ পাথরকে শ্রদ্ধাভক্তি করে। মক্কাতে হজের সময় মুসলিমরা এই পাথরকে প্রদক্ষিণ করে ভক্তিসহকারে। কাবাঘরের পূর্ব কোণে এই পাথর ভূমি হতে পাঁচ ফুট ওপরে গাঁথা আছে।

এটা আসল উল্কাপিণ্ড নাও হতে পারে। তৃতীয় শতাব্দি খ্রিস্টাব্দের কোনো এক সময় জুরহাম অভিভাবকরা এটাকে সরিয়ে জমজম কূপের মাঝে ফেলে দিয়েছিল।

www.pathagar.com

৬০৩ খ্রিস্টাব্দে উমাইয়া সেনাবাহিনীর কাবাঘর আক্রমণের সময় এ পাথর ভেঙ্গে তিন টুকরো হয় এবং পরে কারমাতিয়ানরা এই পাথর কাবাঘর থেকে উঠিয়ে নিয়ে যায়।

বর্তমানে এই পাথর কিছুটা ডিম্বাকার, বেড়ে সাত ইঞ্চি (diametre) আর এর উপরটা অসমতল। ডজন খানেক ছোট বিভিন্ন আকার ও সাইজের পাথর সিমেন্ট দিয়ে জোড়া লাগানো এবং খুব মসৃণ সমস্ত পাথরটা রুপা দিয়ে বাঁধানো।

কালো পাথর খুব পবিত্র এবং কাবার একমাত্র পবিত্র পাথর নয়। ঘরের পশ্চিম কোণে আর একটি পাথর আছে সৌভাগ্য (আসাদ) পাথর-দেয়ালের সাথে গাঁথা। এই পাথরকে স্পর্শ করে হাজীরা; কিন্তু চুম্বন করে না। তবুও আরও একটা পাথর আছে, তাকে বলা হয় আব্রাহামের স্থান (মোকামে ইব্রাহিম)। কাবাঘর নির্মাণ করার সময় আব্রাহাম নাকি এই পাথরের উপর দাঁড়িয়েছিলেন। এটা এখন গিল্টি করা খাঁচায় আবদ্ধ, রাখা আছে বাইরের ছোট একটি কোটায়।

প্রফেট মোহাম্মদ সব ধরনের মূর্তি পূজার নিন্দা করেছেন এবং কালো পাথরকে ভক্তি-শ্রদ্ধা দেখানো হজের অংশ নয়। সুতরাং এই পাথর স্পর্শ করা এবং চুম্বন করা উপাসনা বা হজের অঙ্গ বলে গণ্য নয়। খলিফা ওমর (মৃত ৬৪৪) কালো পাথর সম্বন্ধে বলেছিলেন; আমি জানি তুমি একটা পাথর ছাড়া কিছুই নও, মানুষকে সাহায্য করা বা ক্ষতি করার তোমার কোনো ক্ষমতা নেই। যদি আমি আল্লাহর রসূলকে না দেখতাম তোমায় চুম্বন করতে, আমি তোমাকে কখনও চুম্বন করতাম না।

২.৮ প্যাগনদের হজ (তীর্থক্ষেত্র)

মক্কাতে বছরে একবার তীর্থযাত্রীদের আগমন হতো (হজ করতে) এবং কাবাঘর ছিল তীর্থ ক্ষেত্রের মণিকেন্দ্র বা ধর্মীয় কেন্দ্র। এই হজ হতো দশ দিনের জন্য এবং হরেক রকমের আনুষ্ঠানিকতা পালন করতে হতো। ইসলামের আবির্ভাবের পর সামান্য পরিবর্তন করে এই হজ ও আনুষ্ঠানিকতা পালন করা হয়। বর্তমানে মুসলমানরা হজের সময় যে আনুষ্ঠানিকতা (rituals) পালন করেন তার অনেক কিছু প্রাক-ইসলামী যুগে চালু ছিল। প্রাক-ইসলামী যুগে অপবিত্র পুরনো কাপড় পরে কাবা মন্দিরের ধারে-কাছে যাওয়া নিষেধ ছিল। তীর্থযাত্রীরা স্নান করার পর সাদা কাপড়ে দেহ ঢেকে দিত; এই আচ্ছাদনকে ইহরাম বলা হতো। এই কাপড় বদলানো পর্ব সারা হতো দেবী মানতের পীঠস্থানে। যারা নতুন কাপড় কিনে ইহরাম বাঁধতে না পারত তারা কাবাঘরে উদোম হয়ে প্রদক্ষিণ করত (Hughes, 1977 P 630)।

মন্দিরে প্রবেশের পূর্বে তীর্থযাত্রীরা তাদের আল্লাহর কাছে প্রস্তুতির ঘোষণা দিত (তালবিয়া) এবং স্পষ্ট করে মন্ত্র উচ্চারণ করত— হে আল্লাহ, আমি আমার ধর্মীয় কর্তব্য পালন করতে এসেছি; তুমি এক ও অদ্বিতীয়। এই ফরমুলা বহু প্রাচীন, একে বলা হতো লাব্বাইকা। এখনোও লাব্বাইকা বলা হয় হজের সময়।

পবিত্র ঘরে প্রবেশ করে প্রধান অনুষ্ঠান (rite) হলো কাবাকে বাঁ দিকে রেখে ডাইনে থেকে বাঁয়ে সাত বার প্রদক্ষিণ করা অর্থাৎ তাওয়াফ করা। প্রতিবার ঘোরার সময় কালো পাথরকে চুম্বন করতে হয় বা মাথা নোয়াতে হয়।

তাওয়াফের পর সেই সব গোত্র তাদের দেব-দেবীদের কাছে অর্ঘ্য ও উৎসর্গ

www.pathagar.com

করবে যেসব দেব-দেবী কাবার চারদিক ঘিরে প্রতিষ্ঠিত; প্যাগন কোরেশরা তাদের প্রধান দেবী লাত, উজ্জা আর মানাতকে অর্ঘ্য দিয়ে আহ্বান (invoke) করবে।

এই সব অনুষ্ঠান করতে পাঁচ দিন চলে যাবে। ৬ষ্ঠ দিনে তারা মক্কার দুই পর্বত সাফা ও মারওয়ার মধ্যে সাত বার ছুটাছুটি করে (সাঈ)। এই দুই পাহাড় কাবা থেকে কয়েকশো গজ দূরে। মুসলিম ট্রাডিশন অনুযায়ী কথিত যে আব্রাহাম হ্যাগার (হাজেরা) ও ইসমাইলকে এই পর্বতের কাছে ছেড়ে গেলে হ্যাগার তৃষ্ণায় পানির জন্য এখানে ছুটোছুটি করেছিলেন।

প্যাগানদের সময়ে এই দুই পাহাড়ের চূড়ায় পাথর বা তামার দুটো মূর্তি থাকত— একটি পুরুষ, আর একটি নারী। এই মূর্তিদ্বয়কে মক্কার লোকেরা পূজো করত। প্যাগন আরবরা, কোরেশ ও খোজা গোত্রসহ এই মূর্তিদের অর্ঘ্য নিবেদন করত এবং তাদের ছুঁয়ে আশীর্বাদ চাইত।

লোককাহিনী বলে যে, প্রাচীনকালে একটি রমণী নাইলা তার প্রেমিক ইসাফ-এর সাথে কাবাঘরের সীমার মধ্যে প্রেম করাতে তারা পাথরে পরিণত হয়। মক্কার শাসকের আদেশক্রমে তাদের পাথর দেহ সাফা ও মারওয়া পাহাড়ের উপর প্রতিষ্ঠিত করে এই উদ্দেশ্যে যে, এই দৃষ্টান্ত থেকে মানুষরা সাবধান হবে এবং কাবাঘরের চত্বরে কোনো দুষ্কর্ম করবে না। এই ঘটনার সূত্র পরোক্ষভাবে কোরানে উল্লেখ আছে (৭ঃ২৭)। এই ঘটনা প্রমাণ করে যে প্যাগন আরবদের কালে কাবাঘরের মধ্যে উদোম হয়ে সাত পাক ঘোরার ব্যবস্থা ছিল। ইসলামের আবির্ভাবের পর কাবাঘরে তাওয়াফ নারী-পুরুষে একসাথে করে না, আলাদা করা হয় এবং আচ্ছাদিত অবস্থায়।

তীর্থের অষ্টম দিনে তীর্থযাত্রীরা মক্কার উত্তরে মীনা উপত্যকায় যায় এবং সেখানে তারা রাত্রি যাপন করে। নবম দিনের সকালে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে রওয়ানা হয় আরাফাত পাহাড়ে। এখানে তারা মধ্যাহ্নকাল থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকে। আরাফাত পর্বত মক্কা থেকে পূর্ব দিকে প্রায় তের মাইল। প্রাক-ইসলামী সময়ে এখানে দেবতা ইলালের আস্তানা ছিল। আরবরা একে পূজা করত। আরাফাতে এই দাঁড়িয়ে থাকা (উকুফ) পর্বটি তীর্থের অবিচ্ছেদ্য অংশ।

আরাফাতে সূর্যাস্তের পর পরবর্তী পর্ব মুজদালিফা পর্বতে ছুটে চলা (ইফাদা) এ স্থানটি মীনা থেকে তিন মাইল দূরে। মুজদালিফা গোল টাওয়ার দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং বজ্র দেবতা কুজার পবিত্র ধ্বনি (এ. জে. ওয়েন সিঙ্ক, SEI 1974, P/124)। এখানে তীর্থযাত্রীরা আগুন জ্বালিয়ে রাতে পাহারা দেয় এবং মাঝে মাঝে চৌকিদারের মতো হাঁক দেয়। মুজদালিফায় আগুন জ্বালানো এই প্যাগন রীতি প্রফেট মোহাম্মদের বিদায় হজের সময় পালিত হয় এবং খলিফা হারুন-অর-রশীদের সময় পর্যন্ত চলেছে অর্থাৎ ৮০৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত।

তীর্থ পালনের দশ বা শেষ দিনের পর্ব মীনা উপত্যকায় পালিত হয়। মুজদালিফার সংগৃহীত সাত খণ্ড পাথর এখানে প্রত্যেক তীর্থযাত্রী ছোড়ে। এই পাথর ছোড়ার উদ্দেশ্য পরিষ্কার নয়, তবে মুসলিম ট্রাডিশন মতে বলা হয় এখানে আব্রাহাম শয়তানকে পাথর মেরে তাড়িয়েছিলেন।

মীনাতে পাথর মারার (রজম) পর তীর্থযাত্রীদের দেহ থেকে পবিত্রতা সরে যায়

www.pathagar.com

এবং তারা সাধারণ জীবনে ফিরে আসে। মীনাতে পর্বের চূড়ান্ত হয় ছাগল, ভেড়া বা উট উৎসর্গের (বধের) মধ্য দিয়ে। এই উৎসর্গ করা হতো দেবতাদের সন্তুষ্টি লাভের জন্য। থাবির (Thabir) পাহাড়ের গায়ে যেখানে অব্রাহাম তার পুত্রকে উৎসর্গ করতে চেয়েছিলেন, সেই স্থানেও পশু উৎসর্গ করার রীতি পালন করতে হয়। এই ধারাকে প্রায় বজায় রেখেছে হজ পর্ব ও কোরবানি।

মীনা পর্বের পরের তিন দিন অর্থাৎ ১১ তারিখ থেকে ১৩ তারিখ পর্যন্ত তসরিক পর্ব অর্থাৎ উৎসর্গকৃত পশুদের রক্ত-মাংস পরিষ্কার করে স্থানটিকে শুকনো করা হয়। তারপর বিশ্রাম। A.J. Wensinek বলেন : From references in early Arab poetry, it seems that occasion provided an opportunity for amorous encounters between the young men and women of diffrent tribes. Muhammad was to refer to this period as 'days eating, drinking and sensual pleasure' (SEI 1974 P/124).

২.৯ আল্লাহ

আরব গোত্ররা যারা হেজাজে বাস করত তাদের প্রধান দেবতা ছিল আল্লাহ (২৯ ঃ ৬১)। আল্লাহ শব্দের মূল (root) হচ্ছে 'আল' অর্থ 'গড'। এর ভিত্তি হচ্ছে 'এল' সেমেটিক ভাষার স্বর্গীয় নামের কেন্দ্র (nucleus of the divine name)। আল্লাহ শব্দটি গডের (God) সাথে জড়িত; যেমন ব্যাবিলিয়ন ও এসিরিয়নে 'ইলু'; ক্যানানাইটে এল; হিব্রু ইলোহিম; আর্মেনিয়ানে আলাহা; নাবাতিয়ানে এলহ বা আলহ; মধ্য আরবে ইলাহ।

এই প্রধান দেবতার কোনো মূর্তি ছিল না; ছিল একটা ছায়া ছায়া ভাব। এই ছায়া ছায়া ভাবের আল্লাহ'র ছোটখাটো দেব-দেবীদের মতো জনপ্রিয়তা ছিল না। অন্যান্য দেব-দেবী থেকে আল্লাহকে আলাদা করে রাখার জন্য নাম দেয়া হয়েছিল আল্লাহ God Most High। প্রাক-ইসলামী আরব এই ছায়া ছায়া প্রধান দেবতা আল্লাহকে একেশ্বর-বাদিত্বের প্রতীক বলে ধরে মান্য করত এবং এইসব আরবরা ছোটখাটো দেব-দেবীর বহুবাদিত্বে বিশ্বাসী ছিল না। এমনকি ইহুদি ও খ্রিস্টানরা ঐ সময়ে এই দেবতাকে আল্লাহ বলে শ্রদ্ধা করত। এই নামের কারণে প্রাক-ইসলামী আরবে বহু মানুষের নামকরণ করা হয়েছিল। যেমন প্রফেট মোহাম্মদের বাবার নাম ছিল আবদুল্লাহ-আল্লাহর দাস। তিনি ছিলেন প্যাগন আরব, মুসলিম নয়। খ্রিস্টানদের মাঝে নাম ছিল আবেদেল্লাস (Abdellas)। একজন বিশপের গ্রিক নাম ছিল আবদুল্লা (Abdulla)।

কাবাঘরে আল্লাহর পূজা করা হতো, এই কারণে এই ঘরের নাম ছিল বায়তুল্লাহ House of Allah। প্রাক-ইসলামী কবিতায় আল্লাহকে কাবার প্রভু Lord of the Kaaba বলা হয়েছে। তীর্থযাত্রীরা তাওয়াফ-এর সময় উচ্চারণ করত 'লাব্বাইকা' বলে।

আল্লাহর কাছে ও মাধ্যমিক দেব-দেবী, যাদের আল্লাহর সাথী-সঙ্গী বলা হয়, তাদের কাছে প্যাগান আরবদের অর্ঘ্য প্রণালীর কথা কোরানে উল্লেখ আছে (৬ঃ১৩৭)। মক্কাবাসীরা যেমন উল্লেখ করেছিল যে, এ ধরনের পূজা প্রণালী আল্লাহ বারণ করেননি (৬ ঃ ১৪৯)।

মক্কায় ইসলামের প্রাথমিক সময়ে প্রফেট মোহাম্মদ 'আল্লাহ' দেবতার সাথে

www.pathagar.com

প্যাগন আরবের পূজা প্রণালীর কথা ভালোভাবেই জানতেন, তাই 'গড'কে নির্দিষ্ট করতে আল্লাহ্ নাম গ্রহণ করতে ইতস্তত করেন, পরিবর্তে রহমান নাম দেবার চেষ্টা করেন।

আল্লাহকে আরও একটি নামে পরিচিত করা হয়েছিল দেবতা হুবাল-এর সাথে, যার মূর্তি অন্যান্য দেব-দেবীর সাথে কাবাঘরে ছিল। এই নাম সেমেটিক শব্দ 'হু' থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। যার অর্থ তিনি (He) অথবা তিনি হন (He is) (দেখুন ৩ ঃ ১), সাথে এল শব্দ অর্থাৎ God জোড়া ছিল। সম্ভবত তিনি আল্লাহ শব্দের প্রাচীন ব্যবহারিক শব্দ। হুবালের নাম নিয়ে মক্কাবাসীরা যুদ্ধ যাত্রা করত। নাবাতিয়েন ও অন্যান্য উত্তর আরবীয় গোত্র হুবালের পূজা করত, কিন্তু কোরানে এ শব্দ ব্যবহৃত হয়নি। বলা হয় যে, মোহাম্মদ যৌবনে কাবাঘরে হুবাল মূর্তি স্থাপনের অনুষ্ঠানে সাহায্য করেছিলেন।

২.১০ ঈশ্বরের উপাধি

কোরানে বলা হয়েছে (৭ঃ১৭৯), আল্লাহর উৎকৃষ্ট নামাবলি (আসমা-উল-হুসনা) আছে। এখান থেকে মুসলিমরা আল্লাহর ৯৯ নাম আহরণ করেছে যা আল্লাহর পদবি বা উপাধি। উদাহরণস্বরূপ আল মজিদ (The Glorious), আল-গফুর (The Forgiving), আল রাজ্জাক (The Provider), আল হাকিম (The Judge), আল খালিক (The creator), আল আওয়াল (The First), আল আখির (The Last)। এই নামের মধ্যে এমন কতকগুলি নাম আছে যার সাথে প্যাগন দেবতাদের সাথে নিকট সম্বন্ধ আছে; কিন্তু বলা হয়েছে যে প্যাগনরা বিকৃতভাবে প্রথম থেকে সত্যকার ঈশ্বরের নাম তাদের দেব-দেবীর ওপর অর্পণ করেছিল (সেল ১৮৮৯ পুঃ ১২৭)। এই রূপে আল লাত নেয়া হয়েছে আল্লাহ থেকে; মানাত করা হয়েছে মান্নান (Beauntiful) থেকে, জিরত নেয়া হয়েছে জব্বার (Preserver) থেকে ইত্যাদি।

অন্য দিকে এটা বলা যায় যে প্রথম দিকে মুসলিমরা তাদের পূর্বপুরুষদের দেব-দেবীর নামকে আল্লাহকে দেয়া ৯৯টি নামের সাথে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করেছিল এবং তার কিছু আভাসও এর মধ্যে পাওয়া গেছে। এই ভাবে ওয়াদ (Moongod)-এর ওদুদ (The loving)-এর সাথে সাদৃশ্য আছে; মুনিম, যা উত্তর আরবে পূজিত হতো, সাদৃশ্য রয়েছে আলমানি (The with holder)-এর সাথে; সাল্‌স তাইমাদের দেবতার নাম মিশে আছে আল-সালাম (The peaee)-এর সাথে; কাউস বা কাইস যাকে আল-মানাতের সাথী বলে বিবেচনা করা হতো তার নাম মিশে আছে আল-কাবী (The strong)-এর সাথে; উত্তর আরবের দেবতা আজিজ আল-আজিজ (The Mighty)-এর সাথে অপরিবর্তনীয় রয়েছে; ঈশ্বরের (God) প্রাক-ইসলামী পদবি আল-রহমান (The merciful) এবং আল রহিম (The compassionate) পরিবর্তন ছাড়াই রয়ে গেছে।

এটা ঐতিহাসিক সত্য যে কোরানের সূরার (chapter) নামকরণও বর্তমান আকারে সাজানো হয়েছে প্রফেট মোহাম্মদের মৃতুর পর এবং যারা সংকলন করেছেন এবং এই সংকলনে সাহায্য করেছেন তারা বেশ কয়েকটি সূরার নাম দিয়েছেন প্যাগন দেবতার। যেমন তারিকা (সূরা ৮৬) নক্ষত্র দেবতার নাম; হিমিয়ারদের দেবতার নাম

www.pathagar.com

নসর ১১০ সূরার নাম। শামস্ সৌর দেবীর নাম (মধ্যপ্রাচ্যে ব্যাপকভাবে পূজিত) দেয়া হয়েছে সূরা ৯১-এ।

২.১১ আল্লাহর কন্যা (বানাতাল্লাহ্)

তিনজন নারীদেবতার নাম উল্লেখ আছে কোরানে (৫৩ঃ১৯) আল্লাত, উজ্জা এবং মানাত। হেজাজের এই তিন দেবী গ্রহমণ্ডলীর সভানেত্রী। এদের আল্লাহ কন্যা (বানাতাল্লাহ্) বলা হয়।

কোনো কোনো পণ্ডিত মনে করেন যে আল-লাত-এর নাম টানা হয়েছে আল্লাহর নাম থেকে কেননা আল শব্দটা পুরুষ প্রকৃতি। নাবাতিয়ানরা একে যুদ্ধের দেবী বলে মানত। হেরোডোটাস আললাতকে আরবদের মহান দেবী বলে উল্লেখ করেছেন। এর সাথে অন্য দুটি দেবী উজ্জাকে বলা হয় আরবের প্রেমের দেবী, তার থানে বলির ব্যবস্থা ছিল এবং মানাত ছিলেন ভাগ্যের দেবী। নাবাতিয়ানদের কাছে এই দুই দেবী অজানা ছিল না। কাবাঘরে তাওয়াফের সময় প্যাগন কোরাইশরা এই দেবীদের নাম উচ্চারণ করত।

মক্কা থেকে চল্লিশ মাইল দূরে দক্ষিণ-পূর্বে তায়েফে আল-লাতের বিশেষভাবে পূজা হতো; মক্কা থেকে চল্লিশ মাইল দূরে পূর্বে নাখালাতে উজ্জা দেবীর পূজা চলত, আর মানাতের হতো কোদইদে, মক্কার অনতিদূরে মদিনার পথে। এখানেও অন্যান্য স্থানে তারা নারী রূপে পূজিত হতো কিংবা চার কোণা পাথর বা কালোপাথর রূপে।

৬১৬ খ্রিস্টাব্দে প্রফেট মোহাম্মদ তার বিরুদ্ধবাদীদের খুশি করার জন্য এই তিন দেবীর পক্ষে বলেছিলেন, কিন্তু কিছু সময় পরেই তিনি তার বাণী প্রত্যাহার করেন। আরবে প্যাগনদের উপাসনার কেন্দ্রভূমি ছিল তায়েফ, এখানে এই তিন দেবীর থান ছিল এবং আল-লাতের বিশাল এক মূর্তি ছিল। ৬৩০ সালে প্রফেট মোহাম্মদ এই সব আস্তানা ও মূর্তি ভেঙ্গে ফেলার নির্দেশ দেন।

২.১২ প্যাগন দেব-দেবী

প্রাক-ইসলামী আরবের দশটি দেব-দেবীর কথা কোরানে লিপিবদ্ধ আছে। আল্লাত, উজ্জা ও মানাত (৫৩ঃ১৯) জিবত ও তাগুত (৪ঃ৫৪) ঈগলের মতো নসর; সিংহের মতো ইয়াগুত; ঘোড়ার মতো ইয়াহুক; নারীর মতো সোয়া এবং পুরুষের মতো ওয়াদ (৭১ঃ২৩)

আরব ঐতিহাসিক ও বংশতালিকার হিশাম আল কালবি (মৃত ৮২০) তার পুস্তক কিতাবুল আসনাম (Book of idols)-এ মূর্তিদের একটা পরিপূর্ণ লিস্ট দিয়েছেন। এ ধরনের পুস্তক অন্য লেখকরাও লিখেছেন। আধুনিক গ্রন্থকাররা বলেছেন প্রাক-ইসলামী আরব গোত্রের মধ্যে সত্তরের বেশি মূর্তির পূজা হতো।

কাবাঘরে ও আশপাশে যেসব মূর্তি ছিল তাদের পূজা করত দক্ষিণ আরববাসী, মেসোপটেমিয়ান, প্যালেস্টানিয়ান, সিরিয়ান ও অন্যান্য প্রত্যন্ত অঞ্চলের লোক। আহমদ বে কামাল নামে এক লেখক দেব-দেবীদের একটা বড় লিস্ট তৈরি করেছেন। তাদের সাথে প্রাচীন মিশর ও আরবে পূজিত দেব-দেবীদের সাদৃশ্য আছে। বিশ্বাস

www.pathagar.com

করা হয় যে এই সব প্রাচীন মূর্তিকে নিয়ে তিনশো ষাটটি মূর্তি কাবাঘরে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল। এর মধ্যে কতগুলো ছিল লম্বা খাড়া পাথর, কতক ছিল অমার্জিত মনুষ্য ও পশু আকৃতি। আর কতকগুলো ছিল প্রাগৈতিহাসিককালের নূহের প্লাবনের সময়কালের।

অনেকে মনে করেন যে, এখন কাবাঘরে যেসব থাম বা পিলার আছে, সেগুলোর মধ্যে অনেক থাম বা পিলার সেই অরিজিনাল লম্বা খাড়া পাথরের উপর নির্মিত। প্রাক-ইসলামী যুগে মক্কায় যে বাৎসরিক তীর্থ মেলার রেওয়াজ ছিল, তখন পশু বলি হতো এই সব দেবী-দেবতার বেদীমূলে। (ইসলাম আগমনের পর কাবাঘরের চত্বরে রক্তপাত বন্ধ করা হয়।) প্রফেট মোহাম্মদের জন্মের বহু পূর্বে এখান থেকে এক খণ্ড লম্বা পাথর, কথিত আছে, পশ্চিম ইন্ডিয়ার সোমনাথ মন্দিরে শিবলিঙ্গ রূপে প্রতিষ্ঠা করে পূজা করা হতো। ১০২৪ খ্রিস্টাব্দে গজনীর সুলতান মাহমুদ কর্তৃক এই মন্দির আক্রমিত হয় ও মূর্তি ধ্বংস হয়।

আরব গোত্রে অন্যান্য দেব-দেবী যারা পূজিত হতো তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো :

দেদানে ভাগ্যের দেবতা ছিল গাদ্দ। রাবিয়া গোত্রের দেবতা ছিল রোধা; এর প্রতীক ছিল সন্ধ্যাতারা। কিনানা গোত্রের দেবতা ছিল সাদ। এর আকৃতি ছিল লম্বা পাথর। এই পাথরের পদতলে রক্ত বলির ব্যবস্থা ছিল। কোদা গোত্র পূজা করত অমার্জিত চার কোণা কালো পাথর– নাম ছিল ওকাইসির।

মুনহিব ইবন দাউস গোত্র পূজা করত জুল কাসাইনকে। এর প্রতীক ছিল হাতের দুই চেটোর মতো (Two palms of hand)।

প্যাগন তাঈ গোত্রের মনুষ্যাকৃতির মূর্তি পূজা পেত; এর নাম ছিল ফলস। প্রফেট মোহাম্মদ আলীকে কাবাঘরের মূর্তিগুলো ভাঙ্গতে পাঠান; আলী মূর্তি ভেঙ্গে ফিরে আসেন কাবাঘরে উৎসর্গীকৃত এক বিশেষ তরবারি হাতে করে। এই তরবারি জুলফিকার রূপে আলীর ব্যক্তিগত তরবারি হিসাবে রয়ে যায়। অন্য একটি বিখ্যাত মূর্তি জুলখালাসা মক্কা ও সানার মধ্যে অবস্থিত ছিল। এই জুলখালাসার আস্তানায় তীর দিয়ে ভাগ্য পরীক্ষা করা হতো। প্রফেট মোহাম্মদ বলেছিলেন রোজ কিয়ামতের আগে আবার জুলখালাসার বন্দনা শুরু হবে।

দক্ষিণ আরবের দেবতাগুলোর মধ্যে ছিল চন্দ্র-দেবতা হত্তবাস; চন্দ্র-দেবী আত্তার (ইস্তার), আকাশ-দেবতা সামাবি, সৌরদেবী দরবা আদান। এসব দেব-দেবী ছিল হিমিয়ার গোত্রের। তালাব ও রাইআম ছিল দুটি বৃক্ষ-দেবতা। এদের আস্তানায় গায়েবি খবরাখবর পাওয়া যেত। সানাতে যখন লোকজন ইহুদি ধর্ম গ্রহণ করে তখন সেখানকার মূর্তি পূজা উঠে যায় ৪১০ খ্রিস্টাব্দে। (ফারিস, ১৯৫২, পৃঃ ১০)।

মাইন শহর-রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষক বা দেবতা ছিল নাকরা। আদেন অঞ্চলে অসানি শহর রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষক দেবতা ছিল ওয়াদ। সাবার প্রধান দেবতা ছিল আলমাকা, যার বেদিতে ধূপ-ধুনা ও সুগন্ধিদ্রব্য জ্বালানো হতো। আম্মি (আংকেল) হলো চন্দ্র দেবতা। কাতাবানের দেবতা; এর আস্তানা ছিল মারিবের নিকটে।

অশুভ বা অমঙ্গলের প্রধান ছিল স্যাটান (শয়তান)। একে ইবলিসও বলা হতো।

www.pathagar.com

গ্রিক শব্দ ডায়াবোলস থেকে ইবলিস শব্দটি এসেছে। তার অধীনে কাজ করত ছোট ছোট শয়তান। এছাড়াও অশুভ অস্তিত্বের আর একটা শ্রেণী ছিল যাদের ইফ্‌রিত বলা হতো। এরা আকারে দৈত্যের মতো। তারা সব সময় মানুষের অমঙ্গল চিন্তা করত ও ভয় দেখাত।

জিন জাতির নাম-ডাক ছিল। এক বচনে জিনি। ইরানের আবেস্তাতে জাইনি। 'জাইনি' অর্থ দুষ্ট আত্মা (wicked spirit)। এই জাইনি বা জিনি আরামাইক ভাষায় ঢুকে যায়; পরে আরামাইকভাষী খ্রিস্টানরা প্যাগন গডদের জিনি বলতে শুরু করলেও শেষে দৈত্যদানোর পর্যায় নেমে আসে। স্যাটানের মতো জিনিদের আগুনের শিখা থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। এরা মানুষ বা পশুর রূপ ধরে বাতাসে, পাহাড়ে, গাছে এবং অন্ধকারে ও মরুভূমির প্রান্তরে মিশে থাকে। সাধারণত তারা গায়ে পড়ে কারো ক্ষতি করে না, তবে মাঝে মাঝে মানুষদের হয়রানি করে ছাড়ে।

কোরানে জিন নামে একটা সূরা আছে, যেখানে বলা হয়েছে যে একদল জিন কোরান শুনে মুসলমান (বিশ্বাসী) হয়ে যায় (৭২ ঃ ১)

২.১৩ প্রকৃতি পূজা

প্রাচীন বিশ্বের অন্যান্য মানুষের মতো আরবরাও প্রাকৃতিক বস্তু– যেমন গ্রহ, নক্ষত্র, পাথর, বৃক্ষ ও কূপের পূজা করত। সার্বিয়েনরা ছিল নক্ষত্র পূজারী, হিমিয়ার বাসীরা সূর্যের আরাধনা করত; আসাদ ও কিয়ানা গোত্রের লোকেরা চন্দ্রের পূজা করত, এছাড়া পূজা করত ভেনাসের ও সাইরিয়াসের (লুব্ধক নক্ষত্র)। বলা হয় যে, কাবা-ঘরকে উৎসর্গ করা হয়েছিল মহান দেবীকে বা চন্দ্র দেবতাকে।

শাহরাস্তানির মতে (মৃ. ১১৫৩) আরাবিয়ানদের মধ্যে প্রচলিত যে, কাবাতে তাওয়াফ করাটা মূলত গ্রহের কক্ষপথে ঘোরার প্রতীক (রডওয়েল, ১৯১৫, পৃঃ ৪৫৫)। তিনজন দেবী লাত, মানাত আর উজ্জা, চন্দ্র, ভেনাস গ্রহ, সাইরিয়াস (লুব্ধক নক্ষত্র)-এর ওপর সভানেত্রিত্ব করে। কোরান বলে আল্লাহ সাইরিয়াসের প্রভু (৫৩ঃ৫০)।

বহু প্যাগন গোত্রের পৃষ্ঠপোষক দেবতাদের সাথে পাথরের সম্পর্ক আছে। আরবরা কালো পাথরকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করেছে এবং এখনো করছে। বলতে কি, পাথর পূজা পৃথিবীব্যাপী ধর্মীয় আচরণ। বিভিন্ন আকারের, ঢঙের ও রঙের পাথরকে মানুষ ভক্তি-শ্রদ্ধা করেছে, অর্ঘ্য চড়িয়েছে। এইসব পাথরকে স্পর্শ করা, চুম্বন করা এবং ঘরে ও আস্তানায় প্রতিষ্ঠা করা একটা রেওয়াজে দাঁড়িয়েছিল। পাথরে পবিত্রতা আছে এটাই প্রমাণ করেছে।

নাবাতিয়ানদের দেবতা ধুশারা এবং এমেসার (এখন সিরিয়ার হোমস্) এলোগাবাল, উভয়ের আকার ও প্রতীক কালো পাথর। (এমেসার কালো পাথরটি ৬৩৬ খ্রিস্টাব্দে মুসলিম দখলের পর ধ্বংস করা হয়েছে, পাছে এটা মক্কার কাবাঘরের সাথে প্রতিযোগিতা না করে এর জন্য; আর এখানকার প্রধান খ্রিস্টান গোত্রদের নির্বাসনে পাঠানো হয়।)

অনেক রকমের বৃক্ষ ও দেব-দেবীর রূপ পরে পূজা পেয়েছিল। কোনো কোনো

www.pathagar.com

সময় আসল বৃক্ষও পবিত্রতা অর্জন করেছে, যেমন মেসোপটেমিয়ার খেজুর গাছ এবং অন্য ক্ষেত্রে বৃক্ষকে পাথর ভেবে শ্রদ্ধাভক্তি করেছে সেমেটিকেরা। আরবরা বিশেষভাবে আকাসিয়া বৃক্ষকে পবিত্র জ্ঞানে শ্রদ্ধা করত। বাইবেলের শিতিম (ছাতিম?) বৃক্ষ যা দিয়ে আর্ক (জাহাজ) তৈরি করা হয়েছিল, সে গাছ ছিল আকাসিয়া। আকাসিয়া বৃক্ষ উজ্জা দেবীর আস্তানার প্রতীক। মক্কার পশ্চিমে তিহানা উপকূলে একটা বিখ্যাত আকাসিয়া গাছ জন্মেছিল।

প্রফেট মোহাম্মদ ও তার অনুসারীগণ যখন হোদায়বিয়ায় শপথ গ্রহণ করেন, তখন একটি আকাসিয়া বৃক্ষের নিচে করেছিলেন। এই বৃক্ষটি পরে হাজীদের জন্য পবিত্র স্থান হয়ে ওঠে এবং তারা দর্শন দিতে শুরু করেন; তাই খলিফা ওমর এই গাছটি কেটে ফেলেন।

কাবার দক্ষিণ-পূর্ব দিকে সর্বজনজ্ঞাত আরবের জমজম কূপটি বড় পবিত্র। একজন দেবদূত এই কূপটির ঠিকানা হ্যাগার (হাজেরা)কে বলে দেন, যখন হ্যাগার ও তার পুত্র ইসমাইল ছাতি ফাটা তৃষ্ণায় কাতর হয়েছিলেন। জোরাস্ত্রিয়ানদের কাছেও এই কূপটি খুব পবিত্র ছিল। অনেক পুরানো আরবি কবিতার একটি চরণে এই কূপটির নাম উল্লেখ করে বলেছে যে, এখানে প্রাচীন পারস্যবাসীরা গুনগুন করে নিচু স্বরে মন্ত্র পড়ে প্রার্থনা করত, তাই এর নাম জমজম। প্রফেট মোহাম্মদ-এর আবির্ভাবের এক শতাব্দি পূর্বে এই কূপটি মজে গিয়েছিল এবং কূপের এ বদ্ধাবস্থা সংস্কার করেন প্রফেটের দাদা আব্দুল মোত্তালেব।

হাজীরা এই কূপটিকে খুব তাজিম ও শ্রদ্ধা করে, এর পানি পান করে এবং বোতলে ভরে নিয়ে দেশের বাড়িতে চলে যায়। মরণোন্মুখ রোগীরা এই বোতলের পানি চুমুক দেয় স্বর্গীয় আশীর্বাদ লাভের আশায়।

২.১৪ নারীপ্রীতি

এটা বেশ মজার ব্যাপার ও কৌতূহলোদ্দীপক, কেমন করে নারীদের জন্য এই দুর্বোধ্য ধারণা (esoteric concept) জন্মেছিল এবং তা সারা আরব জীবন মূলে প্রোথিত হয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য ধর্মের মতো, প্রাচীন আরব ধর্মে নারীপ্রীতি প্রবল ছিল। ধর্মকর্মে ও আরাধনায় নারীপ্রীতি প্রাধান্য পেয়েছে, তাই প্রাচীন মিথোলজিতে মহান দেবীদের আবির্ভাব বেশ 'কমন'।

নারী-দেবতা, যেমন আল্লাত, উজ্জা ও মানাত আরবে পুরুষের ওপর গুরুত্বপূর্ণরূপে আধিপত্য বিস্তার করেছে। এমনকি সৌর দেবতাকে আরব গোত্র মহিলা রূপ দিয়ে শামস বলেছে, যদিও চন্দ্রকে দেবতারা শাসন করেছে কিন্তু এই দেবতাকে অতি উত্তম নারীর রূপ দেয়া হয়েছে।

কাবাঘরকে প্রথমে তৈরি করা হয় কালো পাথরের যোগ্য পীঠস্থান রূপে। এই কালো পাথরকেও মহান দেবীর প্রতীকরূপে বিশ্বাস করা হয়। কাবাঘরের নাম প্রথাগতভাবে নেয়া হয় কিউব (Cube) শব্দ থেকে। সঠিকভাবে এর উৎস খুঁজতে গেলে পাওয়া যাবে এক প্রাচীন শব্দ 'কাআব' (Kaab), যার অর্থ কুমারী (Virgin)। এই ভার্জিন শব্দের সাথে মিল রয়েছে পুরাতন সেমেটিক শব্দ-মূল QBA-এতে; এই

www.pathagar.com

QBA-এর অর্থ হচ্ছে স্ত্রী-অঙ্গ (Pudenda), এমনকি আজও কালো পাথর ঘিরে কিনারার আকৃতি গমের মতো (Vulva) এবং সমস্ত পীঠস্থান (Shrine) একটি ডিম্বাকৃতি স্থানের ওপর প্রতিষ্ঠিত। দামস্কের জন (John of Damascus)–মৃত ৭৪৯- কাবা শব্দটিকে কুবার অর্থাৎ প্রেমের নক্ষত্রের সাথে সমন্বয় করেন।

মহান দেবীর অন্য আর একটি প্রতীক হলো পূর্ণচন্দ্র এবং কাবাকে এই চন্দ্রদেবীর কাছে উৎসর্গ করা হয়। আসলে আরববাসীদের রহস্যজনক সম্পর্ক হলো চন্দ্রের সাথে এবং আরবদের ভাগ্যই নির্ধারণ করে এই চন্দ্রদেবী। এমনকি আরবের মাস ও বৎসর চন্দ্রের সাথে জড়িত। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় প্রফেট মোহাম্মদের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ ঘটেছিল বদর নামক স্থানে আর বদর অর্থ 'পূর্ণ-চন্দ্র' (Frieling, 1978, P, 48)।

চান্দ্র মাসের ১/৪ অংশ হচ্ছে সাত এবং সাত সংখ্যা হচ্ছে চান্দ্র নম্বর। হেরোডেটাস উল্লেখ করেছেন যে, আরবগণ শপথ গ্রহণের সময় সাতটা পাথর ব্যবহার করে। ঐতিহাসিক মাসুদী (মৃ. ৯৫৬) লিপিবদ্ধ করে গেছেন যে, এক পুরানো বিশ্বাস মতে কাবাঘরকে উৎসর্গ করা হয়েছে সাতটি স্বর্গীয় বস্তুর ওপর। প্রাক-ইসলামী যুগে কাবাকে বাঁ দিকে রেখে সাত বার প্রদক্ষিণ করা হতো। বাঁ দিকে রাখার অর্থ হচ্ছে যে মেয়েদের স্থান পুরুষের বাঁ দিকে। সাফা ও মারওয়া পাহাড়ের মধ্যে হাজীদের সাত বার দৌড় দিতে হয়। মীনাতে সাতটা পাথর ছুড়তে হয় ইত্যাদি। পুরানো কালের কিছু রীতিনীতি এখনও পালিত হচ্ছে।

ইসলামে অন্য কোনো ধাতুর, রৌপ্য বাদে, অলঙ্কার পরিধান করা নিষিদ্ধ তাই অনেক পুরুষ ও নারী রৌপ্যের আংটি ও অলঙ্কার পরিধান করে, কেননা রুপার রঙ চাঁদের মতো। মহান দেবীর পাখি হচ্ছে কবুতর ও ঘুঘু। এই জাতীয় পাখি কাবাঘরের চত্বরে ঘুরে বেড়ায়। সেখানে বা পবিত্র শহরের কোনো অংশে এই পাখি কেউ মারতে পারে না।

মুসলিমদের পছন্দের রঙ হচ্ছে সবুজ, এই রঙ তাজা সবজির এবং মহান দেবীর পছন্দের রঙ। মুসলিম সেনাবাহিনীর পতাকা সবুজ ছিল, কোনো কোনো ক্ষেত্রে ত্রিকোণা বিশিষ্ট (Hughes, 1977, P. 607)। এই সবুজ রঙ মেয়েদের বোঝায়। উমাইয়াদের রঙ ছিল সাদা, আব্বাসীদের কালো; কিন্তু ফাতিমিদের (প্রফেটের বংশধর) রঙ ছিল সবুজ।

আল্লাহকে আহ্বান করার রীতি হলো তাসমিয়া যাতে আল্লাহকে দয়ালু ও করুণাময় বলা হয়– এই উভয় গুণাবলি নারীদের। প্রথাগতভাবে বলা হয় যে কোরানের বাণী বহন করে এনেছিলেন গ্যাব্রিয়েল (জিব্রাইল), যিনি আধ্যাত্মিকভাবে চন্দ্রের সাথে জড়িত। প্রফেট মোহাম্মদও কোরানের কিছু আয়াত পেয়েছিলেন সাকিনার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে; সাকিনা হলো আল্লাহর আত্মার নারী অংশ বিশেষ।

উল্লেখ্য যে, ক্রিসেন্ট বা নতুন চাঁদের অবয়ব মূলত ভেনাস গ্রহের প্রতীক এবং ইস্তারেরও; পরবর্তীতে কুমারী মেরির প্রতীক রূপে খ্রিস্টানরা গ্রহণ করেছে। খ্রিস্টীয় নবম শতাব্দির পর থেকে ভিনিস, নেপলস, কনস্ট্যান্টিনোপল এবং অন্যান্য স্থানে খ্রিস্টান যুদ্ধবাজগণ ও সামন্তগণ ব্যাপকহারে মাতা মেরির নামে ক্রিসেন্ট ব্যবহার করেছে। ১৪৫৩ খ্রিঃ যখন কনস্ট্যান্টিনোপল অটোমেন তুর্কিরা দখল করে তখন

www.pathagar.com

বিজয়ের চিহ্ন স্বরূপ তুর্কিরা বাইজানটাইন প্রচলিত শাসন ব্যবস্থাকে গ্রহণ করে নেয়। এই তুর্কি থেকেই মুসলিম বিশ্বে তাদের পতাকায় ক্রিসেন্ট (অর্ধচন্দ্র) ব্যবহার করতে শুরু করে।

প্রাক-ইসলামী আরব গোত্রে প্রায় সকলেই চান্দ্র-বৎসর অনুসরণ করত এবং প্রফেট মোহাম্মদ তাই চালু রাখেন এবং মুসলিম পালা-পার্বণ এখনো এই চান্দ্র বৎসরেই পালিত হয়। প্রাচীন আরবে প্যাগন কমিউনিটি গণসম্মেলনের (জুমা) জন্য শুক্রবারকে গ্রহণ করেছিল, কারণ শুক্রবার চন্দ্রের কাছে উৎসর্গীকৃত এবং পরবর্তীতে মুসলিমরা 'সাবাত' হিসাবে এই শুক্রবারকেই বেছে নেয়। মুসলিম সনের প্রথম দিন ছিল শুক্রবার।

ইসলামী যুগে বড় বড় মসজিদে (জুমা মসজিদ) পরিচর্যাকারীরা ছিল খোজা (eunuchs)। চতুর্দশ শতাব্দির শেষের দিকে মরোক্কোর পরিব্রাজক ইবনে বতুতা বলেছেন যে, মদিনার মসজিদ-ই-নববীতে পরিচর্যাকারীরা ছিল খোজা এবং তাদের প্রধান ছিলেন একজন আবিসিনিয়ান যার মর্যাদা ছিল একজন আমিরের মতো। খোজাদের এই সূত্র খুঁজতে গেলে পাওয়া যাবে ফ্রিজিয়া (Phrygia), ইফেসাস (Ephesus) এবং অন্যান্য স্থানের মহান মাতার মন্দিরগুলোতে।

মৃত্যু, শেষকৃত্য এবং এর সংশ্লিষ্ট সব অনুষ্ঠান হতো মহান দেবীর আস্তানাতে (in the shrines of the Great Godess)। এমনি আনুষ্ঠানিক কৃত্যকর্ম সংঘটিত হতো আরাবিয়ান মন্দিরে। কাবাঘরের আশপাশে বহু মহাপুরুষের সমাধি আছে বলে কথিত (A.J. Wensinck, in SEL 1974 P. 197) এবং জানা যায় যে মৃতদেহ নষ্ট হবার পূর্বে শোভাযাত্রাসহকারে এই সব পীঠস্থানে নিয়ে আসা হয়।

পৌত্তলিক যুগে নারী-পুরুষের সঙ্গম প্রক্রিয়া, বেশ্যাবৃত্তি, সমকামিতা, অন্যান্য যৌন আচরণের কর্মকাণ্ড এই মহান দেবীর মন্দিরের চত্বরেই অনুষ্ঠিত হতো। ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে এই ধরনের আচরণ কাবাঘরের আশপাশ ঘিরে ঘটত। পরবর্তীতে এসব ঘটনা মাঝে মাঝে ঘটেছে এবং অর্থোডক্স ও হাজীদের দ্বারা এর নিন্দাবাদও হয়েছে। মাঝে মাঝে এ ধরনের রিপোর্ট পাওয়া গেছে ঊনবিংশ শতাব্দি পর্যন্ত এবং এই রিপোর্ট দিয়েছেন মুসলিম ও নন-মুসলিম উভয় পরিব্রাজকরা।

জন লুই বারখারর্ড (John Lewis Burkhardt) মক্কাতে গিয়েছিলেন ১৮১৪ সালে। তিনি লিখেছেন : The Holy Kaaba is rendered the scene of such indecencies as cannot with propriety be more particularly noticed. They were not only practised here with impunity, but almost publicly" সরল ভাষায় বলতে গেলে বলা যায় যে, পবিত্র কাবাঘরে যেসব কর্মকাণ্ড ঘটে তা দেখার মতো নয়। এসব কাণ্ড লুকিয়ে-চুরিয়ে হয় না, হয় প্রায় জনসম্মুখে।

১৮৮২ সালে মদিনা সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে চার্লস মন্টেগু ডাফটি (Charles Montagu Doughty) বলেছেন— তাস খেলা, রকবাজি করা, গাঁজা খাওয়া ও মাস্তানি সম্বন্ধে। এই সব যথেচ্ছাচার শুধু সৌদি শাসনের 'পিউরিটানিক' শক্ত হাতে দমন করা সম্ভব।

www.pathagar.com

২.১৫ ইসলাম-পূর্ব নারী

মধ্যপ্রাচ্যে প্রখ্যাত রানী ও অদম্য বীরাঙ্গনাদের কথা অজানা নেই। নিনেভের কিংবদন্তিসম সেমিরামিস শেবার রানী এবং মিশরের ক্লিওপেট্রার নাম উল্লেখযোগ্য।

আরবেও নারী প্রশাসক এবং নারী গোত্র প্রধানদের লম্বা ইতিহাস আছে যেমন রানী জাজিবা, রানী শামসি, ইয়াতি তাঈল খুনু, তুবা এবং আদিয়া। এই সব রানী ও গোত্র প্রধানরা এসিরিয়ান রাজাদের প্রতিরোধ করেছিল। লিহিয়ানাইট রাজ্যেও রানী ছিল, তারপর ছিল নাইলা যাকে যাব্বা বলা হতো, কোদাআ কনফেডারেসির রানী, যিনি ২৭০ খ্রিস্টাব্দে ব্যাবিলনের উত্তর ইউফ্রেটিস নদীর তীরে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। পালামিরাতে ছিলেন জেনোবিয়া। উল্লেখ্য যে জেনোবিয়া ও জাব্বা দুইজন আলাদা রমণী। জাব্বার বোন জুবাইবা নদীর অন্যদিকে একটি শহর শাসন করতেন। কোদাআ গোত্রের একটি শাখা তানুখ গোত্রের নেতা জাদিমা ইবন ফাহম যখন জুবাইবার এলাকা আক্রমণ করার চেষ্টা করে তখন জাব্বা একটি যুদ্ধে তাকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত ও নিহত করেন। এই রানীর কীর্তিকথা প্রথম দিকের আরবি কবিতায় উল্লেখ আছে।

প্রাক-ইসলামী আরবের কবিতা ও কাহিনী থেকে এটা প্রমাণিত যে সেই সব দিনে আরব রমণীরা উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ছিল এবং তাদের যৌন স্বাধীনতা সামাজিকভাবে অনুমোদিত ছিল। প্রাক-ইসলামী আরব সমাজ ছিল মাতৃতান্ত্রিক এবং মাতৃ ধারায় সন্তানগণ পরিচিত ছিল। এটা জানা জরুরি ছিল একটি শিশুর পিতার চেয়ে মাতার পরিচয় জানার।

প্রাচীন আরব সমাজে শিশুরা মায়ের পরিবারে বাস করত এবং সেই পরিবারভুক্ত ছিল। আরবে, শহরে এবং বেদুইনদের মধ্যে বংশ তালিকা খোঁজা হতো মায়ের বা নারীর পূর্ব মাতৃগোত্রে এবং নারী ও পুরুষ উভয়ের মায়ের গোত্রভুক্ত বলে বিবেচিত হতো। মাতৃতান্ত্রিক সমাজে পরিবার প্রধান ছিল মা এবং তার মৃত্যুতে নেতৃত্ব চলে যেত অন্য নারীতে। সম্পত্তি, উত্তরাধিকার, সাম্প্রদায়িক প্রশাসন এবং সামাজিক মর্যাদা সবই দেখাশোনা করত মা, বোন, কন্যা, খালা বা অন্য আত্মীয়।

আল-বোখারী (মৃ. ৮৭০) বলেন যে প্রফেট মোহাম্মদকে এক ব্যক্তি তিন বার জিজ্ঞাসা করেছিল বাপ-মা-এর মধ্যে শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি কে? তিনি জবাব দিয়েছিলেন তিন বারই মা। এর পর চতুর্থ বার জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেন বাপের অবশ্য একটা দাবি আছে তবে মায়ের বেশি।

সমাজে নারীদের মর্যাদা ছিল এবং তারা ছিল ঘোমটাবিহীন, কোনো পর্দা ছিল না। তারা পর্দা ব্যবহার করত লজ্জা ধারণ করার জন্য কিংবা নিজেদের পরিচয় গোপন করার জন্য; এছাড়া তারা পর্দা না করেই মুক্তভাবে সমাজে চলাফেরা করতে পারত। নারী-পুরুষের মেলামেশা ও প্রেম সমাজে স্বীকৃত ছিল। ব্যভিচার পাপ বলে গণ্য হতো না, তবে পারিবারিক সম্পত্তির অধিকার থেকে আইনগতভাবে বঞ্চিত হবার কারণ হতো। (J.Schacht in SEI, 1974, P. 658)

যদিও অবিবাহিত যুবতী মেয়েদের স্বামী বাছাই করার অধিকার ছিল না তবে মনোনীত স্বামীকে প্রত্যাখ্যান করার অধিকার ছিল এবং প্রস্তাব করতে পারত। তারা স্বামীর ঘরে নির্যাতিত হলে কিংবা অসুখী হলে বাপের বাড়ি ফিরে আসতে পারত।

www.pathagar.com

এটাও সত্য যে বিয়ের পর মেয়েরা সাধারণত বাপের বাড়িতেই থাকত। স্বামীরা মাঝে মাঝে আসত স্ত্রীদের কাছে।

আরবে তালাক বা বিবাহ বিচ্ছেদ সাধারণ ব্যাপার; হরহামেশাই হতো এবং পুরুষের সাথে নারীর সমঅধিকার ছিল এ ব্যাপারে। বেদুইন যুবতী বিধবা কিংবা তালাকী নারী নিজের তাঁবুতে বাস করতে পারত এবং সেখানে ইচ্ছা করলে পুরুষ সঙ্গী রাখতে পারত (Glubb, 1717, P/28)। তারা তাদের পরবর্তী স্বামী বেছে নিতে পারত, কারো সাহায্যের প্রয়োজন হতো না। যেমন যুবক মোহাম্মদের কাছে বিধবা খাদিজা নিজেই বিয়ের প্রস্তাব পাঠান।

সাধারণত একটি নারী কেবলমাত্র কোনো সময়ে একজন স্বামী নিয়েই থাকত, তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে পলিয়ান্দ্রি (মেয়েদের একাধিক স্বামী) নিয়মস্বীকৃত থাকলে মেয়েরা একাধিক স্বামীর ঘর করত একই সময়ে। মেয়েরা ঘন ঘন বিয়ে করতে পারত ও করত এবং এই নিয়ম এমনভাবে শিকড় গেড়েছিল যে পরবর্তীতে একে উচ্ছেদ করা যায়নি। বিংশ শতাব্দির শুরুতে রক্ষণশীল পরিবারের মেয়ে ভূপালের বেগম বলেছিলেন যে, মক্কার নারীরা কমপক্ষে দশ দশটা বিয়ে করে এবং দুটো-তিনটে সংখ্যা খুবই কম। স্বামীর বয়স হলেই মেয়েরা তাকে ছেড়ে সুন্দর, স্বাস্থ্যবান ও ধনী যুবক বিয়ে করত (Muir 1912, P. 294)।

সিরিয়ার রোমান ঐতিহাসিক এমিয়ানাস মার্সেলেনাস (মৃত ৯০ খ্রিঃ) ব্যাপকভাবে মধ্যপ্রাচ্য ভ্রমণ করে তার সময়ে আরবের রীতি-নীতি বিশেষ করে সাময়িক বিবাহের (মুতা) কথা লিখেছেন। এই মুতা বিবাহ এখনও কোনো কোনো মুসলিম দেশে চালু আছে। বার্কহার্ড (Burck hardt) বলেছেন— প্রথমদিকে আরবে রীতি ছিল পরিবারের মেয়েকে, সাধারণত গৃহকর্তার স্ত্রীকে, পরিব্রাজক অতিথির কাছে রাত্রি যাপনের জন্য দেয়া হতো। এই রীতি অনেক দিন ধরে মরুগোত্র মাঝে বিরাজ করেছে। এই শিথিল সামাজিক অবস্থার কারণে আরবদের অদমিত যৌন ক্ষুধা জেগেছিল এবং সেইভাবে পার্শ্ববর্তী দেশ সিরিয়া ও মিশরবাসীদের কাছে পরিচিত ছিল।

এমিয়ানাস মার্সেলিনাস মন্তব্য করেছেন— এই যৌন ক্ষুধার কারণে আরবে নারী-পুরুষে ব্যভিচারের ঘটনা অত্যধিক বেড়েছিল। এক তালমুদিক চিকিৎসক রাব্বী নাথান লিখেছেন যে, আরবে যে পরিমাণে ব্যভিচারের ঘটনা ঘটে, পৃথিবীর অন্য কোনো দেশে এ ধরনের দৃষ্টান্ত নেই।

আরবে শিক্ষিত নারীর প্রসার ছিল এবং এদের মধ্যে কেউ কেউ বিতর্ক প্রতিযোগিতা, কবিতা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছে, বিশেষ করে মক্কার নিকট ওকাজের বাৎসরিক মেলাতে। নামকরা মহিলা কবিদের মধ্যে ছিলেন খানসা (আসল নাম তোমাদির)। ইনি মারা যান ৬১৬ সালে যখন প্রফেট মোহাম্মদ ইসলাম প্রচার শুরু করেন। সক্রিয় ব্যবসা-বাণিজ্যেও মহিলারা অংশগ্রহণ করে প্যালেস্টাইন, সিরিয়া ও পারস্যে তাদের পণ্যদ্রব্য পাঠিয়েছে উটের বহরে। প্রফেট মোহাম্মদের প্রপিতামহ সালিমা মদিনার একজন ধনী মার্চেন্ট ছিলেন এবং তিনি নিজেই তার ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা করতেন। ইনি মক্কার হাশিমকে এই শর্তে বিবাহ করেন যে তিনি তার

www.pathagar.com

ব্যবসার মালিকানা বজায় রাখতে এবং তার তালাক দেয়ার অধিকার থাকবে। প্রফেট মোহাম্মদের স্ত্রী খোদেজা বিশাল ব্যবসা-বাণিজ্য নিজেই পরিচালনা করেছেন। আবু জাহিলের মাতা পরিচালনা করতেন একটি লাভজনক পরিফিউমের ব্যবসা। আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দ সিরিয়ান বর্ডারে খ্রিস্টানদের কাছে তার পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করেছেন।

মোট কথা আরব মহিলারা নির্ভীক, স্বাধীন চেতা ও সাহসী ছিলেন। তারা প্রায় স্বামীদের সাথে যুদ্ধে গিয়েছেন এবং পেছনে থেকে সৈন্যদের ও পরিবারের সদস্যদের উৎসাহিত করেছেন শত্রুদের আক্রমণ করার জন্য। নিজের দল পিছু হটলে বা পরাজিত হলে তারা গালি দিয়েছেন, ধিক্কার দিয়েছেন এবং সময়ে সময়ে নিজেরাই তেড়ে গেছেন শত্রুদের সামনে। এই মহিলা যোদ্ধা ও বীরাঙ্গনাদের যে ট্রাডিশন তা প্রফেটের আমল পর্যন্ত চলেছিল এবং এটা জানা কথা যে কিছু কিছু মহিলা যেমন নোসাইবা প্রফেট মোহাম্মদের পক্ষে যুদ্ধে শামিলও ছিলেন।

২.১৬ প্যাগন রীতি রয়ে গেছে (Pagan survivals)

আব্রাহাম যে একেশ্বরবাদ প্রচার করে গেছেন মূলত প্রফেট মোহাম্মদ সেই একেশ্বরবাদই প্রচার করলেন এবং যেখানে পৌত্তলিকতা বা বহুঈশ্বরবাদ সেখানকার স্থানীয় প্যাগানিজম-এ হস্তক্ষেপ করেননি। তিনি মূল আরব বিশ্বাসের ভিত্তিকে নড়বড়ে না করার জন্য সতর্ক ছিলেন; তাঁর সমসাময়িক প্যাগনদের যথেষ্ট ছাড় দিয়েছিলেন। যেখানে কোনো পরিবর্তনের প্রয়োজন ছিল না, সেখানে কোনো পরিবর্তন করেননি।

তিনি প্রাক-ইসলামী পঞ্জিকা পদ্ধতির পরিবতর্ন করেননি অথবা প্যাগনদের মাসগুলোর কোনো সংশোধনও করেননি, সেগুলো রয়ে গেছে (৯ঃ৫)। প্যাগনদের পবিত্র উপাসনালয় মক্কা মাতৃনগরী (Mother city) রূপে পরিচিতি পেয়েছে (৪২ঃ৫) এবং প্রার্থনার কেন্দ্রভূমি ও বিশ্ব মুসলিমের তীর্থ ক্ষেত্র রূপে পরিগণিত হয়েছে।

প্রফেট মোহাম্মদ যে ঈশ্বরকে বেছে নিলেন তার স্থানীয় নাম 'আল্লাহ' বলে ঘোষণা করলেন, যে নাম আরবদের প্যাগন ও নন-প্যাগন উভয়ের প্রধান দেবতা ছিল ইসলামের পূর্বে। কাবাতেই তার স্থান হলো। কোরান মুসলিমদের নির্দেশ দিচ্ছে এই ঘরে প্রভুর পূজা করো (১০৬ঃ৩)। 'ঘর' অর্থ কাবা। প্যাগনদের এই পবিত্র ভূমির কোনো পরিবর্তন হলো না।

পুরানো প্যাগন অনুষ্ঠান (ceremonies)গুলো প্রায় সবই রাখা হলো এবং আজো পর্যন্ত সেই সব প্রচ্ছন্ন অনুষ্ঠানগুলো মুসলিম বিশ্বাসে জেগে রইল, এমনকি যে কালো পাথরকে প্রাচীন আরবরা পূজো করে গেছে সেই কালো পাথর হজের কেন্দ্রীয় আনুষ্ঠানিক বস্তু (the central rite of the muslim pilgrimage)।

হিজরার পূর্বে মক্কাতে এবং পরে মদিনাতে প্রফেটের প্রধান প্রধান অনুসারীদের অনেকের বিশ্বাস নড়বড়ে ছিল। এরা ছাড়া অন্যেরা ছিলেন গোঁড়া একেশ্বরবাদী, তবু তারা মনে করতেন ইসলাম গ্রহণ করার অর্থ এই নয় যে তাদের পুরানো বিশ্বাস একেবারেই পরিত্যাগ করতে হবে। আমরা দেখেছি প্রফেটের সময় একেশ্বরবাদ এমন কিছু নতুন আবিষ্কার নয়, আদর্শও নয়। শতাব্দি ধরে ইহুদি ও খ্রিস্টানদের সাথে ও

www.pathagar.com

হানিফদের সংস্পর্শে এসে একেশ্বরবাদের সাথে পূর্ব পরিচয় ছিল এবং এও জানা ছিল যে ঈশ্বর একজনই। একই সময়ে আরবদের এ-ও মনে হয়েছে যে একেশ্বরবাদের সাথে আরও ছোট ছোট দেব-দেবীদের শ্রদ্ধা মান্য করা দোষের কিছু ছিল না। অনেক আরব মক্কার প্যাগনসহ, আল্লাহকে প্রধান ঈশ্বর, স্বর্গ ও মর্তের সৃষ্টিকর্তা বলে বিশ্বাস করত (২৯ঃ৬১) এবং কোনো মন্দিরে এর প্রতিমূর্তি ছিল না। তবুও তারা অবাস্তব দেব-দেবীর অস্তিত্বে বিশ্বাস করেছে যাদের আল্লাহর সঙ্গী বা বানাতাল্লাহ-আল্লাহর কন্যা বলে বিবেচনা করা হয়েছে। এদের নিজস্ব স্থানে মূর্তি গড়ে পূজা করা হয়েছে। এদের মধ্যে কয়েকজন প্রধান দেবতার সাথে মধ্যস্থতাকারী হিসাবে পরিচিত ছিল এবং এরা পূজারীদের আল্লাহর নৈকট্য লাভে সাহায্য করত (৩৯ঃ৪)। পূজারীগণ তাদের উৎপাদিত দ্রব্যাদির একাংশ আল্লাহর জন্য এবং আর এক অংশ অধঃস্তন দেব-দেবীদের জন্য তুলে রাখত।

ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে শিথিল বিশ্বাসের কিছু মুসলিমকে কোরানের বাণী লেখার জন্য কিংবা কোরান সংকলনের কাজে নিযুক্ত করা হয় যখন কোরান সংকলিত হয়। এটা সত্য যে, ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে অনেকেই তাদের পুরানো দেব-দেবীদের কথা বাহ্যিকভাবে উচ্চারণ না করলেও স্মৃতি থেকে মুছে যায়নি।

এ ধরনের চিন্তাধারা ইহুদিদের মধ্যেও দেখা দিয়েছিল যখন তারা কেনানে প্রবেশ করে কেননা সেখানে প্রাচীন দেব-দেবীদের কেউ মুছে ফেলতে পারেনি। তেমনি মিশরীয় দেব-দেবীদের স্মৃতি জড়িয়ে কপ্‌টিক খ্রিস্টানটির সাধুদের উদ্ভব হয়েছিল। ৫৯৬ খ্রিস্টাব্দে যখন পোপ প্রথম গ্রেগরি দ্য গ্রেট সেন্ট অগাস্টাইনের সাথে নিগ্রো হাড্রিয়ান ও অন্য সাধুদের ইংল্যান্ডে পাঠান ইংলিশদের খ্রিস্ট ধর্মে দীক্ষা দিতে, তিনি তাদের নির্দেশ দিয়েছিলেন প্যাগন মূর্তিগুলো ভেঙ্গে দিতে, কিন্তু তাদের মন্দিরগুলো রক্ষা করে খ্রিস্টানদের ভজনালয় তৈরি করতে। খ্রিস্টান সাধুদের মধ্যে প্যাগন দেব-দেবীদের স্মৃতি রক্ষায় প্যাগন, খ্রিস্টান চার্চে প্যাগন মন্দির কাঠামো ধরে রাখার, খ্রিস্টান উৎসবাদিতে প্যাগন আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্ম রক্ষা করার কাহিনী সারা ইউরোপের সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য বিষয়।

প্যাগন আরবীয়া তাদের পুরানো দেব-দেবীদের পরিত্যাগ করেনি, মনে ও মগজে ধরে রেখেছিল। তায়েফবাসীদের যখন তাদের বিশ্বাসকে পরিত্যাগ করতে চাপ সৃষ্টি করা হয়, তারাও দৃঢ়ভাবে চাপ দেয় তাদের দেবতাদের ধরে রাখার জন্য। সত্যি বলতে কি, প্রফেট মোহাম্মদের মৃত্যুর পর যখন মালে গণিমতের অংশ থেকে বঞ্চিত করে তাদের ওপর আক্রমণ করার উদ্যোগ নেয়া হয়, তখন ইসলামের মিত্রদের প্রায় সকলেই দ্রুতভাবে ইসলাম থেকে আনুগত্য উঠিয়ে নিয়ে তাদের পূর্বপুরুষের বিশ্বাসে প্রত্যাবর্তন করে। প্রাথমিক ইসলামের ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পারি কেমন করে এই সব আরব গোত্র তাদের পূর্ব স্মৃতিচারণ করে প্রাক-ইসলামী যুগের কথাবার্তা বলতে শুরু করে, যে সময়ে তারা ইচ্ছামতো সুরা পান করতে পারত, গান ও কবিতা শুনতে পারত।

বর্তমানকালে উত্তর আফ্রিকা ও ইন্ডিয়ার তীর্থযাত্রীরা (হজযাত্রী) এমন সব মুসলিম সাধুদের মাজার জিয়ারত করতে যান, সে সবের অনেক স্থানই প্রাচীন প্যাগন তীর্থ ক্ষেত্র। ইংলিশ পরিব্রাজক C.M. Doughty ১৮৮৮ সালে লিখতে গিয়ে বলেছেন যে তখনও পর্যন্ত তায়েফে আল্লাত, উজ্জা, মানত, এমনকি হুবালের প্রস্তর খণ্ডের দেবীমূলে

www.pathagar.com

গোপনভাবে অসুখ-বিসুখের জন্য আরোগ্য লাভের প্রার্থনা করেছে।

পরিশেষে, প্রফেট মোহাম্মদ আরব প্যাগনদের প্রচলিত আইনের (Customary Law) বেশির ভাগ মুসলিম শরিয়া আইনের অন্তর্ভুক্ত করে গেছেন।

২.১৭ প্রচলিত আইন (Customary law)

সব আইনের মূলে মৌলিক নীতিকে বলা হয়েছে প্রাক-ইসলামিক। এটাই শরিয়া অর্থাৎ সরল পক্ষ right way (৪৫ঃ১৭)। শরিয়া কথাটা এমন শব্দ থেকে আহরিত যার অর্থ নির্দেশিত পথ বা যে পথ দিয়ে সকলেই চলে (beatentrack) (৫ঃ৫২)। জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করার জন্য, রেগুলেট করার জন্য মানুষদের এই পথ দিয়েই চলতে হবে, সমাজের ব্যক্তি জীবন ও সমষ্টি জীবন উভয়কেই।

শরিয়া সাধারণ নীতি থেকে উৎসারিত হয় সুন্নাহ, 'কাস্টম' যা প্রাক-ইসলামী সময়ে পূর্বপুরুষরা মডেল হিসাবে ব্যবহারিক জীবনে গোত্র প্রধানরা প্রতিষ্ঠা করে গেছে (Rahman, ১৯৬৬, পৃ-৪৪) এবং গোত্র সংসদের একমত দ্বারা নির্ধারিত নিয়ম (ইজমা)। এইভাবে সারা কমিউনিটিতে বিশ্বাস ও অভ্যাস গড়ে উঠেছে।

এই জ্ঞান (lore) লিপিবদ্ধ করা হয়েছে বংশানুক্রমে যা এক হাত থেকে অন্য হাতে গড়িয়েছে—একেই বলা হয়েছে 'হাদিস'। ওই 'হাদিস' শব্দটি প্রাক-ইসলামিক শব্দ (usage) যার অর্থ কাহিনী বা প্রতিবেদন (story or report); সাধারণভাবে একেই 'ট্রাডিশন' বলা হয়।

প্রচলিত আইন (Customary law) সব আরব গোত্রের মধ্যে সমভাবে প্রযোজ্য এবং সর্বক্ষেত্রে পালিত, দু'একটা যে ব্যতিক্রম ছিল না তা নয় এবং তা ছিল পরিস্থিতিনির্ভর। এর নির্দেশগুলো (Precepts) বাস্তবায়ন করা হতো সুশীল সমাজে মূল্যবোধ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে, (মুরুবা), বিশ্বস্ততা, সাহস, প্রত্যাহার, আত্মসম্মান, নিজের আত্মীয়দের প্রতি দয়া-দাক্ষিণ্য, দান ও সহনীয় মনোভাবকে জাগিয়ে তোলা। এসবের পূর্ব প্রকাশ পেয়েছে প্রাথমিক ট্রাডিশনে এবং প্রাচীন আরাবিক কাব্যে।

প্রচলিত আইন সাধারণত মানুষের প্রকৃতির প্রয়োজনে পালিত হতো যেমন ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য রক্ষা, হস্ত-মুখ প্রক্ষালন (ব্যক্তিগত, ধর্মীয় বা অশুচি অবস্থায়), চুলের যত্ন, দাড়ি ও গোঁফের বৈচিত্র্য, দাঁত ও নখের পরিচর্যা, অসুস্থ অবস্থায় যত্নবান হওয়া, এবং মৃত্যু ও সমাধিকরণ ব্যবস্থায়।

সামাজিক আচরণের ওপরও এই ট্রাডিশনের রীতি ছিল, যেমন আতিথিয়েতার আচরণ। শ্রদ্ধা, সম্ভাষণ, সালাম বা অভিনন্দন, কথাবার্তা আদান-প্রদান ও পরমত সহিষ্ণুতা, খাদ্য ও পানীয় অনুমোদিত পোশাক-পরিচ্ছদ, আনন্দদানের ব্যবস্থা (গান বাজনা, জলসা, কবিতা পাঠ ইত্যাদি) জুয়া খেলা, তীর বা অন্য উপায়ে ভাগ্য নির্ণয়, ভোজ উৎসব, চান্দ্রমাস প্রতিপালনের অনুষ্ঠান। তীর্থযাত্রা, রোজার মাসে আহার গ্রহণ না করা [সকাল থেকে সন্ধ্যা যেমন কোরানে বলা হয়েছে (২:১৭৯)] ইত্যাদি।

মহিলাদের সম্বন্ধে বিশেষ আইন; যেমন বয়ঃপ্রাপ্তি ও ঋতুমতি হওয়া; ব্যভিচার বিবাহ; পণপ্রথা, তালাক, বহুবিবাহ, উপপত্নী ব্যবহার; সন্তান-সন্ততি, দত্তক গ্রহণ এবং খাৎনা করা ইত্যাদি। গোত্র কমিউনিটিতে আইনের সমব্যবহার (উম্মাহর

www.pathagar.com

ব্যাপারে)– গোত্রে গোত্রে সমঝোতা জুরিসপ্রুডেন্স (ফিক্‌হ); শপথ গ্রহণ; সাক্ষ্য; রাজনীতি, সভা-সমিতি, কর ধার্য; সম্পত্তি ও উত্তরাধিকার, দান ও ওসিয়াত; খুন-খারাবি; চুরি, আহত করা বা অযথা নিন্দাবাদ, অর্থনৈতিক সম্বন্ধীয় যেমন– ক্রয়-বিক্রয় বস্তুর বদলে বস্তু (বার্টার) বাণিজ্যিক সংযোগ; সুদ গ্রহণ ও সুদ।

সামরিক বিষয়ে অতিরিক্ত আইন; তীর ধনুকের উপযুক্ত প্রয়োগ এবং তরবারির ব্যবহার; প্রতিভূ (hostage) গ্রহণ; পুরুষ, নারী ও শিশুবন্দিদের ওপর আচরণ; শান্তি সন্ধিকরণ; আক্রমণ রক্ত-দ্বন্দ্ব বা যুদ্ধ; প্রতি আক্রমণ ও প্রতিশোধ গ্রহণ, পবিত্র মাসে যুদ্ধ, দাস-দাসীদের প্রতি ব্যবহার; সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও দাসদাসী ক্রয়-বিক্রয়; তাদের (প্রতি) আচরণ ও মুক্তি।

ঐতিহাসিক আবুল ফিদা (মৃত ১৩৩১ খ্রি) লিখেছেন : জালেহিয়া সময়ে (প্রাক-ইসলামী) আরবগণ যেসব জিনিস করেছে, ইসলাম ধর্ম সেসব গ্রহণ করেছে। এসব হওয়ারই কথা, কারণ ইসলাম গভীরভাবে অতীতেই প্রোথিত এবং নতুন বাণী আগমনের সাথে প্রচলিত ধারণার কাঠামোকে, প্রাচীন শব্দ সম্ভারসহ কিছুটা সংশোধিত করে, নতুন ধর্মে ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে (incorporated into the new order) এবং সেখানে এগুলোর স্থির অবস্থান হয়েছে। কিছু কিছু বিষয়ে কোরানে গ্রন্থিত হয়েছে এবং বেশির ভাগই হাদিসে জুড়ে বসেছে।

www.pathagar.com

৩

ইসলাম-পূর্ব একেশ্বরবাদীগণ

মুসলিম লেখকগণ প্রফেট মোহাম্মদের পূর্বে আরবের যুগকে অন্ধকার বা অজ্ঞতার যুগ বলে উল্লেখ করেছেন শুধু প্রফেটের আশীর্বাদ ও সংস্কারকে উচ্চ আদর্শ তুলে ধরার জন্য।

কিন্তু আসলে ইসলাম আবির্ভাবের পূর্বে আরবে শক্তিশালী ধর্মীয় প্রভাব এমনকি একেশ্বরবাদ সারা পেনিনসুলাতে আরববাসীদের আলোকিত করেছিল। ইসলাম আবির্ভাবের পর, বলা যেতে পারে, আরো একটি স্টেজের আগমন হয় যা বহু কাল ধরে ধর্মীয়-সামাজিক জীবনে উন্নয়ন এনেছে, বিশেষ করে পশ্চিম এশিয়ায় ও মধ্যপ্রাচ্যে এবং এটা এখনও চলছে।

কোরানে একাধিকবার বলা হয়েছে প্রফেট মোহাম্মদের পূর্বে আরবে কোনো প্রফেটের উদয় হয়নি। (৩২ঃ২; ৩৬ ঃ ৫) তবুও এতে বলা হয় কতকগুলো প্রফেট আগে পাঠানো হয়েছিল আরব গোত্রের কাছে একেশ্বরবাদ প্রচার করতে ও তাদের সমাজ সংস্কার করতে। এই সব প্রফেট একক ঈশ্বরের বাণী বহন করে এনেছিলেন এবং মূর্তিপূজার বিরুদ্ধবাদী ছিলেন এবং সেই সব দেশের লোকদের তাদের পুরানো প্রথাকে পরিহার করতে উৎসাহিত করেছিলেন। কিন্তু পরিবর্তে এই সব প্রফেট নির্যাতিত হন।

এরকম একজন প্রফেট ছিলেন (শোয়েব) ইনি মিদিয়ান গোত্রের কাছে যান (৭ঃ৮৩)। মিদিয়ান ছিল উত্তর-আরবে। তিনি তাদের পুরানো প্রথা ছেড়ে আল্লাহর পথে নিয়ে আসার চেষ্টা করেন। কিন্তু মিদিয়ানবাসীরা শোয়েবের কথা মানেনি, ফলে তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় ভূমিকম্প দ্বারা। মিদিয়ান অধিবাসীরা বাইবেলে মিদিয়ানাইন বলে কথিত। (যাত্রা পুস্তক ২ঃ১৫) এবং শোয়েব মুসার শ্বশুর জেথরো (Jethro) ছিলেন বলে তফসিরকারগণ মনে করেন। অন্য আর একজন প্রফেট ছিলেন হুদ। ওমান ও হাদ্রামাতের মধ্যে আদ গোত্রের নিকট প্রেরণ করা হয় (৭ঃ৬৩)। এখানকার অধিবাসীগণ তার কথা শোনে নাই, এজন্য তাদের দুর্ভিক্ষ দিয়ে ধ্বংস করা হয়। কেউ কেউ ইহুদি ও আরবদের পূর্বপুরুষ এবারের (Ebar) সাথে মিল খুঁজে পান। অন্যেরা বলে আদি ছিলেন ইসমাইলের পুত্র হাদার (Hadar) (আদি পুস্তক ২৫ঃ১৫)। হাদ্রামাতে হুদের মাজার আছে; যেখানে লোকজন এসে জিয়ারত করে থাকে, শিন্নি চড়ায়।

www.pathagar.com

আদ গোত্রের পুরানো শাসকদের মধ্যে একজন ছিলেন অধার্মিক সাদ্দাদ। ইনি ইরাম নগরী নির্মাণ করতে আদেশ দেন (৮৯ঃ৬)। এই নগরে বড় বড় মার্বেল পাথরের পিলার জুড়ে তিনি এখানে প্রতিদ্বন্দ্বী স্বর্গ গড়তে চেয়েছিলেন। যখন নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয় সম্রাট সাদ্দাদ ও আমাত্যবর্গ সেই নগরী দেখতে যান, কিন্তু দীর্ঘকাল যাত্রার সময় ধূলিঝড়ে তারা মরুর বালিতে ঢাকা পড়ে যান। আর স্বর্গ দেখা হয় না। লোককাহিনী হিসাবে ইরাম নগরী এখন নাকি অনেকের কাছে দৃশ্যমান মরু বালিতে কিন্তু লোকচক্ষুর অগোচরে। কেউ ইরামবাসীদের সাথে আরামিয়েনদের তুলনা করে থাকে এবং সাদ্দাদকে করে থাকে সিরিয়ান সম্রাট প্রথম বেনহাদাদের সাথে (১ কিং ১৫ঃ১৮-২০)।

তৃতীয় প্রফেট হচ্ছেন সালিহ (৭ঃ৭১) পশ্চিম আরাবিয়ায় সামুদ গোত্রের কাছে ধর্ম প্রচারে গিয়েছিলেন। এদের কথা উল্লেখ আছে ৭১৫ খ্রিঃপূর্বাব্দে দ্বিতীয় সারগনের সময়ে উৎকীর্ণ এক শিলালিপিতে। এরা এসিরিয়া রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। কোনো কোনো পণ্ডিত ব্যক্তি বলেছেন যে আরিফাক্সাদ (Arphaxad)-এর পুত্র সালাহ্‌র সাথে সালেহ মিল খুঁজে পাওয়া যায় (আদি পুস্তক ১০ঃ২৪) এবং অন্যেরা বলেন জোকতানের পুত্র শেলেফ (Sheleph)-এর সাথে মিল আছে।

কোরেশরা যেমন প্রথম দিকে প্রফেট মোহাম্মদকে অস্বীকার করেছিল কোরানে তেমনি উল্লেখ আছে সামুদবাসীরা সালেহকে অস্বীকার করে। তারা বলেছিল সে আমাদের মতোই মানুষ, সে কোনো ওহি আনতে পারে না। একজন প্রতারক মাত্র (৫৪ঃ২৫), একজন ভূতগ্রস্ত মানুষ (২৬ঃ১৫৩)। এর জন্য তারা তাদের পূর্বপুরুষের ধর্ম পরিত্যাগ করতে পারে না। (১১ঃ৬৫) সামুদবাসীরাও ভয়ঙ্কর এক ভূমিকম্পে এই নগরীসহ ধ্বংস হয়ে যায়।

সামুদ অঞ্চলটি ছিল হিজর সামুদায় প্লিনি (Thamedaei of pliny)। বাইবেলে দেদানের নামে এই নগরীর রাজধানীর নাম দেদান ছিল (Gen. ২৫ঃ২৩)। এই রাজধানী অবস্থিত ছিল মদিনা ও সিরিয়ার মধ্যবর্তী উত্তর হেজাজে। হিজরের অন্য একটা নাম ছিল মাদাই সালিহ–অর্থ সালিহর শহর। হিজর কোরানের একটি সূরার (Chapter) নাম।

পরবর্তীতে সামুদ অঞ্চল লিহিয়ানরা শাসন করেছে প্রায় ১৫৩ বছর ধরে লোহিত সাগরের পশ্চিম দিক ঘিরে। এদের প্রধান শহর ছিল এলওলা (Elola), তাইমা থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে আশি মাইল দূরে। লিহিয়ান শাসকদের মধ্যে একজন নারীসহ আট জন ছিল। এদের মধ্যে একজনের নাম তুলমে, এতে মনে হয় এরা টলেমিদের সময়কার লোক (Irvine in wiseman, 1973, P. 299)। এলওলা প্রধান শহরের চারদিক ঘিরে হেলেনিক স্টাইলে পাথরের খোদাই করা চেম্বার ছিল। হেলেনিক কাঠামোর উপাসনালয়ও ছিল; আর ছিল দক্ষিণ আরাবি লিপিতে পাথরে উৎকীর্ণ লিখন। এইসব উৎকীর্ণ লিপির প্রকৃতি ছিল একেশ্বরবাদী– এর থেকে মনে হয় এখানে হিব্রুদের প্রভাব ছিল।

৩.১ হানিফ

প্রাক-ইসলামী যুগে একেশ্বরবাদীকে সাধারণত হানিফ বলা হতো। হানিফ শব্দটি

www.pathagar.com

সিরিয়ান ক্রিশ্চান থেকে ধার করা। এর অর্থ হচ্ছে সেই সব মানুষ যারা পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করে এক ঈশ্বরে বিশ্বাসী। ইসলামের প্রাথমিক যুগে হানিফ শব্দকে ঘিরে চার ধর্ম আবর্তিত; যেমন জোরাস্ত্রিয়ান, ইহুদি, খ্রিস্টান ও সাবিয়েন। এরা সকলেই বিশেষভাবে কোরানে স্বীকৃতি পেয়েছে (২২ ঃ ১৭) [সাবিয়ান অবশ্য সাবার অধিবাসী সাবিয়েনদের থেকে পৃথক ধরা হয়।]

সাবিয়ান শব্দটি শিথিলভাবে ব্যবহৃত হয় কয়েক গ্রুপের লোকজনদের জন্য যারা সেথ, ইনোক (ইদ্রিস) বা নোয়াহ ধর্ম পালন করত; পশ্চিম ইরাকের জ্ঞেয়বাদী (Gnostic) জুদো-খ্রিস্টান ব্যাপ্টাইজড গোষ্ঠী। এই গোষ্ঠী এখনও এই অঞ্চলে টিকে আছে মান্দায়েন নামে এবং যারা তাদের বিশ্বাস ত্যাগ করে অন্য ধর্মে চলে গেছে যেমন প্রফেট মোহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা যাদের প্যাগন সমসাময়িক গোত্ররা সাবিয়ান বলত। (Hughes, 1799 P557)

সাধারণভাবে সাবিয়ান শব্দটি প্রযোজ্য হতো প্রাচীন আরমাইকভাষী উত্তর মেসোপটেমিয়ার হারবানবাসীদের জন্য। বাইবেলে এই শহরের নাম প্রায়ই উল্লেখিত হয়েছে (আদিপুস্তক-১১ ঃ ৩১)। হারবানবাসীরা নক্ষত্র পূজা করত ও এঞ্জেলদের শ্রদ্ধা-মান্য করত। সেলুসিডদের সময় এই সাবিয়েনরা হেলোনস্টিক প্রভাবে ছিল–হারবান চার্চ ফাদারদের কাছে হেলেনোপলিস বলে পরিচিত ছিল। এরা বিজ্ঞান বিষয়ক নিয়ে লেখাপড়া করত। অনেক যুগ ধরে এরা ইসলামের অধীনে ছিল এবং ইসলামী সভ্যতায় এদের অবদান গুরুত্বপূর্ণ। একজন বিশপের অধীনে হাররানে একটি খ্রিস্টান (মনোফিসাইট) কমিউনিটি ছিল।

ইহুদি বা খ্রিস্টান প্রভাবে আরব গোত্রে পঞ্চম শতাব্দিতে দেখা দিতে শুরু করে 'হানিফ' সম্প্রদায় এবং এরা স্থানীয় সংস্কারক ছিলেন। হানিফ এবং তাদের অনুসারীরা নিয়মসিদ্ধ সম্প্রদায় ছিল এবং এরা যা বিশ্বাস করত তাই শিক্ষা দিত। এদের মূল কর্মস্থল ছিল হেজাজ ও মক্কার শহর এলাকা। ইয়েথরেব (মদিনা) ও তায়েকও এদের কেন্দ্রস্থল ছিল এবং প্রফেটের সময় পর্যন্ত এই হানিফ সম্প্রদায় তাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল।

গাজার এক খ্রিস্টান ঐতিহাসিক সজোমেনাস (Sozomenus) মৃত ৪৪৩ লিখেছিলেন যে কিছু আরব ইসমাইলাইট যারা আব্রাহামের বংশধর বলে দাবি করত–চেষ্টা করত তাদের ধর্মে প্যাগন দুর্নীতি মুছে ফেলতে। তারা খোলাখুলিভাবে গোত্রের মানুষদের পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে সমালোচনা করত এবং চেষ্টা করত সংস্কার করতে যাতে আব্রাহামের ধর্ম (মিল্লাত ইব্রাহিম)কে পুনরুদ্ধার করা যায়।

সত্যের সন্ধানে হানিফরা আল্লাহর একত্বের ঘোষণা করত (তৌহিদ)। তারা ঈশ্বরকে আর-রহমান (দয়ালু) উপাধি দিয়েছিল, আর দিয়েছিল আর-রব (প্রভু) এবং আল গফুর (ক্ষমাশীল)। তারা রোজ কিয়ামত ও পুনরুত্থানে বিশ্বাস করত এবং সাধু ব্যক্তিকে স্বর্গবাসের কথা বলত; তারা দুষ্টদের দোযখ আজাবের কথা বলে মানুষদের সাবধান করত।

ইবন ইসহাকের মতে, হানিফরা বিশ্বাস করত যে তাদের সহযোগী আরবরা আব্রাহামের ধর্ম থেকে সরে গেছে এবং বলতে গেলে তাদের এখন কোনো ধর্মই নেই।

www.pathagar.com

তারা বহুবাদিতার বিরুদ্ধে, আল্লাত ও উজ্জার পূজার বিরুদ্ধে এবং কালো পাথরের পূজার বিরুদ্ধে মতবাদ প্রচার করত। তারা বলত পাথরের চারদিক ঘিরে তোমরা করছো কি? হে লোক সকল, আল্লাহর বা ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হও, বিশ্বাস আনো; পাথরের ওপর বিশ্বাস করে পূজো করে কোনো ফল হবে না। তারা অন্যান্য প্যাগন রীতিনীতির নিন্দাবাদ করত। যেমন জীবন্ত বালিকা শিশুদের জীবন্ত গোর দেয়া এবং তাদের এই প্রচারের কারণে এই জঘন্য প্রথা আস্তে আস্তে কমে আসছিল। তারা মানুষের দায়িত্ব সম্বন্ধে প্রচার করত। সত্য ধর্ম সম্বন্ধে ওকালতি করত। আর স্বচ্ছ নৈতিক জীবনযাপনের পক্ষে বলত। দুস্থদের প্রতি অনুদান, রোগীদের সেবা, দরিদ্রের সাহায্য করা, অনাথদের কল্যাণ, বিধবাদের নিরাপত্তা এবং অভাবীদের দুঃখ মোচন, দাস-দাসী ক্রয় এবং তাদের মুক্তি দেয়া হানিফদের প্রধান কর্মকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

খ্রিস্টান সাধুদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে হানিফরা নির্ধারিত সময়ে নিয়মিত প্রার্থনা করত। কেউ কেউ তাদের মাথা কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখত (দিথার), আরাধনায় সাহায্য করত এবং ঐশী বাণীতে আগ্রহী ছিল। এছাড়া ইহুদিদের তিসরি মাসে দশ দিন উপবাস পালন, খ্রিস্টান সাধুদের লেন্টের সময় শৃংখলা পালন ইত্যাদি দেখে তারা নিজেদের মধ্যেও আত্মশুদ্ধির চেষ্টা করত।

প্রত্যেক বছর পবিত্র রমজান মাসে তারা জাগতিক কাজকর্ম থেকে নিজেদের সরিয়ে সারা মাস আত্মশুদ্ধি করত, একে বলা হতো 'তাহানুথ'। তারা মদ্যপান, যৌনকর্ম থেকে বিরত থাকত, সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত প্রতিদিন উপবাস করত। ইবনে হিশাম ও অন্যান্য পণ্ডিত ব্যক্তিরা তাহানুথ শব্দ থেকে হানিফদের মতো সুশৃংখল জীবনযাত্রা নির্বাহের পদ্ধতি খুঁজে পান।

রমজান মাসে মক্কার হানিফরা শহরের চারদিকে পাহাড়ে ও গিরিগুহায় চলে যেত এবং নির্জনে মরুর অঞ্চলের নিস্তব্ধতার মাঝে নিজে আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে স্বর্গীয় নৈকট্য লাভের চেষ্টা করত। এদের মধ্যে এই পদ্ধতি অনুসরণ করতেন প্রফেট মোহাম্মদের দাদা আবদুল মোত্তালেব। (মৃ. ৫৭৮ খ্রিঃ)। তার জীবনীকার আল জুহুরী (মৃ. ৭৪২) বলেন– আবদুল মোত্তালেব হেরা পর্বতের গুহায় উপবাস অবস্থায় নির্জনে আরাধনা করতেন। আবদুল মোত্তালেব যে হানিফ ছিলেন, আল জুহুরীর বক্তব্য থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়।

এটা স্পষ্ট যে প্রফেট মোহাম্মদের আবির্ভাবের অনেক পূর্ব থেকেই ইসলামের মৌলিক ধারণা মক্কার বাতাসে উড়ে বেড়াত এবং মক্কাবাসীদের প্রভাবিতও করেছিল। ওয়েলহসেন বলেন– প্রফেট মোহাম্মদের পূর্বে আরবে হানিফ সম্প্রদায় আরবে ইসলামের বর্তিকা প্রজ্বলিত করেছিল। স্প্রেঙ্গারের মতে Islam is the fruit of the Hanif tradition– হানিফ ট্রাডিশনের ফলস্বরূপই ইসলাম, যার মূলাধার প্রফেট মোহাম্মদের সময় পর্যন্ত সারা আরবে বিস্তৃতি লাভ করেছে।

মুসলিম ঐতিহাসিকরা উল্লেখ করেছেন প্রথমে প্রফেট মোহাম্মদের সঙ্গী ছিলেন ১২ জন এবং তারা সকলেই হানিফ, এছাড়া আরো অনুসারী ছিলেন যারা হানিফ। তাদের মধ্যে ছিলেন ওসমান ইবন হোয়াইরিথ; তিনি ছিলেন আসাদ গোত্রের; জায়েদ ইবন আমর যার সঙ্গে মোহাম্মদের পরিচয় হয় ৫৯৫ খ্রিস্টাব্দে; ওয়ারাকা যিনি সব

www.pathagar.com

সময়ে মোহাম্মদকে উৎসাহ দান করেছেন। ইয়াদ গোত্রের কুসবিন সায়দা, ওবাইদুল্লাহ ইবন জাহান, তায়েফের উমাইয়া এবং আবু আমির- এরা দু'জনেই প্রফেটের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। আউস গোত্রের আবু কায়েস, প্রফেটের মদিনায় হিজরতের পর, ইনি হজরতের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে খাড়া হন এবং মৃত্যু পর্যন্ত এই অবস্থানে ছিলেন। কেউ কেউ বলেন ইনি পরে মুসলিম হন।

এই হানিফদের মধ্যে চার জন প্রফেটের আত্মীয়তা লাভ করেছেন, ওসমান ইবন হোয়াইরিথ, জাবেদ ইবন আমর, ওয়ারাকা এবং ওবাইদুল্লাহ এবং অনেকেই খ্রিস্টান ছিলেন। যেমন- ওসমান বিন হোয়াইরিথ, ওয়াক্কাস ইবনে মায়দা, ওবায়দুল্লাহ এবং সম্ভবত আবু আমির।

প্রফেট মোহাম্মদ নিজেই আব্রাহামকে হানিফ বলেছেন, কারণ তিনিই সর্বপ্রথম একেশ্বরবাদ প্রবর্তন করেন (২১ঃ৫২)। কোরানে মুসলিমদের ইব্রাহিমের ধর্ম পালন করতে বলা হয়েছে (৩ঃ৮৯)। তিনি ইহুদি ছিলেন না খ্রিস্টানও ছিলেন না (৩ঃ৬০) ছিলেন হানিফ (১৬ঃ১২১)।

এক সময়ে সব মুসলিমের জন্য হানিফ শব্দ ব্যবহর করা হয়েছে, কিন্তু যেহেতু প্রফেটের অনুসারীদের জন্য নির্দিষ্টভাবে এর প্রয়োগ ছিল না, এই শব্দের ব্যবহার পরবর্তীতে মুসলিম আরবে ইতিহাসভুক্ত হয়েছে।

৩.২ ইসলাম-পূর্ব ইহুদি

আরাবিয়ান ট্রাডিশন মতে মুসার সময় থেকে ইহুদিরা উত্তর আরবে বসতি করেছিল। তারপর অনেক ইহুদি নেবুচ্ছেদনজর, সেলুসিড ও রোমানদের নির্যাতন ও অত্যাচার এড়ানোর জন্য আরবে আশ্রয় নিয়েছে।

ঐতিহাসিকভাবে ইহুদিরা প্রফেট মোহাম্মদের জন্মের তিন শতাব্দি পূর্বে আরবে প্রবেশ করেছিল। ৭০ খ্রিস্টাব্দে রোমান টাইটাস-এর সময় জেরুজালেম মন্দির ধ্বংস হবার পর ইহুদিরা উত্তর আরবের লোকজনদের সাথে বসবাস করার জন্য এসেছিল। এর পরে কয়েক শতাব্দি ধরে ইহুদি গোষ্ঠী সারা আরব পেনিনসুলায় ছড়িয়ে পড়ে। এমনকি দক্ষিণে হিমিয়ারে বসতি গেড়ে বসে এবং কিছু লোকজনকে ইহুদি ধর্মে দীক্ষিত করে।

৩১৫ খ্রিস্টাব্দে আবিসিনিয়ানরা হিমিয়ার দখল করলে হিমিয়ারইট শাসক (তুববা) ও তার পরিবারবর্গ ইথরেবে (মদিনায়) আশ্রয় গ্রহণ করে। তখন মদিনায় ইহুদি সম্প্রদায়ের বিরাট বসতি। হিমিয়ারে আবিসিনিয়ার দখল বেশি দিন ছিল না এবং ৩৭৫ খ্রিস্টাব্দে মালিক কারিব বলে এক আরব ইহুদি এবং তুব্বার আত্মীয়, হিমিয়ার থেকে বিদেশীদের তাড়িয়ে সে আরব বংশ পুনরুদ্ধার করে।

তার উত্তরাধিকারী ও পুত্র আসাদ আবু কারিব (মৃ. ৪১৫) ইথরেবে গিয়ে ইহুদি ধর্মে দীক্ষা নেয় এবং ফিরে এসে হিমিয়ারে ইহুদি ধর্মকে রাজধর্ম বলে ঘোষণা দেয়। (ফিলবি, ১৯৪৭, পৃঃ ১১৭)। আসাদ আবু কারিব এরপর উত্তর দিকে অভিযান চালিয়ে ইথরেব আক্রমণ করে প্যাগনদের উৎখাত করে ইথরেব শহরকে ইহুদি শহরে পরিণত করার পরিকল্পনা নেয়। কিন্তু কোরাইজা গোত্রের দু'জন রাব্বি তাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে

www.pathagar.com

এ পরিকল্পনা পরিত্যাগ করতে বলে।

যখন আসাদ এর পরিবর্তে মক্কা নগরী আক্রমণ করতে ইচ্ছা প্রকাশ করে তখনও এই দু'জন রাব্বি এই অভিযানের বিরুদ্ধে পরামর্শ দেয়, কারণ দেখিয়ে বলে এই নগরী প্রাচীন পবিত্র নগরী, একে ধ্বংস করা উচিত হবে না। রাজা আসাদ তখন মক্কা নগরীতে উপস্থিত হয়ে ইয়েমেনি বস্ত্র দিয়ে কাবাঘরকে আচ্ছাদিত করে এবং এই সময় থেকে কাবাকে কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখার প্রথা চালু হয়; একে কিস্‌ওয়া বা গিলাফ বলা হয়। (Esin 1963, পৃষ্ঠা ৫১)

ইহুদি ও খ্রিস্টান দক্ষিণ আরবে একসাথে ৫২৪ খ্রিঃ পর্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করেছে যখন হিমিয়ারের আর এক ইহুদি রাজা আসাদ আবু কবিরের বংশধরধু-নুবাস আক্রমণ করে। এই প্রতিবেশী রাজ্য খ্রিস্টান পরিপূর্ণ। ফিমিউন নামে একজন এখানে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করেছিল এবং বেশ উন্নতিও করেছিল। ধু-নুবাস নাজরান আক্রমণ করে খ্রিস্টানদের ওপর অত্যাচার শুরু করে এখনকার রাজা হারিথকে হত্যাও করে। আর যারা ইহুদি ধর্ম গ্রহণ করতে অস্বীকার করে তাদের জ্বলন্ত কুণ্ডে নিক্ষেপ করে।

মনে হয় এ ঘটনা সম্বন্ধে কোরানের প্রাথমিক সূরায় উল্লেখ আছে। সেখানে বলা হয়েছে উহারা তাহাদিগকে নির্যাতন করিয়াছিল শুধু এই কারণে যে তাহারা বিশ্বাস করিত আল্লাহতে– ধ্বংস হইয়াছিল কুণ্ডের অধিপতিরা ইন্ধনপূর্ণ যে কুণ্ডে অগ্নি ছিল (৮৫ : ৪, ৫, ৮)। এতে বোঝা যায় যে কোরান খ্রিস্টানদের সত্যিকারের বিশ্বাসী বলে গণ্য করেছে, পরে অন্য ব্যাখ্যাকারীরা মনে করেন যে এখানে নবুচ্ছেদনজর যে তিনজন ইহুদিকে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করেছিল সেই কথা এখানে বলা হয়েছে (Dan. ৩. : ২০)।

ধু-নুবাসের অত্যাচারের ফলে যে মানুষটি প্রাণে বেঁচে যায় তার নাম দাউস ধুথালাবান; সে বাইজানটাইন সম্রাট ১ম জবাস্টিনের দরবারে পালিয়ে যায় এবং একটি অর্ধদগ্ধ গসপেল দেখিয়ে এর প্রতিশোধ নিতে বলে। সম্রাটের অনুরোধে ৫২৫ খ্রিস্টাব্দে আবিসিনিয়ার রাজার সৈন্যবাহিনী ধুনুয়াসকে আক্রমণ করে পরাজিত করে (পরে তারই প্রজাদের দ্বারা নিহত হয়)। বিজয়ী আবিসিনিয়ার রাজা সুমিয়াফাকে গভর্নর করে দেশে ফিরে আসেন। সুমিয়াফা পরে তার প্রতিদ্বন্দ্বী আবরাহা কর্তৃক গদিচ্যুত হয়।

৩.৩ ইসলাম-পূর্ব খ্রিস্টান

নিউ টেস্টামেন্টে বর্ণিত (Acts ২ : ১১) যে ইহুদি এক পর্বের দিনে (পেন্টিকস্ট) জেরুজালেমের উপস্থিত লোকজনদের মধ্যে কিছু আরাবিয়ান ছিল তারা প্রফেট বর্ণিত সু-সমাচার শুনছিল। সেন্ট পল লিখেছেন (গলসীয় ১ : ১৭) এই ঘটনার পর তিনি আরবে যান, কিন্তু সেখানে গিয়ে কি ঘটল তার বর্ণনা দেননি। সেন্ট পল সিনাই অঞ্চলে পেট্রাতে গিয়েছিলেন।

আরবে বহু পূর্ব থেকে কিছু ধর্মান্তরিত খ্রিস্টান ছিল এবং তাদের মধ্যে কিছু নামকরা লোকও ছিল। বিজ্ঞে মোনাইমাস (মৃ. ১৮০) এবং সাধু ভেলেরিয়াস (২৫০ খ্রিঃ) অরিজেনের শিষ্য ছিলেন এবং ভেলেরিয়ান গোষ্ঠীয় প্রতিষ্ঠান। এই দুইজন আরব

www.pathagar.com

খ্রিস্টানদের মাঝে বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন এবং খ্রিস্টান চার্চে অবদানও রেখেছিলেন। সেন্ট সাইমন স্টাই লাইটস্ (মৃ. ৪৯৯) একজন আরব ছিলেন এবং তিনি গসপেলও প্রচার করেন।

মিশনারি ও সাধু-সন্ন্যাসীরা মধ্যপ্রাচ্যে খ্রিস্ট ধর্ম প্রচার করেছে এবং অনেকেই সেখানে পাকাপাকিভাবে ব্যবসা শুরু করে। (যেখানেই তারা বসতি করছে, সেখানেই চার্চ নির্মাণ করে মঠ তৈরি করেছে, বিধর্মীদের ধর্মান্তর করেছে, শিক্ষা ও সংস্কৃতির উন্নতি সাধন করেছে এবং যে অঞ্চল তারা দখল করেছে সেখানে নিজেদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তার করেছে। মিশনারি ছাড়া খ্রিস্টান ব্যবসাদার ও কারিগররা আস্তে আস্তে আরবের বড় বড় শহরে ছড়িয়ে পড়ে। তারা ছিল শান্তিকামী, পরিশ্রমী এ ধর্মের প্রতি নিবেদিত।

সিরিয়া, প্যালেস্টাইন ও মেসোপটেমিয়ায় প্রধান শহরে অনেক আরব বিশপের বাস ছিল এবং অনেক বিশপ তাদের আরবি নাম রেখেছিলেন। প্রফেট মোহাম্মদের জন্মের তিন শতাব্দি পূর্বে খ্রিস্ট ধর্ম আরব পেনিনসুলার রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করেছিল এবং ব্যাপকভাবে এর প্রসার ঘটেছিল। উত্তরে চার্চগুলো বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের মিশনারিরা প্রতিষ্ঠা করেছিল, দক্ষিণে হাদ্রামাত ও ওমানে চার্চ করেছিল ইন্ডিয়ান মিশনারিজ, ইয়েমেনে ও হিজাজে করেছিল আবিসিনিয়ার মিশনারিরা। ৬ষ্ঠ শতাব্দির মাঝামাঝি আরাবিয়া খ্রিস্টানদের, বলতে গেলে, কেন্দ্রভূমিতে পরিণত হয়।

ইসলামের আবির্ভাবের এক শতাব্দি পূর্বে যিশু ও তার অনুসারীদের সম্বন্ধে ট্র্যাডিশন মধ্যপ্রাচ্য ও আরবে বহুল প্রচারিত ছিল। সিরিয়া ও প্যালেস্টাইনে খ্রিস্টানরা তাদের বিভিন্ন রকমের গসপেল, এমনকি গসপেলের বাইরের পুস্তকেও, যিশুখ্রিস্ট সম্বন্ধে বিভিন্ন কাহিনী তৈরি করে প্রচার করেছে। এই অঞ্চলের সাধারণ ভাষা ছিল সিরিয়াক (খ্রিস্টান আরামামাইক) এবং এই ভাষাতে তাদের বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছে।

আলেক্সান্দ্রিয়া, রোম, কনস্ট্যান্টিনোপল এবং অন্যান্য স্থানে খ্রিস্টান ধর্মীয় বিভেদ ও মতবাদ সম্বন্ধে আরবের খ্রিস্টানরা অবহিত ছিল। সত্য বলতে কি, সিরিয়ান-খ্রিস্টান এর মধ্যে যে ভেদ বা দলাদলি তাকে 'শিয়া' (ফ্যাকশন) বলা হতো, এই শিয়া আরবি শব্দে ঢুকে দল বা গোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছে। তবে মোটামুটিভাবে আরবে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে এই ধর্মীয় দলাদলি বিশেষ প্রভাব ফেলতে পারেনি।

পূর্ব দেশীয় চার্চে খ্রিস্টানরা ছিল মনোফিসাইট (সিরিয়ান, কপটিক, আবেসিনিয়ান), ডিফাইসাইট (নেস্টোরিয়ান), এন্টি-মনোফিসাইট (মেলসাইট) আরিয়ান, নস্টিক (জ্রেয়) এবং মনিকিয়েন।

মনিকিয়েন গোষ্ঠী ছিল দ্বিত্ববাদী। এর প্রতিষ্ঠাতা একবাটানার মনি (মৃ. ২৭৬)। এর মিশনারি মধ্য এশিয়াতে বিস্তৃত ছিল– যে মনিকিয়েনিজম্ ৭৬২ সালে উইঘুর তুর্কিতে রাষ্ট্রধর্মে পরিণত হয়– পরে পূর্ব দিকে তিব্বতে প্রসার ঘটে (হফ ম্যান ১৯৬১ পৃঃ ৫২) এবং পশ্চিম দিকে নর্থ আফ্রিকা পর্যন্ত– এখানে সেন্ট অগাস্টিন এই ধর্মে দীক্ষা নেন। সেন্ট অগাস্টিন মারা যান ৪৩০ খ্রিঃ।

হিরা ও মেসোপটেমিয়াতে মনিকিয়েন কেন্দ্র ছিল এবং খোদ মক্কাতে এই মতবাদের ধারণা অজানা ছিল না। মনি দাবি করতেন যে তিনি যিশু প্রতিশ্রুত

www.pathagar.com

প্যারাক্লিট ছিলেন অর্থাৎ এডভোকেট বা আইনি উপদেষ্টা। তিনি আরও দাবি করতেন- তিনি শেষ ও ফাইনাল প্রফেট। এই প্রফেটের ধারায় বা সিলসিয়ায় (in prophetic succession) এবং তিনি ঐশীবাণী প্রাপ্ত। তিনি এমনও বলেন যে যিশু ক্রুশবিদ্ধ হননি, তার পরিবর্তে অন্য একজন হয়েছে। এই সব কথা বা বাক্য, অনেকের মতে, প্রফেট মোহাম্মদকে প্রভাবিত করেছে।

মনিকিয়েনদের 'সিদ্দিক' সত্যবাদী বলা হতো। প্রফেট মোহাম্মদ এই পদবি আবুবকরকে দিয়েছিলেন এবং কোরানেও একথা আছে (১৯ঃ৫৭) এনক বা ইদ্রিসকে উল্লেখ করে। মনিকিয়েনিদের মুসলিম খলিফারা বেশি হারে চাকরি দিয়েছে। কারণ এদের নিষ্ঠা, সততা, কর্তব্যের প্রতি একনিষ্ঠতা, নক্ষত্র বিষয়ে তাদের জ্ঞান, গণিতবিদ্যায় ও চিকিৎসাবিদ্যায় তাদের পারদর্শিতা এবং শিল্পকলায় তাদের দক্ষতা মুসলিমদের মুগ্ধ করত।

নেস্টোনিয়াস দ্বারা প্রতিষ্ঠিত খ্রিস্টান উপদল পারস্যতে প্রসার লাভ করে। নিস্টোনিয়াস মারা যান ৪৫১ খ্রিঃ। এরা যিশুখ্রিস্টের দ্বিত্ব প্রকৃতিতে বিশ্বাসী ছিল বলে কনস্ট্যান্টিনোপলের ধর্মগুরুরা তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, ফলে বাইজানটিয়ান থেকে তারা পারস্যে পালিয়ে যায়। খ্রিস্টের দ্বিত্ব প্রকৃতি সম্বন্ধে এদের ধারণা যে যিশুর মানুষ এবং স্বর্গীয় (divine) উভয় প্রকৃতি ছিল। পারস্য এদের স্বাগতম জানায় কারণ বাইজানটিয়াম এদের প্রতিদ্বন্দ্বী; তাই সাসানিয়ান সম্রাটের দ্বারা তারা উৎসাহিত হয়েছে। ৫৩১ খ্রিস্টাব্দে জান্দিশাপুরে নেস্টোরিয়ান বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। দক্ষিণ-পশ্চিম পারস্যে জান্দিশাহপুরে এই বিশ্ববিদ্যালয় আদর্শ হিসাবে উমাইয়া খলিফারা অনুসরণ করেন।

নেস্টোরিয়ানরা তাদের ধর্মীয় মতবাদকে বহু দূর-দূরান্তে পৌঁছে দিয়েছিল এবং স্টেসিফোন (Ctesiphon) থেকে বেজিং-এর বাণিজ্য পথ তাদের পীঠস্থানে চিহ্নিত হয়েছিল। তারা ইন্ডিয়া ও সিংহলে ধর্মীয় স্কুল ও শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছিল, এছাড়া কুর্দিস্তান, পারস্য, বেক্টেরিয়া, পার্থিয়া, সগদিয়ানা, স্কাইথিয়া, তুর্কিস্তান ও মঙ্গোলিয়া উপজাতি ভূমিতে তাদের ধর্ম ও শিল্পকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে। তারা চীন ও জাপানে মিশনারিও পাঠিয়েছিল। (Rice, 1964, P. 12)। ৬৩৫ খ্রিস্টাব্দে নেস্টোরিয়ানের একটি মিশন চীনের রাজধানীতে পৌঁছলে চীন সম্রাটের বিজ্ঞপ্তিতে তা ঘোষিত হয়েছিল। (Diringer, 1977. 9. 286)।

৩.৪ সন্ন্যাসী

অনেক নিবেদিত খ্রিস্টান সাধু মধ্যপ্রাচ্যে দরিদ্র ও রুগ্ন ব্যক্তিদের সেবা ও কল্যাণময় কর্ম করেছেন, দান-ধ্যানও করেছেন। মধ্য আরবের খ্রিস্টান তামিম গোত্রের সাসা নামে এক মহান ব্যক্তি শিশুকন্যা ক্রয় করে তাদের জ্যান্ত কবর দেয়া থেকে বাঁচাত এবং পালনও করত। তার নাতি ফারাজদাক উমাইয়াদের সময়ে একজন বিখ্যাত কবি ছিলেন। তিনি গর্ব করে বলতেন তিনি তারই বংশধর যিনি বহু শিশুকন্যাকে কবরের হাত থেকে বাঁচিয়েছেন।

গোঁড়া ধর্মীয় মতবাদে বিশ্বাসী খ্রিস্টানগণ শহুরে জীবন পরিত্যাগ করে মঠে

www.pathagar.com

সন্ন্যাস জীবনযাপন করত ঈশ্বরের আরাধনায়। মিশর, এশিয়া মাইনর, সিরিয়া, প্যালেস্টাইন, মেসোপটেমিয়া ও আরাবিয়া মরুভূমিতে এসব সন্ন্যাসীর পবিত্র স্থানের নিদর্শন পাওয়া যেত, এদের মধ্যে অনেকগুলোর নাম প্যাগন ও মুসলিম কাহিনীতে লিপিবদ্ধ আছে। পরবর্তীতে এই সব মঠের অনেকই মুসলিমরা তাদের ব্যবহারের জন্য বাসস্থানে রূপান্তর করে।

খ্রিস্টান মঠের জন্য আরবরা সিরিয়াক শব্দ 'দাইর' ব্যবহার করত এবং আরবের বেশিরভাগ মানুষ এই মঠ ও সন্ন্যাসীদের নিবেদিতপ্রাণের কথা জানত। তারা এ-ও জানত যে খ্রিস্টান সাধুরা নির্জনে একাকী বসে আরাধনা করে, এমনকি পর্বত গুহাতেও তারা নির্জনে উপাসনা করে। আর কবিরা এই নির্জন মরু উপাসনা সেন (কুঠরি) ও খ্রিস্টান সাধু সম্বন্ধে ও তাদের রাতভর উপাসনা সম্বন্ধে তারা বলেছে– রাতের নির্জনতায় শুধু আকাশের তারকারাজি তাদের এই আরাধনা ও উপাসনার সাক্ষী ছিল।

মরুভূমিতে ক্যারাভান যাত্রা পথে অন্ধকারে এই সাধু-সন্ন্যাসীদের কুটির থেকে অনেক দূর পর্যন্ত আলো দেখা যেত, এতে ভ্রমণকারীরা সাহস পেত এবং অনেক ক্ষেত্রে তারা আশ্রয় ও খাদ্যবস্তু পেত অতিথিরূপে। প্রাক-ইসলামী এক কবি লিখেছেন– এদের প্রকৃতি অন্য মানুষের মতো নয়, স্বার্থপর নয় তারা, সৎ ও নিঃস্বার্থ ছিল এবং তাদের পাওয়ার কিছু ছিল না দুনিয়াদারি থেকে।

এই সব সাধু-সন্ন্যাসীর আরাধনার পদ্ধতির সাথে আরবদের পরিচয় ছিল। প্রার্থনার সময় সাধুরা তাদের মাথা ঢেকে রাখত না, কারণ এটা ছিল ইহুদিদের প্রথা এবং এই প্রথা মস্তককে অসম্মান করার প্রথা (১ করিন্থ. ১১ : ৪)। কিন্তু যদি কেউ আরাধনা করার ইচ্ছা করত, তখন শরীরে চাদর জড়িয়ে নিত, একখণ্ড কাপড় দিয়ে মাথা ঢেকে দিত, যাতে বাইরের কোনো দৃশ্য আরাধনায় বাধা সৃষ্টি না করতে পারে।

এই সাধুদের দিনে পাঁচবার প্রার্থনার সময় এবং সময় সময় ভারি রাত্রি পর্যন্তও প্রার্থনা করত, এই বিশ্বাসে যে ঘুমানোর চেয়ে প্রার্থনা ভালো। (Archer, 1924. 67) প্রার্থনার সাথে বিভিন্ন রকম দেহভঙ্গিমা (Postures) ছিল। যেমন– দাঁড়িয়ে, দুই হাত জোড় করে বেঁধে, ঝুঁকে দাঁড়ানো (Bowingdown) এবং গোড়ালির ওপর বসা। সময় সময় সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত (Prostration)। মাটিতে কপাল ঠেকিয়ে আরবে যে প্রার্থনার প্রথাকে 'সেজদা' বলা হয়। সেজদা শব্দটি সিরিয়াক। সিরিয়ান খ্রিস্টানদের মধ্যে প্রণিপাত বা প্রসট্রেশনের জন্য যে কপালে দাগ পড়ে তাকে খ্রিস্টান সন্ন্যাসীরা অতিরিক্ত ভগবত ব্যক্তি প্রতীক (Piety) বলে মনে করত। (Andrae 1960 P. 89)। কোরানেও এ ধরনের কপালের দাগ সম্বন্ধে প্রার্থনাকারীকে (নামাজিদের) বলেছে (৪৮:২৯)।

এই গভীর প্রণিপাত করা হয় হাঁটু ভেঙ্গে বসার সময়। এই সময় বিশেষ ব্যবস্থা নেয়া হয় যাতে পেছন দিকটা বেশি ওপরে না উঠে যায়। এই প্রার্থনা পদ্ধতিকে ইহুদিরা বিদ্রূপ করত, কারণ এটা প্রাচীন ক্যানানাইটদের প্রথা এবং অনেক চার্চ পুরোহিত এ প্রথা নিরুৎসাহ করেছে। এই প্রথা ধীরে ধীরে খ্রিস্টানরা পরিত্যাগ করেছে, যদিও কোনো সময় তীর্থযাত্রায় তারা ব্যবহার করে।

ম্যাকডোনেল্ড, আর্চার ও অন্য পণ্ডিতদের মতে, ইসলাম আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য

www.pathagar.com

খ্রিস্টানদের এই প্রার্থনা পদ্ধতি গ্রহণ করেছে, বিশেষ অতিরিক্ত রাত্রিকালীন প্রার্থনা। প্রফেট মোহাম্মদের প্রাথমিক প্রচারকালে তিনি বহু খ্রিস্টান সাধু-সন্ন্যাসীদের সাথে দেখা করেছেন, আলাপ-আলোচনাও করেছেন। তিনি তাদের জীবনযাত্রার সাথে পরিচিতও ছিলেন এবং তাঁদের রাত্রীকালীন প্রার্থনা সম্বন্ধে বিশেষ করে অনেক নম্র ব্যবহারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়েছেন (৫ ঃ ৮৫)। আহলে কেতাব হিসাবে যখন তাদের কথা বলতেন, আল্লাহর প্রতি তাদের ভক্তি ও একাগ্রতা, ন্যায়বিচার ও ভালো কাজের কথা উল্লেখ করেছেন, (৩ : ১০৯ - ১০)।

যদিও প্রফেট মোহাম্মদ সন্ন্যাস জীবন অনুমোদন করেননি, তিনি বিশ্বাস করতেন খ্রিস্টানরা নিজেরাই এর আবিষ্কারক (৫৭ : ২৭)। তবু তিনি সত্যের সন্ধানে খ্রিস্টান সাধুদের এই সুশৃংখল জীবনযাত্রায় প্রভাবিত হয়েছেন। তার সময়ে অন্যান্য সত্যানুসন্ধানীর মতো তিনি খ্রিস্টান সন্ন্যাসীদের কিছু পদ্ধতি যেমন প্রার্থনার সময় মাথা ঢাকা, দিনে কয়েকবার প্রার্থনা করা এবং প্রার্থনাকালে গভীর প্রণিপাত (সেজদা) গ্রহণ করেছেন। মুসলিম ফরমুলা (তসবিব) ভোরের আজানের সময় মোয়াজ্জিন নামাজিদের ডাকে 'প্রার্থনা ঘুমের চেয়ে ভালো] এটা মরুবাসী সাধু-মঙ্কদের প্রথাকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

৩.৫ খ্রিস্টান গোত্র

ব্যক্তি ও ক্ষুদ্র দল ছাড়াও অনেক বড় বড় খ্রিস্টান সম্প্রদায় ছিল যারা আরব গোত্র সম্প্রদায় অথবা একটা বৃহৎ খ্রিস্টান জনগোষ্ঠী। আরবের প্যাগন প্রতিবেশীর মতো, খ্রিস্টান গোত্ররা প্রায় স্থান বদল করত; তাই বিশাল এলাকা জুড়ে তারা দল বা গোত্র হিসাবে ছড়িয়ে থাকত, তাই তাদের গোত্রে গোত্রে সম্পর্ক লোকজন ও মুভমেন্ট সম্বন্ধে একটা সম্যক চিত্র, লোকসংখ্যার হিসাব রেকর্ড করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি।

এই সব গোত্র দেখা গেছে বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে সিরিয়া থেকে দক্ষিণ আরব পর্যন্ত এবং ভূমধ্যসাগর এলাকা থেকে পারস্য উপসাগর পর্যন্ত। এদের অনেক প্রশাসক সাহিত্য, শিল্প ও কাব্যের গুণগ্রাহী ছিলেন। আরবি লিপি ও ভাষায় খ্রিস্টান সম্পদায়ের যথেষ্ট অবদান ছিল এবং শিল্প ও প্রসারে তাদের ভূমিকা ছিল অনবদ্য।

সিরিয়া, প্যালেস্টাইন, মেসোপটেমিয়া ও আরব পেনিনসুলা বিভিন্ন গোত্র ও কল্যাণের মধ্যে ইতিহাসে অনেকের উল্লেখযোগ্য স্থান আছে, ইসলামের পূর্বে ও পরেও। ৩০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৬০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে এমনি কয়েকটি খ্রিস্টান গোত্রের চিত্র তুলে ধরা হলো :

সিরিয়া এবং উত্তর-পশ্চিম আরবের রাজ্যগুলো গ্রেট কোদা কনফেডারেশনের শাখা দলের দখলে ছিল এবং তাদের প্রধান ছিল নুমান ইবন আমর ইবন মালিক (মৃ. ২৭০)। সম্ভবত প্রখ্যাত তানুখ প্রশাসক ছিলেন রানী মাবিয়া (মৃ. ৩৭৫), যার পক্ষে খ্রিস্টান স্বার্থ প্রচার করে গেছেন বিশপ ও সন্ন্যাসী মোজেস এবং এই বিশপের শাসনাধীনে (Diocese) ছিল অনেক যাযাবর গোত্র। রানী মাবিয়ার সময়েই এই বিশপের প্রভাব ছিল বেশি যার ফলে এর প্রচারকার্যের জন্য সিরিয়ার প্রায় আরব গোত্র খ্রিস্টানিটিতে দীক্ষা নেয়।

www.pathagar.com

তানুখ গোত্রের সাথে সম্পর্কযুক্ত বহরা গোত্র যাযাবর প্রায় ছিল যারা পালমিরা ও দামেস্কের মধ্যে চলাফেরা করত। দক্ষিণ দামেস্কের এলাকা ইটুরিয়া (Ituraea) সালিহ গোত্রের দখলে ছিল। প্রায় ৩৬৫ খ্রিস্টাব্দে সালিহ গোত্র খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করে। কোদ্দা কানফেডারেশনের আর একটি শাখা উধারা (Uddara) আধুনিক আম্মানের পূর্ব ভূমি দখল করেছিল, একটা আরবি প্রেম-কাব্যের নামও দিয়েছিল। এই সব গোত্র এবং অন্য খ্রিস্টান গোত্রের নিজস্ব বিশপ ও পুরোহিত ছিল।

প্যালেস্টাইন উপরিভাগে একটু উত্তর দিকে যে গোত্র ছিল তা ছিল বিশাল আজদ কনফেডারেশনভুক্ত। এরা নিজেদের দেবতার মূর্তি আইম (Ayim)কে সাথে নিয়ে আসে। এই গোত্র খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দিতে দক্ষিণ থেকে এদিকে উঠে আসে এবং পূর্ব দিকে ওমান এবং উত্তর দিক দিয়ে মধ্য আরব পর্যন্ত ছাড়িয়ে যায়। এই গোত্রকে ঘাসান বলা হতো– ২৫০ খ্রিস্টাব্দে এরা ট্রান্সজর্ডনে বসতি স্থাপন করে। 'Day of Halima' নামে এক বিখ্যাত যুদ্ধে তারা সিরিয়ান আরবদের পরাজিত করে তাদের রাজ্য দখল করে নেয়।

ঘাসানের রাজপরিবার মনোফিসাইট খ্রিস্টানিটি গ্রহণ করে এবং প্যালেস্টাইনের কিছু অংশ ও সিরিয়ান মরুভূমির পশ্চিম দিক শাসন করে। তাদের রাজধানী ছিল দামেস্কের কাছে এবং দ্বিতীয় রাজধানী ছিল বসরায়। রাজত্বকাল ২৯২-৬৪০ খ্রিস্টাব্দ। এককালে এই অঞ্চল ছিল নাবাতাইনদের কেন্দ্র। ঘাসানিরা অনেক চার্চ ও মঠ নির্মাণ করে এবং এই বংশের শেষ রাজার কাল পর্যন্ত খ্রিস্টানিটি বজায় ছিল। হেলেনিস্টিক সভ্যতার প্রভাবে এদের সভ্যতাও চরমে পৌঁছেছিল।

ইসলামের আবির্ভাবের পর ঘাসান গোত্র শিল্প বিস্তারের ক্ষেত্রে আরবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মুসলিম ঐতিহাসিকরা যেমন বলেছেন প্রফেট মোহাম্মদের পূর্বে জাহেলিয়া যুগে তারাই ছিল শিক্ষা-দীক্ষা ক্ষেত্রে সামন্ত গোত্র (Lord of the day of ignorarce) এবং ইসলামের যুগে নক্ষত্র স্বরূপ।

ঘাসানিরা প্যালেস্টাইনের মিত্র ছিল এবং প্রায় পারস্য সাহায্যপুষ্ট হিরা রাজ্যের লাবমিদ রাজাদের সাথে আরব গোত্রের ওপর কর্তৃত্ব দখলের যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ত। ৫২৯ খ্রিস্টাব্দে বাইজানটাইন সম্রাট জাস্টিনিয়ান ঘাসান প্রশাসক তৃতীয় হারিথ ইবন জাবালাকে 'ফাইলার্ক' (Phylark) পদবিতে ভূষিত করেন। এই পদবি মাত্র সম্রাটের নিচের পদবি এবং খুউব উচ্চস্তরের।

ঘাসানির সর্বশেষ প্রিন্স দ্বিতীয় জাবালা (মৃ. ৬৩৭) বাইজান্টাইন রাজদরবারে আশ্রয় পান। সেখানে তার যথেষ্ট সম্মান ছিল। এ ছাড়া বাইজানটাইনে মুসলিম রাজ্য থেকে অনেকে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। এদের মধ্যে তাঈ গোত্রের জাবইবন সারদাস অন্যতম। ৭১০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে, কোরেশি গোত্রের মখজুম আল-ওয়াবিসি, মুসলিম ধর্মে অনীহা প্রকাশ করে বাইজানটাইনে চলে গিয়ে খ্রিস্টান হয়েছিলেন, পরে বিবাহ করেন ও সেখানেই মারা যান। আরব গোত্রের অনেকেই এমনিভাবে দেশত্যাগ করে নিরাপদ আশ্রয় খুঁজেছে। সামোনাস নামে একজন সেরাসিন সম্রাট ৬ষ্ঠ লিওর (মৃ. ৯১২) বন্ধুরূপে বাইজাইন্টাইনে গিয়ে খ্রিস্টান মঠে সন্ন্যাস জীবনযাপন করেন।

ঘাসান এলাকার দক্ষিণে কোদা কনফেডারেশনের বালি গোত্র মধ্য প্যালেস্টাইনে

www.pathagar.com

গ্যালিলিতে কিছু এলাকা দখল করে নেয়। আমিলা ও জুদহাম গোত্রের মতো বালি গোত্রের প্রায় সকলেই খ্রিস্টান ছিল এবং এই তিন গোত্র মিলে মুতার যুদ্ধে প্রফেট মোহাম্মদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছে। কয়েকজন পণ্ডিত মানুষ বলেছেন আমিলা মূলত আরামাইন গোত্র-সম্ভূত; আবার অনেকে তাদের যোগসূত্র খুঁজে পান ওল্ড টেস্টামেন্টের আমালেকাইটসদের সাথে (গণনা : ১৩ : ২৯); অন্যরা বিশ্বাস করে, তারা জোকতানের পুত্র আবিমায়েলের বংশধর (আদিপুস্তক ১০ : ১৮); তারপরেও অন্য একদল বিশ্বাস করে তারা জুরহাম গোত্রের সাথে সম্পর্ক যুক্ত।

প্রভাবশালী জুদহাম গোত্র (আমর ইবন আদি বলেও পরিচিত) কোদা কনফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত এবং মনে হয় এই কোদা গোত্রও জুরহামের সাথে সম্পর্কযুক্ত তবে এতে মতভেদ আছে। হেজাজ থেকে বিতাড়িত হবার পর, তারা হিজরের আশপাশে বসতি করে এবং লোহিত সাগরের পশ্চিম উপকূল হয়ে সিনাইয়ের দক্ষিণ অংশ পর্যন্ত জুড়ে বসে। এদের রাজধানী ছিল আইলা (আকাবা)। প্রায় ৩৫০ খ্রিস্টাব্দে নাবাতাইনদের প্রভাবে, জুদহামরা খ্রিস্টান হয়ে যায়। সিনাইয়ের আশপাশ এলাকায় অনেক চার্চ ভবন গড়ে ওঠে। পঞ্চম শতাব্দির মধ্যভাগে এই সব চার্চের নেতাদের মধ্যে ছিলেন বিশপ আবদুল্লাহ (Abdellas) এবং হারিথা (Aretas)। সিরিয়ান মরুভূমে অগ্রগামী গোত্র ছিল কালব যারা কাহতান আরবদের সুপ্রিম প্রতিনিধি— যেমন, আদনান (উত্তর) আরব ছিল খ্রিস্টান কাইস (Kayis)। এরাও কোদ কনফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এরা উত্তর দিকে সরে যায় এবং দুমাতে রাজধানী গড়ে তোলে। প্যাগনদের সময়ে দুমা আরব রানীদের বা উচ্চ মহিলা পুরোহিতদের কেন্দ্রস্থান ছিল। এদের প্রধান দেব-দেবীদের মধ্যে ছিল আতার (ইসতার) দাঈ, আবিরিল্লু ও নূহাই।

দুমাতে কাল্‌ব গোত্র খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করে। নামকরা সদস্যদের মধ্যে এই গোত্রে ছিল জায়েদ ইবন হারিথ প্রফেট মোহাম্মদের পালক পুত্র। ৬৩০ খ্রিস্টাব্দে অক্টোবর মাসে প্রফেট মোহাম্মদ দুমাতে খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে এক সশস্ত্র বাহিনী পাঠান। এই কালব গোত্র পরে উমাইয়া খলিফাদের প্রধান সাহায্যকারী রূপে আবির্ভূত হয় এবং খলিফা মাবিয়া এই গোত্রের একটি রমণীকে বিবাহ করেন যে মহিলা ১ম ইয়াজিদের মাতা ছিলেন। নাম মায়মুনা।

বানু কলির দক্ষিণ রাজ্যে ছিল বানু তাঈ, এরাও কাহতান বংশজাত। যদিও এরা প্রধানত ভবঘুরে তবু প্রাচীন শহর তাইমার আশপাশে বসতি করে। কথিত যে, ইসমাইল পুত্র তেমা এই তাইমা শহর পত্তন করেন। (আদিপুস্তক ২৫; ১৫)। প্রাচীন মিশর ও মেসোপটেমিয়ার মরু বাণিজ্য পথে তাইমা উন্নয়নশীল ওয়েসিস রূপে লোহিত সাগর ও পারস্য উপসাগরের মধ্যে প্রসিদ্ধি পায় এবং হেজাজ থেকে সিরিয়া পর্যন্ত বাণিজ্যপথ নিয়ন্ত্রণ করে। এখানে অ-আরব বিশাল জনগোষ্ঠীর বসবাস ছিল, সাথে ছিল কিছু ইহুদি স্থাপনা।

বানু তাঈ, বলা হয়ে থাকে, পৌত্তলিকার মাঝেই তাদের জীবন নির্বাহ করেছে, খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত না হওয়া পর্যন্ত। এই গোত্রের সদস্যদের মধ্যে একজন হাতেম তাঈ (৫৯০ খ্রিঃ) প্রফেট মোহাম্মদের পূর্বে বেঁচে ছিলেন। তার আতিথেয়তা কিংবদন্তি

www.pathagar.com

স্বরূপ ছিল। প্রফেট মোহাম্মদ এই গোত্রের উচ্চ প্রশংসা করতেন। এই পরিবারের লোকজনেরা আরবে বহুল পরিচিত ছিল এবং কেউ অতিথি সৎকারে সমাজে প্রতিষ্ঠা পেলে তাকে হাতেম তাঈ-এর সাথে তুলনা করা হতো। ইসলামের পূর্ণ আবির্ভাবের পর এই গোত্রের সকলেই ধর্মান্তরিত হয়।

তাঈ গোত্রের একটি শাখা বাআন গোত্র সাহিত্য ক্ষেত্রে উৎকর্ষতা লাভ করে এবং তারা লিখন পদ্ধতির নতুন সংস্কার করে। আরব ধর্মলিপির নবআবিষ্কারের জন্য খ্যাত ছিলেন তিন জন বাআন পণ্ডিত।

উত্তর হেজাজে প্যাগন গোত্রদের মধ্যে এক খ্রিস্টান সম্প্রদায় ছিল। প্রধানত তারা ছিল জুদহাম ও তাঈ গোত্রভুক্ত। এরা বসতি স্থাপন করে এলওলা ওয়েসিস-এর পর্বত গাত্রে। এক সময় এই অঞ্চল ছামুদ ও লিহিয়ান গোত্রদের দখলে ছিল। তাঈ গোত্র থেকে আর একটি দল ওয়াদি আল কোরাতে কুটির স্থাপন করে, একে বলা হতো 'গ্রাম্য উপত্যকা'। এই ভ্যালি মদিনার উত্তরে ও খাইবারের পশ্চিমে অবস্থিত ছিল। এই ভ্যালিতে ইহুদিদেরও কিছু স্থাপনা ছিল।

মদিনা ওয়েসিসের প্রত্যন্ত অঞ্চলে গানিম বলে খ্রিস্টান গোত্র বাস করত। এরা ছিল আজদ কনফেডারেশনের একটা অংশ, যারা (নন-খ্রিস্টান) আউস ও খাজরাজের আত্মীয় ছিল। ৬৩০ খ্রিস্টাব্দে তাদের উপাসনার গৃহগুলো প্রফেট মোহাম্মদের আদেশে জ্বালিয়ে দেয়া হয়।

খোদ মদিনাতে খ্রিস্টানদের একটি ক্ষুদ্র সম্প্রদায় ছিল; কিন্তু প্রধান স্থাপনা ছিল ইহুদিদের এবং মদিনার সমাজে জুদাইজমদের শক্তিশালী সম্পর্ক বিরাজ করত। (Muir, 1912, P: 116)। ইহুদিদের এই শক্তিশালী সামাজিক অবস্থা প্রফেট মোহাম্মদের পূর্বে ও পরেও ছিল।

হেজাজ ও নেজদের বিস্তীর্ণ এলাকাতে আসাদ বলে খ্রিস্টান গোত্র ছিল, এরা নন-খ্রিস্টান কোরেশদের সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিল (Trimingham, 1979, P 263)। আসাদ গোত্রের উল্লেখযোগ্য সদস্যদের মধ্যে সংস্কারক ছিলেন তোলাইহা, প্রফেট মোহাম্মদের প্রথম স্ত্রী খোদেজা; খোদেজার কাজিন ওয়ারাকা এবং ওসমান ইবনে হুয়ারিথ।

ইবনে হিশাম ও অন্যরা বলেন যে, ওসমান ইবনে হুয়াইরিথ মক্কার এক নেতা এবং খোদেজার কাজিন, কাবাঘরের পৌত্তলিকতায় বিতৃষ্ণ হয়ে বাইজানটাইন দরবারে চলে যান। সেখানে তার সমাদর হয় এবং পরে তিনি খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করেন। প্রায় ৬০৫ খ্রিস্টাব্দে, প্রফেট মোহাম্মদের মিশনের কিছু পূর্বে ওসমান মক্কায় ফিরে আসেন এবং রাজকীয় সাহায্যের বলে মক্কা নগরীর শাসনভার গ্রহণ করে প্যাগন ধর্ম সংস্কারের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এতে প্রতিষ্ঠিত মক্কার শাসকবর্গ জোর প্রতিরোধ জানালে ওসমান সিরিয়ায় পালিয়ে যান। কিন্তু দু'বছর পরে মক্কাবাসীরা ওসমানকে হত্যা করতে সমর্থ হয়। পরে মুসলিম ট্রাডিশনে তাকে হানিফ বলা হয়েছে। কতকগুলো বিক্ষিপ্ত গোত্র, প্রায়ই যাযাবর টাইপ, উত্তর মেসোপটেমিয়ার জেজিরা দখল করে নেয়। ঐ সময় সিরিয়ায় ও আশপাশ অঞ্চলে যেসব ছোট-বড় গোত্র ছিল, তারা সবাই খ্রিস্টান ছিল (Kennedy, 1986, P. 20)।

www.pathagar.com

এই সব গোত্রের প্রধান ছিল তাঘালিব (বানু হুদ বলেও পরিচিত)। এরা নেজ্দ থেকে মধ্য এশিয়ায় আগমন করে। ৪৫০ খ্রিস্টাব্দে এদের প্রথম ব্যাচ এসে ইউফ্রেটিসে বসবাস শুরু করে এবং কিছু দিনের মধ্যেই খ্রিস্ট ধর্মে দীক্ষিত হয়। নজ্দের বাকি তাঘলিব গোত্র বক্‌র গোত্রের সাথে চল্লিশ বছর যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে এবং শেষ হয় ৫৩৫ খ্রিস্টাব্দে। এই যুদ্ধ আরবের প্রাচীন কাব্যে 'বাসাসের যুদ্ধ' বলে বিখ্যাত। যুদ্ধের পর বাকি তাঘলিব গোত্রে যারা ছিল, তারা নেজ্দ থেকে উত্তরে চলে যায় তাদের পূর্ব গোত্রের সাথে যোগ দিতে।

তাঘলিবদের পরাজিত করেন খলিফা ওমর, কিন্তু তারা জিজিয়া কর দিতে অস্বীকার করে এই যুক্তিতে যে, তারা আরব– সুতরাং তাদের রেয়াত দিতে হবে। তাই তাদের মুসলিম হিসাবে কর দিতে বলা হয়, নন-মুসলিম বলে নয়। ঐতিহাসিক ইয়াহিয়া বিন জারির (মৃত ১০৭৯) বলেন যে, তাঘলিবরা তার সময় পর্যন্ত খ্রিস্টান থেকে যায়, এমনকি প্রফেটের মৃত্যুর তিনশো বছরের অধিক পর্যন্ত।

দক্ষিণের তাঘলিব গোত্র ছিল আইলিদ গোত্র (বা আইলিদ ইবন নাজির)। এরা মূলত ইয়ামামা থেকে আগত এবং দাবি করে যে প্রফেট মোহাম্মদের পূর্বপুরুষ আদনানের পুত্র মাআদের বংশধর। উত্তর দিকে মাইগ্রেশনের সময় তাদের পূর্বপুরুষ আইলিদ বা ইলিয়াদ, মক্কাতে একটি পবিত্র টাওয়ার (মিনার) প্রতিষ্ঠা করে, সম্ভবত মেসোপটেমিয়ার স্টাইলে জিগুরাতের মতো। কথিত আছে যে, তারা কাবা নামে একটি চৌকো ঘর, কুফা ও বসরার মধ্যে সিন্দাদে তৈরি করে (Faris, 1952 P. 39)। শেষে এই তাঘলিব গোত্র ইউফ্রেটিস ভ্যালিতে বসবাস শুরু করে দেয় এবং আনবার নামে এক রাজধানী শহরও গড়ে তোলে যা পার্থিয়ানদের জন্য বেশ গুরুত্ব লাভ করেছিল। ৪২০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে আনবার খ্রিস্টানদের জন্য দুর্গ স্বরূপ হয়। পরে শিক্ষা-দীক্ষায় ও এক নতুন ধরনের লিখন পদ্ধতিতে এরা বিখ্যাত হয়ে ওঠে।

লাখমিদ গোত্র দক্ষিণ আরবের কাহ্‌তান গোত্রের শাখা ছিল, কিন্তু উত্তরের আদিনার গোত্রের সাথে তাদের শক্ত সম্পর্ক ছিল। এরা রাজত্ব করেছে ২৬৮ খ্রিঃ থেকে ৬৪৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত, রাজ্যসীমা ছিল সিরিয়া ও মেসোপটেমিয়ার মধ্যে, রাজধানী ছিল হিরা। হিরা শব্দ সিরিয়াক হারতা (Herta) থেকে, অর্থ ক্যাম্প। হিরা নগরী ইউফ্রেটিসের নিম্নাঞ্চলে অবস্থিত ছিল। হেরা নগরীর আশপাশ অঞ্চল পবিত্র বলে গণ্য হতো, কেননা লোকে বিশ্বাস করত এই অঞ্চলে আদম ও নূহের সমাধি ক্ষেত্র আছে।

সিরিয়ার বিশাল অঞ্চল নিয়ে ঘাসানরা যেমন বাইজানটাইনদের সুনজরে ছিল তেমনি ইরাকের বিশাল অঞ্চল দখল করে লাখামিদরা ছিল পার্সিয়ান সাসানিদদের মিত্র। ৩২৫ খ্রিঃ পারস্যের দ্বিতীয় শাহপুর লাখমিদ রাজ্য ইমরুল কায়েসকে 'সব আরবের রাজা' উপাধি দিয়েছিলেন। এই উপাধি ৩২৮ খ্রিস্টাব্দে নাসারার প্রতিলিপিতে উৎকীর্ণ করা হয়েছিল, যে উৎকীর্ণ প্রতিলিপি আরবি ভাষায় সবচেয়ে প্রাচীন (রডিনসন ১৯৭৬, পৃঃ ২৭)।

লাখামিদরা সাংস্কৃতিকভাবে চরম উৎকর্ষতা লাভ করেছিল এবং ৪১০ খ্রিস্টাব্দে পারস্যের প্রথম ইয়াজদ গার্ড হিরার শাসক ১ম নুমানের কাছে আপন পুত্র বাহরাম গুরকে শিক্ষা-দীক্ষার জন্য দেন। এই বাহরাম গুর পরবর্তীকালে কিংবদন্তি শিকারি

www.pathagar.com

হয়েছিলেন। ১ম নুমান তার রাজত্বের শেষে সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়েছিলেন।

৫১০ খ্রিস্টাব্দ থেকে হিরা নেস্টোরিয়ান বিশপ্রিকের কেন্দ্রস্থল ছিল, কিন্তু সব লাখমিদ রাজারা খ্রিস্টান ছিল না। এদের মধ্যে দু'জন ওজ্জা দেবীর ভক্ত ছিল। কিন্তু তারা খ্রিস্টান পরিবারে বিয়েশাদি করেন এবং তাদের প্রজারা প্রায় সকলেই খ্রিস্টান ছিল।

হিরার তৃতীয় মুনধিরের স্ত্রী হিন্দ একটি খ্রিস্টান মঠ প্রতিষ্ঠা করেন এবং তার প্রস্তরফলকে লেখা হয়েছিল যে তিনি রাজার কন্যা, রাজার মাতা কিন্তু খ্রাইস্টের দাসী। তৃতীয় মুনধীর মারা যান ৫৫৪ খ্রিঃ। এই মঠটি ইসলামের ইতিহাসে অনেক দিন পর্যন্ত স্মরণীয় ছিল।

হিরার নুমান বংশের কথা আরব ঐতিহাসিকরা ঘনঘন উল্লেখ করেছেন এবং এদের রাজদরবারে সব সময়েই কবি ও বুদ্ধিজীবীদের দ্বারা গুলজার থাকত। পারস্যের রাজপরিবারের মতো আরব প্রধানগণ তাদের পুত্র-সন্তানদের হিরার খ্রিস্টান স্কুলে শিক্ষার জন্য পাঠাত, কারণ সেই সময় হিরার বিদ্যাপীঠের সুনাম ছিল।

আরবি ভাষা, আরবি লিপি ও আরবি কবিতা, ইসলাম-পূর্ব যুগে হিরার খ্রিস্টান রাষ্ট্রের কাছে ঋণী ছিল, কারণ সে সবের উৎকর্ষতা এখানেই হয়েছিল।

৬ষ্ঠ শতাব্দির মধ্যভাগ থেকে পারস্যের সাসানিয়ান রাজারা হিরাকে করদরাজ্য হিসাবে গণ্য করতে আরম্ভ করে, ফলে হিরার রাজারা তাদের দেশীয় আরব প্রধানদের আনুগত্য লাভের চেষ্টা করে। চতুর্থ নুমান (মৃ. ৬০২), যে খ্রিস্টান রাজার যশকথা আরবি কবিতায় উল্লেখ আছে। পারস্য সম্রাটের সন্দেহভাজন হন তার আরবপ্রীতির কারণে, বিশেষ করে খ্রিস্টান বকর গোত্রের সাথে তার সখ্যর জন্য। এই জন্য তিনি পারস্য সম্রাট দ্বিতীয় খসরু পারভেজ কর্তৃক উৎখাত হয়ে প্রাণ হারান, আর এর সাথেই লাখমিদ বংশের অবলুপ্তি ঘটে।

এই হিরা রাজ্যের পতনের পর তিন বছরের মধ্যে আরবের বকর গোত্র পারস্যের প্রভাব হিরা রাজ্য থেকে উৎখাত করে দেয়। পারস্যের এই পরাজয় পারস্য সাম্রাজ্যের ওপর আরব বিজয় সহজ করে দেয়। ইসলামী রাজ্যের কয়েক শতাব্দি ধরে হিরার আশপাশে জনসংখ্যার অনেকেই খ্রিস্টান ধর্ম পালন করতে থাকে। এই হিরা শহরের মধ্য থেকেই শিয়াদের নাজাফ শহর গড়ে ওঠে যা শিয়াদের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য শহর বলে গণ্য।

হিরার কিছু উত্তর দিকে একটি উন্নয়নশীল খ্রিস্টান সম্প্রদায় গড়ে ওঠে যাদের বলা হতো ইবাদ-আল-মসিহ। খ্রিস্টের দাস। এরা পরবর্তীতে 'ইবাদ' গোত্রে পরিণত হয়। এক সময় তারা নিকটে ওজ্জা দেবীর পীঠস্থান দখল করে নেয় (কথিত আছে এখানে নরবলি ও পশুবলি হতো)। এর উপরে ইবাদ গোত্র একটি চার্চ নির্মাণ করে। ৫৬০ খ্রিস্টাব্দের দিকে ইউফ্রেটিস নদীর ধারে তারা তাদের রাজধানী আকুলা প্রতিষ্ঠা করে এবং একজন বিশপও নিযুক্ত হন।

হিরা শহর যেমন মুসলিম শহর নাজাফের কেন্দ্রবিন্দু ছিল, তেমনি আকুলা ছিল কুফা শহরের (Trimingham, 1979 P. 171)। কুফা শহর বুদ্ধিজীবী, আইনজ্ঞ ব্যক্তি এবং বিদ্যাপীঠের জন্য বিখ্যাত ছিল। ৬৩৫ খ্রিস্টাব্দে নাজরান থেকে বিতাড়িত বহু খ্রিস্টান কুফাতে আশ্রয় নেয়। ৬৬০ খ্রিস্টাব্দে চতুর্থ খলিফা কুফা চার্চ ধ্বংস করেন

www.pathagar.com

এবং কুফাতে তার রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন। এই অঞ্চলে খ্রিস্টানদের প্রভাব যে কী পরিমাণ ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় আরব ঐতিহাসিক হিসাব আল কালবি-র (মৃ. ৮২০) গ্রন্থ The Churches and Monastaris of Hira and the Genoalogis of the Ibadis থেকে। মূলত গ্রন্থটি এখন পাওয়া যায় না, তবে ঐতিহাসিকদের লিখিত গ্রন্থে এর ঘন ঘন উল্লেখ পাওয়া যায়।

বানু ইবাদের দক্ষিণে ছিল ইজল (Ijl), যারা হিরা ও বসরার মধ্যে বসতি স্থাপন করে। আরও দক্ষিণ দিকে এই খ্রিস্টান গোত্রের বেশ কয়েকটি বসতি গড়ে উঠেছিল।

টাইগ্রিস-ইউফ্রেটিস ডেল্টার কাছে আরবের প্রধান এক শহর চারক্স অবস্থিত ছিল, পারস্য উপসাগরের কাছে এর রাজধানী শহর। এই এলাকা পূর্বে গ্রিক আলেকজান্ডারদের দখলে ছিল, পরে ছিল পার্থিয়েনদের দখলে। চতুর্থ শতাব্দিতে (খ্রিঃ) হিরা শহরের আরবরা ওবুলার পূর্বে একটি ছোট খ্রিস্টান মঠ তৈরি করে। খেজুর বৃক্ষ কুঞ্জের মধ্যে এই মঠটি মরুর রুক্ষ আবহাওয়ার মধ্যে মনোরম স্থান ছিল।

এখানে ৬৩৮ খ্রিস্টাব্দে মুসলমানরা বসরা নগরী প্রতিষ্ঠা করে। এই শহর ছিল নাবিক সিন্দাবাদের। পরে এই শহর কুফা নামে মুসলিম ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে ওঠে। বসরার পণ্ডিত ব্যক্তিরা উৎকৃষ্টভাবে কোরান পাঠ ও ব্যাখ্যা করতে পারত এবং আরবি ভাষার চরম উৎকর্ষ সাধন করে। সাহিত্য, ধর্ম ও রাজনীতিতে বসরা ও কুফা মুসলিম বিশ্বে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। ওয়াট লিখেছেন যে, আব্বাসীদের প্রাথমিক যুগে বসরাতে গ্রিক দর্শনসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বুদ্ধিবৃত্তির কর্মকেন্দ্র গড়ে উঠেছিল।

দক্ষিণ-পশ্চিম ইরাকে রাবিয়া ও নামিরের আদনান গোত্ররা বাস করত এবং আরও দক্ষিণে খ্রিস্টান মুদার সম্প্রদায় তাদের গির্জাসহ শান্তিতে বসবাস করেছে। মুদার সম্প্রদায়ের একটি শাখা ছিল অখ্রিস্টান কিনানা দল। এই কিনানা দলে ছিল কোরেশ গোত্র। রাবিয়া ও মুদারের মধ্যে ঘনঘন সংঘর্ষ লেগেই থাকত, বিশেষ করে যখন তারা ইসলামে দীক্ষা নেয়। উভয় গোত্রই উমাইয়া যুগে মুসলিম রাজ্য প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

আরব ও পারস্য উপসাগরের উপকূলে বাহরাইনে (সুমেরিয়ান লিপিতে এর নাম ছিল দিলমুন) খ্রিস্টান মিশনারিদের কেন্দ্রভূমি ছিল। প্রাথমিক ইসলামী যুগে বাহরাইনের উপকূল অঞ্চল বর্তমান বাহরাইন দ্বীপের চেয়ে আকারে বড় ছিল। এখানে দুটি নদী (বাহরাইন) মিশে দক্ষিণ ইরাকে শাত-ইল-আরব-এর রূপ ধারণ করেছে (O'Leary, 1927. P. 10) এবং হাসা (প্রাচীন নাম গেরহা) কুয়েত ও কাতার পেনিনসুলা উপকূল ধরে বয়ে চলেছে। এই অঞ্চলে প্রধান খ্রিস্টান গোত্র হলো বকর (বা বকর ইবন ওয়াইল), যিনি ৫০২ খ্রিস্টাব্দে সিরিয়ার বর্ডারের আতঙ্ক ছিলেন। পরে অবশ্য বাইজানটাইন সম্রাট প্রথম এনাসতাশিয়াস এদের সঙ্গে সন্ধি করে বশে আনতে সক্ষম হন। এরা পরে ৬০৫ খ্রিঃ কুফার কাছে ধূ-কারে পারসিয়ানদের যুদ্ধে পরাস্ত করে। এই যুদ্ধের কীর্তিগাথা আরব কবিরা তাদের কবিতায় লিখে গেছেন।

বকর সম্প্রদায়ের সাথে জড়িত আরও একটি গোত্র ছিল কাইস বা আবদুল কাইস। প্রথমে নাজরানের বাসিন্দা পরে কাতার ও বাহরাইনের আশপাশে স্থায়ী বাসিন্দা হন। ৫৭৫ খ্রিস্টাব্দে সেখানকার চার্চগুলো তদারক করবার জন্য একটা

www.pathagar.com

বিশপের অফিস প্রতিষ্ঠা করা হয়। কাইস গোত্রের উত্তর-পশ্চিম দিকে বাহরাইনে ছিল খ্রিস্টান আইউব গোত্র।

তৃতীয় শতাব্দির মাঝামাঝি আজদ কনফেডারেশনের আর একটি খ্রিস্টান গোত্র মাজুন ওমান (মাস্কট) অঞ্চলের দিকে সরে যায়। প্রাচীনকালে এখান থেকে তামা সরবরাহ করা হতো। অল্প সময়ের মধ্যে এই অঞ্চলে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের বেশ বাড়-বাড়ন্ত হয় এবং ওমানে প্রায় ৪২৪টি বিশপ অফিস গড়ে ওঠে। মুসলমানরা যখন ওমান শহর দখল করে তখন তারা খ্রিস্টান গোত্র মাজুন নিজ ধর্ম পালন করার অনুমতি দেয় এই শর্তে যে তারা তাদের অর্ধেক জমি ও সম্পদ মুসলমানদের সমর্পণ করবে। মাজুন খ্রিস্টানদের অনেকেই এই শর্তে নিজ ধর্ম পালন করতে থাকে।

ওমানের উত্তর বর্ডারের প্রান্তে দোফার (Dhofar) রাষ্ট্রে বড় একটা খ্রিস্টান সম্প্রদায় ছিল এবং বন্দর শহর মোশচাতে একজন বিশপ ছিলেন। খ্রিস্টান নেজদ ও ইয়ামামা গোত্র নেস্টোনিয়ান মিশনারি দ্বারা প্রভাবিত ছিল। এদের মধ্যে তামিম গোত্র ও আইয়ুব গোত্র পশ্চিম আরবের বিশাল অংশ জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে। এরাই মক্কাতে কোরেশ গোত্রের অবস্থানকে পোক্ত করতে যথেষ্ট সহায়তা করেছে, কিন্তু প্রায় খ্রিস্টপূর্ব ৪৫০ অব্দে মক্কার অন্য গোত্র তাদের বিরুদ্ধে অপবাদ দেয় এই বলে যে তারা কাবার সম্পদ চুরি করেছিল সেই সময়ে। বহু শতাব্দির পর মক্কার কোরেশ গোত্র খ্রিস্টান তামিম গোত্রের সাহায্যের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং তাদের অনেক সদস্যকে ধর্মীয় ও বিচারকার্যে নিয়োজিত করে।

বহু পূর্ব থেকেই তামিম গোত্র ওকাজে বাৎসরিক কবিতা উৎসবের পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে। এই দায়িত্ব তারা খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করার পরেও পালন করেছে এবং বিচারকার্যও পরিচালনা করেছে। তামিম গোত্রের দুইজন বিখ্যাত কবি জারির ও ফারাজদাক উভয়েই খ্রিস্টান ছিল।

তামিম গোত্রের মহিলাদের সৌন্দর্য ও সাংস্কৃতিক উৎকর্ষতার জন্য কোরেশ গোত্রের মর্যাদাশীল ব্যক্তিরা তামিম গোত্রের মহিলাদের বিবাহ করতে পছন্দ করত। বিখ্যাত মহিলা সংস্কারক সাজাজ এই তামিম গোত্রের; এর অবশ্য সমাজে নিন্দাবাদও ছিল তার ব্যতিক্রমধর্মী চরিত্রের জন্য; কিন্তু নিজ গোত্রের সদস্যদের সাপোর্ট যথেষ্ট পেয়েছেন। প্রফেট মোহাম্মদের প্রচারকালে তামিম গোত্রের কিছু সদস্য অনিচ্ছাভাবে ইসলাম গ্রহণ করে কিন্তু প্রফেটের মৃত্যুর পর তারা আবার নিজ ধর্মে ফিরে আসে। পরে জবরদস্তিতে মুসলিম হয়।

তামিম গোত্রের মধ্যে আরো একটি গোত্র ছিল নাজিয়া। এরাও খ্রিস্টান ছিল কিন্তু ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। খলিফা আলীর বিরুদ্ধে খারিজী বিদ্রোহীদের মধ্যে এরাও ছিল। অনেকেই খ্রিস্ট ধর্মে ফিরে আসে এবং আলীর সৈন্যদের দ্বারা ধৃত হলে তারা তাদের ধর্ম সম্বন্ধে গর্ব করে (Trimingham, 1979 P. 279)।

আরবের উত্তর প্রান্তে বকর গোত্রের একটি প্রভাবশালী শাখা হানিফা বসবাস করত (Muir, 1912. P. 457); এরা খ্রিস্টান ছিল এবং ইয়ামামাতে ছড়িয়ে ছিল। এখানকার একজন খ্রিস্টান শাসক হাওদা ইবন আলীর কাছে প্রফেট মোহাম্মদ ইসলাম গ্রহণ করার জন্য পত্র দেন। হাওদার উত্তরাধিকারী ছিল মুসাইলামা। ইসলাম ধর্ম গ্রহণ

www.pathagar.com

করার পর এই গোত্র ও ইয়ামামা গোত্রের অনেক সদস্য কোরানের ক্বারী ছিল।

নেজ্‌দের দক্ষিণে ছিল নাজরান অঞ্চল। এর রাজধানীও ছিল নাজরান। নাজরান দক্ষিণ আরাবিয়া ও হেজাজের মধ্যে ক্যারাভান সংযোগ ছিল। ভূমধ্যসাগর ও পারস্য উপসাগর ছেড়ে পূর্ব দিকে এই ক্যারাভান বাণিজ্য করত।

পারস্যে জন্মগ্রহণকারী আরব ঐতিহাসিক তাবারি (মৃ. ৯২৩) পুরনো ইতিহাস উল্লেখ করে বলেন যে, এক সিরীয় সাধু ফিমিউন (ফেমিয়ন? ইফেমিউস?) রাজমিস্ত্রি রূপে জীবিকা নির্বাহ করতেন। তিনি বেদুইন দ্বারা ধৃত হন এবং নাজরানে দাস হিসাবে বিক্রি করে দেয়; এটা হবে প্রায় ৪৬০ খ্রিস্টাব্দে। এখানে তিনি অনেক আরবকে খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত করেন এবং নাজরানে প্রথম চার্চ নির্মাণ করেন।

নাজরান শহরে একটা বাৎসরিক মেলা হতো, এটা দক্ষিণ আরবের মক্কার সন্নিকটে ওকাজ মেলার মতোই গুরুত্বপূর্ণ। নাজরান মেলায় বিধর্মী আরবদের নিকট অনেক খ্রিস্টান সাধু ধর্ম প্রচার করত। এদের প্রচেষ্টার ফলে বলতে গেলে নাজরানের সব লোকসংখ্যা পঞ্চম শতাব্দির শেষে খ্রিস্টান হয়ে যায়। (Glubb. 1979 P. 51)। ৫২৪ খ্রিস্টাব্দে ধু-নুয়াস, হিমিয়ারের ইহুদি শাসক নাজরান আক্রমণ করলে যোগাযোগ শুরু হয় এবং খ্রিস্টানদের ওপর অত্যাচার চলতে থাকে। পরের বছর (৫২৫) বাইজানটাইনের মিত্র আবিসিনিয়ানরা ধু-নুয়াসকে পরাজিত করে বিতাড়িত করে।

ঐতিহাসিক ইবনে হিশাম নাজরান সম্বন্ধে বলেছেন যে, তাদের রাজার ধর্ম ছিল অর্থাৎ বাইজানটাইন সম্রাটের ধর্ম। নাজরানে একটি খুব বড় উৎকৃষ্ট ক্যাথিড্রাল ছিল মার্বেল ও মোজাইক চর্চিত এবং এই ক্যাথিড্রাল বাইজানটাইন সম্রাটের অনুদান (O' Leary 1927. P. 144)। নাজরানের খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের চামড়া ও বস্ত্রশিল্প ছিল এবং সেখান থেকে বিখ্যাত ইয়েমেনি পোশাক তৈরি হতো। সম্ভবত সেসময় নাজরান আরবের লোকজন সম্পদশালী ছিল।

সেই সময় সমসাময়িক আরব রাষ্ট্রের মধ্যে নাজরানে একটি উন্নত রাজনৈতিক সমাজ-জীবন ছিল। একজন সৈয়দ মহান নেতার দ্বারা নাজরান শাসিত হতো এবং তিনি পররাষ্ট্র, বাণিজ্য ও প্রতিরক্ষার দায়িত্বে ছিলেন। তার ডেপুটি হিসাবে একজন আকিব অভ্যন্তরীণ বিষয় দেখাশোনা করতেন। আর একজন বিশপ ছিলেন যিনি চার্চ ও ধর্ম বিষয় তদারক করতেন (এর পর সৈয়দ শব্দটি প্রযোজ্য হয়েছে প্রফেট মোহাম্মদের বংশধরদের জন্য)

নাজরানের সম্ভ্রান্ত পরিবারের দেখাশোনা করত দাইয়ান পরিবার এবং এই পরিবারের অনুদান ছিল চার্চের জন্য একটি বিরাট অঙ্ক। আরব কবিরা এই পরিবারকে আরবে সবচেয়ে সম্ভ্রান্তশীল পরিবার বলে উল্লেখ করেছে।

নাজরানে দুটি মহান গোত্র ছিল এবং প্রত্যেক গোত্রে খ্রিস্টানদের সংখ্যা বেশি। একটি ছিল হারিথ গোত্র যারা আরবে উত্তর-পশ্চিমে স্থায়ী বাসিন্দা ছিল, এই গোত্র নাজরানে একটি 'কাবা' ভবন নির্মাণের দায়িত্বে ছিল। এই ভবনে অত্যাচারিত ব্যক্তিরা আশ্রয় গ্রহণ করত। এখানে আরব খ্রিস্টানরা তীর্থের জন্য জড়ো হতো। এটা ছিল তীর্থভূমি। অন্য মহান গোত্রটি ছিল কিন্দা গোত্র যারা দক্ষিণ ও মধ্য আরবে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বাস করত। এদের মধ্যে অনেকে প্যালেস্টাইন ও সিরিয়াতে আশ্রয় নিয়েছিল

www.pathagar.com

এবং সেখানে মাআদ ও আদনান গোত্রের সাথে সখ্য স্থাপন করে। কিন্দা গোত্র শাসন করতেন একটি খ্রিস্টান বংশ, এই বংশ কবি ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের সমাদর করেছে। তাদের উৎসাহ জুগিয়েছে। ইসলামিক দার্শনিক ইয়াকুব আল কিন্দি (মৃ. ৮৬৮) এবং আবদুল মসিহ আল-কিন্দি এই কিন্দা রাজবংশের সন্তান। ইয়াকুব আল কিন্দি পশ্চিম দেশে আল কিন্দুস বলে পরিচিত।

খলিফা ওমর নাজরান খ্রিস্টানদের জোর করে মুসলমান না করা পর্যন্ত তারা খ্রিস্টান ছিল; তারপর নাজরানের অনেক খ্রিস্টানকে কুফাতে নির্বাসনে পাঠানো হয়। দক্ষিণে আরব পেনিনসুলার শেষ প্রান্ত পর্যন্ত (ইয়েমেন, হিমিয়ার, হাদ্রামাত) খ্রিস্টানদের প্রভাব ঐসব অঞ্চলে নাজরান ও আবিসিনিয়া থেকে পড়েছিল।

ফিলসটরগাস (মৃ. ৪৩৯) তার চার্চ হিস্ট্রিতে বর্ণনা করেছেন যে ৩৪২ খ্রিস্টাব্দে বাইজানটাইন সম্রাট কনস্ট্যান্টিয়াস ইন্ডিয়াতে একজন বিশপের অধীনে এম্বেসি পাঠিয়েছিলেন। এই এম্বেসির সাথে অনেক মূল্যবান গিফ্‌ট এবং দুশো কাপ্পাডোশিয়া ঘোড়াও পাঠান এই উদ্দেশ্যে যে, হিমিয়ারাইট রাজা তার রাজ্যে চার্চ নির্মাণ করার অনুমতি দিবেন। অনুমতি পাওয়া গিয়েছিল এবং একটি চার্চ আদাননে (এডেন) আর একটি হোরমুজে নির্মাণ করা হয়েছিল। সবচেয়ে বড় চার্চ নির্মিত হয় সানার দক্ষিণে জাফরে। এই চার্চ নির্মাণে বাইজানটাইন সম্রাট মার্বেল ও মোজাইক প্রদান করেছিলেন।

আনুমানিক ৩৪৫ খ্রিস্টাব্দে আবিসিনিয়ার নেগাস দক্ষিণ আরাবিয়ার প্রদেশগুলোতে কিছু নিয়ন্ত্রণ আদায় করে নেন এবং আকসুম, হিমিয়ার, সাবা ও রাইদানের রাজা উপাধি গ্রহণ করেন এবং ঐসব প্রদেশে খ্রিস্টান ধর্মকে রাষ্ট্র ধর্ম করার প্রচেষ্টা চালান। এই প্রথম আধিপত্য (৩৪৫-৭৫) শেষ হয় যখন একজন আরব নেতা আবিসিয়ানদের ঐ সব প্রদেশ থেকে উচ্ছেদ করেন। এই আরব নেতা পরে সেখানে ইহুদি রাষ্ট্র স্থাপন করেন।

হিমিয়ারে এরপর আর একবার স্বল্পকালের জন্য খ্রিস্টান শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় যখন আব্‌দ কেলাল নামে এক আরব খ্রিস্টান সে স্থান অধিকার করে অল্পকালের জন্য (৪৫৫-৬০) সাবাতে রাজ্য স্থাপন করেন। কিন্তু এ বিষয়ে ইতিহাস কতটুকু সত্য তা এখনো নির্ণীত হয়নি। তবে ঐসব এলাকায় পঞ্চম শতাব্দির শেষ পর্যন্ত যে খ্রিস্টানদের আধিপত্য ছিল, সে সম্বন্ধে সন্দেহ নেই।

৫২৫ খ্রিস্টাব্দে ধু-নুয়াসের মৃত্যুর পর আবিসিনিয়ার গভর্নর সুমিয়াফা নেসাসের কর্তৃত্ব স্বীকার করে সানা থেকে দক্ষিণ দিক শাসন করতে থাকে আকসুমাইট কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে। সুমিয়াফা কমপক্ষে চারটি দক্ষিণ-আরবীয় প্রতিলিপি থেকে পরিচিত যার মধ্যে একটি দয়াময় (আল-রহমান) ঈশ্বর ও তৎপুত্র খ্রিস্টের নামে উৎসর্গীকৃত। (Philby, 1947 P. 121)। এরপর ৫৫০ খ্রিস্টাব্দে খ্রিস্টান মিশনারিরা হিমিয়ার থেকে নুবিয়ান রাষ্ট্রে ভ্রমণ করে, যার রাজধানী ছিল সোবা (Soba) বর্তমান খার্তুমের কাছে এবং সেখানে খ্রিস্টানিটি প্রতিষ্ঠা করে। ৫৮০ সালে ঐ রাষ্ট্রে খ্রিস্ট ধর্ম রাজধর্ম রূপে পরিগ্রহ করে (Trimingham, 1979, P. 302)]

৫৩০ খ্রিস্টাব্দে আব্রাহা নামে এক সিরীয়-আরব সুমিয়াফাকে স্থানচ্যুত করে

www.pathagar.com

সানারাজ্য দখল করে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন এবং নেগাসের ভাইসরয় হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেন। মারিব ড্যাম (dam)কে পুনর্নির্মাণের জন্য তিনি উদ্যোগ নেন। দক্ষিণ আরবীয় প্রতিলিপিতে তার নাম উল্লেখ আছে। এর মধ্য দিয়ে তিনি প্রসিদ্ধিও লাভ করেন।

আব্রাহাকে বহু দেশের শাসনকর্তা অভিনন্দন জানাতে তার রাজ্যে দূত পাঠান। এদের মধ্যে আবিসিনিয়ার নেগাসের দূতও ছিল। অন্যান্য দেশের মধ্যে বাইজানটাইন সম্রাট জাস্টিনিয়ন, পারস্যের প্রথম খসরু, খ্রিস্টান আরব রাজা হিরার তৃতীয় মুনধির, ঘাসান রাজ্যের শাসনকর্তা তৃতীয় হারিস ইবন জাবালা (Philly, 1947, P. 192)।

সানাতে আব্রাহা ক্যালিস নামে এক বিরাট চার্চ নির্মাণ করেন। ক্যালিস শব্দ গ্রিক 'ecelesia' অর্থাৎ চার্চ থেকে আগত। ঐ যুগে এই চার্চকে বিস্ময়কর বলে অভিহিত করা হতো। তার ইচ্ছা ছিল এই চার্চকে কেন্দ্র করে তীর্থস্থান গড়ে তুলতে, হেজাজের কাবার মতো। তার এই ইচ্ছাকে নস্যাৎ করতে মক্কা থেকে একটি দল সানাতে আসে এবং গু-গোবর দিয়ে এই পবিত্র স্থানকে কলুষিত করে। অন্য একটা কাহিনী মতে, তারা আব্রাহার একজন মিত্রকে হত্যা করে। এই অপকর্মের প্রতিশোধ নিতে আব্রাহা ৫৫০ খ্রিস্টাব্দে এক বিশাল বাহিনী নিয়ে মক্কাতে অভিযানে যাত্রা করেন। আব্রাহার বাহিনীর মধ্যে হস্তিবাহিনীর উপস্থিতি মক্কাবাসীদের বিস্ময়ের উদ্রেক করে, কারণ এই বিশাল জন্তুর সাথে তাদের পূর্ব পরিচয় ছিল না। আব্রাহা যে পথ দিয়ে আক্রমণ চালান সে পথকে 'হস্তি-পথ' বলা হয়। পথে আব্রাহা মক্কার আবদুল মোত্তালেবের (প্রফেটের দাদা) দুশো উট আটক করেন; তখন আবদুল মোত্তালেব মক্কার প্রভাবশালী ব্যক্তি।

আব্দুল মোত্তালেব আব্রাহার সাথে মিটিং করতে প্রস্তাব করলে, আব্রাহা বলে পাঠান যে তিনি যুদ্ধ করতে আসেননি। আব্দুল মোত্তালেব বলে পাঠান– আমরা যুদ্ধ চাই না, কারণ যুদ্ধে আমাদের বিশেষ দক্ষতা নেই। আমি আমার উটগুলো ফেরত চাই। আব্রাহা বিস্মিত হয়ে বলেন— আপনি শুধু আপনার উটের কথা বললেন, কিন্তু যে মন্দিরে আপনি পূজা করেন এবং আপনার পূর্বপুরুষরা করেছেন সে সম্বন্ধে কিছু বললেন না। আমি ঐ মন্দির ঘর ধ্বংস করতে এসেছি। আব্দুল মোত্তালেব জবাবে বলেন, উটগুলো আমার, কিন্তু মন্দির আমার নয়। যার মন্দির তিনিই এটি রক্ষা করবেন। আমার উটগুলো শুধু ফেরত দেন। (Nicholson, 1969 P. 67)।

আব্দুল মোত্তালেবকে তার উটগুলো ফেরত দেয়া হয়। এরপর আব্দুল মোত্তালেব মক্কাবাসীদের নিরাপত্তার জন্য বক্তব্য রাখেন ও আব্রাহাকে তার উদ্দেশ্য ত্যাগ করে ফিরে যেতে বলেন।

ইত্যবসরে হলো কি যে, আব্রাহার সেনাদলে গুটি বসন্ত দেখা দিল, ফলে আব্রাহা ফিরে যেতে বাধ্য হন তার উদ্দেশ্য পরিত্যাগ করে। আরবিতে গুটি বসন্তের অর্থ ক্ষুদ্র পাথর, কারণ বসন্তের গোটা বেশ শক্ত হয় রোগীর দেহে। তাই ঘটনাকে কোরানে বলা হয়েছে (সূরা ১০৫) যে, পক্ষীরা দলে দলে আক্রমণকারীদের পাথর ছুড়ে মেরেছে। পরবর্তীতে ট্রাডিশনে বলা হয়েছে যে, প্রফেট মোহাম্মদ ঐ হাতির বছরে (year of the elephant) (আম-আল ফিল) জন্মগ্রহণ করেন যখন আব্রাহা মক্কা আক্রমণ করেন। এই ট্রাডিশনে প্রফেটের জন্মের সাথে আব্রাহার ব্যর্থতার একটা যোগসূত্র টানার

www.pathagar.com

প্রচেষ্টা। সত্য ঐতিহাসিক ঘটনা হচ্ছে, আব্রাহার অভিযানের প্রায় দু'দশক পরে প্রফেটের জন্ম। আল-জুহুরির (মৃ. ৭৪২) মতে আব্রাহার ঘটনার আঠারো বছর পর প্রফেটের জন্ম; আর ইবন আল-কালবির (মৃ. ৮২০) মতে, তেইশ বছর পর অর্থাৎ 'year of the elephant'-এর তেইশ বছর পর।

অভিযান থেকে প্রত্যাবর্তনের পরই আব্রাহার মৃত্যু হয় এবং তার পরবর্তী দু'জন উত্তরাধিকারী স্বৈরশাসনের কারণে সাইফ ইবন ধু-ইয়াজান নামে এক স্থানীয় হিমিয়ার নেতা হিরার দরবারে আপিল করেন। এই আপিলের জন্য তিনি পারস্যের সাহায্য লাভ করেন।

পারস্য থেকে সমুদ্রপথে এক অভিযানের ফলে ৭৫৬ খ্রিস্টাব্দে পারস্য আবিসিনিয়াদের বিতাড়িত করে এবং হিমিয়ার পারস্যের একটি প্রদেশে পরিণত হয় এবং এই অবস্থা পঞ্চাশ বছর ধরে চলে। এরপর পারসিয়ানরা স্থানীয় প্রকাশক নিযুক্ত করে যিনি সানাতে নিযুক্ত পারস্য গভর্নরের অধীনে কাজ করতে থাকেন।

সানার সর্বশেষ গভর্নর ছিলেন বাধান যিনি সাসানিয়ান সম্রাট দ্বিতীয় খসরু পারভেজের রাজত্বকালে সানা শাসন করেছেন; পরে ৬২৮ খ্রিস্টাব্দে এই রাজ্য মুসলিমদের দখলে আসে। দু'বছর পর হিমিয়ারাইটসদের জোর করে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করা হয়।

www.pathagar.com

৪

ইসলাম-পূর্ব আরব

৪.১ আরবি ভাষা

আরবি সেমেটিক ভাষাগুলোর মধ্যে একটি। ইসলামের পূর্বে এ ভাষার যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল এবং ৪৮০ খ্রিস্টাব্দেই জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং আরবের অধিকাংশ অঞ্চলে এ ভাষা দ্রুত প্রসার লাভ করে। কবিরা এ ভাষায় কবিতা বর্ণনা করেছে এবং কস বিন সাইদা ও তায়েফের উমায়া এই ভাষাতে সংস্কার ও শিক্ষা-দীক্ষা দিতে শুরু করেন।

এই ভাষার প্রধান পৃষ্ঠপোষক আরাবিরা খ্রিস্টান রাজ্যগুলোতে প্রধানত হিরার লাখমিদদের মধ্যে। এই লাখামিদরা সরকারি ভাষা হিসাবে আরবিকে প্রথমেই গ্রহণ করে ৫২০ খ্রিস্টাব্দে এবং ষষ্ঠ শতাব্দির শেষের দিকে এই ভাষা সারা আরব পেনিনসুলাতে ছড়িয়ে পড়ে কবিদের কবিতা ও ভ্রাম্যমাণ গাতকদের দ্বারা (হুমায়ূন আহমেদ গাতক শব্দটি চালু করেছেন)। এই আরবি সাহিত্য, ব্যাকরণ ও শব্দভাণ্ডার পরিপূর্ণ হয়েছে নন-আরব বিদেশী শব্দের দ্বারা, বিশেষ করে আরামাইক, সিরিয়াক, হিব্রু, পাহলবি, ইথিওপিক, গ্রিক ও গ্রিক ইউনান এবং বাইজানটাইন (রুম)।

এই নতুন ভাষা উত্তরোত্তর প্রসার লাভ করতে থাকল, শব্দ ব্যবহার ও প্রকাশের ধারাকে অবস্থার সাথে সঙ্গতিপূর্ণভাবে কিছুটা পরিবর্তন করে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে হিজাজের অবস্থান মধ্যপথে, তাই আরবে অন্যান্য অঞ্চল থেকে হিজাজে বিদেশীদের দ্বারা বেশি প্রভাবিত এবং এখানেই পরবর্তীতে কোরানিক আরবি ভাষার উৎপত্তি। প্রফেট মোহাম্মদের পূর্বে হেজাজে কোরানিক ভাষার পরিচিতি ঘটেছিল বেশি কেননা সংকলনের সময় হেজাজে প্রচলিত ভাষা ব্যবহৃত বেশি হয়েছে বলে অনেকে ধারণা করেন।

ইসলামের পরে এই ভাষার আরো উন্নতি হয় লেখক ও পণ্ডিত ব্যক্তিদের দ্বারা, প্রধানত খ্রিস্টান অধ্যুষিত এলাকা কেন্দ্র নাজাফ (পূর্বে হিরা), কুফা (একদা একুলা বলে কথিত) এবং বসরা (পূর্বে খ্রিস্টান স্থাপনা)। কুফা ও বসরা উভয়ের বাসিন্দা পরিশুদ্ধ ভাষায় কথাবার্তা বলে থাকে, যে অঞ্চলে একদা খ্রিস্টান লাখমিদ বংশ রাজত্ব করেছে এবং তাদেরই সাংস্কৃতিক ট্র্যাডিশন এখনো বজায় আছে।

৪.২ আরাবিক হস্তলিপি

আরবি হস্তলিপি আবিষ্কারের বহু পূর্বে আরবের বিভিন্ন অঞ্চলে আঞ্চলিক স্থানীয় কথিত

www.pathagar.com

শব্দে লিখিত হতো এবং এর মধ্যে অনেকেই ছিল খ্রিস্টের জন্মের বহু শতাব্দির পূর্বে। এই সব হস্তলিপির প্রতিলিপি খোদিত ছিল বিভিন্ন প্রস্তর খণ্ডে যার প্রথম নিদর্শন পাওয়া যায় দক্ষিণ আরবে মোসনাদ প্রতিলিপিতে। এইসব লিপি ছিল হিমিয়ারাইট। সাবিয়েন, মিনায়িয়েন এবং অন্যান্য দক্ষিণ অঞ্চলে ডায়ালেক্ট কথাভাষা। এছাড়া ইসলাম-পূর্ব প্রতিলিপি ছিল তালমুদ, লিহিয়ানাইট এবং সাফাইট (উত্তর-পশ্চিম দক্ষিণের সাফা)। উল্লেখযোগ্য অন্যান্য প্রমাণ ছিল মোসনাদ আরামাইক, নাবা তিয়ান, সিরিয়াক ও গ্রিক হস্তলিপির, যা পাওয়া গিয়েছিল ২৬৭ খ্রিস্টাব্দে হিজরে, নামারায় (৩২৮ খ্রিঃ), এলেপ্পোর দক্ষিণ-পশ্চিমে জাবাদে (৫১২ খ্রিঃ) এবং হাররানে (৫৬৮ খ্রিঃ)।

এটি অনুমিত যে, ৫২০ খ্রিস্টাব্দে দক্ষিণ আরবের হস্তলিপির মতো কিছু পাওয়া গেছে হিজাজে, যদিও এখন এর কোনো প্রমাণ নেই। এই অঞ্চলে হিব্রু ও সিরিয়াক হস্তলিপি অজানা ছিল না।

প্রাথমিক আরবি হস্তলিপির ইতিহাস পরিষ্কার নয়, ধোঁয়াশাপূর্ণ, বিক্ষিপ্ত। বিশ্বস্ত সূত্রের এ তথ্য ভ্রান্তিপূর্ণ এবং উৎসও ছেঁড়া ছেঁড়া। পুরনো ট্রাডিশনের অনেকটা এ বিষয়ে সংকলন করেন হিশাম আল-কালবি (মৃ. ৮২০) এবং হাইথাম ইবন আদি (মৃ. ৮২১); পরে সংকলিত হয়েছে কালাধুরি (মৃ. ৮৯২) কর্তৃক সংগৃহীত কিছু নতুন মালমশলা থেকে। এই সংকলিত গ্রন্থ ব্যাফ্রিয়ান ঐতিহাসিক ইবন খালিকান (মৃ. ১২৮২) কর্তৃক আরও নতুন আঙ্গিকে পরিবর্ধিত করা হয়েছে।

কথিত আছে যে প্রায় ৫১০ খ্রিস্টাব্দে খ্রিস্টান তাঈ উপজাতির বাইয়ান গোত্রের তিনজন মানুষ হারামাইক বর্ণমালার অক্ষর গ্রহণ করেছিল। এই বর্ণমালা দ্বিতীয় শতাব্দিতে নাবাতিয়ানরা ব্যবহার করত। নাবতিয়ানরা এই বর্ণমালা থেকে বাইশটি অক্ষরের আরবি হস্তলিপির মূল কাঠামো উৎপন্ন করে। এই হস্তলিপি পরে আনবারের মোরামির ইবন মোরা কর্তৃক পরিশীলিত হয়। আনবার ছিল খ্রিস্টান উপজাতি ইয়াদ (Iyad)-এর রাজধানী।

মোরামির এক সিরিয়াক পণ্ডিত ব্যক্তির আরবি নাম। এই পণ্ডিতের আসল নাম ছিল মার আমের। তিনি এই বাইশ অক্ষরের সাথে আরও ছয়টি অক্ষর যোগ দিয়ে মোট আটাশটি অক্ষর করেছেন।

নতুন অক্ষরের আকৃতি প্রাচীন সিরিয়ায় চৌকো মডেল থেকে গ্রহণ করা হয়েছে এবং একে অনেককাল ধরে ইবাদ উপজাতির আকুলা শহরের খ্রিস্টান ক্যালিগ্রাফাররা পারফেক্ট করে তুলেছেন। এ লেখার ধারা ছিল খোদাই করা, যেমন পাথর কেটে লিখে পরে চার্চের দেয়ালে বসিয়ে দেয়া। যে আকুলা শহরে এই সব উন্নয়নের কাজ হয় তার নাম পরিবর্তন হয়ে এখন কুফা হয়েছে কারণ এই লিখন পদ্ধতির নাম ছিল কুফিক (Kufic)। এই পদ্ধতি স্মারকলিপির উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হতো, পরে আলঙ্কারিত পদ্ধতিতে কোরান লিখিত হয়। কুফিক বর্ণমালা বা অক্ষর হিরাতে সংশোধিত হয়ে আছে এবং এখানে বক্রাকারে লিখন পদ্ধতিকে 'নাসখি' বলা হয় এবং লিপিকাররা সংস্কার করে পাণ্ডুলিপি থেকে বোধগম্য ভাষায় লিখতে আরম্ভ করে। আরবি বর্ণমালার সূত্রানুসন্ধান করতে গিয়ে পণ্ডিত আল-সুলি (মৃ. ৯৪৬) বলেন কেমন করে আরবরা হিরার লোকজনদের কাছ থেকে লিখন শিল্পের শিক্ষা

www.pathagar.com

গ্রহণ করে (Grunebanum, 1964 P. 344)।

এই হিরা থেকেই কিতাব (book) ও কাতিব (writer) শব্দাবলি আরবদের মধ্যে ছড়িয়েছিল। লেখার ব্যাপারে অন্যান্য শব্দ যা আরবিতে মিশে গেছে তার মধ্যে ক্রল (সিজিলি), কবর (সিফর), কলম (কালাম, গ্রিক-কালামস), পাতা (সহিফ), কাগজ (কিরতাস) অন্যতম।

প্রায় ৫৬০ খ্রিস্টাব্দে বশির ইবন আব্দুল মালেক নামে কালবের এক খ্রিস্টান প্রিন্স হিরাতে লিখন দক্ষতা লাভ করেন। তিনি দুমার শাসনকর্তা ছিলেন। তিনি মক্কায় গমন করেন এবং আবু সুফিয়ানের দাদার (উমাইয়ার পিতা) হারবকে নাসখি লেখা শেখান। পরে হারব-ই এই নতুন লিখন পদ্ধতির দক্ষতা অন্যদের শিখিয়েছেন। ফলে নাসখি পদ্ধতি পুরানো লিখন পদ্ধতিকে সরিয়ে স্থান দখল করে নেয় এবং এখনও তা চলছে।

এখন পর্যন্ত যতটুকু লিখন পদ্ধতির উন্নতি হয়েছিল তাতেও গলতি ছিল, এই গলদ কোরান সংকলনের সময়েও দেখা যায়। প্রথমে সব আরবি বর্ণমালায় (সেমেটিক লিপির সমতুল্য) শুধু ব্যঞ্জনবর্ণ ছিল (Diringar, 1947, P. 275) এবং স্বরবর্ণের প্রয়োগ অনেক পরে হয়েছে। তাই অনেককাল ধরে প্রাথমিকভাবে আরবি লিপি এক প্রকার ক্ষুদ্রলিপি (Shorthand) ছিল বলা যায়।

অনেক আরবি অক্ষর ছিল ত্রি-অক্ষরে অর্থাৎ মূলে তিন-অক্ষর যুক্তাক্ষরে এবং প্রায় অনেক কথা একই মূলাধারে যুক্ত ছিল। তাই স্বরবর্ণের অ-বর্তমানে, উসুল (মূল-Root- QTL কাফ-তে-লাম) = কাত্‌ল, কাতালা বা কাতিল- এই তিন শব্দকেই বোঝাত যার অর্থ হত্যা, হত্যা করা, সে হত্যা করেছে বা হত্যাকারীও বোঝাত। এতে মানুষ অর্থ করত ভ্রান্তিমূলক। তাছাড়া যেমন ইংরেজিতে আছে ব্যঞ্জনবর্ণ HRD (স্বরবর্ণ ছাড়া) এ থেকে পড়া যেত Hard, Heard, Horde, Heard, Herod, Hired ইত্যাদি। তেমনি আরবিতেও এই গোলমাল ছিল স্বরবর্ণ ছাড়া।

আবার ইংরেজি যে 'C' অক্ষর-এ 'ক', 'স' শব্দ বেরিয়ে আসে— যেমন- Come (কাম) আবার Cent (সেন্ট), তেমনি পুরনো আরবি অক্ষরেও ছিল। যেমন, বে এবং 'তে', 'জিম' ও 'হে', 'সিন' ও 'শিন' অক্ষরগুলো একই আকারের কিন্তু এদের কোনো চিহ্ন বা নোক্‌তা দিয়ে আলাদা করা হয়নি; তাই পঠন ক্রিয়ায় মুশকিল হতো।

যেমন নিকলসন বলেছেন- 'It is impossible to read the same combination of consonants, bnt, net, byt, tnb, ntb, nyb and in various other ways' (1969 P. 201)

সংক্ষেপে বলতে গেলে বলা যায় যে, সে সময় আরবি লেখা হতো শুধু ব্যঞ্জনবর্ণ দিয়ে, এতে কোনো প্রকার পার্থক্য থাকত না। যেখানে কোনো চিহ্ন থাকত না স্বরবর্ণ বোঝাতে, অক্ষর সংশ্লিষ্ট চিহ্ন সম্বন্ধে বৈশিষ্ট্যমূলক কোনো প্রকার সংকেতও থাকত না।

পরিশেষে, আরবি বাক্যে শব্দগুলো বা অক্ষরগুলো একের সাথে অন্যটা জড়ানো থাকত, মধ্যে কোনো ফাঁকা বা যতি চিহ্ন থাকত না— কোথায় থামা দরকার, ভাগ করা দরকার কোনো প্রকার ইঙ্গিত বা চিহ্ন ছিল না, এর জন্য কোরান পাঠে, প্রাথমিক যুগে নির্ভুল পাঠ ও নির্ভুল ব্যাখ্যা করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াত।

www.pathagar.com

৪.৩ কবিতা

প্রাচীন আরবদের মধ্যে দৈনন্দিন জীবনে ভাষা বা গদ্যকথাকে স্মৃতি ধারণের জন্য যথেষ্ট বলে মনে করা হতো না এবং কোনো উল্লেখযোগ্য গদ্য সাহিত্য প্রাক-ইসলামী যুগ থেকে আমাদের হাতে নেমে আসেনি। অন্য দিকে কবিতাকে উৎসাহদাতা ভাষা মাধ্যম বলে গুরুত্ব দেয়া হতো। পদ্য ছিল উত্তেজনাপূর্ণ আবৃত্তি যাতে অন্তরে রণধ্বনি সৃষ্টি করত, চেতনা করত জাগ্রত। কিন্তু এ বিষয়ে মতভেদও ছিল এবং আরবরা কবিতার প্রতি তাদের মনোবৃত্তিকে ভিন্ন ধারায় প্রবাহিত করত।

সাধারণত কবিদের মনে করা হতো আধ-পাগলা, ভাবালু, খেয়ালি। তারা নির্ভর করত এই ধারায় যে কবি-সত্তার অনুপ্রেরণা অদৃশ্য শক্তি থেকে লাভ করা যায়। এদের জাদুকর বা ম্যাজিশিয়ান (সাহির) বলা হতো। কবিরা ভূতগ্রস্ত হতে পারত (মাশুর) এমনকি জীনে 'অধিগ্রস্ত (মাজনুন)। দুষ্ট আত্মা কর্তৃক পরিচালিত হয়ে সে মিথ্যা বাণী প্রচার করে প্রবঞ্চনা করার চেষ্টা করত।

কবিতাকে ঐশীবাণী এবং ম্যাজিক কর্ম বলে ধরা হতো এবং কারোর ক্ষতি করা বা অভিশাপ দেওয়ার জন্য মানুষেরা কবিদের সাহায্যের আশা করত। কবিরা প্রয়োজনে তাদের মাথা আবরিত করে রাখত কাপড় বা বড় চৌকো রুমাল দিয়ে (বারদা), মনে হতো যেন তারা তার আড়ালে কোনো অদৃশ্য শক্তির কাছ থেকে বার্তা চেয়ে পাঠাচ্ছে। জাদুকরদের মতো কবিরা মন্ত্রপাঠ করে শপথ নিত এবং পৃথিবী ও স্বর্গের কাছ থেকে সাহায্য চাইত তাদের উচ্চারণ ও বাক্যে সাফল্যের জন্য।

কবিদের পক্ষে অবশ্য ভালো বলারও কিছু ছিল। বিশ্বাস করা হতো যে কবিরা অনুপ্রেরিত অবস্থায় জ্ঞানী বলে মনে হতো। শাইর বা স্বর্গীয় সত্তা বা ভবিষ্যৎ বক্তা (কাহিন)। কবিরা উপযুক্ত সময়ে তাদের আবেগের মুহূর্তে চমৎকার কবিতার চরণ রচনা করে ফেলতে পারত। যখন তাদের কোনো অনুষ্ঠানে বা আয়োজনে ডাকা হতো কবিতা বর্ণনার জন্য তারা অদৃশ্যকে আহ্বান করে কবিতা রচনার মাধ্যমে গৃহস্থের জন্য শান্তি ও মঙ্গল কামনা করত। যদিও তাদের এই আচরণের ও স্বভাবের জন্য সময়ে সময়ে তাদের চারিত্রিক উৎকর্ষের জন্য প্রফেটের স্বীকৃতি দেয়া হতো কিন্তু তারা সে মর্যাদা পেত না ওল্ড টেস্টামেন্টের নীতির কারণে।

প্রাচীন আরবি কবিরা বিশেষ করে রাজদরবারের কবিদের মর্যাদা আলাদা ছিল তাদের কাব্যিক ও ছান্দিক গুণাবলির জন্য। তাদের কবিতার স্টাইল, ছন্দের মাধুর্য, পঠনে সঙ্গীতের ধ্বনি, স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের সুষম ব্যবহার অপূর্ব দ্যোতনায় আন্দোলিত ছিল। তারা নতুন ছন্দ ও গদ্যের মিল এবং ইত্যাদি আবিষ্কার করে তাকে আরও উন্নত করত এবং ভাষা ও কাব্যের চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করত এবং উৎকর্ষের মান এমনভাবে গ্রন্থিত করত যা পরবর্তী কবিদের জন্য অনুকরণীয় হতো।

এমনকি ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে এই কবিতার মান, ছন্দ, স্টাইল, শব্দের ব্যবহার ইত্যাদি উৎকর্ষের চরম পর্যায়ে পৌঁছেছিল, যা পরবর্তী কবিদের আর নতুন করে এর উন্নয়নের জন্য কোনো কবিকে চিন্তা করতে হয়নি।

আরবি কবিতায় বিভিন্ন ধরনের ছন্দ ব্যবহার করা হতো। তার মধ্যে 'সাজ' ছিল ছান্দিক ও গতিময় গদ্য, ছোট ছোট শব্দ সমষ্টি দ্বারা গঠিত। এই বিশেষ ধরনের

www.pathagar.com

কবিতা কাহিন বা জাদুকরেরা ব্যবহার করত অভিশাপ আরোপের সময় এবং কোনো প্রকার গুহ্য ব্যাপারকে কেন্দ্র করে। অন্য আর এক প্রকার কবিতা ছিল কাসিদা বা কাউকে উদ্দেশ্য করে তার গুণগান করা। আর এক ধরনের ছিল 'বাসাজ' দুই অক্ষর পদ বিশেষ (iambic); আর ছিল গজল প্রেমগাথা (lyric)। এই গজল পরে আরও উন্নত হয় উধরার খ্রিস্টান গোত্রের দ্বারা। কিছু কবিতাকে অভিশাপ দেয়ার জন্য ছড়া আকারে উচ্চারণ করলে অন্তরে বেশ আঘাত হানত এবং 'হিজা' বিদ্রূপাত্মক কবিতার রূপ ছিল ধ্বংসাত্মক। কিছু কবিতা ছিল যেসব উৎসবকালীন গীত হতো, কারোর জন্য প্রশংসাসূচক গাথা, যুদ্ধ কাব্য এবং শোকগাথা রূপে ব্যবহৃত হতো।

প্রথমে, প্রায়ই প্রাচীন কবিতা বা কাব্য মৌখিকভাবে– পেশাদার আবৃত্তিকারের মাধ্যমে (রাবী) বলা হতো। এরা স্মরণ রাখত, ঘনঘন পুনরাবৃত্তি করত এবং পরবর্তী বংশধরদের দিয়ে যেত। প্রত্যেক পেশাদার কবির, যারা লিখতেও পারত এদের নিয়েও একজন রাবী থাকত, তার কাছে তার কবিতা মুখস্থ করিয়ে দিত, আবার এই রাবীরাও অন্যদের কাছেও সে কবিতা শিখিয়ে দিত। প্রাচীন প্রাক-ইসলামী বিখ্যাত কবি ইমরুল কায়েসও অন্য এক কবির রাবী ছিলেন। কবি ধু-রুমা (মৃ. ৬৩৮) লিখতে-পড়তে জানতেন না, কিন্তু রাবীরা তার কাছ থেকে মুখে কবিতা শুনে মুখস্থ করে নিত।

রাবীরা কবিদের বংশ তালিকা জানতেন কাব্যের বা কবিতার মর্ম বোঝার জন্য এবং কোন সময় ও পরিবেশে কবিতাটি লেখা হয়েছিল তাও মনে রাখত।

প্রাচীনকালে নিয়মিতভাবে কবিতার প্রতিযোগিতা হতো, ছান্দিক গদ্য এবং তাৎক্ষণিকভাবে রচিত কবিতা, সাথে সাথে তর্ক-বিতর্ক ইত্যাদি বিভিন্ন মেলায় অনুষ্ঠিত হতো। দক্ষিণে নাজরান শহরে, মক্কার কাছে মাজনাতে, ধুউল মাজাজে– যা আরাফাত পাহাড়ের নিচেই অবস্থিত। সবচেয়ে বিখ্যাত কবিতা প্রতিযোগিতা হতো মক্কার পূর্বে নাখালা উপত্যকার পাশে উন্নয়নশীল মার্চেন্ট শহর ওকাজ-এ।

ধু-আল-কাদা মাসে সাত দিনব্যাপী ওকাজ-এ বিশাল জনসমাবেশ ঘটে। ধু-আল-কাদা পবিত্র মাস— এ মাসে যুদ্ধ-মারামারি-হানাহানি ইত্যাদি নিষিদ্ধ।

এই ওকাজের মেলা বা সমাবেশ শুরু হয়েছে খ্রিস্টান তামিম গোত্রের তত্ত্বাবধানে, এই মেলায় যে কবিতা জয়লাভ করত তা নিকটে পবিত্র মন্দিরে টাঙিয়ে রাখা হতো। ওকাজ মেলা প্রাচীন আরবের সামাজিক, সাহিত্যিক ও রাজনৈতিক জীবনের মিলন কেন্দ্র ছিল। মুক্ত ও অবাধ আলোচনা, যুক্তি-তর্ক, বিভিন্ন গোত্রের মানুষের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর ঘটত এবং এই প্রতিযোগিতার ফলাফলকে সমগ্র পেনিনসুলার মধ্যে ছড়িয়ে দেয়া হতো, প্রচলিত প্রবাদবাক্য ছিল– 'ওকাজ আজকে যা বলে সারা আরবে আগামীকাল পুনরাবৃত্তি হয়।'

প্রাচীনকালের কবিদের রচনাই ছিল প্রাক-ইসলামী যুগের আরব সাহিত্য। ইসলামের আবির্ভাবের পর পুরনো সাহিত্যের অনেক কিছু উপেক্ষিত হয় কিংবা নষ্ট করে ফেলা হয় অবহেলায় এবং এটা সত্যই বিস্ময়ের; তবুও অনেক কিছু রয়ে গেছে।

ক্ষমতা গ্রহণের কিছু পরে প্রফেট মোহাম্মদ ওকাজের মেলা-উৎসব বন্ধ করে দেন কিছুটা তার কবিদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ ভাব, আর কিছুটা তার প্রচলিত নব্যধর্মের

www.pathagar.com

প্রতি সম্ভাব্য প্রতিবাদকে প্রতিরোধ করার জন্য।

মুসলিম ধর্মবিদরাও প্রাক-ইসলামী যুগের কবিতা ও সাহিত্যের মাধ্যমে আবেগ প্রকাশের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন না। কবিদের মদ্যপ্রীতি, নারীদের প্রতি মুক্ত প্রেম-ভালবাসা প্রকাশ, তাদের জীবনযাত্রা ও চিন্তাধারা, প্রাচীন আরবের (যাকে ইসলাম জাহেলী যুগ বলেছে) গুণগাথা ও শৌর্যবীর্য কীর্তন এবং প্যাগন দেব-দেবীর প্রতি জাগরণের আহ্বান প্রাচীন কবিদের অর্থোডক্স ইসলামবাদীদের সন্তুষ্ট করেনি। বলা হয়েছে যে যদি.কেউ পুরানো কবিদের উল্লেখ করে কোনো উপমা গড়ার চেষ্টা করেছে তাদের প্রতি মুসলিমরা বীতশ্রদ্ধ হতো এবং 'আল্লাত'-এর পরিবর্তে 'আল্লাহ' উচ্চারণ করিয়ে ছাড়ত।

মিশরীয় পণ্ডিত তাহা হুসেন, ১৯২৫ সালে লিখতে গিয়ে বলেন, যে প্রাক-ইসলামী যুগের অতি সামান্য মূল্যবান সাহিত্য উদ্ধার করা হয়েছে এবং যা কিছু অতি অল্প উদ্ধার হয়েছে তাও আবার ইসলাম প্রবর্তনের পরে তার 'মুসলমানি' করা হয়েছে। (Kritzeek 1964, P. 60)। অনেক পণ্ডিত ব্যক্তির ধারণা, এখন যা প্রাক-ইসলামী সাহিত্য বলে ধরা হয় তা আসলে প্রাচীন আরবি কবিদের রচিত কিনা সন্দেহের কারণ আছে।

প্রাক-ইসলামী যুগে অনেক খ্রিস্টান কবি ছিলেন, কিংবা কোনো খ্রিস্টান গোত্রের সাথে যুক্ত ছিলেন বা খ্রিস্টান প্রিন্সের দ্বারা পরিবেষ্টিত আরবি কবিতা ও সাহিত্যে খ্রিস্টান কবি-সাহিত্যিক ও গোষ্ঠীগোত্রদের দ্বারা উন্নত, এর কারণ আরবের সাথে খ্রিস্টান গোষ্ঠী-গোত্রের সম্পর্ক সাধারণত সেখানকার আদিবাসিন্দার মতো।

প্রাচীন ট্র্যাডিশন মতে কবিদের মধ্যে ছিলেন আইয়ুব ইবন মাহরুফ (প্রায় ৪৮০ সালে প্রতিষ্ঠিত) তিনি ছিলেন তামিম গোত্রভুক্ত। ইবন আরাবীর মতে, তিনিই ছিলেন প্রথম খ্রিস্টান আরব কবি। যুদ্ধ কবি মুহাল্লিল ইবন রাবিয়া (৫০০ সালে প্রতিষ্ঠিত) ছিলেন খ্রিস্টান তাঘলিব গোত্রভুক্ত। তিনিই প্রথম আরবি গীতিকাব্য রচনা করেন। বিস্তাম ইবন কাইস (৫১০ সালে প্রতিষ্ঠিত) ছিলেন খ্রিস্টান কিন্দা গোত্রের।

কবি সামাওয়াল (স্যামুয়েল) ইবন আদিয়া (৫৩৫ সালে প্রতিষ্ঠিত) ইহুদি ধর্ম গ্রহণ করেন। তার আনুগত্য প্রবাদ প্রমাণ ছিল এবং একথা প্রত্যেক মরুবাসীর মুখে মুখে ফিরত কারণ তিনি তার কাছে গচ্ছিত ইমরুল কায়েসের (তখন তিনি কনস্ট্যান্টিনোপলে) মালামাল কাউকে দিতে অস্বীকার করেন। এই প্রতিরোধের কারণে অপরের হাতে তার চোখের সামনে নিজের পুত্রের মৃত্যু পর্যন্ত তাকে দেখতে হয় তবুও তিনি ইমরুল কায়েসের মাল হাতছাড়া করে অবিশ্বাসী হতে চাননি। মুতালামিস (মৃ. ৫৭০) মদ্যপায়ী ছিলেন। তার আসল নাম ছিল জারির ইবন আবদুলমসিহ। তিনি তামিম গোত্রের খ্রিস্টান, তার আসন ছিল হিরার রাজদরবারে।

কবি আদি ইবন জাইদ (৫৮৭ সালে প্রতিষ্ঠা) আয়ুব গোত্রভুক্ত ছিলেন। পারস্য রাজ প্রথম খসরুর অধীনে চাকরি করতেন এবং লাখিমিদ রাজদরবার কর্তৃক পরিপোষিত। মদের জন্য কবিতা লিখে তিনি নাম করেন, যদিও তিনি খ্রিস্টান ছিলেন। আরব ট্রাডিশনের কয়েকজন কবির গভীর অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছে আদির গীতিকাব্যের একটি চরণে যে চরণে তিনি মক্কার প্রভু এবং যিশুর ক্রুশকে লক্ষ্য করে আহ্বান জানান।

www.pathagar.com

পুরাতন সূত্র থেকে প্রাপ্ত যে, আরবে সাতটি অতি উত্তম গীতিকাব্য আছে যার নাম 'মোয়াল্লাকাত',- সম্মানজনক অতি-পঠিত। এই শব্দের আর একটি অর্থ মুলতবি (Suspended)। কারণ এই সম্প্রীতি কবিতা বা কাব্য প্রত্যেকটি ষাট থেকে একশো পয়ার ছন্দে রচিত এবং কথিত যে এই সব ছন্দ সোনার অক্ষরে পর্দার কাপড়ে লিখিত এবং এই পর্দা কাবাকে অলংকৃত করেছে। মহামূল্যবান এই সব ছন্দ বহু বছর ধরে সংগৃহীত। এই সাতটি গীতি কবিতার সাথে পরে আরও দুটি সংযোজিত হয়ে একুনে নয়-এ দাঁড়িয়েছে। এই নয়টি স্থানীয় কবিতার কয়েকটি রচিত হয়েছে খ্রিস্টান কবিদের দ্বারা। মোয়াল্লাকাতের কবিদের মধ্যে হচ্ছেন :

ইমরুল কায়েস (মৃ. ৫৪০), ইনি কিন্দার রাজকীয় পরিবারের একজন যুবরাজ। বেশির ভাগ সময় ইনি বাইজানটাইন রাজদরবারে সময় কাটিয়েছেন এবং একে প্রাক-ইসলামী যুগের শ্রেষ্ঠ কবিদের মধ্যে একজন ধরা হয়। খলিফা ওমর এবং খলিফা আলী উভয়েই এর প্রতিভার প্রশংসা করেছেন। মোয়াল্লাকাতের মধ্যে কায়েসের গীতি কবিতা উৎকৃষ্ট বলে গণ্য।

আমর ইবন কুলসুম (মৃ ৫৭০), ইনি খ্রিস্টান তাঘলিব গোত্রভুক্ত এবং ইমরুল কায়েসের পৌত্র। কালব বা বকর গোত্রের হারিথ ইবন হিলিজার পৌত্র। হিলিজা মারা যান ৫৭০ সালে। ইনি হিরার রাজা আমর ইবন হিন্দের রাজদরবারের কবি।

তারাফা (মৃ. ৫৬০), ইনি তার চাচা কুলসুমের মতো হিরার দরবারের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। তারাফার ক্ষুরধার বাণীর জন্য তিনি রাজরোষে পতিত হন এবং আমর ইবনে হিন্দ মাত্র চব্বিশ বছর বয়সে তাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন।

অন্তরা (মৃ. ৫৯০) আব্‌স গোত্রের আরব-নিগ্রো কবি। তিনি সব ধরনের কবিতা লিখতে চেষ্টা করতেন, কিন্তু অনুযোগ করতেন যে তার পূর্বসূরিরা তার জন্য নতুন কিছু রেখে যাননি।

নাবিঘা (মৃ. ৬১০)। লাখামিদ গোত্রের মানুষ। তার সময়ের বেশির ভাগ তিনি কাটিয়েছেন ঘাসান ও হিরার রাজদরবারে। তিনি খ্রিস্টান ধর্ম সম্বন্ধে যথেষ্ট ওয়াকিফহাল ছিলেন এবং লোকে বলে তিনি নিজেও খ্রিস্ট ধর্ম পালন করতেন বলে কথিত। যদিও অনেকে এ ব্যাপারে একমত ছিলেন না।

জুহাইর (মৃ. ৬২৫)। লাখমিদ গোত্রের আর একজন সদস্য, খ্রিস্টান বলে পরিচিত, তবে অনেকে তা অস্বীকার করেছে। তিনি প্রফেটের সময়ে বেঁচে ছিলেন, কিন্তু ইসলাম গ্রহণ করেননি। তিনি বলতেন আল্লাহই জানে সত্য কোনটা এবং বিচারের দিনে এর প্রকাশ ঘটবে।

যে দু'জন কবি পরে এই সাতজনের সঙ্গে সংযুক্ত হন তারা হলেন আশা এবং লাবিদ। আশা (মৃ. ৬২৯) আরব কবিদের সমগোত্র। কথিত আছে যে ইবাদি (যদিও মদের ব্যবসা করতেন) তাকে খ্রিস্ট ধর্ম শিক্ষা দেন। তিনি হিরাতে বেশির ভাগ সময় কাটাতেন এবং এক লাখমিদ যুবরাজের ঘনিষ্ঠ বন্ধু হন। এছাড়া তিনি নাজরানের বিশপেরও বন্ধু ছিলেন। লাবিদ (মৃ. ৬৬২)। প্রাক-ইসলামী যুগের শেষ জেনারেশনের কবি। লাখমিদ শাসকদের তিনি সহানুভূতি ও সাহায্য পেয়েছেন। ৬০১ সালে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন, এর পর তিনি আর কবিতা লেখেননি। ১১২

www.pathagar.com

বছর বয়সে তিনি মারা যান।

প্রাক-ইসলামী যুগের কবিরা তৃণমূলের কবি ছিলেন এবং আমজনতার সাথে জড়িত থেকে গদ্য জীবন ও দৃষ্টিভঙ্গি সম্বন্ধে লিখে গেছেন। বিশেষ বিষয়ের ওপর তারা রচনা করেছেন কাব্য ও গাথা; প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, মরু জীবনের সুখ-দুঃখ, খামর বা মদের আনন্দ, রোমান্টিক প্রেম, সামাজিক ন্যায়বিচার এবং জীবন ও মৃত্যুর একের ওপর অন্যের প্রতিফলন। অনেক কবি ছিলেন যারা আরবের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত বিচরণ করতেন, মানুষের দ্বারা সংবর্ধিত হতেন এবং তাদের কাছ থেকে কবিতাগাথা শুনতে ভালবাসতেন। কথিত আছে কবিদের বাণী মরুর উপর দিয়ে তীরের চেয়ে বেগে উড়ে বেড়াত।

মরুর বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে কবিতা একটা অদৃশ্য বন্ধন গড়ে তুলেছিল। আরবের বিশ্বস্ততার মহিমা, সাহস, আতিথিয়েতা, আত্মত্যাগ ও অন্যান্য মহৎ গুণাবলি এবং তাদের দেব-দেবীদের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা, আর একেশ্বরবাদের ওপর একাগ্রতা (আল্লাহর ধারণা ও ক্ষমতা)— এসবই তাদের সামাজিক, ধর্মীয় ও নৈতিক চেতনায় একটি একক জাতিতে অর্থাৎ আরব জাতিতে পরিণত করেছে।

এই সব কবিতার মাধ্যমে আরবের মধ্যে অতীতের যোগসূত্রকে দৃঢ় করেছে। কবিদের বলা হতো আরবের ঐতিহাসিক লেখ্যাগার (Archievs of the Arab)। তাদের কবিতার চরণগুলো আরবের হারিয়ে যাওয়া জাতিদের স্মরণ করিয়ে দেয়, যেমন তসম, জাদিস ও বাহম, পুরনো গোত্রদের সাথে তাদের সম্পর্ক; সময়ের কালে ভুলে যাওয়ার যুদ্ধ-বিগ্রহের ইতিহাস যার আর এখন কোনো চিহ্ন নেই। প্রাচীন আরবের রীতি-নীতি ধর্ম সম্বন্ধে অনেক তথ্য জোগায়, আর গোষ্ঠীগাথা, গ্রাম্যনীতি, ট্রাডিশন ও প্রথা, জাতির ইতিহাস যা এখন সব হারিয়ে গেছে, তার ঠিকানা মেলে এই কবিতা ও গাথার মাধ্যমে।

আরবের প্রাচীন কবিতা পাঠে পুরনো কবি ও মানুষদের জীবন সূত্র খুঁজে পাওয়া যায়। কবিরা যেসব রাজা, যুবরাজ ও প্রশাসকদের কথা লিখে গেছেন তাদের ঐতিহাসিক ও সামাজিক পটভূমি জানতে পারা যায়। তার সাথে পাওয়া যায় কবিদের জীবনী।

এই কবিতার মধ্যে আরবের বিশাল শব্দ ভাণ্ডার, লিখন পদ্ধতি, কবিতার পদ, ছন্দ, ব্যাকরণের ব্যবহার ইত্যাদি যা কবিরা প্রয়োগ করেছেন সেগুলো এখন আরবের ভাব ও সংস্কৃতির গবেষণার উৎস হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে; সেইমত আরবি পণ্ডিতগণ যারা এখন ইসলামের অরিজিন এবং কোরানের ব্যাখ্যা নিয়ে আলোচনা করছেন তারা এখনকার যুগের কবিদের কাব্য ও কবিতার ওপর আলোকপাত করার সুযোগ পাচ্ছেন।

এটা মনে করা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ যে আরবি সাহিত্যের মান বা স্ট্যান্ডার্ড কোরানের ভাষায় প্রতিষ্ঠিত হয়নি, হয়েছে প্রাক-ইসলামী যুগের কবিদের ভাষা ও শব্দ ভাণ্ডার এবং গ্রন্থিত রচনার মাঝে এবং আরবি ভাষাতত্ত্ব (philology) অভিধান সংকলন বিদ্যা (Lexicography) এবং ব্যাকরণ কোরানের ওপর ভিত গড়ে ওঠে, কিন্তু উঠেছে প্রাচীন কবিতার মধ্যে (Gibb 1974. P. 39)।

www.pathagar.com

আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (মৃ. ৬৮৭) প্রফেট কাজিন ছিলেন। তিনি ছিলেন বাইবেল ও কোরানের (টীকাকার) exigesis, ইনিই কোরানের কোনো অপ্রচলিত শব্দ বা ব্যাখ্যার সূত্র খুঁজতে প্রাক-ইসলামী যুগের কবিতার সাহায্য গ্রহণ করতেন।

প্রফেটের একজন বিজ্ঞ অনুসারী আবু আসওয়াদ আল-দুয়ালি (মৃ. ৬৮৮) যখন কোরানের শব্দের প্রয়োগ রীতির ওপর একটি সরল ব্যাকরণ ও শব্দকোষ প্রস্তুত করার কথা চিন্তা করেন (বাইবেলের মত), তখন তিনি তার সাহায্যকারী হিসাবে আব্দুল কাইস গোত্রের খ্রিস্টান কবি-পণ্ডিত ব্যক্তিদের নিয়োগ করেন।

আরব ভাষাতত্ত্ববিদ ও বৈয়াকরণ খলিল ইবন আহম্মদ (মৃ. ৭৯০) প্রাচীন কবি ও ওমানের মাজুন গোত্রের লোকদের সাহায্য নিয়েছিলেন আরবি ছন্দ প্রকরণের (Prosody) নিয়মাবলিকে সুসমন্নত করতে। তার এই মূল্যবান গ্রন্থ এখনো আরবি সাহিত্যে সমুজ্জ্বল। কঠিন ও অপ্রচলিত আরবি শব্দের একটি বিশাল অভিধান সংকলন করেছেন আলেম ও পণ্ডিত ব্যক্তি আবু ওবায়েদ আল-কাসিম সাল্লাম (মৃ. ৮৩৯)। ঐসব শব্দ-সম্ভার নিয়ে সেসব শব্দ আরবি কবি ও সাহিত্যিকরা– বিশেষ করে প্রাক-ইসলামী যুগের কবিরা ব্যবহার করে গেছেন। আবু ওবায়েদ আল কাসিম সাল্লাম হেরাটবাসী এক গ্রিক দাসের পুত্র।

www.pathagar.com

৫

মক্কার সময়কাল

প্রাক-ইসলামী আরবদের ঐতিহাসিক ও জৈবনিক (Biographical) ধারাবাহিক কোনো রেকর্ড বংশধারা সম্বন্ধে ছিল না, এই কারণে প্রফেট মোহাম্মদের বাল্য জীবনের ইতিহাস পাওয়া মুশকিল। তাই গোত্র প্রধান মুখে মুখে বর্ণিত খণ্ড খণ্ড সংবাদ এবং পেশাদার গল্পকারদের (Story teller) সূত্র ধরে প্রফেটের জীবনী গ্রন্থিত করেছেন প্রাথমিক জীবনীকারগণ। এই সব সংবাদ মুখে মুখে শতাব্দিকাল ধরে চলে এসেছে এবং কোনো জীবনীকার তাঁকে চাক্ষুষভাবে দেখেননি। আর একটা কথা ইসলামে কোনো গসপেল (সুসমাচার) নেই।

যারা প্রফেট মোহাম্মদের জীবন কাহিনী পড়ছেন এবং যে প্রাথমিক কাহিনীকাররা বর্ণনা করেছেন, মনে হয়, তাদের তিনটি উদ্দেশ্য ছিল :

(১) তাঁর জীবনকাহিনী ও তাঁর পারিবারিক ইতিহাস সম্বন্ধে যেসব সত্য-মিথ্যা তথ্য পাওয়া যায় সেগুলোকে সমাধান করা। (২) প্রফেটের মদিনা জীবনে প্রাথমিক অভিযাত্রা ও সামরিক যুদ্ধ-বিগ্রহ (মাঘাজি)-এর ঐতিহাসিক রেকর্ড তৈরি করা যেগুলোতে জীবনীকার ও ঐতিহাসিকরা তার ধর্মীয়তত্ত্ব প্রসারের চেয়ে বেশি আগ্রহশীল ছিল, কেননা পরবর্তীতে মুসলিম সম্রাট ও বাদশারা দেশ ও রাজ্য জয়ের জন্য বেশি অনুপ্রেরণা লাভ করে এবং (৩) কোরানে বিধৃত যেসব চ্যাপ্টারে দ্ব্যর্থ-বোধক ভাষ্য দেখা যায় তার পরিপূর্ণ ও গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা প্রদান করা।

প্রফেট মোহাম্মদের ঘটনাপূর্ণ জীবনের ধারাবাহিকতা পরিষ্কার নয় এবং প্রথমে যে চরিতকাররা তার জীবনী রচনা করেছেন তাঁরা ঘটনা ও বিষয়গুলোকে পর্যায়ক্রম অনুসারে সাজিয়ে বর্ণনা করেননি। ঘটনার কাহিনীর তারিখ ঘটনার সাথে উল্লেখ করা হয়েছে ঘটনা উল্লেখ করে, তারিখানুসারে নয় যেমন– "আমিনার মৃত্যুর ছ'বছর পর কিংবা আবু তালিবের মৃত্যুর আট বছর পর" ইত্যাদি।

প্রফেট মোহাম্মদের জন্ম তারিখ সম্বন্ধে কোনো সঠিক বক্তব্য নেই। এক একজন এক একটি দিন-ক্ষণ উল্লেখ করেছেন। প্রফেটের বাল্য ও কৈশোর জীবন এবং তাঁর প্রথম ধর্ম প্রচার ও প্রসারের তারিখ ও বিকৃত বর্ণনা খণ্ডভাবে পাওয়া যায়। ঐ সময় প্রফেটকে ব্যক্তি বা বক্তা রূপে অতি অল্পই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তিনি কি বলেছেন বা প্রচার করেছেন মক্কার লোকেরা বিশেষ করে তাঁর পরিবারের মানুষরা কোনো আমলে আনতো না। তাঁর প্রথম ওহির অবতরণের তারিখও 'মনে হয়'-এর মতো

www.pathagar.com

(approximately)। ৬২২ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে সমস্ত তারিখগুলো, যখন প্রফেট প্রায় বাহান্ন বছর বয়সে মক্কা থেকে মদিনায় আশ্রয় নিলেন এবং যখন থেকে মুসলিম সনের শুরু– বিতর্কিত বিষয়।

এই নির্দিষ্ট তারিখের বিষয় ছাড়া, প্রফেটের ব্যক্তিগত ও জনজীবনের ঘটনার যে বিবরণ পাওয়া যায় তা যথেষ্ট নয়। এই তাঁর জীবনের দুই-তৃতীয়াংশের ইতিহাস আসলে প্রশস্ত ব্যাহ্যিক আঁচড় মাত্র (broad outline)। (Dermenghem, 1958 P. 5) এবং তাঁর ঘটনাবহুল জীবনী নিয়ে বহু স্ব-বিরোধী ট্রাডিশন রচিত হয়েছে– এমনকি তাঁর মৃত্যুর অবস্থাকেও ঘিরে।

জানা যায় যে তাঁর জীবনী তথ্য সময় সময় সংগৃহীত হয়েছে ঐ সব ব্যক্তির নিকট থেকে যারা সংগ্রহ করেছে প্রাচীন সূত্র থেকে। এই সব মানুষরা তাদের জ্ঞান সেই পরিমাণ বিক্রি করত বদলে যতটুকু দাম পেত। অন্য কোনো স্থানেও এই কারবার অজানা ছিল না। কোরানে এ সম্বন্ধে উল্লেখ আছে যারা কম পয়সায় মুসার কেতাব থেকে বিকৃত সংবাদ বিনিময় করত (২ : ৭৩)।

প্রফেটের জীবনীর রচনার কারণে খবরা-খবর বেচা-কেনা চলেছে তাঁর মৃত্যুর অনেক বছর পরেও। এ ধরনের এক কুখ্যাত মানুষের নাম ছিল শুরা বিল ইবন সাদ (মৃ. ৭৪০)। ইনি একটি সাহাবার (যারা প্রফেটের সাথে উঠাবসা করেছেন) লিস্ট তৈরি করেছিল। যদি কোনো সংবাদ সংগ্রাহক উচিত মূল্য দিতে রাজি না হতো তাহলে বদরের যুদ্ধে প্রফেটের সঙ্গী কারা কারা ছিলেন তা দিতে অস্বীকার করত। পুরনো ঐতিহাসিকদের অনেকেই ইবন ইসহাকসহ, হয়তো তাদের কাউকে পাননি।

ঐতিহাসিকগণ এই মৌখিক সংবাদের ভিত্তিতে যা রেকর্ড করে গেছেন তা থেকে নিজেরা কিছু বাছাই করেছেন। তাদের কর্মের সংশ্লিষ্ট কিছু অংশ পরবর্তী লেখকগণ ইচ্ছামতো গ্রহণ বা বর্জন করেছেন। প্রত্যেক গ্রন্থকার চেষ্টা করেছেন পরবর্তী লেখকের চেয়ে তার গ্রন্থ উচ্চ মানের হোক, গ্রহণযোগ্য হোক।

প্রফেটের জীবনীতে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে শোনা কথা ও জনপ্রিয় ট্রাডিশন থেকে রচিত। প্রাথমিক জীবনীকারগণ তাই জানতেন যে তার গ্রন্থে বর্ণিত প্রফেটের সম্বন্ধে ঘটনাগুলো বা বর্ণনাগুলো অথেনটিক বলা যাবে না; কারণ কোনো কোনো স্থানে হয়তো তাদেরকে শুধু শোনা কথার ওপর বিশ্বাস করতে হয়েছে যার কোনো প্রমাণ ছিল না। সময়ে সময়ে তাদের সন্দেহকে ব্যক্ত করে খোলা মনে স্বীকার করেছেন– আল্লাহই জানেন এর সত্য-অসত্য সম্বন্ধে।

প্রফেট মোহাম্মদের প্রথম চরিতকার হচ্ছেন ইবন ইসহাক। তার সমসাময়িক মালিক ইবনে আনাস (মৃ. ৭৯৫) তার বিরুদ্ধে মিথ্যা ট্রাডিশন আমদানি করার অভিযোগ এনেছেন। অন্য আর একজন চরিতকার, ইবন হিশাম, খোলাখুলিভাবে স্বীকার করেছেন যে তিনি বিভিন্ন কারণে তার রচনা থেকে অনেক আইটেম বাদ দিয়েছেন। বিভিন্ন চরিতকারের রচনায় কি কি গ্রহণ ও বর্জন করতে হবে এই যে সমস্যা তা কখনো সমাধান হয়নি।

www.pathagar.com

৫.১ প্রফেট মোহাম্মদের চরিতকারগণ

প্রফেট মোহাম্মদের চরিতকারদের মধ্যে মদিনার ইবন ইসহাক-ই (মৃ. ৭৬৮) তার জীবনী সংকলন করেন। ইবন ইসহাকের দাদা ইয়াসার নামির গোত্রের একজন খ্রিস্টান ছিলেন। ৬৩৩ খ্রিস্টাব্দে ইরাকের আইন-আল তামার চার্চে তিনি ধৃত হন এবং মুসলিম সেনাপতি খালিদ বিন ওয়ালিদ দাস হিসারে তাকে মদিনায় নিয়ে আসেন।

ইবন ইসহাকের এই মহৎ কর্মটি তার পরবর্তী উত্তরাধিকারীদের দ্বারা বিশ্বাসযোগ্য বর্ণনা মনে করা হয়। এতে প্রফেট মোহাম্মদের আকৃতি, দৈনন্দিন জীবন এবং অভ্যাস, তাঁর যুদ্ধ অভিযানের বিস্তারিত বর্ণনা উল্লেখ করা হয়েছে। এই সব বর্ণনার মালামাল (মেটিরিয়াল) তিনি তাঁর সমসাময়িক সঙ্গী আল-জুহরীর নিকট থেকে গ্রহণ করেন। আল জুহরী এ সম্বন্ধে বহু ট্রাডিশন সংগ্রহ করেছিলেন। আল-জুহরি জুহরা গোত্রভুক্ত ছিলেন, যে গোত্রে প্রফেটের মা আমেনাও ছিলেন। ইবন ইসহাকের মূল জীবন গ্রন্থ হারিয়ে গেছে, কিন্তু এর অধিকাংশই তাঁর উত্তরাধিকারীদের গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে উদ্ধৃত হয়েছে।

উমর আল-ওয়াকিদী (মৃ. ৮২৩) মদিনাবাসী ছিলেন। প্রফেট সম্বন্ধে যে জীবনী তিনি রচনা করেন তাতে প্রফেটের সামরিক অভিযানের ওপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। আল-ওয়াকিদী প্রাথমিক চরিতকার হিসাবে মোটামুটি বিশ্বাসযোগ্য। বসরার ইবন হিশাম (মৃ. ৮৩৪) ইবন ইসহাকের রচনার সম্পাদনা করেন এবং কিছু অংশ পরিবর্তন করে সম্প্রসারিত করেন এবং কিছু নতুন অংশ জুড়ে দেন। ইবন সাদ (মৃ. ৮৪৫) আল-ওয়াকিদীর সেক্রেটারি ছিলেন। তিনি যে জীবনী রচনা করেন ঐতিহাসিকভাবে তা অস্পষ্ট (Dubious)। এতে প্রফেটের ও তাঁর সমসাময়িক সাহাবাদের বংশ লতিকার আধিক্য বেশি, ঘটনাবহুল নয়। আবু জাফর আল-তাবারি পারস্য-বংশোদ্ভূত ঐতিহাসিক ছিলেন। তিনিও প্রফেটের জীবনী রচনা করেন যা প্রায়ই পরবর্তী গ্রন্থকারদের দ্বারা উদ্ধৃত হয়েছে।

প্রফেটের এই সব জীবনীতে উল্লেখিত ঐতিহাসিক মূল্য সম্বন্ধে অনেক পশ্চিমা পণ্ডিত সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। কয়েকজন, যেমন হেনরি লেমেনস (Lemmens)-এর মতে কোরানিক টেক্সট্ ভাষ্যমূলক ব্যাখ্যা বিশুদ্ধ (জেনুইন) হলেও প্রায় বেশির ভাগ ঐতিহাসিক বিষয়গুলো আবিস্কৃত অর্থাৎ বানানো। অন্যান্য পণ্ডিত মনে করেন যে প্রফেটের জীবনী সম্বন্ধে কোনো কিছুকে নির্ঘাত সত্য বলা যাবে না। শুধুমাত্র কোরানিক কনফারমেশন ছাড়া।

মুসলিম চরিতকারদের রচনা ছাড়া কিছু অল্প-স্বল্প প্রফেটের জীবনী সম্বন্ধে তথ্য পাওয়া অমুসলিম সূত্র থেকে এর মধ্যে এমন কিছু আছে যা ইবন ইসহাকারেরও পূর্বে রচিত। ৬৩৪ ও ৬৪৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে গ্রিক ও সিরিয়াক ভাষায় রচিত সামান্য কিছু লেখা, ৬৩৮ সালে যখন মুসলমানরা জেরুজালেম দখল করে তখনকার হিব্রুতে কিছু লেখা পাওয়া যায় এবং ৬৬০ খ্রিস্টাব্দে একটি আরমেনিয়ান ঘটনাপঞ্জি (Chronical) পাওয়া গেছে এগুলোতে প্রফেট মোহাম্মদের জীবনের প্রাথমিক ঘটনাবলির কিছু তথ্য আমাদের সরবরাহ করে (Cook. 1983 P. 73)। এই সব তথ্য মুসলিম চরিতকারদের

www.pathagar.com

রচিত গ্রন্থে বর্ণিত ঘটনার সাথে কিছু অমিল পাওয়া যায়। এ ব্যাপারে কুক-এর বর্ণিত ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য (Cook. 1983 P. 73)।

যাই হোক এ পর্যন্ত মুসলিম ও অমুসলিম জীবনীকারগণ যেসব পুস্তক রচনা করেছেন তারা মূলত মুসলিম সূত্র ব্যবহার করেছেন, অমুসলিম সূত্রকে টেনে আনেননি।

৫.২ প্রফেটের পূর্বপুরুষ

পঞ্চম শতাব্দির মাঝামাঝি কোরেশ নেতা কোশে মক্কা নগরীর নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করেন। তার পুত্র আবিদ মনাফ তার স্থলাভিষিক্ত হন। আবিদ মনাফের চার পুত্র ছিল। এই চার পুত্র বিভিন্ন দেশে বাণিজ্য সম্পর্ক গড়ে তোলেন– যেমন আবদ্‌ মোতালেব ইয়েমেনে, নোফেল ইরাক ও পারস্যে, আবদ্‌ শামস্‌ আবিসিনিয়ায় এবং হাশিম সিরিয়াও মেসোপটেমিয়ায়।

আবদ শামস ও হাশিম জমজ সন্তান, দু'জনে কাঁধে লেগে ছিল। আবদ শামস মায়ের পেট থেকে প্রথমে বের হয়। এই যমজ সন্তানদের কাঁধ কেটে বিচ্ছিন্ন করা হয় তখনকার পদ্ধতিতে।

ষষ্ঠ শতাব্দির প্রায় মাঝামাঝি অর্থাৎ প্রফেটের জন্মের প্রায় অর্ধশতাব্দি পূর্বে আবদ মনাফের পুত্র হাশিম এবং আবদ শামসের পুত্র উমাইয়ার নেতৃত্বে দুই প্রভাবশালী গোত্র গড়ে ওঠে এবং এই দুই গোত্রের মাঝে ক্ষমতা লাভের জন্য চরম দ্বন্দ্ব শুরু হয়। উল্লেখ্য, হাশিম ও উমাইয়া ছিল চাচা-ভাতিজা।

হাশিমকে বাইজানটাইন রাজদরবারে নিমন্ত্রণ করা হয় এবং মক্কা থেকে সওদাগরদের পণ্যদ্রব্য সিরিয়ায় নিরাপদে নিয়ে যাবার জন্য সনদ দেয়া হয়। হাশিম গোত্র কাবাঘরেরও দায়িত্ব লাভ করে এবং তীর্থযাত্রীদের দেখভালের দায়িত্বভার তাদের ওপর ন্যস্ত হয়।

হাশিম সালমা নামে মদিনার এক মহিলাকে বিবাহ করেন এবং আবদুল মোত্তালেব নামে তাদের এক পুত্র সন্তান হয়। এই আবদুল মোত্তালেবের ওপর পড়ে তীর্থযাত্রীদের খাওয়া-দাওয়া ও জল সরবরাহের দায়িত্ব। তিনি মজে-যাওয়া জমজম কূপের সংস্কার করেন যা কাবাঘরের আঙ্গিনায় অবস্থিত। মক্কার অন্যান্য ধর্মীয়মনা মানুষের মতো তিনিও শহরের পাশে পর্বতে গিয়ে উপবাস করতেন। ৫৫০ খ্রিস্টাব্দে তিনি ইয়েমেনের আবিসিনিয়ার গভর্নর আব্রাহাকে মক্কা আক্রমণ থেকে বিরত করেন। কোরেশ মাখজুম গোত্রের আমর বিন আইদ-এর কন্যা ফাতিমাকে আবদুল মোত্তালেব বিবাহ করেন, তাদের সন্তান আবদুল্লাহ যিনি আমিনাকে বিবাহ করেন। কোরেশের জোহরা গোত্রের ওহাবের কন্যা আমিনা। এদের পুত্র মোহাম্মদ তার পিতার মৃত্যুর চার মাসের পর জন্মগ্রহণ করেন। ট্রাডিশন অনুযায়ী মোহাম্মদের জন্ম সোমবার, কিন্তু তার আসল জন্ম তারিখ জানা যায় না। তবে অনেকের মতে ৫৬৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৫৭৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে, তবে সাধারণত ধরা হয় ৫৭০ সালে তাঁর জন্ম হয়।

এটা সত্য যে, গোত্রগতভাবে প্রফেট মোহাম্মদের মক্কা ও মদিনাতে উভয় স্থানে যোগ-সূত্র ছিল, যা তাঁর জীবনে পরবর্তীতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বালক মোহাম্মদ যখন যৌবনে পদার্পণ করেন তখন হাশিম গোত্র কোরেশী বংশধারা থেকে স্থানচ্যুত

www.pathagar.com

হয়ে যায় এবং ক্ষমতার রাশ উমাইয়াদের হাতে পড়ে এবং কাবাঘরের কর্তৃত্বও (গার্জেনশিপ) প্রতিদ্বন্দ্বী গোত্র উমাইয়াদের হাতে পড়ে। এরপর উমাইয়া গোত্রের নেতা আবু সুফিয়ান প্রফেট মোহাম্মদের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে খাড়া হন।

৫.৩ বাল্যকাল ও যৌবন

প্রফেট মোহাম্মদের জন্মকালে যদিও পরে অনেক কথা-কাহিনী, কিংবদন্তি ও মোজেজার কথা যোগ করা হয়েছে, তবুও ঐতিহাসিকভাবে তাঁর শিশু বা যৌবনকালের কিছু কাহিনী জানা যায়।

তার প্রথম নার্স ছিল আবিসিনিয়ার খ্রিস্টান আইমান। তখন আইমানের বয়স ষোল/সতের (পরে যায়েদ বিন-হারিথের সাথে তাঁর বিয়ে হয়। বিন হারিথ প্রফেটের দত্তক পুত্র ছিল)। শিশু মোহাম্মদের দ্বিতীয় নার্স ছিল থুআইবা, যে কয়েক সপ্তাহ মাত্র তার পরিচর্যা করেছে।

তাঁর তৃতীয় নার্স ছিল হালিমা। হাওয়াইন উপজাতির বেদুইন গোত্রের বানু সাদের রমণী। কোরেশ গোত্রের নয়। আমিনা তার চার বছরের পুত্রকে হালিমার কাছে দিয়েছিলেন এই ভেবে যে মক্কার অস্বাস্থ্যকর (insalubrious) আবহাওয়া থেকে মরুর স্বাস্থ্যকর পরিবেশে তার পুত্র বেড়ে উঠবে। পরে প্রফেট বলেছিলেন যে, বানু সাদের পরিবেশে তিনি শুদ্ধ আরবি ভাষা রপ্ত করতে পেরেছেন। পাঁচ বছর বয়সে হালিমা অসুস্থতার কারণে শিশু মোহাম্মদকে তার মায়ের কাছে ফিরিয়ে দেয়।

শিশু মোহাম্মদ যখন ছ'বছরের তখন তাঁর মা মারা যাওয়ায় তাঁর প্রতিপালনের দায়িত্ব পড়ে দাদা আবদুল মোত্তালেবের ওপর। বলা হয় যে, ছয় বছরের শিশুকে তাঁর দাদা কাবাঘরের হুবাল দেবতার কাছে নিয়ে যায়। দাদা আবদুল মোত্তালেবের মৃত্যুর পর চাচা আবু তালিব শিশু মোহাম্মদের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন, তখন তাঁর বয়স আট বছর।

বাল্যকালের বছরগুলোতে এমন কোনো ঘটনা ঘটেনি যা উল্লেখযোগ্য, তাই বালক মোহাম্মদ, মক্কার অন্যান্য বালকদের মতো, মক্কার আশপাশে ছাগল ও ভেড়ার দেখাশোনায় নিযুক্ত হন। প্রায় ৫৮২ সালে, যখন তাঁর বয়স বারো, আবু তালিব তাঁকে সাথে করে ব্যবসার কারণে কয়েক মাসের মতো সিরিয়ায় গমন করেন। তারা পেট্রা, জেরাশ, আম্মান এবং অন্যান্য প্রসিদ্ধ শহরের মধ্য দিয়ে সিরিয়ায় খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের কাছে এসে পৌঁছান। মক্কায় ফিরে যাবার পথে সিরিয়ার বসরাতে তারা থামেন; এখানে ক্যারাভান পথের বড় একটা জংশন রোড বিভিন্ন স্থান থেকে পাঁচটি বড় রাস্তা মিশেছে। তাছাড়া এটা খ্রিস্টানদের একটি কেন্দ্রভূমি, একটা বড় ক্যাথিড্রাল আছে। কথিত আছে এই বসরায় সাধু বহিরা বালক মোহাম্মদের কাঁধের আকৃতি দেখে তাঁর সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করেন এই বলে যে, ভবিষ্যতে ছেলেটির বিখ্যাত ব্যক্তি হওয়ার লক্ষণ পাওয়া যাচ্ছে। তারপর বহিরা বালক মোহাম্মদের সাথে কথাবার্তা বলেন এবং বলেন, এই বালক ভবিষ্যতে আরবের প্রফেট হবে। তাদের মূর্তিপূজা থেকে সরিয়ে আনবে এবং কাবা গৃহ পরিষ্কার করে ফেলবে মূর্তি থেকে।

সতের এবং উনিশ বছর বয়সে মোহাম্মদ তাঁর চাচার সাথে স্থানীয় গোত্র যুদ্ধে যোগ

www.pathagar.com

দেন। এই যুদ্ধ সময় সময় পবিত্র মাসে নিষিদ্ধ হলেও ঘটত। একে ফিজার যুদ্ধ বলা হয়। এই যুদ্ধ অনেক দিন ধরে চলেছিল। তরুণ মোহাম্মদ এই যুদ্ধে শুধু শত্রুদের ছোড়া তীরগুলো কুড়িয়ে নিয়ে নিজের দলের লোকদের দিতেন ব্যবহারের জন্য।

বিশ বছর বেশি বয়স পর্যন্ত তখন মোহাম্মদ তাঁর চাচা আবু তালেবের সাথে উত্তর আরব, প্যালেস্টাইন ও সিরিয়াতে ক্যারাভানসহ বাণিজ্য যাত্রা করেছেন। এই বাণিজ্য কালে তিনি বিভিন্ন ধরনের মানুষের সাথে মিশে তাদের জীবনযাত্রার সাথে পরিচিত হন। সেই সাথে তিনি বিদেশী বাণিজ্য সম্বন্ধে প্রাথমিক অভিজ্ঞতা লাভ করেন এবং একটি দেশের উন্নয়ন ও অর্থনৈতিকভাবে টিকে থাকার কথা উপলব্ধি করেন। তিনি নিজেই আবিসিনিয়ার সাথে চামড়ার ব্যবসা শুরু করেন, এই ব্যবসায় তার অংশীদার ছিল মখজুম গোত্রের আল-সাইব। (এই মখজুম গোত্রের রমণী ছিলেন তাঁর দাদি ফাতিমা)। তাঁদের ব্যবসার পণ্যদ্রব্য মক্কাতে আল-সাইবের গুদাম ঘরে জমা থাকত।

৫৯৪ সালে মোহাম্মদের ২৪ বছর বয়সে একটি অগ্নি দুর্ঘটনায় ও পরবর্তীতে বন্যার করণে কাবাঘরের বেশ ক্ষতি হয়, ফলে এই মন্দিরকে ভেঙ্গে নতুনভাবে গড়ে তোলার প্রয়োজনবোধ করে কোরেশরা। সেই সময় কাবাঘরের দেয়াল ছিল ছোট এবং কোনো ছাদ ছিল না। কোরেশরা তাই এই মন্দির ঘরকে উঁচু করে নতুনভাবে তৈরি করার কথা চিন্তা করে। কিন্তু এই ঘর নির্মাণে প্রয়োজনীয় কাঠ ও শ্রমিক স্থানীয়ভাবে পাওয়া গেল না।

ঠিক এই সময় লোহিত সাগরে জেদ্দা বন্দরে একটি গ্রিক জাহাজ নষ্ট হয়ে যায়। এই জাহাজে আবিসিয়ান চার্চ নির্মাণের জন্য কাঠ বোঝাই করে আনছিল। সেই জাহাজে ক্রুদের সাথে একজন কপটিক খ্রিশ্চান কাঠমিস্ত্রিও ছিল—তার নাম বাকুম (পাচোমিয়াস?)। এই কাঠ ও মিস্ত্রি দিয়ে কাবাঘরের পুনর্নির্মাণ শুরু হয়। তরুণ মোহাম্মদ অন্যান্যদের সঙ্গে পাহাড় থেকে পাথর বয়ে আনেন এবং কালো পাথর পুনঃস্থাপনে সাহায্য করেন। কথিত আছে, এই কালো পাথর বসানোর সময় গোত্র নেতাদের মাঝে ঝগড়া শুরু হয় কোন গোত্র পাথরটি তার স্থানে পুনঃস্থাপন করবে। তখন মোহাম্মদ একটি কম্বলের উপর পাথরটি বসিয়ে প্রত্যেক গোত্র প্রধানদের কম্বলের কোণ ধরে পাথরটিকে উঁচু করে তুলে ধরতে বলেন এবং সমপরিমাণ উঁচু অবস্থায় উঠলে তিনি পাথরটি নিজেই তার স্থানে বসিয়ে দেন। এইভাবে সমস্যাটির সমাধান হয়। তারপর মহাদেবতা হুবালকে তার নিজ আসনে বসানো হয়। এই পুনর্নির্মাণে সর্বপ্রথমভাবে কাবাঘরের ছাদ তৈরি করা হলো।

এই সময়ের মধ্যে মোহাম্মদ তাঁর বাপ-দাদাদের ধর্ম-কর্মে অংশগ্রহণ করেন এবং বাৎসরিক তীর্থের সময় পরিবারের সদস্যদের তীর্থের রীতিনীতিও পালন করেন। ঐতিহাসিক কালবি এবং ইয়াকুবের বর্ণনা মতে, প্রফেট বলেছিলেন যে, মাত্র একবার তিনি উজ্জা দেবীর থানে একটি ভেড়ি বলি দেন এবং তার মাংস গ্রহণ করেন। তার পরেও তিনি পরিবারের নিয়ম-রীতি অনুযায়ী বলির মাংস খেয়েছেন।

ওহি পাবার পূর্ব পর্যন্ত, মোহাম্মদ হানিফদের সাথে এবং তাদের কর্মপদ্ধতির সাথে খুব ভালোভাবেই পরিচিত ছিলেন এবং হেজাজের কয়েক জন ধর্ম সংস্কারকের সাথেও তাঁর পরিচয় ঘটে, এদের মধ্যে কয়েকজন তাঁর পরবর্তী জীবনে প্রভাব

www.pathagar.com

ফেলেছিলেন। ওহি আগমনের পর প্রফেট মোহাম্মদের জীবনের গতি সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তিত হয়।

৫.৪ জায়েদ ইবন আমর

জায়েদ ইবন আমর কোরেশী দ্বিতীয় খলিফা ওমরের চাচা ছিলেন। ইনি একজন প্রতিশ্রুত হানিফ। তিনি নিজেকে আব্রাহামের ধর্মের অনুসারী বলে পরিচয় দিতেন। তার গোত্রের পৌত্তলিকতা সম্বন্ধে প্রকাশ করে কবিতা লিখতেন এবং নারী-শিশু হত্যা ও মূর্তি পূজাকে নিন্দা করতেন। সারা রমজান ধরে তিনি হিরা পর্বতে নির্জনে কালাতিপাত করতেন।

৫৯৫ খ্রিস্টাব্দে মোহাম্মদ জায়েদের সাথে দেখা করেছিলেন, আলাপ-আলোচনা চলত এবং দেবতার কাছে উৎসর্গীকৃত পশুর রান্না করা গোস্ত নিয়ে যেতেন তার সাথে খাওয়ার জন্য। জায়েদ সে খাদ্য খেতে অস্বীকার করতেন। মোহাম্মদকে মূর্তিপূজা থেকে নিবৃত করার চেষ্টা করতেন এবং বকাবকি করতেন দেবতার কাছে বলি দেয়া পশুর মাংস খাওয়ানোর জন্য (দ্র. Acts 15 : 29)। পরে মোহাম্মদ বলেছেন যে সে সময় থেকে তিনি জ্ঞাতসারে কোনো দেবতার দোরে যাননি, কিংবা কোনো পশু উৎসর্গও করেননি।

জায়েদ কাবার প্রাঙ্গণে বসে প্রার্থনা করতেন– হে ঈশ্বর আমি জানি না তোমাকে কিভাবে পূজা করব। যদি জানতাম, তাহলে সেই ভাবেই করতাম।

মক্কার মানুষের দ্বারা বিদ্রূপিত হয়ে তিনি সিরিয়া ও ইরাকে চলে যান এবং রাব্বি ও সাধুদের প্রশ্ন করেন। ৬০৮ খ্রিস্টাব্দে মক্কায় ফেরার পথে দুর্বৃত্তের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে মারা যান। হিরা পাহাড়ের নিচে তার সমাধি হয়েছে।

প্রফেট মোহাম্মদ তাঁর বাণীতে বলেছেন যারা অবিশ্বাসী তাদের অবস্থান নরকের আগুনে, কিন্তু, বলা হয় যে, প্রফেট জায়েদের জন্য আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ প্রার্থনা করেছেন এই বলে যে, যদিও তিনি মুসলিম ছিলেন না, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন। প্রফেট বলেছিলেন, 'জায়েদ রোজ কেয়ামতে মুসলিম সম্প্রদায়ের একজন হয়ে জীবিত হবেন এবং তার জন্য বেহেস্তে স্থান করা আছে। আমি সেখানে তাকে দেখেছি।

৫.৫ কস ইবন সাঈদা

একটি মুসলিম ট্র্যাডিশনে বর্ণিত যে প্রফেট মোহাম্মদের মিশন আরম্ভ হওয়ার পূর্বে, নাজরানের বিশপ আইয়াদ গোত্রের কস ইবন সাঈদা মক্কার ওকাজের বাজারে প্রচার করছিলেন। তিনি মাস্ত হয়ে প্রাথমিক কোরানের সূরা পাঠের মতো সুর করে গদ্য ছন্দে (সাজ) কবিতা আবৃত্তি করছিলেন। তার প্রচার এত হৃদয়গ্রাহী ছিল যে, সে-কথা লোকে মুখস্থ করে ফেলেছিল; এখনো নাকি কিছু খণ্ডিতভাবে চালু আছে। কবিতাটি এইরূপে আরম্ভ হয়।

'হে লোক সকল কাছে এসো/ শোনো এবং ভয় করো/আয়াতগুলো পঠিত/কিছু পাবার আশায় নয়;/তারকারাজি উদয় হয় আবার অস্ত যায়/সমুদ্র কখনো শুকিয়ে যায়

www.pathagar.com

না/ছাদের ওপরে অনন্ত আকাশ/দূরে দিগন্তে পৃথিবীর সাথে মিশেছে/বৃষ্টি পড়ে/বৃক্ষরাজি তাজা হয়/নারী পুরুষে বিবাহ করে/সময় চলমান, চলে যাচ্ছে/হে মরণশীল মানুষ বলো/আজ তোমাদের গোত্ররা কোথায়/যারা একবার অবাধ্য হয়েছিল/শুভকর্মে আইন/কোথায় তারা?/নিশ্চয়ই আল্লাহ্ দিয়েছে/তাদের আলো যারা বাঁচতে চায়।'

কস তারপর প্রচার করেছেন মানুষের নৈতিক ত্রুটি (Fafraitlyth) সম্বন্ধে, দুর্বলতা সম্বন্ধে, ঈশ্বরের করুণা ও শেষ বিচারের দিন সম্বন্ধে।

প্রফেট মোহাম্মদ মুগ্ধ হয়ে কসের সু-সমাচার শুনে গভীরভাবে বিচলিত হন। কসের সারমন তার মনকে উত্তেজিত করে, আত্মাকে নাড়া দিয়ে তোলে। মুতাজিলি জাহিজ (মৃ. ৮৬৯) এক ট্র্যাডিশনে বর্ণনা করেছেন প্রফেট মোহাম্মদ সেই সারমনের দৃশ্য এবং বাণী পুনর্ব্যক্ত করেছিলেন, তিনি ভোলেননি।

অনেক বছর পর যখন আইয়াদ গোত্রের এক ডেপুটেশন মক্কা গমন করে, প্রফেট মোহাম্মদ কস সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে জেনেছিলেন যে তিনি প্রায় ৬১৩ খ্রিস্টাব্দে মারা যান। প্রফেট শ্রদ্ধার সাথে তাকে স্মরণ করে বলেছিলেন যে তিনি প্রচার করেছিলেন 'সত্যিকারের সার্বজনীন বিশ্বাসের বাণী'– 'The true universal faith'।

৫.৬ তায়েফের উমাইয়া

উমাইয়া ইবন আবু আল-সাল্‌ত (মৃ. ৬২৯) তায়েফের থাকিফ গোত্রের একজন সংস্কারক ছিলেন। তিনি প্রফেট মোহাম্মদের সমসাময়িক হলেও বয়সে বড় ছিলেন। তিনি কবি ও সত্যসন্ধানী ছিলেন এবং পরে প্রফেটের প্রতিদ্বন্দ্বী ও মতপার্থক্য পোষণ করেন; তার কবিতাগুলো কোরানের মতো পঠিত হতো। তিনি নিজেকে হানিফ বলে পরিচয় দিতেন এবং হানিফদের ধর্ম (দ্বীন) সত্য এবং তা পৃথিবীর শেষ দিন পর্যন্ত টিকে থাকবে বলে বিশ্বাসী ছিলেন।

উত্তর আরব, নাবিতিয়া, প্যালেস্টাইন ও সিরিয়া ভ্রমণকালে তিনি ইহুদি ও খ্রিস্টান ডকট্রিন (তত্ত্ব-নীতি) পাঠ করেন এবং খ্রিস্টান আইয়াদ গোত্র কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত স্কুলকে অনুমোদন করেছিলেন।

নাকতিয়ার খ্রিস্টানরা ইহুদিদের একটি রীতি অনুসরণ করত তোরাহ্-র ওপর ভিত্তি করে, যেখানে ঈশ্বরকে করুণাময় এবং মহৎ বলে উল্লেখ করা হয়েছে (যাত্রা পুস্তক ৩৪:৬)। আরবিতে এই ফরমুলাকে 'তাসমিয়া' অথবা 'বাসমালা' নামে একই অর্থে আল্লাহকে আহ্বান করা হতো। তায়েফের উমাইয়া এই ফরমুলা গ্রহণ করেছিলেন এবং পরে আরবে কোরেশদের এই ফরমুলা শিক্ষা দেন। (Rodwel (1915, p. 19) প্রফেট মোহাম্মদও এই ফরমুলা গ্রহণ করে সব সময়েই ব্যবহার করতেন। 'তাসমিয়া' এইভাবে পড়া হতো– "আল্লাহর নামে (বিসমিল্লাহ), আর-রহমান আর-রহিম" 'In the name of God (Bismillah) The Merciful (al-Rahman), The Compassionate (al-Rahim)'। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, রহমান শব্দে খ্রিস্টান মৌলিক অর্থের তাৎপর্য বেশি ছিল– had strong Christian connstation.

'তাসমিয়া' মুসলিমদের তাৎপর্যপূর্ণ ফরমুলায় পরিণত হয় এবং কোরানে প্রতিটি

www.pathagar.com

সূরা প্রথমে ব্যবহার করা হয়েছে [সূরা তওবা (৯ নং) বাদে]– ৯নং সূরাতে 'তাসমিয়া' ব্যবহৃত হয়নি কারণ এই সূরা প্রথমে ৮ নং সূরার অংশ বিশেষ ছিল। প্রার্থনার পূর্বে 'তাসমিয়া' পুনঃ পুনঃ উচ্চারিত হয়। ওজু করার সময় এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠান আরম্ভ করার পূর্বে উচ্চারিত হয়। শুধু তাই নয়, খাবার পূর্বে, যাত্রার পূর্বে, ভালোবাসার পূর্বে (making love) এবং অনুরূপ কোনো কাজ আরম্ভের পূর্বে ব্যবহৃত হয়।

পশু নিধনের পূর্বে কিংবা যুদ্ধ বা জেহাদের পূর্বে ব্যবহৃত হয় না, এসব কর্মে আল্লাহের দয়া বা করুণার গুণাবলি উল্লেখ করা হয় না, পরিবর্তে মুসলিমরা উচ্চারণ করে অন্য ফরমুলা— আল্লাহর নামে, যিনি মহান In the name of 'God', God most great। এই শব্দাবলির শেষাংশ অর্থাৎ 'আল্লাহু আকবর'কে 'তকবির' বলা হয়।

৫.৭ খাদিজা

প্রফেট মোহাম্মদ তাঁর চাচা আবু তালেবের কাছে অনুরোধ করেছিলেন, তাঁর কন্যা উম্মে হানির পাণি গ্রহণের জন্য। যদিও ভাতিজার জন্য তার স্নেহের অন্ত ছিল না, কিন্তু প্রফেটের দারিদ্র্যের কারণে আবু তালেব তার কন্যার সাথে বিবাহে সম্মতি দেননি।

প্রফেট মোহাম্মদের যখন বয়স পঁচিশ, আবু তালিব তাকে কোরেশ গোত্রের এক ধনী বিধবার কাছে সোপারেশ করেন। খুয়ালিদের কন্যা খাদিজা দু'দফা বিধবা হন এবং তার পূর্বে স্বামীদের দ্বারা দু'টি পুত্র ও একটি কন্যার জন্ম হয়। প্রফেট মোহাম্মদ খাদিজার অধীনে চাকরি গ্রহণ করেন এবং তাঁর ওপর খাদিজার ব্যবসা ও বাণিজ্য ব্যবস্থাপকের দায়িত্ব পড়ে এবং এই সূত্রে খাদিজার প্রতিনিধি রূপে তিনি আরব, সিরিয়া, দামেস্ক এবং এলেপ্পোর বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করেন। ব্যবসা-বাণিজ্যে তার অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান খাদিজার ব্যবসার সুফল বয়ে আনে।

৫৯৫ খ্রিস্টাব্দে, চাকরিতে যোগদানের কিছুদিন পরে, প্রফেট মোহাম্মদ খাদিজাকে বিবাহ করেন এবং মদিনায় ৬২২ খ্রিস্টাব্দে হিজরত পর্যন্ত তিনি খাদিজার গৃহে বাস করেন। দারিদ্র্যের মধ্য দিয়ে বেড়ে ওঠার পর, বিবাহের কারণে প্রফেট মোহাম্মদের অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন হয়, যদিও মানসিকভাবে তাঁর অস্থিরতা কেটে ওঠেনি। এ ব্যাপারে কোরানে বলা হয়েছে– 'আমি কি তোমার বক্ষ তোমার কল্যাণে প্রশস্ত করিয়া দেই নাই? (৯৪:২)। অন্য এক আয়াতও প্রাসঙ্গিক : তিনি তোমাকে পাইলেন নিঃস্ব অবস্থায়, অতঃপর অভাবমুক্ত করিলেন (৯৩:৮)। এখন তিনি আরবের বিধর্মী আচরণের (প্যাগানিজম) সংস্কারে বেশি সময় নিয়োজিত করলেন এবং খাদিজাও তাঁকে এ বিষয়ে অকুণ্ঠ সহযোগিতা করলেন।

প্রফেট মোহাম্মদের সাথে খাদিজার যখন বিবাহ হয় তখন সাধারণত বলা হয়েছে তার বয়স হয়েছিল চল্লিশ; কিন্তু একজন লেখক ইবনে হাবীব, বলেছেন তখন তার বয়স ছিল আটাশ। এটি বেশি বিশ্বাসযোগ্য, কারণ খাদিজা এই বিবাহ সূত্রে দু'টি পুত্র কাসিম ও আব্দুল্লাহ উভয়েই শিশুকালে মারা যায় (প্রফেট মোহাম্মদকে প্রায় লোকে আবুল কাসেম-কাসেমের বাবা বলে সম্বোধন করত) এবং চারটি কন্যা সন্তানের জন্ম দেন। জয়নবের বিবাহ হয় খাদিজার ভাইপো আবুল আস-এর সাথে; রোকেয়া, উম্মে কুলসুম ও ফাতিমা। কেবলমাত্র ফাতিমা প্রফেটের মৃত্যুর পর বেঁচে ছিলেন এবং

www.pathagar.com

কেবলমাত্র ফাতিমার বংশের মাধ্যমেই প্রফেট চিরকাল স্মরণীয়। প্রফেট মোহাম্মদের বর্তমান বংশধররা এবং মহান ইমামগণ (শিয়াদের) সকলেই খাদিজার বংশধর।

খাদিজার সাথে বিবাহের পর থেকে হেরা পর্বতে প্রথম 'ওহি' অবতরণের মধ্যে ১৫ বছর প্রফেটের জীবন সম্বন্ধে অতি অল্পই জানা যায়, কিন্তু এই সময়ের মধ্যে প্রফেট জীবনকে খাদিজা যেভাবে পরিচালিত করেছেন সে অবদান অনস্বীকার্য। এই সময়ে প্রফেট যখন 'ভুলপথে চলছিলেন' (wandering in error), এ সময় তিনি যে সঠিক পথের সন্ধান পান, সে 'গাইডেনস' খাদিজার কাছ থেকে এসেছিল– এ সম্বন্ধে প্রথম দিকের একটি আয়াত তুলনীয়– যেমন, তিনি তোমাকে পাইলেন পথ সম্পর্কে অনবহিত, অতঃপর তিনি পথের সন্ধান দিলেন। (৯৩:৭)।

প্রফেট যখনই বিচলিত হতেন তিনি তখন খাদিজার কাছে সান্ত্বনার জন্য গমন করতেন। খাদিজা প্রথম মহিলা যিনি প্রফেটের মিশনে বিশ্বাস করেন এবং প্রফেটকে তিনি তাঁর বিশ্বাসে অটল থাকতে বলেন।

খাদিজা প্রায়ই প্রফেটের সাথে যেতেন যখন তিনি (প্রফেট) মরুতে আরাধনা করেন, খাদিজা প্রফেটের মনে তার মিশন সম্বন্ধে দৃঢ়তা এনে দেন এবং অনবরত উৎসাহ দিতেন তাঁর বিশ্বাসে দৃঢ় থাকতে। খাদিজা বিরুদ্ধ মতবাদীদের প্রতিবাদকে পাত্তা দিতেন না, বলতেন এসব নিরর্থক, প্রফেট গভীর হতাশায় ভেঙে পড়লে তিনি আন্তরিকভাবে সান্ত্বনা দিতেন, প্রফেটের অন্ধকার দিনগুলোয় খাদিজা আলোর বর্তিকা বহন করেছেন, সাহস জুগিয়েছেন, সুপরামর্শ দিয়েছেন উৎসাহের সাথে। তিনিই ছিলেন প্রফেটের প্রধান পরামর্শদাত্রী, কাউন্সিলার।

৬১৯ সালে খাদিজা মারা যান। তার সমাধি মক্কার শীর্ষে উপত্যকায়, মুসলিম তীর্থযাত্রীরা এখনো দর্শন করে থাকেন। তার মৃত্যু প্রফেটের জীবনে অপূরণীয় ক্ষতি বহন করে আনে, দীর্ঘদিন ধরে প্রফেট স্ত্রী-বিয়োগে বিমর্ষ ছিলেন। তার মৃত্যু ও প্রফেটের পুনর্বিবাহের বহু বছর ধরে খাদিজার জন্য তার অন্তরে গভীর সচেতনতা বিরাজ করেছে। যখন কোনো কণ্ঠস্বর খাদিজার মতো শোনাত এবং কখনো তার নাম উচ্চারিত হলে তিনি দুঃখে-শোকে মুহ্যমান হতেন এবং তার দু'চোখ বেয়ে আঁসু ঝরে পড়ত।

খাদিজার কথা স্মরণ করলে প্রফেটের সুন্দরী তরুণী স্ত্রী আয়েশা প্রতিবাদ করেন। খাদিজাকে না দেখলেও অন্যান্য স্ত্রীদের চেয়ে আয়েশা ঈর্ষান্বিত হতেন। একবার আয়েশা যখন গর্ব করে বলেছিলেন ঐ বুড়ির পরিবর্তে কি আমি ভালো নই, প্রফেট রাগত হয়ে জবাব দেন– না, তার পরিবর্তে আল্লাহ আমাকে কোনো ভালো স্ত্রী দেননি। আমি যখন দরিদ্র ছিলাম, তিনি তাঁর সম্পদ আমাকে দেন; অন্যরা যখন আমাকে প্রত্যাখ্যান করে, তিনি আমাকে বিশ্বাস করেছেন, সান্ত্বনা দিয়েছেন। অন্যরা যখন আমাকে মিথ্যাবাদী বলেছে, তিনি আমাকে সত্যবাদী বলেছেন, আমার কথায় বিশ্বাস করেছেন। তাঁর মধ্য দিয়ে আল্লাহ আমাকে সন্তান-সন্ততি দিয়েছেন, অন্য কোনো স্ত্রী আমাকে সন্তান দেয়নি।

খাদিজা একমাত্র ব্যক্তিত্ব যিনি এককভাবে প্রফেটের জীবনে প্রভাব ফেলতে পেরেছেন– অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব। সম্ভবত ইসলামের ইতিহাসে তিনি ছিলেন

www.pathagar.com

অসাধারণ মহিলা এবং অত্যন্ত সঠিকভাবে তাকে 'মহান খাদিজা' উপাধিতে ভূষিত করা হয় (খাদিজা আল-কুবরা)। প্রফেট মোহাম্মদ পৃথিবীর ইতিহাসে খাদিজাকে চারজন আদর্শ নারীর একজন বলেছেন– অন্য তিনজন হলেন আসিয়া, ফেরাউনের কন্যা যিনি মুসাকে পালন করেন, যিশুর মাতা কুমারী মেরি, আর খাদিজার গর্ভে তার কন্যা ফাতেমা।

খাদিজার ধর্মীয় বিশ্বাস সম্বন্ধে অতি অল্পই জানা যায়, কিন্তু আল-তাবারীর মতে, তিনি সব ঐশী গ্রন্থ (scriptures) পাঠ করেছেন এবং প্রফেটদের ইতিহাস সম্বন্ধে তিনি জ্ঞাত ছিলেন। খ্রিস্টানদের লেখা বইপত্রের সাথে তার পরিচয় ছিল এবং খ্রিস্টানদের সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতেন। হতে পারে, তিনি নিজেই খ্রিস্টান ছিলেন।

খ্রিস্টান ধর্মের সাথে তার যোগাযোগ ছিল দৃঢ়, অবিচ্ছিন্ন। ওসমান ইবন হাওয়ারিথ, খাদিজার কাজিন, খ্রিস্টান ছিলেন এবং তিনি মক্কার ধর্ম সংস্কারের চেষ্টা করেন। তার অন্য কাজিন ওয়ারাকাও খ্রিস্টান ছিলেন। তার দ্বিতীয় স্বামী আবু হালা খ্রিস্টান তামিম গোত্রভুক্ত। তার তৃতীয় স্বামী প্রফেট মোহাম্মদকে এক খ্রিস্টান দাস উপহার দেন, যার নাম ছিল জায়েদ বিন হারিথ, এই জায়েদকে তিনি পোষ্যপুত্র রূপে গ্রহণ করেছিলেন।

যারা প্রফেট মোহাম্মদকে যিশুর জীবনী সম্বন্ধে বলেছিলেন, তাদের মধ্যে খাদিজা একজন। যিশুর সম্বন্ধে অনেক ওহি প্রফেট মোহাম্মদ প্রাপ্ত হন। শিক্ষিত নারী হিসাবে, খাদিজাই প্রথম ব্যক্তি যিনি প্রফেটের কাছ থেকে ওহির 'ডিকটেশন' লিপিবদ্ধ করেন। তিনি নিশ্চয়ই প্রফেটকে খ্রিস্টান রীতিমতে একজন স্ত্রী গ্রহণ করার জন্য বলে থাকবেন, এবং একথা বলার মতো অবস্থা তার ছিল, কারণ প্রফেট কখনই খাদিজার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করেননি। এই কারণেই তাদের বিবাহিত জীবনের ২৪ বছরেও প্রফেট দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করেননি।

হতে পারে যে খাদিজা প্রফেটের সম্মুখে আরবের প্রচলিত ধর্মীয় অবস্থা সংস্কারের কথা বলেছেন এবং নারী-শিশু হত্যা করার মতো কু-প্রথা বন্ধ করার জন্য পরামর্শ দেন। এ ছাড়া আরবের হানিফদের আচার-ব্যবহারও প্রফেটের জন্য অনুপ্রেরণা স্বরূপ ছিল, যে কারণে আরবে অনেক অধর্ম-আচরণ ও বর্বর প্রথার তিনি উচ্ছেদ সাধন করেছেন। যদিও বলা হয় যে, খাদিজা প্রফেট মোহাম্মদের ধর্ম ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, তেমনি এটাও সমভাবে সত্য যে প্রথমে প্রফেট মোহাম্মদকে একেশ্বরবাদে বিশ্বাস করানোর জন্য খাদিজাই দায়ী ছিলেন– it would be equally true to say that She was responsible for His conversion in the first place.

৫.৮ সওদাগর

৬১০ খ্রিস্টাব্দে ওহি পাওয়ার পূর্বে প্রফেট মোহাম্মদ ২৫ বছরের অধিক ব্যবসা-বাণিজ্যের সাথে জড়িত ছিলেন। তিনি ও তাঁর পরিবার ব্যবসা-বাণিজ্যে শুরু থেকেই জড়িত এবং বারো বছর বয়সে তিনি নিজ চাচা আবু তালিবের তত্ত্বাবধানে বাণিজ্যে হাতেখড়ি নেন এবং পরবর্তীতে এ সম্বন্ধে পারদর্শী হয়ে ওঠেন। ২০ বছর বয়সে তিনি খাদিজার বাণিজ্য ও ব্যবসার দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং খাদিজার সাথে বিবাহের পরও

www.pathagar.com

স্ত্রীর ব্যবসার কাজ চালিয়ে যান। হয়তো খাদিজার মৃত্যুর পর তাঁর জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য, বেশ কয়েক বছর ব্যবসা-বাণিজ্যের কাজ চালিয়ে যেতে হয়েছিল।

ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান ছিল অসাধারণ, ক্যারাভান পরিবহন ও বিদেশ বাজার সম্বন্ধে ভালো ধারণা ছিল এবং অন্যান্য বাণিজ্য সম্প্রদায় সম্বন্ধে, গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যপথ সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত ছিলেন। এ সম্বন্ধে কোরানে অনেক সূত্রের উল্লেখ আছে। এই সব সূত্র সংগ্রহ করে ১৯৮২ সালে একজন আমেরিকান গ্রন্থকার চার্লস টোরে (Charles Torrey) একটি পুস্তক রচনা করেন।

শীতকালে ও গ্রীষ্মকালে ক্যারাভানে বাণিজ্যযাত্রা, পণ্যদ্রব্যের হিসাব, শেষ বিচারের দিন, প্রত্যেক মানুষের প্রাপ্য হিসাব, তারাজুর কথা, প্রত্যেক মানুষের ভালো-মন্দ কর্মের ওজন, শপথ গ্রহণ ও তার জন্য কাজ করা, প্রফেটের জন্য সাপোর্ট ইত্যাদির কথা কোরানে বিস্তৃতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রফেট মোহাম্মদের বাণিজ্য সম্পর্ক সম্বন্ধে তীক্ষ্ণ জ্ঞান তাঁর জীবনে অনেক সময় কাজে লেগেছে। ৬১৫ খ্রিস্টাব্দে আবিসিনিয়াতে একজন অনুসারীকে পাঠানো হয়েছিল বিপক্ষ মক্কাবাসীদের জানানোর জন্য যে, সে দেশের সাথে তাঁর সম্পর্ক গড়ার উদ্দেশ্যে। তাঁর মদিনাতে গমনের উদ্দেশ্য ছিল ৬২২ সালে সেখানে একটা কেন্দ্র গড়ে তোলা, যাতে মক্কাবাসীদের বাণিজ্যে তিনি বাধা দিতে পারেন এবং অর্থনৈতিকভাবে তাদের ক্ষতিসাধন করা। মদিনা এমন এক গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য পথে অবস্থিত যেখান থেকে তাঁর পরিকল্পনা মতে মক্কাবাসীদের বাণিজ্য ক্যারাভান আক্রমণ করতে পারেন এবং তাদের হয়রানি করতে পারেন ক্যারাভান যাত্রীদের। ফলে মক্কাবাসীদের বাণিজ্যে পরিশেষে তিনি নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। মদিনায় যাওয়ার পর মক্কার ক্যারাভানের ওপর বার বার আক্রমণ ও তাদের পণ্যদ্রব্য অধিগ্রহণ মক্কাবাসীদের বাণিজ্য ব্যবস্থাকে দুর্বল করে তোলা প্রফেটের পরিকল্পিত ব্যবস্থা এবং তীক্ষ্ণ ব্যবসায়িক বুদ্ধির পরিচয়। এইভাবে আক্রমণের মাধ্যমে প্রফেট কোরেশদের অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল করে, তাঁর নেতৃত্ব গ্রহণ ও মিশনকে স্বীকৃতি দিতে কোরেশদের ওপর চাপ সৃষ্টি করেন।

৫.৯ হীরা পর্বতের গুহা

প্রফেট মোহাম্মদ চিন্তাপ্রবণ ব্যক্তি ছিলেন, মনে হতো সদা দুঃখভারাক্রান্ত এবং ত্রিশ দশকের শেষের বয়সে তিনি আরো বেশি যেন গুটিয়ে গেলেন, মনে হলো অসুস্থ মানুষ। তাঁর দেশের মানুষের জন্য গভীর অনুভূতি ছিল এবং সর্বদা এই চিন্তা তাঁকে কুরে কুরে খেত তাঁর পূর্বপুরুষের ধর্ম বিশ্বাস সম্বন্ধে। সব সময়েই ভেবে আকুল হতেন তিনি পূর্বপুরুষদের অধর্ম আচরণের স্থলে একেশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন কিনা।

রমজান মাসে সময় সময় তিনি স্ত্রী খাদিজাসহ মক্কার পার্শ্ববর্তী পর্বতে নির্জন বাস করতেন শুধুমাত্র জীবনধারণের জন্য কিছু প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি নিয়ে। তার দাদা এবং অন্যান্য ধার্মিক ব্যক্তি এবং হানিফরাও এই ভাবে পর্বতে সময় সময় নির্জন বাস করতেন।

একদিন (৬১০ খ্রিঃ) প্রফেটের বয়স যখন চল্লিশের মতো, তিনি একাকী হিরা পর্বতের পাদদেশে এক গুহায় নির্জন বাস চলে যান। প্রায় তিন মাইল উত্তর-পূর্ব দিকে

www.pathagar.com

হিরা একটি পাথুরে-পাহাড়। এই গুহাতেই হানিফ জাইদ ইবন আমর প্রায় আরাধনা করতেন। ঐ দিনরাতে রমজান মাসের ২৭ তারিখে লায়লাতুল কদর— 'শক্তির রাত্রি' Night of Power (১৪৭ : ১) প্রফেট গভীর আরাধনায় নিমগ্ন, হঠাৎ তিনি কণ্ঠস্বর শুনলেন কে যেন তাঁকে আদেশ করে বলছে : পড় (ইকরা) এবং প্রফেট জিজ্ঞাসা করলেন আমি কী পড়বো? (তুলনীয় : একটি কণ্ঠস্বর বলছে 'কাঁদো' [হিব্রু 'কারা' অর্থ পাঠ করা] এবং আমি বললাম– আমি কী বলে কাঁদবো?" ইসাইয়া ৪০:৬)

প্রফেট মোহাম্মদ বললেন যে তিনি পড়তে জানেন না, এ সময়ে তিনি অনুভব করলেন কে যেন তাকে বুকে চেপে ধরেছে এবং তার নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। আবার কণ্ঠস্বর হলো : 'পড়, আল্লাহর নামে যিনি এক বিন্দু রক্ত থেকে মানুষ সৃষ্টি করেছেন। পড়, তোমার প্রতিপালকের নামে যিনি মহিমান্বিত এবং যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন।'

বলা হয় এটা প্রফেটের নিকট প্রথম ঐশীবাণী এবং যে আয়াত তিনি শুনেছেন তা সূরা আলাকে বিধৃত (৯৬ : ১-৪)। এই অভিজ্ঞতায় প্রফেট মোহাম্মদের ভীষণ কম্পন শুরু হলো। তিনি বিব্রত হয়ে বাড়ি ফিরলেন, মনে হলো কে যেন তার দেহে ভর করেছে। স্ত্রী খাদিজাকে বললেন— আমাকে ঢেকে দাও, আমাকে ঢেকে দাও, আমি আমার জন্য চিন্তান্বিত। খাদিজা জিজ্ঞাসা করলেন– ব্যাপার কি? এবং তিনি প্রফেটকে সাহস দিয়ে শান্ত হতে বললেন এবং তাঁকে পরীক্ষা করলেন কোনো অশুভ আত্মা হতে ভালো-মন্দ শুনে থাকবেন।

খাদিজা প্রফেটকে বললেন আবার সেই আগন্তুক উদয় হলে প্রফেট যেন খাদিজাকে বলেন। ইবনে ইসহাক-এর বর্ণনা মতে, পরবর্তীতে যখন সেই 'ভিশন' দেখা দিল, খাদিজা প্রফেটকে তার বাঁ উরুতে বসতে বললেন, তারপর তাঁর ডান উরুতে এবং পরে তাঁর কোলে বসতে বললেন এবং প্রত্যেক বার প্রফেট জানালেন যে সেই ভিশন রয়ে গেছে। তারপর কোলে বসা অবস্থায় খাদিজা নিজেকে উন্মুক্ত করে তার স্বামীকে তার দুই জানুর মধ্যে টেনে নিতেই প্রফেট জানালেন যে সেই 'ভিশন' অদৃশ্য হয়ে গেছে।

সম্ভবত এই অবস্থাদৃষ্টে খাদিজার ধারণা বদ্ধমূল হলো যে, যিনি দেখা দিয়েছিলেন তিনি 'দেবদূত' 'শয়তান' নয়। খাদিজার নিশ্চিত অনুমান যে প্রফেট মোহাম্মদ আল্লাহর মনোনীত ব্যক্তি আরবে মূর্তিপূজা দূরীভূত করার জন্য। খাদিজা প্রফেটকে আশ্বাস দিয়ে বললেন, আনন্দ করুন, নিশ্চয় আল্লাহ সু-সংবাদ পাঠিয়েছেন আমি আশা করি আপনি আপনার লোকদের জন্য নবী নিযুক্ত হবেন।

চরিতকার মুসা ইবন ওকবার (মৃ. ৭৫৮) অথরিটিতে বর্ণিত এক ট্রাডিশন অনুযায়ী এবং অন্য বর্ণনা মতে, খাদিজা প্রফেট মোহাম্মদকে নিনেভ থেকে আগত এক খ্রিস্টান ধার্মিক ব্যক্তি আদ্‌দাস-এর কাছে নিয়ে যান; আদ্‌দাস মক্কাতে স্থায়ীভাবে বসবাস করছিলেন। আদ্‌দাস সব ঘটনা শুনে দেবদূত গ্যাব্রিয়েল সম্বন্ধে যা জানতেন তাদের কাছে সেসব ব্যক্ত করলেন।

www.pathagar.com

৫.১০ ওয়ারাকা

এরপর খাদিজা গেলেন তার কাজিন ওয়ারাকা ইবন নওফেলের কাছে। ইনি কোরেশ গোত্রের। বিপুল অভিজ্ঞতাসম্পন্ন জ্ঞানী ব্যক্তি ওয়ারাকা গোত্র পুরোহিত বংশোদ্ভূত। তিনি মক্কার নিকটে দেবী উজ্জার মন্দিরের চার্জে ছিলেন। খ্রিস্ট ধর্মে দীক্ষিত ওয়ারাকা হিব্রু জানতেন এবং ইহুদি ও খ্রিস্টানদের ধর্ম পুস্তক অধ্যয়ন করেছেন। তিনি খ্রিস্টানদের গসপেল ও কিছু লেখার আরবিতে অনুবাদ করেন আংশিকভাবে। ওয়ারাকার ভগিনীও বিদুষী ও জ্ঞানী মহিলা ছিলেন এবং নিয়মিতভাবে গসপেল পাঠ করতেন। (Glubb, 1979, P. 68)।

খাদিজার কাছ থেকে ঘটনা শোনার পর ওয়ারাকা জবাব দেন তুমি যা বলেছ, তা সত্য হলে, খাদিজা, আমি তোমাকে বলতে পারি, প্রফেট মোহাম্মদের কাছে নামুসের আত্মা এসেছিল [গ্রিক নোমস (nomos) শব্দ থেকে নামুস অর্থ আইন] যা মোসেসের কাছেও এসেছিল এবং মোহাম্মদ তাঁর লোকদের নবী হবেন। সুতরাং তাকে সন্তুষ্টচিত্তে থাকতে বলো। খাদিজা বাড়ি ফিরে প্রফেটকে ওয়ারাকা যা বলেছিলেন সব বললেন।

এর কিছুদিন পর প্রফেট মোহাম্মদ নিজেই ওয়ারাকার কাছে গমন করে ঘটনার পুনরাবৃত্তি করেন। সব শুনে ওয়ারাকা আবার সেই একই কথা বললেন যা খাদিজাকে বলেছিলেন। তিনি অবশ্য যোগ দেন যে, এতে মানুষে তার বিরুদ্ধে দুর্নাম রটাতে পারে, মন্দ কথা বলতে পারে, এমনকি ঘৃণ্য ব্যবহারও করতে পারে, আপনাকে তারা মিথ্যাবাদী বলবে, অস্বীকার করবে, অত্যাচার করবে, যুদ্ধ করবে, এমনকি গোত্র থেকে বহিষ্কারও করবে। যদি ঈশ্বরের ইচ্ছা হয়, আমি বেঁচে থাকলে সাহায্য করবো সেই ভাবে যেভাবে ঈশ্বর আজ্ঞা করবেন।' তারপর তিনি প্রফেট মোহাম্মদের ললাট চুম্বন করলেন। প্রফেট নিঃসঙ্গচিত্ত হয়ে বাড়ি ফিরে এলেন এবং নিজের মনকে শক্ত করলেন। ওয়ারাকা যে উৎসাহ প্রফেটকে দেন তা তার অন্তঃকরণকে উন্নত করে, আলোকিত করে (Watt 1953, P. 51)।

ঐ একই বছরে (৬১০), ওয়ারাকা খ্রিস্টান হিসাবে মারা যান। অনেক ইসলামী পুস্তকে ওয়ারাকাকে হানিফ বলা হয়েছে অথবা বলা হয়েছে সত্য ধর্মের অনুসারী।

৫.১১ বিরতি (ফাত্‌রা)

হেরা পর্বতে গুহার প্রথম 'ওহি' অবতরণের পর বেশ কিছু সময়ের জন্য ওহি বন্ধ ছিল। এই বিরতিকে ফাত্‌রা বলা হয়। সূরা আলাক (৯৬) ও পরবর্তী সূরার মধ্যে বিরতি ছিল কারোর মতে সাত মাস, আবার অন্যের মতে সাত বছর। আবার কেউ বলেন তিন বছর এবং এটা সম্ভবত সঠিক ব্যবধান অনেক পণ্ডিতের মতে।

আল-তাবারীর মতে, লোকেরা প্রফেট মোহাম্মদকে উপহাস করত এই বলে যে তার প্রভু (রব) অথবা সাথী (সাহিব) তাকে ত্যাগ করেছে। এক মহিলা– অনেকে বলেন উম্মে জামিল আবু লাহাবের পত্নী– বলেছিলেন– 'তোমার শয়তান তোমাকে ত্যাগ করেছে এবং সে তোমাকে ঘৃণা করে।'

এই বিরতির প্রথম দিকে প্রফেট মোহাম্মদ বেশ মানসিক যন্ত্রণায় ভুগেছেন। তিনি প্রায় সময় বিমর্ষ হয়ে থাকতেন, এমনকি আত্মহত্যা করার চিন্তা করেন (১৮ ঃ ৫)।

www.pathagar.com

তফসীরকার ইবন হিশাম এবং আল বোখারী বলেছেন যে প্রফেট অনেকবার চেয়েছিলেন যে পাহাড়ের শীর্ষ থেকে লাফ দিয়ে জীবন অবসান করে দেন। তিনি তাঁর মিশনে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন এবং বিস্মিত হয়েছিলেন এই ভেবে যে তাকে হয়তো ঠকানো হয়েছে।

এই ক্রাইসিস ও হতাশা থেকে তিনি আশাহত জীবনে আশার আলো পেয়েছিলেন খাদিজার অনবরত আশ্বাসবাণী ও উৎসাহের দ্বারা। খাদিজা তাকে বিশ্বাসী হতে বলেন, সহিষ্ণু হতে বলেন এবং তার প্রচেষ্টাকে খাদিজা উৎসাহ দেন এবং একেশ্বরবাদীতে আরো বেশি করে বিশ্বাসী হতে বলেন। এই সময়ের মধ্যে প্রফেট মক্কাতে বসবাসরত খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের সদস্যদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করতে থাকেন এবং তাদের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতেন।

পরবর্তী তিনটি ওহি অবতরণের পর্যায়ক্রম ও তারিখ নিয়ে পণ্ডিতদের মতভেদ আছে, কিন্তু সাধারণত মনে করা হয় ঘটনা ঘটেছিল এই ভাবে। একদিন ৬১৩ খ্রিস্টাব্দে এই লম্বা বিরতির অবসান হলো যখন প্রফেট মোহাম্মদ ঐশীবাণী পেলেন, যাতে তার প্রভু (রব) তাকে আশ্বাস দিলেন যে তিনি প্রফেটকে ত্যাগ করেননি এবং তার প্রতি অসন্তুষ্টও নন (৯৩ : ৩)। এর পরেই কার্পেটে চাদর গায়ে শোয়া থাকা অবস্থায় তিনি আরও দু'টি ওহি পান উভয়ই শুরু হয়েছিল– 'হে বস্ত্রাবৃত' তারপর আদেশ হয় উঠে দাঁড়াও ও প্রার্থনা করো (৭৩ ঃ ২); তারপরেই অন্য আদেশ হলো ওঠ, এবং প্রচার করো। (৭৪ ঃ ২)। এরপর থেকেই ধারাবাহিকভাবে তিনি ওহি পেয়েছেন এবং সেগুলো মুখস্থ করা হয় এবং লিখে রাখা হয় তার সঙ্গীসাথীদের ও খতিবদের দ্বারা; পরবর্তীতে সংকলিত হয় সম্পূর্ণ একটি কোরানের আকারে।

৫.১২ অশিক্ষিত প্রফেট

হেরা পর্বতের গুহায় অবতীর্ণ প্রথম ওহির রাত্রের তাৎপর্য নিয়ে এবং প্রফেট মোহাম্মদ যেভাবে 'পাঠ করা'র জন্য আদিষ্ট হয়েছিলেন তার প্রকৃতি ও অর্থ নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে অনেক বিতর্কের সূচনা হয়েছে। এই প্রথম ভিশনের সময় প্রফেটকে স্বর্গীয় পুস্তকের একটি পৃষ্ঠা দেখিয়ে পড়তে আদেশ করা হয়। পরে তাঁকে স্বর্গীয় সুবিধাও দেওয়া হয়েছিল পাঠ করার জন্য, কারণ বলা হয় তিনি অশিক্ষিত ছিলেন।

প্রফেট মোহাম্মদ সম্বন্ধে কোরানে বলা হয়েছে, তিনি অক্ষরজ্ঞানহীন unletted (উম্মি) (৭ ঃ ১৫৭)। তিনি কোনো গ্রন্থ পড়তে পারতেন না, লিখতেও পারতেন না (২৯ ঃ ৪৭)। মুসলিম ধর্মীয় পণ্ডিত বা আলেমরা জোর দিয়ে বলে থাকেন যে প্রফেট মোহাম্মদকে বলা যাবে না যে তিনি পুস্তক থেকে জ্ঞান আহরণ করেছেন, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন অন্য উৎস থেকে। একটা পবিত্র ধর্মপুস্তক বর্ণনা করার জন্য তার কয়েকটি প্রজ্ঞাকে 'কেতাবী জ্ঞান' দিয়ে কলুষিত না করাই শ্রেয়। তাই প্রফেটের অক্ষরজ্ঞান তীব্রতা এভাবেই প্রমাণ করে যে কোরান অলৌকিক ঘটনা থেকে উৎসারিত।

এক কাহিনীতে বলা হয়েছে যে প্রফেট মোহাম্মদের প্রথম যুগের শত্রু ইবন সিয়াদকে তিনি যখন জিজ্ঞাসা করলেন 'তুমি কি সাক্ষ্য দাও যে আমি আমি আল্লাহর

www.pathagar.com

নবী?' জবাবে ইবন সিয়াদ বলেন, 'আমি সাক্ষ্য দিই যে তুমি অশিক্ষিত ও মূর্খ লোকদের নবী।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ অস্বীকার করেন যে প্রফেট মোহাম্মদ অশিক্ষিত ছিলেন। তিনি এক প্রভাবশালী পরিবারের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যে পরিবার প্যাগন আরবের অতি পবিত্র ধর্মীয় পীঠস্থানের তত্ত্বাবধায়ক ছিল। তিনি বছরের পর বছর ধরে বাণিজ্য সংক্রান্ত ব্যাপারে বিদেশ ভ্রমণ করেছেন এবং হয়তো তার নিজের ভাষা আরবির নিশ্চয়ই ভালো পরিচয় বা জ্ঞান ছিল, অন্য কোনো ভাষা না জানলেও।

তার স্ত্রী খাদিজা একজন খ্যাতনামা ও সফল ব্যবসায়ী রমণী ছিলেন এবং শিক্ষিত পরিবারের সদস্যা– এমনকি যদি ধরা হয় যে খাদিজার সাথে বিবাহের সময় তিনি অশিক্ষিত ছিলেন, এটা খুবই অবাস্তব যে তাদের ২৫ বছরের বিবাহিত জীবনে এবং একত্রে বাস করা সত্ত্বেও তিনি তার স্বামীকে লিখতে ও পড়তে বলার জন্য অনুরোধ করবেন। প্রফেট পরবর্তী জীবনে শিক্ষার বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন এবং বদরের যুদ্ধে ধৃত কয়েকজন মক্কাবাসীকে মুক্তিপণের বদলে মদিনাবাসীদের লেখাপড়া শিক্ষা দিতে বলেন।

প্রফেট মোহাম্মদ অনুভব করে থাকতে পারেন যে আরবদের ঐশী গ্রন্থ নেই, কেননা তারা অশিক্ষিত, তাই "তিনিই উম্মীদের মধ্যে একজন রাসূল পাঠাইয়াছেন তাহাদের মধ্যে হইতে"– (৬২ ঃ ২); এতে প্রমাণিত যে আরবরা অশিক্ষিত ছিল, যেমন ইবন সিয়াদ প্রফেট মোহাম্মদকে বলেছিলেন 'তুমি অশিক্ষিত মানুষদের নবী।'

হেরা পর্বতের গুহায় সেই 'ভিশন'কে ব্যাখ্যা করা হয়েছে প্রফেট মোহাম্মদের অবচেতন মনের নির্দেশ বলে যাতে তিনি ইহুদি ও খ্রিস্টানদের ধর্মপুস্তক অধ্যয়ন করতে পারেন, তাদের লেখকদের হাতে কলম দেওয়া হয়েছিল ঈশ্বরের বাণী পুস্তকে বিধৃত করতে যে লেখার জ্ঞান আরবদের ছিল না।

কোরানে যে নির্ভুল বাণী লিখিত তা নির্ভর করে প্রফেটের শিক্ষার জ্ঞানের ওপরে, যারা লিখেছেন তাদের ওপরে নয়। কয়েকজন পণ্ডিত ব্যক্তির মতে, প্রফেট মোহাম্মদ ব্যক্তিগতভাবে কিছু আয়াত বিন্যাস করেন এবং সে আয়াতগুলো পরিবর্ধনও করেন। হোদায়বিয়ার সন্ধির খসড়া প্রস্তুত করার সময় তিনি নিজের হাতে কিছু শব্দের পরিবর্তন করেন। মৃত্যুশয্যায় বলা হয়েছে, তিনি লিখবার জন্য কাগজ-কলম চেয়েছিলেন তাঁর উত্তরাধিকারী সম্বন্ধে সমস্যার সমাধান করার মানসে, কিন্তু তাঁর সে অনুরোধ রক্ষা করা হয়নি।

৫.১৩ ঘূর্ণিরোগ ও মৃগীরোগ

বাল্যকাল থেকে মোহাম্মদ ঘূর্ণিরোগে আক্রান্ত হতেন ফলে তিনি অচেতন অবস্থায় মাটিতে পড়ে যেতেন। নার্স হালিমার কাছে চার বছর বয়সে প্রথমে এই রোগে তিনি আক্রান্ত হন। হালিমার পুত্রের সাথে, বেদুইনদের তাঁবুর কিছু দূরে, হাঁটা-চলার সময় হঠাৎ মাটিতে পড়ে অজ্ঞান হয়ে যান। হালিমা মনে করেন বালক মোহাম্মদ জীর্ণ বা ভূতগ্রস্ত হয়ে অজ্ঞান হয়েছে (Nicholson, 1969 P. 147), এই ভয়ে বালক মোহাম্মদকে তাঁর মাতার কাছে হালিমা ফিরিয়ে দেন।

www.pathagar.com

এই মৃগী বা ঘূর্ণ রোগ তাঁর জীবনের বেশির ভাগ জুড়ে চলেছিল এবং একে কেন্দ্র করে বিভিন্ন বর্ণনা ও কেচ্ছা কাহিনীর জন্ম হয়েছে। সাধারণত এ রোগ শুরু হতো মাথা ধরা থেকে অর্থাৎ প্রথমে মাথা ধরত তারপর অসম্ভব মানসিক যন্ত্রণাসহ অব্যক্ত ভীতি তাঁর সারা দেহ-মনকে আচ্ছন্ন করত। কে যেন আক্রমণ করতে আসছে এই ভয়ে তিনি নিজেকে লুকিয়ে রাখতে ইচ্ছা করতেন। তাঁর দুই চোখ এদিক থেকে ওদিকে ঘুরতে থাকত। মাথা ভারি হয়ে দাঁড়াতে পারতেন না, পড়ে যেতেন।

এমনকি শীতের দিনে, তার কপালে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম দেখা দিত তারপরেই ভীষণভাবে ঘেমেনেয়ে উঠতেন অর্থাৎ ঘামে সারা দেহ ভিজে যেত। তারপর মনে হতো যেন দম বন্ধ হয়ে আসছে, দেহ সঙ্কুচিত হচ্ছে কোনো এক অদৃশ্য চাপে, এতে যন্ত্রণা হতো অসহ্য। তাঁর ঠোঁট দু'টি দপদপ করে কাঁপতে আরম্ভ করত এবং সেই সাথে সারা দেহে কাঁপন বেড়ে যেত মাথা থেকে পা পর্যন্ত। তার শ্বাসকষ্ট শুরু হতো, গোঙ্গাতে থাকতেন আর ভীষণ কর্কশ শব্দে চেঁচিয়ে উঠতেন উটের বাচ্চার কান্নার মতো (cry out like camet colt)।

তিনি নিজের জিহ্বা কামড়াতেন, সারা মুখ ফেনায় ভরে যেত, মুখ লাল হয়ে আসত মৃগী রোগীর মতো। তারপর হঠাৎ মুখ লাল হয়ে রক্ত ঝরত এবং গায়ের রঙ সাদা হয়ে যেত। এর পরেই তিনি নিস্তেজ হয়ে আসতেন অথবা মাতালের মতো ধপ করে মাটিতে পড়ে যেতেন (Andrae, 1960 P. 50). তারপর খিঁচুনি শুরু হতো এবং অচেতন হয়ে পড়ে স্থির হয়ে যেতেন সম্মোহ মূর্ছারোগগ্রস্ত রোগীর মতো। এই অভিজ্ঞতাকে বর্ণনা করতে গিয়ে একবার তিনি আবদুল্লাহ ইবন ওমরকে বলেছিলেন 'আমি একটা বিকট শব্দ শুনি, তারপর মনে হয় কে যেন ভীষণ একটা ঘুষি কষলো, এতে অনুভব করি আমার আত্মা যেন ছিঁড়ে যাচ্ছে, পরান বের হয়ে যাচ্ছে।'

অন্য সময়ে তিনি অদ্ভুত শব্দ শুনতে পান, মাথায় গোলমাল শুরু হয়, কান ভোঁ ভোঁ করে যেন মৌমাছির ভোঁ ভোঁ শব্দ; অগুনতি মৌমাছির পাখার শোঁ শোঁ শব্দ, তারপর কানের কাছে ফিসফিস শব্দ (হাতিফ), এ শব্দ প্রাণকে বিব্রত করে তোলে, তারপর ঘণ্টার প্রতিধ্বনি। এই ঘণ্টার শব্দ তার কছে অদ্ভুত লাগে, অত্যন্ত বিরক্তিকর শব্দ, অসহ্য এ শব্দ তার অন্তঃকরণকে ছিন্ন-ভিন্ন করে দেয়। এমনকি প্রতিদিন যে মন্দিরে ঘণ্টা বাজে তাতেই তিনি মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন, অদ্ভুত মনে হয় সে ঘণ্টা ধ্বনি। তাঁকে এ শব্দ উদ্বিগ্ন ও অস্বস্তি করে তোলে, মনে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। এই কারণেই তিনি প্রার্থনার জন্য ডাকতে যে ঘণ্টাধ্বনি বাজানো হতো তা বন্ধ করে দেন।

প্রফেট মোহাম্মদের কিছু অনুসারী তার বাল্যকালের এই মূর্ছা রোগের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন যে, দেবদূতরা এসে তাকে অচেতন করে অন্তর হতে আদিপাপ বা বদ রক্ত বের করে দিত।

সাক্ষ্য প্রমাণে, প্রফেটের সমসাময়িক যারা ছিলেন তাদের ধারণা যে তাঁর হঠাৎ অজ্ঞান হওয়া বা খিঁচুনি রোগ (epilepsy) থেকে ভুগতেন বাল্য অবস্থা থেকে। ঐ সময়ের আরবেরা অন্যান্য প্রাচীন লোকদের মতো খিঁচুনি বা মূর্ছারোগকে পবিত্র অসুখ বলে বিবেচনা করত যা স্বর্গীয় আশীর্বাদস্বরূপ। মৃগী রোগীর মতো প্রফেটের প্রায়ই আক্রান্ত হওয়ার পূর্বে সাবধান বাণী পেতেন এবং সাথে সাথে লুকিয়ে যেতেন বা তাঁর

www.pathagar.com

চাদর দিয়ে নিজেকে অথবা মস্তক ঢেকে ফেলতেন। এই অবস্থা ও অন্যান্য নিদর্শন আরবের লেখকগণ মৃগী রোগের বা মূর্ছা রোগের লক্ষণ বলে বর্ণনা করেছেন। যাইহোক প্রফেট মোহাম্মদের প্যাগন আত্মীয়স্বজনরা প্রথম দিকে এ রোগের চিকিৎসা করে সারতে চেষ্টা করে।

পরবর্তীতে, আল-ওয়াকিদির মতো লেখকরা ব্যাখ্যা করেছেন যে রোগটা হয়তো জ্বর বা কম্পজ্বর (ague) বা মাথাব্যথা (মাইগ্রেন) জাতীয় হবে, আবার অনেকে ব্যাখ্যা করেছেন পবিত্র সম্মোহনভাব (holy trance) এবং অনেকে বলেছেন অন্য কিছু যার মধ্য দিয়ে তিনি সমাধিপ্রাপ্ত হতেন এবং 'ওহি' অবতরণ হতো ঐ সময়ে এবং সেই অবস্থাতে তিনি ঐশীবাণী আবৃত্তি করতেন এবং সত্যি বলতে কি, প্রফেটিক জীবনের শুরুতে 'ওহি' পাওয়ার পূর্বে এই মূর্ছাবস্থায় 'সমাধি'প্রাপ্ত হতেন।

এই 'সমাধি'প্রাপ্ত অবস্থার কালভেদ ছিল অর্থাৎ ক্ষণস্থায়ী বা দীর্ঘস্থায়ী হতো। সময়ের বিবর্তনে এই মূর্ছা রোগের মাত্রা কমে গেল এবং মদিনাতে 'এ ঘটনার' পুনরাবৃত্তি ঘটত খুব কম। আরো বলা হয়েছে যে, শুরুতে এই রোগে বেগ কম ছিল, তাই ভালোমতো কোনো চিকিৎসা হয়নি.এবং এর ফলে ক্রমে বৃদ্ধি পেতে পেতে আবার কমে গেছে যার ফলাফল দেখা গেছে মক্কায় 'ওহি' অবতরণের এবং পরবর্তীতে মদিনায় 'ওহি' অবতরণের পুনঃপুনঃ সংঘটন থেকে (Frequency)। কারণ– মক্কায় সূরা নেমেছে ৯০ বার আর মদিনায় ২৪ বার (কোরানে সংকলিত সূরার সংখ্যা মোট ১১৪)।

মদিনা কালে দেখা গেছে যে, সে সময় প্রফেটের সচেতনতা বেশি ছিল এবং সেই অবস্থায় কোনো কোনো পণ্ডিত ব্যক্তি মনে করেন যে কিছু 'সম্মোহন অবস্থা' অকৃত্রিম (genuine) ছিল এবং পরের ঘটনা যদিও দেখাত স্বতঃস্ফূর্ত (spontaneous), মনে হতো নিয়ন্ত্রিত এবং কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যে আত্মোভূত (Torrey 1967. P. 59)। প্রফেট মোহাম্মদ অনুভব করতে পারতেন যে তার এই পবিত্র সমাধি ভাবের মাত্রা কমে যাওয়াতে তার অনুসারীরা বিশ্বাস করত যে, এই পরিবর্তিত অবস্থায় তার অনুপ্রাণিত প্রকৃতির কথাবার্তার মাত্রাও কমে গেছে। তার এই বিচ্ছিন্ন 'সম্মোহনভাব'কে তিনি সমন্বিত করতে পেরেছিলেন ভবিষ্যদ্বক্তা হিসাবে। অর্থাৎ তার বাণীকেই তার অনুসারীগণ ঐশীবাণীই বলে বিবেচনা করেছেন।

মুসলিম পণ্ডিতরা এইসব অনুমানকে পক্ষপাতগ্রস্ত ও ভিত্তিহীন বলে বাতিল করেন। প্রফেট মোহাম্মদের যে মৃগী রোগ বা মূর্ছারোগ ছিল এ সম্বন্ধে আরব দেশে কোনো দলিল নেই। কোনো সময়েই তার এই তথাকথিত রোগের লক্ষণ দেখা দেয়নি এবং তার একজন সাহাবীও কখনো বলেননি যে, প্রফেটের মানসিক অস্থিতি ছিল। আরবের বন্য গোত্র-দ্বন্দ্বকে শান্ত ও নিয়ন্ত্রিত করতে, ইসলামের পক্ষপুটে বিধর্মী আরবদের টেনে আনতে, কোরানে যেসব পবিত্র ও পূত বাণী আমরা দেখি তার গ্রহীতারূপে যে মহান পুরুষটি সক্ষম হয়েছিলেন, এই সব স্পষ্ট ঐতিহাসিক সত্যগুলো, মুসলিম পণ্ডিতরা বলেন, প্রমাণ করে যে প্রফেট মোহাম্মদ ছিলেন যুক্তিবাদী, পরিষ্কার মস্তিষ্ক এবং প্রকৃতিস্থ এবং তাঁর জীবনের শেষদিন পর্যন্ত এই অবস্থায় ছিলেন।

www.pathagar.com

৫.১৪ ভূতাবেশ

প্রাচীন লোকদের মধ্যে ভূতগ্রস্ত হওয়া বা ভূতে পাওয়া সাধারণ বিশ্বাস ছিল, এখনো আছে। তাই আরবে খ্রিস্টান বেদুইনদের মধ্যে মোহাম্মদের বাল্যাবস্থার ভূতগ্রস্ত হওয়ার কাহিনী অস্বাভাবিক ছিল না, তাই তখনকার আরববাসী সন্দেহ করত যে মোহাম্মদ বাল্যাবস্থায় ভূতগ্রস্ত হতেন। পরে তার এই রোগ সম্বন্ধে অনেক থিওরির অবতারণা হয়েছে। এটা হতে পারে যে তিনি কোনো রমণীর অশুভ দৃষ্টিতে (ইসাবাত আল-আয়েন) ক্ষতি করার জন্য জাদু করত ঈর্ষাবশত (হাসাদ) এবং দড়ি বা সুতোয় গিঁট দিয়ে তাদের দুষ্ট মানস চরিতার্থই করত। প্রফেট মোহাম্মদ আরবদের মধ্যে প্রচলিত এই নিয়ম বা পদ্ধতি সম্বন্ধে অজ্ঞাত ছিলেন না (১১৩ ঃ ৪-৫)।

যারা বিশ্বাস করতেন যে প্রফেট মোহাম্মদ কুদৃষ্টির দ্বারা জাদুগ্রস্ত হয়েছেন তাদের সংখ্যা কম ছিল না। তাঁর স্ত্রী খাদিজা এটা পছন্দ করতেন না যে তার স্বামী এই পদ্ধতির দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হন, তাই তিনি এক বৃদ্ধাকে ডেকে এনে এর প্রতিরোধ করতেন। যখন প্রফেট মোহাম্মদ ঐশীবাণী পেতে আরম্ভ করলেন, তখন এই বৃদ্ধা মহিলাকে বিদায় করেন। প্রফেট মোহাম্মদের শত্রুরা তাঁর মধ্যে যে রহস্যজনক লক্ষণ দেখতে পায় সেটা তাদের কাছে অস্বাভাবিক মনে হয়। তিনি যে দাবি করতেন গ্যাব্রিয়েলের মারফৎ আল্লাহর বাণী পেতেন এটা তার বিরুদ্ধ দলের মনে বদ্ধমূল করেছিল এই মর্মে যে কোনো অশুভ অস্তিত্ব এই সব গায়েবী আওয়াজের জন্য দায়ী। প্রফেট মোহাম্মদ জাদুগ্রস্ত বা ভূতগ্রস্ত হয়ে কোনো দুষ্ট আত্মার মুখপাত্র হয়ে এসব কথাকে আল্লাহর বাণী বলে চালাচ্ছে। "অতএব উহারা তাহাকে অমান্য করিয়া বলে 'সে শিক্ষাপ্রাপ্ত এক পাগল' (৪৪ঃ১৩)। কেউ শনাক্ত করল যে প্রফেটকে জ্বিনে ভর করেছে। (৫২ ঃ ২৯), যে তাকে দিয়ে বলাচ্ছে। কেউ বলল জাদুগ্রস্ত মানুষ (২৫ ঃ ৯)। কেউ বলল ম্যাজিসিয়ান (৩৭ ঃ ১৫) কিংবা ভবিষ্যৎদ্বক্তা (Soothsayer)-৬৯ ঃ ৪২)। জোহরা গোত্রের আসওয়াদ ইবন আব্দুল ইয়াগুত, প্রফেটের মায়ের তরফের কাজিন, অপবাদ দিল জাদুকর ও পাগল বলে– এমনকি প্রফেটকে খুন করার জন্য খুনি ভাড়া করার চেষ্টা করে (খালিবি, ১৯৬৮, পৃঃ ৯০)।

প্রফেট মোহাম্মদ বিশ্বাস করেন যে শয়তান বা দুষ্ট ব্যক্তিরা মানুষদের বিভ্রান্ত করছে। এই দুষ্ট প্রকৃতি রাতে প্রার্থনার সময় মানুষের অন্তরে প্রবেশ করে তাদের সত্য পথ থেকে বিপথে চালাবার চেষ্টা করছে। শয়তান আদমকে ধোঁকা দিয়েছিল তাই তাকে বেহেস্ত থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। (২ ঃ ৩৪) অতীতে সে মহান প্রফেটদের বেপথু করার চেষ্টা করেছে। এক স্মরণীয় ঘটনায় প্রফেট নিজেই শয়তান দ্বারা সাময়িকভাবে ধোঁকা খেয়ে যান।

প্রফেটের শত্রুরা বলত অশুভশক্তি তাকে ভর করেছে কোনো দুষ্টবুদ্ধি কাজে লাগানোর জন্য এবং এর জন্য তারা উপহাস করেছে, বিরুদ্ধে বলেছে। এরূপ পাঁচ জন উপহাসকারী ও বিদ্রূপকারী এক দিনেই মারা গেছে। প্রফেট তার চাচা আবু লাহাবকে অভিশাপ দেন এবং কিছু দিনের মধ্যে বদরের যুদ্ধে আবু লাহাব মারা যান।

বদরের যুদ্ধে প্রফেট মন্ত্র পড়ে শত্রুদের প্রতি নিক্ষেপ করেন। প্রথমে তিনি তাঁবুতে বসে ধ্যান করতেন তারপর বের হয়ে এসে আনুষ্ঠানিক পদ্ধতিতে একমুঠো

www.pathagar.com

কাঁকর তুলে শত্রুদের প্রতি নিক্ষেপ করে বলতেন তাঁদের ভূতে পাক-নিপাত যাক। হুনায়েনের যুদ্ধেও তিনি এই একই পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন এবং একমুঠো ধুলো নিক্ষেপ করে বলেছেন– তোদের ধ্বংস হোক।

অন্য একটা ঘটনায় বলা হয়েছে যে, যখন একটি খ্রিস্টান ডেলিগেশন নাজরান থেকে প্রফেট মোহাম্মদের সাক্ষাতে এলেন, তারা উভয় ধর্মের তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনায় অংশ নেন। এক পর্যায়ে প্রফেট বলেন যে বিষয়টি সাব্যস্ত হোক একে অন্যকে অভিশাপ প্রদানের মাধ্যমে (৩ ঃ ৫৪)। এতে খ্রিস্টান ডেলিগেশন সম্মত হয়নি।

মুসলিম বর্ণনাকারীদের মতে, প্রফেট মোহাম্মদ ঘটনাকে প্রভাবিত করতেন তার কথার দ্বারা এবং এই ক্ষমতা কোনো অশুভ শক্তি থেকে তিনি পেতেন না, পেতেন আল্লাহর কাছ থেকে যিনি তাঁকে সারা জীবন ধরে পরিচালিত করেছেন। এই আল্লাহর শক্তি ও সাহায্যে তিনি তাঁর শত্রুদের ও প্রতিবাদী শক্তিকে ধ্বংস করেছেন।

৫.১৫ জায়েদ ইবন হারিথ

খাদিজার পর ইসলামে দীক্ষিত দ্বিতীয় ব্যক্তি হলেন জায়েদ ইবন হারিথ (৫৮০–৬২৯)। তিনি খ্রিস্টান কাল্‌ব গোত্রে দক্ষিণ সিরিয়াতে জন্মগ্রহণ করেন। দস্যুদের দ্বারা অপহারিত হয়ে তিনি বিক্রীত হন খাদিজার ভাইপোদের কাছে এবং সেখানেই পালিত হন। খ্রিস্ট ধর্মে বিশ্বাস রেখেই তিনি খাদিজার অধীনেই ছিলেন।

খাদিজা যখন প্রফেট মোহাম্মদকে বিবাহ করেন তখন তিনি বালক জায়েদকে উপহার দেন স্বামীকে। তখন জায়েদের বয়স পনের বছরের মতো। জায়েদ দাস হিসাবেই কাজ করতেন। যখন তাঁকে মুক্তি দিয়ে তাঁর গোত্রের কাছে ফিরে যেতে বলা হলো, জায়েদ ঐ বাড়িতেই থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তার আন্তরিকতায় সন্তুষ্টি প্রকাশ করে জায়েদকে নিয়ে কাবাঘরে যান প্রফেট মোহাম্মদ এবং সকলের সম্মুখে দাসত্ব থেকে মুক্তি দিয়ে ঘোষণা দেন যে তিনি জায়েদকে নিজ পুত্র হিসাবে দত্তক নিলেন। যুবক জায়েদ তখন থেকেই জায়েদ ইবন মোহাম্মদ বলে পরিচিত হন।

জায়েদই কেবলমাত্র প্রফেট মোহাম্মদের সাহাবীদের মধ্যে কোরানে উল্লেখিত হয়েছেন (৩৩ ঃ ৩৭)। প্রফেট মোহাম্মদ প্রথমে জায়েদের বিবাহ দেন তার প্রথম খ্রিস্টান নার্স উম্মে আয়মানের সাথে। তিনি বারাকা নামেও পরিচিত। জায়েদের চেয়ে বারাকা ১৫ বছরের বড় ছিলেন এবং তিনি জায়েদকে এক পুত্র সন্তান উপহার দেন। তার নাম ওসামা। পরে জায়েদ বিবাহ করেন প্রফেটের কাজিন, সুন্দরী জয়নাবকে, তাকে পরে তালাক দেয়া হয়। প্রফেট মোহাম্মদ তখন নিজেই জয়নাবকে বিবাহ করেন।

যখন প্রফেট মোহাম্মদের কাছে কোরানের বাণী অবতরণ করতে শুরু করে তখন জায়েদের বয়স প্রায় তিরিশ। জায়েদ সুশিক্ষিত ছিলেন এবং আরবি ভাষার ওপর ভালো দখল ছিল। তিনি প্রফেটের প্রাথমিক ওহি ধারকের মধ্যে একজন ছিলেন। প্রফেটের ধর্মীয় প্রচার ও প্রসারের ওপর জায়েদের প্রভাব ছিল যথেষ্ট। প্রফেট মোহাম্মদ যখন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত তখন জায়েদ প্রফেটের বিশ্বাসী ব্যক্তিরূপে সকলের কাছে সম্মানীয় ছিলেন। বলা হয়েছে যে, ৬২৯ সালে মুতার যুদ্ধে তার অকাল মৃত্যু না হলে হয়তো তিনিই প্রফেট মোহাম্মদের উত্তরাধিকারী হতেন (Watt, 1961, P. 157)।

www.pathagar.com

৫.১৬ প্রথমে যারা ইসলাম গ্রহণ করেন

প্রথমে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, তার মধ্যে আবুবকর ছিলেন বেশ প্রভাবশালী ব্যক্তি। তিনি ধনাঢ্য বণিক, প্রফেটের চেয়ে দু'বছরের ছোট। পরে ইনি প্রফেটের শ্বশুর হন এবং প্রথম খলিফা বা প্রফেটের উত্তরাধিকারী। আবু বকর, ওসমান ইবন আফ্‌ফানকে প্রভাবিত করেন ইসলাম গ্রহণে। ওসমান শক্তিশালী কোরেশী উমাইয়া গোত্রভুক্ত। পরে তিনি ইসলামী রাজ্যের তৃতীয় খলিফা হন।

অন্যান্যদের মধ্যে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তারা হলেন খাদিজার ভাইপো এবং নামকরা যোদ্ধা জুবাইর ইবন আওয়ান (জুবাইরের পুত্র অরওরা ইসলামী প্রাথমিক ট্র্যাডিশনের একজন অথরিটি ছিলেন।) খাদিজার আর একজন আত্মীয় আবদুল্লাহ ইবন উম্মে মাখতুম ইসলাম গ্রহণ করেন কিন্তু প্রফেট তাকে প্রথমে ফিরিয়ে দেন কারণ তিনি অন্ধ ছিলেন, কিন্তু পরে তাকে গ্রহণ করা হয় (৪০ ঃ ১। তিনি দু'দুইবার মক্কার গভর্নর পদে অধিষ্ঠিত হন। প্রফেটের চাচা হামজা প্রথমে ইসলামবিরুদ্ধ ছিলেন, কিন্তু মক্কার একটি বিরুদ্ধ দলের হাত থেকে প্রফেটকে রক্ষা করতে গিয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। প্রাথমিক বিশ্বাসীদের মধ্যে আবু তালিবের পুত্র আলীও ছিলেন। আলী ছিলেন প্রফেট মোহাম্মদের চাচার পুত্র, তের বছর বয়সের আলীকে প্রফেট নিজ সংসারের অন্তর্ভুক্ত করেন। পরে আলী ফাতিমাকে বিবাহ্ করে প্রফেটের জামাতা হন, তারপর হন চতুর্থ খলিফা। তিনি শিয়াদের প্রথম ইমামও।

প্রথম দিকে নতুন ধর্ম ইসলামকে অতি সতর্কতার সাথে পালন করতে হতো, কারণ শক্তিশালী কোরেশীদের প্রতিবাদ ও অত্যাচারের ভয় ছিল। গোল্ডজিহার লিখেছেন যে, প্রথমে মুসলিমদের প্যাগন মক্কানদের অগোচরেই প্রার্থনা ও অন্যান্য রিচুয়েল পালন করতে হতো (1967, P. 42) এবং এমনকি ইসলাম ধর্ম পালন যখন খোলাখুলিভাবে চালু হলো তখনও প্রার্থনার সময় সেজদা করাকে মক্কানরা উপহাস ও বিদ্রূপ করত।

ট্র্যাডিশন মতে, আবু তালিব তার যুবক পুত্র আলী ও প্রফেট মোহাম্মদের মক্কার নিকটস্থ এক স্থানে প্রার্থনা করার কথা জানতেন না, তাই তাদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন এটা তোমরা কি করছো। প্রফেট মোহাম্মদ জবাবে বলেন যে, ঐশী নির্দেশ মতে তিনি ইসলামের অনুসরণ করছেন এবং আবু তালিবকেও তাদের দলে যোগ দিতে বলেন। আয়েশার বর্ণনা অনুযায়ী, বৃদ্ধব্যক্তি (আবু তালিব) জবাব দিয়েছিলেন যে তিনি তার বাপ-দাদাদের ধর্ম-বিশ্বাস ত্যাগ করতে পারেন না এবং এমন একটা প্রার্থনায় যোগ দিতে পারেন না– 'যেখানে মাথার উপর পশ্চাৎদেশ উঠে যায়' (Glubb, 1979, P. 98)। পরে তায়েফের শহরবাসীরা ইসলামে যোগ দিতে রাজি হয় এই শর্তে যে তারা 'সেজদা' বাদ দিতে চায় প্রার্থনা থেকে। তাদের এ প্রস্তাব অবশ্য গৃহীত হয়নি।

যখন মক্কার লৌহমানব ও বদমেজাজী এককালীন ইসলামবিরোধী ওমর ইবন আল-খাত্তাব ইসলাম গ্রহণ করেন তখন মুসলিমদের সাহস ও আত্মবিশ্বাস বেড়ে যায়। তার নিজের বোন ফাতিমা ও তাঁর স্বামী সাঈদ (হানিফ জায়েদের পুত্র) প্রফেট মোহাম্মদ-এর অনুসারী হয়েছে, তখন ওমর তাদের বাসায় গিয়ে দেখেন যে তাদের দাস খাবাব জোরে জোরে কোরানের পাণ্ডুলিপির এক অংশ পাঠ করছে। রেগেমেগে

www.pathagar.com

প্রথমেই তিনি বোনকে আঘাত করেন ফলে তার রক্তপাত হয়। নিজেকে সামলে নিয়ে যখন তিনি একটু শান্ত হন তখন খাবাব তাকে সে আয়াত (সূরা ২০ থেকে) পাঠ করতে এবং নতুন ধর্ম সম্বন্ধে শুনতে অনুরোধ করে। এর পর ওমর নিজেই মুসলিম হন। পরে ওমর দ্বিতীয় খলিফা হয়েছিলেন।

প্রফেট মোহাম্মদ তার প্রাথমিক শিষ্যদের নিয়ে নিজের বাসাতে আলোচনা করতেন না, আলোচনা করতেন কোরেশ গোত্রে মাখজুম আল-আকরামের বাসায়, সেটা মক্কার বাইরে একটা নির্জন স্থানে অবস্থিত ছিল। বিভিন্ন অথরিটি প্রাথমিক মুসলিমদের লিস্টি দিয়েছেন বিভিন্নভাবে এবং তাদের পর্যায়ক্রম। আবুবকর বা আলী মনে করেন না যে খাদিজা ও জায়েদ ইবন হারিথ বিশ্বাসীদের মধ্যে প্রথম।

সম্ভবত খাদিজ মহিলা বলে তার নাম উল্লেখিত হয়নি; আর জায়েদকে বাদ দিতে পারা যায়নি ক্রীতদাস বলে, কারণ অন্য ক্রীতদাসদের নামের উল্লেখ আছে। সম্ভবত উভয়কে বাদ দেয়া হয়েছে খ্রিস্টান বলে, কেননা খ্রিস্টান বলে তারা সত্যিকারের ইসলাম গ্রহণকারী হতে পারেন না।

ক্রীতদাসদের মধ্যে প্রথম দিকে মুসলিম ছিল খাবাব, জোহরা গোত্রে কাজ করত কামার হিসাবে। তার মা ছিল পেশাদার খাতনাকারী। অন্য জন ছিল আম্মার ইবন ইয়াসির, যে আল-আকরামের বাসায় যাতায়াত করত। তার মায়ের দ্বিতীয় স্বামীর মধ্য দিয়ে তাঁর খ্রিস্টানদের সাথে যোগাযোগ ছিল। তাঁর মায়ের দ্বিতীয় স্বামী মূলত গ্রিক মুক্ত দাস এবং সম্ভবত খ্রিস্টান।

আবুবকর একবার এক ক্রীতদাসকে মুক্তিপণ দিয়ে খালাস করেন। তার নাম বিলাল। বিলাল তার মক্কান মালিক কর্তৃক নিষ্ঠুরভাবে নির্যাতিত হতো। বিলাল এক আবিসিনিয়ান ক্রীতদাসীর পুত্র এই কারণে খ্রিস্টানিটি সম্বন্ধে জ্ঞান ছিল। সে আবুবকরের পরিবারে যোগ দিয়ে পরে অন্যান্য মুসলিমদের সাথে মদিনায় চলে যায়। তার দরাজ কণ্ঠস্বরের কারণে সে প্রথম মোয়াজ্জিন হয়েছিল এবং মসজিদের কাছে একটি উঁচু ছাদের উপর থেকে আজান দিয়ে মুসল্লিদের জামাতে ডাক দিত।

৬৩০ সালে তাবুকে যখন প্রফেট মোহাম্মদ আইলার খ্রিস্টান প্রিন্স জনকে সংবর্ধনা জানান, তখন তিনি বিলালকে আতিথেয়েতার ভার দেন, কারণ বিলাল খ্রিস্টানদের রীতিনীতির সাথে পরিচিত ছিল। প্রফেট মোহাম্মদ বিলালকে এক খণ্ড জমি দান করেন, কিন্তু প্রফেটের মৃত্যুর পর দ্বিতীয় খলিফা ওমর বিলালের দাসত্বের কথা ভুলেননি, তাই সে জমি বাজেয়াপ্ত করেন। কিন্তু কারণ দেখানো হয় বিলাল সে-জমি আবাদ করতে ব্যর্থ হয়েছে। ওমরের অনুমতি নিয়ে, বিলাল মদিনা ত্যাগ করে খ্রিস্টান সিরিয়ায় চলে যান। ৬৩৯ খ্রিস্টাব্দে সিরিয়া অধিকার করে ওমর যখন সিরিয়ায় আসেন তখন তার বিলালের আজান শোনার ইচ্ছা হয়। বেলাল শেষ বারেরমতো আজান দেন। অন্য এক বর্ণনায় বেলাল দামেস্ক মারা যান এবং তার সমাধি বলে কথিত একটি স্থানকে এখনও প্রদর্শন করা হয়। অন্য আর একটি বর্ণনা অনুযায়ী বেলাল দামেস্ক থেকে আনাতোলিয়ায় খ্রিস্টান তারসাসে গমন করেন এবং সেখানে মৃত্যু হয়। তাঁর সমাধি তারসাসে বা আলোপ্লোতে যে কোনো এক স্থানে হতে পারে।

উল্লেখযোগ্য যে, নতুন কনভার্ট মুসলিমদের মধ্যে প্রায় চল্লিশজন ছিল

www.pathagar.com

নিম্নসামাজিক স্তরের– আবিসিনিয়া অথবা বাইজানটাইন অরিজিন। প্রফেটের অতি ঘনিষ্ঠ সাহাবীদের মধ্যে– যারা মক্কাতে ছিলেন– খ্রিস্টান ছিলেন অথবা খ্রিস্টান শিক্ষা-সংস্কৃতি সংযুক্ত আর কিছু কনভার্ট হয়েছিল আল আকরামের বাসাতে।

প্রফেট মোহাম্মদ 'ওহি' পেয়ে প্রথমেই যাদের দ্বারা লিখাতেন তাদের মধ্যেও বেশ খ্রিস্টান ছিল। মক্কায় প্রথম দিকে প্রফেট ঘনিষ্ঠভাবে খ্রিস্টানদের সাথে যোগাযোগ রাখতেন– গ্রিক (বাইজানটাইন)ও ছিল। ঐ সময়ে বাইজানটাইনরা সিরিয়া ও মিশর নিয়ন্ত্রণ করত এবং আবিসিনিয়ার বন্ধু দেশ ছিল। যখন ৬১৫ খ্রিস্টাব্দে পারস্যরাজ দ্বিতীয় খসরু পারভেজ হেরাক্লিয়াসের অধীন সেনাদের পরাস্ত করেন, তখন প্রফেটের বিরুদ্ধ মক্কাবাসীরা আনন্দ-উৎসব করেছিল, কারণ পারস্যরা তাদের মতোই অগ্নি-পূজারী রূপে মূর্তি পূজক ছিল। এদের সাথে ইসলামের মিল ছিল না (Rodwell, 1915. P. 210)।

কিন্তু প্রফেটের সহানুভূতি ছিল বাইজানটাইনদের ওপর এবং তিনি একটি 'ওহি' পান। যেমন গ্রিকরা অতি নিকট ভূমিতে পরাজিত হয়েছে। কিন্তু এই পরাজয়ের পর তারা তাদের শত্রুদের পরাজিত করবে (৩০ : ১-২)। দশ বছর পর ৬২৫ খ্রিস্টাব্দে মুসলিমদের ক্যাম্পে আন্দোৎসব হয় যখন বাইজানটাইনরা পারসিকদের বিধ্বস্ত করে পরাজিত করে এবং প্রফেট মোহাম্মদের ভবিষ্যদ্বাণী ফলে যায়। বলা হয় যে, যখন বাইজানটাইনের বিজয়ের সংবাদ সকলে জানতে পারে, তখন অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করে।

৫.১৭ মক্কাবাসীদের প্রতিবাদ

৬১৫ খ্রিঃ হামজা ও ওমরের মতো শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের ইসলাম গ্রহণ করার পর প্রফেট মোহাম্মদ খোলাখুলিভাবে জনসম্মুখেই প্রচার আরম্ভ করে দিলেন।

প্যাগন আরবদের ধর্ম বিশ্বাসের কিছু মুখ্য আদর্শকে আক্রমণ করার কারণে মক্কার কোরেশগণ প্রফেট মোহাম্মদকে বিভেদ সৃষ্টিকারী বলে অপবাদ দিয়ে অভিযোগ আনল যে তিনি একটি নতুন ধর্ম (মুহ্দাত) প্রচার করছেন (২১ঃ১), যে ধর্ম আরবদের বিশ্বাস ও পূর্বপুরুষদের ধর্মের বিপরীত। (অন্যান্য বিষয়ের সাথে আরবরা তখনো পর্যন্ত স্বর্গ, নরক অথবা শেষ বিচারের দিন সম্বন্ধে কিছুই জানত না)। মক্কার প্যাগনরা ভয় পেল এই ভেবে যে একেশ্বরবাদ যার ওপর প্রফেট মোহাম্মদ জোর গুরুত্ব আরোপ করেছেন, তাতে আরবদের প্রধান ধর্মীয় কেন্দ্র হিসাবে মক্কা গুরুত্বহীন হয়ে পড়বে এবং এর ফলে মক্কার বাণিজ্যের মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ৬১৭ খ্রিস্টাব্দে মক্কাবাসীরা তাই মুসলিমদের সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে বয়কট করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল।

কোরেশদের এই প্রতিরোধের সময়ও প্রফেট মোহাম্মদ চাচা আবু তালেবের সমর্থন ও প্রটেকশন পেতে থাকলেন। এই সময় একটি মক্কান ডেলিগেশন আবু তালিবের বাড়িতে প্রফেট মোহাম্মদের সাথে দেখা করে তাকে বোঝাবার চেষ্টা করে। এই ডেলিগেশনের নেতা ছিলেন কোরেশের মখজুম গোত্রের আমর ইবন হিশাম তার উপনাম ছিল আবু হুক্‌ম অর্থাৎ বিচারের পিতা। ইসলামের ইতিহাসে তিনি আবু জাহেল

www.pathagar.com

অর্থাৎ 'নির্বুদ্ধির পিতা' বলে খ্যাত, কারণ তিনি প্রফেট মোহাম্মদের তিক্ত প্রতিবাদী ছিলেন।

আবু জাহেল প্রফেট মোহাম্মদকে জিজ্ঞাসা করেন মক্কাবাসীরা কি করলে তিনি তার এই প্রচার কাজ বন্ধ করতে পারেন এবং জবাবে তিনি বলেন 'শুধু বলুন আল্লাহ ছাড়া দ্বিতীয় ঈশ্বর নেই'। এই সময় প্রফেট মোহাম্মদ আল্লাহর নবী বলে দাবি করেননি, কিন্তু অন্য বর্ণনা মতে, বলা হয়েছে যে, এর সাথে তিনি যোগ করেছিলেন– 'এবং মোহাম্মদ আল্লাহর বার্তাবাহক' আবু জাহেল এ শর্ত অস্বীকার করে ডেলিগেশনসহ চলে আসেন।

আবু জাহেল প্রফেট মোহাম্মদকে প্রতারক ভাবতেন এবং তার বাণীকে পাগলের প্রলাপ বলতেন। দশ বছর পর যখন তিনি বদরের যুদ্ধে মারা যান, তখন প্রফেট মোহাম্মদ উল্লাস প্রকাশ করেছেন তার ছিন্ন মস্তক দেখে (exulted over his severed head)। আবু জাহেল সম্বন্ধে কোরানে উল্লেখ আছে– সে বিতণ্ডা করেছে লোকদিগকে আল্লাহর পথ থেকে ভ্রষ্ট করার জন্য। ইহলোকে ও কিয়ামত দিবসে সে তার ফল লাভ করবে এবং তার স্থান হবে নরকে (২২ ঃ ৮ - ৯)।

মক্কাবাসীরা তখন আবু তালিবকে অনুরোধ করলেন তার ভাইপোর ওপর প্রভাব খাটিয়ে এই গোত্র-বিরোধ এবং মক্কার ধর্মীয় ঐতিহ্যকে ক্ষুণ্ন করার পন্থা থেকে বিরত থাকতে। বৃদ্ধ ও দুর্বল আবু তালিব তখন প্রফেট মোহাম্মদকে বোঝালেন এবং তাকে কোরেশ গোত্রে ও পরিবারে অশান্তি সৃষ্টি করা থেকে ও নতুন ধর্ম প্রচার থেকে সরে থাকতে আবেদন জানালেন। একটি নির্ভরযোগ্য ট্রাডিশন মতে, প্রফেট মোহাম্মদ জবাবে বলেছিলেন– আমার ডান হাতে সূর্য এবং বাম হাতে চন্দ্র এনে দিলেও আমি আমার সত্য পথ থেকে সরে আসব না, আর আমার প্রচেষ্টাও বন্ধ হবে না।

যদিও প্রাথমিক মুসলমানদের ওপর কোরেশদের নির্মম অত্যাচারের কথা সম্বন্ধে অনেক দলিল পাওয়া যায়, কিন্তু আসলে অত্যাচারের মাত্রা মৃদু ছিল (mild in character) (watt, 1953 p. 123) এবং এর মাত্রাকে অতিরঞ্জিত করা হয়েছে। যে বয়কট করা হয়েছিল তা কড়াভাবে পালিত হয়নি। দরিদ্র ও অরক্ষিত প্রাথমিক মুসলিমদের সময় সময় তাদের বিশ্বাসের জন্য হয়রানি করা হয়েছে, কিন্তু তা ছিল বিদ্রূপ ও উপহাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ, আর ছোটখাটো শারীরিক নির্যাতন, যেমন খোঁচা দেওয়া বা চড়-থাপড় মারা। কোরানে কোনো বড় ধরনের নির্যাতন বা অত্যাচারের কথা ক্বচিৎ উল্লেখ আছে।

৬১৯ খ্রিস্টাব্দে আবু তালিব কোরেশদের বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বয়কট প্রত্যাহার করাতে সমর্থ হন এবং অবস্থা আগের মতোই ফিরে আসে।

৫.১৮ আবু সুফিয়ান

ঐ সময়ে উমাইয়া গোত্রের নেতা ছিলেন ধনী, সম্পদশালী ও শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি আবু সুফিয়ান। তিনি কোরেশী এবং উমাইয়ার পৌত্র এবং প্রফেট মোহাম্মদের দূর সম্পর্কের আত্মীয়। আবু সুফিয়ান যোগ্য নেতা ছিলেন এবং মক্কা সিনেটের (মালা) অধ্যক্ষ। তাছাড়া কাবাঘরের চাবি ছিল তাঁর হাতে এবং কাবার পতাকারও রক্ষক ছিলেন। এই

www.pathagar.com

কারণে বলতে গেলে, কোরেশী রাষ্ট্র বাহিনীর প্রধান সেনাপতি ছিলেন তিনি।

মক্কার প্রধান মার্চেন্টের একজন হিসাবে আবু সুফিয়ানের শক্তি ও প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল। ৬০৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি একটি বণিক প্রতিনিধির নেতৃত্বে পারস্যের রাজধানী যান এবং সাসানিয়ান সম্রাট দ্বিতীয় খসরু পারভেজের সমীপে নীত হন। হিরার দরবারে ও তিনি কিছু সময় অতিবাহিত করেন এবং থালাবির মতে, তিনি হিরার খ্রিস্টান দরবার থেকে নমনীয় ধর্মীয় মতবাদ গ্রহণ করেন (heterodoxy doctrine) (1968, p. 92)।

বালাধুরির বর্ণনা মতে, প্রফেট মোহাম্মদ অর্থ লগ্নী করেন কিছু পণ্যদ্রব্যে যা আবু সুফিয়ান ক্যারাভান নিয়ে সিরিয়ায় বাণিজ্যে যান এবং এই বাণিজ্য থেকে প্রফেট কিছু লভ্যাংশ পেয়েছিলেন।

পরবর্তীতে কিছু ক্ষমতা সংগ্রহের পর, প্রফেট মোহাম্মদ আবু সুফিয়ানের সাথে দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়েন। এর পর থেকে আবু সুফিয়ান প্রফেটের বিরুদ্ধে মক্কাবাসীদের নিয়ে অভিযান শুরু করেন এবং ইসলামের ঘোর শত্রুরূপে পরিচিত হন (the arch enemy of Isam)। বদরের যুদ্ধে (৬২৪) আবু সুফিয়ানের জ্যেষ্ঠ পুত্র ও উত্তরাধিকারী হান্‌জালা মুসলিম বাহিনী কর্তৃক নিহত হয়। ঐ যুদ্ধে আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দার বাবাও মারা যায়। ওত্‌বা ইবন রাবিয়া তার ভাই ও চাচা, প্রত্যেকে আবু সুফিয়ানের সাথে যোগ দিয়ে প্রফেটের বিরুদ্ধে নেমে পড়ে। হিন্দা কখনও তার ঘৃণা ও বিদ্বেষ (প্রফেটের প্রতি) চেপে রাখতে পারেনি।

আবু সুফিয়ানকে বাগে আনতে না পেরে প্রফেট ৬২৮ খ্রিস্টাব্দে তাঁকে হত্যা করার জন্য এক এজেন্ট প্রেরণ করেন, কিন্তু সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। নিজের জ্ঞাতিবর্গের সাথে প্রফেটের ব্যক্তিগত শত্রুতা অন্তহীনভাবে চলেছিল যা কোরানে ব্যক্ত হয়েছে এবং সেখানে তাঁকে (আবু সুফিয়ান) বলা হয়েছে 'ঐ শয়তানটা' (৩ ঃ ১৬৯)।

আবু সুফিয়ানের ভগ্নী উম্মে জামিল, প্রফেটের অন্য এক বিরোধী ব্যক্তি আবু লাহাবের স্ত্রী ছিলেন। আবু সুফিয়ানের জামাতা উবাইদুল্লাহ আবিসিনিয়ায় গিয়ে খ্রিস্টান হয়ে যায়। অন্য এক জামাতা উরওয়া, ৬২৮ খ্রিস্টাব্দে মক্কায় ফিরে আলোচনার চেষ্টা করেন, তখন প্রফেটের সাথে ভালো ব্যবহার করেনি।

এমনকি ৬৩০ সালে ইসলাম গ্রহণের পরে আবু সুফিয়ান চাপের মুখে ও অনিচ্ছা সত্ত্বে প্রফেট ও ইসলামের প্রতি তার প্রতিবাদী মনোভাব বজায় রেখেছিলেন। যদিও হুনায়নের যুদ্ধে (৬৩০), তিনি মুসলিমদের পক্ষে ছিলেন, তিনি মুসলিমদের প্রাথমিক পরাজয়ে খুশি হন এবং তাঁর এক মক্কার সহযোগীর কাছে চুপে চুপে বলেন– 'এ যুদ্ধ থামবে না।' ইয়ারমুকের যুদ্ধেও (৬৩০), তিনি মুসলিম পক্ষে বাইজানটাইনদের বিরুদ্ধে থাকলেও তিনি যুদ্ধে শত্রু পক্ষের প্রতিটি সুবিধাজনক অবস্থায় আনন্দ প্রকাশ করেন।

যদিও তার কাজিন, ওসমান তৃতীয় খলিফা হন, তবুও তিনি তাঁর মতে, প্রফেটের গোত্র হাশিমের বিরুদ্ধাচরণ করেছেন। আবু সুফিয়ানের পুত্র মাবিয়া উমাইয়া বংশের প্রথম খলিফা হয়েছিলেন এবং তিনি ও তার উত্তরাধিকারীরা প্রফেটের হাশেমী দলের বিরুদ্ধে বিরুদ্ধাচরণ করে গেছেন।

www.pathagar.com

৫.১৯ আবু লাহাব

৬১৯ খ্রিস্টাব্দে ৪৯ বছর বয়সে প্রফেট মোহাম্মদ তার বিশ্বস্ত স্ত্রী খোদেজাকে হারান। অর্থাৎ খোদেজার মৃত্যু হয় ৬১৯ সালে। এর কয়েক সপ্তাহ পরে মারা যান তার চাচা আবু তালিব। মৃত্যুশয্যায় প্রফেট মোহাম্মদ তাঁর কাছে যান এবং ইসলাম গ্রহণ করতে অনুরোধ করেন, কিন্তু বৃদ্ধ ব্যক্তি তার নিজ ধর্মে অটল থেকে বলেন যে তিনি তার বাপ-দাদার ধর্ম পরিত্যাগ করতে পারেন না। তিনি আরও বলেন যে, প্রফেট মোহাম্মদের 'ভিশন' ভ্রান্তিপূর্ণ (delusion) এবং এই ধর্ম গোত্র দ্বন্দ্বের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। প্রফেট মোহাম্মদের প্রধান দুইজন রক্ষাকারীর মৃত্যুর সাথে তার শত্রুদের তরফ থেকে তার ব্যক্তিগত জীবনের ঝুঁকি ও বিপদ বেড়ে যায়।

আবু তালিবের মৃত্যুর পর হাশিম বংশের প্রধান হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন তার ছোট ভাই আবদুল উজ্জা-আবু লাহাব বলে বেশি পরিচিত। তিনি যদিও প্রফেট মোহাম্মদের ভিশনের দাবিকে অস্বীকার করতেন, তবুও তিনি প্রফেটকে সমর্থন ও রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দেন। কিছু পরে এক গুজব সম্বন্ধে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে প্রফেটকে জিজ্ঞাসা করেন যে, তাঁকে সব সময় সাহায্য করা ও রক্ষা করার পরও কি তাঁর দাদা আবদুল মোত্তালেব ও চাচা আবু তালেব, তাঁর নতুন ধর্ম বিশ্বাসে, তারা নরক বাস করছেন, কারণ তারা ইসলাম ধর্মের অনুসারী ছিলেন না? প্রফেট মোহাম্মদ স্বীকার করে জবাবে বলেন– সত্যই তারা নরকবাসী হয়েছেন। শুধু তাই নয়, মক্কাবাসীদের সব পূর্বপুরুষেরা নরক যন্ত্রণা ভোগ করছেন কারণ তারা বিধর্মী ও মূর্তিপূজারী ছিলেন।

প্রফেটের অকৃতজ্ঞতা ও পরিবারের প্রতি বিরূপ ভাব লক্ষ্য করে আবু লাহেব রাগে অগ্নিশর্মা হলেন এবং নতুন ধর্মের বর্বর শিক্ষা সম্বন্ধে মুহ্যমান হন। যে ধর্মের প্রবর্তক কে যে মহান দুই পুরুষ—আবদুল মোত্তালেব ও আবু তালিব— স্নেহ ও প্রাণ দিয়ে পালন ও রক্ষা করলেন সেই প্রবর্তকের ধর্ম-শিক্ষা তাদের ঠাঁই দিল নরকে? আবদুল উজ্জা প্রফেটের মিশনকে প্রকাশ্যভাবে নিন্দা করে তার ওপর থেকে সমর্থন ও তাঁকে রক্ষার শপথ প্রত্যাহার করেন। স্থান পরিত্যাগ করার পূর্বে বললেন– তুই উৎছন্নে যা, আজ থেকে আমি তোর ঘোর শত্রু হলাম। প্রফেট মোহাম্মদও বলে বসলেন, তুমি ধ্বংস হও এবং অনির্বাণ অগ্নিশিখায় জ্বলতে থাকো। এই ঘটনার পর থেকে আবদুল উজ্জার নাম হয়ে গেল আবু লাহাব, অগ্নিশিখার পিতা। প্রফেট মোহাম্মদ তখনই 'ওহি' পেলেন আবু লাহাব ও তার স্ত্রী উম্মে জামিলের (আবু সুফিয়ানের ভগিনী) জন্য যে, তাদের নরকবাস হবে (১১১ ঃ ৩)। আবু ৬২৪ খ্রিস্টাব্দে, এক সপ্তাহ পরে, বদরের যুদ্ধে প্রাণ হারান। অনেকে দিন ধরে তার দেহ সমাহিত হয়নি।

প্রফেট মোহাম্মদের দুই কন্যা রোকেয়া ও উম্মে কুলসুমের বিবাহ হয়েছিল ওত্‌বা ও ওতাইবার সাথে। এরা উভয়েই আবু লাহাবের পুত্র। ওতবা পরে রোকেয়াকে তালাক দিয়ে খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করে (J. Barth, in SEI, 1974, p. 11)। প্রফেট রোকেয়াকে ওসমান ইবন আফফানের সাথে বিবাহ দেন; যখন ৬২৪ সালে ওতাইবা উম্মে কুলসুমকে তালাক দিলে তার বিবাহও ওসমানের সাথে হয়।

www.pathagar.com

৫.২০ আবিসিনিয়ায় নির্বাসন

প্রফেট মোহাম্মদের সময় আবিসিনিয়া ও হেজাজের সাথে গাঢ় বাণিজ্যিক সম্পর্কে ছিল। আবিসিনিয়ার মার্চেন্টগণ ও কারিগরগণ মক্কাতে জমিয়ে ব্যবসা করত এবং বসবাসও করত। ধনী মক্কার বণিকরা বেকার আবিসিনিয়ানদের ভাড়া খাটাত তাদের সৈন্যদলে, বাসায় ও ওয়ার হাউসে নিরাপত্তা প্রহরী হিসাবে।

প্রফেট মোহাম্মদ তাঁর ব্যবসায়ী অভিজ্ঞতা থেকে উপলব্ধি করেছিলেন যে আবিসিনিয়া কোরেশদের জন্য বেশ লাভবান বাজার, তিনি এও জানতেন যে মক্কার সাথে বাণিজ্য প্রতিযোগিতায় আবিসিনিয়া গুরুত্বপূর্ণ স্থান। যেহেতু ইসলাম ও খ্রিস্টানিটির মধ্যে ধর্মনীতি প্রায় একই, তাই সেদেশের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে বিশেষ অসুবিধা হবে না। এই ধর্মীয় যোগসূত্র বন্ধুত্বের বন্ধনকে ত্বরান্বিত করবে, কারণ নেগাস মূর্তিপূজারী কোরেশদের চেয়ে একেশ্বরবাদী ইসলাম ধর্মের অনুসারীদের অগ্রাধিকার দিবে।

এই সময়ে যখন মুসলমানদের বিরুদ্ধে কোরেশদের শত্রুতা তুঙ্গে উঠেছে, সেই সময়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে, যদিও ঘটনাগুলোর সত্যতা সম্বন্ধে বর্ণিত ইতিহাস ও কাহিনীর অনেক স্থলে গোঁজামিল আছে।

সামাজিক বয়কটের সময়, কিছুসংখ্যক মুসলিম, বিশেষ করে যারা দরিদ্র ও গোত্র সমর্থনহীন ছিল, ভুল স্বীকার করে ইসলাম পরিত্যাগ করে। এই ভাবে দলত্যাগী মুসলিমদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবার পূর্বে প্রফেট মোহাম্মদ সিদ্ধান্ত নেন তাঁর অনুসারীদের মধ্য থেকে কিছু সংখ্যক মুসলিমকে আবিসিনিয়ায় পাঠাবেন। তাই তিনি তাদের বোঝান যে, আবিসিনিয়া খ্রিস্টান রাজা দয়ালু, ন্যায়বিচারক এবং সেখানকার মানুষও বন্ধুভাবাপন্ন, সুতরাং সেখানে মুসলিমদের কোনো অসুবিধা হবে না। পরে মক্কার অবস্থা স্বাভাবিক হলে তারা ফিরে আসতে পারে।

এই অধিবাসীদের (ইমিগ্রান্ট) মধ্যে শুধু দরিদ্র ও নিরাপত্তাহীন মুসলিম ছিল না, কিছু প্রভাবশালী মক্কান পরিবারের সদস্যও ছিল। এই দলের মধ্যে কিছু সংখ্যক স্বাধীনচেতা মানুষ ও সাহাবী ছিলেন, যাঁরা বিদ্যমান পরিস্থিতিতে গোলযোগ সৃষ্টি করতে পারেন। এই কারণে প্রফেট সেই সব প্রভাবশালী ব্যক্তিদেরও আবিসিনিয়ায় পাঠিয়ে দিয়ে নিজে মক্কায় থেকে তাঁর কর্তৃত্ব বজায় রাখার চেষ্টা করবেন। এই সব প্রভাবশালী ব্যক্তিদের কেমন করে আবিসিনিয়ায় যেতে রাজি করানো হয়েছিল সে ঘটনা পরিষ্কার নয়। তবে প্রফেট মোহাম্মদ তাদের বুঝিয়েছিলেন এই বলে যে, দলে কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তির প্রয়োজন নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য এবং মক্কার সংকট না শেষ হওয়া পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করার জন্য এবং কোনো সমস্যা হলে তার সমাধানের উপায় বের করার জন্য।

এই ব্যবস্থা অনুযায়ী ৬১৫ খ্রিস্টাব্দে এবং পরের কয়েক মাস ধরে ছোট ছোট দলে মুসলিমরা আবিসিনিয়ায় মক্কার প্রাচীন বন্দর শোরাইবাতে যাত্রা করে সেখান থেকে আলাদাভাবে আবিসিনিয়ার ছোট জাহাজ করে সে দেশে গমন করার জন্য। শোয়াইবা বন্দর জেদ্দা থেকে বেশি দূরে ছিল না।

প্রাথমিক মুসলিম লেখকগণ– ইবন ইসহাক ও ইবন হিশামসহ এই যাত্রাকে

www.pathagar.com

ইসলামের প্রথম হেজিরা (এমিগ্রেশন) বলে উল্লেখ করেছেন, এর সাত বছর পর ৬২২ সালে মক্কা থেকে মদিনাতে মহান হিজরত হয়েছিল যখন প্রফেট নিজেই সেখানে শামিল ছিলেন।

এ প্রথম হেজিরাতে সর্বমোট ৮৩ পুরুষ ছিল, এদের অনেকের সাথে তাদের স্ত্রী-পুত্রগণ শামিল ছিল, এতে সর্বমোট সংখ্যা দাঁড়ায় ১৫০। আবিসিনিয়াতে তাদের স্বাগতম জানানো হয় এবং তারা আকসুমে অর্থাৎ রাজধানীতে বসতি স্থাপন করেন। বর্ণনাকারীরা এই দলে যেসব মুসলিম ছিলেন তাদের একটি লিস্টও তৈরি করেছেন, এদের মধ্যে প্রধান প্রধান ব্যক্তি ছিলেন :

এই দলের নেতা ছিলেন আবু তালিবের পুত্র জাফর, আলীর বড় ভাই এবং প্রফেটের কাজিন। ইনি পরে মদিনাতে প্রফেটের সাথে মিলিত হন এবং মুতার যুদ্ধে প্রাণ হারান (৬২৯)। জাফরের সাথে ছিল তার স্ত্রী আসমা বিন্‌ত উম্মাইস। জাফরের মৃত্যুর পর আসমা আবুবকরকে বিবাহ করেন এবং তার মৃত্যুর পর বিবাহ করেন আলীকে অর্থাৎ জাফরের ছোট ভাইকে।

জুবাইর ইবন আওয়ান খাদিজার ভাইপো ও প্রফেটের কাজিন ছিলেন। তিনিও আবিসিনিয়া থেকে ফিরে এসে প্রফেটের সাথে যোগ দেন মদিনাতে। পরে উটের যুদ্ধে (৬৫৬) মারা যান।

ওসমান ইবন আফ্‌ফান উমাইয়া গোত্রের সদস্য। তিনি আবিসিনিয়ায় যান স্ত্রী প্রফেটের কন্যা রোকেয়াকে সাথে নিয়ে। পরে মদিনায় ৬৪৪ সালে ওমরের মৃত্যুর পর খলিফা হন।

প্রফেট মোহাম্মদের দশ বছরের সিনিয়র আবু সালামা স্ত্রীসহ আবিসিনিয়ায় যান। তিনি বদরের যুদ্ধে অংশ নেন এবং ৬২৫ সালে ওহোদের যুদ্ধে আহত হয়ে পরে মারা যান। তাঁর বিধবা স্ত্রী উম্মে সালামাকে প্রফেট মোহাম্মদ বিবাহ করেন। আবদুর রহমানের পুত্র আবু সালামা আর এই সালামা কিন্তু ভিন্ন ব্যক্তি।

খালিদ ইবন সাঈদ প্রথম দিকেই মুসলিম হন এবং পিতা কর্তৃক বিতাড়িত হয়ে প্রফেটের বাড়িতে বসবাস করেন। আবিসিনিয়ায় থাকাকালে তিনি লোহার পাতের রিংয়ে রুপার দ্বারা খোদিত 'আল্লাই সত্য' লিখে ধারণ করতেন। ফিরে এসে প্রফেট এই রিং-এর বদলে তার নিজের সোনার রিং তাকে উপহার দেন। এই রিং প্রফেটের স্মারক চিহ্নরূপে তার বংশধরেরা ব্যবহার করেছেন এবং পরে খলিফা ওসমানের কাছ থেকে এই রিং হারিয়ে যায়।

ওসমান ইবন মাজুন জুমার কোরেশ গোত্রের লোক। তিনি তাঁর দুই পুত্রকে সাথে করে আবিসিনিয়ায় গমন করেন। তিনি সুফি সাধক ছিলেন, পরে প্রফেটের স্ত্রী আয়েশার সতীত্ব সম্বন্ধে অভিযোগ তোলেন। আবু বকর বা উমর উভয়েই তাঁর গোঁড়ামি পছন্দ করতেন না। তিনি স্বাধীন মতবাদের মানুষ ছিলেন এবং তার দলের মানুষরা তার মতোই গোঁড়া মতবাদী ছিলেন।

হাত্তাব তার স্ত্রী ফুকাইহাসহ আবিসিনিয়ায় গমন করেন। ফুকাইহার বাবা ইয়াসরা খ্রিস্টান ছিলেন। কোরেশীরা দাবি করত যে প্রফেট মোহাম্মদ ধর্মীয় নির্দেশ ইয়াসরার কাছে থেকেই পেতেন।

www.pathagar.com

মুসাব ইবন ওমাইয়া গোঁড়া মুসলিম ছিলেন। তিনি তাঁর প্যাগন মাতাকে মুসলিম করার চেষ্টা করেন, কিন্তু মহিলা জবাবে বলেন— 'আমি তোমার ধর্মমত মূর্খের মতো গ্রহণ করব না। তুমি চলে যাও, আমি তোমার মতো পুত্র চাই না এবং আমি আমার ধর্ম বিশ্বাস নিয়েই থাকব। মুসাব তাঁর স্ত্রী হামনা বিন্ত জাহাশকে নিয়ে আবিসিনিয়ায় যান। হামনা ওবাইদুল্লাহ ইবন জাহাশের ভগিনী, মায়ের দিকে হামনা খ্রিস্টান আসাদ গোত্রভুক্ত। ৬২০ সালে মুসাব মক্কায় ফিরলে প্রফেট তাকে মদিনায় ইসলাম প্রচারে প্রেরণ করেন। বদরের যুদ্ধে মুসা অংশগ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু ওহোদের যুদ্ধে মারা যান।

জুহরা গোত্রের আবদুর রহমান ইবনে আউফ প্রফেট মোহাম্মদের দশ বছরে ছোট। প্রাথমিক মুসলিম রূপে আবিসিনিয়ায় যান এবং ফিরে এসে মদিনায় প্রফেটের সাথে মিলিত হন। তিনি ধনাঢ্য মার্চেন্ট হন এবং বেশ কয়েকটি যুদ্ধে অংশ নেন। ৬২৭ সালে তিনি কাল্‌ব গোত্রের খ্রিস্টান প্রধানের কন্যা তোমাদিরকে বিবাহ করেন। বিখ্যাত জুরিস্ট কনসাল্ট আবু সালামার এরাই পিতা-মাতা।

সাকরান ইবন আমরের মাতা ওমাইমা আবদুল মোত্তালেবের কন্যা, তাই ইনি প্রফেটের কাজিন। তিনি স্ত্রী উম্মে হাবীবাসহ আবিসিনিয়া যান। উম্মে হাবীবা আবু সুফিয়ানের কন্যা। আবিসিনিয়ায় গিয়ে তিনি গোঁড়া খ্রিস্টান হয়ে যান। ইবন ইসহাক বর্ণনা করেছেন যে তিনি প্রফেটের সাহাবীদের বলতেন- 'আমরা স্পষ্ট দেখতে পাই, কিন্তু তোমাদের চোখ অর্ধভাবে উন্মুক্ত।' তিনি ৬২৮ সালে আবিসিনিয়ায় মারা যান খ্রিস্টানরূপে। প্রফেট মোহাম্মদ তার বিধবা পত্নীকে ফিরে আসার পূর্বেই প্রক্সি দিয়ে বিবাহ করেন। তিনি ওবাইদুল্লাহর ভগিনী জয়নাব বিন্ত জাহাশকেও বিবাহ করেন।

মক্কাবাসী, যাদের আবিসিনিয়াদের সাথে বাণিজ্য সম্পর্ক ছিল, তারা শঙ্কিত হয় এই ভেবে যে, প্রফেট মোহাম্মদের পার্টি সেখানে তাদের ব্যবসার ক্ষতি করতে পারে। এই জন্য তারা দুই সদস্য বিশিষ্ট একটি বাণিজ্য ডেলিগেশন নেগাস আসহামাকে অনুরোধ করেন সেখানকার মুসলিম আশ্রয় প্রার্থীদের ফেরত পাঠানোর জন্য। মক্কান ডেলিগেশনের নেতৃত্বে ছিলেন আমর ইবন আল-আস, পরে যিনি মিশর জয় করেন।

নেগাস মক্কান ডেলিগেশনের অনুরোধ নাকচ করে বলেন যে, আশ্রয় প্রার্থীদেরও কথা শুনতে চান। এই বলে তিনি মুসলিমদের ডেকে পাঠান এবং তাদের বক্তব্য রাখতে বলেন। তাঁদের মুখপাত্র জাফর তাঁদের বক্তব্য তুলে ধরেন। যেখানে বিশপ ও পুরোহিতগণ যারা উপস্থিত ছিলেন তাদের দেখিয়ে জাফর বলেন যে, এরা একদা মূর্তি পূজারী ছিলেন এবং প্রফেট মোহাম্মদ তাদের সত্য পথের সন্ধান দেন। তখন জাফরকে প্রফেট মোহাম্মদের পাওয়া 'ওহি' পড়ে শোনাতে বলেন নেগাস। তখন জাফর সূরা ১৯ (মরিয়ম) পড়ে শোনান। এই সূরাতে ব্যাপ্টিস্ট জনের জন্মকথা ও জেসাসের অলৌকিক জন্মেরও ইতিহাস আছে।

কেবলমাত্র প্রথম ৩৫টি আয়াত পড়ার পর ৩৬নং আয়াতের শুরুতেই বলা হয়েছে 'ঈশ্বরের কোনো পুত্র থাকা উচিত নয়' আর এতেই প্রকাশ পায় যে যিশুর পুত্রত্ব প্রফেট মোহাম্মদ অস্বীকার করেছেন। এই বক্তব্যে নেগাস বিরক্ত হয়ে ওঠেন। কোনো কোনো অথরিটি বিশ্বাস করেন যে তখন সূরা ১৯-এর আয়াত সংখ্যা ছিল ৩৫টি এবং জাফর

www.pathagar.com

এখানেই পাঠ শেষ করেন। সূরার বাকি আয়াতগুলো ভিন্ন স্টাইল, তাল ও ছন্দ আছে এবং পঠনের ভাষণ বিতর্কমূলক (Polemical)। এর পরের আয়াতগুলো নিশ্চয় পরে যোগ করা হয়েছে যখন আরবের খ্রিস্টানদের সাথে প্রফেট মোহাম্মদের বিরোধিতা শুরু হয় ধর্মতত্ত্ব নিয়ে।

ঘটনা যাই হোক, আসহামা সন্তুষ্ট হয়েছিলেন সম্ভবত এই ধারণায় যে মুসলিম খ্রিস্টানের অংশ বিশেষ (Sect) বা গোষ্ঠীভুক্ত (Glubb. 1979, p. 122), তাই তিনি সরাসরি মক্কান ডেলিগেশনের অনুরোধ নাকচ করে মুসলিমদের আবিসিনিয়ায় থাকতে দেন। এই সংবাদ যখন প্রফেট শুনলেন তখন তিনি চিন্তামুক্ত হন।

এই ঘটনার কয়েক মাস পর প্রফেট সংবাদ পেলেন যে নেগাসের মৃত্যু হয়েছে। তিনি তখন তাঁর অনুসারীদের ডেকে তাঁদের মর্যাদা অনুযায়ী তাঁর পেছনে দাঁড় করিয়ে চার বার 'আল্লাহ্ আকবর' তকবির দিয়ে আসহামার জন্য প্রার্থনা করলেন, যখন তাঁর অনুসারীরা তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি উত্তরে বলেন যে, নেগাসের সহানুভূতি ও সদয় ব্যবহারকে স্মরণ করলেন। অন্য একটি বর্ণনায় বলা হয়েছে, কতকগুলো দর্শক চিৎকার করে বলেছে যে, তিনি একজন মৃত খ্রিস্টান ব্যক্তি, যাকে তিনি কখনো দেখেন নাই, তার জন্য প্রার্থনা করেছেন। প্রফেটের স্ত্রী আয়েশার এক ট্রাডিশনে জানা গেছে যে নেগাসের সমাধির ওপর সবসময় একটা আলো দেখা যায়।

উদ্বাস্তুরা আবিসিনিয়াতে নিরাপত্তা, শান্তি ও ভালোভাবেই বিভিন্নরূপে ১৩ বছর এবং কয়েক মাসের মতে বসবাস করেছে। কয়েকজন নির্বাসনে মারাও গেছে। কিছু সেখানে থেকে খ্রিস্টানও হয়ে গেছে এবং স্থায়ীভাবে রয়েও গেছে। এক বছরের মধ্যে প্রায় তিরিশটি পরিবার মক্কাতে ফিরে এসেছে, যখন তারা জেনেছিল যে কোরেশগণ এখন মুসলিমদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়েছে, যখন প্রফেট মোহাম্মদ তাদের কিছু সুবিধা (Concession) প্রদান করেছেন। চৌদ্দটি মানুষের একটি দল জাফর ও ওসমান ইবন আফ্ফান পরিবারবর্গসহ মহান হিজরতের পূর্বেই (৬২২) ফিরে এসেছেন। মদিনাতে প্রফেট মোহাম্মদের প্রতিষ্ঠা পাওয়ার পর বত্রিশ জন ব্যক্তি তাদের পরিবারসহ ৬২৮ সালে মদিনায় চলে আসেন। তখন আবিসিনিয়ায় যে নেগাস রাজত্ব করছিলেন তিনি সেই দলকে দুটো জাহাজ দেন লোহিত সাগর পার হওয়ার জন্য।

৫.২১ স্যাটানিক ভার্স

প্যাগন মক্কানদের কিছু সুবিধা দেওয়ার জন্য প্রফেট মোহাম্মদের ওপর উত্তরোত্তর চাপ বৃদ্ধি পাচ্ছিল এবং আল-তাবারীর ভাষ্য মতে, তিনি নিজেও ইচ্ছুক ছিলেন মক্কানদের কিছু সুবিধা দিতে যাতে তারা তার ধর্মমত গ্রহণ করে। এই সদিচ্ছা নিয়ে ৬১৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি বহু-ঈশ্বরবাদীদের সাথে তাদের দেবী লাত, উজ্জা ও মানাত সম্বন্ধে একটা সমঝোতায় আসার চেষ্টা করলেন। এই তিনটি দেবী মক্কা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় খুবই জনপ্রিয় বিধায়, দেবীদের পক্ষে একটা সম্মানজনক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

তিনি কাবাঘরে গিয়ে মক্কার মুরব্বিদের সামনে কোরানের আয়াত পাঠ করলেন (৫৩ ঃ ১৯-২০) এই তিন দেবীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তারপর তিনি এই শব্দগুলো যোগ করলেন— These are the exalted damsels (gharanik-variously

www.pathagar.com

translated as 'females', `birds', 'swans' 'herons', 'crane') mounting upwords to heaven whose intercessions may be sought" অর্থাৎ এই তিন মহীয়সী রমণী (ঘারানিক- বিভিন্নভাবে যার অর্থ করা হয়েছে 'নারী', 'পক্ষী', 'রাজহংস', 'বক' ও সারস বলে) যারা স্বর্গ পানে ধাবিত হয় তাদের মধ্যস্থতা (intercession) আকাঙ্ক্ষা করা যেতে পারে।

মূর্তিপূজকরা মহাখুশি প্রফেটের এই ঐশীবাণী শ্রবণ করে যা তাদের দেবীদের স্বর্গীয় মর্যাদা দান করে পূজার যোগ্য করা হলো এবং যদিও প্রফেটের একেশ্বরবাদের প্রতি দ্বিধা-দ্বন্দ্ব থেকে গেল, তবুও সাধারণভবে তারা টেনশনমুক্ত হলো। এই সমঝোতা আবিসিনিয়ায় নির্বাসিতদের কানে পৌঁছতেই তাদের মধ্যে কয়েকজন মক্কায় ফিরে এলো।

কিন্তু কিছু পরেই (কেউ বলেছেন ঐদিন সন্ধ্যা বেলাতেই, কেউ বলেছেন কয়েক সপ্তাহ, আবার কেউ বলেছেন কয়েক মাস) প্রফেট বুঝতে পারেন যে 'সমঝোতা' অকার্যকর হবে। পরে তিনি যা বলেছিলেন সেই সিদ্ধান্ত থেকে সরে গেলেন এবং সকলকে বুঝিয়ে বললেন যে, অতিরিক্ত আয়াত পাঠ করা হয়েছিল তা শয়তান কর্তৃক তার ভাববাদী অবস্থায় তার মুখ দিয়ে বলিয়েছে, এটা তাঁর নিজের ভাষ্য ছিল না। সেই মতে ঐ 'স্যাটানিক ভার্স' শয়তানি আয়াত অন্য আয়াত দ্বারা উপস্থাপিত করা হয়েছে। উপস্থাপিত আয়াত এখন এইভাবে পঠিত : "What, Shall men have male progeny, and God female? This is a most unfair distinction" (53 : 21-2)—অর্থাৎ, তবে কি তোমাদের জন্য পুত্র সন্তান এবং আল্লাহর জন্য কন্যা সন্তান? এই প্রকার বণ্টন তো অসংগত। এই পরিবর্তনের পর এই অর্থ হলো যে, যদি এই তিন দেবী পুরুষ হতেন নারীর পরিবর্তে তাহলে তাদের জন্য হয়তো আপত্তি থাকত না বা কমে যেত। এই অর্থকে আরো মজবুত করা হলো আর একটা আয়াত দ্বারা "God brings to nought that which satan suggested (22 : 51) অর্থাৎ শয়তান যা প্রস্তাব করে, আল্লাহ তা নাকচ করেছেন। প্রফেট তার শিক্ষার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে জোর দিয়ে বলেন- সেগুলো অভিশপ্ত শয়তানের ডকট্রিন হতে পারে না। (৮১ : ২৫)।

এই 'শয়তানী আয়াত'-এর কাহিনী নিয়ে অনন্ত ও তিক্ত তর্কাতর্কি হয়েছে। ঐতিহাসিকগণ ও তফসিরকারগণ- যেমন আল-ওয়াকিদী, ইবন হিশাম, ইবন সাদ, আল-তাবারী, আল-জামাখশারী, আল বায়দাবী এবং জালালুদ্দিন এদের মধ্যে অন্যতম, যারা উল্লেখ করেছেন তাদের এ বিষয়ে সুচিন্তিত মতামত। পরবর্তী আলেমরা মনে করেন তার কাছে 'সত্য' আগমনের পর, প্রফেট ভুল করেছেন বলে মনে করলে তাকে ধর্ম-বিরোধী (heretical) বলা যেতে পারে এবং এই ঘটনা, পরবর্তীতে যারা প্রফেটের চরিত রচনা করেছেন তারা কৃচিৎ উল্লেখ করে থাকেন এবং বর্তমানে অনেক মুসলিম এ ঘটনাকে অস্বীকার করে।

৫.২২ তায়েফ গমন

মক্কাতে শত্রুতা বৃদ্ধির তীব্রতা দেখে, প্রফেট মোহাম্মদ, একটি নির্ভরযোগ্য নিরাপদ স্থানের খোঁজে এ-গোত্র থেকে সে-গোত্রে আবেদন জানান এবং জনশ্রুতি যে, তাঁর সে

www.pathagar.com

আবেদনে কোনো গোত্র-প্রধানই সাড়া দেয়নি। কারণ কোনো গোত্র প্রভাবশালী কোরেশীদের অসন্তুষ্টির কারণ হতে চায়নি। ৬১৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি পরিশেষে তাঁর পালিত পুত্র জায়েদকে নিয়ে তায়েফ গমনে সিদ্ধান্ত নিলেন।

মক্কার দক্ষিণ-পূর্বে প্রায় ৪০ মাইল দূরে এই সবুজ পার্বত্য-শহর তায়েফ অবস্থিত। এই শহর আঙুর ও ফলমূলের শহর বলে খ্যাত ও ব্যস্ত বাণিজ্য কেন্দ্র। এখানে তাকিফ গোত্রের বাস। মক্কার অসহ্য উষ্ণতা ও ধূলিবালি এড়ানোর জন্য গ্রীষ্মকালে বেশ কয়েকটি ধনাঢ্য মক্কার বণিক এখানে এসে আড্ডা গাড়ে। এই শহরটি একটি ছোট কেন্দ্রও বটে মদ্য ব্যবসার জন্য, ইহুদিরা তৈরি করে বিক্রিও করে।

প্রফেট মোহাম্মদ তায়েফে এসে দশ দিন ছিলেন এবং কয়েকজন নেতা গোত্রের লোকের সাথে দেখা করেন। তিনি তাঁদের সাহায্য প্রার্থনা করেন এবং তাদের ধর্মীয় আদর্শের ওপর থেকে মক্কানদের নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহার করানোর জন্য প্রস্তাব করেন। তিনি তাঁর মিশন সম্বন্ধে তাঁদের অবহিত করেন এবং তাঁদের শুধু ঈশ্বরের পূজা করতে আহ্বান জানান। তাঁর কথাবার্তা শুনে তায়েফ নেতাদের আমোদ ও বিরক্তি উভয়ই উদ্রিক্ত হয়। বণিকদের মধ্যে কয়েকজন জানালেন যে এ বিষয়ে তাদের কিছু করার নেই। কিন্তু তবুও প্রফেট তাদের কাছে বারবার একই প্রস্তাব উপস্থাপিত করায় তারা শেষমেশ বিরক্ত হয়ে তাদের শহর থেকে বের করে দেওয়ার জন্য কিছু লোক ভাড়া করে।

আশাহত হয়ে প্রফেট ও জায়েদ শহরের দু'মাইল বাইরে একটি খ্যাতনামা দ্রাক্ষাকুঞ্জে আশ্রয় নেন। এখানে আদ্দাস নামে এক খ্রিস্টান দাস, এক থালা আঙুর ও কিছু নাস্তা এনে তাদের সেবা করে, এতে প্রফেট মোহাম্মদ সন্তুষ্ট হয়ে তাকে দোয়া করেন।

এরপর নোফাল গোত্রের মোতিম ইবন আদি নিরাপত্তার আশ্বাস দিলে প্রফেট ও জায়েদ মক্কায় ফিরে এলেন, কিন্তু তাঁর অবস্থার পরিবর্তন বা সহজ হলো না।

পরবর্তী কয়েক মাসের মধ্যে তিনি বিভিন্ন মেলাতে যাযাবরদের মাঝে তাঁর বাণী প্রচার শুরু করলেন— গোত্রদের মধ্যে ছিল কিন্দা, কাল্‌ব, হানিফা এবং আমির। প্রথম তিনটি গোত্র, পুরোপুরি কিংবা আংশিক খ্রিস্টান ছিল তাই তারা তার বাণী প্রচারে সাড়া দেয়নি। আমির গোত্রও প্রথমে কোনো সাড়া না দিলেও পরে প্রফেটের দলে যোগ দেয়।

৫.২৩ নৈশভ্রমণ (মিরাজ)

অনেক ধর্মে কাহিনী বা কিংবদন্তি আছে যে প্রফেট কিংবা সাধুব্যক্তি স্বর্গ এবং নরক দর্শন করে এসেছেন— কেউ একা গেছেন কেউবা গেছেন দেবদূতের সঙ্গে। এই যাত্রায় কেউবা যানবাহন ব্যবহার করেছেন, কেউবা সিঁড়ি দিয়ে উঠে স্বর্গ বা নরকে পৌঁছে গেছেন। এই কেচ্ছা কাহিনীর মধ্যে সিঁড়ি বেয়ে স্বর্গে যাওয়ার কথা আছে জ্যাকবের (আদিপুস্তক ২৮ ঃ ১২) 'ইথিওপিক বুক অব জুবিলিজ'-এ এই যাত্রাকে বলা হয়েছে 'মা-আরেগ' (maareg) এলিজা স্বর্গে গেছেন অগ্নি-রথে চড়ে (২ কিং ২ ঃ ১১); এনোক বিভিন্ন স্বর্গে ও নরকে এমনি উঠে গেছেন যার বর্ণনা আছে ইথিওপিক ও স্লাভানিক 'বুকস অব এনক'-এ (প্রায় খ্রিঃ পূঃ ৫৯); যিশুখ্রিস্ট স্বর্গে উঠে গেছেন (লুক

www.pathagar.com

২৪ ঃ ৫১); সেন্টপল যানবাহনে গেছেন তৃতীয় স্বর্গ পর্যন্ত (২ করিন্থ ১২ ঃ ২); এবং এই যে ঊর্ধ্ব-রাজ্যে আরোহণ এতে সাহায্য করেছে দেবদূতেরা যেমন বর্ণনা আছে 'এসেনসেন অব ইশাইয়া' কেতাবে (প্রায় ৮০ খ্রিস্টাব্দ)।

কয়েকজন মহাত্ম ব্যক্তির স্বর্গে ও নরকে গমন এবং পরিদর্শনের কথা আছে প্রাচীন 'নসটিক রাইটিংস-এ' (Gnostic writings)। বলা হয় এগুলো পহ্লভি কিতাব– প্রফেট মোহাম্মদ-এর চার শতাব্দি পূর্বে। এখানে পুরোহিত আরতা বিরাফের (Arta viraf) স্বর্গে গমনের কাহিনীতে যে যাত্রার কথা আছে সে-যাত্রা গাইড করেছিলেন মহাদেব দূত (আরচেঞ্জেল); সারোশ দেবতা অরজমন্ডের সম্মুখে পৌঁছে তার দর্শন লাভের পর তিনি অন্যান্য অঞ্চল পরিদর্শন করেন। অরজ্‌মন্ড ইরানের শুভ দেবতা।

প্রফেট মোহাম্মদ ও অন্যান্য ধর্মভীরু কোরেশ ব্যক্তিরা নিশ্চয়ই এই সব ঊর্ধ্বগমনের কাহিনীর সাথে ভালোভাবেই পরিচিত ছিলেন। কোরানে বর্ণিত প্রফেটের বিরোধীরা বলেছিল যে তারা প্রফেটের মিশনে কখনোও বিশ্বাস করবে না যতক্ষণ না তিনি 'সিঁড়ি বেয়ে স্বর্গে উঠে যাবেন' (১৭ ঃ ৯৫)

একবার আবু তালিবের কন্যা উম্মে হানির বাড়িতে রাত কাটানোর সময় (৬২১ খ্রিঃ) প্রফেট মোহাম্মদ দাবি করেন যে তিনি ঊর্ধ্বগমনের অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন। বলা হয় যে, তিনি যেহেতু মক্কাবাসীরা এই অলৌকিক ঘটনা ঘটানোর দাবি করেছিল, তাই তাদের বিশ্বাস জাগানোর জন্য তিনি এই ঘোষণা দেন।

কোরানের একটি আয়াতে আছে যে প্রফেট মোহাম্মদকে রাত্রিকালে মক্কার পবিত্র মন্দির থেকে দূরবর্তী মন্দিরে নিয়ে যাওয়া হয় (১৭ ঃ ১)। 'দূরবর্তী' (আল-আকসা) মন্দিরের নাম নেয়া হয়নি, কিন্তু জেরুজালেম বলে কথিত এবং পরবর্তীতে মোরিয়া পর্বতের কথিত স্থানে একটি মন্দির নির্মাণ করা হয়। (কোরানে কোথাও জেরুজালেমের নাম কখনো উচ্চারিত হয়নি)।

এই কাহিনীকে (রাত্রিভ্রমণ)–ইসরা-ঘিরে বহু কেচ্ছা গল্পের জাল বোনা হয়েছে, যা কোরানের কোনো স্থানেই উল্লিখিত হয়নি। গৃহীত ভার্সান মতে কাহিনী হচ্ছে : মক্কাতে এক রাতে, হিজরতের কয়েক মাস পূর্বে, প্রফেট যখন ভাত-ঘুম অবস্থায়, তখন জিব্রাইল তাঁর নিকট হাজির হয়, বোরাক নামে এক দেখনধারী ঘোড়া নিয়ে। ঘোড়াটির মুখ নারীর মতো, লেজে ময়ূরপুচ্ছ এবং সফেদ রঙ এবং এক ধাক্কায় একজনকে নিয়ে যায় দৃষ্টির বাইরে– বলেছেন ইবন ইসহাক।

প্রফেট ঘোড়ায় চড়লেন এবং জেরুজালেমে মোরিয়া পর্বতে চলে গেলেন। এখানে এসে তিনি সোনার মই-এর শেষ পা-দানি ধরে ফেলে মই-এ চড়লেন, যা স্বর্গ থেকে ঝুলছিল। তারপর জিব্রাইল এক এক করে সপ্ত-স্বর্গে উঠে গেলেন। স্বর্গদ্বারে পৌঁছে আদম, এনক, জোসেফ, মোসেস, আরন, আব্রাহাম ও যিশুর সাথে এক এক করে দেখা করলেন। শেষে তিনি শেষ পর্দার দুই-ধনুক সমান দূরে গিয়ে দাঁড়ালেন। একটু সম্মুখে হাজার পর্দার পেছনে ঈশ্বর অপেক্ষায়। সেখানে তিনি বা জিব্রাইল কেউ যেতে পারেন না। ঈশ্বর মানুষের সাথে কথা কন না 'ভিশন'-এ দেখা দেন কিংবা পর্দার পেছনে। (৪২ ঃ ৫০)

www.pathagar.com

ফিরে আসার পূর্বে তিনি এক নজর দোজখ দেখে নিলেন। এই যে এত ঘটনা ঘটে গেল তা ঘটল এক পলকের মধ্যে, এক সেকেন্ডের অংশ বিশেষ।

বলা হয় যে, যখন প্রফেট মোহাম্মদ পরদিন সকালে বাসার লোকজনদের কাছে তাঁর এই অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করেন, তখন উম্মে হানি ভীষণভাবে বিরক্তি প্রকাশ করে বলেন—দোহাই একথা যেন মানুষের সামনে বলে উপহাসের পাত্র হবেন না এবং নিজের সুনাম নষ্ট করবেন না। কিন্তু তিনি অবশ্য এ কাহিনী তাঁর একান্ত বিশ্বস্ত অনুসারীদের কাছে ব্যক্ত করলেন। আবু বকর বিশ্বাস করলেন, কিন্তু অন্য সকলে বিব্রত বোধ করলেন এবং অনেকের কাছে অবিশ্বাস্য ও অবাস্তব বলে মনে হওয়ায় অনেকে ধর্ম পরিত্যাগ করে (Glubb, 12979 p. 136)।

প্রফেট মোহাম্মদ পাবলিক স্কোয়ারে তার এই নৈশভ্রমণের কথা ব্যক্ত করলে, যেমন আশা করা হয়েছিল, লোকজনে বিশ্বাসই করল না। তাঁর মাথায় গোলমাল হয়েছে কিনা, তাই সন্দেহ করল।

দুরন্ত কোরেশীরা এই পাগলের প্রলাপ বলে উড়িয়ে দিল। তাদের এই ধারণাকে পাল্টে দেয়ার জন্য একটি হাদিসের উৎপত্তি হলো। বর্ণনায় আছে প্রফেট বলেছেন—আমার চোখ বন্ধ ছিল ঘুমে, কিন্তু আমার অন্তঃকরণ ছিল জাগ্রত। অন্য হাদিস আছে আয়েশার বর্ণনায় 'রসূলের দেহ যেখানে ছিল সেখানেই ছিল, কিন্তু আল্লাহ তাঁর আত্মাকে রাত্রে তুলে নিয়েছিলেন।' পরবর্তী অনেক মুসলিম আলেম ও ধর্মবিদ বলেছেন যে, প্রফেটের ঐ নৈশভ্রমণ একটি রহস্যময় অভিজ্ঞতা ছাড়া আর কিছু নয় এবং অন্যেরা বলেছেন এই অভিজ্ঞতাকে প্রতীকী অর্থে ধরে নিতে হবে।

www.pathagar.com

৬

মদিনা ও তারপর

মিশরের প্রাচীনকাল থেকে ইথরেব শহর পরিচিত, মক্কার উত্তরে ২৩০ মাইল দূরে অবস্থিত। ইথরেব ইহুদিদের কাছে মদিনা বলে পরিচিত ছিল। আরামাইক শব্দ মেদিনতা থেকে মদিনা– এর অর্থ শহর। 'মদিনাত-আল-নবী' থেকে যে মদিনা হয়েছে এটা সত্য নয়। মদিনাত-আল-নবী অর্থ 'প্রফেটের শহর' (Rodinson 1976 p. 139)।

ট্রাডিশন মতে, মদিনার প্রধান গোত্র আউস ও খাজরাজ কাহতান গোত্রভুক্ত। এরা মূলত দক্ষিণ-আরবের বাসিন্দা এবং মক্কানদের থেকে আলাদা শাখাভুক্ত। এরা প্রথমে উত্তর আরবে অথবা আদনান জাতীয়ভুক্ত। প্রফেট মোহাম্মদের মদিনার সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল। মদিনায় নাবাতিয়ানদের একটা বাজার ছিল এবং এখানে হাশিম, প্রফেটের প্রপিতামহ, বাণিজ্য উপলক্ষে আসা-যাওয়া করতেন। এই রকম একটা বাণিজ্য যাত্রাকালে আমরের কন্যা সালমার সাথে তার দেখা হয় এবং তিনি তাকে বিবাহ করেন। আমর মদিনার খাজরাজ জাতির নাজ্জার (সূত্রধর) গোত্রভুক্ত ছিলেন। এই বিবাহের কারণে প্রফেটের দাদা আবদুল মোতালেবের জন্ম হয় এবং তিনি এখানেই পালিত হন। প্রফেটের পিতা আবদুল্লাহ মদিনায় বাণিজ্য উপলক্ষে আসতেন এবং মদিনায় মৃত্যুবরণ করলে এখানে সমাধিস্থ হন। প্রফেট যখন শিশু, তখন তার মা আমিনা তাঁকে মদিনায় নিয়ে আসেন আত্মীয়স্বজনদের সাথে দেখা করতে, মক্কায় ফেরার পরে তিনিও মারা যান।

প্রফেট তাঁর 'মিশন' সম্বন্ধে মক্কাতে বেশ সুবিধা করে উঠতে না পারায় তাঁর উদ্দেশ্য স্থবির হয়ে পড়ে। বলা হয়েছে যে অত্যাচারের জন্য নয় (যার ন্যূনতম সাক্ষ্য-প্রমাণ পাওয়া যায়), কিন্তু তাঁর মিশনের কোনো উন্নতি হচ্ছে না দেখে তিনি মদিনায় চলে যাবার কথা চিন্তা করেন এবং সেখান থেকে মক্কাবাসীদের ওপর বাণিজ্য বিষয়ক ব্যাপারে চাপ সৃষ্টি করে তাদের অর্থনৈতিকভাবে অসুবিধায় ফেলার কথা চিন্তা করেন।

তিনি মক্কানগরী পরিত্যাগ করতে ইচ্ছা করেননি, তবে লোকদের বোঝাতে চেয়েছিলেন যে তাঁকে মাতৃভূমি থেকে নির্বাসিত করা হচ্ছে। তাই কোরানে মুসলিমদের নিষেধ করা হয় মক্কাবাসীদের সাথে বন্ধুত্ব করতে কারণ তাঁরাই প্রফেটকে তাঁর দেশ থেকে নির্বাসিত করেছে (৬০ ঃ ৯)।

পরবর্তীতে, মদিনায় প্রফেট মোহাম্মদের সাফল্য তাকে উদ্বুদ্ধ করেছে মদিনাকে আপন দেশ হিসেবে গ্রহণ করার জন্য। তিনি সেখানে তার বাকি জীবনটা কাটিয়েছেন এবং তার

www.pathagar.com

সব অভিযানের-সামরিক ও ধর্মীয়-হেড কোয়ার্টার প্রধান কার্যালয় রূপে ব্যবহার করেছেন। সেখানেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন এবং তাঁর মসজিদের পিছনে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

৬.১ আকাবার শপথ

৬২০ সালে মক্কায় বাৎসরিক হজের সময় মদিনার খাজরাজ গোত্রের ছয়জন লোকের যাঁদের সাথে প্রফেটের আত্মীয়তা ছিল, তাদের সাথে দেখা করেন এবং কথাবার্তা বলেন। তারা মনে করেছিল যে মদিনাতে যে সামাজিক, বাণিজ্যিক বিশেষ করে যে গোত্রীয় সমস্যা ছিল, এগুলোর সমাধানে প্রফেটের সাহায্য মিলতে পারে। তাঁর যদি কোনো ধর্মীয় আদর্শও থাকে সে সম্বন্ধেও তিনি মতামত প্রকাশ করতে পারেন। পরের বছর ৬২১ সালে মদিনার ১২ জনের একটি দল (১০ জন খাজরাজ গোত্র এবং ২ জন আউস গোত্র) প্রফেটের সাথে আবার আকবায় দেখা করে এবং একটি চুক্তিপত্র হয়, এতে তারা শপথ করে যে, তারা মূর্তি পূজা করবে না, মিথ্যা বলবে না, ব্যভিচার করবে না, কিংবা মেয়ে শিশু মেরে ফেলবে না। তারা প্রফেটের আদেশ মেনে চলবে। একে আকাবার প্রথম শপথ বলা হয়। তারা মদিনায় ফিরে গেল সাথে কোরান শিক্ষার জন্য নিয়ে গেল প্রফেটের এক শিষ্য মোসাব ইবন ওমরকে।

পরের বছর (৬২২), প্রথম শপথকে নবায়ন করল মদিনার ৭৫ জন লোক এবং দুইজন স্ত্রীলোক। অতিরিক্ত শর্ত হলো যে মদিনায় যেসব মুসলিম চলে যাবে তাদের জানমালের নিরাপত্তা তারা দিবে। একে আকাবার দ্বিতীয় শপথ বলা হয়। এই শপথকে সিমিটিক কায়দায় সত্যায়িত করা হয় 'বায়া'-র দ্বারা অর্থাৎ মোহাম্মদ তাঁর হাত বাড়িয়ে দিলেন এবং মদিনার পুরুষেরা সেই হাতের ওপর হাত রাখল। মেয়ে শুনেই শপথ গ্রহণ করল।

এই দল থেকে প্রফেট মোহাম্মদ ১২ জনকে শিষ্য হিসাবে গ্রহণ করে বললেন– মুসা তার অনুসারীদের মধ্যে থেকে ১২ জনকে শিষ্য নিয়েছিলেন এবং যিশুও তাই করেন, তোমরা বারো জন সব সময়ের জন্য আমার জামিনদার হলে (Muir 1912 p. 130)।

মদিনাবাসীরা তারপর প্রফেটের কিছু অনুসারীকে নিয়ে মদিনায় ফিরে এলো প্রফেটের মদিনায় চলে আসার পথ প্রস্তুত করতে। পরে মদিনাবাসীদের ওপর প্রফেট মোহাম্মদের প্রভাব উত্তরোত্তর বাড়তে লাগল। তারপর মাত্র কয়েক জন মক্কায় রয়ে গেলেন তারা হলেন প্রফেট মোহাম্মদ নিজে, আবুবকর আলী ও কিছু হাতেগোনা বিশ্বাসী সহচরবৃন্দ।

৬.২ মক্কা থেকে মদিনায় আগমন (হিজরত)

৬২২ সালের জুন মাসে কোনো এক সময়ে (সঠিক তারিখ সম্বন্ধে পণ্ডিত ব্যক্তিদের মতভেদ আছে) প্রফেট মোহাম্মদ, মদিনাতে তার অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করে, রাতে মক্কানগরী পরিত্যাগ করলেন। সাথে নিলেন আবুবকর ও অবশিষ্ট কিছু অনুসারী, শুধু বিশ বছরের কাজিন আলীকে রেখে। আলী ও আর একজন সাথী কিছুদিন পরে তাদের অনুসরণ করবেন। এই ঘটনাকে হেজিরা বলা হয়। (আরবিক হিজরা ইমিগ্রেশন, প্রস্থান, নির্বাসন বা পলায়ন)

www.pathagar.com

প্রফেটের মক্কা থেকে চলে যাওয়া এবং তার পিছে মক্কাবাসীদের ধাওয়া সম্বন্ধে রংচড়ানো (embellished) ঘটনাপঞ্জি রচিত হয়েছে। যেমন, প্রফেট ও তাঁর পার্টি মক্কার বাইরে তিন মাইল দূরে থাউরের গুহায় আশ্রয় নেন। এখানে গুহার মুখে মাকড়শা তাৎক্ষণিকভাবে জাল বুনে দেয় এবং এতে ধাওয়াকারীরা গুহার মধ্যে কেউ থাকতে পারে না ভেবে ফিরে যায়। সেখান থেকে প্রফেট ও তাঁর দল এক বেদুইনের সাহায্যে বিভিন্ন ঘাট পেরিয়ে মদিনায় এসে পৌছেন। এই যাত্রায় প্রায় নয়দিন অতিবাহিত হয় এবং ২৮ জুনের (৬২২) মধ্যে মদিনায় আসেন।

যখন প্রফেট মোহাম্মদ ও তাঁর দল মদিনা মরূদ্যানের তিন মাইল দক্ষিণে কোবা (koba) গ্রামে এসে পৌছেন, তখন তাদের দেখে একজন ইহুদি তৎক্ষণাৎ মদিনাবাসীদের সংবাদ দেয়। এই সংবাদ শুনে, মদিনার মুসলিমরা বের হয়ে এসে প্রফেটকে স্বাগতম জানায়। তিনি তাদের কোবাতে একটি মসজিদ তৈরি করার নির্দেশ দেন তাঁর শুভ আগমনের স্মরণিকা রূপে। সাদাসিদে একটা মসজিদ তৈরি হয় এবং এতে প্রফেট নিজে অংশগ্রহণ করেন। এই মসজিদ নতুন ধর্মের প্রথম উপাসনালয় রূপে পরিচিত হয়।

তিন দিন পর আল-কাসওয়াতে প্রফেট তাঁর উটে আরোহণ এবং মদিনার কেন্দ্রস্থলে যাত্রা করেন। তিনি উটের লাগাম ছেড়ে দিয়ে সিদ্ধান্ত নেন যে, উটটি যেখানে তাকে নিয়ে যাবে তিনি সেখানেই যাবেন। উটটি একটি ফাঁকা গোরস্থান মাঠে এসে দাঁড়ায়। এখানে প্রফেট একটি প্লট খরিদ করেন এবং নিজের ও পরিবারের জন্য বাড়ি নির্মাণের কাজে হাত দেন। এখানে একটি মসজিদও তৈরি করা হয় 'মসজিদ আল-নবী' বলে।

মদিনাতে প্রফেট মোহাম্মদ একজন বীরের সংবর্ধনা পান এবং কিছু মহল ছাড়া, তাঁর প্রভাব অন্য সব মহলের ওপর দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। কিছুদিনের মধ্যেই শহরের 'রাজা' (ruler) বনে গেলেন।

প্রফেটের মৃত্যুর ছ'বছর পর ৬৩৮ খ্রিস্টাব্দে খলিফা ওমর, গ্রিক ও রোমানদের জীবনযাত্রা বিবেচনা করে, প্রফেট মোহাম্মদের হিজরতের তারিখ থেকে মুসলিম যুগ হিজরি সাল প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই যুগ বা বর্ষ শুরু করার নির্ধারিত দিনটি হয় যে চান্দ্র মাসে হিজরত হয়েছিল ঐ মাসের প্রথম তারিখটি। ৬২২ খ্রিস্টাব্দে এই দিনটি পড়েছিল শুক্রবার ১৬ জুলাই। ৩৩টি সৌর বছরে চান্দ্র বছর হবে ৩৪টি। এখন আন্তর্জাতিক সুবিধার জন্য প্রায় সব মুসলিম দেশ গ্রেগরিয়ান সৌর ক্যালেন্ডার ব্যবহার করেন।

৬.৩ প্রথম (কনভার্টস) মোহাম্মাডানস্

প্রথমে যারা মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করে, ট্রাডিশনালি বলা হয়, তাদের সংখ্যা ছিল সত্তর জন। এদের বলা হতো 'রিফিউজি'—মোহাজির বহু বচনে (মোহাজিরিন)। এই মোহাজিরিনদের সংখ্যা পরে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় প্রথম থেকেই যারা ইসলামে দীক্ষা নিয়েছে তারা এবং আকাবা শপথের পর যারা মক্কা ছেড়ে মদিনায় গেছে, যারা প্রফেটের সহযোগী ও পরে অনুসরণ করেছে তারা এবং পরে তাঁর সাথে, ৬৩০ সালে

www.pathagar.com

মক্কা বিজয়ের আগ পর্যন্ত যোগদান করেছে। মদিনায় প্রথম দীক্ষিত ব্যক্তিরা যারা নতুন মোহাজেরদের সাহায্য (নসর) এবং পরবর্তীতে যারা সাহায্য করেছে সেই সব মদিনার লোকদের আনসার বলা হয়। এই শব্দটি অর্থাৎ আনসার কোরানে প্রথম ব্যবহৃত হয় যিশুর শিষ্য ও সাহায্যকারীদের জন্য (৩ঃ ৪৫)।*

মদিনার সাহায্যকারীরা প্রধানত ছিল দুইটি প্রতিদ্বন্দ্বী দলের যারা মদিনার মরূদ্যান নিয়ন্ত্রিত করত। একদল হলো খাজরাজ প্রফেটের প্র-মাতামহের দিক থেকে আত্মীয় এবং এর প্রধান ব্যক্তি ছিল সাদ ইবন ওবাইদা, অন্য দলটি আউস, একদা ইহুদিদের সাথে আঁতাত ছিল। এর প্রধান ব্যক্তি সাদ ইবদ মুয়াদ।

যারা প্রফেটের সহযোগী বা সাথীদের (আসাব; একবচন সাহাব; উৎস পাশ্চাত্য শব্দ সাহিব) মধ্যে বিভিন্ন ধরনের মানুষ নিকট সম্পর্ক থেকে যারা তাঁর সঙ্গে কথা বলেছে, এমনকি নাম শুনেছে বা এমনকি তার জীবদ্দশায় তার বাসস্থানের আশপাশে বাস করেছে। এক সময় তার অনুসারীরা নিজেদের বলত হানিফ– ইসলাম-পূর্ব যুগে যারা নিজেদের একেশ্বরবাদী বলত। পরে এরা 'বিশ্বাসী' শব্দটি ব্যবহার করেছে– 'মুমিনুন' –একবচনে মুমিন। এবং এ-ও তারা বলত যে তারা 'আল্লাহর দলের লোক।' (হিজবি-ই-আল্লাহ)। অন্য অর্থে 'হিজবুল্লাহ'।

প্রফেট মোহাম্মদ একবার বলেছিলেন তাঁর মৃত্যুর পর যেসব দল-উপদল সৃষ্টি হবে, তার মধ্যে কেবল একটিই বিশ্বাসী দল। বাকি সবই অবিশ্বাসী (infidels) শুরু থেকেই তিনি যে তত্ত্ব কথা প্রচার করেছেন তাতে তার নাম বহন করেছে। এমন কি হিজরতের পূর্বে প্রফেটের অনুসারীদের বলা হতো 'মোহাম্মদী সম্প্রদায়'—উম্মা মোহাম্মদীয়া এবং এ কথা বা এর ব্যবহার শতাব্দি ধরে চলে এসেছে।

মুসলিম ইতিহাসে অনেক গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় দাবি করেছে যে তারা নিখাদ মোহাম্মদী সম্প্রদায়। এছাড়া অনেক রহস্যবাদী দলও আছে যারা বলে যে তারা 'মোহাম্মদী পথে'-র তীর্থযাত্রী (তরিকা মোহাম্মদীয়া) কারণ তারা প্রফেট কর্তৃক শুধু প্রবর্তিত আইন ও নীতি মেনে চলে, অনুসরণ করে; বিকৃত বা ভ্রান্ত তরিকা, যা ঢুকে গেছে, তার থেকে ভিন্ন। ভারতে 'মোহাম্মদী তরিকা' উদ্ভাবন করেছেন সংস্কারক আহমদ সিরহিন্দী (মৃ. ১৬২৪)। উর্দু কবি খাজা মীর ডারদ (মৃ. ১৭৮৫)-ও এ বিষয়ে যথেষ্ট এ-প্রক্রিয়ার উন্নতি করেন বলে প্রচলিত। অধুনা ইন্দোনেশিয়াতে মুসলিমদের মধ্যে মোহাম্মদীয়া আন্দোলন প্রবল আকার ধারণ করেছে।

একবিংশ শতাব্দির শুরু পর্যন্ত মুসলিমদের মধ্যে এবং পাশ্চাত্য বিশ্বে 'মাহমেডান' পদবিটি প্রচলিত ছিল। প্রফেট মোহাম্মদ কর্তৃক প্রবর্তিত ধর্ম এই নামেই পরিচিত ছিল এবং এখনো আছে।

অধুনা, মুসলিমগণ এই 'মহমেডান' শব্দটির ব্যবহারে আপত্তি তুলেছে এই কারণে যে এই ধর্মটির সৃষ্টিকারক প্রফেট মোহাম্মদ অথবা এমনকি প্রফেট মোহাম্মদ পূজনীয় বস্তু বা ব্যক্তি বোঝায়। 'মুসলমান' ফার্সি শব্দরূপে যা বিশ্বজনীন ব্যবহৃত হয়েছিল, 'মুসলিম' শব্দের পরিবর্তে, তা-ও ব্যবহারের বাইরে চলে যাচ্ছে।

---

* সূরা আল-ইমরানে স্পষ্টভাবে এ বাক্য নেই– এখানে ফেরেশতাগণ আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি 'কালেমার' সুসংবাদ দিচ্ছে, যিশুর শিষ্যগণ ও সাহায্যকারী নেই— অনুবাদক।

www.pathagar.com

মুসলিমগণ 'ইসলাম' শব্দটিকে বেশি মর্যাদা দিচ্ছে এবং এর 'অনুসারীদের মুসলিম বলা হচ্ছে।' ইসলাম ও মুসলিম উভয় শব্দ মূলত ইসলাম-পূর্ব যুগে খ্রিস্টানরা ব্যবহার করেছে (as Christian usage) এবং প্রফেট মোহাম্মদ প্রথমে সাধারণ অর্থে এই দুটি শব্দ ব্যবহার করেছেন কারণ আব্রাহাম থেকে যিশু পর্যন্ত সকল প্রফেটদের ধর্ম বিশ্বাস রূপে তাদের অনুসারীগণ ব্যবহার করেছেন।

৬.৪ মোনাফেকগণ

প্রফেট মোহাম্মদ জানতেন যে তাঁর অনুসারীদের মধ্যে বেশ কিছু মুসলিম দ্বৈত-চরিত্রের এবং তারাই কোরানে ৬৮ নং সূরার বিষয়বস্তু।

কোরান বলে, কিছু লোক ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার ভান করে, কিন্তু অন্তরে তারা মিথ্যাবাদী এবং তাদের আত্মায় মোহর মারা। তাদের বিশ্বাসে তারা অস্থিতিশীল ছিল, আনুগত্যে আস্থাহীন। কর্তব্যে ছিল অনিয়মিত এবং সংকটের সময় তাদের বিশ্বাস করা যেত না। তারা সমালোচনা করত, দল পাল্টাত এবং ক্ষুব্ধ ছিল, আর গোপনে অন্তরে অনাস্থা পুষে রাখত। তারা ওহিতে সন্দেহ প্রকাশ করত এবং ধর্মমতে বিশ্বাসী ছিল না। এই ধরনের লোকদের কোরানে, সন্দেহবাণী বা মুক্তচিন্তক হোক, মোনাফিক বলা হয়েছে– বহুবচনে মুনাফিকুন। কোরানের এই শব্দ (term) ইথিওপীয় উৎসের– অর্থ, 'উপহাসকারী' 'বিদ্রূপকারী' (scoffer)।

এইসব মোনাফেকদের মধ্যে অনেকেই নামাজ ও রোজার আনুষ্ঠিকতাকে বিদ্রূপ করত খোলাখুলিভাবে, যেসব কথা মুসলিমরা বলতে ইতস্তত করেছে। এই বিদ্রূপকারীদের মধ্যে ছিল রাফা বিন জায়েদ এবং সোয়াইদ ইবন হারিথ। এরা ইসলাম গ্রহণ করলেও গোপনে উপহাস করেছে এবং প্রফেটের অনুসারীদের মধ্যে কোনো কোনো দলের কাছে বেশ জনপ্রিয়তা লাভও করেছে।

প্রফেট মোহাম্মদ জানতেন সত্যিকারের বিশ্বাসী পাওয়া মুশকিল। যেমন, একবার তিনি স্বীকার করেছিলেন, আমি কখনো কাউকে ইসলাম গ্রহণ করতে আমন্ত্রণ জানাইনি, কিন্তু যারা গ্রহণ করেছিলেন তারা ছিলেন দ্বিধান্বিত, সন্দেহবাদী এবং দোনামোনা, একমাত্র আবু বকর ছাড়া।'

মানুষেরা তাদের বিশ্বাসে অটল ছিল না। তাই দলত্যাগী ঘনঘন হতো এবং তাদের আস্থা ছিল ভঙ্গুর। মক্কায় যখন নতুন মুসলিমদের ওপর কিছুটা অত্যাচার শুরু হলো, তারা অনেকেই ধর্ম ত্যাগ করে। অন্যান্যরা তাদের পুরনো বিশ্বাসের ওপর জোর দিয়ে আস্থা রেখেছিল, নতুন ধর্মের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করে। প্রফেটের মুখে মিরাজের কাহিনী শুনে অনেকেই উপহাস করে নিজের ধর্মে ফিরে গেছে, বিশ্বাস করেনি। পাগলের প্রলাপ বলেছে। এমনকি প্রফেট মোহাম্মদ যখন হোদায়বিয়ার সন্ধি সই করেন তখন ওমরের মতো দৃঢ়চিত্ত মানুষ সন্ধির শর্তগুলোকে অসম্মানজনক মনে করে নতুন ধর্ম ত্যাগ করার কথা চিন্তা করেন।

৬.৫ হাসান ইবন থাবিত

মদিনাতে পৌঁছানোর কিছু পরেই প্রফেটকে নিয়ে অনেক ব্যঙ্গাত্মক কবিতা লেখা

www.pathagar.com

হয়েছে তাঁর মিশনকে কেন্দ্র করে। অনেকে উপহাস করেছে তাঁর দাবিকে। তারা ঘোষণা করেছে যে কোরান প্রফেট মোহাম্মদের নিজের রচনা। তারা গর্ব করে বলত এমন কাহিনী নিয়ে কবিতা তারাও লিখতে পারে এবং তাঁকে উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও মিথ্যাবাদী বলে অভিযুক্ত করেছে। প্রফেট মোহাম্মদ এই সব আক্রমণে ও প্রতিক্রিয়ায় আবেগপ্রবণ হয়ে উঠতেন এবং এর মোকাবেলা করতেন জোরেশোরে। ফলে অনেকেই তাদের এই হটকারীতার জন্য প্রাণ দিয়ে মূল্য দিতে হয়েছে।

প্রফেট মোহাম্মদ কোরানিক প্রেরণাকে কবির কল্পনা মনে করে ঘৃণা করতেন এবং একাধিক বার তিনি পরিষ্কার করে বলেছেন যে, তিনি কবিতাকে ঘৃণা করেন এবং কবি গোষ্ঠীকে নিন্দা করেন। এ সম্বন্ধে তাঁর এক হাদিস আছে, 'পেটভরা কবিতার চেয়ে পুঁজভরা পেট অনেক ভালো'। তিনি বিখ্যাত ইসলাম-পূর্ব কবি ইমরুল কায়েসকে বলেছিলেন সে নরকের নেতা। তিনি ওকাজ মেলায় যে কবির লড়াই ও কবিতার প্রতিযোগিতা হতো তা বন্ধ করে দেন। কিন্তু তিনি নিজেই কবিদের নিয়োগ করেন তাঁর বিরুদ্ধে রচিত কবিতার জবাব দিতে এবং তাঁর সামরিক অভিযানের গুণগান গাইতে এবং শত্রুদের কবিতার উচিত জবাব দিতে।

তাঁর নিয়োজিত কবিদের মধ্যে প্রধান কবি ছিলেন হাসান ইবন থাবিত। খাজরাজ গোত্রের কবি। হাসানের পূর্বপুরুষেরা কবি ছিলেন, তিনি ঘাসানের খ্রিস্টান যুবরাজদের দলে অনেক দিন কাটিয়েছেন কবিয়াল হিসাবে, অন্যান্য খ্রিস্টান কবিদের মতো তিনি মদের প্রশংসা করে কবিতা লিখেছেন।

মিশরের গভর্নর প্রফেটকে দু'টি খ্রিস্টান বালিকা উপহার দেন। তার মধ্যে একটি হাসানকে দিয়ে, অন্যটি নিজে রেখে দেন। তিনি ছিলেন 'মেরি কিব তিয়া'– Mary the Copt. প্রফেট মোহাম্মদ হাসানকে একজন খ্রিস্টান বালিকা উপহার দেয়ায় মনে করা হয় হাসান নিজেও খ্রিস্টান ছিলেন। প্রফেটের মৃত্যুর পর হাসান তৃতীয় খলিফা ওসমানের অনুসারী হন এবং ওসমানের মৃত্যুর পর মাবিয়ার খলিফা হওয়ার পক্ষেই তিনি মত প্রকাশ করেন।

৬.৬ প্রাথমিক যুদ্ধবিগ্রহ

৬২৩ খ্রিস্টাব্দে, মদিনায় কয়েক মাস অবস্থানের পর প্রফেট মোহাম্মদ মক্কান ক্যারাভানের ওপর প্রথম আক্রমণের (রাজিয়া) ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এর পরপর আরও কয়েকটি আক্রমণ চালানো হয়েছিল। এর মধ্যে কয়েকটি তিনি ব্যক্তিগতভাবে পরিচালনা করেন। উদ্দেশ্য ছিল মক্কার ব্যবসায়ীদের হয়রানি করে অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু করা। তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল অর্থ সংগ্রহ করা, সংগঠনকে শক্তিশালী করা। আর মদিনার বাণিজ্য ব্যবস্থাকে সাহায্য করা, কেননা তারা মূলত চাষবাস করেই দিনাতিপাত করত। ৬২৪ সালে জানুয়ারি মাসে আরবি পবিত্র মাসে যখন যুদ্ধবিগ্রহ নিষিদ্ধ, প্রফেটের অনুসারীগণ নাখালা উপত্যকায় একটি মক্কার ক্যারিভানকে আক্রমণ করে। এই আক্রমণে একজন কোরেশী নিহত হয় আর দু'জন বন্দি হয়। ক্যারাভানকে মদিনায় নিয়ে আসা হয় মালেগণিমত হিসাবে। পবিত্র মাসে এই আক্রমণ হওয়ায় শহরে বেশ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় পুরনো ট্র্যাডিশন ভঙ্গ করার জন্য কিন্তু প্রফেট সময়

www.pathagar.com

মতো 'ওহি' দ্বারা বিষয়টিকে জায়েজ করে ফেলেন এই বলে যে, এই আক্রমণ আল্লাহর কারণেই হয়েছিল (২ ঃ ২১৪)। এই অভিযানের নেতা ছিলেন আবদুল্লাহ ইবন জাহাশ— তিনি খেতাব পেলেন 'আমিরুল মুমেনিন'—এ খেতাব খলিফারা পরে ব্যবহার করেছেন।

ঐতিহাসিকভাবে প্রফেট মোহাম্মদের সাথে কোরেশদের গুরুত্বপূর্ণ মোকাবেলা হয় ১৫ মার্চ ৬২৪। প্রফেট মোহাম্মদ জানতে পারেন যে, মক্কানদের কয়েকশ' উটের পিঠে বিশাল এক সম্পদের বহর সিরিয়া থেকে বাণিজ্য করে মক্কায় ফিরছে এবং এই বিরাট কাফেলা মক্কা থেকে বিশ মাইল দূরে বদর নামক এক স্থান দিয়ে অতিক্রম করবে। প্রফেট মোহাম্মদ এখানেই ঐ কাফেলাকে 'এমবুশ' করার পরিকল্পনা করেন। উমাইয়া প্রধান উক্ত ক্যারাভানের নেতৃত্বে ছিলেন।

মদিনাবাসীদের পরামর্শ মতো, প্রফেট মোহাম্মদ দলবল নিয়ে অগ্রসর হলেন এবং অবস্থান নিলেন একটি জলশূন্য কূপের কাছে। উদ্দেশ্য ছিল মক্কার ক্যারাভানকে পানি থেকে বঞ্চিত করা। যদিও মরু সম্প্রদায়ের কাছে কূপের পানি জলশূন্য করা মারাত্মক অপরাধের শামিল কিন্তু প্রফেট এই অবস্থায় এ নীতি অনুসরণ করা সমীচীন মনে করেননি। আবু সুফিয়ান প্রফেটের এই পরিকল্পনা টের পেয়ে দমদম নামে এক সংবাদবাহককে মক্কায় পাঠালেন প্রফেটের আক্রমণকে প্রতিহত করতে, সেনাবাহিনী পাঠানোর অনুরোধ করে। তারপর আবু সুফিয়ান লোহিত সাগরের উপকূল ঘেঁষে ভিন্ন পথ ধরে তার কাফেলা নিয়ে নিরাপদে বাড়ি পৌঁছে যান।

এদিকে মক্কানরা একটা বাহিনী সংগঠন করে বদর অভিমুখে শত্রুর মোকাবেলা করার জন্য রওয়ানা দেয়। তার পর একটা রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম শুরু হয় যার বর্ণনা মুসলিম ঐতিহাসিকগণ বিস্তারিতভাবে দিয়েছেন। প্রফেট মোহাম্মদ নিজে কোনো সক্রিয় অংশ এই যুদ্ধে গ্রহণ করেননি, তবে খেজুর বৃক্ষের কাণ্ড ইত্যাদি দিয়ে তৈরি একটি ছাউনির সামনে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ পরিচালনা ও তদারক করেন। এই ছাউনির পেছনে দ্রুতগামী উটের বহর রাখা হয়েছিল, মদিনার আউস গোত্রের প্রধান এর ব্যবস্থা করে প্রফেটকে বলে– যদি যুদ্ধের গতি বিপরীত হয় তাহলে তিনি এই উটের সাহায্যে মদিনা অভিমুখে যাত্রা করতে পারেন নিরাপদ স্থানে পৌঁছানোর জন্য (Glubb 1979 p. 184)।

প্রফেট মোহাম্মদ তাঁর ছাউনিতে দাঁড়িয়ে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতে থাকেন, এই সীমাহীন আবেদন আবুবকরকে পীড়িত করে, তাই তিনি প্রফেটকে বলতে বাধ্য হন– 'হে আল্লাহর রসূল আপনার এই লাগাতার আবেদনে হয়তো আল্লাহ বিরক্ত হতে পারেন। কারণ তিনি নিশ্চয়ই আপনাকে সাহায্য করবেন ও মনোবাঞ্ছা পূরণ করবেন। যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে প্রফেট মোহাম্মদ অতিরিক্ত টেনশন ও উত্তেজনার কারণে এক সময় জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন।

যখন যুদ্ধ ঘোরতর আকার ধারণ করে তখন হঠাৎ আচমকা এক ধূলিঝড় উঠে মক্কানদের বিপর্যস্ত করে তোলে। এই অবস্থা দেখে প্রফেট মোহাম্মদ চিৎকার করে বলে ওঠেন– 'শত্রুদের ওপর হাজার ফেরেশতার আক্রমণ হচ্ছে'। এই ঘটনা কোরানেও উল্লেখিত হয়েছে, 'যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সিদ্ধান্তে অটল থাক এবং শত্রু তোমার ওপর হামলা চালায় তখন আল্লাহ তাঁর পাঁচ হাজার ফেরেশতা

www.pathagar.com

পাঠিয়ে সাহায্য করবে (৩ ঃ ১২২)।

মুসলিম ট্র্যাডিশনে বলা হয়েছে যে, বদর যুদ্ধে মক্কাবাসীদের জোয়েল ইবন সাকোরা, স্থানীয় গোত্রের প্রধান শয়তানের বেশ ধরে সাহায্য করেছে। সে মক্কাবাসীদের যুদ্ধজয়ের নিশ্চয়তা প্রদান করেছিল, কিন্তু যুদ্ধের গতি যখন উল্টে যায় তখন সে পালিয়ে প্রাণ বাঁচায়। পলায়নপর গোত্র প্রধানকে জিজ্ঞাসা করলে জবাবে সে বলে– 'তোমরা যা দেখনি, আমি তা দেখেছি' (৪ ঃ ৫০) অর্থাৎ ফেরেশতারা মুসলিমদের পক্ষ নিয়ে যুদ্ধ করছিল।

ঐতিহাসিকগণ বলেন– ৭০০ মক্কাবাসী ৩৫০ জন মুসলিম সেনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে এবং মুসলিমরা জয়ী হয়। প্রফেটের দিকে ১৫ জন হত হয়, আর মক্কাবাসীদের ৫০ জন। মক্কানদের মধ্যে নিহত হয়েছিল আবু জাহেল এবং অন্য প্রধান ব্যক্তিরা এদের মধ্যে ছিল আবু সুফিয়ানের জ্যেষ্ঠ পুত্র। এই যুদ্ধে উভয় পক্ষ খুব বেশি হিংসাত্মক ছিল না, কারণ মক্কাবাসীরা হঠাৎ আক্রমণে বিব্রত হয়ে আত্মরক্ষা ও কাফেলা রক্ষায় ব্যস্ত ছিল। আর মুসলিমদের কাছে যারা বন্দি হয়েছিল তাদের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করা হয়নি। বেশ কয়েক জনকে মুক্তিপণ দিয়ে মুক্তি দেয়া হয়।

৬২৪ সালে জুলাই, সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে প্রফেট মোহাম্মদ বদর যুদ্ধ জয়ে উদ্বুদ্ধ হয়ে মক্কানদের বাণিজ্য কাফেলায় আরও তিনটি আক্রমণ চালান এবং বেশ কিছু মালেগণিমত অর্জন হয়। শেষে মক্কাবাসী আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে তিন হাজার সমর্থ লোকদের নিয়ে এক বাহিনী গঠন করেন এবং ৬২৫ সালে ২৩ মার্চ মক্কা থেকে প্রায় ৬ মাইল উত্তরে মদিনার কাছাকাছি ওহুদ পাহাড়ে মদিনা আক্রমণে প্রস্তুতি নেয়া হয়। এই ওহুদ যুদ্ধে উভয় পক্ষের মোকাবেলা হয়।

ঐতিহাসিকদের মতে, মুসলিম পক্ষে ৭০০ জন যোদ্ধা ছিল যা অতি সহজেই মক্কাবাসীরা ছত্রভঙ্গ করে দেয়। প্রফেট মোহাম্মদ পলায়নপর লোকদের থামাতে চেষ্টা করে বলেন যে, তিনি খোদার প্রেরিত পুরুষ, তাঁর ওপর বিশ্বাস রেখে ঘুরে দাঁড়াও কিন্তু কোনো ফল হয়নি। মক্কানদের একটি ক্ষুদ্র দল প্রফেটকে আক্রমণ করলে তিনি বল্লাম দিয়ে একজনকে আঘাত করেন ফলে তার মৃত্যু হয়। প্রফেট নিজে একখণ্ড পাথর দ্বারা মুখে আঘাত পান ফলে তার ঠোঁট কেটে যায় ও দুটো দাঁত পড়ে যায়। তিনি তার গালে ও পায়েও আঘাত পান এবং গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে তিনি মারা গেছেন। তার জীবন রক্ষা পায় একদল নিবেদিত অনুসারীদের প্রাণপণ প্রচেষ্টায়, যারা তাদের ঘিরে এক নিরাপদ গুহাগাত্রে আশ্রয় নেয়। সেখানে তাঁর ক্ষতস্থান ধৌত করে প্রাথমিক চিকিৎসা করা হয়।

মক্কাবাসীদের জয়ের জন্য প্রধান কারণ ছিল খালিদ ইবন ওয়ালিদের অসাধারণ রণদক্ষতা। খালিদ ছিলেন মাখজুম গোত্রভুক্ত। ইনি পরবর্তীতে মুসলিম দলে যোগ দেন এবং মুসলিম সেনাবাহিনীর এক মহান জেনারেল হিসাবে ইসলামের ইতিহাসে স্থান করে নেন।

ওহোদের যুদ্ধে মুসলিম পক্ষে ৭০ জন নিহত হয় যার মধ্যে প্রফেটের চাচা হামজাও ছিলেন। আর মক্কাবাসীদের মাত্র ১৭ জন প্রাণ হারায়। এই যুদ্ধে মুসলিম সেনাবাহিনীর মনোবল প্রায় ভেঙে যায়। লোকজন হতাশ হয়ে পড়ে বিশেষ করে

www.pathagar.com

ঐশীবাণীর নিশ্চয়তার প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলে যেখানে বলা হয়েছে– "দশজন সবল মুসলিম ২০০ জন বিধর্মীকে পরাস্ত করবে, আর একশ' জন করবে ১০০০ হাজারকে" (৮ ঃ ৬৬)। বদরের যুদ্ধের জয় ফেরেশতাদের অংশগ্রহণের কাহিনী ওহোদ যুদ্ধের পরাজয়ের গ্লানিকে মুছে দিতে পারল মানুষের মন থেকে। একে সুসমন্বয় করে আশ্বাস বাণীসহ পরবর্তী ওহি নেমে এলো (৩ ঃ ১২০ - ২০০) আল্লাহ এই পরাজয়ে মুসলিমদের পরীক্ষা করলেন– এই বলে সান্ত্বনা দেওয়া হলো।

এই বিজয়ের সূত্র ধরে মক্কাবাসীরা আর আক্রমণ চালায়নি এবং ৬২৬ সালের এপ্রিল হতে, এক বছর বিশ্রাম নিয়ে প্রফেট মোহাম্মদ আবার মার্চেন্ট ক্যারাভান আক্রমণ শুরু করলেন। এই সব আক্রমণ থেকে মালেগণিমতের (spoils) শনৈ শনৈ আয়তন বৃদ্ধি পেল এবং মদিনার মুসলিম সম্পদ হিসাবে উট, দাস, বন্দি নারী ও শিশুর সংখ্যা বেড়ে যেতে থাকল। এই না দেখে মুসলিম দলে অন্যান্য গোত্র যোগ দিয়ে বাণিজ্য ক্যারাভান আক্রমণে অংশ নিয়ে নিজেদের অবস্থান নিরাপদ করল, আবার মালেগণিমতের ভাগীদারও হলো।

কিছুদিন ধরে প্রফেট মোহাম্মদ সম্পদশালী ইহুদিদের অবস্থান (Settlement) দখল করার চিন্তাভাবনা করছিলেন, এখন তিনি তার পরিকল্পনা বাস্তবায়নে স্থির সিদ্ধান্ত হন। ৬২৪ সাল থেকে তিনি একে একে ইহুদিদের অবস্থানের ওপর দখল নেয়ার চেষ্টা করেন এবং সফলও হয়েছেন এবং ৬২৮ সালের মধ্যে আর কোনো গুরুত্বপূর্ণ ইহুদি গোত্র মদিনা বা এর আশপাশে আর রইল না। এই সময়ের মধ্যে অ-ইহুদি গোত্রদের বিরুদ্ধে অভিযান ও আক্রমণ চলতে থাকল এবং সাফল্যও এলো। সর্বমোট, এই অবস্থায় পৌছতে, প্রফেট মোহাম্মদকে ১০০শ'র বেশি আক্রমণ ও অভিযান সংগঠিত করতে হয়েছিল।

৬.৭ পার্সি সলমন

৬২৭ সালে এপ্রিল মাসে মক্কাবাসীরা একটা মরণপণ আক্রমণ করার পরিকল্পনা করল যাতে মদিনার মুসলিমদের বিষদাঁত ভেঙ্গে দেয়া যায়। এই উদ্দেশ্যে সাত হাজার লোকবল নিয়ে মদিনার দিকে যাত্রা শুরু হলো। মক্কানদের সাথে বেদুইন ঘাফতান ও আসাদ গোত্রও যোগ দিল, তাদের ওপর মুসলিমদের আক্রমণের প্রতিশোধ নিতে। অবস্থা গুরুতর দেখা দিল এবং এই গুরুতর অবস্থায় প্রফেট মোহাম্মদ তাঁর সাথী (সাহাবী) পার্সি সলমনের পরামর্শ চাইলেন।

মদিনার দুর্বল দিকে সলমন ফার্সি পারস্য-স্টাইলে পরিখা খনন (খন্দক) করার পরামর্শ দিলেন এবং সেই পরামর্শে কাজ হয় যার ফলে শহরটি আক্রমণের হাত থেকে বেঁচে যায়। 'আরবদের এমন খন্দক' সম্বন্ধে কোনো ধারণা না থাকায় তারা আক্রমণের পথ খুঁজে পায়নি। তবুও মক্কাবাসীদের দুর্বল আক্রমণ মদিনাবাসীরা প্রতিহত করতে সমর্থ হয় এবং এইরূপে যুদ্ধে কোনো পক্ষই বিশেষ সুবিধা করতে পারেনি। মক্কাবাসীরা ফিরে যায়। এই যুদ্ধ 'খন্দকের যুদ্ধ' নামে পরিচিত।

সলমন ফার্সি পূর্বে জোরাস্ত্রিয়ান ছিলেন পরে খ্রিস্টান হন। পারস্যে জান্দিশাপুরে নেস্টোরিয়ান কলেজে তিনি শিক্ষা লাভ করেন এবং পরে সিরিয়াতে খ্রিস্টান কাল্ব

www.pathagar.com

গোত্রে অনেক বছর অতিবাহিত করেন। পরে মদিনায় চলে যান। তিনি প্রফেট মোহাম্মদের ওহি লেখকদের (কাতিব) মধ্যে কেউ ছিলেন না, তবে প্রফেটের সঙ্গী হিসাবে আলাপ-আলোচনা করতেন। কথিত আছে যে, কোরানে শেষ বিচারের দিন, ফেরেশতা ও শয়তান-ইবলিস ইত্যাদি যে কথা বিধৃত আছে তার ধারণা সলমন ফার্সিই দিয়েছেন।

প্রফেট মোহাম্মদ সলমন ফার্সির প্রজ্ঞাতে এতই মগ্ন হয়েছিলেন যে তিনি তাঁর অনুসারীদের বলেছিলেন– ১যদি সপ্তকন্যা নক্ষত্রপুঞ্জেও (Pleiades) জ্ঞান ভাণ্ডার থাকে তাহলে এই পারস্য জাতি সেই ক্ষেত্র থেকেও জ্ঞান আহরণ করে থাকে।' দুষ্টু লোকেরা বলত প্রফেট সলমন ফার্সির কাছ থেকে অনেক মূল্যবান সলাপরামর্শ পেয়েছিলেন।

সলমন ফার্সি একান্ত মুসলিম ছিলেন কিনা এটা পরিষ্কার নয়। প্রফেটের মৃত্যুর পর তিনি মদিনা পরিত্যাগ করেন কারণ আলীর পরিবর্তে আবু বকরের খলিফা নির্বাচন তার মনোপূত হয়নি। তিনি মেসোপটেমিয়ায় রাবিয়াতে খ্রিস্টান গোত্র হতে ইসলাম গ্রহণকারীদের সাথে বাস করার জন্য চলে যান। সেখানেই তার মৃত্যু হয় এবং স্টেসিফোন অথবা জেরুজালেমে সমাহিত হন।

শিয়া সম্প্রদায়ের নুসাইরিয়াদের জন্য যথেষ্ট কাজ করেছেন সলমন যার জন্য তাকে মুসাইরি সম্প্রদায় দেবতা জ্ঞান করে তাকে রহস্যবাদী ত্রিত্ববাদে পরিণত করেছিল প্রফেট মোহাম্মদ ও আলীর সাথে। অনেক সময় সলমন ফার্সিকে নুসাইরিরা ত্রিত্ববাদের অন্য দুটি অংশের চেয়ে বেশি মর্যাদা দিয়েছে (G. Levi della Vida, in SEI, 1974 p. 501)।

৬.৮ প্রফেট মোহাম্মদের পত্নীগণ

প্রফেট মোহাম্মদের পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন, ইবন ইসহাক, ইবন হিশাম, ইবন সাদ, ইবন হানবল, আল-তারাবী এবং অন্য ঐতিহাসিকগণ। হাদিসেও তাঁর ব্যক্তিগত পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে বর্ণনা রয়েছে। একটি হাদিসে বলা হয়েছে যে প্রফেট মোহাম্মদের তিনটি প্রিয় দ্রব্য ছিল– সালাত, সুগন্ধি এবং নারী। কোরানেও নারীর জন্য প্রফেটের দুর্বলতার ইঙ্গিত আছে (৩৩ ঃ ৫২)। ইবন আরাবীর মতে, প্রফেট বলেছিলেন যে নারীর মধ্যে তিনি স্বর্গীয় অনুভূতি পেতেন। আল্লাহ নারীকে আমার কাছে প্রিয় বস্তুরূপে দান করেছেন (Sehuon, 1976, p. 185)। তুর্কি পণ্ডিত নাবিয়া এবট-এর মতে, প্রফেট মোহাম্মদ ছিলেন ইসলামের এবাদতকারী ও সুগন্ধি প্রিয় রসূল এবং "avowedly a great lover of ladies" –দুর্দান্তভাবে নারীপ্রিয়।

বলা হয় যে প্রফেট মোহাম্মদ একবার প্রিয় তরুণী পত্নী আয়েশাকে বলেছিলেন যে, যদি তিনি প্রফেটের পূর্বে মারা যান তাহলে তার শেষকৃত্য অতি সম্মান ও জাঁকজমকের সাথে করবেন। উত্তরে আয়েশা বলেন– 'হ্যাঁ তা করবে, তবে তার পরেই সোজা অন্য নারীর কাছে যাবে আনন্দ করতে; তারপর আর একটি নতুন কচি বৌ আমার স্থলে নিয়ে আসবে।' একথা শুনে ইবন ইসহাক লিখেছেন, প্রফেট মুচকি হেসেছিলেন।

www.pathagar.com

প্রফেট মোহাম্মদের নারীপ্রীতি এবং ঘন ঘন বিবাহ তাঁর সমসাময়িকদের মধ্যে আলোচ্য বিষয় ছিল। তাঁর বিরুদ্ধবাদীরা অভিযোগ করেছিল এই বলে যে, তিনি নিজেকে মেয়েদের সান্নিধ্যে ডুবিয়ে রাখতেন, যা একজন প্রফেটের চরিত্রের সাথে সামঞ্জস্য নয়– (not in keeping with the character of a Prophet) এবং তিনি এক দাম্পত্য সমস্যা সম্পর্কে স্বর্গীয় নির্দেশ ও অনুপ্রেরণা পাওয়ার ভান করতেন।

ইহুদিরা একটা প্রবাদ বাক্য অনুসরণ করত– Carnality precludes prophecy- ইন্দ্রিয়বিলাস ভবিষ্যদ্বাণী নিবারণ করে; তাই তারা বলত যদি প্রফেট মোহাম্মদ একজন প্রফেট বলে দাবি করেন তাহলে তার নারী প্রিয়তা থাকা উচিত নয়। তারা বলত 'এ কী ধরনের প্রফেট যে কেবল বিবাহের চিন্তা করে'? (Andrae, 1960 p. 188)। এবং যে সন্দেহজনক পরিস্থিতিতে তিনি তাঁর জন্য নারী গ্রহণ করেন– যেমন রায়হানা ও সাফিয়া। এ আচরণ একজন ঐশী নির্দেশপ্রাপ্ত ব্যক্তির ব্যবহারের সাথে খাপ খায় না।

কোনো কোনো মুসলিম লেখক প্রফেটের স্বভাবের এই দিকটাকে মনে করেন "Superior Virility" অর্থাৎ অতি উন্নত পুরুষত্ব এবং সত্য সত্য তারা বলে গেছেন যে তিনি এক রাতে তার সব ক'টি স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করতে পারেন। তারা তাঁর বহু বিবাহকে কয়েকটি কারণে সমর্থন করেছেন : যেমন, যখন কোনো সম্প্রদায়ের মধ্যে হৃদ্যতা বা আনুগত্য লাভের কারণে সে গোত্রের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন; কোনো কোনো পরিবারের বাধ্যতা আদায়ের কারণে সে পরিবারের কন্যাকে গ্রহণ করেন। সামাজিক মর্যাদা বাড়ানোর জন্য একাধিক স্ত্রী প্রয়োজন হয়েছিল; কিছু বিধবার স্বামী ও এতিম কন্যার পিতারূপে অসহায় বিধবা ও এতিম কন্যাদের আশ্রয় দিয়েছেন এবং তিনি 'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা' এই প্রবচনে বিশ্বাস করে একাধিক বিবাহ করেন তাঁর ওপর আরোপিত 'আবতারা' পুত্রহীন অপবাদ ঘুচাবার জন্য।

কোরান মুসলিমদের জন্য চারটির বেশি স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি দেয়নি, কিন্তু প্রফেটের জন্য 'বিশেষ ওহি' দ্বারা এ বিধানের ব্যতিক্রম ছিল। সাধারণ হিসাবে প্রফেটের এগারো জন স্ত্রী ছিল, কোনো কোনো হাদিস মতে তার ছিল বাইশটি (Hughes 1977 P. 400)। এই বাইশটি পত্নীর মধ্যে কয়েকটি অকার্যকর (invalid) হয়, কারণ শর্ত পূরণ হয়নি, কয়েকজনের সাথে মিলন হয়নি (never cousumated) এবং কয়েকজন তালাকপ্রাপ্ত। কয়েকজন ইচ্ছাকৃতভাবে প্রফেটকে ছেড়ে গেছে। কয়েকটি বিবাহ স্থির করেও শেষ মুহূর্তে ভেঙে যায় এবং কয়েকটি ছিল অস্থায়ী।

এইভাবে প্রফেট ৬৩০ সালে দুটো বিবাহ করেন। একজন আসমা বিন্‌ত নুমান কিন্দা গোত্রের কন্যা, কিন্তু তিনি (প্রফেট) তাকে ফেরত পাঠিয়ে দেন কোনো কারণে। অন্য জন ছিল কিলাব জাতির ওয়াহিদ গোত্রের এয়াজিদের কন্যা আমরা। তিনি প্রফেটকে বিয়ে করতে অনিচ্ছুক ছিলেন কারণ তার বাবা মুসলিম কর্তৃক নিহত হয়েছিলেন, পরে বিয়ে হলেও প্রফেট তাকে তালাক দেন। ট্র্যাডিশনে আরও আছে যে প্রফেট একবার ইবন আব্বাসের শিশুকন্যা উম্মে হাবিবকে হামাগুড়ি দিতে দেখে মন্তব্য করেন এই মেয়ে বড় হলে এবং তিনি বেঁচে থাকলে, তাকে বিয়ে করবেন। কিন্তু মেয়েটির শিশু অবস্থাতেই প্রফেট মারা যান (Guillaume 1960, P. 55)।

প্রফেট মোহাম্মদের মদিনায় নিয়মিত (regular) স্ত্রীদের জন্য এক রুমঅলা

www.pathagar.com

এপার্টমেন্ট ছিল যা মসজিদের পূর্ব দিক সংলগ্ন এবং স্ত্রীর সংখ্যা বাড়ার সাথে ঘরের সংখ্যাও বেড়ে যায়। সাধারণভাবে গৃহীত স্ত্রী-সংখ্যা নিম্নরূপ :

(১) খাদিজা প্রফেট মোহাম্মদের প্রথম স্ত্রী। মক্কায় থাকা অবস্থায় তিনি মারা যান। প্রফেট মোহাম্মদ চব্বিশ বছর ধরে স্ত্রী-আনুগত্য (fidelity); মনে করা হয় আংশিকভাবে ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা যা তার প্রতি ছিল; কিন্তু এটা বলা হয়ে থাকে যে অর্থ ও সম্পদের কারণে এবং যে প্রভাব ও নিরাপত্তা খাদিজা দিয়েছিলেন সেই জন্য স্বামীকে এক বিবাহে সন্তুষ্ট থাকতে বাধ্য করার মতো অবস্থা খাদিজার ছিল। তাই খাদিজার জীবদ্দশায় প্রফেট দ্বিতীয় বিবাহের চেষ্টা করেননি। যাই হোক, আরব লেখকদের মতে, প্রফেটের অদম্য পুরুষত্ব, খাদিজার মৃত্যুর প্রায় এক মাস পরেই তিরিশ বছরের বিধবা সওদাকে বিবাহ করে ঘরে তোলেন, যদিও স্ত্রী খাদিজার মৃত্যু তাঁকে দুঃখ দিয়েছে।

(২) সওদা বিনত জামাআ সাকরানের বিধবা স্ত্রী। প্রফেটের সাথে বিয়ে হয় ৬১৯ খ্রিস্টাব্দে যখন তাঁর বয়স প্রায় তিরিশ। সময়ের সাথে বয়স বাড়লে প্রফেট তাকে অবজ্ঞা করতে থাকেন এবং ৬৩০ সালে তালাক দেন। কিন্তু সওদা এই অপমান এড়ানোর জন্য প্রফেটের কাছে আবেদন করেন যে তার পালাটা তিনি আয়েশাকে দিলেন, যদি তাকে ফিরিয়ে নেয়া হয়। প্রফেট এই শর্তে তাকে পরিবারে রেখে দেন।

(৩) আয়েশা, প্রফেটের প্রিয় পত্নী— আবু বকরের কন্যা, পরে খলিফা হন। আয়েশা ইসলামের প্রাথমিক যুগে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

(৪) ওমরের কন্যা হাফসা। ওমর দ্বিতীয় খলিফা হন পরে। স্বামী খুনাইজ যখন মারা যায়, হাফসার বয়স ছিল সতের। বদরের যুদ্ধে (৬২৫) তার স্বামী নিহত হলে প্রফেট হাফসাকে বিয়ে করেন। হাফসা ও আয়েশা দু'জনেই বন্ধু ছিলেন। ৬৭০ সালে হাফসা মারা যান।

(৫) জয়নাব বিনত খোজাইমা ওবাইদার স্ত্রী ছিলেন। ওবাইদা বদরের যুদ্ধে মারা যান; তিনি প্রফেটের কাজিন ছিলেন। প্রফেট ৬২৬ সালে জানুয়ারি মাসে জয়নাবকে বিয়ে করেন, তখন তার বয়স ছিল তিরিশ। বিয়ের আট মাস পরেই জয়নাব মারা যান।

(৬) উম্মে সালমা ছিলেন মখজুম গোত্রের মেয়ে বিবাহ হয় আবু সালামার সাথে। ৬২৫ সালে ওহুদের যুদ্ধে আহত হওয়ার কারণে মারা যান। প্রফেট এবং তাঁর দুই শ্বশুর আবু বকর ও ওমর তিনজনই প্রার্থী ছিলেন এই বিধবার পাণি গ্রহণে। উম্মে সালমা প্রফেটের উদ্দেশে বলেন যে, তার চারজন স্ত্রী বর্তমান সওদা, আয়েশা, হাফসা ও জয়নাব; সুতরাং এ বিবাহ হয় কি করে? তখন চারের অধিক স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি দিয়ে প্রফেটের জন্য ওহি নাজেল হয় (৩৩ : ৪৯)। ৬২৬ সালে মার্চ মাসে প্রফেট উম্মে সালমাকে বিবাহ করেন। তখন তার বয়স উনত্রিশ। প্রফেটের হেরেমে তিনি আলীর পত্নী (প্রফেটের কন্যা) ফাতিমার সাথে বন্ধুত্ব গড়ে তোলেন। প্রফেটের মৃত্যুর পর তিনি বেঁচে ছিলেন।

(৭) জয়নাব বিনত জাহাশ প্রফেটের পালক-পুত্র জায়েদ ইবন হারিথের স্ত্রী। জায়েদ জয়নাবকে তালাক দিলে প্রফেট তাকে বিবাহ করেন।

www.pathagar.com

(৮) জুয়াইরিয়া আবু দিরারের পুত্র হারিথের কন্যা। আবু দিরার বানু মুস্তালিকের গোত্র প্রধান। বানু মুস্তালিক খোজা গোত্রের শাখা। জুয়াইরিয়ার বিবাহ হয় ঐ গোত্রের একজনের সাথে। বানুমুস্তালিক গোত্রের বিরুদ্ধে এক অভিযানকালে জুয়াইরিয়া বন্দি হন। প্রফেট মোহাম্মদ মুক্তিপণ দিয়ে এক নাগরিকের কাছ থেকে মুক্ত করে ৬২৮ সালে জানুয়ারি মাসে বিয়ে করেন। তখন তিনি বাইশ বছরের সৌন্দর্যময়ী নয়নন্দন তরুণী।

(৯) উম্মে হাবিবা (মৃত ৬৬৫) আবু সুফিয়ানের কন্যা এবং ওবাইদুল্লাহর স্ত্রী। ওবাইদুল্লাহ আবিসিনিয়াতে মৃত্যুবরণ করেন ৬২৮ সালে। প্রফেট তাকে বিবাহ করতে মনস্থ করেন ইদ্দত কাল শেষ হওয়ার পর, আবিসিনিয়ার শাসকের সম্মুখে 'প্রক্সি' দিয়ে এ বিবাহ সম্পন্ন হয়। উম্মে হাবিবা প্রফেটের সাথে মদিনায় যোগ দেন ৬২৮ সালেই। তখন তার বয়স পঁয়ত্রিশ। ফাতিমার সাথে এর সখ্য গড়ে ওঠে।

(১০) সাফিয়ার প্রফেটের সাথে বিবাহ হয় যখন তিনি ইহুদি অবস্থান খাইবার দখল করেন। আয়েশার সাথে সখ্য গড়ে ওঠে। মারা যান ৬৭২ খ্রিস্টাব্দে।

(১১) মায়মুনা, হারিথের কন্যা, উম্মুল ফজলের বোন ও আব্বাসের (প্রফেটের চাচা) শালি। শিষ্ট স্বভাবের বিধবা মহিলা। ছাব্বিশ বছর বয়স। প্রফেট ৬২৯ সালে মক্কায় হজের সময় মায়মুনাকে বিবাহ করেন। প্রফেটের মৃত্যুর পর বেঁচে ছিলেন, বিরাশি বছরে মারা যান। 'আল্লাহর তরবারি' খালিদ ইবন ওয়ালিদের খালা বা ফুপু অর্থাৎ আন্টি।

৬.৯ আয়েশা

৬২১ খ্রিস্টাব্দে হিজরতের পূর্বে প্রফেট মোহাম্মদ সাত বছরের এক বালিকার সাথে বাগদত্ত হন। আয়েশা আবু বকর ও তার স্ত্রী উম্মে রুমানার কন্যা। প্রফেট মোহাম্মদের সাথে যোগসূত্র মজবুত করার জন্য জুবের ইবন মোতাম নামক এক যুবকের সাথে বাগদান ছিন্ন করেন প্রফেটের স্থান করার জন্য। জুবেরের পিতামাতা প্যাগন ছিলেন, এই সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ায় তারা খুশিই হয়েছিল। কারণ তারা ভয় করেছিলেন বিয়ের পর হয়তো তার সন্তান মুসলমান হয়ে যাবে।

৬২৩ সালে হিজরাতের ন'মাস পরে আয়েশার বয়স হলো ন'বছর। সূত্র মতে, তখনো সে পুতুল নিয়ে খেলত। এই ন'বছর বালিকার সাথে ৫২ বছরের প্রফেট বিবাহ-মিলন সম্পূর্ণ (consummate) করেন। আয়েশা একমাত্র কুমারী স্ত্রী এবং তাদের দাম্পত্য জীবনে কোনো সন্তান আসেনি। খাদিজার মৃত্যুর পর আয়েশা প্রফেটের প্রিয়তমা পত্নী হিসাবে ছিল প্রফেটের মৃত্যু পর্যন্ত। তাঁর ঘরেই বুকে মাথা রেখে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

আয়েশার বর্ণনা মতে, প্রফেট মোহাম্মদ যখনই কোনো কারণে বা অভিযানে মদিনার বাইরে যেতেন তিনি লটারি করতেন তার সাথে কোন স্ত্রী যাবে। ৬২৭ খ্রিস্টাব্দে বানু মুস্তালিকের বিরুদ্ধে অভিযানকালে তিনি আয়েশাকে সাথে নেন। পরের মাসে ফিরে আসার সময়, মদিনা পৌঁছবার মুখে একস্থানে বিশ্রাম গ্রহণ করেন। কাকভোরে, আয়েশা একটু অন্ধকার থাকতে, তার হাওদা ছেড়ে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে যান এবং এই সময়ে তার অজান্তে গলার হার পড়ে যায়। যখন ফিরে এলেন তখন লোকেরা যাত্রা করার জন্য তাঁবু গোটাতে শুরু করেছে। এই সময়ে তিনি গলায়

www.pathagar.com

হাত দিয়ে বুঝতে পারেন হার কোথাও পড়ে গেছে। তিনি ফিরে গিয়ে মরুর বালুতে খুঁজতে শুরু করেন এবং শেষে পেয়েও যান।

তাঁবুর কাছে ফিরে এসে দেখেন যে তাদের কাফেলা তার হাওদাসহ উঠে গেছে কিন্তু কারোর নজরে পড়েনি যে তিনি নিজের হাওদায় নেই। তিনি নিজেকে তার চাদরে জড়িয়ে নিয়ে অপেক্ষা করতে থাকেন, এই আশায় যে হয়তো তাকে না দেখে কেউ ফিরে আসবে তাকে নিতে। ইত্যবসরে ঐ দলের অন্য একটি গ্রুপের এক তরুণ সদস্য সাফওয়ান ইবন মোযাত্তাল (সোলাইম গোত্র) পেছনে আসছিলেন। আয়েশাকে দেখে প্রফেটের স্ত্রী বলে চিনতে পারলেন সাফাওয়ান, তাই তার উটকে আয়েশার সামনে বসিয়ে চড়তে বলেন। আয়েশা উটের পিঠে উঠে বসলে সাফওয়ান উটের রশি ধরে হাঁটা শুরু করেন। আয়েশা কোনো কথা না বলে চুপচাপ ছিলেন, কিন্তু মুখে পর্দা ছিল, শরীর ছিল চাদরাবৃত্ত।

পরের দিন সকালে মদিনাতে মূল পার্টির সাথে যখন দেখা হয়, আয়েশা তখন ঘটনার বিবৃতি দেন; কিন্তু লোকেরা এর অন্য অর্থ করে আয়েশার চরিত্রের বিরুদ্ধে গুজব ছড়ানো শুরু করে। হামনা বিনত জাহাশ, প্রফেটের স্ত্রী জয়নাবের বোন, এমনও অভিযোগ তুলল যে আয়েশা ও সাফাওয়ান অনেক দিন ধরেই একে অন্যকে চেনে এবং এর পূর্বেও তাদের মধ্যে এ ধরনের ঘটনা ঘটেছে। আয়েশার বিরুদ্ধে অপবাদকারীদের মধ্যে ছিল আব্দুল্লাহ ইবন ওবেই, খাজরাজ গোত্র প্রধান এবং প্রফেট মোহাম্মদের নিয়োগকৃত কবি হাসান বিন থাবিত। প্রফেট মোহাম্মদের জামাতা আলী (ফাতিমার স্বামী) প্রফেটকে বলেন মেয়ের কি অভাব আছে। ওকে ত্যাগ করে নতুন একটা গ্রহণ করুন।

এই স্ক্যান্ডালে প্রফেট হতচকিত হয়ে ভীষণভাবে বিমর্ষ হয়ে পড়েন এবং পরবর্তীতে কী করবেন ভেবে পান না, তবে আয়েশা থেকে দূরে সরিয়ে রাখেন নিজেকে; কিন্তু তাঁর এই ক্ষণ বিচ্ছেদের ভার তাঁর সহ্যের বাইরে চলে যায়। তারপর এক মাস গত হলে তিনি ওহি পান (২৪ ঃ ১১) যেখানে আয়শাকে সন্দেহাতীতভাবে নির্দোষ বলা হয় এবং এই ঐশী নির্দেশে অপ্রীতিকর অবস্থার নিষ্পত্তি হয়। কিন্তু আর কখনো কোনো ভবিষ্যৎ অভিযানে আয়েশাকে একা সঙ্গে নেননি। গুজব-ছড়ানোকারীদের মধ্যে কয়েকজন পুরুষকে, কবি হাসান ইবন থাবিতসহ, চাবুক মারা হয়; তবে আব্দুল্লাহ ইবন ওবেই-কে তার পদমর্যাদার জন্য ছেড়ে দেয়া হয়।

আয়েশার ঘরটি মদিনা মসজিদের চত্বরের দিকে খোলা ছিল যে চত্বরে প্রফেট কোনো ব্যক্তি বা দলের সাথে সামাজিক এবং রাজনৈতিক আলোচনা করতেন। এই কারণে কি আলোচনা হয় বা বিষয়বস্তু কি, সে সম্বন্ধে আয়েশার জানতে অসুবিধা হতো না। বিশ্বাস করা হতো যে আয়েশা এই সব আলোচনার বিশেষ করে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক প্রশ্ন জড়িত থাকলে তার সারাংশ তার পিতা আবু বকরকে অবহিত করতেন যাতে তার রাজনৈতিক জীবনকে এগিয়ে নিতে সাহায্য করত।

এটা আরো বলা হয়েছে যে আয়েশা তার প্রতি প্রফেটের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে প্রফেটের মতামতকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করতেন। প্রফেটের হেরেমের মধ্যে দুটি প্রধান দল ছিল যা একে অপরের সাথে তিক্ত-শত্রুতা বিরাজ করত। একটা দলের নেতৃত্ব দিতেন আয়েশা, তার সাথে ছিলেন ওমরের কন্যা হাফসা আর প্রফেটের ইহুদি

www.pathagar.com

স্ত্রী সাফিয়া। অন্যটির নেতৃত্বে ছিলেন প্রফেটের কন্যা ফাতেমা, সাথে ছিলেন উম্মে সালমা আর উম্মে হাবিবা।

আল-বোখারী, ইবন হানবাল এবং ইবন সাদ-এর মতে প্রফেট মোহাম্মদ, আয়েশা কাছে থাকলে, অনুপ্রাণিত হতেন, বেশি ওহি পেতেন এবং এই অনুপ্রাণিত ওহি নিয়ে রচিত সূরার সংখ্যা বেশিই হতে পারে। যখন উম্মে সালমা আয়েশার প্রতি পক্ষপাতিত্বের কারণে প্রফেটের কাছে অভিযোগ করেন তখন সে-অভিযোগ নাকচ করে বলেছিলেন— আয়েশা সম্বন্ধে আমাকে বিরক্ত করো না। সেই একমাত্র স্ত্রী যে সাথে থাকলে আমি যে কোনো ওহি পেতে পারি।

এটাও গুরুত্বপূর্ণ যে, ২০০০ বেশি হাদিস আয়েশা দ্বারা বর্ণিত এবং যদিও জ্ঞানী পণ্ডিতদের দ্বারা তার বেশির ভাগ হাদিস বাতিল হয়েছে তবুও ১৭০-র বেশি হাদিস সত্য বলে গৃহীত এবং বলা হয় যে প্রফেট স্বয়ং নিজেই তাঁর বাণী আয়েশাকে দিয়েছিলেন।

তরুণী পত্নী হিসাবে আয়েশা প্রফেট মোহাম্মদ ও তাঁর শিক্ষার গতিকে বেশ ভালোভাবেই বুঝতে ও আয়ত্ত করতে পেরেছেন। একটা ট্রাডিশন আছে যে, মদিনা থেকে বাইরে গেলে তাঁর অবর্তমানে তিনি তার অনুসারীদের নির্দেশ দিয়ে যেতেন এই বলে যে, যদি কোনো ধর্মীয় সমস্যা উত্থাপিত হয় তাহলে আয়েশার মতামত নিতেন। (Armstrong, 1991 P. 240)

প্রফেট যখন মারা যান তখন আয়েশার বয়স আঠারো বছর এবং তিনি যেমন বুদ্ধিমতী ছিলেন তেমনি সুন্দরী, কিন্তু অন্য স্ত্রীদের মতো তিনিও কোরানের বিধান মতে দ্বিতীয় বিবাহ করতে পারেননি। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি তাঁর রাজনৈতিক জীবনে বড় সক্রিয় ছিলেন। তিনি তৃতীয় খলিফা ওসমান ও চতুর্থ খলিফা আলীর বিরুদ্ধাচরণ করেছেন এবং প্রফেটের মৃত্যুর পঁচিশ বছর পর তিনি আলীর বিরুদ্ধে উটের যুদ্ধে তার মিত্রদের নিয়ে যুদ্ধরত ছিলেন।

৬৭৮ খ্রিস্টাব্দে ৬৪ বছর বয়সে অজানা এক রোগে মারা যান। নাবিয়া এবট তার শেষ অসুখের বিবরণ পড়ে বলেন যে, আত্মিক বিজয় বা স্বর্গীয় অনুভূতির কোনো চিহ্ন তিনি রেখে যাননি, যা একজনের বিস্ময়ের উদ্রেক করে। সত্যি, তিনি বলতেন তার জন্ম না হলেই ভালো হতো এবং তিনি আশা করতেন, বিস্মৃতির তলে তলিয়ে যেতে। তিনি নির্দিষ্টভাবে বারণ করেছিলেন, তার সমাধি যেন প্রফেটের পাশে না হয়; মদিনার বাইরে বাকি সমাধি ক্ষেত্রে তাকে সমাহিত করা হয়।

৬.১০ জয়নাব বিনত জাহাশ

শুধু আয়েশার ব্যাপারটা নিয়ে তৎকালীন মুসলিমদের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়নি; আরও একটি ঘটনা এর আঠারো মাস পূর্বে ঘটেছিল, যে-ঘটনা কম আলোড়ন সৃষ্টি করেনি। এ ঘটনাটি ছিল প্রফেটের ফুপাতো বোন জয়নাব বিনত জাহাশের (ওবাইদুল্লাহ ইবন জাহাশের বোন) সাথে প্রফেটের বিবাহের ব্যাপারটি। জয়নাব সে সময়ে প্রফেটের পালিত পুত্র (দত্তক পুত্র) জায়েদ বিন হারিথের বৈধ স্ত্রী।

প্রফেট মোহাম্মদ তাঁর সাহাবী ও অনুসারীদের সাবধান করেছিলেন তারা যেন

www.pathagar.com

কারোর অবর্তমানে তার গৃহে পদার্পণ না করে। ৬২৬ সালে আগস্ট মাসে তিনি নিজেই জায়েদের গৃহে গমন করেন এবং জায়েদকে অনুপস্থিত দেখে ফিরে আসার জন্য তৈরি হন তখন, তারাবী বর্ণনায়, তিনি হঠাৎ জয়নাবকে মনোহর মূর্তিতে (ravishing) দেখতে পান। জয়নাব তখন স্বল্পবাসে আবৃত ছিলেন। তিনি দৃষ্টি ফিরিয়ে নেন। কিন্তু জয়নাবের রূপমাধুর্যে মুগ্ধ হয়ে আর একবার সেদিকে তাকিয়ে মুগ্ধকণ্ঠে বলে ওঠেন— সব প্রশংসা আল্লাহর যিনি মানুষের হৃদয় তার ইচ্ছামতো পরিচালিত করেন। পরে সকলকে সাবধান করে দেন, কোনো নারীর প্রতি দ্বিতীয়বার দৃষ্টি না দিতে, প্রথম দৃষ্টি ধর্তব্যের মধ্যে নয়, তবে দ্বিতীয় দৃষ্টি নিষিদ্ধ।

তাৎক্ষণিকভাবে ঘরে ফিরে এসে তিনি তার পঞ্চম পত্নী জয়নাব বিনত খোজাইমার সাথে শয্যা গ্রহণ করেন। একটি হাদিসে আছে প্রফেট বলেছেন : যখন কোনো রমণীকে দেখে তুমি আকৃষ্ট হও, তৎক্ষণাৎ ঘরে ফিরে স্ত্রী সহবাস করবে; কারণ সেই নন্দিত নারীর যা আছে, তোমার স্ত্রীরও তাই আছে। (Mernissi, 1975 P. 11)।

জয়নাব বিনত জাহাশ মেজাজকুট্টি মহিলা ছিলেন। তিনি এক সাবেক ক্রীতদাসের সাথে তার বিবাহ কোনো মতেই মেনে নেননি। তার স্বামী (জায়েদ) ফিরে এলে ঘটনা বিবৃত করেন এবং প্রফেট মোহাম্মদ তাকে সে অবস্থায় দেখে যা বলেছিলেন তা-ও ব্যক্ত করেন। প্রফেটকে আকৃষ্ট করেছে জেনে, জয়নাব তার স্বামীকে শান্তিতে থাকতে দেননি যতক্ষণ পর্যন্ত জায়েদ তার সাথে সম্পর্ক ছেদ করে প্রফেটের সাথে বিবাহের জন্য তালাক না দেয়।

চার মাসকাল ইদ্দত পালনের পর প্রফেট মোহাম্মদ জয়নাব বিনত জাহাশকে বিবাহ করেন ২৭ মার্চ ৬২৭ খ্রিস্টাব্দে জয়নাবের বয়স যখন বত্রিশ বছর যখন তিনি প্রফেটের সপ্তম স্ত্রী হয়ে হেরেমে প্রবেশ করেন। তিনি মারা যান ৬৪১ সালে।

পালিত পুত্রের স্ত্রীর সাথে বিবাহ আরব রীতি মতে নিষিদ্ধ এবং যেমন ইবন হিশাম বলেন, এই ঘটনা আরবে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে এবং মদিনার মুসলিম সম্প্রদায় সাধারণ মানুষ নিন্দিত করে এই বলে যে এই বিবাহ অজাচার তুল্য।

কিন্তু সমস্যার সমাধান হয় যখন প্রফেট মোহাম্মদ একটি বিশেষ নির্দিষ্ট ওহি পেলেন, যা কোরানে বিধৃত, "...অতঃপর জায়েদ যখন জয়নাবের বিবাহ সম্পর্ক ছিন্ন করিল, তখন আমি তাহাকে তোমার সহিত পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করিলাম। আল্লাহ যখন অনুমতি দিয়াছেন, প্রফেটর কোনো দোষ দেয়া যায় না। পরে জয়নাব গর্ব করে বলতেন যে প্রফেটের সাথে তার বিবাহ আল্লাহর আদেশেই হয়েছে এবং এর ঘটক আল্লাহ নিজেই (who was her match-maker)। এই গর্বিত উক্তি আয়েশার বিরক্তির কারণ হতো। এই ওহিকে উল্লেখ করে আয়েশা প্রফেটের কাছে বক্রোক্তি করতেন এই বলে যে 'আপনার প্রভু আপনার ইচ্ছা মিটাতে খুব তড়িঘড়ি সিদ্ধান্ত দেন।'

৬.১১ মেরি দ্য কপ্ট

প্রফেটের বৈধ স্ত্রী ছাড়াও তার দু'জন উপপত্নী ছিল। একজন রায়হানা যাকে প্রফেট ৬২৭ সালে ঘরে এনেছিলেন ইহুদি গোত্র কোরাইজা নিধনের পর। অন্যজন ছিল মেরি দ্য কপট (মারিয়া কিবতিয়া) দু'জন খ্রিস্টান ক্রীতদাসের মধ্যে একজন যাদের ৬২৮

www.pathagar.com

সালে মিশরের গভর্নর প্রফেটের কাছে পাঠিয়েছিলেন।

মেরি সুন্দরী ছিল এবং তার মাথার চুল ছিল কোঁকড়ানো। এই মহিলার কাছে প্রফেট দিনে-রাতে ঘন ঘন যাতায়াত করতেন। একবার হাফিসা মেরি ও প্রফেটকে একসঙ্গে ধরে ফেলেন। হাফিসা শুধু তার নিজের কামনায় তার বিছানায় যুগলবন্দি দেখেননি, ঐ দিনটি ছিল আয়েশার পালার দিন।

প্রফেট হাফসাকে অনুরোধ করেন এ ঘটনা আয়েশার কানে না তুলতে, এই শর্তে যে তিনি আর কোনো দিনই মেরির সঙ্গ হবেন না। হাফসা রাজি হন, কিন্তু ব্যাপারটি আয়েশার কাছে ব্যক্ত করায় সারা হেরেমে স্ক্যান্ডেল ছড়িয়ে পড়ে। এতে প্রফেট স্ত্রীদের কাছে, হেরেমের নিয়ম ভঙ্গের কারণে, শীতল আচরণ পেতে থাকেন।

মেরির সঙ্গে পুনর্মিলনের অঙ্গীকার থেকে মুক্ত হবার জন্য (কারণ তিনি মেরির সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন) তিনি এই ওহি পেলেন– "হে নবী আল্লাহ তোমার জন্য যাহা বৈধ করিয়াছেন, তুমি তাহা নিষিদ্ধ করিতেছে কেন? তুমি তোমার স্ত্রীদের সন্তুষ্টি চাহিতেছ? আল্লাহ তোমাদের কসম হইতে মুক্তি লাভের ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং আল্লাহ তোমাদের কর্ম বিধায়ক" (৬৬ ঃ ১-২)।

হাফসা ও আয়েশা মেরির সঙ্গলাভের ও তার কাছে যাওয়ার কারণে প্রফেট মোহাম্মদকে খোঁচা দিতে থাকেন, এতে প্রফেট ধৈর্য হারা হয়ে তাদের তালাক দিবেন বলে ধমকি দেন এবং আবার ঐশী নির্দেশে তাদের সাবধান করে বলেন যে, যদি তিনি তাদের পরিত্যাগ করেন আল্লাহ তাকে এর পরিবর্তে তাদের চেয়ে উৎকৃষ্ট কুমারী, তালাকপ্রাপ্ত ও বিধবা মহিলা দান করবেন (৬৬ ঃ ৫)।

এই সাবধান বাণীতে তাঁর স্ত্রীরা চুপ করে গেলেন, কিন্তু প্রফেট স্থির করলেন যে, মেরিকে এদের কাছ থেকে সরিয়ে মদিনার অন্য কোনো কোয়ার্টারে আলাদাভাবে রাখার বন্দোবস্ত করলে ভালো হয়। সেই ব্যবস্থা হলো এবং প্রফেট সেভাবেই আলাদাভাবে মেরির সাথে মিলিত হতে থাকলেন। মেরির প্রতি অত্যধিক আকর্ষণের কারণে তাঁর কাছে অন্য কেউ গেলে তিনি ঈর্ষান্বিত হতেন। কিন্তু যখন গুজব ছড়াল যে তার কাজিন মাবুর নিয়মিত মেরির বাসায় যাতায়াত করে, তখন তিনি আলিকে পাঠান বিষয়টি তদন্ত করতে। আলি যখন দেখলেন মাবুব মেরির বাড়ির দিকে যাচ্ছে, তখন তিনি নাঙ্গা তলোয়ার নিয়ে তাকে তাড়া করেন। মাবুর দৌড়ে পালায়, কিন্তু এক পর্যায়ে হোঁচট খেয়ে মাটিতে পড়ে যায় প্রায় উলঙ্গ অবস্থায় তখন আলি দেখতে পান যে মাবুরের পুরুষাঙ্গ নেই। আলি খাপে তলোয়ার ভরে প্রফেট মোহাম্মদকে ঘটনা জানালে তিনি আল্লাহকে ধন্যবাদ দেন এবং মাবুরকে ডেকে নির্দেশ দেন খবরদার কখনো মেরির সাথে আর দেখা করবে না।

৬৩০ খ্রিস্টাব্দে এপ্রিলে মেরি এক পুত্র সন্তানের মা হয়, প্রফেট যার নাম রাখেন ইব্রাহীম (আব্রাহাম)। এই নামের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ছিল। কিন্তু ৬৩২ সালে জানুয়ারি মাসে, আংশিক সূর্যগ্রহণ কালে, ১৫ মাসের মাথায় শিশু ইব্রাহিম মারা যায়। এতে প্রফেট গভীর শোকে আচ্ছন্ন হন।

তাঁর প্রথম স্ত্রী খাদিজা এবং মেরি দ্য কপ্‌ট প্রফেট পরিবারের এই দুই মহিলা, সন্তান ধারণ করেছিলেন। মেরি, প্রফেটের মৃত্যুর প্রায় পাঁচ বছর পর মারা যায়।

www.pathagar.com

৬.১২ হেরেম সঙ্কট

প্রফেট মোহাম্মদ যখন মধ্য পঞ্চাশে তখন থেকেই তার হেরেমের স্ত্রীদের মধ্যে সমস্যা শুরু হয় এবং তাঁর বয়স যখন ষাট বছরে পৌঁছে তখন সঙ্কট চরম অবস্থা ধারণ করে এবং তাঁর আয়ত্তের বাইরে চলে যায়। তাঁর নতুন স্ত্রীদের মধ্যে কেউ কেউ একজন গত-যৌবন স্বামীর সাথে সন্তোষজনক বিবাহিত জীবনের স্বাদ থেকে বঞ্চিত ছিল, স্বামীর মর্যাদা বা প্রতিপত্তি যা-ই হোক না কেন। কথিত যে, পুরানো স্ত্রীরা নতুনদের এমনভাবে সলাপরামর্শ দিত, যাতে নববধূরা স্বামীর বাহু বন্ধন এড়িয়ে যেত। এই অবস্থায় একটি কোরানিক আয়াত প্রযোজ্য– "আমি তোমাদের কাছ থেকে আল্লাহর আশ্রয় কামনা করি" (১৯ ঃ ১৮)। কত বার তিনি এই আয়াতের শরণাপন্ন হতেন, তা জানা যায়নি (এবট, ১৯৮৫ পৃ. ৬২)।

প্রফেট মোহাম্মদের বর্ধিত হেরেম, তাঁর বয়সের কারণে ক্ষমতা হ্রাস ইত্যাদির কারণে তিনি তাঁর স্ত্রীদের নিরপেক্ষভাবে সন্তুষ্ট রাখতে সমর্থ ছিলেন না, যেমন আল্লাহ বলেছেন প্রত্যেক স্ত্রীর সাথে সমান আচরণ বাঞ্ছনীয় (৪ ঃ ৩)। মেরি ছাড়া তাঁর আরো কয়েকটি প্রিয় পত্নী ছিলেন– যেমন আয়েশা এবং এর কিছু কম ডিগ্রিতে ছিলেন উম্মে সালমা এবং জয়নাব বিনত জাহাশ। এই অবস্থায় আর একটি 'ওহি' তিনি পান যেখানে তাঁকে স্ত্রীদের প্রতি নিরপেক্ষ হতে রেহাই (exempt) বা অব্যাহতি দেয়া হয় (৩৩ঃ ৫১)।

তাঁর স্ত্রীরা তাঁকে প্রায় নানান অভিযোগে ও দাবিদাওয়া পেতে ব্যতিব্যস্ত করে তুলত। স্ত্রীদের মধ্যে তার সাথে 'পালার' অধিকার নিয়ে বা রাত বরাদ্দ নিয়ে ঝগড়াঝাঁটি লেগেই থাকত। তারা তাদের মর্যাদা ও স্ট্যাটাস নিয়েও ঝগড়া করত। তাঁর হেরেমে স্ত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি ও তাদের সাথে স্বল্প সময় দিয়ে সঙ্গ লাভের জন্যও বিরক্তি প্রকাশ করত। দাম্পত্য জীবনযাত্রারও অন্যান্য সন্তুষ্টি থেকে বঞ্চিত হয়ে তারা বেছে নিল আরাম আয়েশের জীবন, ভালো পোশাকপরিচ্ছদ ও বিলাসিতা; এতে হেরেম সঙ্কট তীব্র আকার ধারণ করে।

মেরির সাথে মিলনে বাধা পেয়ে যে সমস্যার উদ্ভব হয় এতে প্রফেটের ধৈর্যচ্যুতি ঘটে এবং অবস্থা এমন অসহ্য হয়ে দাঁড়ায় যে তিনি সব স্ত্রী থেকে নিজেকে আলাদা করে ফেলতে বাধ্য হলেন; তখন আবার ওহি এলো। আল্লাহ বল্লেন : তোমার স্ত্রীদের দুইটি চয়েসের মধ্যে একটাকে বেছে নিতে বল : তারা তোমার সাথে থাকবে, না সম্মানজনকভাবে তালাক গ্রহণ করবে (৩৩ ঃ ২৮)।

তালাকের ধমকির গুজব ছড়িয়ে পড়লে সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে মারাত্মক অবস্থা সৃষ্টি হয়, কারণ তালাক দিলে স্ত্রীদের পরিবারের সাথে ও গোত্র সম্পর্কে– আবু বকর (আয়েশার পিতা), ওমর (হাফজার পিতা) এবং খালিদ ইবন ওয়ালিদ (মায়মুনার ভাইপো) চিড় ধরতে পারে। তাই, চিন্তা করা হয় যে কিছু কম ক্ষমতাসম্পন্ন স্ত্রীকে তালাক দেয়া যেতে পারে, কিন্তু ঠিক হলো আয়েশা এবং আরো আট জন তার সাথে রয়ে যাবেন (Watt, 1961, P. 226)।

স্ত্রীদের এই আচরণের সূত্র ধরে, ঐ সময় প্রফেট মোহাম্মদ বেশ কয়েকটি ওহি পান যাতে স্ত্রীদের স্বাধীনতা সীমিত করে দেয়া হয়। তিনি চাইলেন না যে তাঁর স্ত্রীরা সেই স্বাধীনতা ভোগ করবে, যে স্বাধীনতা ইসলাম-পূর্ব আমলে মেয়েরা ভোগ করত

www.pathagar.com

(৩৩ ঃ ৩৩)। আল-বাইদাবী বর্ণনা করেছেন যে প্রফেট মোহাম্মদ তাঁর হেরেমের মহিলাদের জন্য অন্দর মহলের পুরুষ থেকে আলাদাভাবে থাকার ব্যবস্থা চালু করতেন যদি তিনি কখনো মেহেমানদারির সময় দেখতে পেতেন যে পরিবেশন করার সময় তার তরুণী স্ত্রী আয়েশার হাত কোনো অতিথির হাত স্পর্শ করেছে।

তবুও অন্য একটি ওহিতে বলা হয়েছে যে ঘরের লোকজন ছাড়া বাইরের পুরুষের সাথে প্রফেটের স্ত্রীদের পর্দার পেছনে ছাড়া সম্মুখ কথাবার্তার অনুমতি দেয়া হয়নি, কারণ এতে প্রফেট অস্বস্তি বোধ করতেন (৩৩ ঃ ৫৩)। প্রফেটের স্ত্রীদের মধ্যে কেউ স্পষ্টত কোনো অশ্লীল কর্ম করলে তারা দ্বিগুণ শাস্তি পাবে (৩৩ ঃ ৩০) কিন্তু যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে মান্য করবে দ্বিগুণভাবে পুরস্কৃত হবে এবং বেহেশতে সম্মানজনক স্থান লাভ করবে (৩৩ ঃ ৩১); এবং তারা অন্য মহিলাদের মতো নয় (৩৩ ঃ ৩২)।

ইবন সা'দ তার এক হাদিসে বর্ণনা করেছেন, তালহা ইবনে ওবাইদুল্লাহ (আবু বকরের কাজিন)কে বলতে শোনা গেছে যে তিনি, প্রফেট মারা গেলে, আয়েশাকে বিবাহ করবেন। প্রফেট মোহাম্মদ একথা শুনে ভাবতে শুরু করেন তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর সুন্দরী স্ত্রীদের কপালে কি ঘটবে। এরপরই তিনি ওহি পান এই মর্মে যে তাঁর মৃত্যুর পর কেউ তার স্ত্রীদের বিবাহ করতে পারবে না। (৩৩ ঃ ৫৩)। এই নিষিদ্ধকরণকে আরো মজবুত করার জন্য তাদের মর্যাদা দেয়া হয় 'মোমেনগণের মাতা' বলে। (৩৩ ঃ ৬)।

এক কাহিনীতে বলা হয়েছে যে প্রফেটের বিধবা বলে এক মহিলাকে আবু জাহেলের পুত্র ইকরাম বিবাহ করেছে। এই সংবাদে মুসলিমদের মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি হয় এই কারণে যে সংবাদ সত্যি হলে প্রফেটের স্মৃতির অবমাননা করা হবে। কিন্তু আবুবকর বিষয়টি সামাল দেন এই বলে যে ঐ মহিলার সাথে প্রফেটের বিবাহ ছিন্ন হয় এবং তাদের মধ্যে মিলন হয়নি (had not actually been consummated)।

প্রাক-ইসলামী যুগের সাথে তুলনা করলে প্রফেট মোহাম্মদ মহিলাদের স্বাধীনতা অনেক খর্ব করে দিয়েছেন এবং অনেকেই মনে করেন যে মহিলাদের মর্যাদা, অন্দরবাস, পর্দা এবং সাধারণ আচরণের জন্য যে মুসলিম বিধান বা আইন তৈরি হয়েছে তার বেশিরভাগই নির্ধারিত হয়েছে প্রফেটের প্রবীণ বয়সকালে তার তরুণী স্ত্রীদের সাথে অভিজ্ঞতা অর্জনের ফলশ্রুতি হিসাবে।

৬.১৩ হোদায়বিয়ার সন্ধি

কোরেশীদের প্রতিবাদের আধিক্যকে উপলব্ধি করার জন্য প্রফেট মোহাম্মদ মক্কায় হজ করতে মনস্থ করেন। তাই ৬২৮ খ্রিস্টাব্দে মার্চ মাসে সাথে ১৪০০ লোকজন নিয়ে মদিনা থেকে যাত্রা করেন। কোরবানির জন্য পশুও সাথে নেন।

মক্কার মধ্যপথে, আরওয়াতে তিনি থামেন এবং মা আমেনার কবর জেয়ারত করেন। আল-বাইদাবী বলেন যে প্রফেট তাঁর মায়ের আত্মার মুক্তির জন্য আল্লাহর অনুমতি প্রার্থনা করেন কিন্তু একটা ওহির মাধ্যমে তার প্রার্থনা নামঞ্জুর হয়। তারপর প্রফেট আবার মক্কাভিমুখে যাত্রা শুরু করেন।

যখন মক্কাতে তার আগমন সংবাদ পৌছাল। কোরেশীরা তাদের সিদ্ধান্তে অটল রইল। তারা প্রফেট মোহাম্মদের উত্তরোত্তর ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং বাণিজ্য পথে ক্যারাভান

www.pathagar.com

নিয়ন্ত্রণ করার মধ্যে তার বারগেনিং ক্ষমতার সম্বন্ধে অবহিত ছিল। তারা জানত যে তাঁর সাথে শত্রুতা করতে গেলে তিনি মক্কাবাসীর বাণিজ্যের সম্ভাব্য ক্ষতি করতে পারেন। কিন্তু অন্য দিকে তারা স্থির সিদ্ধান্ত নিল মক্কা নগরীতে প্রবেশ করতে দিবে না এবং তাঁকে এ ধারণাও দেওয়া হবে না যে যখন ইচ্ছা তিনি মক্কায় এসে বড় হজ ছোট হজ করতে পারবেন। তাই মক্কাবাসীরা আশপাশের গোত্র প্রধান ও তাদের লোকবল নিয়ে নগরের বাইরে বাধা দেওয়ার জন্য সশস্ত্র প্রস্তুতি গ্রহণ করল।

এ সম্বন্ধে পূর্বে সংবাদ পেয়ে প্রফেট মোহাম্মদ প্রধান সড়ক ছেড়ে মক্কার সাত মাইল দূরে হোদাইবিয়ায় ক্যাম্প গাড়লেন। মক্কাবাসীদের পক্ষ থেকে প্রফেটের কাছে দূত পাঠানো হলো এই সংবাদ জানিয়ে যে যদিও তারা শান্তির বার্তা সাথে নিয়ে হজ করতে এসেছে, তবুও তাদের মক্কা নগরীতে হজ পালন করতে দেয়া হবে না। এই দূতালির মধ্যে আবু সুফিয়ানের জামাতা তায়েফের প্রধান ওরওয়া কাটখোট্টা মানুষ ছিল। সে বলে বসল যে, মক্কাবাসীরা তোমাদের আবর্জনা শহরে ঢুকতে দিতে রাজি নয়। এই বলে সে প্রফেটের দাড়ি ধরতে চেষ্টা করে। কিন্তু তাঁর (প্রফেটের) দলের সদস্যরা তাকে বাধা দেয়।

প্রফেট মোহাম্মদ তখন মক্কাতে তাঁর দূত পাঠাতে সিদ্ধান্ত নিলেন। তাঁর প্রথম দূতের সাথে মক্কানরা দুর্ব্যবহার করে। তখন প্রফেট ওমরকে পাঠাতে মনস্থ করলেন, কিন্তু ওমর এই বলে রাজি হলেন না যে সেখানে তাকে বিপদের হাত থেকে রক্ষা করার কেউ নেই। তখন আবু সুফিয়ানের কাজিন ওসমান যেতে রাজি হন।

যখন কয়েক ঘণ্টা অতিবাহিত হলো এবং ওসমান ফিরলেন না তখন সকলের ধারণা হলো যে তাকে মেরে ফেলা হয়েছে। তখন প্রফেট মোহাম্মদ নিজের নিরাপত্তার জন্য চিন্তিত হন। এই অবস্থায় প্রফেট সিদ্ধান্ত নেন, যদি মক্কাবাসীরা আক্রমণ করে তাহলে শেষ পর্যন্ত তাঁরা লড়াই করবেন। এই সিদ্ধান্ত তিনি আকাশিয়া বৃক্ষের নিচে (৪৮ ঃ ১৮), তাঁর অনুসারীদের শপথ ও প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেন এই মর্মে যে, তারা শেষ প্রাণীটি পর্যন্ত তাঁকে রক্ষা করতে বদ্ধপরিকর। এই শপথ 'বৃক্ষের নিচে শপথ' বলে বিখ্যাত হলো ইসলামের ইতিহাসে। [একে 'বায়াতে রেদওয়ান'ও বলা হয়—অনুবাদক]

দেখা গেল ওসমান নিরাপদে ফিরে এসেছেন। তিনি এসে বললেন কোরেশীরা দুই পক্ষের মধ্যে একটা সন্ধি করতে চায়। কোরেশীদের প্রতিনিধিরা এলে এদের নেতৃত্ব দেন সোহাইল ইবন আমর।

প্রফেট মোহাম্মদ তাঁর জামাতা আলীকে ডাকলেন এবং সন্ধির শর্ত ডিকটেট করতে শুরু করলেন। প্রথমে 'বিসমিল্লাহ আর রাহমান আর রহিম' বলেই সোহেল বাধা দিলেন, তিনি বললেন, 'রহমান' বলা যাবে না আল্লাহর নাম বলে, কারণ তিনি এ নামে আল্লাকে (God) চেনেন না। তাই রহমান নাম বাদ দেয়া হলো এবং প্রফেট আবার ডিকটেশন শুরু করলেন : এই সন্ধি মোহাম্মদ 'রসূলুল্লাহ' ও কোরেশদের মধ্যে বলতেই সোহেল আবার বাধা দিয়ে বললেন যে, 'মোহাম্মদ ও আল্লাহর রসূল এটা ধারণা মাত্র এবং গ্রহণযোগ্য নয়। শুধু আপনার ও আপনার বাবার নাম লিখুন।' আল-বোখারী ও মুসলিম ইবন আল-হাজ্জাজ উভয়েই হাদিসে বলেন যে, প্রফেট মোহাম্মদ

www.pathagar.com

তখন আলীর হাত থেকে কলম নিয়ে 'রসূলুল্লাহ' কেটে দিয়ে নিজের হাতে লেখে দেন 'আবদুল্লাহর পুত্র'।

সন্ধির শর্ত মতে, দশ বছরের জন্য শান্তি বজায় থাকবে। যদি কোনো মক্কান প্রফেটের দলে চলে যায়, তাহলে তাকে মক্কাতে ফেরত পাঠাতে হবে। কিন্তু কোনো মুসলিম মক্কায় চলে গেছে, তাহলে কোরেশরা তাকে মদিনায় ফেরত পাঠাতে বাধ্য নয়।

হজ সম্বন্ধে শর্ত হলো : মুসলিমদের এখন মদিনায় ফিরে যেতে হবে, কিন্তু পরের বছর তারা ফিরে আসতে পারে ছোট হজ (ওমরা) করার জন্য। তারা মক্কায় মাত্র তিন দিন থাকতে পারে। তারা আসবে খাপের মধ্যে তরবারি বন্ধ রেখে। এই লজ্জাজনক শর্তের কারণে প্রফেটের দলে অনেকেই অপমানিত বোধ করেন। প্রফেট তাদের শান্ত হতে বলেন, কিন্তু ওমর প্রফেটের সাথে একমত না হয়ে, শুধু গুম্‌রে গুম্‌রে চুপ করে থাকলেন। আল-ওয়াকাদি লিখেছেন– ওমর পরে বলেছিলেন প্রায় ১০০ জন মুসলিম তার মতে মত দিলে ইসলাম পরিত্যাগ করতে প্রস্তুত ছিলেন। (Andrae, 1990 P. 160)।

প্রফেট মোহাম্মদ এবং তাঁর পার্টি সাথে যেসব পশু এনেছিলেন, সেগুলোকে হোদাইবিয়াতে কোরবানি দিয়ে মদিনায় ফিরে গেলেন। ফেরার পথে আল্লাহর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে ঘোষণা করেন যে হোদায়বিয়ার সন্ধিতে বিজয় সূচিত হলো। (৪৮ ঃ ১)।

৬.১৪ বহির্দেশে যোগাযোগ

নিজের অবস্থানকে আরো শক্ত করতে প্রফেট মোহাম্মদ আরবের অন্যান্য গোত্রের সাথে সম্পর্ক গড়তে আগ্রহী হলেন। উদ্দেশ্য ছিল সিরিয়ার দিকে বাণিজ্য পথে নিরাপত্তা নিশ্চয়তা করা। ৬২৮ সালে শরৎকালে তিনি কয়েকটি গোত্রের সাথে যোগাযোগ করে চুক্তি সই করেন— বিশেষ করে খ্রিস্টানদের সাথে– যেমন দক্ষিণ প্যালেস্টাইনে জুদহাশ এবং সিরিয়াতে কাল্‌ব গোত্র।

একই সময়ে, প্রফেট মোহাম্মদ সিদ্ধান্ত নেন তাঁর প্রফেটহুডকে যতদূর সম্ভব ঘোষণা দিয়ে ছড়িয়ে দিতে হবে এবং এই মর্মে আরবের বড় বড় রাজ্য প্রধানকে যেমন ইয়ামামা, ওমান ও বাহরাইনের রাজাদের পত্র দিয়ে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দিতে হবে।

ওমান ও বাহরাইনের জবাবে কোনো মন্তব্য ছিল না; কিন্তু ইয়ামামার খ্রিস্টান হানিফা গোত্রের প্রধান হওদা ইবন আলী মধ্য আরাবিয়ার ক্ষমতাধর ব্যক্তি ছিলেন। তিনি তাঁর জবাবে লিখেন : ঐশীবাণীটা খুবই চমৎকার যার দ্বারা আমাকে দাওয়াত দেয়া হয়েছে। আমাকে আপনার অংশের ভাগীদার করলে আমি আপনার প্রতিষ্ঠানে যোগ দিতে পারি। এই জবাব পেয়ে প্রফেট মোহাম্মদ হওদাকে অভিশাপ দেন। ফলে কথিত আছে পরের বছরেই হওদা মৃত্যুবরণ করেন।

বিদেশী শাসকদের কাছেও ঐ দিন পত্র পাঠানো হয় ইসলামে দীক্ষা নিতে। বলা হয় যে, রোমের (রুম) সম্রাট হেরাক্লিয়াস ঐ দাওয়াতপত্র পড়ে দেখেন যে তাকে যিশু ও মেরিকে পূজা না করে মোহাম্মদের মিশন গ্রহণ করতে বলা হয়েছে; এতে তিনি পাগলের প্রলাপ বলে পত্রটি ছুড়ে ফেলে দেন। ঐতিহাসিকরা বলেন যে বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের অধিকাংশ রাজ্য মুসলিম সেনারা কিছুদিন পরেই অধিকার করে নেয়।

www.pathagar.com

ঘাসানের খ্রিস্টান গোত্রের যুবরাজ প্রথম হারিথকে অনুরূপ পত্র দিয়ে ইসলামে দীক্ষা নিতে বলা হয়। তখন হারিথ সিরিয়ায় বসরাতে বাইজানটাইন গভর্নর ছিলেন। এখানে যে দূতকে পাঠানো হয়েছিল তাকে পাগলের প্রতিনিধি বলে দরবার থেকে বের করে দেয়া হয়। পরের বছর হারিথ মারা যান এবং ঐতিহাসিকদের মতে, তার রাজ্য অচিরেই মুসলিম রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

পারস্যে দ্বিতীয় খসরুর কাছে প্রফেটের পত্র পৌঁছিবার আগেই খসরু মারা যান; কিন্তু তার উত্তরাধিকারী দ্বিতীয় কোবাদ চিঠির বক্তব্য পড়েই ছিঁড়ে টুকরো করে দেন। যখন এই সংবাদ প্রফেটের কাছে পৌঁছে তখন আল্লাহ্‌র কাছে আবেদন করেন— 'হে আল্লাহ্ তার রাজ্য বিদীর্ণ করে দাও।' তাই হয়েছিল।

মিশরের রোমান গভর্নর (মুকাও কিস) প্রফেটের দূতকে সম্মানের সাথে অভ্যর্থনা জানান এবং চিঠির বন্ধুসুলভ একটি জবাব প্রেরণ করেন, আর নিয়মমতো দুটি খ্রিস্টান ক্রীতদাসী উপহার। এদের মধ্যে মারিয়া কিবতিয়া (মেরি)কে প্রফেট নিজে বেছে নেন এবং অপরটি তাঁর কবি হাসান ইবন থাবিতকে উপহার দেন।

আবিসিনিয়ার রাজা নেগাসকে যে পত্র দেয়া হয় ভদ্রভাবে তিনি তাঁর স্বীকৃতি দেন। তাঁর নিজের বিবেচনা মতে নেগাস বিশ্বাস করতেন যে প্রফেটের নতুন ধর্ম খ্রিস্টান ধর্মের প্রকৃতি। প্রফেট মোহাম্মদ নেগাসের কাছে তাঁর দ্বিতীয় পত্রে অনুরোধ করেন যে তাঁর নিকট আশ্রয় প্রার্থী বাকি মুসলিমদের (প্রায় ষাট জনের মতো) মদিনাতে যেন পাঠিয়ে দেয়া হয়।

পশ্চিমা ঐতিহাসিকরা প্রফেট মোহাম্মদকে এই সব সরকারি পত্রের (missives) কাহিনীকে অতি সামান্যই গুরুত্ব দিয়ে থাকেন এবং তিনি যে বিদেশী সম্রাটদের ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে দাবি জানিয়েছিলেন তার সামান্যই মূল্যায়ন করেছেন। এইসব চিঠি পত্রের ও তার জবাবের যেসব কপি মুসলিম ঐতিহাসিকরা রক্ষণ করেন তার অধিকাংশেরই গ্রহণযোগ্যতা নেই (apocryphal)। এসব ঐতিহাসিকরা এই পত্রগুলির বিরুদ্ধে বিবরণ দিয়ে থাকেন কারণ এদের তারিখ, প্রেরণের সময় এবং প্রাপকদের নাম এমনকি পত্রের বিষয়বস্তু ও শব্দ গঠনের সঙ্গতিপূর্ণতার অভাব রয়েছে। প্রফেট মোহাম্মদের তখনকার অবস্থার সাথে তার দাবি সামঞ্জস্যহীন।

যে সময় এসব পত্র বিলি করা হয়েছিল বলে ধরা হয়, তখন প্রফেট মোহাম্মদের ক্ষমতা মদিনার বাইরে অতি নগণ্য ছিল। এমনকি তখনো তিনি মক্কাকে তাঁর করতলগত করতে পারেননি। তখন তাঁর পক্ষে কোনো স্বাধীন নৃপতিকে ইসলাম গ্রহণ করার মতো দাবি জানানোর অবস্থা ছিল না এবং বাস্তবে এ ধরনের পদক্ষেপ নেয়ার মতো ক্ষমতা ছিল না। তিনি হয়তো ঐ সব নৃপতির কাছে নিকট সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য বন্ধুভাবে পত্র (Friendly letters) লিখে থাকবেন। এ-ও হতে পারে আরবের যে অংশে তিনি রাজ্য স্থাপন করেছেন তার বিবরণ দিয়ে, তার বিরুদ্ধে মক্কানদের আক্রমণাত্মক আচরণের জন্য সাহায্য চাইতে পারেন। মিশর ও আবিনিসিয়া থেকে যে নম্র জবাব পেয়েছিলেন তাতে এই বোঝানো হয়েছে যে এর বেশি তারা কিছু করতে পারবে না।

ঐসব ঐতিহাসিক সরকারি পত্রের কাহিনী মনে হয়, ৬২৯ খ্রিস্টাব্দে ট্র্যাজিক

www.pathagar.com

পরাজয়কে খণ্ডন (counter) করার উদ্দেশ্যে লেখা হয়ে থাকবে। অবশ্য এই পত্রগুলোর প্রভাবে প্রফেটের মৃত্যুর দশ বছর পর মুসলিম সেনাবাহিনীকে অনুপ্রেরণা জোগাতে পারে।

৬.১৫ ওমরা হজ

৬২৯ খ্রিস্টাব্দে ফেব্রুয়ারি মাসে প্রফেট মোহাম্মদ দু'হাজার অনুগামীদের নিয়ে মক্কায় ওমরা হজ করতে যান। আগের বছরে হোদায়বিয়ার সন্ধির শর্ত মতে, কোরেশ বাহিনী মক্কা শহর ত্যাগ করে আশপাশের পর্বতের ধারে তাঁবু স্থাপন করে।

প্রফেট মোহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা কাবাঘরে সাতপাক দিয়ে সাফা ও মারওয়াতে সাতবার দৌড়াদৌড়ি করেন এবং সাথে যেসব পশু এনেছিলেন তাদের কোরবানি হয়।

মক্কায় থাকাকালে প্রফেট তাঁর গোত্র হাশেমীদের সাথে একটা সমঝোতা করার চেষ্টা করেন। আগেকার গোত্র প্রধান তাঁর চাচা আবু লাহাব মারা যান ৬২৪ সালে। তখন গোত্র প্রধান ছিলেন তার আর এক চাচা আব্বাস। তিনি ছিলেন একজন ব্যাংকার। মূর্তিপূজারী ও ইসলামের শত্রু আব্বাস বদরের যুদ্ধে প্রফেট মোহাম্মদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন; পরবর্তীতে তিনি নিরপেক্ষ ভাব ধারণ করেন।

এখন ভাইপোর ক্ষমতার উর্ধ্বগতি দেখে আব্বাস ইসলাম গ্রহণ করতে সম্মতি জ্ঞাপন করেন। এই নতুন সম্পর্ককে গাঢ় করার জন্য প্রফেট মোহাম্মদ তার চাচি উম্মুল ফজল (আব্বাসের স্ত্রী)-এর বোন মাইমুনাকে বিবাহ করলেন। এর কিছুক্ষণ পরে মহান সেনাপতি খালিদ ইবন ওয়ালিদ, প্রফেটের নতুন স্ত্রী মায়মুনার ভাইপো, ইসলাম গ্রহণ করলেন এবং মুসলিম সেনাবাহিনীতে যোগ দিলেন।

বন্ধুভাব প্রদর্শন করে, প্রফেট মোহাম্মদ মক্কাবাসীদের জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি মক্কা শহরে আরো কিছুদিন থাকতে পারবেন কিনা, যাতে তিনি তার নতুন বিবাহের ওয়ালিমা সম্পন্ন করতে পারেন। কিন্তু মক্কানরা অভদ্রতার সাথে তাকে জবাব দেয় যে তারা তাঁর কাছ থেকে কোনো ভোজের আশা করে না। পরে তাঁকে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয় যে, শর্তমতে তিন দিন অতিবাহিত হয়েছে সুতরাং তাদের শহর পরিত্যাগ করা দরকার।

আব্বাস মক্কায় রয়ে গেলেন প্রফেট মোহাম্মদের ফেলে আসা কাজগুলো সম্পন্ন করার জন্য, এই আব্বাসের বংশধররা পরে ৭৫০ সালে খলিফা হয়েছিল।

৬.১৬ অভিযানসমূহ

মার্চেন্টদের ক্যারাভানের ওপর আক্রমণের সাথে সাথে প্রফেট প্রতিবেশী গোত্র ও শহরের বিরুদ্ধে অনেকগুলো অভিযান চালান। ৬২৪ এবং ৬২৮ সালের মধ্যে তিনি তখন ক্ষমতাধর ইহুদি সম্প্রদায়ের ওপর বিজয় শেষ করে তার দৃষ্টি আরও বড় বিজয়ের দিকে নিক্ষেপ করেন।

যাই হোক, আরব গোত্রদের বিরুদ্ধে তার বেশির ভাগ অভিযান ৬২৯ খ্রিস্টাব্দে (হিজরি সপ্তম বছর) তুঙ্গে ওঠে এবং শেষ হয় পরাজয়ের মধ্যে। ফেব্রুয়ারি মাসে

www.pathagar.com

একটি মুসলিম দলকে পাঠানো হয় ফাদাকের দিকে বানু মুরার বিরুদ্ধে, কিন্তু মুসলিম দলের একজনও বাঁচেনি, সকলেই নিহত হয়। কয়েক মাস পরে প্রফেট মোহাম্মদ মুরারকে পরাজিত করে প্রতিশোধ গ্রহণ করেন। এপ্রিল মাসে বানু সোলাইম-এর বিরুদ্ধে একটি মুসলিম বাহিনী প্রেরিত হলে তারা বিধ্বস্ত হয়। দলের সকল সদস্যের হত্যা করা হয়, শুধু দলপতি কোনো রকমে প্রাণ নিয়ে পালাতে সক্ষম হয়। জুন মাসে বানু লায়েদের বিরুদ্ধে মক্কার পথে এক অভিযান করা হলে, তারা অধিকাংশ হত হয়, বাকিরা যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়।

জুলাই মাসে প্রফেট মোহাম্মদ সিরিয়ার বর্ডারের কাছে ধাত আতলাতে এক বাহিনী প্রেরণ করেন এবং তাদের লোকদের মুসলিম হতে বলা হয়। এর জবাবে তারা অনবরত তীর বর্ষণ করে মুসলিম বাহিনীকে বিব্রত করে, মুসলিম বাহিনী ঘুরে যুদ্ধেরত হলে সকলেই মারা পড়ে, মাত্র একজন বেঁচে গিয়ে যুদ্ধের কাহিনী বর্ণনা করে।

৬২৯ খ্রিস্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে প্রফেট মোহাম্মদ ঘাসান যুবরাজদের কাছে তাঁর প্রতিনিধি পাঠালেন। ফিরে আসার পথে সেই প্রতিনিধিকে বেদুইন গোত্র মেরে ফেলে, ফলে প্রফেটের পালিত পুত্র জায়েদ ইবন হারিথের অধীন একটি মুসলিম ফোর্স পাঠানো হয়, পরে পাঠানো হয় খালিদ ইবন ওয়ালিদকে। তারা বাইজানটাইন ফ্রন্টিয়ার পর্যন্ত অগ্রসর হয়, সেখানে তাদের সাথে খ্রিস্টান ও প্যাগন সেনাবাহিনীর সাথে মোকাবেলা হয় এবং মুতার যুদ্ধে মুসলিমদের ভীষণভাবে পরাজয় ঘটে এই যুদ্ধে জায়েদ ইবন হারিথ, আলীর ভাই জাফর এবং যোদ্ধা কবি আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা অন্যদের সাথে মারা পড়ে।

মুসলিম বাহিনীতে যারা বেঁচে ছিল তাদের নেতৃত্ব দিয়ে খালিদ ইবন ওয়ালিদ মদিনায় ফিরে এসে উপহাসের পাত্র হন। মদিনার লোকেরা তাদের ঢিল মেরে ধিক্কার দেয় যুদ্ধ ক্ষেত্র ছেড়ে পালিয়ে আসার জন্য। শেষমেশ প্রফেট ক্রুদ্ধ লোকজনদের বুঝিয়ে ঠাণ্ডা করেন এবং তাদের বলেন যে মুতার যুদ্ধে যারা শহীদ হয়েছে তাদের তিনি বেহেশতের বারান্দায় গদি-আঁটা আসনে হেলান দিয়ে বসে থাকতে দেখেছেন।

[৬৩২ সালে জুলাই মাসে অবশ্য মুতা যুদ্ধের পরাজয়ের প্রতিশোধ নেওয়া হয় প্রফেটের মৃত্যুর কয়েক সপ্তাহ পরে। যখন জায়েদ ইবন হারিথ এবং উম্মে আইমানের পুত্র ও সামা মুতা প্রান্তরে অভিযান চালিয়ে সেখানকার সব কিছু ধূলিতে মিশিয়ে দেন। বহু লোককে হত্যা করা হয় এবং যারা বেঁচে ছিল তাদের বন্দি করে আনা হয়।]

সামরিক অভিযান ৬৩০ ও ৬৩১ সাল পর্যন্ত চলেছিল। জোট বাহিনীর মধ্যে যে যোদ্ধা ও অফিসাররা অংশ নিয়েছিল, তারা এই লাগাতার অভিযানের কারণে বেশ অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে। এদের অনেকেই প্রফেটের আদেশ পালনে অসম্মতি জানায়। যারা অংশগ্রহণ করেছিলেন সেনাবাহিনীতে অসম ব্যবহারের কারণে বিক্ষুব্ধ হয়। অনেকেই অপ্রয়োজনীয় ও লম্বা মার্চিং-এর জন্যও বিরক্ত হয়; বিশেষ করে যুদ্ধের মালেগণিমতের (booty) অন্যায্য ভাগাভাগির জন্যও ক্ষুব্ধ হয়।

একবার এক ঘটনায় সেনাবাহিনীর জোয়ানরা প্রফেট মোহাম্মদকে ঘিরে ধরে এবং মালেগণিমতে ন্যায় অংশ পাওয়ার জন্য হৈচৈ শুরু করে দেয়। এমন বন্য ব্যবহার তাঁর সাথে তারা করেছিল যার ফলে তাঁর ম্যানেটল (জোব্বা) খুলে নেয় এবং পোশাক

www.pathagar.com

ছিঁড়ে দেয়। বাধ্য হয়ে তাঁকে একটি বৃক্ষের নিচে আশ্রয় নিতে হয়। মদিনায় ফেরার পথে, প্রফেটকে পাহাড়ের উপর থেকে ফেলে দিয়ে হত্যা করার মতলবও করে (Rodinson, 1976 p. 277)।

এই সব দুর্ভাগ্যজনক ঘটনার জন্য প্রফেট মোহাম্মদ ভবিষ্যতে আর কোনো অভিযানে নেতৃত্ব না দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। যুদ্ধে ব্যক্তিগতভাবে সর্বশেষ অংশগ্রহণ হয় ৬৩০ সালে অক্টোবর মাসে তাবুকের যুদ্ধে যেখানে তিনি খ্রিস্টান গোত্রদের সাথে একটি সন্ধি সম্পাদন করেন।

৬.১৭ মক্কা বিজয়

মুতা যুদ্ধে পরাজয়ের কিছু সময়ের পর কোরেশ-মিত্রদের সাথে মুসলিমদের মারপিট শুরু হয়ে যায়। প্রফেট মোহাম্মদ এই সব গণ্ডগোলকে হোদায়বিয়ার সন্ধির শর্তভঙ্গের কারণ হিসাবে গণ্য করে, গোপনে গোপনে সুযোগ খুঁজতে থাকেন মক্কার সাথে হোদায়বিয়ার দশ বছর মেয়াদের চুক্তি যাতে ভেঙে যায়। হোদায়বিয়ার চুক্তির মেয়াদ তখন মাত্র দু'বছরের কম অতিবাহিত হয়েছে। ৬২৮ খ্রিস্টাব্দে হোদায়বিয়া যাত্রার পর ৬২৯ সালে ওমরা হজ পালন করে তিনি বুঝতে পারেন যে মক্কার পক্ষে একটা বিরাট বাহিনীকে আর মোকাবেলা করার ক্ষমতা নেই; তাই তিনি মক্কা অভিযানের প্রস্তুতি নিতে শুরু করেন।

কোরেশরা আবু সুফিয়ানকে প্রফেটের সাথে আলোচনা করার জন্য পাঠায়। বৃদ্ধ আবু সুফিয়ান প্রথমে তার কন্যা উম্মে হাবিবার (প্রফেটের স্ত্রী) সাথে দেখা করেন এবং তার (কন্যার) হস্তক্ষেপ কামনা করেন। কিন্তু উম্মে হাবিবা তার কথায় কান দিলেন না, এমনকি তার ঘরে আবু সুফিয়ানকে বসতেও বললেন না। ঘরে যে কার্পেট পাতা ছিল সেটাকে গুটিয়ে রাখা হলো। আবু সুফিয়ান কন্যাকে উদ্দেশ্য করে বলে ওঠেন, 'প্রিয় কন্যা আমার, হয় কার্পেটটি আমার জন্য উপযুক্ত নয়, কিংবা আমি কার্পেটের উপযুক্ত নই।' কন্যা জবাবে বললেন, 'পিতা, এটা প্রফেটের কার্পেট এবং তুমি একজন অবিশ্বাসী (unbliever)।' বাবা ক্ষুব্ধ হয়ে মন্তব্য করলেন : 'সত্যিই বেটি, আমাকে ছেড়ে আসার পর তুমি গোল্লায় গেছ।'

আবু সুফিয়ান যখন প্রফেট মোহাম্মদের সাথে দেখা করলেন রাস্তাতে এবং কথা বলার জন্য থামলেন, প্রফেট তাকে না দেখার ভান করে পাশ কাটিয়ে চলে গেলেন। প্রফেটের সাথে সাক্ষাৎলাভে বিফল হয়ে আবু সুফিয়ান তার উটে উঠলেন এবং মক্কায় ফিরে গেলেন।

৬৩০ খ্রিস্টাব্দে জানুয়ারি মাসে, প্রফেট মোহাম্মদ মক্কাভিমুখে দশ হাজার সেনা নিয়ে যাত্রা করলেন, এই বাহিনীতে বেদুইন দলও ছিল। এই বাহিনী তাঁবু গাড়লো মক্কা শহর থেকে একদিনের যাত্রা পথ দূরে। মক্কাবাসীরা আতঙ্কিত হলো এই ভেবে যে তাদের শহর দখল হতে চলেছে। প্রফেটের চাচা আব্বাস, যিনি প্রফেটের এজেন্ট হিসাবে মক্কাতে বাস করছিলেন, ভাতিজার সাথে দেখা করার জন্য শহর থেকে বের হয়ে এলেন। কিছু পরেই আবু সুফিয়ানও এলেন প্রফেটের সাক্ষাৎ প্রার্থী হতে। পরের দিন সাক্ষাতের বন্দোবস্ত হলো।

www.pathagar.com

মিটিং-এর সময় আবু সুফিয়ানকে জিজ্ঞাসা করা হলো যে তিনি এখন এক আল্লাহ এবং প্রফেট মোহাম্মদ তাঁর রসূল এই কথায় বিশ্বাস করেন কিনা। তখন আবু সুফিয়ানের বয়স প্রায় সত্তরের কাছাকাছি এবং তার চৌদ্দ-পুরুষের ধর্ম পরিত্যাগ করতে অনিচ্ছুক থেকে ইতস্তত করে বললেন– দেখ বাপু তোমার কাব্যের প্রথম অংশটুকু আমি বিশ্বাস করতে প্রস্তুত, কিন্তু দ্বিতীয় অংশটি সম্বন্ধে আমার মনে সন্দেহ আছে।

তার এই মন্তব্য শুনে ওমর তার কোষ থেকে তরবারি বের করে তাকে কতল করার ধমক দিতেই বৃদ্ধ ব্যক্তি অতি ক্ষীণ স্বরে আবৃত্তি করলেন আল্লাহ ছাড়া কোনো প্রভু নেই। তারপর একটু দম নিয়ে যোগ করলেন এবং মোহাম্মদ তাঁর রসূল। পরে তিনি গোপনে আব্বাসের কাছে স্বীকার করেন, 'তোমার ভাইপোটি সত্যি একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হয়ে উঠেছে।'

এরপর আবু সুফিয়ানকে মক্কায় পাঠানো হলো শহরে প্রফেট মোহাম্মদকে গণমাধ্যমের সাথে প্রবেশ করার বন্দোবস্ত করার জন্য। মক্কাবাসীদের আশ্বাস দেয়া হলো যে তাদের জীবন ও সম্পত্তির কোনো ক্ষতি হবে না যারা বশ্যতা স্বীকার করবে। তাদেরকে অস্ত্র পরিহার করে ঘরের মধ্যে থাকতে বলা হলো।

প্রফেট মোহাম্মদ ৬৩০ সালে ১১ জানুয়ারি লোকজন নিয়ে বিজয়ীর বেশে প্রবেশ করলেন। তিনি কাবা দর্শন করলেন, হিজরতের পর দ্বিতীয়বারের মতো ওমরা পালন করেন। তারপর তিনি কাবাঘরে ও তার আশপাশে প্রতিষ্ঠিত ৩৬০টি মূর্তিকে ধ্বংস করার আদেশ দেন। দেয়ালে ও পিলারে যেসব পেন্টিং ছিল সব মুছে ফেলতে বলেন। কাবাঘরের সিলিং থেকে কোরেশদের দেবতা-রূপী একটি কাঠের কবুতরকে তিনি নিজের হাতে ভেঙ্গে দেন।

একই সময়ে প্রফেট তাঁর সেনাপতি খালিদ ইবন ওয়ালিদকে আদেশ দিলেন প্রতিবেশী গোত্রের যত প্যাগন মন্দির আছে সব ধ্বংস করতে। (জাজিমা গোত্রকে বলা হলো, তোমরা বলো যে 'তোমরা মুসলিম' কিন্তু তারা বলল 'আমরা সাবিয়েন'। এতেই খালিদ পুরো গোত্রকে হত্যা করেন)।

প্রফেট মোহাম্মদ পরে তাঁর প্রথম স্ত্রী খাদিজার কবর জিয়ারত করলেন; তারপর সাফাতে গিয়ে একটা পাথরের ওপর বসলেন। এখানে পূর্বে একটি প্যাগন মূর্তি ছিল, কোরেশরা যার পূজা করত। সব মূর্তি ও মন্দির ধ্বংস করার পর প্রফেট, পূর্বে যারা তার বিরুদ্ধতা করেছিল, তাদের সাথে নমনীয় ভাব দেখালেন এবং সম্মিলিত জনতার উদ্দেশ্যে তিনি আশ্বাসের বাণী দিয়ে তাঁর আনুগত্য গ্রহণ করতে বলেন।

যখন তিনি মক্কায় মহিলাদের উদ্দেশে বলেন, তখন তাঁকে বারে বারে বাধা দেয়া হয় এবং প্রশ্নবাণে বিদ্ধ করা হয়। বিশেষ করে একজন মহিলা চিৎকার করেই যাচ্ছিল, থামছিল না। তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করা হলে সে বলে তার নাম হিন্দা আবু সুফিয়ানের স্ত্রী। সেই বিখ্যাত মহিলা যে অন্যান্য মেয়েদের সাথে দাঁড়িয়ে ওহুদের যুদ্ধে কোরেশদের উৎসাহিত করেছিল। সে-যুদ্ধে প্রফেটের পরাজয় হয়েছিল। প্রফেটের বিরুদ্ধে আবু সুফিয়ানের তীব্র বিরোধিতা প্রকাশ নিয়ে তার স্ত্রী হিন্দার আচরণে, তার অপমানকর উক্তির জন্য, শাস্তি দিতে চাইলে, রাজনৈতিক কারণে প্রফেট মোহাম্মদ তাঁর বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ নেননি।

www.pathagar.com

দুই সপ্তাহ শহরে অবস্থানের পর প্রফেট মোহাম্মদ মক্কা পরিত্যাগ করলে মক্কাবাসীরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে।

৬.১৮ তায়েফের পতন

যখন প্রফেট মোহাম্মদ সাথে ১২ হাজার লোকজন নিয়ে মক্কা ত্যাগ করেন, তখন দশ মাইল উত্তর-পশ্চিমে হোনায়েনে এসে তিনি দেখতে পান যে হাওয়াজিন গোত্রের একটি সশস্ত্র ফোর্স তার গতি রোধ করেছে। এই হাওয়াজিনের সাথে তায়েফের তাকিফ গোত্রের একটি কন্টিনজেন্ট যোগ দেয়। তায়েফ দলের সাথে ছিল প্রায় চার হাজার যোদ্ধা। প্রফেট মোহাম্মদের যোদ্ধারা অতি বিশ্বাসী ছিল বিজয়ের জন্য, কারণ সংখ্যার দিক দিয়ে তারা দলে ভারি ছিল; কিন্তু হাওয়াজিনরা এমন প্রবলভাবে আক্রমণ করে যে প্রফেটের যোদ্ধারা পালাতে পথ পায় না। এই ঘটনা কোরানে উল্লেখ করা হয়েছে— সংখ্যাধিক্যের জন্য মুসলিমগণ এবং পরবর্তীতে শত্রুর আঘাতের কারণে পলায়ন (৯ ঃ ২৫) করে।

বিজয়ের জন্য ডাক দিয়ে প্রফেট মোহাম্মদ একমুঠো ধুলো নিয়ে শত্রুর আক্রমণের দিকে ছুড়ে দেন এবং বেশ কষ্ট করে সৈন্যদের আবার যুদ্ধে ফিরিয়ে আনেন। ঐশী সাহায্যের ফলে, মুসলিম সেনা আবার জড়ো হয় এবং ভীষণযুদ্ধের পর মুসলিম সেনারা হাওয়াজিন ও থাকিফ সেনাদের অটাসের উপত্যকা পর্যন্ত তাড়িয়ে নিয়ে যায় এবং শেষমেশ তাদের পরাজিত করে। হোনায়েনের যুদ্ধে মুসলিমদের বিজয় হলেও (১ ফেব্রুয়ারি ৬৩০) এতে উভয় পক্ষে সেনাবাহিনীর অনেক লোক হতাহত হয়।

প্রফেট মোহাম্মদ তখন তায়েফের দিকে ঠেলা মারেন। ৬১৯ সালে এই তায়েফ শহরে তিনি সঙ্গীসহ অপমানিত হয়েছিলেন সে ঘটনা তাঁর মনে পড়ে, তাই প্রতিশোধ নিতে বদ্ধপরিকর হন। সলমন ফার্সিতাকে উপদেশ দেন গুলতি ব্যবহার করতে (পাথর ছুড়ে মারার যন্ত্র Catapult) তখন গুল্তি দিয়ে অপারেশন শুরু হয়। কিন্তু তায়েফ শহরের দেয়াল থেকে তাদের তীরন্দাজরা তীর ছুড়ে যখন প্রফেট বাহিনীর কয়েকজন লোক মেরে ফেলে, তখন গুল্তি বন্ধ করে শহর দখল করার ইচ্ছা পরিহার করেন। এর পরিবর্তে তিনি তায়েফ শহরের বাইরে অবস্থিত ফলের বাগান ও দ্রাক্ষাকুঞ্জ লুণ্ঠন করে ধূলিসাৎ করার আদেশ দেন এবং মদিনা ফেরার পূর্বে এ কাজ সম্পন্ন করা হয়।

মদিনার আশপাশের গোত্ররা যখন প্রফেটের কাছে আত্মসমর্পণ করতে থাকল, তখন তায়েফের তাকিফ প্রধান আরওয়া ইবন মাসুদ মদিনায় এসে প্রফেটের কাছে ইসলাম দীক্ষা নেন। এই আরওয়া আবু সুফিয়ানের জামাতা হোদায়বিয়ার সন্ধির সময় প্রফেটের সাথে দুর্ব্যবহার করেছিলেন। তায়েফে ফিরে তিনি শহরের সব লোকদের নতুন ধর্ম গ্রহণ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে গিয়ে তাদের হাতে তীর বিদ্ধ হয়ে মারা যান।

এর কয়েক মাস পরে, যাই হোক, তায়েফের তাকিফ গোত্র দেখল যে ইসলাম গ্রহণ থেকে তাদের বেশি দিন ঠেকিয়ে রাখা যাবে না; তাই ৬৩০ সালে ডিসেম্বর মাসে ছয় দলের এক প্রতিনিধি মদিনায় গিয়ে প্রফেটের সঙ্গে আলোচনা শুরু করে কী শর্তে ইসলাম গ্রহণ করা যায় তার বিবেচনা করে।

প্রতিনিধি দল প্রস্তাব করল যে তাদের অতি শ্রদ্ধেয় দেবী আল-লাতকে তিন

www.pathagar.com

বছরের জন্য প্রতিষ্ঠিত থাকার অনুমতি দিতে হবে। প্রফেট রাজি হলেন না; তারপর তারা তাদের অনুরোধ কমিয়ে এক বছর, ছ'মাস শেষে এক মাস পর্যন্ত অনুমতি চাইল; কিন্তু প্রত্যেকবারই প্রফেট তাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। পরিশেষে তারা বলে যে আল-লাতের মূর্তি তারা ভাঙ্গতে পারবে না, বাইরের কাউকে দিয়ে ভেঙ্গে দিতে হবে, যাতে তারা এ পাপকর্ম থেকে বেঁচে যায়। প্রফেট আবু সুফিয়ানকে পাঠান তাঁর প্রতিনিধি রূপে তাঁর কর্ম সমাধা করতে। আবু সুফিয়ান মন্দিরের বাইরে দাঁড়িয়ে ভেতরে ঢুকলেন না—পরে পূজনীয় দেবী মূর্তি ভাঙ্গতে অস্বীকার করলেন। তখন একজন মুসলিম এই কাজটি সমাধান করে। মূর্তিটি ভাঙ্গার সময় সারা শহরে মহিলাদের মধ্যে মাতম, রোনা-পিটনা শুরু হয়ে যায়।

পরবর্তীতে তায়েফিরা তাদের ব্যবহারের জন্য বন্যপশু শিকারের জন্য বিখ্যাত বনভূমি ওয়াজ তাদের কাছে রাখার জন্য আবেদন জানালে সে আবেদন মঞ্জুর হয়। আরো অনুমতি দেয়া হলো মুসলিমদের মতো কড়াকড়িভাবে রমজান পালন না করতে, একটু শৈথিল্য দেখানো হলো। কিন্তু তাদের নিজেদের দ্রাক্ষাকুঞ্জের দ্রাক্ষা দিয়ে তৈরি মদ পান করার অনুমতি দেয়া হয়নি।

তায়েফিরা তাদের জন্য নামাজ পড়া থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার অনুমতি চাইলে বলা হয়, যেহেতু এটা ইসলামের পাঁচ স্তম্ভের একটি সুতরাং অনুমতি খারিজ করা হলো। পরিশেষে তারা আবেদন করল নামাজ তারা পড়বে তবে পাছা উঁচু করে সেজদা করাটা অপমানকর সুতরাং সেজদা দেয়া থেকে অব্যাহতি দিতে হবে। এ বিষয়ে যে ট্র্যাডিশন আছে তা পরস্পরবিরুদ্ধ। তাই আসলে কী সিদ্ধান্ত হয়েছিল এ বিষয়ে তা জানা যায়নি (Kister, 1980, XT P. 1)

এক বর্ণনায় বলা হয়েছে, যখন এই দাবি করা হয় তখন প্রফেট মোহাম্মদ নীরব ছিলেন। মনে হচ্ছিল যেন রাজি হবেন। তায়েফিরা আগ্রহভরে প্রফেটের মুখের দিকে চেয়ে জবাবের জন্য অপেক্ষা করছিল। তখন ওমর মনে করলেন প্রফেট এতে রাজি হলে অন্য মুসলিমদের জন্য সেজদা দেয়া অপমানজনক হতে পারে; তাই তিনি সে মুহূর্তে তরবারি তুলে তায়েফ প্রতিনিধি দলকে বলেন– 'তোমরা, হে তাকিফদের দল, প্রফেটের হৃদয়-জ্বালিয়ে দিয়েছ, এখন তোমাদের হৃদয় আল্লাহ জ্বালিয়ে দিবেন" আল-জামাখশারি এ প্রসঙ্গে বলেন তখন তাকিফীরা ওমরকে জবাবে বলে, বাপু হে আমরা তোমার কাছে শুনতে আসিনি, এসেছি প্রফেট মোহাম্মদের কাছে।

বলা হয় কোরানে এ প্রসঙ্গে প্রফেটের ইতস্তত করা এবং ওমরের হস্তক্ষেপের কথা উদ্ধৃত হয়েছে। সংশ্লিষ্ট আয়াত বলছে : 'আমি তোমার প্রতি যাহা প্রত্যাদেশ করিয়াছি তাহা হইতে উহারা পদস্খলন ঘটাইবার চেষ্টা প্রায় চূড়ান্ত করিয়াছিল আমি তোমাকে অবিচলিত না রাখিলে তুমি উহাদের দিকে প্রায় ঝুঁকিয়া পড়িতে তখন তাহারা তোমাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিত (১৭ ঃ ৭৩-৭৫)।' এখানে রডিনসন বলেছেন (1951, P. 170) যে, আয়াতের শেষ বাক্য 'তখন তাহারা তোমাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করত'—এর স্থলে উপস্থাপিত হয়েছে– 'But at the last moment a friend (Omar) reprehended you'—এখানে আয়াত ৭৫-এ আছে– তাহা হইলে অবশ্যই তোমাকে ইহজীবনে দ্বিগুণ ও পরজীবনে দ্বিগুণ শাস্তি অস্বাদন করাইতাম, তখন আমার বিরুদ্ধে তোমার

www.pathagar.com

জন্য কোনো সাহায্যকারী পাইতে না।' এখানে 'সাহায্যকারী' অর্থে ওমর।

এই জন্য প্রফেট মোহাম্মদ জেদ ধরলেন যে তোমাদের (তাকিফী) সেজদা করতে হবে এবং ইবন হিশাম বলেন তখন তাকিফীরা রাজি হয়ে বলে আমরা নামাজ ঐভাবে পড়ব, যদিও এটা অপমানজনক।

প্রফেট ও তাকিফিদের মধ্যে এই চুক্তির কোনো লিখিত রেকর্ড নেই কিন্তু জানা যায় যে, হোদায়বিয়ার সন্ধিরমতো, এখানে 'মোহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ' বলা হয়েছে, 'রসূলুল্লাহ' বলা হয়নি (Rodinson, 1976, P. 270)।

৬.১৯ প্রতিনিধি দলের বছর (Year of Deputations)

হিজরির নবম সাল (৬৩১ খ্রিঃ)-কে প্রতিনিধি দলের বছর বলা হয়। ঐতিহাসিকরা বলেন যে, মূর্তিপূজা ও বহু দেবতাবাদের ওপর প্রফেটের যুদ্ধবিগ্রহের কথা শীঘ্র সারা আরবে ছড়িয়ে পড়ে এবং তার মক্কা দখলই প্রমাণ করে যে, তার ইচ্ছাকে প্রয়োগ করার জন্য তাঁর যথেষ্ট শক্তি রয়েছে।

তাই আরবের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বিভিন্ন গোত্রের দূরবর্তী প্রদেশগুলো থেকেও প্রতিনিধি দল তাড়াতাড়ি প্রফেটের সাথে সন্ধি করে তাঁর দাবি মেনে ও আনুগত্য এনে এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে শান্তি স্থাপনে আগ্রহী হয়ে ওঠে। বলা হয়, তাঁর ব্যক্তিগত ক্ষমতা, তাঁর উক্তির প্রতি বিশ্বস্ততা এবং সরল জীবনযাপনের জন্য বহু গোত্র স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে প্রফেটের জাগতিক ও আধ্যাত্মিক কর্তৃত্বে স্বীকৃতি দিয়ে তাঁর বশ্যতা স্বীকার করে। যারা তাঁর সাথে বিরুদ্ধমত প্রকাশ করার জন্য এসেছিল তারাও তাঁর সাথে আলাপ করে তাঁর মতের স্বীকৃতি দেয়, তাদের আপত্তি করার রাস্তা থাকে না। আর যারা অবন্ধুরূপে ঝগড়া করার জন্য এসেছিল তাঁর সম্মুখে এসে সে মনোভাব দূরীভূত হয়।

আধুনিক পণ্ডিতরা এখন দেখতে পান যে তার সম্বন্ধে এসব প্রশংসনীয় উক্তির সাথে বাস্তবতা ও সত্যতার কিছুটা ভিন্ন রঙ পাওয়া যায়। পরের বছরে যখন প্রফেট মারা যান, আরবের অধিকাংশ অংশ তখনও প্যাগন ও অমুসলিম ছিল। বেশির ভাগ গোত্র প্রফেটের মিশনকে অবজ্ঞা করেছে। কেবলমাত্র নগণ্য কয়েকটি দল প্রফেটের মত গ্রহণ করে এবং বেশ কিছু সংখ্যক গোত্র তার দাবি অগ্রাহ্য করে F. Buhl in. SEI, 1974, P. 403)।

তাঁর অনুসারীদের মধ্যে প্রধানত মদিনা ও মক্কার গোত্রের সদস্যরা এবং কিছু ছড়িয়ে ছিল সিরিয়ার বাণিজ্য পথে এবং নাজরান ও ইয়েমেনের দিকে এবং এদের মধ্যেও কিছু ছিল যারা কতল হওয়ার ভয়ে ও তাঁর অভিযান থেকে নিরাপদে থাকতে অথবা মালেগণিমতে ভাগ পেতে মুসলিমদের দলে ভিড়েছিল।

ধর্মান্তরিত যা হয়েছিল তা শুধু তরবারির ভয়ে, বাস্তবতার বিশ্বাসের কারণে নয়। কারণ প্রফেটের মৃত্যুর পরেই অনেকে ধর্ম ত্যাগ করেছে, বিদ্রোহী হয়েছে, অনেকে প্রফেট বলে নিজেকে ঘোষণা দিয়েছে যাদের পরবর্তী সময়ে দমন করতে হয়েছিল মুসলিম সামরিক অভিযানে।

www.pathagar.com

৬.২০ বিদায় হজ

৬৩২ সালে ২০ ফেব্রুয়ারি প্রফেট মোহাম্মদ মক্কার উদ্দেশ্যে মদিনা ত্যাগ করলেন বড় হজ করার জন্য, যাকে বাৎসরিক হজ বলা হয়। তার সাথে গেলেন সব স্ত্রী ও বিশাল অনুসারীর দল আর কোরবানির জন্য একশত উট। তিনি স্পষ্টভাবেই জানতেন যে এটা তার জীবনের শেষ হজ নয়, তবুও মুফাসসিরগণ বহু হাদিসে বলেছেন যে তিনি এটা জানতেন।

তিনি বিদায় হজ (হজ্জাত-আল ওয়াদা) পালন করলেন ৬৩২ সালে ৯ মার্চ এবং এটা করে হজ পালনে প্রাক-ইসলাম যুগের পদ্ধতিকে অনুমোদন করলেন অনুসারীদের পালন করার জন্য, যার মধ্যে ছিল প্রাচীন ফরমুলা (archaic formula) যেসব প্যাগনরা পালন করত। শুধু কাবা মন্দিরকে পরিষ্কার করা হলো মূর্তিগুলো ধ্বংস করে আর কেবলমাত্র আল্লাহর নামে উৎসর্গ করা হলো। যেসব প্রাচীন নিয়মকানুন ও পদ্ধতি ছিল সবই অপরিবর্তিত থাকল এবং পুরোপুরিভাবে প্যাগন সংস্কারমুক্ত হয়নি।

এই প্রাচীন প্যাগন প্রতীকীগুলোর সাথে কট্টর একেশ্বরবাদ, যা প্রফেট প্রচার করেছিলেন তার সাথে সামঞ্জস্যহীন ছিল এবং এর বিরুদ্ধ মানুষে বিরূপ মন্তব্য করতে ছাড়েনি। ইসলামী যুগের শুরু থেকেই শতাব্দিকালের মধ্য দিয়ে কিছু কিছু মুসলিম বিশেষ করে সুফি রহস্যবাদীরা এসবের বিরুদ্ধে তাদের মন্তব্য প্রকাশ করেছেন, এমন কি এ ধরনের হজ পালনের প্রয়োজন আছে কিনা, সন্দেহ প্রকাশ করেন। কয়েকজন, ওমরসহ, কালো পাথরের পূজাকে ঘৃণ্য অনুষ্ঠান বলে মনে করেছেন।

হজের শেষে প্রফেট মোহাম্মদ বিশাল জনসমাবেশের সম্মুখে ভাষণ দেন আরাফাত পর্বতের শীর্ষে আরোহণ করে যাকে আমির আলী বলেছেন 'পর্বতের ভাষণ' (Sermon of the Mount)— 1965, P. 114)।

প্রফেট শুরু করেন, হে লোক সকল আমার কথাগুলো শোন, কারণ আমি জানি না এ বছর পর আমি ভবিষ্যতে তোমাদের সাথে এইভাবে এখানে মিলিত হব কিনা; কোরানের এক আয়াত দিয়ে ভাষণ শেষ হয়। এই দিনে আমি তোমাদের ধর্মকে পরিপূর্ণ করিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের ধর্ম বলে মনোনীত করিলাম। (৫ ঃ ৫)। তারপর আকাশের দিকে মুখ তুলে তিনি বলেন- 'হে আল্লাহ আমি আমার ভাষণ বিবৃতি করলাম, আমি আমার কাজ সম্পূর্ণ করলাম।'

আধুনিক পণ্ডিতগণ আর একবার এই ভাষণের টেক্সটের সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করে সন্দেহবাদী হয়েছে যে, প্রফেট মোহাম্মদ যখন মক্কায় ছিলেন তখন অনেকের সাথে গোপন আলাপ (private talks) করেছেন এবং জনসভায় ভাষণও দিয়েছেন— সেই সময় তিনি অনেক নির্দেশ ও উপদেশ দিয়েছিলেন। বলা হয় যে, বহু দশক ধরে সেই গণভাষণ ও গোপন আলাপের বিষয়বস্তু (contents) সংগ্রহ করা হয়েছে, গোছানো হয়েছে এবং আলেম ব্যক্তিদের দ্বারা সুশোভিত হয়ে (embellished) শুভ কামনায় আলোচনা (valedictory discouse) আকারে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

এই বিদায় হজের ভাষণে সংক্ষিপ্তকারে বলা হয়েছে- মুসলিমদের সাম্য, সামাজিক ন্যায়বিচার, ধর্মভীরুতা এবং উম্মার ঐক্য সম্বন্ধে। এর সাথে আরো বলা হয়েছে পবিত্র মাসের সাথে জড়িত বিষয় সম্বন্ধে চান্দ্র মাসের ক্যালেন্ডার, সুদ খাওয়ার

www.pathagar.com

অবসান, রক্ত-জড়িত কলহ বন্ধ করা, স্বামী-স্ত্রীর অধিকার, ব্যভিচারের জন্য পাথর ছুড়ে হত্যা, মিথ্যা দাবি যারা করে তাদের ঘৃণা করা, ঈশ্বরের নিন্দাবাদ ও ফেরেশতাদের ওপর বিশ্বাস এবং ক্রীতদাসদের সাথে সদয় ব্যবহার এবং আগামী দিনের আশা ছেড়ে বর্তমান ধারণাকে লালন করা ইত্যাদি।

এই বিদায় হজের পর প্রফেট মোহাম্মদ মদিনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন আর কখনো মক্কাতে ফেরার সুযোগ হয়নি।

৬.২১ প্রফেট মোহাম্মদের মৃত্যু

প্রফেট মোহাম্মদের মৃত্যু সম্বন্ধে অনেক বিবরণ আছে এবং এর বিস্তৃত ব্যাখ্যা যা সুন্নি (অর্থোডকস), আয়েশা, শিয়া (আলীব দল), আব্বাসের দল এবং অন্যান্য মতবাদীরা দিয়েছেন তা একের সাথে অন্যটি মেলে না অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার সাথে।

মৃত্যুর পূর্বে প্রফেট অনেক সময়ে মুসলিমদের মধ্যে অনৈক্য দেখে হতাশ হন এবং বিবদমান গোত্রগুলোকে সংঘবদ্ধ করতে না পেরে তিনি মন্তব্য করেছিলেন, 'আমি তাদের সাথে বসবাস করে দেখেছি যে তারা কখনো ঝগড়া-ফ্যাসাদ বন্ধ করেনি, তারা আমার পোশাক ধরে টানাটানি করেছে, আমার অঙ্গে ধুলো দিয়ে ভরিয়ে দিয়েছে, যতদিন পর্যন্ত আমি আল্লাহর কাছ থেকে বিশ্রাম না পেয়েছি।'

৬৩২ সালের মে মাসের শেষের দিকে মৃত্যুর দশ দিন পূর্বে তিনি তাঁর এক সাহাবীকে সাথে করে বাকি কবরস্থানে গিয়েছিলেন এবং কিছুক্ষণের জন্য কবরের মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিলেন। দলীয় কোন্দল সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন থেকে তিনি মৃতদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন— 'হে কবরবাসীগণ তোমরা নিশ্চয়ই যারা বেঁচে আছে তাদের চেয়ে অনেক সুখে আছো। আমার উম্মাহর মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ, মারামারি-হানাহানি তমসা-তরঙ্গের মতো তাদের ওপর পতিত হচ্ছে এবং তারা অন্ধকারে তলিয়ে যাচ্ছে।

বাকি সমাধি ক্ষেত্র থেকে তিনি বাড়িতে ফিরলেন ভীষণ মাথা-যন্ত্রণা ও জ্বর নিয়ে এবং মায়মুনার ঘরে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন। তাঁর জ্বর এক সপ্তাহের মতো ছিল তার পর তিনি একটু সুস্থ বোধ করলে তিনি তাঁর অনুসারীদের সাথে কথাবার্তা বলেন, যদিও তিনি আবুবকরকে মসজিদে নামাজ পরিচালনা করতে বলেছিলেন। ৬ জুন তিনি আবার জ্বরে আক্রান্ত হন এবং স্ত্রী উম্মে সালমার ঘরে যান– সেখানে তাঁর আরো দুই স্ত্রী আয়েশা ও উম্মে হাবিবা উপস্থিত ছিলেন।

রাতে তাঁর জ্বর বাড়াতে তিনি কাতর হয়ে পড়েন এবং যন্ত্রণায় জোরে গোঙাতে থাকেন; তখন আয়েশা তাঁকে বলেন যে অন্যদের অসুখের সময় তিনি যেভাবে সান্ত্বনা দিতেন, নিজেকেও সেইভাবে সান্ত্বনা দিলে আরাম বোধ করবেন। তিনি বলেন– হে প্রফেট, আমাদের মধ্যে যদি কেউ কেউ অসুখে এই ভাবে গোঙাতো, নিশ্চয়ই আপনি তাকে তিরস্কার (reprimand) করতেন। জবাবে তিনি বলেন, 'তা ঠিক, তবে আমার জ্বর-যন্ত্রণা তোমাদের দুই জনের মতো তীব্র।' তিনি আরো বলেন– যন্ত্রণা ভোগের অর্থ হলো পাপ মোচন (expiation for sin) এবং তার পূর্বে যেসব প্রফেট যন্ত্রণায় ভুগেছিলেন তাদের নাম উচ্চারণ করেন।

www.pathagar.com

পরদিন, ৭ জুলাই তাঁর যন্ত্রণা এতো তীব্র হলো যে তিনি জ্ঞান হারালেন, উম্মে সালমা প্রস্তাব করলেন আবিসিনিয়ার রেসিপি অনুযায়ী গাছ-গাছড়ার মূল বেঁটে তার রস খাওয়ানো হোক এবং তা-ই করা হলো। এই রস পান করার পর একটু জ্ঞান ফিরলে তিনি সন্দেহ প্রকাশ করে বলেন— 'তোমরা আমাকে কী খাইয়েছ? এবং রাগান্বিত হয়ে বলেন— ঐ ওষুধ আমার সামনে এই ঘরে যারা আছ সকলেই খাও। মৃত্যুপথযাত্রী প্রফেটের সম্মুখে তখন সকলেই গ্রহণ করলেন।

তখন মেয়েদের মধ্যে কথাবার্তা ফিরে দাঁড়াল আবিসিনিয়ার ওষুধ থেকে খোদ আবিসিনিয়াতে। উম্মে সালমা এবং উম্মে হাবিবা উভয়েই সে দেশে নির্বাসনে ছিলেন। তারা সেখানকার সুন্দর মারিয়া ক্যাথিড্রালের কথা এবং তার দেয়ালে আঁকা সুন্দর সুন্দর ছবির কথা উল্লেখ করলেন। তাদের একথা শুনতে পেয়ে প্রফেট মোহাম্মদ চিৎকার করে বলে উঠলেন– 'আল্লাহ ইহুদি ও খ্রিস্টানদের ধ্বংস করুক, আল্লাহর আগুন তাদের বিরুদ্ধে জ্বলে উঠুক। এই আরব দেশে ইসলাম ছাড়া আর কোনো ধর্ম যেন না থাকে।' প্রফেট মোহাম্মদের এই নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালিত হয়েছিল প্রফেটের মৃত্যুর পর তার উত্তরাধিকারী খলিফা– বিশেষ করে আবুবকর ও ওমর। আরব দেশের ইহুদি-খ্রিস্টানরা সম্পূর্ণরূপে বিতাড়িত হয়েছিল।

পরের দিন সকালে সোমবার ৮ জুন 'ঐ অভিযুক্ত রমণী' শিয়ারা যেমন তাঁকে সব সময়েই বলে থাকে, প্রফেটকে তার ঘরে নিয়ে যাবার জন্য তাঁকে বোঝালেন, তিনি রাজি হলেন। আয়েশার দাবি ছিল ৮ জুন তার পালার তারিখ, যদিও এ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। গুজব ছিল যে, প্রফেট তার ঘরে যাবার পর, আয়েশা প্রফেটের ঘনিষ্ঠ হয়ে তাকে প্রভাবিত করতে লাগলেন যাতে তার মৃত্যুর পর আয়েশার পিতা আবু বকর খলিফা হতে পারেন।

এই সময়ের মধ্যে প্রফেটের কয়েকজন সাহাবা (সঙ্গী) সেই ঘরে প্রবেশ করেন। শিয়াদের মতে, প্রফেট মোহাম্মদ ইচ্ছা করেছিলেন তাঁর পরে আলী খলিফা হবে এবং যদিও তিনি দিন দিন দুর্বল হয়ে যেতে থাকেন, তবুও তিনি কলম ও কালি নিয়ে আসতে বললেন তাঁর উত্তরাধিকারী সম্পর্কে লিখে যাবার জন্য। ইবন আব্বাস এই ঘটনা সম্বন্ধে বলে গেছেন এবং বর্ণনা করেছেন আল-বোখারী ও মুসলিম ইবন আল-হাজ্জাজ। ট্র্যাডিশন বলে যে, ওমর ভয় করলেন হয়তো প্রফেট আলী সম্বন্ধে লিখতে পারেন, ওমর-আলীর চেয়ে আবুবকরকে পছন্দ করতেন তাই তিনি যারা কালি-কলম আনতে গিয়েছিলেন তাদের ডেকে পাঠান। তিনি তাদের ডেকে বললেন, ওগুলো এখন রাখো; দেখছ না প্রফেট ভুল বকছেন জ্বরের ঘোরে, এ বিষয়ে কোরান আমাদের জন্য যথেষ্ট' (Hughes, 1977 P. 386)।

অন্যরা জেদ করল কালি-কলম নিয়ে আসতে; এতে উভয় পক্ষের মধ্যে কথা কাটাকাটি, গোলমাল শুরু হলো মরণাপন্ন প্রফেটের বিছানা ঘিরে। যতক্ষণ না প্রফেট বিরক্ত হয়ে তাদের চুপ করতে বলেন। তিনি বললেন আমার সামনে ঝগড়া করো না, আর কিছু বলতে পারলেন না, শুধু বললেন খিলাল নিয়ে এসো। তাকে খিলাল দেয়া হলে মুখ তুলে দাঁত পরিষ্কার করলেন। তারপর তিনি আবার শুয়ে পড়লেন।

প্রফেট মোহাম্মদ মারা গেলেন প্রায় বাষট্টি বছর বয়সে, আঠারো বছরের তরুণী

www.pathagar.com

স্ত্রী আয়েশার বুকে মাথা রেখে। আয়েশা যেমন বলেন : প্রফেট আমার দুই বাহুর মধ্যে মারা যান। তাঁর মাথা ছিল আমার বুকে, সে দিন আমার পালা ছিল, এতে আমি অন্য কারোর সাথে অন্যায় করিনি।

প্রফেটের মৃত্যুর সংবাদ মদিনাতে সাথে সাথে প্রচার হয়ে গেল। শোকাহত মুসলিমরা দিকহারা হয়ে পড়ল। এক সমসাময়িক ব্যক্তি উল্লেখ করেছেন 'বৃষ্টির রাতে ভেড়ার দলের মতো'। কেউ কেউ তাঁর হঠাৎ মৃত্যুর জন্য উদ্বিগ্ন হলেন। প্রফেট নিজেই কোনো দিন চিন্তা করেননি যে তিনি এমনি হঠাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হবেন। তিনি অনেক পরিকল্পনা করেছিলেন এবং আর একটা অভিযানের জন্য তৈরি হচ্ছিলেন।

মানুষ এ কথা বিশ্বাস করতে পারছিল না, কেমন করে প্রফেট হঠাৎ মারা গেলেন? তাঁর কাছে মৃত্যুর পূর্ব সংবাদ আসেনি কেন? কেন আল্লাহ তাঁর রসূলকে ওহি পাঠিয়ে সাবধান করেননি? কেমন করে তিনি অশোভন (unedifying) ভাবে যুবতী স্ত্রীর বুকে ও কোলে শুয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে পারেন? কেমন করে তিনি কোনো পুত্র সন্তানকে উত্তরাধিকারী হিসাবে না রেখে 'পুত্রহীন'ভাবে চলে যেতে পারেন (আবতার) কোরানে যাকে 'স্বর্গীয় শাস্তির চিহ্ন (Sign of divine punishment) বলে গণ্য করা হয়েছে (১০৮ ঃ ৩)। কেমন করে আল্লাহ উত্তরাধিকারীর প্রশ্নটিকে 'সেটেল' না করে তাঁকে দুনিয়া ছেড়ে চলে যাবার অনুমতি দিলেন?

অনেকে বিশ্বাস করে যে প্রফেট একটা 'পবিত্র সম্মোহের' (holy trance) মধ্যে সাময়িকভবে জ্ঞানহারা (coma) ছিলেন এবং হয়তো শীঘ্র তাঁর জ্ঞান ফিরে আসত। যখন এই 'দেহের পুনরুত্থান' (bodily resurrection) ঘটেনি, অনেকেই হতাশ হন। ওমর শোকে পাগল হয়ে গেলেন, তরবারি খিঁচে জনতার মধ্যে ছুটে গিয়ে চিৎকার করে বলেন– প্রফেট মারা গেছেন যে বলবে আমি তার মাথা কেটে ফেলব। যিশুর মতো তাকে স্বর্গে তুলে নেয়া হয়েছে (Kazi and Flynn, 1984 P.18)। কিন্তু অল্প সময়ের জন্য এবং যিশুর মতো আবার ফিরে আসবেন (Esin 1963 P. 118)।

প্রফেটের মৃত্যুর সময় আবুবকর মদিনার বাইরে সানেহ্-তে ছিলেন। মৃত্যুর সংবাদ পেয়েই মদিনায় ফিরে আসেন। তিনি ওমরকে শান্ত করেন এবং জনগণের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন– হে লোকসকল যদি মোহাম্মদকে কেউ পূজা করে থাকে, সে জানুক যে তিনি মৃত। কিন্তু যদি কেউ আল্লাহকে পূজা করে থাকে, সে জানুক যে আল্লাহ বেঁচে আছেন এবং সর্বকালের জন্য তিনি অমর। তারপর তিনি কোরান থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলতে থাকেন যে, 'সকলের মতো, হে মোহাম্মদ তুমিও মারা যাবে' (৩৯ ঃ ৩১)। আবার 'মোহাম্মদ একজন রসূল ছাড়া কেউ নন এবং তাঁর আগে সব রসূলই মারা গেছেন তবুও যদি তিনি মারা যান বা নিহত হন, তবে তোমরা কি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিবে?' (৩ ঃ ১৪৪)

পরে অনেকে, ওমরসহ, অপ্রমাণিত অভিযোগ করেছিল যে, এই সব বক্তব্যের কোনো সংকলিত রেকর্ড নেই, এর অর্থ এই ছিল যে পরিস্থিত বুঝে আবুবকর এসব আবিষ্কার করেন এবং কোরান সংস্কারের সময় তার এই বক্তব্য জুড়ে দেয়া হয়। কিন্তু বেশির ভাগ পণ্ডিতরা তা মনে করেন না।

www.pathagar.com

৬.১২ দাফন

প্রফেটের মৃত্যুর সময় পরস্পর বিপরীত যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল, মৃত্যুর তাৎক্ষণিক পরেও ঘটনা বর্ণনায় বিক্ষিপ্ত অবস্থা দেখা যায় অর্থাৎ এক বর্ণনা অন্যটার সাথে মিলে না।

আগেই বলা হয়েছে যে, উত্তরাধিকার নিয়ে মরণাপন্ন প্রফেটের সামনেই দুই দলে (শিয়া-সুন্নি) ঝগড়া শুরু হয়েছিল। তাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই এবং তাঁর মৃতদেহ উষ্ণ থাকাকালীন অবস্থায় আরো কমড়াকামড়ি শুরু হয় বিবদমান দলের মধ্যে। মৃতদেহ আয়েশার ঘরেই ছিল এবং মদিনার শোকাহত লোকজন এক এক করে দেখে যায়। ঘরে পুরুষ মানুষের ভিড় থাকার জন্য আয়েশা প্রফেটের অন্য বিধবার ঘরে আশ্রয় নেন।

প্রফেট মোহাম্মদের দু'জন শ্বশুর— আবুবকর ও ওমর আয়েশার ঘরেই ছিলেন, তখন পড়তি বিকালবেলায় সাদ ইবন ওবাইদা তাদের (আবুবকর ও ওমরকে) জানান যে, খাজরাজ গোত্রের নেতা, বানু সাইদাতে এক মিটিং ডেকেছে, প্রফেটের মৃত্যুর পর উত্তরাধিকার ও এই বিষয়ে অন্যান্য প্রশ্ন আলোচনা ও সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য।

আবুবকর ও ওমর তখন সিদ্ধান্ত নেন যে জানাজার জন্য কালক্ষেপণ না করে বানু সাইদাতে যাওয়া দরকার। তাই পরিবারের সদস্যদের আলীর অধীনে মৃতদেহকে দেখাশোনার ভার দিয়ে তারা ত্বরিত গতিতে মিটিং-এর উদ্দেশ্যে রওনা দেন। এর ফলে, বর্ণনা মতে, সারা দিনের মতো মৃতদেহ অবহেলা করে ফেলিয়ে রাখা হয়। আলী ও তার সাপোর্টারগণ মিটিং সম্বন্ধে কোনো খবর রাখলেন না এবং কেউ তাদের এ সম্বন্ধে জানাতে উৎসাহী হয়নি (zakaria, 1983 P. 44)। আয়েশাকে তার বাবা মিটিং সম্বন্ধে জানিয়েছিলেন। আয়েশা তখন মিটিং-এ সংবাদ পাঠান যে প্রফেট মৃত্যুকালে ইচ্ছা প্রকাশ করতে যান যে, আবুবকর তার খলিফা হবে।

দুইটি প্রধান দল নির্বাচক মণ্ডলীরূপে প্রতিনিধিত্ব করে। একটা মদিনার আনসার দল, তাদের নেতা খাজরাজ গোত্রের প্রধান সাদ ইবন ওবাদা। অন্য দলটি মক্কার মোহাজের দল, নেতৃত্ব দেন প্রফেটের ঘনিষ্ঠ সাহাবী তিনজন সকলেই কোরেশ গোত্রভুক্ত। এদের মধ্যে ছিলেন আবুবকর, ওমর আর আবু ওবাইদা। এদের মিত্রদল ছিল মদিনার আউস গোত্র খাজরাজ গোত্র বিরোধী ও নেতৃত্বের প্রতিদ্বন্দ্বী।

মিটিং সোমবার (যে বারে প্রফেট মারা যান) সারারাত ধরে চলে। শুরু থেকেই উত্তপ্ত আলোচনা তর্ক-বিতর্ক চলতে থাকে উত্তরাধিকার নিয়ে। আনসাররা দাবি করল যে মদিনার একজন নেতা প্রফেটের উত্তরাধিকারী হওয়া উচিত। কিন্তু আবুবকর জেদ ধরেন যে কেবলমাত্র কোরেশ গোত্র থেকেই উত্তরাধিকারী সকল আরবদের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে এবং ওমরের সহযোগিতায় এবং আয়েশা কর্তৃক নেপথ্যে যে সঙ্কেত পাঠান আবুবকর খলিফা নির্বাচিত হন।

তারপর প্রফেটের দাফন নিয়ে শুরু হলো বিশদ আলোচনা। মক্কার মোহাজেরগণ চাইল মৃতদেহ মক্কাতে নিতে হবে যেখানে তিনি জন্মেছেন, জীবনযাপন করেছেন, আনসারগণ চাইল দাফন হবে মদিনাতে, এখানেই তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, এবং মৃত্যুবরণও করেছেন। কয়েকজন প্রস্তাব করে যে মৃতদেহ জেরুজালেমে নিতে হবে

www.pathagar.com

কারণ সেখানে অন্যান্য প্রফেটদের সমাধি আছে, শেষমেশ সুবিধার কারণে ও অন্যান্য বিষয়ে দেখভাল করার জন্য সকলেই সম্মত হলেন যে দাফন মদিনাতেই হোক।

কোন শহরে দাফন হবে ঠিক হওয়ার পর, প্রশ্ন উঠল কোথায় দাফন কোথায়? মদিনার কোনো স্থানে দাফন হবে। অনেকে বললেন—মদিনার বাইরে বাকি কবরস্থানে দাফন হোক, কারণ সেখানে তাঁর পুত্র ইব্রাহিম, কন্যা রোকেয়া ও অনেক সাহাবীর কবর রয়েছে। অন্যরা বলল—মসজিদের মিম্বরের কাছে যেখানে তিনি ইমামতি করতেন সেখানে হোক। আলোচনায় উপস্থিত যারা ছিলেন তাদের কেউ জানত না যে দাফনের কাজ তাড়াহুড়ো করে অন্য স্থানে ব্যবস্থা হচ্ছে।

এক বর্ণনা অনুযায়ী প্রফেটের মৃতদেহ শবাধারেই পড়ে ছিল চব্বিশ ঘণ্টা। আবুবকর ও ওমর বানু সাইদার মিটিং থেকে ফিরে এসে মোনাজাত ও ভাষণ সেরে মঙ্গলবার সন্ধ্যায়, আয়েশার ঘরেই মৃতদেহ দাফন করা হলো।

অন্য আর একটি বর্ণনা মতে বলা হয়েছে যে, আবুবকরের নির্বাচনের সংবাদ সোমবার রাতে আলীর কাছে পৌঁছানো হয়, যখন তিনি তার শ্বশুরের মৃতদেহের পাশে চুপচাপ বসে ছিলেন, তার সাথে ছিলেন আব্বাস, প্রফেটের চাচা, আব্বাসের পুত্র ফজল এবং প্রফেটের পালিত পুত্র জায়েদের ছেলে ওসামা।

আলী মনে করেন জানাজা নিশ্চয়ই আবুবকর পরিচালনা করবেন, তাই এটাকে এড়াবার জন্য আর দেরি না করে প্রফেটের মৃতদেহের দাফনের বন্দোবস্ত করেন আয়েশার ঘরেই যেখানে তাঁর মৃত্যু হয়, সেই মতে মৃতদেহ তাড়াতাড়ি গোসল করিয়ে দাফনের বন্দোবস্ত করা হয়, পরে তিনটি জোব্বা (Cloaks) দিয়ে কাফন করা হয়। তারপর কবর খোঁড়া শুরু হয়। ইবন হিশাম বলেন— কবর খোঁড়ার শব্দ প্রফেটের বিধবাদের কানে পৌঁছে এবং তারা বুঝতে পারে যে দাফন কার্য চলছে। মঙ্গলবার ৯ জুন সকালে কবরের নিচে মৃতদেহ নামানো হয় এবং মাটি চাপা দেয়া হয়। আবুবকর বা ওমর কেউ উপস্থিত ছিলেন না।

আবুবকরের নির্বাচনে আবু সুফিয়ান বাধা দেন এবং আলীর দল শিয়ারা এ নির্বাচন কখনো গ্রহণ করেনি। এই বিরোধ শুরু হলে পরবর্তী সপ্তাহ ধরে চলতে থাকে তারপর মাস ও বছর ধরে। শিয়া সুন্নির এই বিরোধ কখনো থেমে থাকেনি এবং ইসলাম বিভিন্ন সম্প্রদায় ও মতবাদে ভাগ হয়ে ধর্মীয় দ্বন্দ্বাকারে রূপ নেয়। অন্য বিরোধে সামান্য মতভেদ থাকলেও উত্তরাধিকার নিয়ে যে দ্বন্দ্ব, মতবাদ ও অনুষ্ঠান তার আজ পর্যন্ত কোনো সুরাহা হয়নি। অনন্তকাল পর্যন্ত এই দ্বন্দ্ব চলতে থাকবে হয়তো।

www.pathagar.com

৭

কোরান

ইসলামের পবিত্র কেতাব কোরানকে ধর্মীয় মুসলিমরা আল্লাহ সমকালীন (Coeval) শাশ্বত ও অসৃষ্ট গ্রন্থ বলে মনে করে। এর বিষয়বস্তু, প্রতিটি ছত্র ও অক্ষর আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত বাণী, অপরিবর্তনীয় ও ফাইনাল। মূল কোরানকে বিশ্বাস করা হয় লৌহ মাহফুজে আলোর ছটার উপর লিখিত এবং রক্ষিত (৫ ঃ ২২) যা আল্লাহর আসনের পাশে রাখা ছিল। এই প্রাচীন টেক্সট পৃথিবী সৃষ্টির বহু পূর্ব থেকেই স্বর্গে মওজুদ ছিল এবং বলা হয় এটা 'উম্মুল কেতাব' অর্থাৎ গ্রন্থের মাতা এবং সমস্ত ঐশীবাণী (ওহি) স্বর্গীয় (১৩ ঃ ৩৯)—আল্লাহ যা ইচ্ছা তা নিশ্চিহ্ন করেন এবং যা ইচ্ছা তা প্রতিষ্ঠিত করেন এবং এই কিতাব আল্লাহর কাছে সংরক্ষিত 'লৌহ মাহফুজ' (৮৫ ঃ ২২)।

আল্লাহর অনুগ্রহে, এই গ্রন্থের অংশ বিশেষ খণ্ড খণ্ড আকারে প্রফেট মোহাম্মদের কাছে তেইশ বছর ধরে প্রেরিত হয়েছে। এই বাণী বহন করে নিয়ে এসেছেন গ্রাব্রিয়েল (জিব্রাইল)—মক্কা ও মদিনা উভয় শহরে এবং সব বাণী একত্রে সংকলিত করে এই কিতাব তৈরি করা হয়েছে।

কোরান নিজেই একটি মোজেজা-মিরাকল (২৯ ঃ ৫০), খলুস আরবিতে লেখা, যা আল্লাহ ও ফেরেশতাদের ভাষা। প্রত্যেক সূরা (চ্যাপ্টার), ১১৪টি, প্রত্যেক আয়াত (৬২০৪ এবং ৬২৩৯ এর মধ্যে), প্রত্যেক শব্দ ও সিলেবল ও প্রতি অক্ষর (আয়াত, শব্দ, সিলেবল, অক্ষরে মুসলিম পণ্ডিতদের মতপার্থক্য আছে) আল্লাহ দ্বারা অনুপ্রাণিত, যখন কোনো আয়াতের উদ্ধৃতি দেয়া হয়, তখন বলা হয়, আল্লাহ বলেছেন (কালা আল্লাহ্) কারণ এর রচয়িতা আল্লাহ।

বলা হয়, কোরান, পৃথিবীর ইতিহাসের সঠিক বর্ণনা দেয় এবং আদি পিতা ও প্রফেটদের জীবনী বর্ণনা আছে; এতে আছে কোনো প্রাচীন রাজার বিষয়বস্তু এবং যিশুর সত্য ঘটনা ও মানবজাতির নিয়তির কথা বলা হয়েছে যার সম্বন্ধে ইহুদি ও খ্রিস্টান ধর্ম গ্রন্থে অসম্পূর্ণ বাণী বিধান পাওয়া যায়। এটা বিশ্বলোকের জ্ঞানের বিশ্বকোষ। সত্যি অনেকে বলে থাকে মানব জ্ঞানের সবদিক, এমনকি বিজ্ঞানের ও প্রযুক্তির এবং দক্ষতার সকল উৎস এই কোরানে বলা আছে এবং এই গ্রন্থের রহস্যময়তা সম্বন্ধে যাদের অন্তর্জ্ঞান আছে তারা রহস্যময় জগতের সবকিছু জানতে পারবে।

কোরান অপরিবর্তনীয়, একে বদলানো যায় না কিংবা সংশোধনও করা যায় না।

www.pathagar.com

আল্লাহর ঐশীবাণী এতে ধারণ করার পর ঐশীবাণীর কালি যে কলম থেকে বের হতো সে কলমের কালি শুকিয়ে গেছে এবং স্বর্গীয় অনুপ্রেরণা বন্ধ হয়েছে এবং আর কিছু বলার নেই। এতে আর কিছু যোগ করার নেই, বাদ দেয়ারও নেই। পৃথিবীর মানুষের নর-নারীর প্রতি পদক্ষেপ যা কিছু প্রয়োজন তার সব গাইডেন্স এই গ্রন্থে পাওয়া যায়। এই গ্রন্থে শুধু ধর্মীয় নয়, সামাজিক-সাংস্কৃতিক-বাণিজ্যিক-আনুষ্ঠানিক, সামরিক আইন, দেওয়ানি ও ফৌজদারি এবং প্রশাসনিক-মুসলিমদের জীবনযাত্রার যাবতীয় পথনির্দেশ পাওয়া যাবে।

৭.১ জিব্রিল ফেরেশতা

প্রফেট মোহাম্মদের কাছে যত বাণী আল্লাহ প্রেরণ করেছিলেন তার মাধ্যম ছিল জিব্রিল ফেরেশতা। সূরা তাকভিরে এ (৮১) ১৯ আয়াতে জিব্রিলকে বলা হয়েছে Illustrious Messenger সম্মানিত বার্তাবাহক, কারণ ইনিই আল্লাহর বাণী মোহাম্মদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন (গ্রিক শব্দ 'angelos' - angel-এরও অর্থ বার্তাবাহক)। এই দাবি জোর দিয়ে প্রমাণ করে যে, কোরানের কোনো ব্যক্তিগত চরিত্র নেই এবং এই ভাষ্যই মোহাম্মদের মক্কাবাসীদের অভিযোগ খণ্ডন করে, কারণ মক্কার বিরুদ্ধবাদীরা অপবাদ দিয়েছিল এই বলে যে কোরানের সব কথাই প্রফেট মোহাম্মদের নিজের আবিষ্কার।

কোরানে জিব্রিল ফেরেশতা সম্বন্ধে কোনো উল্লেখ নেই যতক্ষণ না মদিনা কাল আরম্ভ হলো হিজরতের পর এবং তারপর তাঁর নাম মাত্র দু'বার উল্লেখিত হয়েছে সেই দেবদূত যার মাধ্যমে কোরান অবতীর্ণ (২ ঃ ৯১) এবং একজন সাহায্যকারী হিসাবে (৬৬ ঃ ৪)। অন্যান্য আয়াতে তাঁর উল্লেখ আছে তবে নাম ধরে নয়। এইভাবে, সুউচ্চ পয়েন্টে প্রফেট মোহাম্মদ তাঁকে দেখতে পান (৫৩ ঃ ৭) সেই পরিষ্কার দিগন্তে (Clear horizen) (৮১ ঃ ২৩) এবং পরে তিনি অগ্রসর হলেন দুই ধনুকের দুরত্ব বজায় রেখে (৫৩ ঃ ৯)। অন্য এক ঘটনায় মোহাম্মদ সিদ্‌রা গাছের (লোট ট্রি) কাছে তার ভিশন দেখতে পান যেখানে এই দুনিয়ার সাথে পরবর্তী দুনিয়ার বাউন্ডারি (সীমান্ত) টানা হয়েছে।

বিভিন্ন ট্র্যাডিশন অনুযায়ী, অন্য উৎস থেকেও অনুপ্রেরণা পাওয়া গেছে। কোনো সময়ে অনুপ্রেরণা এসেছে পবিত্র আত্মা থেকে, যে আল্লাহর কাছ থেকে নিয়ে এসেছে। কোনো সময়ে এসেছে সকিনার কাছ থেকে, যার রহস্য মতো অর্থ হচ্ছে ঈশ্বরের নারীরূপে– (Cabbalistic writings in the female aspect of God)।

এক বর্ণনায় মোহাম্মদ বলেছেন, 'দেবদূতটি মানুষের রূপ ধরে আমার সামনে আসত, সেই মানুষটির বর্ণনা দিতে বলা হলে প্রফেট জবাব দিতেন যে তার দাড়ি ও মুখ মক্কার এক সুন্দর যুবাপুরুষের মতো, মাথায় সূচিকর্মের পাগড়ি ব্রকেডের জিনে (saddle) সজ্জিত শুভ্র খচ্চরের পিঠে চড়ে আসত। এই যুবাপুরুষটি দেখতে ছিল দাহিয়া ইবন খলিফার মতো, যিনি খ্রিস্টান কালবি গোত্রের সদস্যভুক্ত (Glubb, 1979, P. 249)।

আর একটা ট্র্যাডিশন মতে, বর্ণনায় মুসা ইবন ওকবা, বলা হয়েছে; হিরা পর্বত গুহায় মোহাম্মদ প্রথম 'ভিশন' দেখার পর, খাদিজা তাঁকে এক খ্রিস্টান সাধু আদ্দাসের

www.pathagar.com

কাছে নিয়ে যান। আদ্দাস নিজে থেকে এসে মক্কায় স্থায়ী বাসিন্দা হয়েছিলেন। খাদিজা তাকে মোহাম্মদের 'ভিশন' সম্বন্ধে ব্যক্ত করলে সাধুপুরুষটি বিস্ময়ে বলে ওঠেন— 'হে সম্ভ্রান্ত কোরেশী মহিলা এই মূর্তি পূজার দেশে গ্যাব্রিয়লকে কী ভাবে উল্লেখ করা হয়? তারপর তিনি খাদিজার কাছে ব্যাখ্যা করেন যে গ্যাব্রিয়েল হলো আল্লাহর ফেরেশতাদের প্রধান যাঁকে আল্লাহ পাঠান প্রফেটদের পথনির্দেশ করতে, গাইড করতে। তাবারির বক্তব্য অনুযায়ী ইহুদিরা বিশ্বাস করে যে মোহাম্মদের ওহিগুলো গ্যাব্রিয়েলের মাধ্যমে আনীত হয়নি, তার কারণগুলোর মধ্যে একটা হচ্ছে, গ্যাব্রিয়েল ধ্বংসকরণের ফেরেশতা, মিকাইলের মাধ্যমে এলে কথা ছিল, কারণ মিকাইল হলো ইহুদিদের গার্জেন (দানিয়েল ১২ ঃ ১)। ইহুদিরা বিশ্বাস করে যে গ্যাব্রিয়েল মোহাম্মদ যে অনুপ্রাণিত করেছিল ইহুদিদের বিরুদ্ধে ধ্বংসাত্মক অভিধানগুলো চালাবার জন্য যেমন বানু কুরাইজার ওপর করা হয়েছিল।

মোহাম্মদ স্বয়ং জিব্রাইলকে পছন্দ করতেন নূহ, মুসা ও ওমরের মতো, যারা কঠোর বিচারে অভ্যস্ত ছিল এবং মিকাইলকে তুলনা করতেন আব্রাহাম, যিশু ও আবুবকরের মতো, যারা ক্ষমা করার পক্ষপাতী ছিলেন। (Muir 1912 P.231) ইহুদি হিব্রু কাবালার (cabbala) রহস্যজনক ট্র্যাডিশন অনুযায়ী, গ্যাব্রিয়েল চন্দ্রের আত্মিক গুণাবলির সাথে সংযুক্ত, আর মিকাইলের সংযোগ হচ্ছে সূর্যের সাথে। (Frieling, 1976. P. 47)। গ্যাব্রিয়েল স্বপ্নের স্তরে অবস্থান করে, যা প্রায়ই প্রতারণামূলক এবং মিকাইল ভিশনের স্তরে অবস্থান করে যা ভবিষ্যদ্বাণী নির্দেশ করে (Matt, 1983 P. 229)।

৭.২ কোরানের অবতরণ

জিব্রিল মোহাম্মদকে কোরানে ওহি (রিভিলেশন) এনে দিতেন তা মোহাম্মদ স্বাভাবিকভাবে শুনতে পেতেন না, কিন্তু অবতরণ হতো প্রত্যক্ষভাবে তার মনে ও অন্তরে। এই অবতরণ (তানজিল) কোনো সময় আসত শব্দ সমষ্টি হয়ে হয়ে, কোনো সময়ে 'ভিশন' আকারে, যা তিনি বুঝতে পারতেন এবং কোনো সময়ে আসত স্বপ্নে। মোহাম্মদ এসব 'ওহি' বা রিভিলেশন বলে দিতেন 'খতিব' বা লেখকদের কাছে। প্রায়ই ওহি আসত অদ্ভুত শব্দের মাধ্যমে এবং চিহ্নরূপে।

অনেক সময় ওহি অবতরণ হতো অপ্রত্যাশিতভাবে এবং অসময়ে; যেমন– ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছেন, কিংবা চুলে পানি দিয়ে পরিষ্কার করছেন বা খাচ্ছেন, (A. J. Wensinck, in SEI, 1974, P. 624)। কোনো কোনো সময়ে পাবলিক মিটিং-এ উত্থিত কোনো প্রশ্নের জবাবে আলোকরশ্মি রূপে চলে আসত, অথবা যখন কোনো মতামত চাওয়া হলে তা টলাতে না পারলে চলে আসত, অথবা কোনো বিশেষ অবস্থায় তাৎক্ষণিকভাবে কোনো সিদ্ধান্তের কিনারা করতে নেমে আসত। এই সময় রিভিলেশন মুহূর্তেই কেউ যেন বলে দিত কোনো সিদ্ধান্ত নিতে যার জন্য সময়ের অপেক্ষা করা যেত না নিয়মিত অনুপ্রেরণার জন্য। এই সব সময়ে, বলা হতো, তিনি আল্লাহর কাছ থেকে ত্বরিত নির্দেশ পেতেন। ক্ষণস্থায়ী (একদিনের মতো) অপেক্ষা করা যায় এমন ঘটনা, সামান্য স্থানীয় সমস্যা বা অন্য কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেয়া হতো কোরানের আয়াত থেকে। ব্যক্তিগত কারণে তাঁর শত্রুকে অভিশপ্ত করার আয়াত ছিল (১১১ ঃ

www.pathagar.com

১)। এটা এমনভাবে প্রচারিত হয় যে এক সময় এক সাহাবী আবু রুহুম আল গিফাবীর সাথে পথ চলতে তিনি হঠাৎ হোঁচট খান, আল গিফারী উদ্বিগ্ন হয়ে অপেক্ষা করেন হয়তো কোনো কোরানের আয়াত পাওয়া যাবে যাতে তিনি একটি উপযুক্ত নির্দেশ পেতে পারেন।

কিছু রিভিলেশন পেয়েছেন শত্রুদের আক্রমণে উত্তেজিত হয়ে এবং কিছু পেয়েছেন তাঁর আচরণ সম্বন্ধে উত্থাপিত আপত্তিগুলোকে খণ্ডন করতে। কিছু এসেছে কোনো রাজনৈতিক বা সামাজিক দাবি মেটানোর কারণে, কিছু এসেছে তাঁকে তাঁর শপথ থেকে মুক্তি দিতে (৪৭ ঃ ৪)। অনেক আয়াত এসেছে যুদ্ধ ও অভিযান করার প্রচারপত্র হিসাবে অথবা ঐ দিন সেনাবাহিনীকে কী নির্দেশ দেয়া হবে সে সম্বন্ধে, অথবা কোনো গোত্র প্রধানের সাথে শান্তি চুক্তি করার ব্যাপারে কিংবা অভিধান শেষে মালেগণিমাত (booty) বিতরণ সম্বন্ধে (৮ ঃ ৪২)

কতগুলো আয়াত এসেছে প্রফেটের স্ত্রীদের সম্বন্ধে তাদের পারিবারিক কলহ ও দাবি সম্বন্ধে। প্রফেটের এই প্রবণতা (tendency), বিশেষ করে মদিনায়, অর্থাৎ রিভিলেশন পাওয়ার প্রয়োজনীয়তাকে বাড়িয়ে দিয়েছিল তাঁর মতামতকে সমর্থন জোগাতে, যাতে তিনি পারিবারিক কলহ-কোন্দলের অশান্ত অবস্থাকে শান্ত করতে পারেন, আর এই মর্মে কিছু কোরানিক আয়াত এমন অসামঞ্জস্য ছিল যা বিরূপ মতামতের হাত থেকে রেহাই পায়নি। এটা মনে করা হয়েছিল যে, প্রফেট তাঁর প্রতিপক্ষকে যখন শান্ত করতে পারেননি তখন বারবার তিনি রিভিলেশন কামনা করেছেন অথবা স্ত্রীদের নিয়ন্ত্রিত করার জন্য অথবা আল্লাহর অনুপ্রাণিত কোনো বাণীর বিপরীতে সংঘটিত এমন অবস্থা থেকে নিজের পজিশনকে স্বচ্ছ করে তোলার কারণে, বারে বারে আল্লাহর সাহায্যপ্রার্থী হয়েছেন।

৭.৩ ওহি লেখকগণ (কাতিব)

প্রফেট মোহাম্মদ যখন তার মিশন শুরু করেন, তখন মক্কার অভিজাত সম্প্রদায় কোরেশ গোত্রের মধ্যে মাত্র সতের জন ছিলেন, যারা লিখতে পারত। হিসাবরক্ষক ও কেরানি হিসাবে বেশির ভাগ ইহুদি, খ্রিস্টান বা আবিসিনিয়ানদের মক্কার ধনী মার্চেন্টরা নিয়োগ করত। মোহাম্মদের প্রাথমিক দিনগুলোতে মদিনায় লেখকের সংখ্যা মক্কার মতোই ছিল, তাই প্রফেট মোহাম্মদ শিক্ষিত দরিদ্র যুদ্ধবন্দিদের মুক্তি দিতেন এই শর্তে যে, তারা তাঁর অনুসারীদের লেখাপড়া শেখাবে। শুধু লেখকদের সংখ্যা কম ছিল না, লেখার সরঞ্জামও বিরল ছিল, হঠাৎ পাওয়া যেত না। এটা প্রত্যয় করে বলা যাবে না, মক্কাতে অবতারিত প্রথম ওহিগুলো কারা লিখে রেখেছিল; তাতে পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় যে প্রথম দিকে অবতারিত মূল ওহির কিছু অংশ হারিয়ে গেছে।

মোহাম্মদের ওহি লেখকদের রাব্বীদের (মুহুরি) মতো দেখতে লাগতো, যারা প্রাচীন চারণকবিদের কবিতা নকলকারীদের মতো। প্রফেটের প্রথম লেখকরা 'ছিল খ্রিস্টান বা খ্রিস্ট ধর্মের লোক ছিল এমন সব ব্যক্তি– যেমন তার স্ত্রী খাদিজা, বৃদ্ধ জ্ঞানী ব্যক্তি ওয়ারাকা এবং মোহাম্মদের পালিত পুত্র জায়েদ ইবন হারিথ। অন্যেরা ছিলেন প্রফেটের অতি কাছের লোক, যেমন আবুবকর ও আলী। তাঁর স্ত্রীদের মধ্যে ছিলেন,

www.pathagar.com

জানা যায় যে, খাদিজা ছাড়া, আয়েশা, উম্মে সালমা এরা পড়তে পারতেন এবং হাফসা ও উম্মে কুলসুম এরা পড়তে ও লিখতে পারতেন। কিন্তু হাফসা ও উম্মে কুলসুম প্রফেটের ডিকটেশন লিখে রেখেছিলেন কিনা জানা যায়নি।

সময়ক্ষেপণের সাথে সাথে অনেকেই ওহি লিখে রাখতে শুরু করেন। এদের মধ্যে ছিলেন জায়েদ ইবন থাবিত যিনি কোরান সংকলনও করেছেন; ওসমান তৃতীয় খলিফা; আবদুল্লাহ ইবন সাদ, ওসমানের সৎভাই; ওবেই ইবন কাব (যিনি তাঁর নিজের কোরান সংকলন করেন; এ সম্বন্ধে পরে আলোচিত হবে); মাবিয়া, ওসমানের কাজিন, (ইনি প্রথম উমাইয়া খলিফা হন) এবং একজন ইহুদি লেখক ও (Sale, 1886 P. 46)। মোহাম্মদের মৃত্যুকাল পর্যন্ত চল্লিশ জনের বেশি ওহি লেখক নিয়োগ করা হয়েছিল।

মুতাজিলি ও আরব সমালোচকগণ কিছু প্রশ্ন উত্থাপন করেন; যেমন (১) ওহি কেমন করে আসত এবং কেমনভাবে গ্রহণ করা হতো? (২) কেমন করে ওহি লেখকরা জানতে পারত কখন প্রফেট 'অনুপ্রাণিত' এবং কখন তিনি হুবহু সেই ওহি প্রকাশ করতেন এবং (৩) কেমন করে লেখক বুঝতে পারত কখন লেখা আরম্ভ করতে হবে এবং কখন থামতে হবে?

এটাই সম্ভাব্য যে, ওহি লেখকরা যা শুনে লিখল (সকলেই তো সমান দক্ষ ছিল না) হয়তো তাদের লেখার মধ্যে কিছু ভুল থাকা অস্বাভাবিক নয়, আর সব নকলকারীরা (Copyist) একই বিষয় লিখত না অর্থাৎ সকলের লেখা অক্ষরে অক্ষরে মিলতো না যদি মোহাম্মদ নিজে লিখতে বা পড়তে না জানতেন, যেমন দাবি করা হয়, তাহলে, কোরানে টেক্সটের ভ্রমশূন্যতার (accuracy) জন্য নির্ভর করতে হয় নিয়োগকৃত একাধিক ওহি লেখকদের (amanuenses) দক্ষতার ডিগ্রির ওপরে। এই জন্য কোনো কোনো পণ্ডিত ব্যক্তি এই মত পোষণ করেন যে, সময়ে সময়ে মোহাম্মদ ধারণকৃত ওহির বিধান পরিবর্ধন ও সংশোধন করেছেন।

৭.৪ মক্কার সূরা

পণ্ডিত ব্যক্তিগণ কোরানের সূরাগুলোর মধ্যে বিভাজন বা পার্থক্য করেছেন, যেসব সূরা মোহাম্মদ মক্কাতে এবং পরে মদিনাতে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ডিকটেট করেছেন। পরবর্তীতে কোরানের আরবি কপিগুলোতে প্রত্যেক সূরার শিরোনামে 'মক্কা' বা মদিনা' উল্লেখ করা হয়েছে যাতে পাঠকদের বুঝতে অসুবিধা না হয় কোনটা মক্কার আর কোনটা মদিনার সূরা (চ্যাপ্টার)।

প্রাথমিক বা মক্কার সূরাগুলোতে অন্য ধর্মের প্রতি এমনকি প্যাগন আরবদের ধর্মের প্রতি সহিষ্ণুতা দেখানো হয়েছে। এই সূরাগুলো উচ্চ আদর্শে পরিপূর্ণ যা গভীর ধর্মবোধ ও আধ্যাত্মিকতার দ্বারা প্রভাবিত; এটা করা হয়েছে ইহুদি ও খ্রিস্টান ধর্মের ট্র্যাডিশনকে সমন্বিত করে। আল্লাহকে বলা হয়েছে আল-রহমান, দয়ালু।

এই সূরাগুলো, ধর্মীয় শিক্ষা, নৈতিক নীতি, সংক্ষিপ্ত সুসমাচার এবং অন্যান্য অনুপ্রাণিত বাণী যা প্রফেট বলেছেন, সেগুলো নির্দেশ করে। বাণীগুলো বলা হয়েছে ছোট ও সরলভাবে আবেগকণ্ঠে প্রাচীন মহাকাব্যের অংশ বিশেষ আবৃত্তি করার মতো, ভিশনারি ক্ষমতা ও জ্বালাময়ী বক্তব্য সংবলিত বাক্যসমৃদ্ধ এবং সাধারণত ছন্দময়ী ও

www.pathagar.com

গদ্য ছন্দ প্রভাবিত (সাজ)।

এইসব দ্যুতিময় ও আবেগাপ্লুত আয়াতগুলোর ছান্দিক গতিময়তা, রহস্যময়তা ও ধর্মীয় অন্তর্বোধ মানুষকে ও শ্রোতাকে মোহান্বিত করে; কারণ এগুলো প্রায়ই জাদুর স্পর্শের মতো মানুষকে অচেতন করার ক্ষমতা রাখে। বলা হয়ে থাকে, প্রফেটের বয়োবৃদ্ধির সাথে সাথে মক্কার সূরাগুলোর কার্যকর ক্ষমতা আস্তে আস্তে কমে যেতে থাকে মদিনায় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ও তার প্রশাসনিক কারণে।

মক্কার সূরাগুলোতে আরবদের জন্য আব্রাহামের ধর্মের কথা বলা হয়েছে এবং সমগ্র কোরানের এক-তৃতীয়াংশ। মক্কার সূরার অধিকাংশ মুসলিমদের মুখে মুখে সম্পূর্ণ বা খণ্ডিতভাবে ধ্বনিত হতো। মৌখিকভাবে পঠিত বা আবৃত্ত হয়ে থাকলেও এগুলোর কোনো পরিবর্তন বা বিকৃতি হয়নি এবং এই সূরাগুলো ইসলামের বিশ্বাস ও ভিত্তির কেন্দ্র স্বরূপ। এর অনেক অংশ স্তোত্র-পাঠের মতো বা গীতিকাব্যের মতো। এগুলো তাই প্রার্থনার জন্য ইমামদের কাছে সুবিধাজনক। তাই গণপ্রার্থনায় ও অন্যান্য ধর্মীয় অনুষ্ঠানে এগুলোর নিয়মিত ব্যবহার করা হতো।

এটা মনে করা হতো যে, মোহাম্মদের মক্কা থেকে মদিনা যাত্রার পূর্বে প্রাথমিক মুসলিমদের মৌলিক বিশ্বাস ও অনুষ্ঠানাদি সবই নাজেলকৃত মক্কী সূরাগুলোতে নিহিত হয়েছে যদিও কোনো কোনো ক্ষেত্রে মূলসূত্র আকারে (rudimentary form)। এই প্রাথমিক ছোট ছোট সূরাগুলো নিয়মিত পাঠ করার কাজে লাগত এবং মানুষের প্রার্থনার বইরূপে পরিগণিত হতো যেমন ছিল খ্রিস্টানদের বাইবেল।

মোহাম্মদ যখন হিজরতের জন্য তৈরি হচ্ছিলেন, তিনি প্রথমে মুসাব ইবন উমাইরকে মদিনায় পাঠান সেখানকার মুসলিমদের নির্দেশ দেয়ার জন্য এবং অবস্থাটা বোঝার জন্যও। মদিনায় মুসাবকে পাঠানো হয়েছিল, কারণ তিনি কোরান আবৃত্তি করতে পারতেন, যাতে মানুষে বুঝত যে মৌলিক ধর্ম গ্রন্থ হিসাবে কোরান সম্পূর্ণ হয়েছে।

প্রখ্যাত ব্রিটিশ পণ্ডিত রিচার্ড বেল, কোরানের টেক্সট অতি সূক্ষ্মভাবে পর্যালোচনা করার পর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এই বলেছেন যে, বদরের যুদ্ধের সময় (৬২৪ খ্রিঃ) কোরান নিশ্চিতভাবে সম্পূর্ণ (completely closed) হয়েছে– অর্থাৎ হিজরতের দু'বছরের পর (Watt 1970, P. 158)। সেই সময় বলতে গেলে কোরান মূলত মক্কী সূরাগুলোই নিয়ে রচিত হয়েছিল।

৭.৫ মদিনার সূরা

মদিনায় এসে মোহাম্মদের মর্যাদা ও ক্ষমতা বেড়ে যাওয়ায় তাঁর চরিত্রে মৌলিক পরিবর্তন এসে গেল এবং কোরানের বাণী ও তার ধর্মীয় মাধুর্যও বদলে গেল। এই পরিবর্তন প্রতিফলিত হলো তাঁর কথা বলার ভঙ্গিমা ও বিষয়বস্তু উভয় ক্ষেত্রেই। মাদানী সূরাগুলো যেমন দীর্ঘ তেমনি পাঠ করতেও ক্লান্তিকর, যেমন বিদেশী সমালোচকরা বলে থাকেন।

মদিনাতে এসে ধর্মীয় উদ্দীপনা এবং মক্কার রিভিলেশনে যে স্বর্গীয় দ্যুতি ছিল মদিনায় লম্বা ও দীর্ঘ সূরাগুলোতে দেখা গেল না। কল্পনাপ্রবণ (visionary) প্রফেট

www.pathagar.com

প্রচারক হয়ে গেলেন; প্রফেট হয়ে গেলেন ধর্মতত্ত্ববিদ। নামে মাত্র মাদানী সূরাতে স্বর্গীয় প্রভাব থাকল না। প্রফেটের যে ধর্মীয় এনার্জি ছিল তার গতি বদলে অন্য দিকে গেল; আগেকার, সেই ঐশ্বরিক প্রেরণা জাগতিক ব্যাপারে নিবদ্ধ হলো। সূরাতে যে ছান্দিক গতি ছিল, যে মোহান্বিত ভাব ছিল, তার স্থানে দেখা দিল খাপছাড়া অপ্রাসঙ্গিক গদ্য। কোনো কোনো সূরার কোনো কোনো অংশে (Passage) তার নিজের মহিমার কথা বা ব্যক্তিগত সমস্যার কথা এবং আস্তে আস্তে তার সহিষ্ণুতা ও ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গিয়ে প্রতিপক্ষদের প্রতি যুদ্ধংদেহির ভাব এসে গেল।

স্পষ্টভাবে বোঝা যায়, মাদানী সূরাগুলো তার সচেতন মন থেকে উৎসারিত। এই সূরাগুলোতে উপদেশ (exhortation), আপিল, আইন-কানুন ও ঘোষণায় পরিপূর্ণ। এতে যে সুর ধ্বনিত হয়েছে তার মতবাদ ও শিক্ষা সম্বন্ধীয় এবং আইন, অপরাধ ও শাস্তি সম্বন্ধীয়। আবেগময় আবৃতি হয়ে গেল মামুলি পাঠ, নির্দেশ অনুসরণীয় ব্যাপার। মদিনায় অবস্থানকালে 'কোরান' শব্দটি আবৃত্তি হিসাবে ব্যবহৃত না হয়ে পরিচিত হলো 'আল-কিতাব' বা গ্রন্থ হিসাবে। জনগণের কাছে মক্কী সূরার মাদানী সূরার চাইতে পরিচিতি বেশি ছিল এবং গণপ্রার্থনায় মক্কী সূরার ব্যবহার ছিল। মাদানী সূরা ও তার বিষয়বস্তু সম্বন্ধে মানুষের ধারণা কম ছিল, এর আকার ছিল বিশাল, বৃহৎ এবং পাঠ-কষ্ট, ক্লান্তিকর। তাই প্রফেটের মৃত্যুর পর মাদানী সূরাগুলোর মধ্যে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করার সুযোগ ছিল বেশি।

মক্কী ও মাদানী সূরার মধ্যে যে পার্থক্য তা প্রথম থেকে মুসলিম মুফাসসিরদের (Commentalor) কাছে প্রথম থেকেই অজানা ছিল না এবং এ বিষয়ে তারা ঘনঘন আলোচনাও করেছেন। আধুনিক কালে, ইরানী লেখক আলি দস্তি এর পার্থক্য দেখিয়েছেন—প্রফেট মোহাম্মদ যেসব বাণী মক্কায় পেয়েছিলেন এবং পরবর্তীতে যা মদিনায় পেয়েছিলেন। ইরানে ইসলামী বিপ্লবের কারণে, আলিদাস্তকে গ্রেফতার করা হয়, তার বিরুদ্ধে অধর্মের অভিযোগ আনা হয়, কারারুদ্ধ করা হয় এবং ভীষণভাবে পেটানো হয়, ফলে ১৯৮২ সালে জানুয়ারি মাসে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। সুদানীজ ধর্মতত্ত্ববিদ মাহমুদ মোহাম্মদ তাহা, সুদানে বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে সমঝোতার কারণ খুঁজতে গিয়ে জোর দিয়ে বলেছেন যে মদিনার সূরার ভিত্তিতে শরীয়া আইন না করে প্রাথমিক মক্কী সূরার ওর ভিত্তি করে রচনা করলে আধুনিক বিশ্বে তা গ্রহণীয় হতে পারত এবং মুসলিম বিশ্ব আরও এগিয়ে যেতে পারত উন্নতিশীল জাতির সাথে। মাহমুদের এই আবেদন ও পরামর্শ সুদান সরকারের কাছে গ্রহণীয় হয়নি, উপরন্তু তাকে ঈশ্বরদ্রোহীর অভিযোগে গ্রেপ্তার করে ১৯৮৫ জানুয়ারি মাসে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করা হয়েছে।

৭.৬ কোরান সংকলন

৬৩২ সালে যখন প্রফেট মোহাম্মদ মারা যান তখন বর্তমান আকারে কোরানের কোনো অস্তিত্ব ছিল না। কিছু খণ্ডিত অংশ, একটি আয়াত থেকে পুরো সূরা পর্যন্ত লিখে রাখা হয়েছিল এবং গচ্ছিত ছিল বিভিন্ন ব্যক্তির হাতে (Private hands)। এর বেশির ভাগ অংশই মুখস্থ রেখেছিলেন সাহাবীরা, নিকট আত্মীয়রা, ক্বারী ও হাফেজরা। কেমন

www.pathagar.com

করে এই সব মেটিরিয়াল শেষ পর্যন্ত সংগৃহীত হয় সে সম্বন্ধে বেশ কতকগুলো স্ববিরোধী বক্তব্য রয়েছে।

৬৩৩ সালে রিদ্দা যুদ্ধের সময় খলিফা আবুবকর কোরান মুখস্থকারী (হাফেজ) কিছু ব্যক্তি এই যুদ্ধে মারা পড়েন। ইয়ামামার যুদ্ধে, পরের বছর, অবস্থা আরও গুরুতর হলো যখন ৩৯ জন সাহাবী-হাফেজ যুদ্ধে প্রাণ হারান।

প্রফেট মোহাম্মদের শ্বশুর ওমর উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন এই ভেবে যে যদি আরও হাফেজ যুদ্ধে প্রাণ হারান তাহলে কোরানের মেটিরিয়েল আর খুঁজে পাওয়া যাবে না, তাই তিনি আবুবকরকে পরামর্শ দিলেন যে, কোরানের যেসব মেটিরিয়াল বর্তমানে পাওয়া যাচ্ছে এবং কোরান টেক্সটে যা লিপিবদ্ধ আছে সব গুছিয়ে নিয়ে সামগ্রিকভাবে সংগ্রহ করা হোক যা দিয়ে একটি পরিপূর্ণ গ্রন্থ সংকলিত হয়। এই আইডিয়াকে সাধারণ মুসলিমরা ভালোভাবে গ্রহণ করতে পারলেন না। অনেকে আপত্তি তুললেন এই বলে যে এটা করতে গেলে প্রফেট যা করতে পারতেন কিন্তু করেননি তাঁর প্রতি অসম্মান (saerilegious) দেখানো হবে, এমনকি আবুবকর পর্যন্ত সন্দেহবাদী ছিলেন, কারণ এটা এমন একটা কাজ যার জন্য তিনি প্রফেট মোহাম্মদের নিকট থেকে কোনো কর্তৃত্ব পাননি।

যাই হোক আবুবকর শেষ পর্যন্ত অনুমোদন দিলেন এবং তিনি এ পবিত্র কাজের ভার প্রফেটের সেক্রেটারিদের মধ্যে একজনকে দিলেন তিনি হলেন মদিনার খাজরাজ গোত্রের জায়েদ ইবন থাবিত। জায়েদ আরবি ভাষা ছাড়া জানতেন পার্সিয়ান, গ্রিক, ইথিওপিক, কপটিক, সিরিয়াক ও হিব্রু এবং ইহুদিদের ধর্মগ্রন্থও পাঠ করেছেন।

বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন উপায়ে যেসব খণ্ড খণ্ড আয়াত ছড়িয়ে ছিটিয়ে রেখেছিল এই জায়েদ সেগুলো তাদের কাছ থেকে সংগ্রহ করলেন। ট্র্যাডিশন বলছে যে, এইসব সংগৃহীত অংশের মধ্যে ভেড়া ও ছাগলের চামড়ার, অংশ, খেজুর পাতা, চ্যাপ্টা পাথর, কাঠের পাটা (ট্যাবলেট), চামড়ার খণ্ড এবং উটের ও ছাগলের স্কন্ধের এবং পাঁজরের হাড় আর 'মানুষের বক্ষ' (breast of man)—অর্থাৎ মুসলিমদের স্মরণশক্তি থেকে উদ্গীরিত অংশ।

৬৩৪ সালের শেষ দিকে যত খণ্ডাংশ ও হাফেজ বর্ণিত কোরানের বাণী সংগ্রহ করা হয়েছিল সেগুলোকে পরিশ্রম সহকারে আলাদা শিটে কপি করে (সুহুফ) পর্যায়ক্রম ও ভালোভাবে ছাঁটাই-বাছাই না করে (without critical selection) একটি অসম্পাদিত (unedited) গ্রন্থের খাড়া করা হলো। এতে অনেক পুনরাবৃত্তি, গরমিল অনৈক্য ও উপভাষার পরিবর্তন (dialect variation) রয়ে গেল। কোনো কোনো মুসলিম অথরিটি বলেন যে জায়েদের প্রথম সংকলনটা বিভিন্ন পণ্ডিতযোগ্য কেন্দ্রে (Scholastic centres) পাঠানো হয়েছিল, কিন্তু অন্যেরা একথা অস্বীকার করেন।

সংগৃহীত মেটিরিয়েল, সম্ভবত চার-কোণ-বিশিষ্ট অক্ষরে লিখিত, আবুবকরকে দেয়া হয় এবং তার মৃত্যুতে এই কপি দ্বিতীয় খলিফা ওমরের হেফাজতে রাখা হয়। ওমরের মৃত্যুর পর অর্থাৎ ৬৪৪ সালে দশ বছর পরে এই কপি চলে যায় ওমরের কন্যা ও প্রফেটের বিধবা স্ত্রী হাফসার কাছে।

ইত্যবসরে সেই সংকলিত কোরানের বিভিন্ন সারাংশ, গোটা সূরা থেকে খণ্ডিত

www.pathagar.com

অংশ, যেসব প্রদেশে ইসলাম বিস্তার করেছে, সেখানে পাঠিয়ে দেয়া হয় আবৃত্তির জন্য তখন আরবি অক্ষরে স্ক্রিপ্ট (script) অসম্পূর্ণতা থাকার কারণে এই সব টেক্সটে পঠনে ও ব্যাখ্যায় পরিবর্তন (veriation) দেখা দেয় এবং প্রত্যেক পাঠ ব্যাখ্যাকারীদের নিকট অথরিটি বলে গণ্য হয়।

আর্মেনিয়া ও আজারবাইজানে অভিযানকালে সিরিয়া ও ইরাকের মুসলিম সেনাবাহিনীতে ব্যবহৃত কোরানের পাঠ ও ব্যাখ্যার পরিবর্তন সম্বন্ধে বিরোধ শুরু হয়ে গেল। এই বিরোধ চরমে পৌঁছলে সেনাপতি হুজাইফা, তৃতীয় খলিফা ওসমানের দৃষ্টিগোচর করেন এবং তাকে এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার জন্য অনুরোধ করেন; কারণ এই বিভিন্নভাবে পঠন ও ব্যাখ্যা ইহুদি ও খ্রিস্টানদের ধর্মগ্রন্থের মতো পার্থক্য এনে দিতে পারে। এই অবস্থাতে তাৎক্ষণিকভাবে প্রয়োজন হলো একটি সমরূপ (uniform) ও প্রভুত্বব্যঞ্জক (authoritative) কোরান সংকলন করা, যাতে বর্তমানে ব্যবহৃত কোরান পাঠে বিভিন্নতা ও ব্যাখ্যার বিকৃতি সত্বর বন্ধ করা যায়।

সুতরাং খলিফা ওসমান সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, দ্বিতীয়বারের মতো একটি ব্যাপক (Comprehensive) ও চূড়ান্ত (definitive) কোরান সম্পাদন ও সংকলন অত্যন্ত জরুরি, যাতে শেষবার ও সর্বকালের মতো বিধিবিধান বা আইনকানুন নির্ধারিত হয়ে যায়। তিনি আবার জায়েদ ইবন থাবিতের ওপর এ কাজের ভার দিলেন আর সাথে দিলেন তিনজন কোরেশী সাহায্যকারী : আবদুল্লাহ্ ইবন আল জুবায়ের, সাদ ইবন আল-আস এবং আবদুল রহমান ইবন আল-হারিথ। (অন্য সাহায্যকারীদেরও লিস্ট আছে যারা এই বিশাল কর্মে অবদান রেখেছেন)। এই সময় তারা বিদ্যমান সকল ধরনের কপিগুলোকে, কোরানের চ্যাপটার বা ক্ষুদ্রাংশ এবং সেই সব মেটিরিয়ালের সাথে পূর্বে সংকলিত কোরান যা হাফসার কাছে ছিল, তার সাথে মিলিয়ে দেখলেন এবং গ্রন্থের চূড়ান্ত ভার্সান তৈরি করলেন, এই সিদ্ধান্ত নিয়ে যে কোনটা রাখতে হবে আর কোনটা বাদ দিতে হবে এবং গ্রন্থ রচনা, সূরার নাম্বার ও ক্রমবিন্যাস চূড়ান্তভাবে ঠিক করলেন।

ওসমানের কোরান-কমিশন অনেকগুলো সমস্যার সম্মুখীন হন : যেমন, সূরাগুলির ক্রমবিন্যাস ও সিকোয়েন্স। টেক্সট্ সম্বন্ধে প্রবল মতভেদ এবং এদের সঠিকভবে সাজানো, গোছানো (collation) ও উপস্থাপন, বিভিন্ন উপভাষায় লিখিত কোরানের আয়াতগুলো কোন ভাষায় সমন্বিত করা। ভাষার সমস্যাকে মেটাবার জন্য ওসমান জায়েদ ইবন থাবিতকে নির্দেশ দিলেন যে ভাষার পরিবর্তন থাকলে কোরেশী উপভাষাকে অগ্রাধিকার দিতে। উল্লেখ্য যে, জায়েদ ইবন থাবিত ছিলেন মদিনার খাজরাজ গোত্রের লোক, একজন অকোরেশী।

যেহেতু কোরানের অধিকাংশ অংশকে ছোট ছোট প্যাসেজে ডিকটেট করা হয়েছে, বর্তমান আকারে ও আলাদা সেকশন ও চ্যাপ্টারে নয়, সেহেতু বিষয়বস্তু বিন্যাসের যে সমস্যা (Problem of textual arangment), সে সমস্যা সমাধানের জন্য কোনো প্রামাণ্য দলিল বা পন্থা নেই। তাই কোরান সংকলন কমিশন পুরো মেটিরিয়েল ঢেলে সাজিয়েছেন এবং অসংশ্লিষ্ট খণ্ডাংশগুলোকে যথাসম্ভব সূরাতে (চ্যাপ্টারে) সন্নিবেশ করেছেন। পুনরাবৃত্তি ও খাপছাড়া অংশগুলোকে এড়িয়ে যাবার জন্য সামান্যই

www.pathagar.com

প্রচেষ্টা করা হয়েছে।

সূরাগুলোর ক্রমপর্যায়কে সঠিকভাবে নির্ধারণ করা অসম্ভব চিন্তা করে, কমিশন সিদ্ধান্ত নিয়ে শুভ আরম্ভ করেছেন 'ফাতিহা' (উন্মোচন) সূরা দিয়ে যে সূরাটি প্রার্থনার আকারে রচিত। 'বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে', বলেছেন ফ্রান্টস্ বুহেল (Frants Buhl), "কমিশনের সুস্পষ্ট মুসলিম চিন্তাধারার অভাব এবং ইহুদি ও খ্রিস্টানদের পরিভাষার উপস্থিতির জন্য এমনটি ঘটতে পারে।" (SEI, 1974, P. 280)। তারপর অতিদীর্ঘ সূরাগুলো উপস্থাপিত করা হয় প্রথমেই; তারপর সাজানো হয় আকারে কম দীর্ঘ বা ছোট সূরাগুলোকে। এই বিন্যাস মূলত রিভিলেশনের ধারাবাহিকতাকে উল্টে সাজানো হয়েছে, কারণ সাধারণভাবে ছোট সূরাগুলো মক্কাতে অবতরণ করেছিল, মদিনার দীর্ঘ সূরাগুলোর আগে।

এই ক্রমবিন্যাসের ফলে, অনেক আয়াত তার মূল অবস্থান থেকে সরে গেছে, কিংবা ছিটকে পড়া খণ্ডিত আয়াতগুলো, যার জন্য কোনো উপযুক্ত স্থান পাওয়া যায়নি। সেগুলোকে যেখানে সেখানে (র‍্যানডম) উপস্থাপিত করা হয়েছে, কিংবা বিষয়বস্তুর সংশ্লিষ্টতা না থাকা সত্ত্বেও উদ্দেশ্যবিহীনভাবে (haphazardly) একসাথে জুড়ে দেয়া হয়েছে। কোনো কোনো স্থানে মক্কার আয়াত ও মদিনার আয়াত একসাথে উপস্থাপন করা হয়েছে, যদিও সেসব আয়াত বিভিন্ন সময়ে ডিকটেট করা হয়। দীর্ঘ সূরার মধ্যে বেশির ভাগ সূরার, যেমন তৃতীয় সূরার (Family of Imran) সংগৃহীত প্যাসেজগুলো বিভিন্ন সময়ের সাথে জড়িত (belonging to different periods)। এমনকি ছোট সূরাগুলো সময় সময় দুই বা ততোধিক বিভিন্ন অংশে গঠিত (Composite)।

এটা জানা যায়নি কে বা কারা এই সূরাগুলোর নাম দিয়েছিলেন ও বিন্যস্ত করেছেন। বলা হয়েছে যে প্রফেট নিজেই সূরাগুলোর টাইটেল দিয়েছেন, কিন্তু এদের বেশির ভাগ, প্রফেটের মৃত্যুর প্রায় পঁচিশ বছর ধরে রচনাগুলো জড়ো করে মিলানো (collated) হয়নি, এটা যুক্তিযুক্ত বলে ধরা যায় না। এটা বলা হয় যে, কয়েকটার অন্তত নাম দিয়ে থাকতে পারেন কিন্তু তাও নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। নাম দেয়ার জন্য কোনো নিয়ম বা পদ্ধতিও ছিল না। সংকলকগণ সূরার নাম দিয়েছেন টেক্সট-এর মধ্যে কিছু মুখ্য শব্দ বেছে নিয়ে অথবা কোনো বিশেষ শব্দকে ধরে যা দিয়ে এটা শনাক্ত করা সম্ভব। কোনো কোনো ক্ষেত্রে একটি সূরা জানা যেত দুটো টাইটেল দ্বারা, পরে অবশ্য একটিকে বাদ দেয়া হয়।

কমিশন যখন সংকলনের কাজ শেষ করেন, তখন হাফসাব মূল সংকলনটি তাকে ফেরত দেয়া হয়। বাকি যেসব কপি ছিল, টুকরো, খণ্ডিত, স্ব-বিরোধী বাণী ইত্যাদি সব কিছু জ্বালিয়ে দেয়া হয়। অনেক মুসলিম সেই সময়, এই খুচরো পাতা ও লিখিত বস্তু যা অতি যত্নসহকারে আল্লাহর ওহি বিচার করে লিখে রাখা হয়েছিল– এইভাবে জ্বালিয়ে দেওয়াকে জঘন্য কর্ম বলে মনে করেছিলেন।

কোরানে একটি সমরূপ ও প্রভুত্বব্যঞ্জক একটি টেক্সট প্রথম নির্ধারণ করা হলো ৬৫৫ সালে। হাফসার মৃত্যুর পর ৬৭০ খ্রিস্টাব্দে মদিনার গভর্নর মারওয়ান ইবন হাকাম, যিনি খলিফা ওসমানের সেক্রেটারি ছিলেন এবং পরে প্রথম মারওয়ান নাম ধরে খলিফা হন হাফসার হেফাজতে যত কোরান সংকলন সম্বন্ধীয় যেসব মেটিরিয়েল

www.pathagar.com

ছিল সব সংগ্রহ করে ধ্বংস করে দেন, যাতে আর কোনো প্রমাণ বা সাক্ষ্য না থাকে ওসমানী কমিশনের সংকলনের বিপক্ষে কোনো আপত্তি তুলতে বা প্রতিবাদ করতে। (বলা প্রয়োজন যে মূল সংকলনের সমালোচনামূলক সংশোধন (recension) আরো পরে করা হয়)

এই নতুনভাবে সংকলিত মাস্টার-টেক্সটের অনেকগুলো কপি করা হয় এবং ইসলামের প্রধান প্রধান কেন্দ্রে বিতরণ করা হয়। এক কপি মদিনায় রেখে অন্যগুলো কুফা, বসরা এবং দামেস্ক, সম্ভবত মক্কায়ও পাঠিয়ে দেয়া হয়। মূল বই থেকে কপি যারা করেছিল তাদের ভুলের জন্য সামান্য পার্থক্য দেখা দেয় অফিসিয়াল কপিগুলোতে; ভুল ছিল সাধারণত বানানে, উপভাষায় (dialect) এবং সূরা ও আয়াতের বিভাজনে।

ওসমানের সংকলন কোরানের একমাত্র সংকলিত গ্রন্থ ছিল না। প্রাথমিক সময় থেকে মুসলিম কাতিবরা যতদূর সম্ভব মোহাম্মদের বাণী লিখে রাখতেন এবং তাদের ব্যক্তিগত সংকলন হিসাবে ঐ পবিত্র আয়াতগুলো ধরে রাখতেন। পণ্ডিত ব্যক্তিরা এই ধরনের সংকলনের একজনের বেশি লিস্টি তৈরি করেন (মাসাহিফ একবচন মুসাফ) তার মধ্যে একটি লিস্ট তৈরি করেন আবু দাউদ (মৃ. ৯২৮) যা এখনো মজুদ আছে।

এইসব ওসমান পূর্ব সংকলন ওসমানের স্ট্যান্ডার্ড সংকলন থেকে ব্যাপকভাবে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় (Watt, I`970, P. 45)। কোনোটাতে পার্থক্য আছে অনুশাসন সম্বন্ধীয় ব্যাপারে; অন্যগুলো শব্দের ব্যবহারে, কমা ও ছেদ ইত্যাদিতে, আর আছে স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণে; সূরার পর্যায়ক্রম ব্যাপারে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে কোনো সূরার চ্যাপ্টারই বাদ দেয়া ও কোরানে ছিল না এমন কয়েক চ্যাপ্টারের সংযোজন।

৭.৭ সূরা প্রারম্ভে উল্লেখিত অক্ষরসমূহ

২৯টি সূরায়, বেশিরভাগ মাদানী সূরা, আরম্ভ হয়েছে কতকগুলো অক্ষর দিয়ে। এগুলো সূরার টেক্সটের অংশ বলে ধরা হয় না, কিন্তু সম্পাদনার। এই অক্ষরগুলোর মাহাত্ম্য অজানা এবং এর অর্থ সম্বন্ধে সন্তোষজনক ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। কিছু নিশ্ছিদ্র রহস্য ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে যাকে ঘিরে শুধু কল্পনার জাল বোনা হয়।

সূরার প্রারম্ভে এই অক্ষরের সমষ্টিকে নিয়ে বিভিন্ন অতীন্দ্রিয় ও দুর্বোধ্য পদ্ধতির মাধ্যমে এর অর্থ খোঁজা হয়, যা অবাস্তব। আরবি বর্ণমালার প্রত্যেক অক্ষরের (হরফ) গুপ্ত অর্থ আছে বলে বিশ্বাস করা হয় এবং এই অর্থ অক্ষরের আকারের মতো— পরিবর্তন হয় তার অবস্থান অনুযায়ী যেমন আরম্ভে থাকলে একরকম অর্থ, মধ্যে থাকলে আর এক রকম অর্থ এবং শেষে থাকলে অন্যরকম। আরবি মূল শব্দের দুই অক্ষরের সমষ্টি বা তিন অক্ষরের সমষ্টি আরও জটিল আকার ধারণ করে। কোনো কোনো পদ্ধতিতে (আবজাদ) প্রত্যেক অক্ষরের গাণিতিক মূল্য আছে এবং এর অর্থ বের করা হয় জেমাট্রিয়া (gematria) নীতি ব্যবহার করে, যেমন গ্রিক ও হিব্রু পদ্ধতিতে করা হয়। (Rabbanial Hebrewতে বলা হয় gematriya, গ্রিক-এ geometria-এ থেকে আসছে geometry)।

এই প্রারম্ভিক হরফগুলোকে বিভিন্নভাবে বলা হয়, আল্লাহর নামের আদ্যাক্ষর বা

www.pathagar.com

তাঁর গুণাবলি বা তাঁর রায় (ডিক্রি) অথবা সূরার অব্যবহৃত টাইটেল। অনেকে বিশ্বাস করেন যে এগুলো হচ্ছে ঐসব লেখক বা খতিবের নামের চিহ্ন (initials) যারা আয়াত লিখে রাখতেন অথবা আবৃত্তিকার ও হাফিজদের চিহ্ন, অথবা সম্ভবত জায়েদ ইবন থাবিতকে যারা কোরানের মূল খণ্ডিত অংশ দিয়েছিল তাদের সঙ্কেত কিংবা যারা আয়াত সংগ্রহ করেছেন অথবা যারা সংকলন করেছেন।

কোনো কোনো অক্ষর বিশেষভাবে ব্যাখ্যাত। যেমন অক্ষর বা হরফ নুন (N) যা সূরা ৬৮-এর আগে বসানো হয়েছে, 'মাছ' বলে অভিহিত করা হয়েছে, সাগর-দানব 'বেহেমথ'-কে চিহ্নিত করে। হরফ কাফ (Q) সূরা ৫০-এর আগে আছে, এর অর্থ হচ্ছে পর্বতমালার বেড়ী যা পৃথিবীকে ঘিরে আছে। KHYAS অক্ষরগুলো, বলা হয়েছে, সূরা ১৯-এর আগে দিয়েছিলেন মোহাম্মদের ইহুদি কাতিব যা "কোহিয়াস (Kohgas)-এর জন্য ব্যবহার করা হয়েছে, অর্থ হলো" এইভাবে তিনি (মোহাম্মদ) আদেশ করেছিলেন।

আবার বলা হয়েছে, ঐসব হরফগুলো প্যাগন দেবতাদের নাম স্মরণ রাখার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। ২৯টি সূরার মধ্যে ১৩টি সূরা আরম্ভ হয়েছে প্রারম্ভিক অক্ষর AL দিয়ে। এদের মধ্যে ৬টি আরম্ভ হয়েছে ALM, পাঁচটি ALR এবং বাকি দুটির মধ্যে একটিতে ALMS অন্যটি ALMR দিয়ে। অক্ষর AL (আল) অর্থাৎ ঈশ্বর; অন্যের মধ্যে আছে প্যাগন দেবতাদের নাম লুক্কায়িত। মেসোপটেমিয়ার সূর্য-দেবতার নাম সিন, হাদ্রামাত পর্যন্ত আরবে যে দেবতার পূজা হয়। এর নাম লুকিয়ে থাকতে পারে সূরা ৩৬-এর পূর্বে বসানো ys অক্ষরের মধ্যে। এর আরবি নাম হলো yasin (ইয়াসিন)। অন্যভাবে এর অর্থ করা হয়েছে 'ইয়া ইনসান', অর্থ হে মানব। কিন্তু সরলভাবে মনে হয় সূর্য দেবতাকে আহ্বান করার উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে, 'O Sin', ওহে 'সিন' দেবতা।

আধুনিক পণ্ডিত ব্যক্তিদের মধ্যে হার্সফিল্ড (Hirsfild) এই মত পোষণ করেন যে, S অক্ষর (সাদ) হাফসাকে উদ্দেশ্য করে, K আবুবকরের জন্য এবং N ওসমানের জন্য। এই তিনজনই নিবিড়ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন কোরান সঙ্কলনের সাথে। অন্য দিকে, নলডেক বিশ্বাস করেন যে প্রারম্ভিক অক্ষরগুলো অর্থহীন প্রতীকী স্বরূপ অথবা ম্যাজিক চিহ্ন। অটো লথ (otto Loth) এই অক্ষরগুলোর সাথে ইহুদিদের ক্যাবালিস্টিক মিস্টিক সিম্বল অর্থাৎ ইহুদি রাব্বীদের গুপ্তমন্ত্রের দুর্বোধ্য প্রতীক। এই ধরনের কাল্পনিক ও গুপ্ত রহস্যের কথাবার্তা অনেকে বাতিল করেছেন এই বলে যে, এগুলো আজগুবি, অবাস্তব ও স্বেচ্ছাচারী কথার ব্যবহার মাত্র, কিন্তু এই অক্ষরগুলো এখনো পর্যন্ত পণ্ডিতদের গবেষণার বিষয়। এইসব থিওরিগুলোকে বিবেচনা করে মন্টোগোমারি ওয়াট বলেন— 'এই হরফগুলো রহস্যজনক' (1970, P. 61)।

৭.৮ কোরানের সমালোচকগণ

মোহাম্মদের জীবদ্দশায়, মক্কা ও মদিনা উভয় শহরে, কোরানিক রিভিলেশনের বাস্তব ও সঠিক প্রকৃতি সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে। তাঁর মৃত্যুর প্রায় পঁচিশ বছর পরে সরকারিভাবে স্বীকৃত সংকলিত কোরান সম্বন্ধে সমালোচকদের তীর্যক দৃষ্টি এড়ায়নি।

www.pathagar.com

এমনকি যারা ইসলাম ধর্ম মেনে চলে, তাদের মধ্যে অনেকে আছেন যারা বিশ্বাস করেন যে প্রফেটিক অনুপ্রেরণা প্রায়ই দৈবক্রমে (casually) এসেছে, এলোমেলোভাবে ডিকটেড করা হয়েছে, অসতর্কভাবে লেখা হয়েছে অথবা অসম্পূর্ণভাবে সংযোজিত হয়েছে।

অনেকে কতকগুলো আয়াতের উপস্থাপনে আপত্তি তুলেছিলেন; অন্যেরা আপত্তি করেছেন লম্বা লম্বা সূরার অনুপ্রবেশ, অনেকে পুরোপুরিভাবে অনুমোদন করেননি। কয়েকটি গোষ্ঠীর (sect) নেতা তাদের মধ্যে কতকগুলো শিয়া ধর্মবেত্তাসহ মনে করেন যে কোরানে কিছু অতিরিক্ত জিনিস যোগ করা হয়েছে, কিছু ছাঁটাই হয়েছে, কিছু সংশোধিত হয়েছে এবং বর্তমান চলতি কোরানকে অবিশ্বাস্য বলে (Falsified) প্রমাণ করা হয়েছে (Gold zi her, 1971, P. 109)।

অনেকে জিজ্ঞাসা করেন আল্লাহর কী এমন দরকার ছিল মরণশীল জীবের কাছ থেকে শপথ নেয়ার– যেমন, সে শপথ করছে ডুমুর ও জলপাই-এর এবং সিনাই পর্বতের নামে (৯৫ ঃ ১), পতোন্মুখ দিবসের নামে (আসর নামাজের সময়) (১০৩ ঃ ১), নক্ষত্র, রাত্রি এবং প্রত্যুষের নামে (৮১ ঃ ১৫ - ১৮) সর্বোপরি, তারা জিজ্ঞাসা করে কেন আল্লাহকে তাঁর নিজের নামে শপথ করতে হলো (৯১ ঃ ৫) যদিও এগুলোর পূর্ববর্তিতা (precedence) আছে যে, ঈশ্বর তাঁর নিজের নামে শপথ করেছেন (আদিপুস্তক ২২ ঃ ১৬)। অনেকে সব প্যাসেজগুলো মিথ্যা বলে বাতিল করেছেন যে আল্লাহ মোহাম্মদের প্রতিপক্ষকে অভিশাপ দিচ্ছেন অথবা সেগুলো– যেখানে তিনি মোহাম্মদের শত্রুদের আবু লাহাব ও তার স্ত্রীর মতো জাহান্নামে ফেলছেন (১১১ ঃ ১)। এইসব নগণ্য প্রতিহিংসাপরায়ণতা সর্বশক্তিমান ও দয়াময় আল্লাহর জন্য প্রযোজ্য নয় (not worthy of Himself)।

অনেকে সমস্ত সূরাগুলো অথেনটিক অর্থাৎ প্রামাণিক বলে গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। যেমন, আজারিদা ও মায়মুনিয়া গোষ্ঠী (seet) ১২ নং সুরাকে বাতিল করেন অর্থহীন বলে কারণ এতে ইউসুফ-জুলেখার (পটিফার স্ত্রী) প্রেম-কাহিনী আছে, (যেখানে এক বিবাহিত মহিলা প্রফেটকে প্রলুব্ধ করেছে), যা একটি মহান পবিত্র ধর্ম পুস্তকের অংশ হতে পারে না

আবদুল্লাহ ইবন মাসুদ নামে প্রফেটের একজন ব্যক্তিগত ভৃত্য, যিনি কোরানের ব্যাখ্যাকার হয়েছিলেন, তিনি তার নিজের জন্য একটি কোরান সংকলন করেছিলেন। এই কোরান কুফাতে অত্যন্ত মর্যাদা ও শ্রদ্ধা পেয়েছিল। ইনি কোরানের প্রথম সূরা এবং শেষ দুটি সূরা (নং ১১৩ ও ১১৪) কোরানের অংশ বলে মনে করেন না এবং তার সংকলিত টেক্সট থেকে সম্পূর্ণভাবে বাদ দিয়েছিলেন।

যদিও সুফিরা সাধারণভাবে কোরানের কোনো প্রত্যক্ষ সমালোচনা করেন না, তবে অনৈষ্টিক (unorthodox) ব্যাখ্যা করেছেন অনেক আয়াত সম্বন্ধে এবং বলেছেন যে ঐ সমস্ত আয়াত দ্ব্যর্থহীনভাবে অনুমোদিত নয়, শুধু রূপক অর্থে ব্যবহার করা যেতে পারে।

আল্লাহ যে কোরান গ্রন্থের রচয়িতা (author) এ ধারণা অনেকে গ্রহণ করেন না। সত্য বলতে কি, বহু মুসলিম চিন্তাবিদ শতাব্দি ধরে তাদের সন্দেহ প্রকাশ করে

www.pathagar.com

আসছেন। গোঁড়াবাদীদের মত হলো যে, কোরান সৃষ্ট নয়, অনন্তকাল ধরে রক্ষিত হয়ে এসেছে পৃথিবী সৃষ্টির পূর্ব থেকেই। তাই তারা সন্দেহবাদীদের অগ্রাহ্য করে।

কোরানের প্রাথমিক সমালোচক হলো মোতাজিলিরা, যাদের ইসলামের মুক্তচিন্তক ও যুক্তিবাদী দল বলা হয়। এই গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠাতা হলেন সুফি রহস্যবাদী ওয়াসিল ইবন আতা (মৃ. ৭৪৯)। তিনি বসরার হাসানের শিষ্য ছিলেন। মুতাজিলিরা গ্রিক ও আলেক্সান্দ্রিয়ান লেখকদের সাথে পরিচিত ছিল অর্থাৎ তাদের জ্ঞানবিদ্যার সাথে পরিচয় ছিল, তাই এরা অনেক গ্রিক ধারণা ন্যায়বাদ ও সন্দেহবাদসহ ইসলামী দার্শনিক ও ধর্মীয় আলোচনায় প্রয়োগ ও আমদানি করেছিলেন।

কোরান যে অনন্ত ও অসৃষ্ট এই গোঁড়াবাদী মতবাদকে মোতাজিলিরা মনে করেন যে এ ধারণা পোষণ করলে কোরানকে আল্লাহর সমকালীন (Coeval) বলা হয় যা অবাস্তব। এ ধারণা তাদের মতে, দ্বিত্ববাদের ধারণা যা আল্লাহর একত্বের বিরুদ্ধে এবং শিরক, অংশীদারিত্ব। কারণ কোরানকে সর্বশক্তিমান আল্লাহর সমতুল্য ও অনন্ত করা হচ্ছে।

তারা এই মত পোষণ করেন যে, কোরানের বাণীর হাজার হাজার খণ্ডিত ও বিক্ষিপ্ত মূল কপি, হাফসার কপিসহ যা সংকলকদের হেফাজতে গচ্ছিত ছিল সেগুলো ইচ্ছাকৃতভাবে ধ্বংস করে ফেলার ফলে এখন সুবিধা হচ্ছে দাবি করতে যে এটি অনন্তকাল ধরে ছিল এককরূপে এবং অপরিবর্তিত রূপে, তবে ইতিহাসকে ফাঁকি দেয়া তো চলে না। এই কিতাবের স্টাইল ও রচনা আহামরি নয় এবং অলৌকিকও নয়। এই গ্রন্থ খাঁটি আরবি ভাষায় লিখিত নয়, এতে বহু বিদেশী শব্দ আছে। অকাট্য প্রমাণও আছে যে এর মধ্যে অনেক কাহিনী, প্যারাবেল ধার করা এবং পরিবর্তিত; আর এতে মোহাম্মদের ব্যক্তিগত মতামতও সন্নিবেশিত। সংক্ষেপে বলা যায়, তারা বলেছেন ও মত প্রকাশ করেছেন এই বলে যে, কোরান মোহাম্মদের রচিত গদ্য-কাব্য, অন্য কিছু নয়।

কোরান সম্বন্ধে মোতাজিলিদের অভিমত যে, এই গ্রন্থ অনিত্য জয়, সৃষ্ট ও উমাইয়া খলিফা দ্বিতীয় মারওয়ান (মৃ. ৭৪৯)-এর পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন এবং আব্বাসী খলিফাদের সরকারি সমর্থন পেয়েছে। আব্বাসী খলিফা মামুন (মৃ. ৮৩৩) ধর্মীয় আদালত গঠন করে এর প্রচলনও করেছেন।

মোতাজিলিদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল ইখওয়ানুস সাফার (প্রায় ৯০০ খ্রিস্টাব্দে), প্রধানত বসরাতে, সদস্যরা। এরা মোহাম্মদের মতবাদ (ডকট্রিন) সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। ইখওয়ানুস সাফা (পবিত্র ভ্রাতৃসংঘ) গ্রিক ও হেলেনিস্টিক ভাবধারায় পুষ্ট এবং তাদের রচিত বিশ্ব কোষ পঞ্চাশ খণ্ডে সমাপ্ত একটি অনবদ্য অবদান। এরা খুব উদার মনোভাবাপন্ন ছিল, তাই এদের নীতি ছিল জ্ঞান আহরণে কোনো গোঁড়ামী থাকা উচিত নয়, কিংবা কোনো মতবাদের ওপর ফ্যানাটিক হওয়াও মানুষের কর্ম নয়। তাদের মুক্ত চিন্তা-ধারা ও উদারমনোবৃত্তির জন্য তারা কোরানের ব্যাখ্যা মুক্তভাবেই করত, এই কারণে তারা গোঁড়া মতবাদীদের রোষানলে পড়ে এবং খলিফা মুস্তানজিদ (মৃ. ১১৭০)কে প্রভাবিত করে তাদের সমস্ত পুস্তকাদি বিশ্বকোষসহ গণসম্মুখে বাজার প্রাঙ্গণে পুড়িয়ে নষ্ট করে ফেলা হয়।

www.pathagar.com

৭.৯ কোরানের হস্তলিপি (script)

প্রাচীন আরবের লিখন পদ্ধতি অনেক দিক দিয়ে অভাবগ্রস্ত ছিল। প্রফেসর গিব বলেন, কোরান যে সময়ে সংকলিত হয়, আরবি লেখন পদ্ধতি অসম্পূর্ণ ছিল, লেখক ছাড়া পাঠোদ্ধার করা মুশকিল ছিল কারণ আরবি ভাষায় বিশেষজ্ঞান ছাড়া হস্তলিপি পাঠ করা বেশ কষ্টকর ছিল (1974, P. 39)।

ওসমানের এই গ্রন্থে সমরূপ ব্যঞ্জনবর্ণকে আলাদা করে পাঠ করা প্রায় অসম্ভব ছিল, স্বরবর্ণ ছিল না (যদিও আলিফ, ওয়াও ও ইয়া পরে স্বরবর্ণরূপে ব্যবহৃত হয়েছে) এবং কোনো বিশুদ্ধ বানানের জন্য (orthographic) চিহ্ন ছিল না। প্রাথমিকভাবে সংকলিত কোরানের যেসব কপি বিভিন্ন শহরে পাঠানো হয়েছিল সেগুলো প্রাথমিক হস্ত লিপিতে লেখা হওয়ার জন্য অসমরূপে লিখিত হয়। এই কারণে টেক্সট সম্বন্ধে বিরোধ উত্থাপিত হতে থাকে। শব্দের বানান, স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ, উচ্চারণ ও অর্থ বিভিন্নতার কারণে পাঠান্তর ঘটে এবং গ্রন্থের স্ব-বিরোধী ব্যাখ্যা শুরু হয়। কুফার মুসলিমরা ওসমানের সংকলিত কোরান বাতিল করে তাদের নিজস্ব ব্যবহার করতে শুরু করে।

উমাইয়া খলিফা আবদুল মালেকের সময় (মৃ. ৭০৫), বিভিন্ন রকম পঠন ভ্রমাত্মক উচ্চারণের কারণে ফ্রি-স্টাইলে কোরান আবৃত্তি ও ব্যাখ্যা ব্যাপকভাবে শুরু হয়ে যায়। আবদুল মালেকের গভর্নর হাজ্জাজ ইবন ইউসুফ একজন আরবি স্কলার ছিলেন ও শিক্ষকরূপে জীবন আরম্ভ করেন। তাঁকে খলিফা বিষয়টি বিবেচনা করে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে আদেশ দেন। তিনি তখন একজন বিখ্যাত সুফি পণ্ডিত বসরার হাসানকে অনুরোধ করেন কোরান পাঠ ও ব্যাখ্যার যাবতীয় গণ্ডগোল দূরীভূত করার জন্য। বসরার হাসান জনৈক ইয়াহিয়া (জন) ইবন ইয়ামারকে (তিনি ও বসরাবাসী) নিয়োগ করেন সমস্যার সমাধানের জন্য।

নেস্টোরিয়ান খ্রিস্টান কর্তৃক ব্যবহৃত ডট্ পদ্ধতির ওপর ভিত্তি করে এবং সিরিয়াক ভাষায় ব্যবহৃত অক্ষর সম্বন্ধে ব্যবহৃত চিহ্ন (diacritical) ও স্বরবর্ণ প্রয়োগ করে ইয়াহিয়া প্রথমে আরবি বর্ণলিপিতে হ্রস্ব ও দীর্ঘ স্বরবর্ণের পার্থক্য নির্ধারণ করেন; পরে ব্যঞ্জনবর্ণের মধ্যে যে সমরূপ ছিল তার পার্থক্য ও শব্দ এবং যুক্ত-ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণ নির্ধারণ করেন। এর পর একটি বাক্যে শব্দের মধ্যে বিভক্তি এবং কমা, পূর্ণ ছেদ, সেমিকোলন, কোলন ইত্যাদি বিরামচিহ্ন (punctuation)গুলোকে কয়েক বছরের মধ্যে ব্যবহারে এনে পাঠ ও আবৃত্তি এবং অর্থ সহজ করে ফেলেন।

আরবি বর্ণলিপি বা লিখন পদ্ধতি এই নতুন জিনিসের আমদানি সহসা সর্বজন কর্তৃক গৃহীত হলো না বা প্রসার লাভ করল না। যেসব চিহ্নগুলো ব্যবহারে চালু হলো তা সমভাবে প্রয়োগ হলো না শব্দের বানানগুলোও হলো না। ব্যাখ্যা বা অর্থ মানুষের মর্জির (ইখতিয়ার) ওপর নির্ভর করল। এরপরও গোঁড়াবাদীয়া আপত্তি তুলল ঐসব ডট্ ও চিহ্ন তো ওহির অংশ নয় বরং দেখা যাচ্ছে পবিত্র কিতাবে বিধর্মীদের জিনিস এনে ঢোকানো হচ্ছে। মহান সুন্নি মোহাদ্দেস খালিক ইবন আনাস (মৃ. ৭৯৫) এই সব ব্যবহার নিষিদ্ধ করে বলেন যে, এই সংশোধিত কিতাব মসজিদ সার্ভিসে নিষিদ্ধ। অন্যান্য পণ্ডিত ও আলেম ব্যক্তি, কয়েক জন খলিফা ও স্থানীয় বাদশারাসহ অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন আগের 'চিহ্নহীন' কোরানই থাকুক যেমন সিগেগগে তোরাহ আছে। বলা

www.pathagar.com

হয়ে থাকে যে, খোরাসানের গভর্নরকে যখন এক পাতা নমুনাস্বরূপ ডট ও বিরাম চিহ্নসহ লিখে দেয়া হয়, তিনি এই বলে আপত্তি করেন, এর ওপর কেন 'ধনের বিচি' (coriander seed) ছড়ানো হয়েছে। তিনি ঐ ডট ও বিরাম চিহ্নগুলো উল্লেখ করে এ কথা বলেন।

সর্বপ্রথম যে মনীষী এই সব সমস্যাগুলোকে সমাধান ও সমন্বয় করে একটি আরবি ভাষার শব্দ ভাণ্ডার প্রস্তুত করেন তিনি ছিলেন হারুন (আরন) ইবন মুসা (মৃ. ৮১৩)। ইনি ইহুদি ছিলেন, পরে ইসলাম গ্রহণ করেন। হারুনের বইটি সর্বপ্রথম আরবি শব্দকোষ তৈরি করার পথ ত্বরান্বিত করে।

এটা বলা জরুরি যে, এই সব উন্নয়ন কোরানিক ভাষা সমস্যা ও সমালোচনায় যে মতদ্বৈধতা তার পরিসমাপ্তি ঘটল না। কারণ আরবি বর্ণমালা সমস্যা চলতে থাকল। এই অসম্পূর্ণতা থাকার কারণে পঠন-পার্থক্য সমস্যা রয়ে যায় এবং বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে প্রত্যেকে কোরান পাঠের জন্য প্রশিক্ষিত কুরার (এক বচনে ক্বারী) জন্য নিজেদের স্কুল প্রতিষ্ঠা করে। সুতরাং বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন পঠন সমস্যা প্রকটভাবে দেখা দেয়, তখন উদ্ভূত সমস্যাকে সমাধানের জন্য আপোষ নীতির এবং ইজ্‌মার (একমত) আশ্রয় নিতে হয়।

এ ব্যাপারে প্রথমে পদক্ষেপ যিনি নেন, বলা হয়, তিনি হলেন ইবন মুজাহিদ (মৃ. ৯৩৬)। তখন আব্বাসী খিলাফতের সময়। প্রথমে দশটি, পরে সাতটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয়; প্রতিষ্ঠা করেন বিখ্যাত এবং গোঁড়া আলেমগণ। তিনটি স্কুল কুফাতে এবং একটি করে বসরা, দামেস্ক, মক্কা ও মদিনায় এই স্কুলগুলোকে 'অথরিটি' হিসাবে গণ্য করা হয় এবং তাদের পঠন পদ্ধতি, উচ্চারণ, বিরাম চিহ্ন ইত্যাদির সোপারেশকে শাস্ত্রসম্মত (Orthodox) বলে স্বীকৃতি দেয়া হয়।

এই গোলমেলে অবস্থা শতাব্দি ধরে চলল। পরে উনবিংশ শতাব্দির শেষ থেকে প্রিন্টেড ও লিথোগ্রাফ কোরানের কপি খুব সতর্কতার সাথে তৈরি করে সমরূপভাবে, যদিও এখনো বিশ্বজনীনভাবে গৃহীত হয়নি, বিতরণ করা হয় ইস্তাম্বুল ও কাইরো কেন্দ্র থেকে এবং বর্তমান আবৃত্তি পদ্ধতি মোটামুটিভাবে অনুমোদিত হয়।

কোরানের হস্তলিপি ও প্রিন্টেড উভয়ই কপিগুলোতে অক্ষর সম্বন্ধে ব্যবহৃত চিহ্ন (dia critical)গুলোকে গ্রন্থের শুরুতেই ছাপানো থাকে যাতে পঠন-পাঠন ইত্যাদি বিষয়ে নিশ্চয়তা দেয়া থাকে। প্রায়ই অক্ষর সম্বন্ধে বেশ কতকগুলো চিহ্ন ব্যবহার করা হয়। কিন্তু স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ পঠন পার্থক্য আগের মতোই থেকে গেছে। কোরানের একটি স্ট্যান্ডার্ড ক্রিটিক্যাল সংস্করণ, সব কিছু বজায় রেখে, এখনো অপেক্ষা করছে আধুনিক পণ্ডিতদের পাণ্ডিত্য থেকে।

৭.১০ কোরানের ভাষা

দাবি করা হয় যে, কোরান খাঁটি আরবি ভাষায় লিখিত এবং ভাষার পরিপূর্ণতাকে প্রতিনিধিত্ব করে। মুসলিমরা উল্লেখ করে থাকেন যে ঈশ্বর শুধু এই পবিত্র গ্রন্থের বাণীর জন্য অথরিটি নন, শব্দের পবিত্রতা, ব্যাকরণের পরিপূর্ণতা এবং গতিশীল স্ট্যাইলের জন্যও অথরিটি।

www.pathagar.com

মোহাম্মদ হাওয়াজিন বেদুইনদের মধ্যে তার বাল্যাবস্থা অতিবাহিত করেন। এই হাওয়াজিন গোত্র ও তার নিজের কোরেশী গোত্রের সাথে কোনো সম্পর্ক ছিল না। যৌবনাবস্থা প্রাপ্ত হলে তিনি বাণিজ্য যাত্রা করেছিলেন প্যালেসটাইন ও সিরিয়াতে এবং সেখানকার ভাষা কিছুটা রপ্ত করে থাকবেন। হেজাজ ও তার আশপাশে কথিত বেশ কয়েকটি উপভাষার সাথে তার পরিচয় ছিল।

মোহাম্মদ তাঁর প্রাপ্ত রিভিলেশনে যে ভাষা ব্যবহার করেছেন তার প্রকৃতি ছিল সংকর জাতীয়। কেননা সে ভাষায় বিভিন্ন ভাষার সংমিশ্রণ ছিল। বলা হয় যে, কোরান অবতরিত হয়েছিল সাতটি বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষাতে অথবা আরবি উপভাষাতে এগুলো হলো, কোরেশ, হাওয়াজীন, থাকিফ (তায়েফের উপভাষা) এবং হোদাইল, আর কাইতান ও আরবদের তিনটি উপভাষা- যেমন, তাঈ, তামিম এবং ইয়েমেনি (হিমিয়ারাইট)। পরবর্তী পণ্ডিতগণ যারা ভাষার খাঁটিত্ব সম্বন্ধে বেশি জানতে চেয়েছিলেন তাদের প্রাক-ইসলামী যুগে আরবি কবিতার ভাষার দিকেও ফিরতে হয়েছিল।

উত্তর আরবের কোনো কোনো অপ্রচলিত ভাষার আভাসও পাওয়া যায় কোরানে ব্যবহৃত ভাষার মধ্যে, যে ভাষা অন্য কোথাও প্রচলিত ছিল না। O'Leary বলেন যে কোরানে ব্যবহৃত আরবি ভাষা থেকে বোঝা যায় যে, এ ক্ষয়িষ্ণু ভাষা। (1927, P. 24) এই সব কম্পোজিট (সংমিশ্রিত) ভাষা ব্যবহার করে মোহাম্মদ আরবিক ভার্সান নির্ধারণ (Fixed) করে দেন পাকাপাকিভাবে এবং এইভাবে সৃষ্ট হয় কোরানিক আরাবিক যা অদ্বিতীয়, অবিচল এবং অপরিবর্তিত ভাষা এবং এ ভাষার কোনো সমালোচনা কেউ করতে পারবে না।

ইসলাম বিস্তারের কালে চলতি আরবি গড়ে উঠল এবং স্বাধীনভাবে উন্নতি করতে থাকল (flourished), এর সাথে যোগ হয়ে গেল বিজিত রাজ্যের শব্দ ব্যাকরণ ইত্যাদি। এই প্রচলিত চলতি ভাষা ব্যাপক ব্যবহারের ফলে সাধারণ মানুষ কোরানের ভাষা থেকে সরে যেতে লাগল এবং পরবর্তীতে সে ভাষা দূরবর্তী ও অপরিচিত বলে মনে হতে থাকল। (Lyall, 1930 P. XXXVIII) এবং অচিরেই সে ভাষার ব্যবহার বন্ধ হয়ে গেল। কথিত ভাষা রূপে ব্যবহার বন্ধ হওয়ার পর কোরানের ভাষা প্রাচীন আরবি ভাষা বলে গণ্য হলো।

বেশ কয়েকটি হাদিসে উল্লেখ আছে যে, প্রফেটের অনেকগুলি ভাষায় দখল ছিল। এই ট্র্যাডিশন অনুযায়ী বলা হয় যে, বিভিন্ন গোত্র এবং জাতি, পার্সিয়ানসহ থেকে যে সব প্রতিনিধি বা লোক এসে প্রফেটের সাথে দেখা করত তিনি তাদের ভাষায় কথা বলতে চেষ্টা করতেন এবং কয়েকটি শব্দ বলতেনও (Tisdall, 1911, P. 257)।

কোরানে বিভিন্ন ভাষার সংমিশ্রণ থেকে প্রমাণিত হয় যে, প্রফেট মোহাম্মদের বিদেশী শব্দ সম্বন্ধে জ্ঞান ছিল। আধুনিক গবেষকরা কোরানে ব্যবহৃত বিদেশী শব্দের লিস্ট তৈরি করে দেখিয়েছেন যে সেখানে ২৭৫টি বিদেশী শব্দ আছে। তাদের মধ্যে আছে : হিব্রু, আরামাইক, সিরিয়াক (বা খ্রিস্টান আরামাইক- এখান থেকেই বেশি নেয়া হয়েছে), সাবাতিয়ান, ইথিওপিক পার্সিয়ান ও গ্রিক। মুসলিম পণ্ডিত সিউতি (মৃ. ১৫০৫)-এর সাথে যোগ দিয়েছেন ভারতীয়, মিশরীয়, কপটিক, তার্কিশ, নিগ্রো

www.pathagar.com

এবং বার্বার।

প্রাচীন মুসলিম তফসিরকারগণ এই বিদেশী শব্দ আমদানি বা ঋণের কথা স্বীকার করেছেন কিন্তু পরবর্তী তফসিরকারগণ, বিশেষ করে ইমাম মোহাম্মদ আল শাফিইর (মৃ. ৮২০) প্রভাবে, এই বিধর্মী কথাবার্তা বাতিল করেন এবং বলেন ভাষার অপরিপূর্ণতা, কপি করার সময় ভ্রমাদি এবং স্বর্গীয় ওহি (Revelation)-এর মাধ্যম রূপে আরবি ভাষা ছিল অপ্রতুল (inadequate)। কোরানের প্রতিটি অক্ষর ও শব্দ আল্লাহ্ কর্তৃক অনুপ্রাণিত বলে তারা ঘোষণা করেন এবং বলেন খাঁটি ও অবিকৃত আরবি ভাষায় লিখে রাখা হয়েছে। এই পবিত্র পুস্তক সব প্রকারের মিশ্রণ থেকে মুক্ত, নকলের বাইরে। এটা পরিপূর্ণ ও অভ্রান্ত গ্রন্থ।

একই সময়ে, জানা যায় যে, মোহাম্মদ খোলাখুলিভাবে আরববাসীদের নিজের উপভাষায় কোরান আবৃত্তি করতে অনুমতি দিয়েছিলেন (আমীর আলি 1965, P. 186), সুতরাং অনুমিত হয় যে ইসলামী বিশ্বে বহু স্থানে দেশীয় ভাষা প্রচলিত ছিল। বিখ্যাত আবু হানিফার (মৃ. ৭৬৭) স্কুল আরবি ভাষা ছাড়া যে কোনো ভাষায় কোরান পাঠের অনুমোদন করেন। ইনি আফগান বংশীয় এবং বিখ্যাত জুরিস্ট (Grunebaum 1961, P. 152)।

তবুও, বর্তমান আকারে কোরান সংকলিত হওয়ার কিছু পরে অধিকাংশ মুসলিম মোল্লা (Theologians) কোরানের অন্য ভাষায় অনুবাদ নিষিদ্ধ করেন, এই সন্দেহে যে অন্য ভাষায় অনূদিত হলে এর ব্যাখ্যা বিকৃত হতে পারে, মূল টেক্সট-এর নির্যাস (essence) বা অস্তিত্ব থেকে সরে যেতে পারে। এর জন্য শতাব্দিকাল ধরে, অধিকাংশ নন-আরব মুসলিম, যারা বিদেশে বাস করেন, তারা না বুঝেই এই আরবি গ্রন্থ মুখস্থ ও পড়তে শুরু করে, যা ইসলামের স্পিরিট বহির্ভূত।

পরবর্তীতে কোরানের অন্য ভাষায় অনুবাদের প্রশ্নটি বহু মুসলিম পণ্ডিত উত্থাপন করেন। কারণ, কোরানই শিক্ষা দিচ্ছে যে আল্লাহ প্রত্যেক জাতিকে তাদের নিজের ভাষায় আইন প্রদান করেছেন, যাতে তারা পড়তে পারে, বুঝতে পারে ও আলোচনা করতে পারে (৪১ ঃ ৪৪)। আরবদের জন্যও তাদের ভাষায় আরবি কোরান পাঠানো হয়েছে যাতে তারা বুঝতে পারে (১২ ঃ ২)।

এই আলোচনার আলোকে যুক্তি দেখানো হয় যে, একজনকে বুঝতে যে আরবি কোরান শুধু আরবদের জন্য, অ-আরবদের নয়। সুতরাং অ-আরব মুসলিমদের তাদের নিজের ভাষায় কোরান পাঠ করা উচিত কোরানকে বুঝবার জন্য।

তাই কোরানের অনুবাদ বিভিন্ন ভাষায় শুরু হয়ে গেল এবং বর্তমানে সত্তরটি ভাষায়, ইন্ডিয়ান ও আফ্রিকান ভাষাসহ কোরান অনূদিত হয়েছে। যদিও আরবি কোরানকে অথরিটি বিবেচনা করা হয়, অন্য ভাষায় অনূদিত কোরানের অবদান ও ব্যাখ্যা ইসলাম প্রচারে যথেষ্ট ভূমিকা পালন করেছে।

৭.১১ কোরানের স্টাইল

কোরানে বিভিন্ন স্টাইলের সন্নিবেশ ঘটেছে উৎফুল্লজনক (ecstatic) আয়াত, ছোট ছোট আয়াত থেকে দীর্ঘ গদ্যছন্দের প্যাসেজ পর্যন্ত। এই স্টাইলের বিভিন্নতা পণ্ডিত

www.pathagar.com

ব্যক্তিদের সাহায্য করেছে মক্কা ও মদিনায় অবতীর্ণ আয়াতগুলোকে পার্থক্য করতে।

শ্রুতিমধুর ও গদ্যছন্দে কোরানিক স্টাইলে ছোট ছোট কবিতা মোহাম্মদের সময়ের বহু পূর্বে আরবি কবি ও ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কারকগণ লিখে গেছেন, যেমন জাইদ ইবন আমর, কস ইবন সাইদ্দা, তায়েফের উমাইয়া এবং আরো অনেকে। প্রাচীন এই ছোট কবিতার অনেকই জনপ্রিয়তা অর্জন করে ও মানুষের মুখে মুখে আবৃত্ত হয় অনেক সময় মনোমুগ্ধকরভাবে। প্রফেটের মক্কান প্রতিপক্ষরা, তাঁর অনুপ্রাণিত বাণীর সাথে প্রাচীন আরবি ক্ষুদ্র কবিতায় জ্ঞান ও মাধুর্যকে তুলনা করে প্রাচীন কবিদের বাণীগুলোকে বেশি জ্ঞান সমৃদ্ধ মনে করত।

ওসমানের কোরান সম্পাদনা ও সংকলনের পর, সূরাগুলোকে প্রশিক্ষিত ক্বারীদের দ্বারা ভাবগম্ভীর কণ্ঠে পবিত্র আয়াত পাঠ করানো হতো যাতে মানুষ মুগ্ধ হয়। শিশুকাল থেকে আরবদের এই আবৃত্তি শুনিয়ে বড় করা হতো মস্তিষ্ক ধোলাই করার জন্য। পবিত্রগ্রন্থ থেকে আয়াত পাঠ করা হতো প্রত্যেক ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠান শুরু করার পূর্বে এবং শিশুর জন্মের সময় ও বৃদ্ধের বা যে কোনো বয়সী মানুষের মৃত্যুর সময় কোরান পাঠ হতো এবং সময়ের সাথে সাথে শ্রোতাদের অন্তরের গভীর ধর্মীয় উদ্দীপনা জাগানোর প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। বিশ্বাসীদের উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে কোরানের প্যাসেজ মুখস্থ করতে ধর্মীয় সম্পদ মওজুদ করার জন্য।

কিন্তু তবুও শুরু থেকে কিছু প্রতিবাদকারীও ছিল যারা বলতে চেয়েছে যে কোরানের স্টাইল ও মর্যাদা নিয়ে বাড়াবাড়ি করা হচ্ছে। মোহাম্মদ চ্যালেঞ্জ করেছিলেন তোমরা দশটা সূরা (১১ ঃ ১৬) বা এমনকি একটি সূরা (১০ ঃ ১৬) যেমন কোরানে আছে তৈরি করো এবং মোল্লারা করেছিল এর সমতুল্য কোনো সূরা মানুষের দ্বারা তৈরি করা সম্ভব নয়। এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে কয়েকজন কবি সূরা রচনায় হাত দেন এবং তারা স্টাইল ও বিষয়বস্তু উভয়েই কোরানের সূরার সমতুল্য, এমনকি একে ছাড়িয়ে গেল উৎকৃষ্টতায়। যখন একজন কবিকে বলা হয় যে তোমার কবিতায় বা সূরায় সেই উৎফুল্লব্যঞ্জকের দ্যোতনা নেই যেমন আছে কোরান আবৃত্তিতে, তখন সেই কবি জবাবে বলেছিল : 'আমারটা একশো বছর ধরে মসজিদে আবৃত্তি করা হোক, তারপর দেখো' (Rodinson, 1976, P. 92)।

যুক্তিবাদী ও মুক্ত চিন্তার অধিকারী মোতাজিলিরা, কোরান যে অলৌকিক গ্রন্থ, গোঁড়াবাদীদের এই মন্তব্যকে মোকাবেলা করার জন্য প্রাচীন আরবি কবি ও জ্ঞানীব্যক্তিদের রচনা জনগণের মধ্যে বিতরণ করেছিল এবং দেখাতে চেয়েছিল যে এই প্রাচীন কবিদের রচনা স্টাইল এবং নৈতিক শিক্ষায় কোরানের চেয়ে অনেক উন্নত। মোতাজিলি লেখক এবং আরবি গদ্যের একজন বিশেষজ্ঞ আমর ইবন বাহার (মৃ. ৮৬৯) আলজাহিজ নামে খ্যাত– বলেছিলেন যে, কোরান রচনায় ও ভাষায়, একটি ভালো গ্রন্থ বটে, তবে পরিপূর্ণ আরবি ভাষায় নয় (not in perfection of Arabic)।

শতাব্দিকাল ধরে বেশ কয়েকজন লেখক দাবি করেছেন যে তারা কোরানিক স্টাইলে লিখতে সমর্থ। তাদের এই দাবির জন্য কয়েকজনকে চরম মূল্য দিতে হয়েছে। কবি ও অনুবাদক ইবন মুকাফা (মৃ. ৭৫৮) কোরানের মতো লিখতে গিয়ে অত্যাচারিত হয়ে মারা যান। ইনি জোরাস্ট্রিয়ান ছিলেন, কিন্তু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে

www.pathagar.com

এবং আরবি সাহিত্যে প্রভূত অবদান রেখে গেছেন।

পারস্যে জন্ম আরবি কবি বাসার ইবন বুরদ (মৃ. ৭৮৪) মুক্ত চিন্তা করতেন এবং বসরায় বাস করতেন। তিনি বলেছিলেন তার যে কোনো কবিতা যদি উপযুক্ত প্রশিক্ষিত ক্বারীদ্বারা আবেগভরে পাঠ করানো হয়, তাহলে তা কোরানের সমতুল্য হবে। যখন তিনি একজন গায়িকাকে তার একটি কবিতা আবৃত্তি করতে শোনেন, তিনি উল্লাস প্রকাশ করে বলেন যে এটা কোরানের সূরা হাশর-এর চেয়ে ভালো।

একজন মোতাজিলি নিঃসঙ্গবাসী (recluse) আবু মুসা আল-মজদার (মৃ. ৮৪০), একজন কারমাতি লেখক মুতানাব্বি (মৃ. ৯৬৫), অন্ধ কবি আবু আলা মাতারি (মৃ. ১০৫৭) এবং মুক্ত চিন্তক মুহাদাবুদ্দিন আল-হিলি (মৃ. ১২০৫)–এরা তখনকার আরবি লেখকদের মধ্যে অন্যতম– ব্যক্তিগতভাবে বা তাদের হয়ে দাবি করা হয় যে তাদের রচনা স্টাইলে ও ভাষার সৌকর্যে এবং নৈতিকগুণে কোরানের সমতুল্য।

পশ্চিমা লেখকদের/পণ্ডিতদের অনেকেই যারা বিষয়বস্তু সম্বন্ধে জানার জন্য কোরান পড়েছেন সমালোচনা করার কারণে নয়, তারা মনে করেন এর অধিকাংশ, আঁদ্রে যেমন বলেছেন, পাঠে বিরক্তি ধরে যায়; এটা সত্যি যে, বেশির ভাগ ধর্ম পুস্তক পাঠে একই রকম বিরক্তি জমে যায়।

উনবিংশ শতাব্দির পশ্চিমা পণ্ডিতদের মধ্যে টমাস কারলাইল মোহাম্মদের প্রশংসা করেছেন। কিন্তু কোরান সম্বন্ধে তাঁর মত হলো– 'a wearisome confused jumble, crude, incondite' and complained of its endless iterations, long windedness, entanglement --insupportable stupidity, in short! Nothing but a sense of duty could carrry any European the through The Koran!' (Ruthven, 1984. P. 102) অর্থাৎ এমন এলোমেলো ও বিশৃংখল যে পড়তে বিরক্তি ধরে, অশোধিত ও অসংস্কৃত, অসমাপ্ত; তিনি অভিযোগ করেন যে এতে অসংখ্য পুনরাবৃত্তি আছে, কুণ্ডলী পাকানো রচনায় যুক্তিহীন বক্তব্য আছে যা সমর্থন করা যায় না। এ পুস্তক পাঠ করে কোনো ইউরোপিয়ান পাঠকের কর্তব্য পালন ছাড়া আর কিছু পাওয়ার নেই।

থিওডোর নলডেক একজন প্রখ্যাত আরবি স্কলার; তিনি কোরানের স্টাইলে যে অসম্পূর্ণতা আছে তার বিস্তারিত আলোচনা করে বলেছেন– আরবি ভাষায় যদি নমনীয়তা (flexibility) না থাকত, তাহলে কোরানের শেষাংশ দ্বিতীয়বারের জন্য পাঠ করা অসহ্য ঠেকত।

৭.১২ কোরানের দুর্বোধ্যতা

আরবি হস্তলিপির অসম্পূর্ণতা, অনেক আরবি শব্দের একাধিক অর্থ এবং প্রায়ই দ্ব্যর্থ-বোধক ভাষাতে লিখিত কোরান বলেই অনেক ব্যাকরণ ও অর্থ সম্বন্ধীয় (Semantic) সমস্যা দেখা দেয়। ফলে এই পবিত্র গ্রন্থের পঠনেও বিভিন্ন ধরনের সমস্যা দেখা দেয়ার যাতে তফসিরকারদের জন্য ব্যাখ্যা করা কঠিন কাজ হয়ে দাঁড়ায়।

কোরানের টেক্সটের মধ্যে স্বাভাবিক অসুবিধা ব্যতিরেকে, কোরানের অধিকাংশ দুর্বোধ্য এবং সময় সময় সানে-নজুলের জ্ঞান না থাকলে সংশ্লিষ্ট অংশ বোধগম্য হয়ে ওঠে না; অর্থাৎ কোনো ঘটনা ও অবস্থাতে আয়াত নাজেল হলো এবং কোনো বিশেষ

www.pathagar.com

ব্যক্তি বা গ্রুপকে বলা হচ্ছে তা জানা না থাকলে অর্থ উদ্ধার করা কঠিন হয়। এসব বিষয়ে যেসব ট্র্যাডিশন আছে সবই আন্দাজের ওপর নির্ভর করে বর্ণিত।

একটি দুর্বোধ্য আয়াতকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে চরিতকার ও তফসিরকাররা কোরানের প্যাসেজ পরোক্ষভাবে বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করে থাকেন তাদের নিজস্ব ভাবধারায়। বিশেষ কোনো একটি আয়াতকে সত্যনিষ্ঠ করার জন্য গল্পের অবতারণা করা হয় এবং বলা হয় অমুক সময়ে অমুক ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন যখন আয়াতের ওহি নেমে আসে। এসব গল্পের বেশির ভাগই কাল্পনিক ও স্বকপোলকল্পিত।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কোরান বলছে, 'যারা কুৎসা রটায়, গিবত করে তাদের ওপর লানত (১০৪ ঃ ১) অন্য কথায়, দুর্ভোগ প্রত্যেকের, যে পশ্চাতে ও সম্মুখে লোকের নিন্দা করে। এটা একটা সরল সাবধান বাণী হতে পারত। কিন্তু তফসিরকাররা এর কারণ খুঁজে বের করেছেন কেন প্রফেট একথা বললেন। এটা বোঝাতে গিয়ে তারা (অনেক তফসিরকার প্রফেটের মৃত্যুর অনেক পরে জন্মেছেন) গল্প ফেঁদেছেন, সংলাপসহ, ঐ লোক সম্বন্ধে যে প্রফেটের নিন্দা করেছে এই কারণেই এই আয়াতের আগমন। এমনকি সময়, ক্ষণ ও লোকের নামও উল্লেখ করা হয়েছে। এই ধরনের এক অপরাধীর নাম আখনাস ইবন শোরাইখ, অন্যজন হলো ওয়ালিদ ইবন মোগাইরা এবং আরো একজন হচ্ছে উমাইয়া ইবন খাল্‌ফ।

ফল হলো যে, কয়েকটি ঘটনা এবং বিভিন্ন ধরনের ব্যাখ্যা একই আয়াতের পক্ষে দেয়া হয়, আর এগুলো পরস্পরবিরোধী হয়ে দাঁড়ায়। একটা সিঙ্গল শব্দগুচ্ছকে (Phrase) ডজন তফসিরকার বারো রকমের ব্যাখ্যা করেছেন এবং প্রত্যেকে তাদের নিজস্ব ভিন্ন মত ব্যক্ত করেছেন। অনেকে আবার শেষে বলেছেন, এর আসল অর্থ একমাত্র আল্লাহই জানেন, আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

৭.১৩ কোরানে পরিবর্তন

প্রফেট মোহাম্মদের অবিশ্বাসী প্রতিপক্ষের মতে, তাঁর ডিকটেট করা গ্রন্থটিকে স্বর্গের অপরিবর্তনীয় গ্রন্থ বলে বিবেচনা করা যায় না, কারণ প্রফেটের দ্বারাই এর ঘন ঘন পরিবর্তন ঘটেছে, যিনি সময়ে সময়ে এক আয়াতের স্থানে অন্য আয়াত উপস্থাপন করেছেন (১৬ ঃ ১০৩)। কোরানে যদিও বলা হয়েছে যে মোহাম্মদ নিজের ইচ্ছায় কোনো পরিবর্তন করেননি, করেছেন নির্দেশপ্রাপ্ত হয়ে (১০ ঃ ১৬), এই ভাষ্যে প্রতিপক্ষের বক্তব্যকেও দুর্বল করা হয় না।

তথাকথিত শয়তানের আয়াতগুলো জনসম্মুখে অবতীর্ণ, আবার জনসম্মুখেই প্রত্যাহার করা হয়। এটা অজানা নয় যে, অনেক আয়াত যা পূর্বে প্রফেট মোহাম্মদ ডিকটেট করেছিলেন, পরে হারিয়ে গেছে, খুঁজে পাওয়া যায়নি। একজন কাতিব (আয়াত লেখক) আব্দুল্লাহ ইবন মাসুদ (প্রখ্যাত সাহাবী) প্রফেটের ডিকটেশনে একটি আয়াত লিখেছিলেন, কিন্তু পর দিন সেই লিখিত পাতাটি আর খুঁজে পাননি। এ ব্যাপারটি তিনি প্রফেট মোহাম্মদের কাছে ব্যক্ত করলে তিনি তাকে বলেন যে, রাতে সেই আয়াতটি বাতিল হয়েছিল।

নিন্দুকরা বলে থাকে প্রফেট মোহাম্মদ তাঁর কিতাবে প্রায়ই কিছু না কিছু নির্দেশ

www.pathagar.com

দিয়ে পরে তা বাতিল করে অন্য আদেশ দেন। একাধিক দৃষ্টান্তে তিনি (প্রফেট) তাঁর রিভিলেশনে কিছু বিষয় জুড়ে দিয়ে মূল অংশ বদলে দিয়েছেন আশপাশে বেষ্টিত সাহাবীদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে (Being prompted by them)।

একবার ডিকটেশন দেবার সময় প্রফেট বলেন : যেসব মুসলিম বাড়িতে বসে থাকে তাদের মর্যাদা মুজাহিদদের (যারা আল্লাহর কারণে যুদ্ধ করে) থেকে কম। একথা শুনে এক অন্ধ মানুষ আবদুল্লাহ ইবন উম্মে মাকতুম অভিযোগ করে বলে, যদি তার অন্যদের মতো চোখ থাকত, নিশ্চয়ই সে-ও যুদ্ধে যেত। একথা শুনে প্রফেট ধ্যানমগ্ন হলেন এবং একটু পরে তার আগের বক্তব্য বদলে নতুন আয়াত বলেন। আয়াতটি হলো : যেসব মুসলিম ঘরে বসে থাকে, অক্ষম না হলে, তারা মুজাহিদদের (জেহাদী) সমান নয় (৪ ঃ ৯৭)।

অন্য একজন কাতিব (আয়াত লেখক) আবদুল্লাহ ইবন সাদ (তৃতীয় খলিফা ওসমানের সৎভাই) নিজেই আয়াতে পরিবর্তন করতেন (আমির আলী 1965. P. 295) এবং একবার প্রফেট মোহাম্মদের ডিকটেশনের পর শেষে এক শব্দগুচ্ছ (Phrase) জুড়ে আয়াতটি সম্পূর্ণ করেন (২৩ ঃ ১৪) এবং এই শব্দগুচ্ছ কোরানে উপস্থাপিত হয়েছে।

পরে আবদুল্লাহ ইসলাম পরিত্যাগ করে (abjured) মক্কায় পালিয়ে গর্ব করে বলে বেড়ান যে, কোরানের একটি বাক্যের তিনি রচয়িতা, কারণ তিনি শব্দগুচ্ছ জুড়ে দিয়ে আয়াত সম্পূর্ণ করেন। তার মতে রিভিলেশনটি ছিল প্রতারণা (hoax), (Glubb, 1979, P. 308)। প্রফেট মোহাম্মদের মাথায় যা আসত তিনি ডিকটেট করতেন (Thaalibi, 1968 P. 69) এবং তিনি নিজেই রিভিলেশনের শব্দগুলো পরিবর্তন করতেন।

এটাও দাবি করা হয় যে আবুবকর তার কন্যা আয়েশার (প্রফেটের প্রিয় পত্নী) মাধ্যমে প্রফেটকে প্রভাবিত করেছেন বাণী রচনায় এবং এটা সত্য যে আয়েশার সঙ্গে থাকা অবস্থায় প্রফেট বেশ কয়েকটি রিভিলেশন পেয়েছেন। বলা হয় যে, অন্য কয়েকটি রিভিলেশন এসেছে ওমরের পরামর্শে। বহুবার এমনও ঘটেছে যে, প্রফেট মোহাম্মদ মনস্থির করতে ইতস্তত করেছেন এবং রিভিলেশন পাওয়ার পূর্বে পরামর্শ চেয়েছেন। ওমরও গর্ব করতেন (সম্ভবত বিনয়ী হয়ে) এই বলে যে তিনি প্রফেটকে অনেকবার পরামর্শ দিয়েছেন, পরে অলৌকিকভাবে তা রিভিলেশনে পরিণত হয়ে আকাশ থেকে নেমে এসেছে (Rodinson, 1976, P. 219)। মুসলিম ধর্মতত্ত্ববিদরা স্বীকার করেছেন যে কোরানের আয়াতে পরিবর্তন হয়েছে ২২০ বার, কিন্তু ব্যাখ্যা করে বলেছেন এসব পরিবর্তন হয়েছে 'বাতিলনীতি' (doctrine of abrogation) অনুসরণ করে। এই মতানুসারে কোনো কোনো বিষয়ে বিশেষ অবস্থায় অনুপ্রেরণা কাজ করেছে তাও অস্থায়ী ভাবে এবং অবস্থার পরিবর্তনে সংশ্লিষ্ট আয়াত পরিবর্তিত হয়েছে, বাতিলও হয়েছে। উল্লেখ্য, ভুলবশত সংকলনের সময় কোরানে ছোটখাটো যেসব পরিবর্তন হয়েছে বা অন্যভাবে আয়াত লেখক (কাতিব), হাফিজ, নকলবিদ্ ইত্যাদিদের দ্বারা যা কিছু ঘটেছে এসব পরিবর্তনের সাথে প্রফেট মোহাম্মদ কর্তৃক পরিবর্তন আলাদা ব্যাপার, কারণ প্রফেট যা করেছেন তা স্বজ্ঞানে অবস্থার পরিবর্তনে

www.pathagar.com

বা কোনো সমস্যাকে সামাল দিতে করেছেন; আর সংকলনে বা লেখার কারণে, ভুলবশত যে পরিবর্তন হয়েছে তা হয়তো অনিচ্ছাকৃত। তবে আবুবকর, ওমর, ওসমান এবং উমাইয়া খলিফাদের প্রথম কয়েকজন ইচ্ছাকৃতভাবে, স্বার্থের কারণে, কোরানের আয়াতসমূহ পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করেছেন, তার থিওরি আলাদা। এ সম্বন্ধে পরে আলোচনা হবে।

৭.১৪ অসম্পূর্ণ কোরান

কোরান যে অসম্পূর্ণ গ্রন্থ এ বিষয়ে অনেকে মত প্রকাশ করেছেন। বলা হয় যে, 'রিভিল্ড কোরান' স্বর্গীয় কিতাবের পরিপূর্ণ প্রতিলিপি (transcript) নয় বা এটা দাবি করাও হয় না। এটা অচিন্তনীয় যে আল্লাহ ইহকাল ও পরকাল সম্বন্ধে যা অবতীর্ণ করেছেন তা একটিমাত্র গ্রন্থে ধারণ করা সম্ভব। কোরানেই এ কথা সমর্থন করেছে (১৮ ঃ ১০৯)।

কোরানে পরিষ্কার ভাষায় বলা হয়েছে যে অন্যান্য নবী-রসূলের কাছে আল্লাহ যা 'রিভিল' করেছেন তার সব কিছুই প্রফেট মোহাম্মদের কাছে করা হয়নি। (৪ ঃ ১৬২) আরো বলা হয়েছে, কোরান নৈতিকতার সংক্ষিপ্তসার (Compendium) নয় এবং লিগেল কোডও নয় এবং মুসলিম আইন কৃচিৎ এর ওপর নির্ভর করে, এতে আইনের নীতি ব্যাখ্যাত আছে যা আছে অন্যান্য ধর্মেও।

প্রফেট মোহাম্মদ যত কথা ও বাণী বলেছেন তার সব কিছুই কোরানে ধারণ করা হয়নি। মোতাজ্জিলিরা বলেন– কাতিব ও হাফিজরা সব সময়েই প্রস্তুত থাকত না লেখার জন্য যখন প্রফেট মোহাম্মদ প্রথমে রিভিলেশন পেতে শুরু করলেন এবং তিনি যা বলেছিলেন তার সবই লিখে রাখা সম্ভব হয়নি। এই কারণে অনেক কিছু হারিয়ে গেছে। এটাও সম্ভব যে, প্রফেট মোহাম্মদ নিজেই অনেক কিছুকে কোরানের অংশ হিসাবে লিখে রাখার মতো বিবেচনা করেননি (Watt, 1953, P. 47); এমনকি যখন বাণীগুলো লেখা শুরু হলো, তখন অনেক সময় বরং উল্টো-পাল্টা (haphazard) ভাবে লেখা হয়েছে, যা স্বাভাবিক। তখনো পর্যন্ত প্রফেট মোহাম্মদ গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বরূপে পরিগণিত হননি এবং কেউ চিন্তা করেনি তাঁর বক্তব্যের আদি-অন্ত লিখে রাখা ভবিষ্যতে গুরুত্ব লাভ করবে।

এটাও সম্ভব যে, প্রফেট মোহাম্মদ নিজে কিছু স্মরণে রাখতে পারেননি বা কিছু অংশ ভুলে যেতে পারেন যা তাঁর কাছে অবতীর্ণ হয়েছে– এ সম্ভাব্যতা কোরানেও উল্লেখ আছে (২ ঃ ১০০)। আবার কিছু সূরা এবং অনেক আয়াত, যা এখানে ওখানে ছড়িয়ে ছিল, হাফেজরা মুখস্থ করছিলেন। এই সব হাফেজদের কিছু স্মরণ না-ও থাকতে পারে যা হারিয়ে গেছে। তাছাড়া স্বাভাবিক মৃত্যু বা যুদ্ধে, বিশেষ করে ইয়ামামা যুদ্ধে, হাফেজদের মৃত্যুর কারণে হারিয়ে যেতে পারে, নষ্ট হতে পারে, মূল বাণী বিকৃত বা দূষিত হতে পারে।

প্রফেটের স্ত্রী আয়েশার একটি হাদিস অনুযায়ী একটি সূরা যাতে সত্তরটি আয়াত ছিল (এর পূর্বে বলা হয়েছিল ২০০-এর অধিক আয়াত), ওসমানের সময় যখন কোরান সঙ্কলন শুরু হয় তখন ঐ আয়াতগুলোকে খুঁজে পাওয়া যায়নি (Guillaume,

www.pathagar.com

1983, P.191)। বিশ্বাস করা হয় যে, একটি পাতায় ব্যভিচারের কারণে পাথর ছুড়ে মারার বিধান ছিল, সেটাও হারিয়ে গেছে। আয়েশা বলেছেন যে, ঐ পাতাটি প্রফেটের শেষ অসুখের সময় বিছানার বালিশের তলায় ছিল, কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর যে অবস্থার সৃষ্টি হয় ঐ সময় একটা ছাগল ঘরে ঢুকে আয়াতসহ পাতাটি খেয়ে ফেলে (Rahman 1966, P.65)। আয়েশার এই বক্তব্যটিকে পরে মোতাজিলিরা উল্লেখ করে বলে আল্লাহ কেমন করে একটা ছাগলকে ঘরে ঢুকে পাতাটি খেয়ে ফেলতে অনুমতি দিলেন এবং স্বর্গ থেকে আগত একটি আইনের বিধানকে চিরকালের জন্য নষ্ট হতে দিলেন যা বিশ্বাসীদের পালন করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছিল?

এ কথাও উল্লেখ করা হয় যে ব্যক্তিগতভাবে অনেক মুসলিমের কাছে খুচরো খুচরো আয়াত সংগ্রহে ছিল; আবুবকর ও ওসমান যখন বিক্ষিপ্ত আয়াতগুলোকে কমিটির কাছে জমা দিতে বলেন, অনেকে জমা দেয়নি। কাজেই ঐসব জমা-না-দেয়া আয়াতগুলো কোরানে সঙ্কলিত হয়নি। প্রফেট মোহাম্মদের কাতিবদের একজন ওবেই ইবন ক্বাব নিজের জন্য একটি কোরান গ্রন্থ সঙ্কলন করেন। এই কোরান সিরিয়াতে বিশেষভাবে আদৃত হয়। এই কোরানের মধ্যে দুটো সূরা ছিল যা স্ট্যান্ডার্ড কোরানে (ওসমানের কোরানে) দেখা যায় না।

শিয়ারা (আলীর পার্টি) সুন্নিদের বিরুদ্ধে দুর্নীতি (তাহরিফ) অভিযোগ এনে বলেছেন যে, এই কোরানের টেক্সটে ইচ্ছাকৃতভাবে কিছু অংশ বিকৃত করা হয়েছে কিংবা সেগুলোকে চাপা (suppress) দেয়া হয়েছে। তারা অভিযোগ করে যে, ওসমানের নির্দেশে, আলীর পক্ষে একটা গোটা সূরা যা মূল রিভিলেশনের অংশ ছিল, ইচ্ছাকৃতভাবে বাদ দিয়ে জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে। সুতরাং এটা মিথ্যা দাবি যে ওসমানের কোরান একটি সম্পূর্ণ কোরান।

ওসমানী কোরান সঙ্কলিত হবার পর কয়েক দশক ধরে সময়ে সময়ে হাফেজরা ছোট ছোট আয়াতের সমষ্টি আবৃত্তি করেছেন যার উল্লেখ ওসমানী কোরানে ছিল না। অনেক মুদ্রায় এবং প্রতিলিপিতে অনেক ছোট শব্দগুচ্ছ 'কোটেশন' রূপে পাওয়া যায়, প্রফেটের ডিকটেটেড আয়াত বলে ধরা হয়েছে, তারও উল্লেখ ছিল সঙ্কলিত কোরানে।

একটা প্রাচীন ট্যাডিশনে বলে : কেউ যেন না বলে যে, সে কোরানের সব কিছুই জানে, কারণ কেউ কি বলতে পারে এর পরিপূর্ণতা কোথায়, যখন এর অনেক কিছুই অদৃশ্য হয়ে গেছে? বরং সে বলুক যা বর্তমানে আছে সে সেইটুকুই জানে।' (Sweetman, 1985, P. 37)

৭.১৫ কবিতা রূপে কোরান

কোরান বলে, যারা গোল্লায় গেছে তারা কবিদের অনুসরণ করে (২৬ ঃ ২২৪)। প্রফেট মোহাম্মদের প্রতিপক্ষ নিন্দাবাদ দিয়ে বলেছেন, কোরান কবির কবিতারই প্রতিনিধি (৬৯ ঃ ৪১), স্বপ্নের জগাখিচুড়ি (medley) ২১ ঃ ৫ এবং বৃদ্ধ মহিলাদের কেচ্ছার পুনরাবৃত্তি যা লিখে রাখা হয়েছে। (২৫ ঃ ৬)।

এই গ্রন্থে কবিরা চিহ্নিত হবে বলেই প্রফেট মোহাম্মদ কবিদের ও তাদের কবিতা অপছন্দ করেছেন। এক হাদিস অনুযায়ী প্রফেট বলেছেন : কবিদের চেয়ে কোনো

www.pathagar.com

প্রাণী আমার কাছে ঘৃণ্য নয় এবং এমনকি আমি তাদের উপস্থিতি সহ্য করতে পারি না। আমি কবি হলে বা জ্বিনগ্রস্ত হলে আমার দুর্ভাগ্য হতো বলে মনে করি। আবার অন্য দিকে কবিদের ক্ষমতা ও জনপ্রিয়তা তার অজানা ছিল না, তাই তিনি নিজের কাজের জন্য কবিদের নিয়োগ করেছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগগুলোকে খণ্ডানোর জন্য তিনি প্রখ্যাত কবি হাসান ইবন থাবিবকে নিয়োগ করেন।

তবু, প্রফেট ও কবিদের মধ্যে তুলনাটা ভিত্তিহীন নয়। প্রথম দিকে কোরানিক বন্ধনগুলো মাপা শব্দে গ্রন্থিত এবং প্রায়ই গদ্য ছন্দে (সাজ) এবং শব্দগুচ্ছ প্রশংসিত স্টাইলে গাঁথা। এর ধ্বনি, দ্যোতনা এবং অভ্যন্তরীণ ছন্দ মানুষের মনকে মাতিয়ে দেয়। সূরা তাকভীরের (৮১) ১ - ১৩ আয়াত এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

অন্য কবিদের মতো প্রফেট মোহাম্মদকে গণকের মতো মনে হতো (৫২ : ২৯), ভূতগ্রস্ত (৪৪ : ১৩), জাদুগ্রস্ত (২৫ : ৯)। ঐ সময়ের গণক ও কবিদের যে স্বভাব ও আচরণ ছিল প্রফেটের বেশভূষায় তা প্রকাশ পেত। তিনি সময় সময় তাঁর মাথা চাদর (বারদা) দিয়ে ঢাকতেন যখন রিভিনেশন আসত। কবিদের মতো তিনি তাঁর অনুপ্রাণিত বাণী কাতিবদের ডিকটেট করতেন। প্রথম দিকের অনেক সূরার (নং ৩৭, ৬৮, ৭৭, ৮৫ ইত্যাদি) কবি ও গণকদের মতো শুরু করেছেন 'শপথ ফরমুলা' দিয়ে। কবি ও জাদুকরদের ন্যায় শত্রুদের প্রত্যক্ষভাবে অভিশাপ ও অমঙ্গল কামনা করেছেন।

কয়েকজন তফসিরকারের মতে, প্রফেট যে কবি ছিলেন না, তিনি যে পাগল ছিলেন না (৩৭ : ৩৫), তিনি যে ভূতগ্রস্ত ছিলেন না (৫২ : ২৯), তিনি যে প্রতারিত হননি (২১ : ৫)– এই দাবির পেছনে কাজ করত তাঁর সন্দেহ, অনিশ্চয়তা এবং উদ্বিগ্নতা যে পরে তিনি যেন বিভ্রান্তির শিকার না হন। কিন্তু তাকে আশ্বস্ত করা হয়েছিল কেননা কোরানে বলা হয়েছে আমরা (ঈশ্বর) তাঁকে (মোহাম্মদ) কবিতা লেখা শিক্ষা দেই নাই, এটা তাঁর জন্য সমীচীনও নয় (৩৬ : ৬৯)।

৭.১৬ কোরানের গ্রন্থকারত্ব

মক্কাতে ও পরে মদিনাতে প্রফেটের মিশনের শুরু থেকেই তার সমসাময়িক ব্যক্তিবর্গ কোরানের (গ্রন্থকার) রচয়িতা হিসাবে তাঁর দাবিকে উপহাস, মস্করা করেছেন। তাঁর রিভিলেশনগুলো বাঁকা চোখে দেখে ভ্রূকুটি করেছেন, সেগুলো তাঁর স্বচরিত বা আবিষ্কার বলে (১১ : ১৬); এটাও বলা হয়েছে যে এই সব আবিষ্কারের দ্বারা কাজ ও অ-কাজকে ও মতামতকে অনুমোদন দেয়ার চেষ্টা করেছেন। তারা জাল (forge) বলে এই পবিত্র গ্রন্থ বাতিল করেছে (২৫ : ৫) এবং কোরান তাঁর তৈরি করা বলে অপবাদ দিয়েছেন (১৬ : ১০৩)।

এটা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, প্রফেট তাঁর বক্তব্যকে সমর্থন দিতে আল্লাহকে হাজির করানোর জন্য সোজা পন্থা অবলম্বন করেছিলেন। একটি সূরা বা আয়াত আরম্ভ করা হয়েছে 'বল' (কুল) শব্দ দিয়ে যেন আল্লাহ মোহাম্মদকে আদেশ দিচ্ছেন অনুসরণ করতে। এই 'বল' আদেশ কোরানে ৩০০ বারের অধিক উল্লেখ করা হয়েছে।

বিরোধ জড়িত বিষয় সম্পর্কে এই পন্থায় সময় সময় যুক্তিতর্কের অবতারণা হতো, যেখানে প্রফেট প্রতিপক্ষের আপত্তিগুলো তুলে ধরতেন এবং পরে নিজেকেই

www.pathagar.com

নির্দেশ দিতেন সেগুলোর জবাব দিতে। এই রূপে, নিষিদ্ধ মাসে কেন যুদ্ধ করা প্রয়োজন তার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি নিম্নোক্ত ওহি পান– "তাহারা (প্রতিপক্ষ) তোমাকে (ওহে মোহাম্মদ) জিজ্ঞাসা করে নিষিদ্ধ (পবিত্র) মাসে যুদ্ধ করা সম্বন্ধে। বলো (তাদের)– 'যুদ্ধ করা পবিত্র মাসে ভালো নয়, কিন্তু আল্লাহর পথ থেকে সরে যাওয়া আরও খারাপ' (২ ঃ ২১৪)।

প্রফেট মোহাম্মদের শক্ররা অভিযোগ করে যে, কোরানের অধিকাংশ তাঁর (মোহাম্মদ) রচনা এবং অনেক প্যাসেজের মাল-মশলা অন্য উৎস থেকে নকল করা হয়েছে কিংবা অন্যের কাছ থেকে ডিকটেশন নেয়া হয়েছে। তারা জোর দিয়ে বলে যে তাঁর (মোহাম্মদ) অনেকগুলো সহকারী ছিল তাঁর রিভিলেশন রচনা করার জন্য, এদের মধ্যে ইহুদি ও খ্রিস্টানও ছিল এবং তাদের (ইহুদি ও খ্রিস্টান) কিতাব তোরাহ ও ইঞ্জিল থেকে অনেক মেটিরিয়েল কোরানে ঢোকানো হয়েছে।

মোতাজিলি মুসলিমদের সাথে ইখওয়ানাল সাফা ও অন্যান্য যুক্তিবাদী দলের সমালোচকরা ইসলামের ইতিহাসে অনুরূপ রায় বিভিন্ন প্রকারে প্রকাশ করেছেন। প্রফেট মোহাম্মদের মতামত উল্লেখ করে তারা কোরানকে বলেছে 'বর্ধিত হাদিস'। আধুনিককালে প্রখ্যাত লেখক সৈয়দ আমির আলী, যিনি ইসলাম সম্বন্ধে একটি বহুল প্রচারিত (মুসলিম ও অ-মুসলিমদের মধ্যে) গ্রন্থ লিখেছেন, প্রফেট মোহাম্মদকে কোরানের রচয়িতা বলে মনে করেন (Guillaume, 1983, p. 160)।

পশ্চিমা স্কলারগণও এই বলে মন্তব্য করেছেন যে কোরান মনুষ্যকৃত, যেখানে প্রফেটের নিজস্ব ব্যক্তিত্বের প্রতিফলন ঘটেছে। মোহাম্মদের গ্রন্থকারত্ব প্রকাশ পায় ও প্রমাণ করে গ্রন্থের অভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য থেকে। কারণ, কোরানের অনেক মেটিরিয়াল বাইরের গ্রন্থ থেকে ধার করা, কিছু অংশ বাতিল, নতুন উপস্থাপন করা (abrogation)। সংশোধন করা, পরস্পরবিরোধী কথাবার্তা, স্টাইলের ছন্দপতন, অনেক প্যাসেজের তদর্থক প্রকৃতি (ad-hoc nature) এবং প্রফেটের ব্যক্তিগত মতামতের ইঙ্গিত, তাঁর ইচ্ছা ও দাবি, তাঁর পছন্দ ও অপছন্দ ইত্যাদি। তারা জিব্রাইল ও তদ্রূপ এজেন্টের মাধ্যমে পাওয়া স্বর্গীয় গ্রন্থকারত্বের ধারণাকে বাতিল করার কথা বলেন। ইতালীয় আরবি ভাষাবিদ লিওন সিতানি কোরানকে বলেছেন এক ধরনের সংবাদপত্র, যাতে দৈনন্দিন নির্দেশ ছাপা হয়েছে। বুলেটিন পারিবারিক বিষয়ে রায় এবং চলতি বিষয়ে অনেক সংবাদ ছাপা হয়েছে। বিভিন্নভাবে বলা হয়েছে যে কোরান ছিল প্রফেট মোহাম্মদের 'দিনের কড়চা', 'বক্তব্য', 'ডায়েরি', 'টেবিল টক', 'সারমন', 'আত্মকাহিনী' কথা বা আলোচনা এবং সমস্তই তার নিজের কথা ও কাজ।

৭.১৭ পরিবর্তিত কোরান

আজকের যে কোরান তা বর্তমান আকারে সংকলিত করা হয়েছিল তাঁর মৃত্যুর অন্তত পঁচিশ বছর পর। এই সময়ের মধ্যে টেক্সটের অনেক পরিবর্তন ঘটেছে এবং আরও পরিবর্তন আসতে পারে।

মক্কায় অবতীর্ণ বেশির ভাগ ছোট ছোট সূরা নতুন ধর্মের আধ্যাত্মিক কেন্দ্রবিন্দু ছিল এবং এগুলো নিয়মিত প্রার্থনায় ও রিচুয়েলে ব্যবহার করা হয় এবং এগুলোর

www.pathagar.com

ওপরেও ঘষামাজা হয়েছে বলে ধারণা করা হলেও মোটামুটি আগের মতোই আছে। কিন্তু মদিনার সূরাগুলোকে পরিবর্তন ও সংশোধন করার যথেষ্ট সুযোগ ঘটেছে. এবং প্রয়োজন বোধে, এমনকি নতুন মেটিরিয়েল দিয়ে উপস্থাপিত করা হয়েছে।

বিশ্বাস করার মতোই কারণ রয়েছে যে, খলিফারা যারা কোরান সংকলনের আদেশ দিয়েছিলেন এবং যারা এই টেক্সট রচনায় হাত দেন তারা পরবর্তী সূরাগুলোতে (মদিনার সূরা) পরিবর্তন এনেছেন, এমনকি কিছু বাদ দিয়ে নিজেদের কথা ঢুকিয়েছেন।

প্রফেট মোহাম্মদের মৃত্যুর পর প্রথমে বিক্ষিপ্ত ও ছড়িয়ে থাকা সব সূরা ও আয়াত সংগ্রহ করে একটা অসম্পাদিত সংকলন করা হয়েছিল এক বছর ধরে আবুবকরের অধীনে। আবুবকরের মৃত্যুর পর দ্বিতীয় খলিফা ওমরের কাছে দশ বছর ধরে সেই অসম্পাদিত কোরান পড়ে ছিল। আবুবকর ও ওমর উভয়েই উচ্চাভিলাষী ছিলেন। তাদের কাছে সেই কোরান থাকার সময়ে তারা যথেষ্ট সুযোগ পেয়েছেন এর মধ্যে পরিবর্তন আনতে কিংবা নতুন কিছু সংযোজন করতে। যখন ওমর মারা যান, তখন বিশাল গ্রন্থের উপকরণ হিসাবে মেটেরিয়াল তৃতীয় খলিফা ওসমানের দখলে চলে আসে।

ওসমান ব্যক্তিগতভাবে কমিশনের সদস্যদের নির্বাচন করেন গ্রন্থের টেক্সটকে সম্পাদনা করার জন্য হাতে পাওয়া উপকরণসমূহ থেকে। সম্পাদনার পর এটা গ্রন্থ হয় 'অথরাইজড ভার্সান অব দ্য কোরান'– অর্থাৎ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত কোরান। এই প্রক্রিয়া চলেছিল প্রায় দশ বছর ধরে। যেহেতু, এর সব কিছুই ওসমানের তত্ত্বাবধানে হয়েছিল, তাকেই চার্জ করা হয় সমস্ত সূরা নষ্ট করার জন্য এবং আসলে বলা হয় তিনি গ্রন্থটিকে 'ছিঁড়ে খুঁড়ে' দিয়েছেন– 'torn up the Book'।

ইসলামের প্রথম তিন খলিফার কাছে কোরানের মেটেরিয়াল পড়ে ছিল প্রায় পঁচিশ বছর ধরে তারপর ওসমান কর্তৃক বর্তমান কোরান অনুমোদিত হয় এবং অনেক মুসলিম গোষ্ঠী আছে যারা অভিযোগ করে যে কোরানে এমন সব মেটিরিয়েল ঢোকানো হয়েছে যেগুলো প্রফেটের মাধ্যমে অবতীর্ণ হয়নি (Hourani 1991, P. 21)। শিয়ারা বিশ্বাস করেন যে তত্ত্বগত কারণে প্রফেটের উত্তরাধিকারী খলিফাদের প্রশাসনিক কারণে কোরান পরিবর্তন হয়েছে এবং অনেক প্যাসেজ প্রপাগাণ্ডার উদ্দেশ্যে জাল করা হয়েছে; তাই অনেকে সেগুলোকে স্বর্গীয় অনুপ্রাণিত প্যাসেজ বলে গণ্য করেন না।

আধুনিক রিভিশনিস্টি স্কলাররা আরও এককাঠি বাড়া। তারা ইঙ্গিত দেন যে, ওমরের সময় থেকে মুসলিম রাজ দ্রুত গতিতে বেড়ে যাওয়ায় এবং আরবের বাইরের লোকদের সংস্পর্শে আসার কারণে– বিশেষ করে উমাইয়া রাজত্বকালে এবং ইহুদি ও খ্রিস্টানদের সাথে ধর্মীয় বিষয়ে বিরোধের কারণে শুধু ওসমানের কোরানের সংশোধনের প্রয়োজন হয়নি, নতুন বিষয়বস্তু (মেটেরিয়েল) উপস্থাপন করে আরও একটি সংকলনের সৃষ্টি হয়েছিল।

ঐতিহাসিক আল কিন্দি (মৃ. ৯১৫) বলেন যে, কোরানের টেক্সটের সম্পূর্ণটা প্রতিদ্বন্দ্বী দলের লোকেরা অন্যায়ভাবে হস্তক্ষেপ করেছে (tamper) (Abbott, 1939 P. 48), যেটা প্রচলিত ছিল উমাইয়া খলিফা আবদুল মালেকের রাজত্বকাল পর্যন্ত।

www.pathagar.com

উমাইয়া খলিফা প্রথম মারওয়ান হাফজার কাছে যে মূল গ্রন্থটি ছিল সেটা ধ্বংস করে ফেলেন। এতেই তার পুত্র খলিফা আবদুল মালেকের চোখ খুলে যায় এই গ্রন্থে আরো পরিবর্তন আনার জন্য এবং এটা করেন ইরাকের গভর্নর হাজ্জাজ ইবন ইউসুফের মাধ্যমে। কোরানের মধ্যে বিভিন্ন ভার্সান ও পঠনে অসুবিধা দূর করার কথা বলে এবং স্বরবর্ণ, ডটমার্ক ও পাংচুয়েশন আমদানি করে কোরানের টেক্সট অধিকাংশই সংশোধন ও সংযোজন করেন। তারপর বলতে গেলে একটা নতুন সংকলন চালু করা হয় (Abbott 1939, P. 47)।

আবুবকর, ওমর ও ওসমান যেসব পরিবর্তন করেছিলেন তা ছিল ব্যক্তিগত বা তত্ত্বগত কারণে কিন্তু উমাইয়ারা যে পরিবর্তন করেন, বলা হয় তা ছিল রাজনৈতিক, বংশগত ও রাজতন্ত্রের কারণে। পরিবর্তন প্রয়োজন হয়েছিল মুসলিম ধর্মকে আরো জোরদার করার জন্য, বিশেষভাবে আরব ধর্মগ্রন্থের ওপর সমর্থন দেয়ার জন্য। আরববাদের দাবিকে মজবুত করার জন্য, আরবদের সংস্কৃতি, ধর্ম ও নেতৃত্বকে প্রতিষ্ঠা ও রক্ষা করার জন্য এবং ইসলামকে ইহুদিবাদ ও খ্রিস্টানিটির ওপরে উৎকৃষ্ট ধর্মরূপে উপস্থাপন করার জন্য।

আরবরা যে সৃষ্টির মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট জাতি এই বিশ্বাস (৩ ঃ ১০৬), আরব পবিত্র ভূমি, মক্কা পবিত্র নগরী, কাবা পৃথিবীর মধ্যমণি (naval of the earth), কোরান রিভিলেশনের মুকুটস্বরূপ এবং মোহাম্মদ প্রফেটদের মধ্যে প্রধান– এই সব প্রতিষ্ঠা করে আরব স্পিরিট জাগিয়ে অন্ধ দেশপ্রেমকে সমুন্নত করে তোলা এবং মুসলিম বিজয় ও প্রশাসনকে ন্যায়সঙ্গত প্রমাণ করা।

তখন থেকেই এই কোরানকে প্রচার করা হলো উৎকৃষ্ট বলে, পরিপূর্ণ বলে, স্বর্গীয়ভাবেপ্রাপ্ত বলে, অভ্রান্ত ও পরিবর্তনীয় বলে এবং এটাই হলো নতুন আরববাদের মেনিফেস্টো এবং স্বয়ং প্রফেট মোহাম্মদকে মূল আদর্শ মানবে রূপান্তর করা হলো আরব জাতির পেট্রিয়ার্ক বলে এবং অনেক উৎসাহী আরব তাকে অবতার– লোগস (Logos) রূপে সেমি ডিভাইন আসনে অধিষ্ঠিত করেছিল।

www.pathagar.com

৮

হাদিস

কোরান একমাত্র মুসলিম আইনের উৎস– এই সাধারণ ধারণাটা ভ্রান্তিমূলক। কোরান সর্বব্যাপী আইনি কোড নয় এবং সব কিছুকে উদ্দেশ্যপূর্ণ করে তোলার জন্য যথেষ্ট নয়। এর থেকে সাধারণ নীতি পাওয়া, কখনো কখনো একটা নির্দিষ্ট পথনির্দেশ করতে পারে, এমনকি ধর্মতত্ত্ব বিষয়ে, নামাজ ও হজের ব্যাপারে সব সময় পরিষ্কার নির্দেশ দেয়, দেয় দ্ব্যর্থবোধক ও পরস্পরবিরোধী।

প্রাচীন ধর্মতত্ত্ববিদরা তাই মনে করেন যে মুসলিমদের সর্ববিষয়ে গাইড করার জন্য কোরান যথেষ্ট নয়। কমিউনিটির প্রাথমিক প্রয়োজনে এই গ্রন্থ উদ্দেশ্য পালনে অপারগ এবং সর্ববিষয়ে সম্পূর্ণ একটি আইনি কোড তৈরি করা এ থেকে সম্ভব নয়। তাই একটি নতুন উৎস খাড়া করার জন্য তত্ত্ব ও নিয়মাবলির একটা পদ্ধতিকে বেছে নিতে হলো।

এই পদ্ধতিই হলো হাদিস। হাদিস শব্দ প্রাক-ইসলামী, ইসলামের আগেও আরবে প্রচলিত ছিল। সাধারণভাবে বলা হয় ট্র্যাডিশন– মুসলিমদের দৈনন্দিন জীবনকে পরিচালিত করার জন্য নিয়ম লিপিবদ্ধ করা হতে লাগল। একে 'সুন্নাহ'ও বলা হয়। সাধারণভাবে হাদিস কোরানের সম্পূরক গ্রন্থরূপে গড়ে উঠলে যেখানে কোরানের টেক্সটসকে সরলভাবে বোঝানোর জন্য ফুটনোট, ব্যাখ্যা ইত্যাদি সংযোজিত হলো; তারপর একে কোরানের পরেই দ্বিতীয় ধর্মগ্রন্থ রূপে গুরুত্ব দেয়া হলো।

৮.১ হাদিসের গোঁড়ার কথা

কোরানকে যেমন আবৃত্ত ওহি বলে ধরা হয়, জিব্রাইল থেকে মোহাম্মদের কাছে তেমনি হাদিসকে অ-আবৃত্ত 'ওহি'-রিভিলেশন বলা হয় প্রফেটের কথা ও কাজের ওপর ভিত্তি করে। হাদিসের কিছু অংশেকে ধরা হয় 'কুদসি'– পবিত্র হাদিস বলে, যেগুলো প্রফেটের কাছে আল্লাহ ডিকটেট করেছেন, যদিও হাদিসে কোন অংশটা 'কুদসি' তার কোনো সঠিক দিশা পাওয়া যায়নি। বলতে গেলে, হাদিসে প্রাক-ইসমালী যুগ থেকেই মেটিরিয়েল রয়েছে, আর অনেক যোগ হয়েছে প্রফেটের মৃত্যুর পর এবং ইসলামী রাজ্যের প্রসারের সাথে এর বিষয়বস্তু বাড়তে শুরু করেছে। এর সমস্ত বক্তব্যই প্রফেট মোহাম্মদের এবং বিশ্বাস করা হয় তার ছেড়ে যাওয়া বাণী ও দৃষ্টান্ত এই গ্রন্থে ধারণ করা হয়েছে, বিশ্বাসীদের অনুসরণ করার জন্য। কোরান বলে, খোদার রসূলের কাছে

www.pathagar.com

তোমাদের জন্য উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত রয়েছে। (আসওয়াতন হাসনা) ৩৩ ঃ ২১। সুতরাং প্রফেটকে অনুকরণ করা চরম আদর্শ।

হাদিসে বর্ণনা রয়েছে, প্রফেটের পোশাক-আশাকের ধরন-ধারণ; তাঁর ইঙ্গিত, তিনি কিভাবে দাঁড়াতেন, বসতেন, হাঁটতেন ও কথা বলতেন সবই বলা হয়েছে এবং কিভাবে তিনি হাত-মুখ ধুতেন, খাবার খেতেন, খিলাল ব্যবহার করতেন, পাগড়ি বাঁধতেন ইত্যাদি যেখানে সম্ভব এই সব ব্যাপারে তার দৃষ্টান্ত প্যাটার্নরূপে গ্রহণ করা উচিত এবং ধর্মপ্রাণ মুসলিমরা তা নকল করে চলে।

প্রফেট মোহাম্মদের যে কোনো বিষয়ে মতামত টুকে রাখা হতো; গোত্রীয় সম্পর্ক, মেয়ে মানুষ, পরিবার, সমাজ ও কল্যাণ এবং যুদ্ধবিগ্রহ এমনকি কবিতা ও সঙ্গীতের ওপর তাঁর পছন্দ ও অপছন্দ সম্বন্ধে ক্যাজুয়েল মন্তব্য সব কিছুর বিধান বলে মেনে নিয়ে আইনি নির্দেশ মতে পালন করা উচিত বলে মনে করা হয়।

শুধু যা প্রফেট বলেছেন তা নয় তাঁর সামনে যা করা হয়েছে এবং যাতে তিনি কোনো আপত্তি করেননি, সেগুলোও পালনীয় হাদিস বলে ধরা হয়। বিখ্যাত মুসলিম জুরিস্ট ইমাম হানবল (মৃ. ৮৫৫) তরমুজ খেতেন না এই ভয়ে যে, প্রফেট কেমন করে খেয়েছেন, ভেঙে খেয়েছেন, না কেটে, না দাঁত দিয়ে কামড়িয়ে– হাদিসে এটা উল্লেখ ছিল না বলে। প্রফেট মোহাম্মদ জানতেন যে লোকেরা তাঁর ক্যাজুয়েল মন্তব্য লিখে রাখে এবং এসব গল্প চতুর্দিকে এক কান থেকে অন্য কানে পৌঁছায়। এই বিপদ সম্বন্ধে তিনি সচেতন ছিলেন; তাই এই সব লিখে রাখতে নিষেধ করেন, সাবধান করেন; কিন্তু যে প্রথা একবার চালু হয়েছে, তাকে আটকানো যায়নি, তাঁর মৃত্যুর পর এই সব ক্যাজুয়েল কথাবার্তা লোকমুখে ছড়িয়ে গেছে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। শুরুতে, এই সব ট্র্যাডিশন মুখে মুখেই প্রচলিত ছিল কিন্তু পরে লোকেরা লিখে রাখতে আরম্ভ করে।

প্রফেটের কথা ও কাজ সম্বন্ধে যেসব হাদিস রেকর্ড করা হয় তার সত্যতা নির্ধারণ করা বেশ কষ্টকর। হাদিস ও ইসনাদ অথেনটিক কিনা একে প্রতিষ্ঠা করতে 'মতন' (text)-এর খোঁজ করা জরুরি হলো, এর উৎসসহ। যেহেতু প্রফেট জীবিত নেই সাহাবা ও সহযোগীদের সূত্র খোঁজার দরকার পড়ল, যারা ট্র্যাডিশনের সত্যায়িত করতে পারেন। প্রফেটের বিধবা পত্নী আয়েশাও অনেক হাদিসের উৎস ছিলেন।

যেহেতু প্রফেটের সাহাবীদের প্রথম জেনারেশনও গত হয়েছেন, হাদিস সংকলকগণ তখন অন্য লোকদের ওপর নির্ভর করলেন, যারা সাহাবীদের দেখেছেন এবং তাদের সাথে কথা বলেছেন, এদের বলা হয় 'তায়েবী'। এইভাবে 'ইসনাদ' অর্থাৎ চেইন (Chain)-এর পরিধি বেড়ে প্রায় ডজনে গিয়ে দাঁড়ায়, অনেক জেনারেশন ধরে। যেমন, বলা হয় মুয়াদ ইবন হাসান আল মামুদ থেকে, মাসুদ শুনেছেন আবদুল্লাহ ইবন আলী থেকে, ইবনে আলী শুনেছেন আবদুর রহমান থেকে, যার কাছে আবু হোবায়রা (সাহাবী) বর্ণনা করেছেন যে প্রফেট মোহাম্মদ বলেছেন : আল্লাহকে যারা ভয় করে তাদের জন্য সিল্কের কাপড় পরিধান করা অনুচিত।

যেহেতু এই ইসনাদে প্রত্যেক ব্যক্তিকে 'বিশ্বাসযোগ্য' লোক হতে হবে এবং যেহেতু তাদের ওপর নির্ভরতা, প্রামাণ্যতা প্রত্যয়ন করা অসম্ভব, তাই ইসনাদের যোগ্যসূত্রগুলো অনেক ধর্মতত্ত্ববিদ বা গোষ্ঠী বিশ্বাসযোগ্য বলে গ্রহণ করেন না। তাই

www.pathagar.com

ট্র্যাডিশনের গ্রহণযোগ্যতা সম্বন্ধে অনেকের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব আছে। তবে হাদিস সাহিত্যগুলো এবং এর গ্রন্থকারগণ জীবনচরিত্র ও ইতিহাসে অনবদ্য অবদান রেখে গেছেন।

প্রথম সংকলনের সময় থেকে মুসলিম স্কলারগণ যথেচ্ছভাবে দুর্বল হাদিস সংগ্রহের বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করেছেন যার মধ্যে বেশির ভাগ মিথ্যা। প্রখ্যাত মুসলিম জুরিস্ট কনসাল্ট আবু সালামা (মৃ. ৭১০) আপত্তিকারদের মধ্যে প্রথম, যিনি প্রত্যয়ন ছাড়া হাদিস সংগ্রহের কুফল সম্বন্ধে সাবধান করেছেন। অচিরেই প্রমাণিত হয়েছে হাদিসগুলো শুধু পুনর্লিখিত নয়, আবিস্কৃত– কারণ প্রফেটের কথা ও কাজের মধ্যে পরস্পরবিরোধিতা ঐ সব হাদিসে দেখা গিয়েছে। এমন যেগুলোকে সঠিক হাদিস বলে মনে হতো, সেগুলোও পরিবর্তিত ও বিকৃত হয়েছে।

বহু বছর ধরে হাদিস তৈরি করা ধর্মীয় ও রাজনৈতিক কর্ম বলে স্বীকৃত হলো এবং সেগুলোকে প্রত্যেকে মেনেও নিল প্রধানত রাজনৈতিক চাপে। এমনকি, সচ্চরিত্র লোকেরা ও ধর্মীয় নেতারা এই ধরনের ফ্রড (fraud) আরম্ভ করেন যাকে 'তদলিস' বলা হয়। উমাইয়া ও আব্বাসী খলিফাদের উদ্দেশ্য পালনের জন্য হাদিস আবিস্কৃত হলো এবং পরবর্তী গোষ্ঠীগত রাজা-বাদশাদের কাছে নেমে এসে বাণিজ্যিক কারবারে পরিণত হলো (Gold zi her 1971, P. 169)। আবার অনেকে এ নিয়ে ব্যবসা শুরু করল। ফলে বেশির ভাগ হাদিসের বিশ্বাসযোগ্যতা রইল না।

তাছাড়া বিদেশী উৎস থেকে বহু জিনিস আমদানি করে সুবিধামতো ইসলামের নামে হাদিসের অন্তর্ভুক্ত করা হলো। এইরূপে, হাদিস সংগ্রাহকগণ ঐ সব নন ইসলামিক মেটিরিয়াল প্রফেটের বাণী বলে হাদিসে চালিয়ে দিল। এইসব মেটিরিয়েলের মধ্যে গ্রিক প্রবাদ ও দর্শন, রোমান স্টোইক নামক দার্শনিকের মতবাদ, প্রাচীন জনশ্রুতি (Proverb), বুড্ডিস্ট জ্ঞানী ব্যক্তিদের সূত্র (maxim), জোরাস্ত্রার ইহুদি ও খ্রিস্টানদের ধর্মপুস্তক থেকে নীতিবাক্য– মুসার দশাদেশ এবং প্রভুর প্রার্থনা বাণীসহ রাব্বীদের বাণী, অপ্রচলিত সুসমাচার (gospel) থেকে ম্যাসেজ এবং রোমান ও বাইজানটাইন আইন পুস্তকের আদেশ (precepts) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। ইসলামের রাজ্যসীমা যতই বাড়তে লাগল বিজিত রাজ্যের সামাজিক প্রথাগত ট্র্যাডিশনগুলোও হাদিসের বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়াল। বিজিত রাজ্যের মধ্যে সেন্ট্রাল এশিয়া আফ্রিকা, ইন্ডিয়া এবং ইন্দোনেশিয়া অন্যতম। এই সব দেশের সামাজিক ও কিছু ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের নিয়মকানুন ইসলামী হয়ে গেল।

এইভাবে হাদিসের সংখ্যা এমনভাবে জনসমাজে ছড়িয়ে গেল যে শেষে একে ম্যানেজ করা কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। এই অচল অবস্থাকে সচল করার জন্য এটা স্পষ্ট হলো যে এ পর্যন্ত যত মেটিরিয়েল সংগ্রহ করা হয়েছে তাকে ছাঁটাই-বাছাই-এর প্রয়োজন। সবচেয়ে প্রথম সংগ্রহ শুরু হয় প্রফেট মোহাম্মদের মৃত্যুর দেড়শো বছর ও তারও অধিক পরে। একজন সংগ্রাহক ইয়াহিয়া ইবন মাইন (মৃ. ৮৪৮), যিনি ৬০০,০০০ লক্ষ হাদিস সংগ্রহ করেন, বলেছেন যে তাঁর সাহায্যকারীরা তাঁর জন্য লিখে দেন ঐ নম্বরের দ্বিগুণ।

সবচেয়ে পরিচিত এবং প্রামাণ্য হাদিস সংগ্রহ করেন আল-বোখারী (মৃ. ৮৭০)। তিনি পারস্যবাসী ছিলেন এবং সংগ্রহ সমাপ্ত করতে তার ১৭ বছর লেগেছিল। তিনি

www.pathagar.com

দুই লক্ষ হাদিস সংগ্রহ করেন। প্রায় চার লক্ষ হাদিস গণনার মধ্যে আনেননি, অবিবেচ্য বলে বাতিল করেন। শেষ পর্যন্ত আরো ছাঁটাই-বাছাই করে রাখেন ৭,৩০০ হাদিস; কিন্তু পুনরাবৃত্তিগুলো বাদ দিয়ে সংখ্যা দাঁড়ায় ২,৭৬০। তার জীবনের শেষ দিকে তিনি অবশ্য তার শিথিল মতবাদের কারণে (unorthodox view) কর্তৃপক্ষের কুনজরে পড়েছিলেন।

আল-বোখারীর পরে দ্বিতীয় ব্যক্তি হলেন মুসলিম ইবন আল-হাজ্জাজ (মৃ. ৮৭৫)। ইনি পারস্যের নিশাপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তার প্রামাণ্য হাদিসের সংখ্যা তিন হাজার। ছয়জন হাদিস সংগ্রাহকের মধ্যে আল-বোখারী ও মুসলিমকে সুন্নিরা অথরিটি মনে করে।

শিয়াদের পাঁচটি প্রামাণ্য হাদিস আছে যা প্রফেটের সাহাবীদের কাছ থেকে সংগ্রহ করা হয়নি, হয়েছে ইমাম বা আধ্যাত্মিক নেতাদের কাছ থেকে। অন্যান্য গোষ্ঠীর (Sect) নিজস্ব হাদিস আছে। সুফি সাধকদের নিজস্ব আলাদা হাদিস ছাড়া কিছু অলিখিত গুপ্ত হাদিস আছে যা শুধু সুফিদের কাছেই পরিজ্ঞাত।

হাদিস সংগ্রাহক ছাড়া হাদিসের তফসিরকার আছেন (মোহাদ্দেস) যারা আসল ও নকল হাদিসের তফাৎ ধরতে পারেন। প্রখ্যাত মোহাদ্দেসদের মধ্যে সাতজন মহিলা মোহাদ্দেস আছেন, তাদের মধ্যে মার্ভের করিমা বিনত আহমেদ (মৃ. ১০৭০) অন্যতম। তিনি তাঁর জ্ঞান ও বিশ্লেষণ ক্ষমতার কারণে সকলের শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি ছিলেন।

বিভিন্ন পণ্ডিত ব্যক্তির দ্বারা হাদিস সংকলন হওয়ার পরও সমস্যার সমাধান হয়নি। কারণ মাউজু (মিথ্যা) হাদিস এর পরেও বর্ণিত হয়েছে, বিভিন্ন রাজনৈতিক স্বার্থ রক্ষার কারণে। ধর্মীয়, আইনি, রাজনৈতিক এবং অন্যান্য সমস্যা জড়িত বিষয়গুলো পুরানো হাদিসকে পরিবর্তন করে বা মিথ্যা হাদিস তৈরি করে নিষ্পত্তি করা হয়েছে। হাদিস জাল করা হয়েছে গোত্রীয় দাবি মেটানোর জন্য এবং এটা প্রথাতে বা প্রতিষ্ঠানে গড়ে উঠেছে। প্রত্যেক পার্টি, প্রত্যেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গুরু এবং প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি নিজের মতো হাদিস তৈরি করেছে তাকে সমর্থন জোগাতে। ক্বচিৎ মতবাদ পাওয়া গেছে যা প্রামাণ্য হাদিসের অনুসৃত। একজন মুসলিম অথরিটি বলেছেন, এমন কোনো ধর্মীয় ব্যক্তি ছিল না, যারা আসল হাদিস বাদ দিয়ে মিথ্যার আশ্রয় না নিয়েছে; অন্য কথায়, সকলেই নিজের রচিত হাদিস দিয়ে, হাদিসের নামে, কাজ সেরেছেন (নিকলসন, ১৯৬৯ পৃঃ ১৪৫)।

হাদিস এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ভিন্নতর ছিল এবং এককালের হাদিস অন্যকালে মিলেনি; প্রায়ই দেখা গেছে পরস্পরবিরোধী মতবাদ। এক স্কুলের গৃহীত হাদিস অন্য স্কুল দ্বারা পরিত্যক্ত। বিভিন্ন অথরিটি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যাখ্যা করেছে বা গ্রহণযোগ্য না হলে বাতিল করেছে। অনেক অথরিটি স্বতঃসিদ্ধভাবে গ্রহণ করেছেন, যে, যে হাদিসে যত বেশি চেইন (ইসনাদ) সেই হাদিস তত বেশি মিথ্যা।

প্রফেট মোহাম্মদের ট্র্যাডিশনের এই অনিশ্চয়তার কারণে, কিছু পণ্ডিত ব্যক্তি এই ইচ্ছা ব্যক্ত করেছেন যে, ইসলামী আইনের উৎসরূপে প্রায় সব হাদিস গ্রন্থকেই যুক্তিসিদ্ধ (valid) উৎসরূপে গ্রহণ করা যেতে পারে না। প্রায় সব হাদিসের ঐতিহাসিক ভিত্তি বিতর্কিত। এমনকি তথাকথিত ক্লাসিক্যাল হাদিসের গ্রহণযোগ্যতা সম্বন্ধে প্রশ্ন

www.pathagar.com

উত্থাপিত করা হয়েছে এবং আধুনিক সমালোচনার আলোকে এটা প্রশ্নবিদ্ধ যে, প্রামাণ্য হাদিস থেকেও অল্প কিছুর গ্রহণযোগ্যতা আছে কিনা।

ট্র্যাডিশনের গোড়ার কথা সম্বন্ধে যে সমস্যা, তাদের প্রামাণিকতা, তাদের মূল্য এবং তাদের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে শতাব্দি ধরে তর্কবিতর্ক হয়ে আসছে। কিছু কিছু মুসলিম স্কলার চরম মত প্রকাশ করে বলেন যে, হাদিস পরিপূর্ণভাবে মহৎ ব্যক্তির জীবনের বিশেষ কোনো ঘটনা, উপাখ্যানের সমষ্টি এবং বিশ্বাসের ওপরে, মতবাদের ওপরে এবং আচরণের ওপরে এর প্রভাব মূল্যহীন, অতি ক্ষীণ। তারা বলেন, হাদিসের ওপর আর কোনো গুরুত্ব না দিয়ে সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করাই নিরাপদ।

৮.২ মুসলিম আইন

একজন গোড়া মুসলিমের প্রত্যেকটি কর্মের জন্য ধর্মীয় অনুমোদন প্রয়োজন এবং এই থিওরিতে একটি মুসলিম ছোট-বড় যে কোনো কাজ করা বা তার পেছনে ধর্মীয় আইনের সমর্থন থাকে। এই ধরনের মুসলিম আইনকে শরিয়া বলে। শরিয়া প্রাক ইসলামী শব্দ, এই শরিয়া আইন একজন মুসলিমের নৈতিক, আধ্যাত্মিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনের সব কিছুকেই নিয়ন্ত্রিত করে।

এমনকি সমকামিতা, নাবালক/সাবালিকা, প্রাণী এবং মৃতদেহের সাথে যৌনক্রিয়া, যদিও স্পষ্টত পাপ ও নিষিদ্ধ, এসবও শরিয়া আইনের আওতাভুক্ত এবং পেশাব করা, বমি করা এবং বাতকর্ম প্রভৃতিও শরিয়া আইনের বিষয়বস্তু (Ruthven 1984, P. 163)। কিন্তু 'প্রফেটের হাদিস আমাদের সব কিছুর বিষয়ে শিক্ষাদান করেছে, প্রার্থনা করা থেকে বাহ্য করা পর্যন্ত।' এই বক্তব্যের প্রভূত বিশ্লেষণ প্রয়োজন, কেননা প্রফেট মোহাম্মদের মুসলিম আইনে অবদান খুব অল্প। শরিয়ার বেশ কিছু মোহাম্মদের পূর্বেই ছিল এবং তার মৃত্যুর পরে অধিকাংশই রচিত হয়েছে।

মুসলিম আইনের মূল (উসুল) বিভিন্ন উৎস থেকে খোঁজা হয়। প্রাচীন উৎস হলো উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া রীতিনীতি (সুন্না) যা প্রাক-ইসলামী যুগে আরবগণ পালন করত, এদের মধ্য থেকে অনেক প্রফেট মোহাম্মদ গ্রহণ করে ইসলামের কাঠামোয় জুড়ে দিয়েছেন। পরবর্তী উৎস হচ্ছে কোরান, যার মধ্যে ইহুদি ও খ্রিস্টান ধর্মের কিছু সংশোধিত অংশ অনুপ্রবেশ করেছে। আর একটি উৎস হলো হাদিস।

কোরান ও প্রাথমিক হাদিসের অংশ বিধিবদ্ধ করে মুসলিম ধর্ম পালনের মূল ভিত গড়া হয়েছে। বিশ্বাস করা অর্থাৎ ঈমান আনার জন্য ছয়টি নীতি বা বিশ্বাসে মূলমন্ত্র (Articles of faith)গুলো হচ্ছে : (১) আল্লাহর একত্ব, (২) ফেরেশতাগণ, (৩) কিতাবসমূহ (৪) প্রফেটগণ (৫) শেষ বিচারের দিন এবং (৬) পূর্ব-নির্ধারিত (pre-destination)। পালনীয় কর্ম পাঁচটি : (১) কলেমা পাঠ, (২) প্রার্থনা, (৩) রোজা বা সওম, (৪) জাকাত বা দান এবং (৫) হজ পালন।

কোরানের তফসির বা ব্যাখ্যা করা নিষিদ্ধ ছিল। পবিত্র গ্রন্থ, বলা হয়েছে, স্ব-ব্যাখ্যাত। কোরান থেকে শুধু আয়াত পাঠ করা যাবে, কিন্তু ব্যাখ্যা করা যাবে না।

প্রফেট মোহাম্মদ আশা করেছিলেন যে, যারা পাঠ করে, তারা বুঝে পাঠ করুক; যদি কোনো ক্ষেত্রে সন্দেহ হয় বা অর্থ দ্ব্যর্থবোধক হয় তাহলে কয়েকজন সাচ্চা মুসলিম

www.pathagar.com

একসাথে বসে এর অর্থ নির্ধারণ করবে। তিনি বলেছিলেন আমার লোকগণ কখনো 'ভুলের' ওপর একমত হবে না। কিন্তু তা হলো না। কোরানের টেক্সট্ সহজবোধ্য নয়। এটার ব্যাখ্যা প্রয়োজন। সম্প্রসারণের দরকার, যাতে এর বিধানগুলো স্পষ্ট হয় এবং উপযুক্তভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে।

প্রথম থেকেই কোরানের ভাষা ও পাঠের অসুবিধার কারণে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ব্যাখ্যার মধ্যে বিভিন্নতা দেখা দিল। এতে কেউ একমত হলেন না, মতভেদ ঘন ঘন হতে থাকল, ফলে গোষ্ঠী (sect) এবং ইমাম ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের মধ্যে বিভিন্ন দল ও স্কুল প্রতিষ্ঠা হলো। সুতরাং একটা স্বতঃসিদ্ধ শরিয়া থেকে ভিন্নতর শরিয়া গড়ে উঠল।

প্রফেটের মৃত্যুর অল্পদিনের মধ্যেই সুন্নি দলের চারটি প্রধান স্কুল প্রতিষ্ঠা পেল। কুফাতে আবু হানিফা, তিনি আফগান বা আরামিয়ান বংশোদ্ভূত, মালিক ইবন আনাস মদিনাতে কেন্দ্র স্থাপন করলেন; প্যালেস্টাইনের আস্কালনে মুহাম্মদ আল-শাফী বসলেন এবং বাগদাদে হুজরা খানা করলেন ইবন হানবল। এছাড়া আরো কিছু ছোট ছোট স্কুলও হলো। শিয়ারা বলল যে, তাদের ইমাম বা ধর্মীয় নেতারা আইন ও ধর্মীয় ব্যাপারে তাদের নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করার অধিকার রাখে।

কোরানিক ব্যাখ্যা অবশ্যই একটা বিবেচিত রায় যা মুজতাহিদরা করে থাকেন, আর তাদের রায়কে ইজতিহাদ বলে অথবা মুজতাহিদদের (ধর্মীয় কাউন্সিল) সম্মিলিত রায়কে ইজমা বলে। সন্দেহজনক কোনো বিষয়কে বিশ্লেষণ করে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হতে কতকগুলো পদ্ধতি আছে, তাদের মধ্যে প্রধান হলো ব্যক্তিগত মতামত, যুক্তি এবং সাদৃশ্য ঘটনা থেকে সিদ্ধান্ত (analogy) কিন্তু এসবের মধ্যেও নির্ভুল সিদ্ধান্ত অল্পই পাওয়া গেছে।

প্রফেট মোহাম্মদ সাবধান করে বলেছিলেন, যে ব্যক্তি নিজের মতামতের (রায়) ওপর ভিত্তি করে কিংবা অজ্ঞতার কারণে কোরান সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করবে, নিশ্চয় তার স্থান হবে নরকের অগ্নিকুণ্ডের কাছে। পরে আবুবকর বলেছিলেন, আল্লাহর কিতাব, যা আমি জানি না, সে সম্বন্ধে বলতে গেলে পৃথিবী বা স্বর্গ কেউ আমাকে রক্ষা করতে পারবে না।

যুক্তি (আক্ল) প্রয়োগ দ্বারা সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য হয়নি। মৃত্যুকালে মালিক ইবন আনাস বহু বিষয়ে যুক্তির দ্বারা সিদ্ধান্ত দেয়ার জন্য অনুতপ্ত হয়েছিলেন।

সাদৃশ্য ঘটনা থেকে সিদ্ধান্ত (Analogy)কে কিয়াস বলা হয়। যেখানে কোনো আইন খুঁজে পাওয়া যায়নি সেখানে কিয়াস ব্যবহার করে সাদৃশ্য ঘটনা থেকে সিদ্ধান্ত দেয়া হয়েছে। মদ (Wine) নিষিদ্ধ ছিল, এই সাদৃশ্য দেখিয়ে ড্রাগ-নেশা হয় এমন দ্রব্যকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। দেখা গেল এই কিয়াসের যত্রতত্র প্রয়োগ করে অপব্যবহার করে আইনি ব্যাখ্যা করার ফলে সমাজে মারাত্মক বিভ্রান্তি দেখা দেয়।

এছাড়া অন্য সমস্যাও ছিল। খুব কড়াকড়িভাবে শরিয়া আইন প্রয়োগ করতে গিয়ে জুরিস্টদের প্রায় আইনের অন্য উপায় অবলম্বন করতে হতো। কোনো একটা সমস্যা আইনের নমনীয় ব্যাখ্যার দ্বারা মিটমাট করতে গিয়ে আর একটি প্রশ্নবিদ্ধ পদ্ধতি (হাইয়াল) গ্রহণ করতে হয়েছে। এইরূপে, সুদ যা কোরানের আইন দ্বারা

www.pathagar.com

নিষিদ্ধ (২ ঃ ২৭৬) এদের সিদ্ধ করতে গিয়ে কৌশল অবলম্বন করতে হয়েছে (Subterfuge was employed) এবং দাতা ও গ্রহীতাকে ব্যবসার অংশীদার দেখিয়ে সুদ খাতককে দান হিসাবে দেখানো হয়েছে। এই চাতুরি (strategem) অবলম্বন করে শরিয়া আইনের কঠোরতাকে অন্য ক্ষেত্রেও নমনীয় করা হয়। যেমন, দেনমোহর, যৌতুক, সম্পত্তি উত্তরাধিকার, শাস্তি (হদ), তালাক ও যাকাত।

শরিয়া আইন প্রয়োগে আর একটা অসুবিধা হলো, ধর্মীয় কারণে ব্যক্তিগত কিংবা সামাজিকভাবে কোনো নিয়ম ভঙ্গ হলে এবং তা ধর্মীয় আদালতের অধিক্ষেত্র বহির্ভূত হলে এসব ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দেয়া মুশকিল হয়। আইন প্রণয়নকারীরা বাধ্য হয়ে তখন 'কানুন' অর্থাৎ সেক্যুলার আইন তৈরি করে, রাজার পাওনা রাজাকে আর ঈশ্বরের পাওনা ঈশ্বরে দিয়ে সমস্যার সমাধান করতে হলো। 'কানুন' শব্দ গ্রিক শব্দ ক্যানন (canon) থেকে আগত। এইভাবে শরিয়া আইনের বিচার বিভাগে দ্বৈত-বিচার পদ্ধতি শুরু হলো, একটা ধর্মীয় আদালতের মাধ্যমে অন্যটি সেক্যুলার কোর্ট; ধর্মীয় আদালত হতে সম্পূর্ণ আলাদা এবং ধর্মীয় আদালতের আওতায় পড়ে না, এমন সব মামলা-মোকদ্দমা এই সেক্যুলার আদালতে ইকুইটি, সাধারণ জ্ঞান ও ট্র্যাডিশনাল রীতি অনুযায়ী নিষ্পত্তি হয়।

ইসলামী রাজ্যের সম্প্রসারণের ফলে, ইসলামী আইন পদ্ধতিতে বিদেশী নিয়ম পদ্ধতি আমদানি হওয়ায়, মুসলিম আইন প্রভাবিত হলো, বিশেষ করে অমুসলিম অভিজাত সম্প্রদায়ের সংস্পর্শে এসে, যেমন মেসোপটেমিয়া, পারস্য, সিরিয়া, প্যালেস্টাইন ও মিশর, ইহুদি, খ্রিস্টান ও জোরাস্ত্রারের আইনি কোড থেকে বেশ কিছু ধর্মীয় বিধান, কোনো ওজর-আপত্তি ছাড়াই, মুসলিম আইনি কোডে মিশে গেল।

হেলেনিস্টিক, রোমান ও বাইজানটাইন আইনেরও অবদান মুসলিম আইনকে সমৃদ্ধ করে তোলে। গোল্ডজিহার বলেন– ইসলামী আইনে রোমান আইনের প্রভাব অভ্রান্ত– 'unmistakable' (1981, P. 4)। এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে বাইজানটাইন সম্রাট জাস্টিনিয়নের (মৃ. ৫৬৫), আইনি স্কুল, কোড ও ডাইজেস্ট প্রভৃতভাবে মুসলিম জুরিসপ্রুডেন্সকে প্রভাবিত করেছে।

সময়ের সাথে, আরবের বাইরে যেসব দূর দেশে ও প্রান্তদেশে লোকজন বাস করত তাদের প্রচলিত আইনের সাথে সঙ্গতি রেখে শরিয়া আইনকে তাদের সুবিধামতো গ্রহণ করা হয়। ধর্মান্তরিত লোকদের মনে হলো, যেহেতু মুসলিমরা তাদের দেশের প্রাচীন রীতি-নীতির ওপর হস্তক্ষেপ করছে না, শুধু মূর্তিপূজা ও শিশু হত্যা ছাড়া, সুতরাং অন্যান্য দেশেও চলতি স্থানীয় আইন ও প্রথা এই এনালজির আদর্শে অপরিবর্তিত থাকবে। ইসলামী মিশনের অংশ রূপে জিম্মিদের কোনো বিপদের সম্মুখীন হবার আশংকা নেই।

নতুন ধর্মে দীক্ষিত মানুষদের ধারণা জন্মে গেল, তাদের প্রাচীন রীতি-নীতির সাথে ইসলামী নীতির বিরোধ বাধবে না এবং তাদের সব প্রাচীন রীতি ও প্রথা আগের মতো চলতে থাকবে। এমনকি, সুদান ও নাইজেরিয়ার কিছু অংশে যে মেয়েদের খাৎনার প্রথা প্রচলিত ছিল এ প্রথারও পরিবর্তন হলো না এবং হাদিস তৈরি করে শরিয়া আইনের অঙ্গীভূত করা হয়েছে।

www.pathagar.com

আফ্রিকার অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রে বার্বারদের মধ্যে এবং সেন্ট্রাল এশিয়া, ইন্ডিয়া ও ইন্দোনেশিয়াতে পরিবার আইন, বিশেষ করে মহিলা বিষয়ক তালাক ইত্যাদি ভূমি সংক্রান্ত আইন, সম্পত্তি ও উত্তরাধিকার, রাজনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক প্রথা, শ্রেণী ও জাতিসহ, সব কিছু স্থানীয় আইন অপরিবর্তিত রয়ে গেল। প্রয়োজনবোধে কিছু পরিবর্তন ও সংশোধনের দ্বারা সমন্বয় করা হলো।

প্রায়ই, পুরানো বিশ্বাস ও প্রথা যা ইসলামের আবির্ভাবের সাথে বন্ধ হয়েছিল, সময়ের সাথে তার পুনরাবির্ভাব হলো এবং দেশের মানুষরা আস্তে আস্তে তার পূর্ব-পুরুষের প্রথা গ্রহণ করে নিল; এই ভাবে বুড্ডিস্ট, হিন্দু, সামানিস্ট (তান্ত্রিক) ও এনিমিস্ট (সর্বপ্রাণবাদী বা অধ্যাত্মবাদী) ইসলামী কাঠামোর মধ্যে মিশে গেল। প্রফেসর গিব বলেন, বিভিন্ন মুসলিম দেশের মধ্যে ইসলামী নিয়মকানুনের বিভিন্নতা দেখা দিল, এমনকি কট্টর গোঁড়ামি মতের বিপরীতে।

পরিশেষে, আধুনিক ইউরোপের আইন পদ্ধতি বর্তমান মুসলিম বিশ্বের প্রচলিত আইনে যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছে। তুরস্কে শরিয়া আইনের বিলোপ সাধনের সাথে ইউরোপীয় আইন প্রবর্তিত হয়েছে, তেমনি হয়েছে কিছু সংশোধন করে মিশর, সিরিয়া, জর্ডান, ইরাক ও অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রে। এই সব রাষ্ট্রে আইন কোড সাধারণত তৈরি হয়েছে পশ্চিমা মডেলে।

শরিয়া আইন একাধিক আইন কোড ও ট্র্যাডিশনাল প্রথা ও পদ্ধতির জগাখিচুড়ি; এখানে বিভিন্ন বিজিত দেশের বিভিন্ন আইন ও সামাজিক প্রথার সমাবেশ। শরিয়া আইন শতাব্দি ধরে বিবর্তিত হয়েছে এবং এখনও উন্নয়ন প্রক্রিয়ার আওতাধীন।

www.pathagar.com

৯

ইহুদি ও মোহাম্মদ

প্রফেট মোহাম্মদের ধর্মীয় প্রচারণার শুরুর দিকে ইহুদি ও খ্রিস্টানদের সাথে তাঁর নিকট সম্পর্ক ছিল। শোনা কথার মাধ্যমে তিনি ইহুদি ও খ্রিস্টান ধর্ম পুস্তক সম্বন্ধে অল্প-বিস্তর জেনেছিলেন, পরে এদের সংস্পর্শে এসে আরো প্রত্যক্ষভাবে মূল মতবাদগুলো জেনে নেন, যা তাদের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। জনশ্রুতি আছে যে, তিনি বেঁচে থাকতে ইহুদি ও খ্রিস্টান ধর্ম গুরুদের কাছ থেকে শিক্ষা লাভ করেছেন।

তিনি বলেছেন বলে কথিত যে, যে ব্যক্তি ইহুদি ও খ্রিস্টানদের ক্ষতি করবে, শেষ বিচারের দিনে আমি তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনব। যখন তিনি আরবদের জন্য একটি ধর্ম প্রতিষ্ঠা করতে মনস্থ করেন তিনি আশা করেছিলেন যে এটা ইহুদি ও খ্রিস্টান ধর্মের অংশরূপেই প্রকাশ করবে।

অনেক দিন ধরে পশ্চিমাদেশে বিবেচিত হয়েছিল যে ইসলাম জুদো-খ্রিস্টান ট্র্যাডিশনের একটি শাখা এবং এখনো কয়েক মহলে এই ধারণা পোষণ করে। বলা হয় যে, ইসলাম ধর্ম মূলত ইহুদি ও খ্রিস্টান মতবাদের সারগ্রাহী (eclectic) ধর্ম। শুধু আরব দেশের মানুষদের জন্য উপযুক্ত করে একটু পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করেছেন, কিন্তু উদ্দেশ্যটিকে মনে রেখে অগ্রসর হয়েছিলেন। এ বক্তব্যের যথেষ্ট প্রমাণ ইতিহাসে পাওয়া যায়।

আরবে ইসলাম আগমনের অনেক পূর্বে, আরবের বিভিন্ন অংশে ইহুদি লোকজন ছড়িয়ে ছিটিয়ে বাস করত। সত্যি বলতে কি, কয়েকটি আরব গোত্রে ইহুদি ছিল। মদিনাতে এবং এর আশপাশে ইহুদিদের প্রভাবশালী সম্প্রদায়ের বাসভূমি ছিল এবং মদিনার আনসারদের মধ্যেও অনেক ইহুদি ছিল।

ট্র্যাডিশন বলে যে মদিনার দুইটি প্রধান গোত্র আউস ও খাজরাজ ইহুদি বংশোদ্ভূত। আর একটি ট্র্যাডিশন জোর দিয়ে বলে যে, মদিনার ইহুদিরা খাজরাজ জাতির নাজ্জার গোত্রের একটা অংশ বিশেষ যাদের সাথে প্রফেটের নিজের মাতৃকুলের নিকট সম্পর্ক ছিল।

প্রথমে প্রফেট মোহাম্মদ ইহুদিদের সাথে সদ্ভাব রেখেছিলেন এবং তারাও মূর্তিপূজা উচ্ছেদ ও তার প্রচেষ্টার বিরোধিতা করেনি। প্রফেট মোহাম্মদও বিশেষ রিভিলেশন প্রাপ্ত জাতি বলে তাদের বিবেচনা করতেন। কোরানে তাই ইহুদিদের বিশ্বজগতের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে (৪৫ ঃ ১৫)।

www.pathagar.com

ইবন ইছহাকের কাছে একটি দলিল ছিল (যার প্রামাণ্যতা সম্বন্ধে কিছু পণ্ডিত ব্যক্তি সন্দেহ করেন) যার শিরোনাম ছিল 'মুসলিম ও ইহুদিদের মধ্যে চুক্তি'। এই চুক্তি হিজরতের পর পরই ইহুদির সাথে সম্পাদিত হয়েছিল। অন্যান্য শর্তের সাথে শর্ত ছিল– "ইহুদিদের আমরা সাহায্য করব এবং সমভাবে দেখব কেননা তারা আমাদের প্রতি সহানুভূতিশীল এবং বন্ধুভাবাপন্ন। তাদের কোনো ক্ষতি করা হবে না কিংবা তাদের শত্রুদেরও সাহায্য করা হবে না।' তার সেনাপতিদের মধ্যে এক আচরণ বিধিতে প্রফেট জানিয়েছিলেন ইয়েমেনে অভিযান চালানোর প্রাক্কালে সেখানকার ইহুদিদের ধর্ম পালনে যেন কোনো বিঘ্ন না ঘটে।

কোরানে একাধিকবার প্যালেস্টাইনকে 'আশীর্বাদিত ভূমি' বলে সম্বোধন করা হয়েছে। প্রথম দিকে প্রফেট মোহাম্মদ জেরুজালেমকে তার ধর্মের কেন্দ্রভূমি মনে করতেন এবং প্যালেস্টাইনের স্থান ছিল মক্কার ওপরে। মক্কা নয়, জেরুজালেমের দিকে মুখ করে প্রফেট প্রার্থনা (নামাজ) শুরু করেছিলেন (Lewis, 1966. P. 42) এবং তাঁর অনুসারীদের সেইভাবে নির্দেশ দেন এবং এই নিয়ম বারো বছর ধরে পালিত হয়েছে, এমনকি মদিনাতে প্রথম মসজিদ তৈরি করার পরও। জানা যায় যে, প্রফেটের মৃত্যুর পর ইরাকে প্রথম দিকে তৈরি মসজিদের কিবলা ছিল জেরুজালেমের দিকে, মক্কার দিকে নয়।

কোরানে বলা হয়েছে যে তোরাহ (তাওরাত)-র মধ্যেই আল্লাহ পথের নির্দেশ ও আলো দান করেন (৫ ঃ ৪৭) এবং মোত্তাকিদের জন্য সম্পূর্ণ কিতাব (৬ ঃ ১৫৫)। প্রফেট মোহাম্মদ কখনো ইহুদিদের কিতাবকে বাতিল বলে মনে করেননি। তিনি কোরানে ওল্ড টেস্টামেন্টের বহু কাহিনী জুড়ে দিয়েছেন, যদিও তিনি সে গ্রন্থ পাঠ করেননি, সম্ভবত ইহুদিদের কাছ থেকে শুনে গ্রন্থিত করেন, যদিও কয়েক স্থানে কিছু ব্যতিক্রম ঘটেছে; হতে পারে, এই ভাবেই তিনি শুনে থাকবেন।

কোরানে বিশ্বসৃষ্টি সম্বন্ধে বলা হয়েছে, স্বর্গে আদম ও ইভের কাহিনী, নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণের ফলে (৯৭ ঃ ১৮) পতনের কাহিনী, নিষিদ্ধ ফল খাওয়ার ফলে জ্ঞানপ্রাপ্ত হওয়া, উলঙ্গ হওয়া, গাছের পাতা দিয়ে আবরণ ইত্যাদি (২০ ঃ ১১৯)। এতে হাবিল ও কাবিলের কাহিনী আছে, নূহ এবং প্লাবনের কাহিনী আছে এবং আল-জুডি পাহাড়ের গায়ে নূহের কিস্তি আটকে যাওয়ার কাহিনী (১১ ঃ ৪৬) (প্রাচীন গ্রিকদের কাছে আর্মেনিয়ার গর্ডাইন পর্বত); ইব্রাহীম ও ইসমাইলের কাহিনী, লুত এবং সডোম ও গোমরাহর ধ্বংসের কাহিনী, ইসহাক ও জ্যাকব, ইউসুফ ও পটিফার স্ত্রী, মুসা ও ফেরাউন, এলিজা ও এলিসা, দাউদ ও সলোমন, শেবার রানী, জব, জোনাহ এবং আরো নাবী ও বাইবেলের রাজা-বাদশার কাহিনী কোরানে বিধৃত।

কোরানে বাইবেল বহির্ভূত কিছু ভার্সান আছে, কারণ প্রফেট মোহাম্মদের ভার্সান মূল (original) থেকে প্রায় পৃথক হয়ে যেত। সেখানে প্রফেট কর্তৃক ব্যবহৃত মেটিরিয়েল বাইবেলের আইন পুস্তকের সাথে অমিল থাকলে তার সূত্র তালমুদ, বাইবেল বহির্ভূত গ্রন্থ (apocrypha) এবং সংশ্লিষ্ট লিখিত বস্তুর মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে। কতকগুলো কাহিনী আরবের সাথে রচিত হয়েছে যেমন, আব্রাহাম ও ইসমাইল হেজাজে এসেছিলেন কাবাঘর তৈরি করতে।

www.pathagar.com

কোরানের কিছু অংশ প্রফেট মোহাম্মদ অনুপ্রাণিত হয়ে পেয়েছিলেন যাকে 'সকিনা' (sakina) বলা হয়। জায়েদ ইবন থাবিত প্রফেটের কাতিব ছিলেন, ওহি লিখতেন। তাঁর মৃত্যুর পর জায়েদকে কোরান সঙ্কলনের দায়িত্ব দেয়া হয়। তিনি বলেছেন, 'আমি তার পাশে ছিলাম। তিনি সজ্ঞানে ফিরলে বলেন– 'লিখো' এবং আমি লিখলাম।' সকিনার ধারণা এসেছে হিব্রু শব্দ শেকিনা (Shekina) থেকে যাকে ইহুদি ট্র্যাডিশনে ঈশ্বরের নারী অংশকে বলা হয় (The femenine aspect of the spirit of God)।

ইবন হিশামের প্যাসেজ থেকে দেখা যায় যে, একবার প্রফেট মোহাম্মদ বেথ হা-মিদরাস-এ গিয়েছিলেন, মিদরাস পাঠ করার জন্য (to study the Midrash)। মিদরাস হচ্ছে বাইবেলের তফসিরি– কমেন্টারি। আল্ বাইদাবি বলেন যে, কোনো কোনো ইহুদি প্রফেট মোহাম্মদের কাছে প্রাচীন ইতিহাসের কাহিনী বার বার পুনরাবৃত্তি করেছেন এবং মোহাম্মদ তাদের সাথেও এ বিষয়ে আলোচনা ও মন্তব্য করতেন। প্রায়ই প্রফেট মোহাম্মদ সিনেগগ, ইহুদিদের উপাসনালয়ে যাতায়াত করতেন। (Hughes, 1977, P. 193)

মক্কাতে আবদিয়াস বেন সালোম নামে একজন বিজ্ঞ রাব্বীর সাথে প্রফেট মোহাম্মদের বন্ধুভাব ছিল। কথিত আছে, এই রাব্বি প্রফেটকে ইহুদি ধর্মগ্রন্থ পাঠ করে শুনিয়েছিলেন। ইহুদিদের ট্রাডিশন ব্যাখ্যা করেছিলেন এবং অন্যান্য বিষয়ে বলেছিলেন, যেগুলো পরে প্রফেট মোহাম্মদের কোরান প্রণয়নের সময় কাজে লেগেছিল। তফসিরকার আব্বাসী ও জালালায়েনের মতে, এই রাব্বী পরে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। তার মুসলিম নাম ছিল আবদুল্লাহ ইবন সালোম এবং বিশ্বাস করা কোরানে তার নাম সাক্ষী হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে (৪৬ ঃ ৯) যেখানে ইনি কোরান ও তাওরাতের মধ্যে চুক্তির প্রমাণ দিয়েছেন (Tisdall, 1911, P. 134)।

উল্লেখযোগ্য যে, প্রফেট মোহাম্মদের ওহি লেখকদের মধ্যে একজন ইহুদি ছিলেন এবং ৬২৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যভাগ পর্যন্ত তিনি ইহুদি সেক্রেটারিদের দ্বারা হিব্রু বা সিরিয়াক ভাষায় চিঠিপত্র লেখাতেন। তার মুসলিম সেক্রেটারি জায়েদ ইবন থাবিত এইসব ভাষা আয়ত্ত করার পর থেকে প্রফেট আর ইহুদি সেক্রেটারি রাখতেন না।

বলা হয়ে থাকে যে, প্রফেট মোহাম্মদ প্রার্থনা সম্বন্ধে কতকগুলি মৌলিক মতবাদ, প্রথা ও অন্যান্য নিয়ম পদ্ধতি ইহুদিদের কাছ থেকে গ্রহণ করেন; এত বেশি গ্রহণ করেন যে ফরাসি গ্রন্থকার আর্নেস্ট রেনান (মৃ. ১৮৯২) ইসলামকে 'কট্টর ইহুদিবাদ' (petrified judaism) বলে অভিহিত করেন।

ঈশ্বরের একত্ব (হিব্রু এহাদ) ইহুদিবাদে জোর দিয়ে বলা হয় এবং ইহুদি ধর্মের বিশ্বাসের স্তম্ভস্বরূপ (Deut 6 : 4)। তেমনি ইসলামেও আল্লাহর একত্বের (আরবি আহাদ) ধর্মেরও ঈমানের অঙ্গস্বরূপ। তাই বলা হয়, মুসলিম ধর্মের ধারণা ইহুদি মডেলে তৈরি।

প্রফেট মোহাম্মদের মিশনের প্রথম দিকে তিনি 'প্রফেট' শব্দের বিপরীতে ইহুদি শব্দ 'নাবী' ব্যবহার করেছেন। ইহুদিরা যে শ্রেষ্ঠ জাতি এই ধারণা থেকেই তিনি আরবদের শ্রেষ্ঠ জাতিরূপে প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করেন। ইহুদিদের রীতির ওপর ভিত্তি করে দানকে ধর্মের অঙ্গ হিসাবে (পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে একটি) 'যাকাত' প্রবর্তন করেন।

www.pathagar.com

'যাকাত' শব্দটি আরামাইক, আরবি নয়।

ইহুদিদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে শূকরের মাংস হারাম করা হয়। আনুষ্ঠানিকভাবে ওজু এবং পবিত্রকরণ, শনিবারকে 'সাবাত' রূপে গ্রহণ এবং সকাল ও সন্ধ্যার প্রার্থনার অতিরিক্ত দুপুরের প্রার্থনা (জোহরের নামাজ) চালু করেন।

ইহুদিদের প্রথানুসারে তিনি খাৎনার প্রবর্তন করেন মুসলিম বালকদের জন্য। যদিও এই প্রথা কোরানে নেই। তবুও প্রাচীন প্রথা রূপে এই প্রথাকে 'ওয়াজেব' করা হয়। তার নিজের খাৎনা হয়েছিল কিনা এ বিষয়ে কোনো প্রমাণ নেই, কিন্তু এই প্রথাকে গুরুত্ব দেয়ার জন্য অনেক পরে এক হাদিসে বলা হয় যে, প্রফেট মোহাম্মদের আদম, নূহ, ইউসুফ, মুসা, সলেমন ও ঈসা নবীদের মতো জন্ম থেকেই খাৎনা করা হয়েছে।

তারপর ইহুদিদের প্রথম মাস তিশরির প্রথম নয় দিন উপবাসের দ্বারা আত্মশুদ্ধির দিন এবং দশ তারিখে আশোর উপলক্ষে কঠোর উপবাস করে তারা প্রায়শ্চিত্ত করে। এই দশ তারিখকে বলে 'ইয়োম কিপ্পুর' (লেবীয় ২৩ : ২৭)। ইহুদিদের এই প্রথার সাদৃশ্যরূপে প্রফেট মোহাম্মদ ৬২৩ খ্রিস্টাব্দে জুলাই মাসে আরবি বছরের প্রথম মাস মহররমের প্রথম দিন উপবাস পালন করে দশ তারিখে 'আশুরা'-র উপবাস করার প্রথা চালু করেন। এই উপবাস সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত নির্ধারণ করা হতো যখন কালো ও সাদা সুতোর পার্থক্য বোঝা যেত (২ ঃ ১৮৩)। এই পদ্ধতিও গ্রহণ করা হয়েছিল ইহুদি কিতাব তালমুদে বর্ণিত প্রথা থেকে। ইহুদিরা এই প্রথায় তাদের প্রার্থনার সময় নির্ধারণ করত সকাল ও সন্ধ্যার, যখন নীল ও সাদা সুতোর পার্থক্য বোঝা যেত (Rodwell, 1915, P. 357)।

৯.১ ইহুদিদের সাথে বিভেদ

ইহুদি ও প্রফেট মোহাম্মদের সাথে বিরোধ ও বিভেদের সূত্রপাত হয় যখন তার ক্ষমতা বাড়ল এবং দাবিও জোরাল হলো। এই দাবি তার নিজের জন্য এবং আরব জাতির জন্য।

মোহাম্মদ দাবি করলেন ইসলাম আব্রাহামের অরিজিনাল বিশ্বাস (faith) বা ধর্ম, যিনি খাঁটি একেশ্বরবাদ প্রবর্তন করেন। আব্রাহাম হানিফ ও মুসলিম ছিলেন (৩ ঃ ৬০) তার নিজের অগ্রদূত (Precursor)। আব্রাহামের ধর্ম (মিল্লাত ইব্রাহীম) ছিল খাঁটি ধর্ম এবং তিনি, মোহাম্মদ, সেই প্রাচীন ধর্ম পুনরুদ্ধার করেছেন (২ ঃ ১২৯)। আব্রাহাম মুসার পূর্বে এসেছিলেন এবং তার ধর্ম ইহুদি ধর্ম (জুদাইজম) থেকে প্রাচীন। তিনি মনে করেন আরবরা আব্রাহামের প্রথম সন্তান ইসমাইলের বংশধর এবং ইহুদিদের চেয়ে আব্রাহামের ধর্মে তার দাবি আগে।

এই দাবির বিপরীতে ইহুদি রাব্বীদের জবাব হলো– ইসমাইল আব্রাহামের মিশরীয় উপপত্নীর অবৈধ সন্তান, সেমেটিক জাতি উদ্ভূত নয়, সুতরাং ইসমাইল ঈশ্বরের সাথে আব্রাহামের চুক্তির বাইরে (outside God's covenant), এছাড়া তিনি অসভ্য ও দুর্ধর্ষ ছিলেন; বাইবেলে বলা হয়েছে– 'বন্য মানব; তার হস্ত প্রত্যেক মানুষের বিরুদ্ধে' (আদিপুস্তক ১৬ ঃ ১২)।

www.pathagar.com

এটা উল্লেখ করা হয় যে, কোরান অনুযায়ী, প্রফেটিক টাইটেল (নবী পদবি) ইসরাইলের বংশধরদের ওপর আল্লাহ্ দান করেছেন (৪৫ ঃ ১৫), বিশেষ করে ইসহাক ও ইয়াকুবের (আইজাক ও জেকব) পরিবারের ওপরে (২৯ ঃ ২৯)। সুতরাং ইহুদিরা প্রফেট মোহাম্মদকে প্রফেট বলে স্বীকার করতে প্রস্তুত নয়। নবীদের বিশেষত্ব অলৌকিক কর্ম সম্পাদন করা (মোজেজা দেখানো), মোহাম্মদ কোনো মোজেজা দেখাননি। যাই হোক, ইসরাইলিদের শেষ নবী আগেই এসে গেছেন; যদিও মেসিয়া এখনো আসেননি।

যখন প্রফেট মোহাম্মদের কয়েকজন অনুসারী (প্রফেট মোহাম্মদ নিজে নয়) বলেন যে ইহুদিরা যে মেসিয়ার কথা বলেছেন এবং আশা করেছেন সেই মেসিয়া হলেন প্রফেট মোহাম্মদ; এতে ইহুদিরা বলে যে, মোহাম্মদ দাউদের (ডেভিড) বংশধর নয়, মেসিয়ার কোনো চিহ্ন বা প্রতীক তিনি ধারণ করেন না, সুতরাং তিনি মেসিয়া হতে পারেন না।

প্রফেট মোহাম্মদ দাবি করেন (৭ ঃ ১৫৭) যে তোরাহ-তে তাঁর আগমন সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। যদিও এই ভবিষ্যদ্বাণীকে কনফার্ম করে কোনো যুৎসই আয়াত উল্লেখ করা হয়নি, মুসলিম পণ্ডিতগণ তারপর থেকে তোরাহ্ বাদ দিয়ে ওল্ড টেস্টামেন্টের অন্যখানে প্রফেটের আগমন সম্বন্ধে প্রমাণাদি উপস্থাপন করলে ইহুদিরা সেসব প্রমাণ অস্বীকার করে।

মুসলিমদের দাবি যে কোরান আল্লাহর নিকট থেকে আগত পবিত্র পুস্তক; জবাবে ইহুদিরা বলে যে, যদি তা-ই হতো তাহলে, যে কোনো পবিত্র ভাষা, হিব্রু বা সিরিয়ান-এ পাঠানো হতো, (Jeffery, 1938, P. 9) কবি ও মাতালদের ভাষা আরবিতে নয়।

ইহুদিরা, ওল্ড টেস্টামেন্ট সম্বন্ধে প্রফেট মোহাম্মদের ভার্সান অস্বীকার করে বলেছে যে, ওসব ভুল ভ্রান্তিতে ভরা এবং অনেক সময় দুর্বোধ্য। যে ধর্মপুস্তককে তিনি কনফার্ম করার দাবি করেন, সে পুস্তক সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান ক্ষীণ বলে ইহুদিরা উল্লেখ করেছে। উদাহরণস্বরূপ, তিনি না জেনেই ভুলক্রমে অভিযোগ করেছেন এই বলে যে এজরা (ওজাইর) ঈশ্বর পুত্র (৯ ঃ ৩০)। ইহুদিরা এই অভিযোগ অস্বীকার করে। আরো কয়েকটি ভুল-ভ্রান্তির কথা তারা উল্লেখ করেছে (Geiger, 1970)।

প্রফেট মোহাম্মদ অনবরত ইহুদিদের সাথে তিক্ত তর্ক-বিতর্ক করেন এবং তারা যতই তাঁর, প্রফেটের দাবি মানতে অস্বীকার করে, তত বেশি বিরোধ ও তিক্ততা বাড়ে।

৬২৩ খ্রিস্টাব্দে অক্টোবর মাসে ইহুদিদের সাথে বিরোধ তুঙ্গে ওঠে বদর যুদ্ধের কিছু পূর্বে। বার বার বাধাপ্রাপ্ত হয়ে এবং তাদের বিরূপ সমালোচনায় তার ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হচ্ছে এই চেতনায়, প্রফেট মোহাম্মদ ইহুদিদের সাথে সমঝোতার আশা ছেড়ে দেন এবং কঠিন পথ অবলম্বন করেন।

তিনি তাঁর বিরুদ্ধবাদীদের শত্রু বলে অভিযোগ করলেন। কোরানে বলা হয়েছে– 'তুমি নিশ্চয় দেখবে যে, যেসব মানুষ মুসলিমদের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন তারা হচ্ছে ইহুদি (৫ ঃ ৮৫)। তিনি বলেন, ইহুদিরা মুসার কাছ থেকে যে আত্মিক রেভিলেশন পেয়েছিল তাকে বিকৃত করেছে (২ ঃ ৭০)।

www.pathagar.com

প্রফেট মোহাম্মদ এবার পরিবর্তন শুরু করলেন হিব্রু শব্দ 'নাবী'র স্থলে আরবি শব্দ রসূল (মেসেঞ্জার) ব্যবহার করলেন। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন ইহুদি প্রথা অনুসরণ করে যেসব প্রথা তিনি চালু করেন সে সমস্ত বন্ধ করে ইসলাম ও জুদাইজমের মধ্যে যতদূর সম্ভব পরিষ্কারভাবে পার্থক্য তৈরি করবেন।

৬২৪ খ্রিস্টাব্দে ১১ ফেব্রুয়ারি তিনি ওহি পেলেন (২ ঃ ১৪৪) এবং কিবলা জেরুজালেম থেকে মক্কাতে পরিবর্তন করেন; এতে পূর্ব থেকে পশ্চিমে দিক পরিবর্তন হলো। ইহুদিরা তখন তাঁকে অস্থিরমতি বলে অভিযোগ করল এবং পাল্টা আক্রমণ করে বলল, পশ্চিমে মক্কাতে কাবাঘরে মূর্তিপূজার মন্দির সেখানে একখণ্ড কালো পাথরও আছে। তাই মূর্তি ও পাথর পূজার চার্জ আনল।

এরপর প্রফেট শনিবার সাবাতের দিনের বদলে শুক্রবার সপ্তাহে বিশেষ দিন এবং গণপ্রার্থনার দিন বলে ধার্য হলো। এই দিন পূর্ণ দিবস বিশ্রামের দিন বলে গণ্য হলো না। জুমার নামাজ ও খোৎবার পর, সাধারণ কাজকর্ম, ব্যবসা, বাণিজ্য– এমনকি প্রয়োজনে যুদ্ধ করতেও বাধা রইল না। এখানেও ইহুদিরা এই অভিযোগ আনল যে প্রফেট মোহাম্মদ প্যাগন আরবদের পুরনো প্রথায় ফিরে গেলেন, কারণ প্যাগন আরবরা শুক্রবারকে বিশেষ দিন রূপে পালন করত।

কিন্তু শূকরের মাংস হারাম থাকল, তবে ইহুদিদের খাদ্য বিষয়ে অন্যান্য কঠোরতা নমনীয় ও সরল করা হলো, কারণ কোরান বলে, খাদ্যবস্তু সম্বন্ধে ইহুদিদের বিধিনিষেধ তাদের ওপর শাস্তিস্বরূপ ছিল (৬ ঃ ১৪৭)।

প্রথমে প্রফেট মোহাম্মদ যখন তাঁর সাহাবীদের সাথে নামাজে ডাকার জন্য কি ব্যবস্থা নেওয়া যায় এ বিষয়ে মতামত চান, তখন কয়েক জন প্রস্তাব করেন ইহুদিদের মতো 'বুক' ড্রাম পেটাতে। তখন ড্রাম তৈরি করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয় পরে যখন ইহুদিদের সাথে বিবাদের সূত্রপাত হয় তখন ড্রামের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

৬২৪ খ্রিস্টাব্দে ফেব্রুয়ারি মাসের শেষের দিকে দশ দিনের আত্মশুদ্ধি যা মহররম মাসে আশুরায় শেষ হতো এ প্রথা বন্ধ করা হয়। এর বদলে আরবি রমজান মাসে সুস্থ মুসলিমদের সারা মাস রোজা রাখার প্রথা প্রবর্তিত হয় যা হানিফরা ঐ সময় মক্কায় পালন করত। সেই সাথে তার সম্প্রদায়কে 'মধ্যপন্থী' করার জন্য ইহুদি ও খ্রিস্টানকে অনুসরণ না করে (যেমন ইহুদিদের দশ দিন আর খ্রিস্টান ৪০ দিন লেন্টেন কাল উপবাস করে) মাঝামাঝি ৩০ দিন (এক মাস) রোজা রাখার বা সংযমের মাস ধার্য করা হয়। কারণ, 'কোরান বলে আল্লাহ তোমার জন্য সব কিছু সরল করে দিতে ইচ্ছা করেন' (২ ঃ ১৮১)।

৯.২ ইহুদিদের বিনাশ সাধন

এখন প্রফেট মোহাম্মদ ইহুদিদের বিরুদ্ধে সক্রিয় নির্যাতনের পথ বেছে নিলেন এই অজুহাতে যে তাঁর আরব প্রতিপক্ষের সাথে সংঘর্ষে ইহুদিরা বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। কিন্তু আসল কারণ ছিল মদিনাতে ইহুদিদের অর্থনৈতিক আধিপত্য।

৬২৪ খ্রিঃ এপ্রিল মাসে শহরের বাজারের মধ্যে এক সাম্প্রদায়িক ঘটনার ছুতো ধরে ঐ অঞ্চলের ধনী ইহুদি সম্প্রদায় বানু কাইনুকা গোত্রের বসতি অবরোধ করা হয়

www.pathagar.com

মুসলিমদের দ্বারা। বানু কাইনুকা সম্প্রদায়ের বেশির ভাগ মানুষ লোহালক্কড়ের ব্যবসায়ী, যুদ্ধাস্ত্র কারিগর, স্বর্ণকার এবং কামার জাতীয় ব্যবসার মালিক। একটানা পনের দিন অবরোধের পর ইহুদিদের আত্মসমর্পণে বাধ্য করা হয়। পুরুষ মানুষদের বাঁধা হয় তারপর তাদের কতল করার ব্যবস্থা হয়।

এই অবস্থায় খাজরাজ গোত্র প্রধান আবদুল্লাহ ইবন ওবেই এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন। তিনি অনর্থক রক্তপাত পছন্দ করতেন না, তাছাড়া প্রফেট মোহাম্মদের নেতৃত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করতেন এবং তার শনৈ শনৈ ক্ষমতা বৃদ্ধি ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা সম্বন্ধে মদিনাবাসীদের তিনি সাবধান করে দেন। একবার প্রফেট তাকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষা দিতে গেলে তিনি বলেছিলেন, 'যারা তোমার ধর্ম প্রচার অপছন্দ করে তাদের অযথা বিরক্ত করার চেষ্টা করো না।' তিনি ইসলাম ধর্ম থেকে দূরে সরে থাকতেন, কখনোই সত্যিকারের বিশ্বাসী ছিলেন না, তাই তাকে মুসলিমরা 'মোনাফেক' বলত। কিন্তু যতদিন তিনি বেঁচে ছিলেন প্রফেট মোহাম্মদ তাকে ঘাঁটতেন না, কারণ মাদানী খাজরাজ গোত্রের তিনি বড় নেতা ছিলেন।

প্রফেট মোহাম্মদ ঘুরে দাঁড়ালে, আবদুল্লাহ ইবন ওবেই তাঁর কুর্তা চেপে ধরেন। এতে ইবন ইসহাক বলেছেন, প্রফেটের মুখ রাগে লাল হয়ে যায়। কিন্তু আবদুল্লাহ কুর্তা ধরে রেখেই বলেন- 'আল্লাহর শপথ, তুমি যদি এই ইহুদি গোত্রের সাতশো লোক এই সকালবেলায় কেটে ফেল, তাহলে আমি অবস্থার পুরো পরিবর্তন করে দিতে পারি।' প্রফেট সব সময়েই ঠাণ্ডা মাথায় অবস্থার মোকাবেলা করতেন; তাই তিনি ইহুদিদের প্রাণে মারেননি। পরিবর্তে গোটা কাইনুকা গোত্রের সিরিয়ায় নির্বাসনের আদেশ হয়। তাদের তিন দিন সময় দেয়া হয় মদিনা পরিত্যাগ করতে আর তাদের সাথে ব্যবসার কোনো জিনিসপত্র দিতে বারণ করা হয়। তারা চলে গেলে তাদের জিনিসপত্র ও বাড়িঘর বিশ্বাসীদের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা হয়ে যায়।

ইবন ইসহাক বলেছেন, প্রফেট মোহাম্মদ মুসলিমদের অনুমতি দিয়েছিলেন কোনো ইহুদির সম্মুখীন হলে তাকে হত্যা করতে। এই সাধারণ নির্দেশ পালিত হয় ৬২৪ সালে জুলাই মাসে, ফলে ইবন সুনাইমা নামে একজন প্রভাবশালী ইহুদি খুন হয়ে যায়। কিন্তু পাইকারি হারে ইহুদি নিধন পরে সংঘটিত হয়।

৬২৫ খ্রিঃ আগস্ট মাসে মদিনা থেকে তিন মাইল দূরে বানু নাদির ইহুদি গোত্রকে চরমপত্র দেয়া হয় যে তারা যেন বাড়িঘর ছেড়ে অচিরেই সিরিয়াতে চলে যায়, অন্যথায় সকলেই প্রাণে মারা যাবে। ওহোদ যুদ্ধের পূর্বে মক্কার আবু সুফিয়ানের সাথে বানু নাদিরের বাণিজ্য সম্পর্ক ছিল, কিন্তু চরমপত্রের কারণে বলা হয়েছিল যে, তারা প্রফেটের সাথে সম্পাদিত চুক্তিপত্র ভঙ্গ করেছে এবং এর সমর্থনে আল্লাহর কাছ থেকে ওহি পাওয়া গেছে (সূরা ৫৯)। আবদুল্লাহ ইবন ওবেই এই চার্জ অস্বীকার করে বলেছিলেন, ওসব ভিত্তিহীন।

বানু নাদিরের ইহুদিদের যাত্রাকে ত্বরান্বিত করার জন্য প্রফেট মোহাম্মদ এগিয়ে গেলেন দলবল নিয়ে তাদের খেজুর বাগান কেটে ফেলতে ও জ্বালিয়ে দিতে। ইহুদিরা অভিযোগ করল এই বলে যে, এটা আরব দেশের যুদ্ধ আইন এবং মুসার আইনকে লংঘন করা হচ্ছে (Deut 20 : 19); কিন্তু কে কার কথা শোনে! বানু নাদিরকে নির্বাসনে

www.pathagar.com

পাঠানোর পর তাদের তরবারি, শিরোস্ত্রাণ ও অন্যান্য যুদ্ধ সরঞ্জাম এবং তাদের বাড়িঘর সবই মুসলিমরা দখল করে নেয়।

৬২৭ খ্রিঃ এপ্রিল মাসে, খন্দকের যুদ্ধের পর প্রফেট মোহাম্মদ বানু কোরাইজা গোত্রের দুর্গ পঁচিশ দিন অবরোধ করার পর দখল করে নেন। ইহুদিরা বানু নাদিরের মতো স্থান পরিত্যাগ করে নির্বাসনে চলে যাবার প্রস্তাব পাঠায়। কিন্তু প্রফেট সে প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেন। তারা বাঁচতে পারে এক শর্তে সেটা হলো তাদের মুসলিম হতে হবে। মাত্র একজন ইহুদি এই শর্ত মেনে নেয়।

এই ইহুদি নিধনে প্রফেট মোহাম্মদের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের দায় লাঘব করার জন্য হাদিস তৈরি হলো এই বলে যে, ইহুদিদের ভাগ্য নির্ধারণের জন্য প্রফেট মদিনার আউস গোত্র প্রধান সাদ ইবন মুয়াদকে সম্পূর্ণ ক্ষমতা অর্পণ করেন। সাদ প্রফেটের উগ্রবাদী চরমপন্থীদের মধ্যে অন্যতম। ইহুদিরা অনেক আগে থেকেই সাদের চক্ষুশূল ছিল, তাছাড়া অবরোধের সময় সাদ মারাত্মকভাবে আহত হয়। তাই সে সিদ্ধান্ত নেয় যে, কোরাইজা গোত্রের পুরুষদের কতল করা হবে, নারী-শিশুদের দাস হিসাবে বিক্রি করা হবে, আর খেজুরের বাগান ও অন্যান্য সম্পত্তি মুসলিমদের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা হবে।

এই নিষ্ঠুর কর্মের বিরুদ্ধে কিছু আরব আপত্তি ওঠানো সত্ত্বেও প্রফেট মোহাম্মদ সাত তবক আসমান থেকে আল্লাহর প্রেরিত রায় হিসাবে আদেশ দিলেন কার্যকর করার জন্য। কোরানে এ ঘটনার উল্লেখ আছে (৩৩ ঃ ২৬)। আদেশ কার্যকর করার পরেই সাদ ইবন মোয়াদ মারা যায় স্পষ্টত তার জখমের কারণে। বলা হয় যে, এই পবিত্র লোকটির মৃত্যুর জন্য আল্লাহর আরশ আসমানে কেঁপে কেঁপে উঠেছিল (Rodinson 1976, P. 213)।

শহরের বাজারের কাছে খাল কাটা হয়েছিল এবং মোহাম্মদের সম্মুখেই আটশ'র অধিক বন্দির পেছনে হাত বেঁধে রেখে সেই খালের ধারে পাঁচ জনের গ্রুপ করে একে একে মাথা কাটা হয়, পরে দেহগুলো খালে ধাক্কা দিয়ে ফেলা হয়। এই নিষ্ঠুর ও অমানবিক ম্যাসাকার, ইসলামের প্রতি সহানুভূতিশীল লেখকরাও বলেছেন, নাজীদের নিষ্ঠুরতাকেও হার মানায় (Armstrong 1991 P. 207)। এই হত্যাকাণ্ড সারা দিন ধরে চলে এবং রাতে টর্চ-বাতি জ্বালিয়েও এর বাকিটুকুও সারা হয়।

একজন নাম-না-জানা ইহুদি মহিলা যার স্বামী ঐ কতলের অন্তর্ভুক্ত চিৎকার করে দাবি জানায় যে তার স্বামীর সহমরণ হতে চায়; তার দাবি পূরণ হয় এবং সে হাসিমুখে মৃত্যুকে বরণ করে নেয়।

মোহাম্মদের প্রিয় পত্নী আয়েশা, এই ম্যাসাকার দেখেছিলেন, তিনি বলেছিলেন যে, সেই মহিলাটির নির্ভীক মৃত্যুবরণ তাকে সারা জীবন তাড়া করেছে।

জাবির নামে এক বৃদ্ধ ইহুদিকে যিনি পূর্বে কয়েকজন মুসলিমের প্রাণ রক্ষা করেছিলেন, ক্ষমা করা হলে তিনি বলেছিলেন, যখন সকলেই চলে গেল তার আর বেঁচে লাভ কি। সে-ও তাদের সাথী হতে চায়। প্রফেট মোহাম্মদকে এ কথা জানালে তিনি বলেছিলেন, সকলের সাথে তাকে জাহান্নামে যেতে দাও। তার পর তার আদেশে তাকেও হত্যা করা হয়।

www.pathagar.com

বানু কোরাইজার জমি-জমা, জিনিসপত্র, গবাদিপশু, অস্ত্রশস্ত্র— সবকিছু মুসলিমদের মধ্যে ভাগ করে দেয়া হয়। কয়েকজন নারীকে উপপত্নী হিসাবে এবং দাস হিসাবে বন্ধুদের বিতরণের পর তিনি নিজেই একজনকে রেখে দেন। সেই মহিলার নাম রায়হানা; সুন্দরী তরুণী মহিলা। তার স্বামীকে এই ঘটনায় হত্যা করা হয়। রায়হানা প্রফেটের স্ত্রী মর্যাদা পেতেন, কিন্তু তিনি তার ধর্ম পরিত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করতে রাজি না হওয়ায় তাকে বাঁদীর মর্যাদা দেয়া হয়।

প্রফেট মোহাম্মদ, বাকি নারী ও শিশু, প্রায় তেরশ'র মতো, প্রতিবেশী গোত্রের কাছে বিক্রি করে বেশ মোটা টাকা মুসলমানদের কোষাগারে জমা হয়।

৬২৮ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে, প্রফেট মোহাম্মদ ধনী ও উন্নয়নশীল খাইবার ওয়েসিস দলবল নিয়ে আক্রমণ করেন। খাইবার মদিনা থেকে সত্তর মাইল উত্তরে সিরিয়া যেতে পড়ে। খাইবার ওয়েসিস হিব্রু শব্দ 'খেবার' থেকে আগত যার অর্থ সাথী বা সঙ্গী। এখানে ইহুদি সম্প্রদায়ের ঘনবসতি এবং খুবই মজবুত সুসঙ্ঘবদ্ধভাবে তারা বাস করে। ইবনে হিশাম, ইবনে সাদ ওয়াকিদি বলেন, প্রফেট মোহাম্মদ এই ওয়েসিস দখল করেন, গোত্রের প্রধান কিনানাকে বন্দি করে তার বুকের ওপর আগুন দিয়ে নির্যাতন করে কথা আদায় হয়, কারণ গুপ্তধন কোথায় আছে কিনানা বলতে চাননি। পরে গুপ্তধনের সন্ধান মিললে, কিনানার শিরোশ্ছেদ করা হয়।

কিনানার স্ত্রী সাফিয়ার বয়স তখন সতের। তার পিতার নাম হায়ী বেন আখতাব। ইনি বানু কোরাইজাতে মৃত্যুবরণ করেন। মালেগণিমত ভাগের সময় সাফিয়া অন্য লোকের ভাগে পড়ে। কিন্তু প্রফেট মোহাম্মদ সাফিয়াকে দেখে তার ওপর নিজের চাদর ফেলে তাকে নিজের বলে দাবি করেন এবং ঐ রাতেই তরুণী বিধবা সাফিয়াকে বিবাহ করেন।

প্রফেট মোহাম্মদ তার নতুন স্ত্রীর প্রতি এতই মুগ্ধ ছিলেন যে, সাফিয়া মদিনায় ফেরার সময় তার উটে উঠতে গেলে, প্রফেট নিজে জানু পেতে দেন, যাতে তার ওপর ভর করে সাফিয়া উটে উঠতে পারে (Rodinson, 1976, P. 254)। পরে ঈর্ষার বশে প্রফেটের অন্য স্ত্রীরা তাকে ইহুদি বলে উপহাস করলে সে রুষ্ট হয়ে জবাবে বলেছিল যে, মুসা তার চাচা এবং আরন তার পুরোহিত বাবা ছিলেন। এতে প্রফেট মোহাম্মদ খুশি হয়ে কোরানের একটি আয়াত আবৃত্তি করেছিলেন যেখানে উল্লেখ ছিল উপহাসকারী রমণীদের চেয়ে সাফিয়া মহত্ত্বর মহিলা। (৪৯ ঃ ১১)।

বন্দি ইহুদি যুবতী নারীদের মধ্যে একজন ছিল তার নাম জয়নাব, যে প্রফেট মোহাম্মদ ও তার সঙ্গীদের জন্য এক থালা ছাগলের মাংস রান্না করে আনে। সেই মাংসের এক টুকরা খেয়ে একজন তৎক্ষণাৎ মারা যায়। প্রফেটও এক টুকরো খেয়ে যন্ত্রণায় আক্রান্ত হন, কিন্তু সময়মতো চিকিৎসার জন্য প্রফেট সে যাত্রা বেঁচে যান। মাংসে বিষ মিশ্রিত ছিল।

জয়নাবকে জিজ্ঞাসা করা হয় কেন সে প্রফেটকে বিষ দিয়ে মারতে গেল। জবাবে বলেছিল যে, তিনি তার বাবা, চাচা, স্বামী এবং ভাইদের হত্যার জন্য দায়ী এবং তার কওমের জন্য চরম নির্যাতনের কারণ। যদি সত্যিই তিনি প্রফেট হতেন, তাহলে তিনি নিশ্চয়ই মাংসের টুকরা খাওয়ার আগে বুঝতে পাবেন এতে বিষ আছে

www.pathagar.com

এবং গ্রহণ করতে অস্বীকার করতেন। এতে প্রমাণিত হলো যে, তিনি তা বুঝতে পারেননি, তার এই জ্ঞানের অভাবের হেতু তিনি প্রফেট হতে পারেন না। জয়নাবকে তখনিই হত্যা করা হয়।

এই ঘটনার পর থেকে সময়ে সময়ে তার জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত (ঘটনার তিন বছর পর) সেই বিষক্রিয়ায় প্রফেট মোহাম্মদ অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করেছেন। পরে এটা দাবি করা হয় যে প্রফেট মোহাম্মদ সেই বিষাক্ত মাংস খাওয়ার পূর্বে সেই মাংসের টুকরা তাকে সাবধান করেছিল বিষাক্ত বলে, তবু তিনি তা গ্রহণ করেছেন, আর এই জন্য তাকে 'শহীদ' আখ্যা দেয়া যেতে পারে, কেননা এই বিষাক্ত মাংস ভক্ষণের কারণে তিনি যথেষ্ট যন্ত্রণা পেয়েছেন এবং এক বিধর্মীর হাতে মারা গেছেন।

খাইবার ওয়েসিস থেকে প্রফেট মোহাম্মদ যত সম্পদ লাভ করেন তা তার আগেকার সব অভিযান থেকে আহরিত সম্পদের মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। খেজুর, তেল, মধু, কালি, ভেড়ার পাল ও উটের বহর এবং সোনা অন্যান্য স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদ সম্পত্তি, জমি ও গ্রামসহ এত বেশি পেয়েছিলেন যা তিনি কল্পনাই করতে পারেননি। ইবনে হিশাম বলেন, খাইবারের পর থেকে মুসলিম ক্রীতদাসের সংখ্যার মাত্রা অনেক বেড়েছিল।

এর কিছুদিন পরে, অন্যান্য ছোটখাটো ইহুদি সম্প্রদায় যারা ছিল– যেমন, ফাদাক, কামুস, ওয়াতিহ, সোলালিম, ওয়াদি আল-কোরা এবং অন্যরা তাদের জোর করে পরাধীন করা হয়। মদিনার আশপাশে আর গুরুত্বপূর্ণ কোনো ইহুদি গোত্র রইল না। খলিফা ওমর বাকি যেগুলো ইহুদি হেজাজে বাস করত তাদের আরব পেনিনসুলা থেকে উৎখাত করে দেশকে ইহুদিমুক্ত করেন এবং তা ঘটেছিল প্রফেট মোহাম্মদের মৃত্যুর কয়েক বছর পরে।

www.pathagar.com

১০

খ্রিস্টান ও মোহাম্মদ

প্রাথমিক সময় থেকেই অনেক খ্রিস্টান মোহাম্মদকে অর্থোডকস খ্রিস্টান মনে করত না সেমেটিক বা বাইবেলের প্রফেটও মনে করত না, মনে করত গোল্লায় যাওয়া একজন খ্রিস্টান যিনি উল্টোপাল্টা শিক্ষা দিচ্ছেন।

আরবীয় খ্রিস্টান ধর্মবিদ জন দামস্কাস (মৃ. ৭৪৯) মোহাম্মদের ধর্মকে বিপথগামী খ্রিস্টানিটি বলে সংজ্ঞায়িত করেছেন। তিনি লিখেছেন যে মোহাম্মদ মনে হয়, অরিয়ন সাধুদের সংস্পর্শে থেকে ওল্ড ও নিউ টেস্টামেন্টের ওপর ভিত্তি করে নিজের স্বতন্ত্র এক গোষ্ঠী (sect) সংগঠিত করেন (Bettmann 1953 P. 17)।

মধ্যযুগের খ্রিস্টান পাদ্রিরা মোহাম্মদীদের (Mohammdans) একটি বিরোধী বা নন-খ্রিস্টান ধর্ম মনে করতেন না, মনে করতেন খ্রিস্টান ধর্মের দলছুট ধর্ম ও ঈশ্বরদ্রোহী।

দান্তেও (Dante) (মৃত ১৩২১) প্রফেট মোহাম্মদ সম্বন্ধে এমন বিরূপ মন্তব্য করেন যার জন্য ইতালির মুসলমানরা ব্যাভেনাতে তার কবর উড়িয়ে দেবার ধমকি দিয়েছিল।

জার্মান দার্শনিক নিকোলাস কুসা (মৃ. ১৪৬৪) কোরান বিশ্লেষণ করে বলেন, এই গ্রন্থ নেস্টোনিয়ানবাদের খিচুড়ি। [খ্রিস্টানিটির প্রথম শতাব্দিতে মধ্যপ্রাচ্যে নোস্টোরিয়ান খ্রিস্টবাদ চালু ছিল, বিশেষ করে সিরিয়াতে। নেস্টোরিয়ারা খ্রিস্টের প্রকৃতিকে দু'ভাগে ভাগ করেছিল– এক মানবিক, দুই স্থানীয়; যা দুটো বিপরীত বাধায় প্রভাবিত হতো এবং তিন, মনোফিসাইটস, যারা সংখ্যায় বেশি ছিল এবং বিশ্বাস করত যে খ্রিস্টের স্বর্গীয় রূপ তার মানবতার মাঝে বিলীন হয়েছিল অর্থাৎ খ্রিস্টের ভগবান রূপ মানুষ খ্রিস্টে একাকার ছিল। এই মতবাদের খ্রিস্টান সিরিয়ায় তখন বেশি ছিল। [অনুবাদক]

কয়েকজন আধুনিক অথরিটিও এই মতবাদ পোষণ করেন যে ইসলাম ফান্ডামেন্টাল খ্রিস্টানিটির একটি শাখা, কেননা এ বিশ্বাস খ্রিস্টান নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। তবে প্রকাশ পেয়েছে অন্যভাবে, কারণ ঐ পরিস্থিতিতে মোহাম্মদ নিজেকে বিকশিত করেন। তারা বলেন, এটা সত্য, যদি তিনি মদিনাতে থাকাকালীন মৌলিক খ্রিস্টান টিচিংস থেকে দূরে সরে না যেতেন, তাহলে খ্রিস্টান সম্প্রদায় আরবে আরাবিয়ার চার্চ প্রতিষ্ঠা করে ফেলত। (Muir, 1912, P. xcviii)।

www.pathagar.com

১০.১ প্রাথমিক খ্রিস্টান প্রভাব

শিশু মোহাম্মদের প্রথম নার্স উম্মে আয়মান আবিসিনিয়ার একজন খ্রিস্টান মহিলা। যদিও সঠিকভাবে জানা যায়নি কতদিন শিশু মোহাম্মদ তার অধীন পালিত হয়েছিলেন, তবু এটা সত্য যে তিনি খ্রিস্টান পরিবেশে জন্মগ্রহণ করেছেন, পালিতও হয়েছেন। এটা মনে করা অসঙ্গত নয় যে, প্রাথমিক আত্মিক জাগরণ কমবেশি হয়েছিল খ্রিস্টানদের মাঝে, যাদের মধ্য থেকে তার ভবিষ্যৎ প্রফেটহুডের দানা বেঁধেছিল।

বারো বছর বয়সে মোহাম্মদ সিরিয়াতে সাধু বহিরার সাক্ষাৎ পান এবং ঐতিহাসিকদের মতে, বয়স বাড়ার সাথে সাথে তিনি উত্তর আরাবিয়া, প্যালেস্টাইন এবং সিরিয়ায় বাণিজ্যিক যাত্রা নিয়মিত করেন এবং জানা-অজানা খ্রিস্টানদের সাথে মেলামেশা করেন, আলোচনা করেন। জানা লোকদের মধ্যে ছিলেন খ্রিস্টান সাধু সারজিয়াস (সারকিস)। সারজিয়াস ছিলেন আবদুল কাইস গোত্রভুক্ত। এছাড়া ছিলেন জিরজিস (জর্জিয়াস) এবং নাস্তর (Nestor)।

প্রাথমিক ঘটনা মতে, এই সাধুদের মধ্যে একজন মোহাম্মদের কাছে ধর্মীয় ডকট্রিন ও আইন ব্যক্ত করেন এবং বাইবেল থেকে কিছু অনুপ্রাণিত প্যাসেজ আবৃত্তি করে শোনান সেগুলো মোহাম্মদ কোরানভুক্ত করেছেন, যাতে প্যাগন আরবরা একটি সত্য ঈশ্বরের সাথে পরিচিত হতে পারে। সত্য যা-ই হোক না কেন, এটা হলফ করে বলা যায় যে, মোহাম্মদ তার গভীর ধর্মীয় আগ্রহ ও অধ্যাত্মবাদের প্রতি ঝোঁকের কারণে এই সব তত্ত্বকথার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে মনোযোগ দিয়ে শুনতেন এবং খ্রিস্টান সাধুদের সাথে আলোচনাও করতেন।

এই সংশ্লিষ্টতার কারণে আরবের মধ্যে এবং বাইরে মোহাম্মদ ধর্মীয় প্রথা ও বিশ্বাসের সাথে পরিচিত হয়ে ওঠেন এবং যদিও তিনি খ্রিস্টান সন্ন্যাসবাদকে অনুমোদন করেননি, তবু খ্রিস্টান সাধুদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ছিল এবং তাদের প্রার্থনা-পদ্ধতি কিছু গ্রহণও করেন।

মোহাম্মদের মিশন আরম্ভের পূর্বে খ্রিস্টান সম্প্রদায় আরাবিয়ান শহরে-নগরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বাস করত। খ্রিস্টান মার্চেন্টরা যারা হেজাজে বাণিজ্য করত তারা স্থানীয় মেলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছে।

কিছু খ্রিস্টান গোত্র মক্কাতে বাণিজ্য ডিপো প্রতিষ্ঠা করে সেখানে তাদের প্রতিনিধি বসিয়ে রেখেছিল। এমনি গোত্রের মধ্যে ছিল ইজিল। এদের সাথে কোরেশ গোত্র সহম-এর বাণিজ্য চুক্তি ছিল। তেমনি ছিল খ্রিস্টান ঘাসান গোত্র ও কোরেশ গোত্র জুহরার সাথে। এই যোগসূত্রের কারণে কাবাঘরের আশপাশে বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছিল খ্রিস্টানদের।

মক্কাতে ছোট হলেও প্রভাবশালী খ্রিস্টান জনসংখ্যা বাস করত, আরব ও বিদেশী খ্রিস্টান উভয়ই। আবিসিনিয়া, সিরিয়া, ইরাক ও প্যালেস্টাইন থেকে ক্রীতদাস ও স্বাধীন খ্রিস্টান ব্যক্তি ভিড় জমিয়েছিল মক্কাতে। এই সব খ্রিস্টান জনগণ ছিল কারিগর, রাজমিস্ত্রি, ব্যবসায়ী, ডাক্তার ও লেখক (কাতিব)। আজরাকি (মৃ. ৮৫৮) বলেছেন যে, মক্কাতে খ্রিস্টানদের একটি আলাদা কবরস্থান (Cemetery) ছিল (Trimingham 1979, P. 260)।

www.pathagar.com

ভ্রাম্যমাণ খ্রিস্টান প্রচারকগণ প্রায়ই হেজাজের মধ্যে বিচরণ করেছেন এবং তাদের মধ্যে একজন কস ইবন সায়দার সারমন, মোহাম্মদের মিশন শুরু হওয়ার পূর্বে, তার মনে গভীর রেখাপাত করেছিল।

খাদিজা মোহাম্মদের প্রথম জীবন সঙ্গিনী ছিলেন তাঁর জীবনের পরবর্তী চব্বিশ বছর ধরে। তিনি খ্রিস্টান ছিলেন এবং খ্রিস্টানদের সাথে তাঁর নিবিড় যোগসূত্র ছিল। তাঁর কাজিন ওয়ারাকা খ্রিস্টান ছিলেন। ওয়ারাকা মোহাম্মদকে প্যাগন আরবদের ধর্ম সংস্কারের প্রচেষ্টাকে উৎসাহিত করেছেন।

৬১৯ খ্রিস্টাব্দে মোহাম্মদের অনুসারীদের অনেকেই খ্রিস্টান আবিসিনিয়াতে হিজরত করেন। এদের মধ্যে তার তিনজন কাজিন ছিলেন জাফর, ওবাইদুল্লাহ ও জুবাইর; তিনজন মহিলা, যারা পরে প্রফেট মোহাম্মদের পত্নীর মর্যাদা পান তারা হলেন সওদা, উম্মে হাবিবা এবং উম্মে সালমা। সওদা ও উম্মে হাবিবা উভয়েই বিধবা ছিলেন এবং তাদের স্বামীরা ছিলেন খ্রিস্টান। মোহাম্মদের শ্যালক মালিক ইবন জামাআ, মোহাম্মদের কন্যা রোকেয়া এবং ওসমানও ছিলেন এই দলে। ওসমান পরবর্তীতে তৃতীয় খলিফা হয়েছিলেন।

হিজরতকারীদের মধ্যে অনেকেই খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করে আবিসিনিয়াতে রয়ে যান, এদের মধ্যে মোহাম্মদের কাজিন ওবাইদুল্লাহ এবং একজন কোরেশী সাকরান। প্রফেট মোহাম্মদের উক্ত তিনজন স্ত্রীদের মধ্যে প্রায়ই আবিসিনিয়ার নির্জনবাস স্মরণে আসত।

মোহাম্মদের পালিত পুত্র জায়েদ ইবন হারিথ এবং সলমন ফারসি যিনি ৬২৭ খ্রিস্টাব্দে খন্দরের যুদ্ধে মুসলমানদের সাহায্য করেছিলেন, উভয়েই প্রথমে খ্রিস্টান ছিলেন। হারিথ ইবন কালদা, মোহাম্মদের বন্ধু ও ডাক্তার, নেস্টোরিয়ান খ্রিস্টান ছিলেন। আবিসিনিয়ান ক্রীতদাস বেলাল, ইসলামের প্রথম মুয়াজ্জিন, তার শেষ জীবন খ্রিস্টান টারসাসে অতিবাহিত করেন এবং হাসান ইবন থাবিত মোহাম্মদের ব্যক্তিগত কবি উভয়েরই নিবিড় খ্রিস্টান বন্ধন ছিল। মোহাম্মদের অতি প্রিয় উপপত্নী মেরি কিবতিয়া মিশরের খ্রিস্টান ক্রীতদাসী ছিলেন।

১০.২ খ্রিস্টান শিক্ষকগণ

ঐসব লোক ছাড়া যাদের কাছ থেকে মোহাম্মদ পরোক্ষভাবে প্রভাবিত হয়েছেন, এমন কতকগুলো খ্রিস্টান ছিলেন যাদের নিকট থেকে পরবর্তীতে তিনি প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং তার ডকট্রিনের পরিপূর্ণতার জন্য তাদের কাছে ঋণী ছিলেন।

প্রফেট মোহাম্মদের শত্রুরা জানত যে তিনি খ্রিস্টানদের টিচিংস সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল হওয়ার জন্য স্থানীয় খ্রিস্টানদের বাড়িতে যাতায়াত করতেন তাই তাঁর শত্রুরা অভিযোগ তুলেছিল যে কোরানে কিছু অংশ তিনি খ্রিস্টানদের কিতাবের মেটিরিয়েল এবং কিছু অংশ বিভিন্ন উৎস থেকে সংগ্রহ করেন। তাঁকে দোষ দেয়া হতো এই বলে যে তিনি যেখানে কিছু শুনতে পেতেন তাতে কান পাততেন (৯ ঃ ৬১) এবং সে সব গাল-গল্পকে গুরুত্বও দিতেন। তারা (তাঁর শত্রুরা) তাঁর বিরুদ্ধে চার্জ এনেছিল এই বলে যে তিনি অন্যের দ্বারা নির্দেশিত (৪৪ ঃ ১৩) এবং সাহায্যপ্রাপ্ত। সেই সব

www.pathagar.com

মানুষ তাকে সকাল-সন্ধ্যায় প্রাচীন কাহিনী ও ঘটনা শোনাত (২৫ ঃ ৬)। এছাড়া তার শিক্ষকদের মধ্যে কিছু বিদেশীও ছিল (৯১৬ ঃ ১০৫)।

এই সব কাজের প্রতিবাদ করে প্রফেট মোহাম্মদ বলেছিলেন যে তিনি পূর্বে কোনো কিতাব পড়েননি বা সেখান থেকে কিছু লিখেও নেননি, গ্রহণও করেননি। (২৯ ঃ ৪৭) এবং বিদেশী শিক্ষক ও তাদের ভাষা সম্বন্ধে প্রফেট বলেন যে তাদের ভাষা বিদেশী, দুর্বোধ্য কিন্তু কোরান লিখিত হয়েছে বোধগম্য আরবি ভাষাতে। ইয়াহিয়া আল-বাইদাবী, আলা-জামাখশারী, আব্বাসী জালালান ও অন্যান্য মুসলিম পণ্ডিত ও তফসিরকারদের লেখা থেকে ঐ সব ব্যক্তিদের চিহ্নিত করা গেছে যারা আরব ও বিদেশী ছিল এবং তারা কোরান রচনায় সম্পৃক্ত; কিন্তু তাদের সম্বন্ধে বিস্তারিত অল্পই পাওয়া যায় তাই বিষয়টি অনিশ্চিত রয়ে যায়।

প্রফেট মোহাম্মদ জ্ঞানী ইহুদি পণ্ডিতদের কাছ থেকে সংবাদ সংগ্রহ করতে পারেন কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দেখা গেছে তাঁর পরামর্শদাতা (mentor) ছিলেন খ্রিস্টান পণ্ডিতরা। তফসিরকার হুসাইন বলেছেন যে প্রফেট প্রত্যেক সন্ধ্যায় জনৈক খ্রিস্টানের কাছে তাওরাত ও ইঞ্জিল শুনতে যেতেন। বেশ কয়েক জন মুসলিম লেখকও বলেছেন যে, প্রফেট অন্য ধর্মের লোকদের সাথে যোগাযোগ করতেন এবং একথা কোরেশীরাও বলাবলি করেছে। যাদের কথা উঠেছে তাদের মধ্যে নিম্নে বর্ণিত পণ্ডিত ব্যক্তিদের নাম উল্লেখযোগ্য।

(১) কাইস ছিলেন আবদুল কাইস গোত্রের; তিনি খ্রিস্টান ছিলেন। প্রফেট মোহাম্মদ তার কাছে যাতায়াত করতেন।

(২) জাবরা যুবক গ্রিক খ্রিস্টান, তার পেশা ছিল তরবারি তৈরি করা এবং হাদ্রামাত থেকে আগত এক পরিবারের গৃহ ভৃত্য। এই পরিবার মক্কাতে স্থায়ী বাসিন্দা ছিল। জাবরা মুসার আইন সম্বন্ধে ভালো জ্ঞান রাখল; বাইবেলের অন্যান্য নবী ও যিশুর শিক্ষা সম্বন্ধেও তার জ্ঞান ছিল। সে প্রফেটের সামনে এই সব কিতাব পড়ে শোনাত এবং প্রফেট মোহাম্মদ তার কাছে নিয়মিত যেতেন।

(৩) আবু তাকবিহা গ্রিক ছিলেন এবং প্রফেট মোহাম্মদ তার আলোচনায় অংশ নিতেন।

(৪) সিনানের পুত্র সোহাইব গ্রিক ক্রীতদাস ছিল এবং দক্ষিণ মেসোপটেমিয়ার ওবোলার পার্সি গভর্নরের ভাতিজা, যাকে ওবোলা থেকে ডাকাতরা তুলে নিয়ে সিরিয়াতে চলে যায়। সিরিয়াতে বাইজানটাইন রূপে শিক্ষা গ্রহণ করে মক্কা পালিয়ে যায় সোহাইব। প্রফেট মোহাম্মদ এর কাছে যেতেন বলে প্রকাশ। এই সোহাইব পরে ইসলাম ধর্মে দীক্ষা লাভ করে।

(৫) আয়েশও একজন ক্রীতদাস। ভালো শিক্ষা-দীক্ষা ছিল। পরে প্রফেট মোহাম্মদের একজন অনুসারী হয়ে যায়।

(৬) খ্রিস্টান তামিম গোত্রের আবু রোকেয়া তার পবিত্র জীবনযাপনের জন্য খ্যাত ছিল। তার নিবেদিতপ্রাণ ও নিঃস্বার্থ সেবা; তাকে আখ্যায়িত করেছিল 'মানুষের সাধুব্যক্তি' (Archer, 1924 P. 60)। পরে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং প্রফেট মোহাম্মদের নিকট সাহাবীদের একজন হয়ে যান।

www.pathagar.com

(৭) খ্রিস্টান তামিম আল-দারী, শোনা যায়, প্রফেট মোহাম্মদকে 'শেষ বিচারের দিন' সম্বন্ধে ধারণা দেন। তিনিও পরে মুসলিম হয়ে যান। সময় সময় তাকে আবু রোকেয়া বলে মনে হতো।

(৮) নিনেভের খ্রিস্টান সাধু আদ্দাস মক্কায় বসতি করেন। খাদিজা মোহাম্মদকে তার কাছে নিয়ে যান এবং তিনি মোহাম্মদের কাছে জিব্রাইল ফেরেস্তা সম্বন্ধে এবং ঐশীবাণী বহনকারী রূপে বিস্তারিত বর্ণনা দেন। তার সাথে মোহাম্মদ অনেক দিন ধরে আলোচনা করেন। এই আদ্দাস সেই আদ্দাস নন, যিনি ৬১৯ সালে তায়েফে আশ্রয় প্রার্থনার সময় সাহায্য করেছিলেন।

(৯) নিনেভের ইউনুছ সম্বন্ধে ইবন হিশাম বলেন যে, ইউনুছ নিনেভের আদ্দাসের ভাই ছিলেন এবং তিনি তাঁর আধ্যাত্মিক ও সাধুতার গুণে প্রফেটিক ক্ষমতা লাভ করেন। প্রফেট মোহাম্মদ তার কাছেও যাওয়া-আসা করেছেন।

(১০) ইয়াসরা বা আবু ফুকাইহা জ্ঞানী খ্রিস্টান ব্যক্তি ছিলেন। ইনি মক্কার একটি পরিবারে ভৃত্যরূপে কাজ করতেন। প্রফেট মোহাম্মদ এখানেও আসতেন। বর্ণনা করা হয় যে ইয়াসরা খ্রিস্টান গসপেল থেকে পড়ে শোনাতেন আর প্রফেট মোহাম্মদ মনোযোগ দিয়ে শুনতেন। ইয়াসরার কন্যা ফুকাইহা হাত্তাবকে বিবাহ করেন এবং আবিসিনিয়ার হিজরতে অংশ নেন।

(১১) তফসিরকার আব্বাসী বলেন যে, কাইন খ্রিস্টান ছিলেন, তিনি প্রফেট মোহাম্মদকে কয়েকটি কাহিনীর বর্ণনা দেন, যা পরে কোরানের অন্তর্ভুক্ত হয়।

(১২) ইয়ামামার রহমান, মোহাম্মদের সমসাময়িক ব্যক্তিরা বলেছেন, প্রফেট মোহাম্মদকে কিছু ধর্মীয় ধারণা দিয়েছিলেন। ইবন ইসহাক ব্যক্ত করেছেন যে, ইয়ামামার এক খ্রিস্টান আব্দুল রহমানের সাথে প্রফেট মোহাম্মদ যোগাযোগ করতেন। এই রহমানকে পণ্ডিত ব্যক্তিরা মুসাইলিমা বলে চিহ্নিত করেন।

১০.৩ খ্রিস্টানদের প্রতি সহিষ্ণুতা

নবী জীবনের শুরু থেকে মক্কাতে এবং মদিনায় প্রথম দিকে, প্রফেট মোহাম্মদ মেসিয়া যিশু, লোগস ও ঈশ্বরের সম্বন্ধে খ্রিস্টান মতবাদের প্রতি গভীর আগ্রহ ছিল।

কোরানে ঈশ্বর যিশুকে বলেন, তোমাকে যারা অনুসরণ করে আমি শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত তাদের অবিশ্বাসীদের ওপর প্রতিষ্ঠিত করব (৩ ঃ ৪৮)। কোরান ধারণ করে যে, খ্রিস্টানরা গর্বমুক্ত এবং মুসলিমদের সাথে বন্ধুত্ব বজায় রাখতে অতি আগ্রহী (৫ ঃ ৮৫)।

৬২৮ খ্রিস্টাব্দে খ্রিস্টান ডেপুটেশনের নেতাদের, যারা মদিনাতে তাঁর সাথে দেখা করে, তাদের নিজের বাসায় থাকতে দেন, তাদের মদিনার মসজিদে প্রার্থনা করার অনুমতি দেন এবং সেখানে খ্রিস্টান নেতারা প্রথামতো পূর্বদিকে মুখ করে প্রার্থনা করেন।

ঐ একই সালে নাজরানের খ্রিস্টানদের সাথে এক সন্ধি চুক্তিতে মোহাম্মদ এই শর্তে আশ্বাস দেন যে, তাদের তিনি আশ্রয় দিবেন এবং কোনো অত্যাচার করা হবে না। তাদের জীবনের, ধর্মের ও সম্পত্তির নিরাপত্তা দেয়া হবে; কোনো খ্রিস্টানকে তার

www.pathagar.com

ধর্ম পরিত্যাগ করতে জবরদস্তি করা হবে না এবং কোনো তীর্থযাত্রীকে বাধা দেয়াও হবে না; খ্রিস্টানের ওপর কোনো কর ধার্য হবে না অথবা তাদের তরফ থেকে কোনো সৈন্য দাবি করা হবে না; খ্রিস্টান মহিলা কোনো মুসলিমকে বিবাহ করলে সে তার নিজের ধর্ম পালন করতে পারবে; কোনো চার্চ ভেঙে মসজিদ গড়া হবে না; চার্চ মেরামতের জন্য সাহায্য প্রদান করা হবে; কোনো বিশপকে চার্চ থেকে, কোনো সাধুকে মনাস্টরি থেকে, কোনো পুরোহিতকে তার বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করা হবে না, কোনো মূর্তি বা ক্রসধ্বংস করা হবে না; খ্রিস্টানরা প্রার্থনার সময়ে কাঠের মন্দিরা বাজাতে পারবে এবং উৎসবের সময় ক্রস বহন করতে পারবে। (Ameer Ali 1965, P. 273)। এই সব বিষয়ে মোহাম্মদ তাঁর নিজের শপথ দিয়েছিলেন। তিনি এবং তাঁর অনুসারীদের ব্যক্তিগতভাবে এই শর্ত মেনে চলার কথা দেন এবং ঘোষণা দেন যে কোনো মুসলিম এই শর্ত ভঙ্গ করলে সে ঈশ্বরের নির্দেশ ভঙ্গকারী রূপে চিহ্নিত হবে।

প্রফেট মোহাম্মদ যেমন একবার চিন্তা করেছিলেন প্রার্থনার সময় মুসল্লিদের ডাকার জন্য ইহুদিদের মতো ড্রাম (বুক) ব্যবহার করবেন। তেমনি তিনি ভেবেছিলেন খ্রিস্টানদের মতো ঘন্টা বাজানো এবং কাঠের মন্দিরা (নাকুস) ব্যবহার করবেন প্রার্থনার সময়। যাই হোক ধাতুর তৈরি ঘন্টার শব্দতে তার বিরক্তি ধরে, তাই তিনি কাঠের মন্দিরা (Clapper) বাজাবার সিদ্ধান্ত নেন। ইবন হিশাম বলেন, প্রফেট মোহাম্মদ কাঠের মন্দিরা তৈরি করতে নির্দেশ দেন এবং তা করাও হয়েছিল; ঠিক এই সময় তিনি মত পরিবর্তন করেন এবং আজান দেয়ার পদ্ধতি চালু করেন।

৬৩০ খ্রিস্টাব্দে মক্কা বিজয়ের পর নগর দখল করে মোহাম্মদ কাবাঘরের সব মূর্তি ভেঙে ফেলার ও দেয়াল চিত্র সব মুছে ফেলার নির্দেশ দেন। আব্রাহাম ও ইসমাইলের মূর্তিও ভেঙে ফেলা হয়, কেননা তাদের হাতে প্যাগন জ্যোতিষীদের মতো হাতে ভাগ্য নির্ধারণ তীর (Divining arrows) ধরা ছিল। কিন্তু বলা হয় যে, তিনি নিজের হাত দিয়ে মাতা মেরি ও শিশু যিশুর একটি চিত্র রক্ষা করেন (Esin 1963, P. 109)। এই ছবিটি চিত্রকর বাকুম (pachomias) কর্তৃক অঙ্কিত বলে কথিত। ৫৯৪ সালে যখন কাবাঘর পুনর্নির্মিত হয় তখন এই চিত্র অঙ্কিত হয়েছিল। পরে এই ছবির কি দশা হয়েছিল জানা যায়নি, তবে নিঃসন্দেহ যে কোনো এক সময়ে উপযুক্ত উপায়ে এই ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিল।

১০.৪ সমান্তরাল প্যাসেজ

পণ্ডিত ব্যক্তিগণ বাইবেল ও কোরানের প্যাসেজ, চ্যাপ্টার ও ভার্স পাশাপাশি রেখে দেখিয়েছেন যে প্রফেট মোহাম্মদ ইহুদি ও খ্রিস্টান সূত্র থেকে বহু মেটিরিয়েল ব্যবহার করেছেন। ক্যাননিক্যাল এবং এপ্রোক্রাইফাল অর্থাৎ আইন বিষয়ক যা বাইবেলের অন্তর্ভুক্ত এবং গুপ্ত বিষয়ে যা বাইবেল বহির্ভূত ও অস্বীকৃত উভয়ই, প্রফেট মোহাম্মদ ওল্ড এবং নিউ টেস্টামেন্টের প্যাসেজগুলো শুনে থাকবেন এবং পরে সেগুলো গুছিয়ে শ্রুত বস্তুরূপে নিজের মতো করে ব্যবহার করেছেন।

বাইবেল থেকে উদ্ধৃতি কোটেশন রূপে কোরানে কিছু ব্যবহার করা হয়েছে, যেমন– "মোত্তাকীগণ পৃথিবীর মালিক হবে (২১ ঃ ১০৫)। এটা সরাসরি ওল্ড

www.pathagar.com

টেস্টামেন্ট থেকে নেয়া" (সঙ্গীতাবলী ৩৭ ঃ ২৯)।

গসপেলের উদ্বৃতি আছে : সেন্ট মার্ক-এর গসপেল বলে : জমি নিজে নিজেই ফসল জন্মাল; প্রথমে চারা, পরে শীষ এবং শীষের মাথায় পরিপূর্ণ শস্যের দানা (মার্ক ৪ ঃ ২৮)। কোরানে এইরূপে বলা হচ্ছে : এবং ইঞ্জিলেও তাহাদের বর্ণনা এইরূপই। তাহাদের দৃষ্টান্ত একটি চারাগাছ, যাহা হইতে নির্গত হয় কিশলয়, অতঃপর ইহা শক্ত ও পুষ্ট হয় এবং পরে কাণ্ডের উপর দাঁড়ায় দৃঢ়ভাবে। (৪৮ ঃ ২৯)।

অতি সুখকর দৃশ্য (beatific vision) নিউ টেস্টামেন্ট ও কোরানে এই ভাবে বর্ণিত : আমরা এখন যেন আয়নায় অস্পষ্ট দেখছি কিন্তু তখন সামনাসামনি দেখতে পাব (১ করিন্থ ১৩ ঃ ১২)। কোরান বলছে : তাদের প্রভুর দিকে তাকিয়ে ঐ দিন তাদের মুখমণ্ডলই উজ্জ্বল হইবে (৭৫ ঃ ২২)।

যিশু বলেছেন : যে তার পিতা বা মাতা-পুত্র বা কন্যাকে আমার চেয়ে বেশি ভালবাসে, সে আমার উপযুক্ত নয়। একটি হাদিসে প্রফেট মোহাম্মদ বলেছেন : কাউকে বিশ্বাসী বলা যাবে না, যদি না সে বিশ্বাস করে আমি তার কাছে তার বাবা, মা, সন্তান সমস্ত মানবজাতি থেকে প্রিয় (Brandon 1970, P. 277)।

বাইবেলের প্যারাবেল আছে জ্ঞানী ও নির্বোধ ভার্জিনদের সম্বন্ধে : নির্বোধ জ্ঞানী ব্যক্তিকে বলে, 'তোমার তেল আমাকে দাও, কারণ আমাদের বাতিগুলো নিভে গেছে।' কিন্তু বিজ্ঞ ব্যক্তি জবাবে বলে : "না, আমাদের জন্য যথেষ্ট না রেখে তোমাকে দেয়া যাবে না। তুমি বরং তোমার জন্য কিনে নাও" (মথিঃ 25 : 8-9)। কোরান বলছে : "ঐ দিন, মোনাফেকগণ নারী-পুরুষ উভয়েই বিশ্বাসীদের বলবে 'আমাদের সাথে এসো যাতে তোমাদের আলোতে আমাদের বাতি জ্বালাতে পারি।' তখন তারা বলবে : ফিরে যাও এবং তোমাদের নিজেদের জন্য আলো খুঁজে নাও, (৫৭ ঃ ১৩)।'

যিশু বলেছেন : সুচের চোখ দিয়ে উট গলে যাওয়া সহজ একজন ধনী ব্যক্তির আল্লাহর রাজত্বে প্রবেশ করার চেয়ে (মথি ১৯ ঃ ২৪)। কোরানের মতে : আমাদের যারা মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে তাদের জন্য স্বর্গদ্বার উন্মুক্ত হবে না, অথবা তারা স্বর্গে প্রবেশ করতে পারবে না, যতক্ষণ সুচের চোখ দিয়ে একট উট গলে যায় (৭ ঃ ৩৮)। বাইবেল বলে : প্রভুর দিনে, স্বর্গগুলো লিখিত বর্গগজের মতো গুটিয়ে যাবে। (ইসাইয়া. ৩৪ ঃ ১)। কোরান বলে : ঐদিন আমরা (ঈশ্বর) লিখিত কাগজের মতো স্বর্গগুলোকে গুটিয়ে ফেলবো (২১ ঃ ১০৪)।

সেন্ট পল লিখেছেন : চোখও দেখেনি, কানও শোনেনি, মানুষের অন্তরেও প্রবেশ করেনি, ঐসব বস্তু তাদের জন্য ঈশ্বর তৈরি করেছেন যারা তাঁকে ভালবাসে (১ করিন্থ ২ ঃ ৯)। প্রফেট মোহাম্মদ আবু হোরায়রাকে বলেছিলেন– আল্লাহ ভালো লোকদের জন্য যা তৈরি করেছেন, তা চোখ দেখেনি, কান শোনেনি বা কারোর অন্তঃকরণেও প্রবেশ করেনি (আমির আলী ১৯৬৫, পৃঃ ১৯৯)। তারপর তিনি নিম্নোক্ত আয়াত আবৃত্তি করেন– ভালো কাজের জন্য যে কী পুরস্কার মানুষের দৃষ্টিকে আনন্দিত করবে, তা কারোর জানা নেই (৩২ ঃ ১৭)।

বাইবেল বলেছে : যেখানে আমার নামে দু'তিন জন লোক জড়ো হয় আমিও তাদের মধ্যে থাকি (মথি ঃ ১৮ ঃ ২০)। কোরান বলে : তিন ব্যক্তির মধ্যে এমন কোনো গোপন

www.pathagar.com

পরামর্শ হয় না, যেখানে চতুর্থ জন হিসাবে আল্লাহ উপস্থিত থাকেন না (৫৮ ঃ ৭)।

এমন অনেক জিনিস রয়েছে যা যিশু করেছেন, যদি কেউ তা লিখতে চায়, আমি মনে করি, লিখলে সারা বিশ্বে সেই সব পুস্তকের ঠাঁই হবে না (জন. ২১ ঃ ১৫)। কোরান বলছে : সমুদ্র যদি কালি হয়, সারা পৃথিবীর বৃক্ষরাজি যদি কলম হয় তাও প্রভুর কথা লিখে সারা যাবে না। (১৮ ঃ ১০৯)।

প্রফেট মোহাম্মদ নিজে এবং তার চরিতকারগণ তাঁর ও যিশুর জীবনের মধ্যে সমান্তরাল টানার চেষ্টা করেছিলেন। এইরূপে বলা হয় যে, যিশুর মতো মোহাম্মদ কয়েকজন শিষ্য চয়ন করেছিলেন ইসলামের বাণী ছড়িয়ে দিতে, যিশুর মতো মোহাম্মদ পর্বতের ওপর থেকে শেষ সারমন দিয়ে বলেন– এই দিন আমি তোমাদের ধর্ম পরিপূর্ণ করিলাম। যিশু নাজরাথের সিনেগগে ঘোষণা দেন : এই দিনে এই পুস্তক তোমাদের কর্ণকে পরিপূর্ণ করিল (লুক ৪ ঃ ২১)। ক্রুশে উঠে যিশুর শেষ বাণী ছিল : শেষ হয়ে গেল (জন. ১৯ ঃ ৩০)। এর প্রতিধ্বনি শুনতে পাওয়া যায় যখন মোহাম্মদ তার সারমনে শেষ বাক্য উচ্চারণ করেন– 'আমি আমার কাজ শেষ করিয়াছি।'

প্রফেট মোহাম্মদের মৃত্যুর পর তাঁর অনুসারীরা এই দুইটি জীবনের মধ্যে সাদৃশ্য (Similarities) খুঁজে চলেছে– মোহাম্মদের অলৌকিকতার মধ্যে, তাঁর পাপহীনতার ধারণার মধ্যে এবং তাঁর স্বর্গীয়-সমমর্যাদার মধ্যে।

১০.৫ পারিভাষিক শব্দ

শুধু পশ্চিম পণ্ডিতবর্গ নয় (Jeffery, 1938; Sweetman, 1967, et ab.) প্রথম দিকের কয়েকজন মুসলিম তফসিরকারও (exegetes) দেখিয়েছেন যে, অনেক মৌলিক ধর্মীয় শব্দ যা মোহাম্মদ ব্যবহার করেছেন, মূলত তা সিরিয়া ও আরবের খ্রিস্টান চার্চে ধর্মীয় পরিভাষার অন্তর্ভুক্ত ছিল যেমন সিরিয়াক (খ্রিস্টয়ান আরামাইক)কে দেখা যায় এবং সেই সব পরিভাষা সুবিধাজনকভাবে হাতের কাছে পেয়ে মোহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা ধার করা শব্দ (loanwords) হিসাবে গ্রহণ করেছেন। সেই সব পরিভাষা থেকে বাছাই করে কিছু অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো :

ইসলাম শব্দটি সেমেটিক মূল (Root) SLM (এসএলএম) থেকে আগত অর্থ পরিপূর্ণতা বা নির্বিঘ্নতা। আরবে গৃহীত হয় মোহাম্মদের জন্মের কিছু পূর্বে, তার পর নির্দিষ্টভাবে এর অর্থ করা হয় আত্মসমর্পণ, আত্মত্যাগ, গ্রহণ বা সমর্পণ, নিবেদন ইত্যাদি। ধর্মীয় মতে টেকনিক্যাল টার্ম হিসাবে সিরিয়ান খ্রিস্টানরা এ শব্দকে ব্যবহার করত ঈশ্বরের নিকট সম্পূর্ণভাবে নিবেদন (Jeffary 1938. P. 63) এবং এটা ব্যবহার করা হতো বিশ্বাসকে বিকাশ করার জন্য। প্রফেট মোহাম্মদের এক সাহাবী আব্বাস ইবন মিরদাস একটি কবিতা রচনা করে তাতে তিনি বলেছিলেন 'ইসলাম' শব্দটি মোহাম্মদের পূর্বে প্রচলিত ছিল, তিনি শুধু এর 'মেরামত' বা সংস্কার করেছেন (Bravmann, 1972, P. 26)।

'মুসলিম' শব্দটিও একই সেমোটিক মূল থেকে উদ্ভূত। এই শব্দটিও খ্রিস্টানরা মোহাম্মদের পূর্বে ব্যবহার করেছে এবং এ শব্দ দ্বারা ঐ ব্যক্তিকে বোঝাত, যে নিজেকে ঈশ্বরের কাছে নিবেদন করেছে। আব্রাহামকে কোরানে মুসলিম বলা হয়েছে (৩ ঃ ৬০)

www.pathagar.com

এবং লুতের ঘরবাড়িকে মুসলিম ঘরবাড়ি বলা হয়েছে (৫১ ঃ ৩৬) এবং ইহুদি ও খ্রিস্টান যারা ইসলাম আগমনের পূর্বে মুসলিম ছিল (২৪ ঃ ৫৩) এবং যিশুর শিষ্যদের মুসলিম বলে ডাকা হতো (৩ ঃ ৪৫)।

প্রথমে মোহাম্মদ ব্যাপকভাবে মুসলিম শব্দ ব্যবহার করেছেন অব্রাহাম থেকে যিশু পর্যন্ত সকল নবীদের অনুসারীদেরকে। এ সমস্ত লোকদের মুসলিম বলা হয়েছে যারা ঈশ্বরের প্রতি নিবেদিত এবং যারা সত্য ধর্ম ইসলামকে অনুসরণ করেছে (৩ ঃ ৭৮)। পরবর্তীকালে মুসলিম শব্দের অর্থকে সঙ্কীর্ণ করে শুধু মোহাম্মদ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ধর্ম ও তাঁর অনুসারীদের চিহ্নিত করা হয়েছে।

কোরান শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে কেরানা (Kerana) শব্দ থেকে যে শব্দটা সিরিয়ান খ্রিস্টানরা চার্চ সার্ভিসে বাইবেল টেক্সট থেকে পাঠ করার সময় ব্যবহার করত।

কোরানের চ্যাপ্টারকে যে 'সূরা' বলা হয়, এই সূরা শব্দটি এসেছে সিরিয়ান খ্রিস্টান শব্দ সুরতা (Surta) থেকে। 'সুরতা' বলা হতো খ্রিস্টান স্ক্রিপচারের (পুস্তক) অংশবিশেষকে (Portion of scripture)। কোরানের 'আয়া' বা চিহ্ন তেমনি এসেছে সিরিয়ান খ্রিস্টান ব্যবহার থেকে।

কোরানে ব্যবহৃত 'ফুরকান' শব্দটির অর্থ রিভিলেশন (ওহি), প্রাক-ইসলামী ও ইসলামী উভয়ই এবং স্যালভেশন অর্থাৎ 'মুক্তি' অর্থে। কোরানের ২৫ নং সূরার টাইটেলও ফুরকান এবং এই শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে সত্য ও ভুলের (Truth and error) মধ্যে পার্থক্যকে তুলে ধরতে। ফুরকান শব্দটি টানা হয়েছে আরামাইক খ্রিস্টান শব্দ পোরকান (Porkan) থেকে, যার অর্থও মুক্তি-স্যালভেশন (Dawood, 1990, P. 358)।

চার্চের যে পবিত্র সার্ভিস তাকে সিরিয়াক ভাষায় সালাত (Salat) বলা হয় এবং এই খ্রিস্টান ব্যবহারিক শব্দ মুসলিমদের প্রার্থনার অঙ্গকে চিহ্নিত করেছে এবং গৃহীত হয়েছে। 'সাজদা' শব্দটি মুসলিম প্রার্থনার সম্পূর্ণ প্রণিপাতকে বোঝায় (Deep prostration)। এটাও সিরিয়ান খ্রিস্টান থেকে ধার করা শব্দ। 'জিকির' শব্দটির দ্বারা বারবার ঈশ্বরের নাম স্মরণ করার পদ্ধতিকে বোঝায়; এই জিকির শব্দ সিরিয়ান খ্রিস্টান শব্দ জুরকরানা (Zurkrana) থেকে আগত, যার অর্থ একই অর্থাৎ প্রসট্রেশন, প্রণিপাত।

ধর্মকে 'দীন' বলা হয়, মার্টারকে 'শহীদ' বলা হয়। এগুলো ছাড়া আরো কতিপয় শব্দের উৎস সিরিয়ান খ্রিস্টান শব্দাবলির মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়। বাধ্যতামূলক দানের জন্য যে কর তাকে 'জাকাত' বলা হয়েছে এবং মিসকিনদের ভিক্ষা দেয়াকে 'সাদাকা' বলা হয়েছে-- এই উভয় শব্দই খ্রিস্টান ও ইহুদি প্রথা থেকে নেয়া হয়েছে।

সাধারণ সেমেটিক পটভূমিতে সিরিয়াক ও আরবি ভাষার অনেক সাধারণ মূল (common roots) ভুক্ত, যা সিরিয়ান খ্রিস্টান ও মুসলিম ধর্মীয় পরিভাষায় ব্যবহৃত। কিন্তু, আসলে ঋণ করা শব্দগুলো (borrowed words) আরবি ভাষায় ছিল না এবং ধর্মীয় ধারণা ও আনুষ্ঠানিক প্রথা যা ইহুদি ও খ্রিস্টানরা অনুসরণ করত তা মোহাম্মদের মিশনের দুই শতাব্দি পূর্বে প্রচলিত। এতে নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে ইসলাম ধর্মে ব্যবহৃত উপরোক্ত শব্দগুলো খ্রিস্টানদের প্রচলিত রীতি থেকে অপরিবর্তিত রূপে গ্রহণ করা হয়েছে।

www.pathagar.com

১০.৬ রহ্মান

'রহ্মান' শব্দটির অর্থ দয়ালু। প্রাচীন প্যাগন স্মৃতিফলকে দক্ষিণ আরবে, স্বর্গীয় দেবতাকে নির্দেশ করে এই অভিধা ব্যবহার করা হয়েছে। ইসলাম আগমনের পূর্বে 'রহমান' নাম দক্ষিণ আরবের খ্রিস্টানরা ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেছে। এই নামের উল্লেখ দেখা যায় প্রাথমিক খ্রিস্টান কবিদের কবিতায় এবং বলা হয় যে, খ্রিস্টান প্রফেটরা, যেমন ইয়ামামার মুসাইলিমা ও আইহালা ইবন কাব, নিজেদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন।

রহ্মান শব্দের সাথে সম্পৃক্ত 'রহিম' শব্দটির একই উৎস। 'রহিম' শব্দের অর্থ করুণাময় (Compassionate)। 'রহিম' শব্দ স্ত্রীলিঙ্গে ব্যবহৃত, এর অর্থ লালন করা ও রক্ষা করা এবং বিশেষ্যরূপে এর অর্থ জঠর, জরায়ু– 'womb' (Ruthven, 1984, P. 115) খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতাব্দি থেকে সিরিয়া মরুভূমির আরবগণ 'রহিম' শব্দ দিয়ে ঈশ্বরের আহ্বান জানাত।

'রহমান' ও 'রহিম' উভয় অভিধা নাবাতিয়ানদের কাছে সুপরিচিত এবং উভয় শব্দ বিখ্যাত মুসলিম ফরমুলা 'তাসমিয়া'তে উল্লেখিত। তায়েফের ওমাইয়া তাসমিয়ার শিক্ষা দেন এবং প্রফেট মোহাম্মদ তা গ্রহণ করেন।

স্বর্গীয় গুণাবলির মধ্যে প্রফেট মোহাম্মদ সর্বপ্রথম স্বীকৃতি দিয়েছেন দয়া ও করুণার ওপর। মুসলিমরা আল্লাহর যে মহান নিরানব্বইটি নাম দিয়েছে তার মধ্যে রহ্মান ও রহিম বিশেষভাবে সম্মানিত। প্রফেট মোহাম্মদ দয়াকে খ্রিস্টানদের চারিত্রিক সদ্‌গুণ মনে করেন। কোরান বলেছে যে, আল্লাহ যিশুকে পাঠিয়েছেন মানবজাতির দয়ার চিহ্নরূপে (১৯ ঃ ২১) এবং তাদের অন্তঃকরণে দয়া আরোপ করেছেন যারা যিশুকে অনুসরণ করে (৫৭ ঃ ২৭)।

'আল্লাহ'-র সাথে প্যাগন আরবদের পূর্ব পরিচিতি সম্বন্ধে মোহাম্মদ সচেতন ছিলেন এবং মক্কাতে থাকার সময় তিনি আল্লাহ'র সাথে 'রহমান' শব্দটি প্রচলিত করার জন্য বারবার প্রচেষ্টা চালিয়েও ব্যর্থ হন। তিনি চেয়েছিলেন উভয় শব্দকে ঈশ্বরের অভিধারূপে ব্যবহার করতে (২০ : ৪)। 'রহমান' আল্লাহ্‌র গুণবাচক বিশেষণ যা কোরানে ঘন ঘন ব্যবহৃত হয়েছে 'আল্লাহ' নামের পরিবর্তে স্থায়ী (Substantive) নাম হিসাবে। স্বর্গীয় সিংহাসনে 'রহমান' রাজকীয়ভাবে সমাসীন এবং 'রহমান'-এর সম্মুখেই আমাদের প্রণিপাত অপরিহার্য। কোরানে সূরা ৫৫-এর 'টাইটেল' এবং প্রথম দিকের সূরার মধ্যে একটি।

মক্কার অধিবাসীদের কাছে 'রহমান' নাম অপরিচিত ছিল, কেননা কাবাঘরে বা অন্য কোথাও 'রহমান' নামে কোনো দেবতার মূর্তি ছিল না, তাই প্রথমে এ নাম তারা পছন্দ করেনি। (২৫ ঃ ৬১)। এই কারণে হোদায়বিয়ার সন্ধির খসড়া প্রস্তুত করার সময় মক্কীরা এ নাম মুছে দেয়ার দাবি জানায়।

কোরানের একটি সূরাতে বলা হয়, 'আল্লাহ নামে ডাক আর রহমান নামেই ডাক, যে নামেই আহ্বান করো না কেন, তার নাম অতি সুন্দর নাম' (১৭ ঃ ১১০)। পরে আল্লাহ এবং রহমান দু'টি আলাদা ঈশ্বর হাতে পারে এই সন্দেহে প্রফেট মোহাম্মদ 'রহমান' নাম ব্যবহার পরিহার করেছিলেন।

www.pathagar.com

১০.৭ গসপেল

কোরানে একবচনে 'গসপেল' বলা হয়েছে, গসপেলকে 'ইঞ্জিল' বলা হয়। এই ইঞ্জিল শব্দ আসছে গ্রিক শব্দ ইভানজেল থেকে যার অর্থ সুসমাচার, good news।

কোরানে গসপেলকে স্বর্গীয় কিতাব বলে গণ্য করা হয় যা ঈসা নবীকে দেয়া হয়েছিল (৫৭ ঃ ২৭)। গসপেল শব্দ কোরানে বারো বার উল্লেখ করা হয়েছে কিন্তু এর উল্লেখ অন্য ভাবেও করা হয়েছে। গসপেলকে হাদিসের সমতুল্য বলা হয়– অর্থাৎ বুশরা, সুসমাচার। কোরান অনুযায়ী গসপেল আল্লাহ দ্বারা অনুপ্রাণিত (inspired) এবং যারা একে গ্রহণ করে তাদের আহলে কিতাব people of the book বলা হয়। কোরান গসপেলকে কনফার্ম করে মানবজাতির পথপ্রদর্শকরূপে– as a guide of mankind (৩ ঃ ২)। গসপেলে সত্য ধারণ করা হয়েছে (৯ ঃ ১১২) এবং আলো ও নির্দেশ প্রদানকারী কিতাব (৫ ঃ ৫০)। যদি লোকেরা গসপেলের নীতি অনুসরণ করে তারা ওপর ও নিচ থেকে প্রাচুর্যপ্রাপ্ত হবে (৫ ঃ ৭০) অর্থাৎ স্বর্গমর্ত থেকে প্রভূত সম্পদ লাভ করবে।

প্রফেট মোহাম্মদ কোনো সময়ে গসপেলের প্রামাণ্যতা ও সত্যতা সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ প্রকাশ করেননি, এও কখনো বলেননি যে, খ্রিস্টান গসপেল বাতিল হয়ে গেছে। তিনি কখনো গসপেলের বাণীকে বিকৃত মনে করেননি, শুধু বলেছেন ভুল ব্যাখ্যা করেছে অথবা ভুলে গেছে (৫ ঃ ১৭)। সংশোধন (তাবদিল) বা বিকৃত (তাহরিফ) যে চার্জ করা হয়েছে খ্রিস্টান কিতাবের বাক্য বা অর্থের, সেটা করেছেন মুসলিম ধর্মীয় মোল্লারা।

১০.৮ ত্রিত্ববাদ

ঈশ্বরের একত্বে বিশ্বাস রাখার জন্য ইসলামে ত্রিত্ববাদের ধারণাকে অস্বীকার করা হয়। কোরান বলে : 'তারা নিশ্চয়ই বিধর্মী যারা বলে ঈশ্বর তিনের মধ্যে তৃতীয়' (৫ ঃ ৭৭) মোহাম্মদ মনে হয় খ্রিস্টানদের ত্রিত্ববাদকে তিন দেবতায় বিশ্বাস (Tritheisn)-এর সাথে গুলিয়ে ফেলেছেন। 'এক আল্লাহতে বিশ্বাস করো এবং বলো না তিনজন ঈশ্বর আছেন' (৪ ঃ ১৬৯)।

আবার মোহাম্মদ ভুলবশত বুঝেছেন যে ত্রিত্ববাদ ঈশ্বর, মেরি ও যিশুকে নিয়ে গঠিত। শেষ দিবসে আল্লাহ যিশুকে জিজ্ঞাসা করবেন তিনি লোকদের বলেছেন কিনা– 'আল্লাহ ছাড়া, আমাকে ও আমার মাতাকে আরো দুটি আল্লাহ বলে গ্রহণ করো' এবং যিশু জবাবে বলবেন, 'সব প্রশংসা তোমার। যা বলার অধিকার আমার নেই তা বলা আমার পক্ষে শোভন নয়। যদি আমি তা বলতাম তবে তুমি তা জানতে পারতে; আমার অন্তরের কথা তো তুমি অবগত আছ' (৫ ঃ ১১৬)।

ঈশ্বর, যিশু ও মেরি সমন্বয়ে ত্রিত্ববাদকে ইসলাম অস্বীকার করেছে বটে, কিন্তু এই আল্লাহর তিন অংশের ধারণাকে মুসলিম বিশ্বাসে ভ্রমক্রমে দাগ কেটে গেছে।

খ্রিস্টানদের 'নোমাইন ফর্মুলা'-তে বলা হয় "পিতার নামে, পুত্রের নামে এবং পবিত্র আত্মার নামে। এই সূত্রের প্রতিফলন দেখা যায় বিখ্যাত ইসলামী ফর্মুলা 'তাসমিয়া'-তে, যেখানে পড়া হয়– 'আল্লাহর নামে (বিসমিল্লাহ) আর রহমান

www.pathagar.com

(দয়াময়) ও রহিম (দয়ালু)-এর নামে। আল্লাহ্ হচ্ছে গড, ঈশ্বর, রহমান দয়াময়, পুত্র এবং রহিম, তার নারীসত্তাকে ধরে 'পবিত্র আত্মাকে' বা মুসলিমদের অস্বচ্ছ ধারণাতে মেরি (মরিয়ম)। সত্যি হিজরির তৃতীয় শতাব্দি থেকে খ্রিস্টানরা মুসলিম ও খ্রিস্টান ফর্মুলার কোনো পার্থক্য না দেখে, তারা প্রায়ই খ্রিস্টান ফর্মুলা পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার পরিবর্তে বিসমিল্লাহ্ ফর্মুলা ব্যবহার করত (Abbott 1939 P. 21)।

১০.৯ পবিত্র আত্মা

কোরান বলে যে পবিত্র আত্মা (রহুল কুদ্দুস) সম্বন্ধে অতি অল্প সমাচার মোহাম্মদের কাছে পাঠানো হয়েছিল (১৭ ঃ ৮৭)। পবিত্র আত্মা, যা ঈশ্বর থেকে আগত, যিশুকে দৃঢ় করেছে (২ ঃ ৮১) এবং কোরানকে অনুপ্রাণিত (Inspired) করেছে (১৬ ঃ ১০৪)।

মোহাম্মদ মনে করেছিলেন খ্রিস্টান থিওরি, ত্রিত্ববাদে মেরিকে চিহ্নিত করে, এ ধারণা তখনকার অসমর্থিত ট্র্যাডিশন থেকে তিনি পেয়ে থাকবেন।

খ্রিস্টান প্রতীকীতে ঘুঘুপাখি পবিত্র আত্মা, প্যাগনদের সময়ে মহান দেবীর পাখি বলে বিশ্বাস করা হতো। 'আত্মা' শব্দকে হিব্রুতে 'রুয়াহ' (ruah) স্ত্রীলিঙ্গ এবং পবিত্র আত্মাকে অনেক সময় 'সেকিনা'-র সাথে তুলনা করা হতো, অজ্ঞেয়বাদীদের সোফিয়ার মতো (Walker 1989, P. 41)। সোফিয়াকে ঈশ্বরত্বের স্ত্রী অংশ বলে বিবেচনা করা হতো। হিব্রুদের অসমর্থিত গসপেলে যিশু বলেন– 'আমার মাতা পবিত্র আত্মা।'

১০.১০ মেরি

কুমারী মেরি (মরিয়ম)-কে প্রফেট মোহাম্মদ একজন পরিপূর্ণ (Perfect) রমণী বলে শ্রদ্ধা করতেন এবং মুসলিম সাধু ও রহস্যবাদীরা সেইভাবে মেরিকে শ্রদ্ধা করেছেন। একজন মরোক্কান মুসলিম আবদেল জলিল, যিনি পরে ফ্র্যান্সিসকান যাজক হয়েছিলেন তিনি কোরানে প্রদত্ত মেরির বিশেষ মর্যাদা সম্বন্ধে বিস্তৃত বর্ণনা দেন (১৯৫০)।

মোহাম্মদ মেরির পবিত্র গর্ভধারণ সম্বন্ধে বিশ্বাস করতেন তার অর্থ তিনি পাপ ছাড়াই গর্ভধারণ করেন (Gibb 1969, P. 31) এবং তিনি যে, পাপমুক্ত ছিলেন তা-ও বিশ্বাস করতেন (৩ ঃ ৩৭)। হাদিসে মোহাম্মদ বলেছেন যে প্রত্যক নবজন্ম পাওয়া শিশুকে শয়তান স্পর্শ করেছে, শুধু মেরি ও তার পুত্র ছাড়া (৩ ঃ ৩১)। বিশ্বের নারীদের মধ্যে তিনি নির্বাচিত শ্রেষ্ঠ রমণী এবং ঈশ্বর দ্বারা পবিত্রকৃত (৩ ঃ ৩৭), পবিত্রতায় রক্ষিত (৬৬ ঃ ১২) এবং সমস্ত প্রাণীজগতের চিহ্নস্বরূপ (২১ ঃ ৯১)।

কোরানে বলা হয়েছে দেবদূত (ফেরেশতা) এসে তাকে সুসংবাদ দিল– 'মেরি, নিশ্চয়ই ঈশ্বর তাঁর কাছ থেকে সুসংবাদ পাঠিয়েছেন, তোমার অন্তরে যে আছে, তার নাম হবে মেসিয়া যিশু।' (৩ ঃ ৪০)। ঈশ্বর তার জঠরে আত্মা ফুঁকে দিলেন, সুতরাং যিশুর জন্ম ঈশ্বরের সৃষ্টিকর্ম একজন নিষ্কলুষ কুমারী উদরে (১৯ ঃ ২০), যে তার কুমারিত্ব বজায় রেখেছিল এবং পবিত্রতার সাথে স্বর্গীয় আত্মা ধারণ করেছে।

www.pathagar.com

১০.১১ যিশু

প্রফেট মোহাম্মদ একবার বলেছিলেন যে, তার মতো যিশুকে (ঈসা) কেউ ভালবাসতে পারে না (Esin 1963, P. 109)। কোরানে অন্য কোনো প্রফেটকে যিশুর মতো উচ্চ মর্যাদায় ভূষিত করা হয়নি, মানুষ হিসাবে একমাত্র তিনিই স্বর্গীয় সান্নিধ্যের কাছাকাছি অবস্থান করেন।

যিশু স্বর্গীয় শক্তির এক দৃষ্টান্ত। তার কোনো পিতা নেই, কুমারী মেরির গর্ভে ঈশ্বরের আত্মা প্রবিষ্ট হয়ে ভ্রূণের সঞ্চার হয় (৬৬ ঃ ১২)। পবিত্র আত্মা তাকে দৃঢ় করেছে (২ ঃ ২৫৪), যে আত্মা ঈশ্বর প্রদত্ত (৪ ঃ ১৬৯) এবং পাপহীন।

যিশু হচ্ছেন একজন মেসিসা (মসিহ্) (৩ ঃ ৪০); শব্দটি সিরিয়াক, যাকে ঈশ্বর আশীর্বাদ করেছেন (১৯ ঃ ৩২)। তিনি সত্যের বাক্য (কাউল আল-হক) (১৯ ঃ ৩৫); আল্লাহর বাণী (কলিমুল্লাহ) ৩ ঃ ৪০ লোগোস-তত্ত্বের প্রতিবিম্ব এবং ঈশ্বর থেকে আগত আত্মা (রুহুল্লাহ) ৪ ঃ ১৬৯।

যিশু আল্লাহর সংবাদবাহক (রসূলুল্লাহ) ৪ ঃ ১৬৯; আল্লাহর নৈকট্য লাভ করেছেন এবং ইহলোক ও পরলোকে মহিমান্বিত (৩ ঃ ৪০); তিনি মানুষের কাছে চিহ্ন রূপে (আয়া, 'অলৌকিক') নিয়োগপ্রাপ্ত এবং আল্লাহর দয়াপ্রাপ্ত (১৯ ঃ ২১)। মৃত্যুর পূর্বে, কোরান বলে, আহলে কিতাবের সমস্ত মানুষ (ইহুদি, খ্রিস্টান ও মুসলিম) তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করবে (৪ ঃ ১৫৭)।

১০.১২ ঈশ্বরের পুত্র

বহুঈশ্বরবাদের ঘোর বিরোধী এবং ইহুদিদের নৈতিক সমর্থন পেয়ে, প্রফেট মোহাম্মদ যিশুর ত্রিত্ববাদ অংশে ও অবতারবাদে অস্বীকার করেন। যিশু ঈশ্বরের পুত্র নন, কারণ ঈশ্বর জন্মদাতা নন। (১১২ ঃ ৩)। ঈশ্বর এক এবং তাঁর কোনো অংশীদার নেই। 'ঈশ্বরের পুত্র থাকবে, তাঁর জন্য এটা সমীচীন নয় (১৯ ঃ ৩৬)। ঈশ্বরের পুত্র থাকা তাঁর গৌরবের পরিপন্থী (৪ ঃ ১৬৯)।

ইবন ইসহাক এক ঘটনায় বলেছেন যে, মোহাম্মদ দুই জন খ্রিস্টান সাধুকে বকাবকি করেন এই কারণে যে, তারা ঈশ্বরের পুত্র তত্ত্বে বিশ্বাস করে। যেহেতু কোরানেই বলা হয়েছে যে, যিশু একজন নিষ্কলুষ কুমারীর সন্তান; তারা তখন জিজ্ঞাসা করে 'তাহলে যিশুর পিতা কে হে মোহাম্মদ?' প্রফেট, কথিত আছে, এই প্রশ্নের কোনো জবাব না দিয়ে নিশ্চুপ থাকেন (Guillaume, 1955, P. 272)। ঈশ্বর কতকগুলো আয়াত পাঠিয়েছিলেন যা এখন একটি লম্বা সূরার অংশ, কিন্তু এগুলো যে স্বর্গ থেকে আগত সে সমস্যার কোনো আলোকপাত করা হয়নি, কেবলমাত্র বলা হয়েছে, ঈশ্বর ইচ্ছা করলেই যা কিছু তৈরি করতে পারেন। যখন তিনি কোনো কিছু সৃষ্টি করার ইচ্ছা করেন, শুধু বলেন 'হও' (কুন) আরও ওমনিই হয়ে যায় (৩ ঃ ৪২)। এসব জিনিস, যেমন কোরানে অন্য স্থানে বলা হয়েছে, 'ঈশ্বরের জন্য খুবই সহজ' (১৯ ঃ ২১)।

যিশুকে ঈশ্বরের পুত্ররূপে বিশ্বাস করতে মোহাম্মদের আপত্তি এই কারণে যে, এই বিশ্বাস আরবে আবার বহুঈশ্বরবাদের দ্বার খুলে দিতে পারে। এই ব্যাপারে তিনি একবার অসুবিধায় পড়েছিলেন, যখন তিনি মক্কাতে প্যাগনদের সাথে একটা সমঝোতা

www.pathagar.com

করার জন্য আল্লাহর তিন কন্যার (আল-লাত, মানাত ও উজ্জা) একটা সিদ্ধান্ত নিতে চেষ্টা করেন।

কয়েকজন পণ্ডিতের মতে, কতকগুলি বিতর্কমূলক (Polemical) আয়াত কোরানে সন্নিবেশ করা হয়েছিল; খ্রিস্টানগণ তার দাবি অস্বীকার করলে তাদের সাথে প্রফেটের বিরোধ বাড়তে শুরু করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় সূরা ১৯-এর কতগুলো আয়াত।

কোরান আল্লাহর কাছ থেকে অভিসম্পাত এনেছে তাদের ওপর যারা যিশুকে ঈশ্বরপুত্র বলে (৯ ঃ ৩০)। আর একটি প্যাসেজে আছে 'যারা বলে যে দয়ালু ঈশ্বর একটি পুত্রের জন্ম দিয়েছেন এক বীভৎস নীতি (ডকট্রিন) প্রচার করতে, যাতে আকাশমণ্ডলী বিদীর্ণ হবে, পৃথিবী খণ্ড-বিখণ্ড হবে ও পর্বতমণ্ডলী চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে আপতিত হবে' (১৯ ঃ ৯১)।

অন্য দিকে মোহাম্মদকে দ্ব্যর্থহীনভাবে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল– "বলো, যদি দয়াময় ঈশ্বরের এক পুত্র থাকে, আমিই প্রথম তাকে পূজা করব (৪৩ ঃ ৮১); এতে মনে হয় যে, আয়াতে যে কথা বলে দেয়া হয়েছে, তাতে ঐ ধারণা অচিন্ত্যনীয় ছিল না।

১০.১৩ যিশুর অলৌকিক কাণ্ড (মোজেজা)

কোরানে যিশুর এমন কতকগুলো মোজেজার কথা বলা হয়েছে যা গসপেলে ধারণ করা হয়নি। তিনি শিশু অবস্থা দোলনার কথা বলেছেন (৩ ঃ ৪১)। শিশু অবস্থায় তিনি তার মায়ের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ খণ্ডন করেন (১৯ ঃ ২৮-৩১)। তিনি কাদা দিয়ে পাখি তৈরি করেন এবং তাতে জীবন দেন। (৩ ঃ ৪৩)। গসপেলের কিছু মোজেজার কথাও আছে কোরানে। যেমন, তিনি অন্ধকে দৃষ্টি দান করেন, কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্ত লোকদের নিরাময় করেন এবং মৃত ব্যক্তিকে জীবন্ত করেন (৫ ঃ ১১০)।

যিশু আরও একটি মোজেজা দেখান যখন তার শিষ্যদের খাওয়ানোর জন্য খাঞ্জাভরা খাদ্যদ্রব্য স্বর্গ থেকে আনয়ন করেন। ঈশ্বর সেই খাদ্যদ্রব্য পাঠিয়ে শিষ্যদের পুষ্ট করেন, কারণ 'তিনি মহান জীবিকাদাতা' (৫ ঃ ১১২-১১৫) সূরা 'মায়দা-তে এই প্যাসেজ আছে'। 'মায়দা' অর্থ 'খান্না' (খাঞ্জা)–এই 'মায়দা' শব্দটি আবিসিনিয়ান খ্রিস্টানরা 'ঈশ্বরের খাঞ্জা' টেকনিক্যাল টার্ম অর্থে ব্যবহার করেছে (Parrinder 1979, P. 88)। এই প্যাসেজটি স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে বিজন প্রদেশে (wilderness) ইসরাইল সন্তানদের কাছে ঈশ্বর প্রেরিত 'মান্না' পাঠানোর ঘটনাকে (যাত্রাপুস্তক ১৬ ঃ ১৫) ও প্রভুর রাতের খাবার (Lord's Supper) মথি, ২৬ ঃ ২০। এই খাদ্য দিয়ে যিশু বহু মানুষকে খাইয়েছিলেন (মথি ১৪ ঃ ২০) এবং সাধু পিটারের ভার্সান যেখানে বলা হয়েছে স্বর্গ থেকে নেমে এলো বৃহৎ খাঞ্জা ভর্তি খাদ্যদ্রব্য (Acts, 10 : 11)।

১০.১৪ মৃত্যু ও পুনরুত্থান

মসিহ্ যিশু যে ক্রুশে মৃত্যুবরণ করেন কোরান তা অস্বীকার করে। যিশুকে ক্রুসিফাই করা হয়নি, কিন্তু তার আদলে অন্য একজন হীন ব্যক্তিকে ধরে ক্রুসে চড়ানো হয়। এই ক্রুসিফিকেশনের সময় ঈশ্বর তাকে (যিশু) আকাশে তুলে নেন (৪ ঃ ১৫৬)। একটি মুসলিম ট্র্যাডিশনে বলা হয়েছে, যিশুর স্থলে যাকে ক্রুশে চড়ানো হয় তার নাম জুদাস।

www.pathagar.com

আলা ওয়াকিদির মতে মোহাম্মদ ক্রুশকে (সালিব) ঘৃণা করতেন এবং ক্রুশের মতো দেখতে তার ঘরের সব বস্তুকে ভেঙে দেন। আবু হোরায়রার বর্ণনায় : মোহাম্মদ বলেছেন যখন যিশু স্বর্গ থেকে নেমে আসবেন, তিনি সব ক্রুশ ভেঙে ফেলবেন ও শূকর নিধন করবেন।

যদিও কোরান ক্রুসিফিকেশন অস্বীকার করে কিন্তু যিশুর মৃত্যুর পুনরুত্থান ও স্বর্গারোহণ গ্রহণ করেছে। শিশুকালে দোলনায় থাকা অবস্থায় যিশু বলেছেন 'আমি যেদিন জন্মগ্রহণ করি, ঈশ্বরের শান্তি আমার ওপর বর্ষিত হয়েছে এবং যেদিন মরব সেদিনও হবে, আবার যখন পুনর্জীবন লাভ করব তখনও হবে' (১৯ ঃ ৩৪)।

কোরানে ঈশ্বর যিশুকে বলেন– 'নিশ্চয়ই আমি তোমার মৃত্যু ঘটাব এবং আমার সম্মুখে জীবিত করব (৩ ঃ ৪৮), যদিও যিশুর মৃত্যুর সঠিক সময় ও স্থান এবং সমাধি সম্বন্ধে কিছু বলা হয়নি। কোরানের অন্যস্থানে বলা হয়েছে– ঈশ্বর যিশু ও মেরির জন্য একটি নির্জন মনোরম স্থানে ও ঝর্ণাধারার কাছে বাসস্থান তৈরি করেছেন (২৩ ঃ ৫২)। মুসলিম ধর্মবিদরা এই সব আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, যিশু ও মেরি উভয়কেই ঈশ্বর শারীরিকভাবে স্বর্গে তুলে নিয়েছেন।

১০.১৫ প্যারাক্লিট

সুসমাচার অনুযায়ী, যিশু তার শিষ্যদের বলেছেন যে, তার মৃত্যুর পর ঈশ্বর তোমাদের কাছে চিরকাল থাকবার জন্য আর একজন সাহায্যকারী পাঠাবেন (জন. ১৪ ঃ ১৬)। 'সাহায্যকারী' (comforter)কে গ্রিক ভাষায় প্যারাক্লিটস (Parakletos), সম্ভবত পেরিক্লিটস (Periklytos) শব্দ থেকে আগত, যার অর্থ 'বিখ্যাত' (Renowned)। এই শব্দটিকে আরবিতে 'আহমদ' বলা হয়েছে– অর্থাৎ প্রশংসিত।

যেহেতু 'আহমদ' ও মোহাম্মদ' নাম একই মূল (roots) থেকে উদ্ভূত, মোহাম্মদ দাবি করেন তিনিই প্যারাক্লিট। উপরোক্ত গসপেলের প্যাসেজকে কোরানে এই ভাবে রূপান্তরিত করা হয়েছে : "স্মরণ করো, যখন যিশু বলেছেন– নিশ্চয়ই আমি ঈশ্বরের সংবাদবাহক, তোমাদেরকে এই প্রফেট সম্পর্কে সুসংবাদ দিচ্ছি যে, তিনি আসবেন আমার পরে যার নাম হবে আহম্মদ" (৬১ ঃ ৬)।

উল্লেখযোগ্য যে মানি অথবা মানেস (মৃত. ২৭৬ খ্রিঃ) পারস্যবাসী ছিলেন। তিনি এক প্রভাবশালী সেমি-খ্রিস্টান গোষ্ঠী (Sect) প্রতিষ্ঠা করেন যা মোহাম্মদের জন্মের পূর্বে আরবে সক্রিয় ছিল। তিনিও ঘোষণা করেন যে, তিনিই প্রফেটদের মধ্যে শেষ ও শ্রেষ্ঠ এবং প্যারাক্লিট। তার নামের ওপর ভিত্তি করে তিনি দাবি করেন যে তিনি মানবজাতিকে আশ্রয় দেওয়ার জন্য এসেছেন (হিব্রু ম্যানস) (সংগীতাবলী ঃ ৫৯ ঃ ১৬) এবং জেসাস যেমন জীবনের রুটি (জন. ৩ - ৩৫) তেমনি মানি, সেই প্রতিশ্রুত প্রফেট যিনি স্বর্গ থেকে মানবজাতির জন্য খাঞ্জাভরে খাদ্যদ্রব্য (মান্না) এনেছেন লোকজনকে পুষ্ট করতে।

খ্রিস্টানরা মোহাম্মদের প্যারাক্লিটের দাবি বাতিল করেছে এই বলে যে, বাইবেলের ভাষ্যকে বিকৃত করা হয়েছে। বাইবেলের ঐ চ্যাপ্টারে, (জন. ১৪ ঃ ২৬) যিশু স্পষ্ট করে বলেছেন যে সাহায্যকারী (Comporter) হচ্ছেন পবিত্র আত্মা।

www.pathagar.com

মোহাম্মদ কখনও পবিত্র আত্মা বলে নিজেকে দাবি করেননি, সুতরাং তিনি প্যারাক্লিট হতে পারেন না। আবার কোরানে যিশুকে মেসিয়া বলা হয়েছে (৪ ঃ ১৬৯) এবং কোনো প্রফেট মেসিয়াকে অনুসরণ করতে পারে না। সর্বশেষে খ্রিস্টানদের মতে, কম্ফর্টার (সাহায্যকারী) যিশুর ঊর্ধ্বগমনের দশদিন পরে পেন্টিকোস্ট দিবসে (ইহুদিদের পর্ব দিন) নেমে আসবেন; তারা বিশ্বাস করেন না যে প্যারাক্লিট যিশুর ঊর্ধ্বগমনের পর ছয় শতাব্দি অপেক্ষা করে মোহাম্মদের রূপে বা আকারে আবির্ভূত হবেন।

মোহাম্মদের পক্ষে সংশ্লিষ্ট প্যারাক্লিটের দাবিতে এবং তার আবির্ভাবের ভবিষ্যৎ বাণী বার্নাবাসের গসপেলে দেখা যায়। বার্নাবাসের গসপেল একটি অসমর্থিত গ্রন্থ (apocryphal work) যা মোহাম্মদের মৃত্যুর শতাব্দির পর একজন ইহুদি বা খ্রিস্টান ধর্মান্তরিত মুসলিম দ্বারা লিখিত। তার সুডো-গসপেলে (মিথ্যা-সুসমাচার), বলা হয়েছে যে জুদাসকে যিশুর বদলে ক্রুসিফাই করা হয়, যা মুসলিমরা বিশ্বাস করে। উক্ত পুস্তকে, যিশু অস্বীকার করেন এই বলে যে তিনি মেসিয়া নন, যেখানে কোরান একাধিকবার এ কথার স্বীকৃতি দিচ্ছে। পরিবর্তে, এই পুস্তকে মোহাম্মদকে মেসিয়া বলা হয়েছে– যে অভিধা মোহাম্মদ নিজে কোনো দিনই দাবি করেননি।

কট্টরবাদী মুসলিম পণ্ডিতরা ওল্ড ও নিউ টেস্টামেন্টের যে কোনো আয়াতকে দ্রুতভাবে পাশ কাটিয়ে গেছে যা মোহাম্মদকে পরোক্ষ ইঙ্গিত করেছে (allude)। Deut. 18 : 18তে যেমন আছে, সেই সূত্র ধরে আরাবিয়ান প্রফেটের দাবি উঠানো হয়েছে। যেখানে বিষয় উপযুক্ত মনে হয়েছে, হিব্রু শব্দ 'মাহম্মাদ' (mahmad)-এর অর্থ 'ভালো', 'প্রিয়' বা 'মনোহর', যে শব্দ ডজনের বেশি ওল্ড টেস্টামেন্টে উল্লিখিত হয়েছে, যেমন সলেমনের পরমগীত ৫ ঃ ১৬, সেখানেই মোহাম্মদের নাম টেনে আনা হয়েছে।

একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, যুক্তিবাদী মুসলিম অথরিটি এই সমস্ত দাবি গ্রাহ্য করেন না, এমনকি বার্নাবাসের গসপেলের ভাষ্য গ্রহণযোগ্য নয়, কেননা মোহাম্মদের সংশ্লিষ্ট কোনো বিষয় অসমর্থিত তথ্যের ওপর নির্ভর করে না।

১০.১৬ দ্বিতীয় আগমন

মুসলিমদের চিন্তাধারা যিশুর আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা, যা ইসলামী ট্র্যাডিশনে বলে যে, রোজ কেয়ামতের কিছু পূর্বে যিশুর পুনরাগমন হবে। এই বিষয়ে মোহাম্মদের কিছু ধারণা স্পষ্টত খ্রিস্টান উৎস থেকে আহরিত।

গোল্ড জিহার (Goldziher) লিখেছেন যে, মোহাদ্দেস ইবন হাজার, ৬২৮ খ্রিস্টাব্দে প্রাচীন অথরিটি তামিম আল দারি শেষ বিচারের দিন সম্বন্ধে মুসলিমদের যে ধারণা দিয়েছিলেন তার সাথে একমত প্রকাশ করেছেন। তামিম আল-দারি খ্রিস্টান সাধুব্যক্তি ছিলেন এবং মোহাম্মদের সমসাময়িক। ইনি পরে ইসলাম ধর্ম গ্রহণে মোহাম্মদের সাহাবীর মর্যাদা লাভ করেন।

কোরান বলছে– যিশু শেষ দিনের প্রতীক (৪৩ ঃ ৬১); হাদিসে লিখিত আছে যে, মোহাম্মদ একদা রূপক অর্থে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'যে মানব জাতির আমি শুরু এবং

www.pathagar.com

যিশু শেষ, সে জাতি কেমন করে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে' (Me Auliffe 1991, P. 132)। খাবিতিয়া সম্প্রদায়ের (Sect) মতে, (আহমদ ইবন খাবিতের অনুসারী), যিশুর দ্বিতীয় আগমন কোরানের আয়াতেও বলা হয়েছে– 'এবং যখন তোমার প্রতিপালক উপস্থিত হইবেন ও সারিবদ্ধভাবে ফেরেশতাগণও –' (৮৯ ঃ ২৩)। যিশুই সেই ব্যক্তি যিনি মানবজাতিকে ডাক দিবেন তার পরবর্তী জীবনে হিসাবের জন্য (Kazi and Flynn, 1984, P. 53)।

দ্বিতীয় আগমনের প্রতি বিশ্বাস 'মেহেদির' ধারণা এনে দিয়েছে। মেহেদি এক শক্তিশালী ব্যক্তিরূপে আবির্ভূত হয়ে শেষ দিবসে মানবজাতিকে নেতৃত্ব দিবেন এবং একটি শান্তির রাজ্য প্রতিষ্ঠা করবেন। কেউ কেউ বিশ্বাস করেন যে, মেহেদি মোহাম্মদের বংশধর থেকে আসবে, কিন্তু বেশিরভাগ ট্র্যাডিশন অনুযায়ী তা নয়। অনেকেই মেহেদি পদবির দাবি করতে পারেন, কিন্তু তারা সকলেই প্রতারক, কারণ একথা মোহাম্মদ ঘোষণা করেছেন। 'মরিয়মের পুত্র যিশু ছাড়া অন্য কোনো মেহেদি নেই' (D, B, Mac Donald, in SEI, 1974, P. 174)।

মুসলিম ট্র্যাডিশনে এই ধারণাও আছে যে, যিশুর দ্বিতীয় আগমনের পূর্বে একজন যিশু-বিরোধী (Autichrist) শক্তির আগমন হবে দাজ্জাল বলে। দাজ্জাল শব্দটি আরামেনিয়ান। এই দাজ্জালের সাথে যিশুর ভীষণ যুদ্ধ হবে এবং শেষে যিশু জয়লাভ করবেন।

এই বিজয়ের পরে ইসলাম যিশুর হাতে চলে যাবে এবং তিনি পৃথিবীতে ৪০ বছর শান্তিতে রাজত্ব করবেন। তারপর যিশুর স্বাভাবিক মৃত্যু হবে এবং মদিনায় তাকে কবরস্থ করা হবে, যেখানে মোহাম্মদ ও আবু বকরের কবরের মাঝখানে তার স্থান সংরক্ষিত থাকবে।

তারপর অনির্দিষ্টকাল বিশ্রামের পর এক ফেরেস্তা তিনবার ড্রামের ওপর আঘাত করবে আর মানবজাতির শেষ দিন ঘোষিত হবে।

১০.১৭ অসমর্থিত গসপেল

কুমারী মেরি ও যিশুর জন্ম, জীবন ও মৃত্যু সম্বন্ধে মোহাম্মদের মতামত এই ধারণা দেয় যে, তার সময়ে মধ্যপ্রাচ্যে যেসব অসমর্থিত গসপেল এবং জনপ্রিয় খ্রিস্টান ট্র্যাডিশন বিক্ষিপ্তভাবে চালু ছিল, তাদের সাথে মোহাম্মদের পরিচয় ছিল। এই সব কাহিনীর কিছু কিছু সত্য বলে গ্রহণ করেছেন তিনি, কেননা সেই সব কাহিনী কোরানে বিধৃত হয়েছে তার ধর্মমতের সাথে খাপ খাইয়ে নিয়ে।

ঈশ্বর, মেরি ও যিশুর ত্রিত্ববাদ যা কোরানের মতে খ্রিস্টানদের গৃহীত নীতি এই মতবাদ তখনকার কিছু মতান্তরগ্রাহী (sehismatic) সম্প্রদায়– যেমন, মরিয়ামাইট্স মান্য করত। আরবে কালরিডিয়ান (Collyridians) নামে একটি সম্প্রদায় ছিল তারা ধর্মীয় অনুষ্ঠান রূপে মেরিকে কেক (cake) নৈবেদ্যরূপে প্রদান করত (Kollyra)।

মেরির জন্ম সম্বন্ধে কোরানে যে বিস্তৃত বর্ণনা রয়েছে (৩ ঃ ৩১) তা দেখতে পাওয়া যায় অসমর্থিত গসপেল 'নেটিভিটি অব মেরি'-তে। জেরুজালেমের মন্দিরে মেরি সম্বন্ধে যে কাহিনী ব্যক্ত হয়েছে, যেখানে ফেরেশতারা তার জন্য খাদ্য এনে দিত

www.pathagar.com

(৩ ঃ ৩২) সে কাহিনী পাওয়া যায় Protevangelium of James the Less এবং Coptic History of the Virgin-এ। খেজুর গাছ ও মেরির ঘটনা (১৯ ঃ ২৩) নেয়া হয়েছে History of Nativity of Mary এবং The Infancy of the Saviour থেকে। যিশু যে কাদা দিয়ে পাখি তৈরি করে প্রাণ দিলেন (৩ ঃ ৪৩) এ কাহিনী পাওয়া যায় Gospel of Thomas the Israelite-এ। যিশুকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়নি, হয়েছে তার মতো একজনকে (৪ ঃ ১৫৬)–এ কাহিনীর উৎস হচ্ছে 'Journeys of the Apostles' এবং এই মত পোষণ করত ডসেটিস্ট (Docetists) অজ্ঞেয়বাদী সম্প্রদায়। ঈশ্বর এক এবং যিশু ঈশ্বর কর্তৃক নির্বাচিত ব্যক্তি এবং তার মধ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে পবিত্র আত্মাদ্বারা পরিপূর্ণ করা হয়েছিল– এ কাহিনী পোষণ করত সামোসোটার পল (Paul of Samosata), মৃত. ২৭২, দ্বারা পরিচালিত মনকিস্ট সম্প্রদায়। পল অব সামোসাটা এন্টিয়কের বিশপ ছিলেন।

বিভিন্ন তারিখের আরো কয়েকটি অসমর্থিত গ্রন্থ নেরেটিভস, 'জার্নিস, অ্যাক্টস, ইনফ্যান্সি গসপেল ইত্যাদি অসমর্থিত গ্রন্থ (Apocrypha) সিরিয়াক, কপটিক, গ্রিস, আরাবিক ও আর্মোনিয়ান ভাষায় মধ্যপ্রাচ্যে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল এবং আগ্রহী পাঠকের জন্য এ সমস্ত কেচ্ছা কাহিনীর দ্বার উন্মুক্ত ছিল।

মদিনা কালে, মোহাম্মদ, সাতটি যুবক ও তাদের কুকুর, যারা একটি গুহায় অনেক বছর ধরে ঘুমিয়ে ছিল, সম্বন্ধে একটি ঐশীবাণী প্রাপ্ত হন। এই কাহিনী, ইফেসাসের সাতজন খ্রিস্টান যুবক ২৫০ খ্রিস্টাব্দে রোমান সম্রাট দেসিয়াস (Decius)-এর অত্যাচারের সময় সেলিয়ন পর্বতে দেয়ালঘেরা অবস্থায় বন্দি হয়; কিন্তু ২০০ বছর ঘুমিয়ে থেকে অলৌকিকভাবে বেঁচে যায়, কাহিনীর পরিবর্তিত রূপ। এই কাহিনী নেয়া হয়েছে সারুগের জ্যাকব নামে এক খ্রিস্টান লেখকের গ্রন্থ 'সিরিয়াক হোমিলিজ' থেকে। জ্যাকব ৫২০ খ্রিঃ মারা যান। গ্রেগরি অব টুরস্ (Gregory of Tours)-এও এই কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে এবং গিবন কর্তৃক রচিত Decline and Fall of the Roman Empire গ্রন্থেও উল্লেখ করা হয়েছে (১৭৭৬)।

১০.১৮ খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম

মদিনায় হিজরতের কিছু দিন পর খ্রিস্টানদের প্রতি মোহাম্মদের আচরণে পরিবর্তন দেখা দেয়। মক্কায় তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল যে তিনি তার খ্রিস্টান শিক্ষকদের নিকট থেকে কিছু ধর্মীয় নীতি (doctrine) গ্রহণ করছেন। এখন খ্রিস্টানরাই তাকে অস্বীকার করছে তাঁর শিক্ষা-নীতি ও খ্রিস্টানিটির অপব্যাখ্যার কারণে।

ইহুদিরা যেমন আব্রাহাম (পেট্রিয়ার্ক) সম্বন্ধে কোরানের কেচ্ছা কাহিনীগুলোকে অসত্য বলে মত প্রকাশ করেছিল, তেমনি খ্রিস্টানরাও যিশুর জীবনী ও তার শিক্ষা সম্বন্ধে কোরানে বর্ণিত কাহিনী সুসমাচারের বর্ণিত সত্য ঘটনার অপলাপ ও অপব্যাখ্যা বলে ঘোষণা দেয় এবং তারা মোহাম্মদকে প্রফেট বলে স্বীকৃতি দিতে কোনও ইচ্ছাও প্রকাশ করেনি।

খ্রিস্টানদের এই সমালোচনাকে সহজভাবে গ্রহণ না করে, মোহাম্মদ তাদের বিরুদ্ধে ঘুরে দাঁড়ান। খ্রিস্টানিটি প্রতিদ্বন্দ্বী ধর্ম হয়ে দাঁড়ায়। এটাও একটা রিভিল্ড

www.pathagar.com

ধর্ম-শিক্ষা ও সত্য এবং শেষ ডকট্রিন বলে দাবি করা হয়। এটা একটি আন্তর্জাতিক বিশ্বাস বা ধর্ম, মানব-জাতির কাছে অগ্নিক্ষরা মিশন নিয়ে আত্ম-প্রকাশ করেছে; সুতরাং খ্রিস্টানদের আর বন্ধু বলে বিবেচনা করা যায় না।

খ্রিস্টানদের সমালোচনার জবাবে মোহাম্মদ বলেন, তারাই যিশুর বাণীকে ভুল বুঝেছে, যেমন ইহুদিরা মুসার বাণীকে বিকৃত ও অপব্যাখ্যা করেছে। কোরান বলে যে, খ্রিস্টানদের যা শেখানো হয়েছিল তার অংশ বিশেষ তারা ভুলে গেছে (৫ ঃ ১৭)। তারা তাদের প্রফেট যিশুকে ঈশ্বরের রূপ দিয়ে ত্রিত্ববাদ সৃষ্টি করেছে।

এতদিন খ্রিস্টানদের প্রতি যে সদিচ্ছা ও বন্ধুভাব দেখানো হয়েছিল তার আমূল পরিবর্তন ঘটল, যেমন তার নিজের মিশনের গতি ঘুরে গেল। এই পরিবর্তন কোরানে প্রতিফলিত হলো : 'হে বিশ্বাসীগণ, ইহুদি ও খ্রিস্টানদের আর বন্ধু বলে গ্রহণ করো না। যদি তাদের বন্ধু বলে গ্রহণ করো, নিশ্চয়ই তুমি তাদের-ই একজন (৫ ঃ ৫৬)। আবার, তাদের বন্ধু বলে গ্রহণ করো না, যারা তোমাদের পূর্বে কিতাব পেয়েছিল অথবা যারা তোমার ধর্মকে খেলা ও মস্করা মনে করে' (৫ ঃ ৬২)।

কোরান খ্রিস্টানদের বিধর্মী (infidels) বলেছে (৫ ঃ ১৯), কারণ তারা যিশু খ্রিস্টকে ঈশ্বরপুত্র বলে পূজা করে; এই বিশ্বাসে তারা অপরাধী। 'ঈশ্বর তাদের সাথে যুদ্ধ করুন' (৯ ঃ ৩০) মোহাম্মদ শুধু ইহুদি ও খ্রিস্টানদের তিরস্কার করেননি, কিন্তু তাদের জন্য স্বর্গদ্বার বন্ধ করে নরকে স্থান দিয়েছেন (৫ ঃ ৭৬), যেখানে তারা তাদের শিষ্যগণসহ অনন্তকাল ধরে বাস করবে। (৯৮ ঃ ৫)। তাঁর এই তীব্র বিরোধিতা জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বজায় ছিল। মৃত্যুকালে তার শেষ বাণীর মধ্যে একটি বাণী ছিল 'প্রভু ইহুদি ও খ্রিস্টানদের ধ্বংস করবেন।'

যুদ্ধ করার জন্য অধিকতর শক্তিপ্রাপ্ত হয়ে মোহাম্মদ প্রকাশ্যভাবে খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে সক্রিয়ভাবে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে প্রস্তুতি গ্রহণ করেন– বিশেষভাবে আরবে তাদের উপস্থিতিকে কেন্দ্র করে অর্থাৎ তিনি সমগ্র আরব দেশ হতে খ্রিস্টানদের বিতাড়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন। এই নীতি পরিশেষে বাস্তবায়িত হলো তাঁর পরবর্তী উত্তরাধিকারী আবু বকর ও ওমরের দ্বারা।

১০.১৯ খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে অভিযান

মোহাম্মদের জীবদ্দশায় ও তাঁর মৃত্যুর পরে আধুনিক তফসিরকারদের পরস্পরবিরোধী ভার্সান পাওয়া যায় আরব খ্রিস্টান গোত্রদের ধর্মান্তরিত সম্বন্ধে। কোনো কোনো বিবরণে দেখা যায় যে কিছু গোত্র নতুন রিভিলেশনের সত্যতায় আকৃষ্ট হয়ে স্ব-ইচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করেছে; আবার অন্য বর্ণনায় দেখা যায় নতুন ধর্মের প্রতি যথেষ্ট প্রতিরোধ হয়েছিল এবং ঘুরে দাঁড়িয়েছিল এবং অনেকেই নিশ্চিহ্ন হবার ভয়ে আত্মসমর্পণ করেছে।

৬৩০ খ্রিস্টাব্দে ফেব্রুয়ারি মাসে মোহাম্মদ আমর ইবন আল-আসের অধীনে এক বাহিনী প্রেরণ করেন ওমানের খ্রিস্টান গোত্রদের বিরুদ্ধে; সেখানকার শাসকদের বলা হয় নতুন ধর্ম গ্রহণ করতে এবং নির্ধারিত কর প্রদান করতে। কিছু আলোচনার পর কতকগুলো গোত্র ধর্মান্তর গ্রহণ করে; কিন্তু মাজুনা গোত্র তাদের ধর্ম পালনে ইচ্ছা

www.pathagar.com

প্রকাশ করে, পরিবর্তে তারা মুসলিমদের অর্ধেক জমি ও সম্পদ প্রদান করতে বাধ্য হয়। এই শর্তে সন্ধি হয়।

ঐ মাসেই, ফেব্রুয়ারি ৬৩০, আরবের দক্ষিণে হিমিয়ার খ্রিস্টান রাজকুমারদের কাছে একটি ডেলিগেশন পাঠানো হয়। ডেলিগেশনের হাতে মোহাম্মদ এক পত্র দেন মুসা ও ঈসার প্রতি তাঁর বিশ্বাস কনফার্ম করে, কিন্তু যিশুর অবতারবাদ ও ত্রিত্ববাদকে অস্বীকার করে। উক্ত পত্রে বলা হয় যে, ঈশ্বর এক এবং মোহাম্মদ তাঁর প্রফেট এবং সকলকে বলা হয় এই নতুন মন্ত্র ও বিশ্বাসকে গ্রহণ করতে। যারা হিমিয়ার ভাষা ব্যবহার করে, তাদের এখন থেকে আরবি ভাষা ব্যবহার করতে হবে। তাদের ইসলামে আত্মসমর্পণ করে নির্ধারিত কর প্রদান করতে হবে। যারা এই নির্দেশ অমান্য করবে তারা মোহাম্মদের শত্রু বলে গণ্য হবে। অগত্যা, জীবনের বিনিময়ে রাজকুমারগণ নতুন ধর্ম গ্রহণ করে পত্রের জবাব দেয়।

হেজাজের আশপাশে যেসব খ্রিস্টান বাস করত তাদের একইভাবে আত্মসমর্পণ করতে বলা হয় এবং তারা প্রাণের ভয়ে তা-ই করে। ৬৩০ সালে জুলাই মাসে আলীকে পাঠানো হয় তাঈ সম্প্রদায়ের এক গোত্রের কাছে যারা তখনও ফালস্ (Fuls) দেবতার মূর্তি পূজা করত। আলী তাদের দেবতার মূর্তি ও মাজার ভেঙে গুঁড়ো করে দিল, সেখানকার লোকদের ধমক দিয়ে ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য করল। এরপর আলী তাঈ সম্প্রদায়ের খ্রিস্টানদের প্রতি দৃষ্টি দিল। তাঈ প্রধান আদি, বিখ্যাত হাতেম তাইয়ের পুত্র, সিরিয়ায় পালিয়ে গেলেন, কিন্তু পরে নিজ ভগিনীর আহ্বানে ফিরে এসে ইসলাম গ্রহণ করেন। আর এক তাঈ প্রধান জার ইবন সারদাস দেশত্যাগ করে প্রথমে খ্রিস্টান সিরিয়াতে যান, পরে সেখান থেকে যান কনস্ট্যান্টিনোপলে।

৬৩০ সালে অক্টোবর মাসে মোহাম্মদ বিশাল এক বাহিনী নিয়ে উত্তর-পশ্চিম দিকে অভিযান যাত্রা করেন এবং তাবুকে অবস্থান নেন। তাবুক মদিনার প্রায় ২৫০ মাইল উত্তর-পশ্চিমে। এখানে ইউহানা (জন) ইবন রুবা, আইলার (আধুনিক আকাবা) খ্রিস্টান প্রিন্স, প্রফেটকে অভ্যর্থনা জানিয়ে সন্ধি করেন এবং আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য অধীনতা স্বীকার করে কর দিতে রাজি হন। মোহাম্মদ তাবুকে বিশ দিন অবস্থান করে মদিনায় ফিরে আসেন, কারণ তার বিভিন্ন গোত্র সমন্বয়ে গঠিত সেনাদলে অসন্তোষের সৃষ্টি হয়। তাবুকের অভিযান মোহাম্মদের ব্যক্তিগত সর্বশেষ অভিযান।

তাবুকে থাকাকালীন সময়ে মোহাম্মদ খালিদ ইবন ওয়ালিদকে ডুমা ওয়েসিসে প্রেরণ করেন। ডুমা তখন শাসিত হতো খ্রিস্টান আরব প্রিন্স কালব গোত্রের ওকাইদির বিন আবদুল মালিক। (ওকাইদির বড় ভাই বিশ্‌র মক্কানদের লিখতে শিখিয়েছিলেন, প্রায় বিশ বছর হলো গত হয়েছেন)। সেই সময় ওকাইদির তার এক ভাইয়ের সাথে শিকারে গিয়েছিল, খালিদ ওৎ পেতে থেকে তার ভাইকে হত্যা করেন এবং ওকাইদিরকে বন্দি করে মদিনায় নিয়ে আসেন। মোহাম্মদ তার সাথে এক সন্ধিচুক্তি করেন। প্রিন্স ওকাইদির ইসলাম গ্রহণ করে ট্যাক্স দিতে রাজি হলে তার নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিয়ে দেশে ফেরার অনুমতি দেয়া হয়। মোহাম্মদের মৃত্যুর পর ওকাইদির বিদ্রোহী হলে, খালিদ তাকে দমন ও হত্যা করে ডুমা ওয়েসিস ইসলামী রাজ্যভুক্ত করেন।

www.pathagar.com

মোহাম্মদ যখন মদিনায় প্রথম পদার্পণ করেন, তখন আউস গোত্রের এক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বের সাথে লম্বা আলোচনা করেছিলেন। তার নাম আবু আমির এবং তিনি মদিনার কাছে বাস করতেন। তিনি আল-রাহিব (সাধু) নামেই পরিচিত ছিলেন তার সন্ন্যাস আচরণের জন্য। অনেক সময় তাকে 'হানিফ' বলে গণ্য করা হতো।

আবু আমির মোহাম্মদকে আব্রাহামের ধর্ম ও নীতি গ্রহণের জন্য তিরস্কার (censured) করেছিলেন এবং তাঁর 'নবীত্ব'-কে অস্বীকার করেন। তিনি অভিযোগ করেন যে, ঐশী বাণীর দোহাই দিয়ে মোহাম্মদ একেশ্বরবাদ তত্ত্বকে বিকৃত করছেন। পরে তিনি রাজনৈতিক, সামাজিক ও নৈতিক কারণে মোহাম্মদের বিরোধিতা করেন। তিন মার্চেন্ট ক্যারাভানের ওপর মোহাম্মদের আক্রমণকে রাহাজানি বা লুণ্ঠন (brigandage) বলে আখ্যায়িত করেন এবং বিশ্বাস করেন যে মোহাম্মদ বিপজ্জনকভাবে উচ্চাকাঙ্ক্ষী।

মোহাম্মদের প্রতিহিংসা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আবু আমির মক্কাতে চলে যান, পরে পঞ্চাশ জন অনুসারী পরিবেষ্টিত হয়ে সিরিয়াতে মাইগ্রেট করেন। ৬২৮ খ্রিস্টাব্দে একজন খ্রিস্টান হিসাবে সিরিয়াতে তার মৃত্যু হয়। আবু আমির সেই ব্যক্তি যিনি ঈশ্বরের বিরুদ্ধে এবং তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে গেছেন বলে কোরানে উল্লেখ করা হয়েছে (৯ ঃ ১০৮)।

আবু আমিরের অনুসারীরা মদিনার গানিস গোত্রভুক্ত ছিল, তারা মদিনার ওয়েসিসের কাছে (কোবাতে প্রফেটের প্রথম মসজিদের নিকট) একটি ভজনালয় প্রতিষ্ঠা করে। এই ভজনালয় দুস্থ ও দরিদ্র মানুষের আশ্রয় কেন্দ্রও ছিল এবং প্রফেটের মসজিদ কোবা থেকে প্রার্থনাকারীদের আকর্ষণও করত। প্রফেট যখন তাবুক যাত্রা করেন তখন গানিস গোত্রের লোকজন তাকে আমন্ত্রণ জানিয়ে সেই আশ্রয়কেন্দ্র পরিদর্শন ও তাদের সাথে প্রার্থনায় যোগ দিতে বলে। তিনি রাজি হন, কিন্তু তাবুক থেকে ফেরার সময় সিদ্ধান্ত নেন যে, যে মসজিদ তাঁর অনুমতি ছাড়া নির্মিত সেখানে তিনি যেতে পারেন না। তিনি ঘোষণা করেন যে আবু আমিরের সমর্থনকারী যারা ঐ ভজনালয় তৈরি করেছে, সেখানে অধর্ম শিক্ষা দেয়া হয় যা মুসলিমদের অনুভূতিতে আঘাত করে। তাছাড়া এদের নেতা আবু আমির প্রফেটের নেতৃত্ব অস্বীকার করেছিল। কোরানে এ ঘটনার উল্লেখ আছে (৯ ঃ ১০৮)। মোহাম্মদ এই ভজনালয়কে পুড়িয়ে দিতে নির্দেশ দেন এবং তা পালিত হয়। পরে একে গোবরস্থানে (dunghill) রূপান্তরিত করা হয় (Sale, 1886, P. 152)।

মোহাম্মদের আচরণ প্রকটভাবে প্রকাশ পেল দুটি খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের ওপর–একটি দক্ষিণের, অপরটি উত্তরের। ৬৩১ খ্রিস্টাব্দে ফেব্রুয়ারি মাসে, দক্ষিণ আরবের খ্রিস্টান হানিফা গোত্রের এক প্রতিনিধি মদিনায় মোহাম্মদের কাছে এলো। আলোচনায় কি হলো বোঝা গেল না। কিন্তু তাদের প্রস্থানের সময়, মোহাম্মদ সেই প্রতিনিধির নেতাকে একপাত্র ওজু করার পরিত্যক্ত জল দিয়ে আদেশ দেন, 'দেশে ফিরে যাও এবং তোমাদের চার্চ ভেঙে ফেলে এই জল ছিটিয়ে তার ওপর মসজিদ তৈরি করোগে' (Muir, 1912, P. 458)। এই আদেশ তারা মানতে বাধ্য হয়। এক মাস পরে, ৬৩১ সালে এপ্রিল মাসে খ্রিস্টান তাঘলিব গোত্রের একদল প্রতিনিধি সোনার

www.pathagar.com

ক্রুশ গলায় ঝুলিয়ে মোহাম্মদকে দর্শন দিতে আসে। প্রফেট তাদের সাথে একটি চুক্তি করেন এবং তাদের খ্রিস্টান ধর্ম পালন করতে অনুমতি দেন এই শর্তে যে তারা তাদের সন্তানদের খ্রিস্ট ধর্মে আর ব্যাপটাইজ্‌ড করতে পারবে না।

অন্যান্য ঘটনায়, যার সম্বন্ধে ভিন্নমত রয়েছে, নাজরান থেকে খ্রিস্টান ডেলিগেশন মদিনায় মোহাম্মদের কাছে আসে। চৌদ্দজন বিশিষ্ট খ্রিস্টান ব্যক্তি নিয়ে গঠিত আর একটি দলও আসে ৬৩১ সালে, এই দলের নেতা ছিলেন কিন্দা গোত্রের আব্দুল মসিহ; বকর গোত্রের বিশপও এসেছিলেন এবং বনেদি দায়ান পরিবারের একজন প্রতিনিধিও এলেন।

সব দলের খ্রিস্টান প্রতিনিধিরা মোহাম্মদের কথা শুনলেন। মোহাম্মদ কোরান থেকে একই প্যাসেজ আবৃত্তি করে শোনালেন তাদের এবং তাদের আমন্ত্রণ করলেন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে; কিন্তু খ্রিস্টান প্রতিনিধির নেতারা অস্বীকার করেন। এর পর উভয় দলের মধ্যে গভীর আলোচনা শুরু হলো এবং প্রতি পয়েন্টে দ্বিমত পোষণ করল দুই দল। তখন মোহাম্মদ প্রস্তাব করেন– 'এসো আমাদের পরিবারের সদস্যদের ডাকি এবং একে অন্যকে অভিসম্পাত দিতে শুরু করি, যাতে ঈশ্বরের অভিশাপ সেই পরিবারের ওপর পড়বে যারা মিথ্যা বলবে' (৩ ঃ ৫৪)। খ্রিস্টানরা এই অদ্ভুত শাপশাপান্ত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে অস্বীকার করে। (Rodinson 1976, P. 271)। প্রত্যাবর্তনের পূর্বে প্রফেট খ্রিস্টানদের আশ্বস্ত করেন এই বলে যে তারা তাদের ধর্ম পালন করলে কেউ বাধা দিবে না এবং তাদের ধনসম্পত্তি ও অধিকার সব কিছুই বজায় থাকবে। কিন্তু পরে ঐ বছরেই ৬৩১ সালের শেষের দিকে মোহাম্মদ খালিদ ইবন ওয়ালিদের অধীনে এক অভিযান পাঠিয়ে নাজরান খ্রিস্টান গোত্রকে ইসলাম গ্রহণ করতে বলেন নতুবা অস্ত্র ধরতে বললে প্রাণের ভয়ে তারা মুসলিম হয়ে যায়। কারণ তারা খালিদের রণকৌশল সম্বন্ধে জ্ঞাত ছিল। কিন্তু ঘটনাচক্রে, খালিদ অন্য সমস্যা নিয়ে জড়িত হয়ে পড়লে, মোহাম্মদের মৃত্যু পর্যন্ত আর কোনো খ্রিস্টান গোত্র বিপদের সম্মুখীন হয়নি।

বালাধুরির মতে, নাজরানের খ্রিস্টানরা ছিল সংখ্যায় বেশি, প্রভাবশালী এবং ক্ষমতাশালী এবং দ্বিতীয় খলিফা ওমর তাদের নতুন ধর্ম ইসলামের প্রতি হুমকি স্বরূপ মনে করলেন। তাই নতুন অভিযানের ভয় দেখিয়ে আরবে অবস্থিত অধিকাংশ খ্রিস্টানদের দীক্ষিত করেন এবং নেতৃস্থানীয় অনেক খ্রিস্টান ব্যক্তিদের এখানে-ওখানে নির্বাসনে পাঠিয়ে দেন। অনেক নির্বাসিত খ্রিস্টান কুফাতে স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে সেখানকার সাংস্কৃতিক জীবনে যথেষ্ট অবদান রাখেন। নাজরানের খ্রিস্টানরা এখানে-ওখানে ছড়িয়ে গেল এবং গোপনে প্রায় দু'শতাব্দি ধরে খ্রিস্ট ধর্ম পালন করতে থাকল।

প্রফেট মোহাম্মদের জীবদ্দশায় নাজরান ও নেজদের কয়েকজন খ্রিস্টান গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব দক্ষিণ ও মধ্য আরবে প্রভূত প্রভাব স্থাপন করে। প্রাচীন মুসলিম ইতিহাসে বিক্ষিপ্তভাবে তাদের জীবনীর সন্ধান পাওয়া যায়। যদিও ঐসব এলাকায় স্থানীয়ভাবে বিশ্বাসী ও প্রথার সাথে মিশে গেছে, তবু সেখানে খ্রিস্টানদের শিক্ষা-দীক্ষার সূত্র খুঁজে পাওয়া যায়।

তাদের মধ্যে একজন সংস্কারকের নাম তোলাইহা। এই তোলাইহা তালহা নামের

www.pathagar.com

ক্ষুদ্র সংস্করণ, বলা যায় নিন্দনীয় সংস্করণ। শক্তিশালী খ্রিস্টান আসাদ গোত্রের প্রধান এবং মক্কার কোরেশ গোত্রের মিত্র গোত্র। তালহা সব সময়ে মোহাম্মদের বিরুদ্ধাচরণ করেছে এবং তাঁকে ভণ্ড বলত। মোহাম্মদও তাল্‌হাকে ভণ্ড প্রফেট বলে ডাকতেন। তোলাইহা মানুষকে যৌন সংযত হতে বলতেন, মদ ছুঁতে বারণ করতেন এবং নিয়মিত প্রার্থনায় মনোনিবেশ করতে বলতেন। তিনি সেজদা করাকে কদর্য ও পৌত্তলিকতা বলে প্রত্যাখ্যান করেন। ৬৩২ সালে তোলাইহা দাবি করেন যে তিনি গ্যাব্রিয়েলের মাধ্যমে ঐশী নির্দেশ পেয়েছেন এবং মধ্য আরবে প্রচারণা করে এক ধরনের খ্রিস্টবাদ প্রচারে সাফল্য লাভ করেন। তার বিরুদ্ধে খালিদ ইবন ওয়ালিদের অধীনে একটি মুসলিম বাহিনী প্রেরিত হলে তিনি তাদের মোকাবেলার জন্য উত্তরমুখে অগ্রসর হন। তোলাইহা পরাজিত হন ও সিরিয়ায় 'পালিয়ে' যান। তার মা ও অনেক অনুসারী ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকার করলে তাদের পুড়িয়ে মারা হয় এবং যারা ইসলাম গ্রহণ করে তাদের ছেড়ে দেয়া হয়। শোনা যায় কিছু দিন পরে তোলাইহা নিজে ক্ষুণ্ন মনে ইসলাম ধর্মে দীক্ষা নেন। তোলাইহা ও তার গোত্রের ইসলামে আনুগত্যের কথা কোরানে বিধৃত আছে (৪৯ ঃ ১৪)।

আউস গোত্রের আর একজন অদ্ভুত বিদ্রোহী ছিলেন আইলাহা ইবন কাব। তার অন্য নাম ছিল 'বোরখাধারী' বা কৃষ্ণমূর্তি (আল-আসওয়াদ) কিংবা 'গাধার মালিক'। বিখ্যাত বক্তা হিসাবে তার নাম ছিল। তিনিও ঘোষণা দেন যে দু'জন ফেরেস্তা এসে তাকে 'রহমানের' বাণী দিয়ে গেছে। বহু লোক তাকে প্রফেট মান্য করে তার শিষ্য হয়ে পেছনে দাঁড়িয়ে গেল এবং কিছু দিনের জন্য তিনি নাজরানের বৃহত্তর খ্রিস্টান অঞ্চলের আসল মালিক হয়ে যান এবং বাহরাইন, তায়েফ ও ইয়েমেনে তার প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে।

মোহাম্মদ তাকে প্রতারক আখ্যা দেন এবং তাকে হত্যা করার জন্য একদল গুপ্তঘাতক নিয়োগ করেন। এর পূর্বে আইহালা হিমিয়ারের শেষ গভর্নর বাদানের পুত্র শারকে হত্যা করে তার বিধবা স্ত্রীকে জোরপূর্বক বিবাহ করেছিলেন। সেই মহিলার যোগসাজশে গুপ্তহত্যাকারী দল রাতে তার বাসায় ঢুকে মাথা কেটে ফেলে। কর্মটি করা হয়েছিল প্রফেট মোহাম্মদের মৃত্যুর আগের রাতে।

প্রফেট মোহাম্মদের মৃত্যুর পর আরব গোত্রের বেশির ভাগ, যারা ইসলামে আনুগত্য এনেছিল, সরে পড়ে এবং কর দেয়া বন্ধ করে দেয়। তাদের বিরুদ্ধে খলিফা আবু বকর সেনাবাহিনী পাঠিয়ে শায়েস্তা করেন। খ্রিস্টান গোত্রের মধ্যে ইয়ামামা গোত্র তাদের ধর্মে অটল ছিল। এই গোত্রে খ্রিস্টান কিং হাওদা ইবন আলীর কাছে মোহাম্মদ তার জীবদ্দশায় চিঠি পাঠিয়েছিলেন ইসলাম গ্রহণ করার জন্য।

হাওদার মৃত্যুর পর ইমামার শাসনভার গ্রহণ করেন খ্রিস্টান হানিফা গোত্রের মুসাইলামা, সম্ভবত মধ্য আরবের সংস্কারকদের মধ্যে তিনি অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। তার আসল নাম ছিল মাসলামা কিন্তু মুসলিমরা তার মর্যাদা ক্ষুণ্ন করার জন্য 'মুসাইলামা' বলে ডাকত, যার অর্থ 'ক্ষুদ্র মুসলিম'–পেটি মুসলিম। এই নামেই তিনি বেশি পরিচিত। ৬০৮ খ্রিস্টাব্দে মুসাইলামা তার সংস্কার কর্ম শুরু করেন হানিফদের নীতি অনুসারে এবং মোহাম্মদের পূর্বেই প্রফেট বলে পরিচিতি পান। শান্তি বাণীর মাধ্যমে

www.pathagar.com

তিনি অসংখ্য অনুসারী ও শিষ্য সংগ্রহ করতে সমর্থ হন এবং দাবি করেন যে, আরবের অর্ধেক 'তার দখলে'।

৬২৫ খ্রিস্টাব্দে কোনো এক সময়ে তিনি তামিম গোত্রের মহিলা প্রফেট সাজাজ বা সাজাহ্-র সাথে জোট বেঁধে কাজ শুরু করেন। সাজাহ্ মেসোপটেমিয়াতে খ্রিস্টানরূপে পালিত হন এবং তার গোত্রীয় লোকজনদের কাছে প্রচারকার্য চালিয়ে জনপ্রিয়তা লাভ করেন। মুসাইলামার হানিফা রাজ্য সীমানার উত্তর-পূর্বে তামিম গোত্র অবস্থিত। এই দুইজন সংস্কারকের জীবনী মুসলিম ইতিহাসে সংক্ষিপ্তভাবে অঙ্কিত এবং সেখানে দু'জনের ব্যক্তিগত চরিত্রের ওপর অভিযোগ এনে তাদের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করার চেষ্টা করা হয়েছে। তাদের কাছে আগত ঐশী বাণীর (রিভিলেশন) কিছু কিছু অংশ আরও ঐতিহাসিকদের দ্বারা উদ্ধৃত– এমনভাবে উদ্ধৃত, যাতে এ দু'জনকে হেয় প্রতিপন্ন করা যায়। ৬৩২ খ্রিস্টাব্দের দিকে সাজাহ মেসোপটেমিয়ায় ফিরে যান এবং তারপর তার সম্বন্ধে আর কিছু শোনা যায়নি।

মুসাইলামার ধর্মীয় নীতি (ডকট্রিন) মোহাম্মদ পূর্ব আরবে প্রচারিত এবং বলা হয় যে মোহাম্মদ তার দ্বারা অনুপ্রাণিত। অক্সফোর্ডের প্রফেসর মারগোলিয়থ এক থিওরিতে বলেন যে, 'মুসলিম' শব্দটি মূলত মুসাইলামার অনুসারীদের বলা হতো (Bravmann, 1972 P. 8)। এ ধারণা অবশ্য, যেমন আশা করা গেছে, সাদরে গৃহীত হয়নি।

মুসাইলামা তার রিভিলেশনগুলোকে গদ্য ছন্দে (সাজ) সাজিয়েছিলেন কোরানের স্টাইলে মক্কান সূরার মতো। তিনি শেষ বিচারের দিন সম্বন্ধে সাবধান বাণী দিয়েছেন, সন্ন্যাসের প্রতি আগ্রহ দেখিয়েছেন, রোজা রাখা ও মদ্যপান পরিহার করতে নির্দেশ দেন। সন্তান জন্মদানের পরে স্ত্রীর সাথে যৌন সম্পর্কে বিশেষভাবে সংযমী হতে বলেন। তিনি প্রার্থনা পদ্ধতিতে হাঁটু ভেঙে বসতে বলেন, সেজদা (Prostration) নয়। তিনি বলেন ঈশ্বর তার পূজারীদের প্রণিপাত করিয়ে অসম্মান করতে দাবি করেননি। তিনি ঈশ্বরকে 'আল-রহমান দয়াময়' বলেছেন এবং নিজেকে বলতেন 'আবদুর রহমান'– রহমানের দাস।

মোহাম্মদের প্রতিপক্ষরা মক্কাতে প্রচার করত এই বলে যে তিনি ইয়ামামার কোনো এক রহমানের কাছ থেকে তার মতামতের অনেক কিছুই আহরণ করেছেন এই রহমানকে স্পষ্টভাবে মুসাইলামাকে বোঝায়। তাঁর কাছে থেকে মোহাম্মদ কিছু মতবাদ ধার করেন আর না করেন, তিনি (মোহাম্মদ) এটা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে মুসাইলামা সংস্কারক হিসাবে তার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী। তিনি মুসাইলামাকে প্রতারক বলে, মিথ্যাবাদী বলে অভিযোগ করেন এবং প্রচার করেন যে মুসাইলামা মানুষকে ঠকাচ্ছে, প্রতারিত করছে, মোজেজা দেখানোর ভান করছে আর কোরানের বাণী নকল করছে। তার মৃত্যুর শয্যায় মোহাম্মদ, কথিত আছে, মুসাইলামার ধ্বংস কামনা করেছিলেন।

মোহাম্মদ যখন মারা গেলেন, তার পর পরই মুসলিম সেনা বাহিনী সারা আরব ভূমি ইসলামাইজ করতে নেমে গেল অস্ত্রের জোরে এবং এই সাথেই মধ্য আরবে খ্রিস্টানদের প্রতি তাদের দৃষ্টি আরো দৃঢ়ভাবে নিবদ্ধ হলো। প্রাথমিক সংঘর্ষে মুসলিম বাহিনী মুসাইলামার অনুসারীদের হাতে পরাজিত হয় এবং দ্বিতীয়বারে ইয়ামামার যুদ্ধে

www.pathagar.com

(৬৩৪ খ্রিঃ) মুসলিম বাহিনী আরো ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে বিধ্বস্ত হয়; কথিত আছে মদিনাতে এমন কোনো পরিবার ছিল না যেখান থেকে কান্নার রোল ওঠেনি।

ইয়ামামার দ্বিতীয় যুদ্ধে মুসলিম ইতিহাসে মারাত্মক ক্ষতিটা হয়েছিল অন্য কারণে, আর তা হলো এই যুদ্ধে মৃত্যুর মধ্যে ৩৯ জন কোরানে হাফেজ শহীদ হন যারা প্রফেটের প্রধান সাহাবীদের মধ্যে অন্যতম। এই ঘটনা ঘটেছিল প্রায় বিশ বছর পূর্বে যখন খলিফা ওসমান স্ট্যান্ডার্ড কোরান সঙ্কলনে হাত দেন।

ঐ একই বছরে (৬৩৪), কয়েক মাস পরে খলিফা আবুবকর তার কৃতী সেনাপতি খালিদ ইবন ওয়ালিদের নেতৃত্বে এক বিশাল বাহিনী প্রেরণ করেন মুসাইলামাকে ধ্বংস করতে। আকরাবায় ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হয় এবং সেই যুদ্ধে এত সৈন্য মারা পড়ে যে, ঐ অঞ্চলকে 'মৃতের বাগান' নামে অভিহিত করা হয়েছে। এখানে মুসাইলামার দশ হাজার অনুসারী মারা পড়ে এবং মুসাইলামা নিজেও প্রাণ হারান; বাকি যারা ছিল তাদের আত্মসমর্পণে বাধ্য করে জবরদস্তি করে ইসলামে দীক্ষা দেয়া হয়।

মুসাইলামার শিক্ষা ও নীতি তার অনুসারীদের মধ্যে গোপনে আলোচিত হতে থাকে বিশেষ করে নেজদে। নেজদের হানিফা গোত্রে যারা মুসাইলামার শিষ্য বা অনুসারী ছিল তাদের নেজদিয়া বলা হতো। ৬৯৩ খ্রিস্টাব্দে নেজদিয়ারা প্রকাশ্যে মুসাইলিমা মতবাদ প্রচারণা শুরু করলে তাদের তাৎক্ষণিকভাবে দমন করা হয়। তারপর আরবে কোনো উল্লেখযোগ্য খ্রিস্টান গোত্র বা নেতার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়নি।

www.pathagar.com

১১

মোহাম্মদের ধর্মীয় পদ্ধতি

ইসলামে রহস্যবাদ ট্রাডিশনের বিবর্তন যাকে বলা হয় (Arberry 1964, P. 63) "The cult of Muhammad (মিল্লাতে মোহাম্মদ), কোরানে অনুরূপ ধারণায় তা "Cult of Abraham (Yusuf Ali, 1991, P. 406) বলে নামে পরিচিত (মিল্লাতে ইব্রাহিম)।

মিল্লাত শব্দটি হিব্রু কিন্তু আরামাইকের 'মেমরা' (memra) ধাতুগত এবং উভয়ই শব্দ মিল্লাত ও মেমরা গ্রিক লোগস (Logos)-এর মতো তাৎপর্যপূর্ণ। Logos অর্থ শব্দ (word)- Hughes, 1977, P. 349)।

মিল্লাত-ই-মোহাম্মদ শক্ত শিকড় গাড়ল প্রফেট মোহাম্মদের মৃত্যুর পর। কয়েকটি গোত্র তার মতবাদের রহস্যনীয় দিকটা ধরে তার নেতৃত্ব-সত্তার ক্যারিশমাকে অধিদৈবিক (supernatural) রূপ দিয়ে শেষমেশ তাকে দেবতার পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হলো অর্থাৎ দেবত্বারোপ (apotheosis) করা হলো। এই বিবর্তন কিভাবে শুরু হয়ে কোন কোন মহলে এই মতবাদটা চরম আকার ধারণ করল তার সংক্ষিপ্ত আলোচনায় আসা যাক।

১১.১ ঈশ্বরে বিশ্বাস

একেশ্বরবাদ (তৌহিদ) ইসলামের বহু পূর্বে আরবদের মধ্যে প্রচারিত হয়েছিল আরব সংস্কারকদের দ্বারা এবং প্যাগনদের মধ্যে এর ধারণা দিয়ে তাদের উদ্বুদ্ধ করা হয়েছিল। কাবাতে তীর্থ করতে এলে আরবরা বলত, 'হে, আল্লাহ, তোমার কোনো অংশীদার নেই। তা সত্ত্বেও, বহুঈশ্বরবাদ ও মূর্তিপূজা বন্ধ হয়নি এবং মোহাম্মদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল মক্কায় অবতীর্ণ সূরার মধ্যে দিয়ে তাদের একেশ্বরবাদে দীক্ষা দেয়ার চেষ্টা করা এবং এক ঈশ্বরের পূজা করা।

কোরানের শিক্ষা খুবই সরল ও দ্ব্যর্থহীন। ঈশ্বর অদ্বিতীয় ও এক এবং তাঁর কোনো অংশীদার নেই। তিনি এক অস্তিত্ব নিয়েই আছেন এবং তাঁকে শুধু একত্ববাদের মধ্যেই অনুভব করা যায়। ঈশ্বরের সাথে কোনো কিছুকে সংযুক্ত করা মুসলিম ধর্মচেতনায় ঈশ্বরবিরোধী কাজ- শিরক।

ঈশ্বরের রূপ ভয়ঙ্কর; তিনি পূত, পবিত্র- মরণশীল মানুষ তাঁর কাছে পৌঁছতে পারে না এবং তাঁর সম্বন্ধে পরিপূর্ণ জ্ঞান লাভ করা সম্ভব নয়। তিনি সব কিছুই দেখেন, কিন্তু কোনোখানেই তিনি দৃশ্যমান নন (৬ : ১০৩)। মুসা কেবলমাত্র স্বর শুনেছেন,

www.pathagar.com

কখনোও দেখেননি (৭ ঃ ১৩৯)।

মোহাম্মদ নিজে কিংবা তার কোনো সাহাবী কখনো দাবি করেননি যে, ঈশ্বরের সাথে মোহাম্মদের সরাসরি সম্পর্ক ছিল অথবা তিনি ঈশ্বরকে কোনো দিন দেখেননি বা তার স্বর শোনেননি। কোরানের বাণী এসেছে জিব্রাইলের মাধ্যমে এবং এমনকি তিনি (জিব্রাইল) মোহাম্মদ থেকে দূরে থাকতেন। যখন প্রফেট মিরাজে, স্বর্গে যান, ঈশ্বর থেকে তাকে আলাদা রাখা হয়েছিল হাজারটি দুর্ভেদ্য পর্দা দিয়ে। একটি হাদিসে আয়েশা বলেছেন : এটা চিন্তা করা জঘন্য মিথ্যা যে মোহাম্মদ ঈশ্বরকে দেখেছেন। (Gold ziher, 1971, P. 57)

১১.২ একটি আরব ধর্ম

মক্কায় প্রাথমিক দিনগুলোতে মোহাম্মদ ইহুদি ও খ্রিস্টানদের উচ্চ প্রশংসা করেছেন। তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন বলে কথিত যে, মুসলিম সম্প্রদায় ইসরাইলের সন্তান ও খ্রিস্টানদের মতো একই পথ অনুসরণ করবে (Kister, '1980, XIV, P. 232)। কয়েকজন পণ্ডিতের মতে, মোহাম্মদের মূল উদ্দেশ্য ছিল তাঁর অনুসারীগণকে ইহুদি খ্রিস্টান-মুসলিম ফেলোশিপের অংশ হিসাবে তৈরি করতে, কারণ তিনি অনুভব করেছিলেন যে এই তিনটি ধর্ম এক মৌলিক বিশ্বাসের ভিন্নরূপ, যার বিভাজন উচিত নয় (৪২ ঃ ১১)।

ইহুদি ও খ্রিস্টানদের প্রার্থনা পদ্ধতি তাদের নিজেদের সুবিধার কারণে নির্ধারিত। তাদের নিজেদের ভিন্ন প্রফেট আছে এবং তাদের নিজেদের ভাষায় রচিত ধর্মপুস্তকও আছে। আরবদেরও নিজস্ব একটি ধর্ম থাকা প্রয়োজন যা তারা নিজেদের দরকার মতো গ্রহণ করবে। যখন ঈশ্বরের ইচ্ছায় মোহাম্মদ প্রেরিত হয়েছেন এক নতুন ধর্মসহ, ইহুদি ও খ্রিস্টানদের ধর্মের সাথে তুলনীয়।

মিশনের শুরুতে মনে হবে, মোহাম্মদের কোনো বিশ্বজনীন মিশন ছিল না। ইসলামকে একটি জাতির ধর্ম হিসাবে (ethnic faith), বিশেষ করে আরব জাতির জন্যই চিন্তা করা হয়েছিল এবং মোহাম্মদ ইচ্ছা করেননি আরবের বাইরে এই ধর্মকে ছড়িয়ে দিতে। তার স্ত্রী খাদিজা, কাজিন ওয়ারাকা এবং তিনি নিজে, মক্কায় প্রচার কালে, বিশ্বাস করেছিলেন যে তিনি শুধুমাত্র আরবদের জন্য একটি ধর্ম প্রতিষ্ঠা করতে যাচ্ছেন।

১১.৩ মধ্যপন্থী মানুষ

প্রফেটের প্রথম দিকের ঘোষণায় তিনি কোনো আক্রমণাত্মক আচরণ করেননি। একজন আধুনিক পণ্ডিত বলেছেন, 'নমনীয়-ন্যায়শীলতা প্রকাশ পেয়েছিল তাঁর শাসনকালে (Guillaume)। প্রফেট কোনো কঠিন আইন প্রবর্তন করেননি তাঁর অনুসারীদের জন্য, কিন্তু আশা করেছিলেন তাঁর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে মুসলিমরা একটি সহনীয় সম্প্রদায় হবে। যেমন কোরান বলছে : 'আমরা তোমাদের মধ্যপন্থী মানুষে পরিণত করেছি' (২ ঃ ১৩৭)।

মোহাম্মদ সব সময়ে সহজ মতবাদের পক্ষপাতী ছিলেন, বাড়াবাড়ি করতেন না।

www.pathagar.com

তিনি অপচয় (ইসরাফ) বা অতিরিক্ত ব্যয় না করাকে ধর্মের অঙ্গ মনে করতেন। আধ্যাত্মিকতা ও কামুকতার মধ্যে ব্যালেন্স করে চলতে বলতেন; আত্মত্যাগ ও স্বার্থপরতার মাঝে সমন্বয় করতে পরামর্শ দিতেন; ভাবলেশহীনতা ও আবেগপ্রবণতার মাঝে মধ্যপথ খুঁজতে বলতেন। ধর্ম-বিমুখতা ও ফ্যানাটিক আচরণের মধ্যপথ অবলম্বন করতে বলতেন। এটাই হলো 'সঠিক পথ' (সেরাতুল মুস্তাকিম) কোরানে প্রথম চ্যাপ্টারে।

ইবন আব্বাস, প্রফেটের কাজিন, ইসলামিক আইনের ও ট্র্যাডিশনের অথরিটি, বলেছেন যে, প্রফেট তাঁর অনুসারীদের জন্য তাদের কর্তব্যকর্মকে সহজ করে দিয়েছেন। তিনি অতিরিক্ত কঠোর পদ্ধতি পালনের কারণে মুসলিমদের পাপের মাত্রা বাড়িয়ে কিংবা অতিরিক্ত ফরজ কর্তব্য পালন করতে তাদের বাধ্য করেননি– "পুস্তকভারে অবনত গাধার মতো যা বহন করার ক্ষমতা তার নেই' (৬২ ঃ ৫)।

মোহাম্মদ কৃচিৎ আনুষ্ঠানিক ধর্ম পালন করার জন্য চাপ সৃষ্টি করতেন; তাঁর কাছে যে ঐশী বাণী আসত তার সহজ ব্যাখ্যা করতেন। এক দৃষ্টান্তে দেখানো হয়েছে যে, একবার কতকগুলো লোক এসে প্রফেটকে জানাল যে, সঠিকভাবে অনুষ্ঠান পালন না করার জন্য সে চিন্তিত; তখন তিনি তাদের বলেন, "ক্ষতি নেই, (লা হরাজা), কোরানে আল্লাহ্ বলেছেন, ধর্মীয় ব্যাপারে তিনি তোমাদের ওপর কোনো কঠোরতা আরোপ করেননি (২২ ঃ ৭৭)। উৎসর্গ সম্বন্ধে প্রফেটকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন– যে উৎসর্গ করতে চায়, সে যেন তার পশুর প্রথম শিশুটিকে উৎসর্গ করে, যদি না করে সে না করুক, ক্ষতি নেই। প্রার্থনা, হজ, খাদ্যদ্রব্য, সওম এবং সপ্তাহের বিশ্রাম পালন সম্বন্ধে কোনো কড়াকড়ি নিয়ম ছিল না, আর যদি থাকত তাহলে তা সহজভাবে পালিত হতো এবং সময় সময় নিয়ম বাতিল করাও হতো, তাতে এটাই বোঝানো হয় যে কোরানকে পাঠ করতে হবে বুঝে, তার স্পিরিট উপলব্ধি করে, আক্ষরিক বা কঠোর ভাবে ফরম্যালিটি পালন করে নয়।

বস্তুত মোহাম্মদ আচরণে বিভিন্নতার জন্য কোনো আপত্তি করেননি; তিনি বলতেন 'আমার সম্প্রদায়ের যে অসাদৃশ্য (diversity), তা আল্লাহর করুণা (Swartz, 1981 P. 126)। বিশ্বাসীদের আল্লাহ্ স্বাধীনতা দিয়েছেন, যাতে অপরিবর্তনীয় বিধি-নিষেধের জন্য তারা যেন অসুবিধা বোধ না করে।

মোহাম্মদের মৃত্যুর পর মুসলিম আইনবিশারদদেরও ইমামদের অনমনীয় আইন ও বিধিবিধান তৈরি, প্রফেটের প্রাথমিক মিশনের বিরোধিতা। তিনি বেঁচে থাকলে ইমাম ও জুরিস্টদের রচিত কঠোর আইন ও বিধিবিধান অনুমোদন করতেন না।

১১.৪ খাদ্য ও রোজা

খাদ্য ও পানীয় ব্যাপারে মোহাম্মদ যথেষ্ট শিথিলতা দেখিয়েছেন। প্রথমে তিনি খাদ্য গ্রহণের সম্বন্ধে কিছু নিয়ম চালু করেন, কিছুটা ইহুদি প্রথায়, কিন্তু পরে প্রত্যেক ক্ষেত্রে বিধি-নিষেধ শিথিল করে দেন।

আহলে কিতাবিদের খাদ্য (ইহুদি ও খ্রিস্টান) কোরান বলে, অনুমোদিত (হালাল) এবং খাওয়া যেতে পারে (৫ ঃ ৭)। কিছু মাংস নিষিদ্ধ (হারাম), শূকরের মাংসসহ (২

www.pathagar.com

ঃ ১৬৮) কিন্তু অতিরিক্ত ক্ষুধার্ত (৫ ঃ ৫) বা প্রয়োজনে (২ ঃ ১৬৮) বা বাধ্য হয়ে (৬ ঃ ১১৯) নিষিদ্ধ দ্রব্য ভক্ষণ করলে পাপ হয় না। সর্বশেষে একটি শেষের দিকের সূরাতে বলা হয়েছে যে, যদি ঈশ্বরকে ভয় এবং সৎকর্ম করে, যে কোনো খাদ্য গ্রহণ করলে তার কোনো দোষ হবে না (৫ ঃ ৯৫)।

ফজলুর রহমান বলেন, প্রথম দিকে মদ পান করার অনুমতি ছিল (1966, P. 38)। যখন মোহাম্মদের সাহাবীদের মধ্যে মদ্যপানের পার্টি জমত এবং ধর্মীয় কর্তব্য ভুলে যেত; তারপর কেউ কেউ মাতাল অবস্থায় মসজিদে নামাজে আসতে লাগল তখন প্রফেট তাদের কর্তব্য স্মরণ করিয়ে দিয়ে, মদ্যপানকে পাপকর্ম বলে উভয়ের মধ্যে (মদ ও জুয়া) আছে মহাপাপ এবং মানুষের জন্য উপকারও; কিন্তু উহাদের পাপ উপকার অপেক্ষা অধিক (২ ঃ ২১৬)। মদ শয়তানের কাজ এবং যদি এর ব্যবহারে ঈশ্বরকে স্মরণে না থাকে, তাহলে পরিহার করা উচিত (৫ ঃ ৯১-৯২)।

কোরান বলে খেজুর বৃক্ষের ফল ও আঙুর থেকে তোমরা মদ তৈরি করো, ইহাতে অবশ্যই বোধ শক্তিসম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন আছে (১৬ ঃ ৬৯)। কিছু কিছু ধর্মবিদ আঙুরজাত মদ (খামর), যা নিষিদ্ধ এবং খেজুরের রস (নাবিদ)-এর মধ্যে পার্থক্য করেছেন। খেজুরের রস বৈধ, গ্রহণ করা যায়, কারণ প্রফেট নিজেই এই রস পান করতেন। একটি হাদিসে বলে : আয়েশা বর্ণনা করেছেন যে প্রফেট বলেছেন– 'তোমরা মদ পান করতে পার, কিন্তু মাতাল হয়ো না (Gold-ziher, 1981, P. 60)।

অন্যভাবে, মদকে স্বাস্থ্যকর বলা হয়েছে এবং মানবজাতির নিকট এটি আল্লাহর অবদানের চিহ্নস্বরূপ বলে গণ্য করা হয়েছে। (১৬ ঃ ৬৯)। একাধিকবার বলা হয়েছে যে, স্বর্গে আনন্দদায়ক বস্তুর মধ্যে একটি (৫৬ ঃ ১৮)।

মদ্যপানের জন্য ৮০ ঘা বেত মারার শাস্তি অনেক পরে প্রবর্তিত হয়েছে এবং এই শাস্তির বিধান কোরানে নেই। খলিফা আল মোতাওয়াকিল (মৃত ৮৬১), নিজে অর্থোডক্স সুন্নি হলেও নিজে মদে চুর হয়ে থাকতেন। আর একজন খলিফা, কাহির (মৃ. ৯৩৪) মদ্যপায়ীর বিরুদ্ধে কঠোর হলেও নিজে প্রায়ই স্খলিত পদ হতেন এবং সারা মুসলিম ইতিহাস জুড়ে অসংখ্য নেতা-ধর্মীয় ও রাজনৈতিক– গোপনে মদ্যপানের আসর জমাতেন।

যদিও আফিমের মতো ড্রাগ কোরানে নির্দিষ্টভাবে নিষিদ্ধ নয়; ইসলামী আইনে কিয়াসের দৃষ্টান্তে নিষিদ্ধ। যুক্তি দেখানো হয়েছে যে মদ (খামর) নিষিদ্ধ কারণ এটা মানুষকে মাতাল করে। আফিম ও অন্যান্য ড্রাগও উত্তেজক বস্তু, মাতাল করে দেয়, তাই এগুলো নিষিদ্ধ।

নিয়মিতভাবে উপবাস পালন করা ইহুদি ও খ্রিস্টানদের রীতি এবং মোহাম্মদ যখন ৩০ দিনের উপবাস চালু করলেন, তা পুরনো রীতি অনুযায়ী; অথবা কোরান বলে উপবাস তোমাদের জন্য নির্ধারিত হলো যেমন তোমাদের পূর্বে ছিল (২ ঃ ১৭৯)। এখানেও কিছু শিথিলতা আছে। কোরান অনুযায়ী যারা উপবাস করতে পারবে না, তারা গরিব লোকদের খাওয়াবে। (২ ঃ ১৮০)

www.pathagar.com

১১.৫ প্রার্থনা

কোরানে প্রার্থনার বিবরণ নেই বা নির্দিষ্টভাবে নিয়ন্ত্রিত করা হয়নি। পরবর্তী পর্যায়ে ধর্মীয় গুরুরা যে ফরম্যালিটি চালু করেছেন মোহাম্মদ নিজে বা তাঁর সাহাবীরা সেভাবে পালন করেননি। প্রার্থনার পদ্ধতি প্রবর্তন করতে মোহাম্মদ নিঃসন্দেহে খ্রিস্টান সাধুদের প্রার্থনা পদ্ধতির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন, যে পদ্ধতি খ্রিস্টান সাধুরা মধ্যপ্রাচ্যে পালন করতেন। যেমন, নিয়মিত বিরতি দেয়া, হাঁটু গাড়া, প্রণিপাত ইত্যাদি।

খ্রিস্টান মঠ, চার্চ, সিনেগগ ও মসজিদগুলোকে কোরানে উপাসনালয় বলা হয়েছে (২২ ঃ ৪০)। এক হাদিস অনুযায়ী, সিনেগগ ও চার্চ সম্বন্ধে মুসলিমদের বলা হয়েছে– 'তোমাদের প্রার্থনা সেখানেও করতে পার, এতে ক্ষতি নেই।' মোহাম্মদ নিজে, বলা হয়েছে যে, সিনেগগ প্রায়ই পরিদর্শন করতেন। ৬২৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি নাজরান থেকে আগত একটি খ্রিস্টান ডেলিগেশনকে মদিনার মসজিদে প্রার্থনা করার অনুমতি দেন।

গণপ্রার্থনাকে, সাম্প্রদায়িক, প্রায় সামাজিক, অনিয়মিত এবং ক্যাজুয়েলভাবে পালনীয় বলে বিবেচনা করতেন। তিনি নিজে কখনো খালি পায়ে বা মোজা লাগিয়ে প্রার্থনা করেননি, যেমন এখন অর্থোডক্স মুসলিমগণ দাবি করেন। তিনি জুতা সমেত প্রার্থনায় দাঁড়াতেন, শুধু পাশে পাশে ধুলো ঝেড়ে নিতেন। শাহদান ইবন আউস বর্ণনা করেন যে মোহাম্মদ বলেছেন : ইহুদিরা যা করে তার উল্টো করো, কারণ তারা বুট বা জুতা পায়ে প্রার্থনা করে না। (Hughges, 1977 P. 470)। এক হাদিসে বলা হয়েছে যে, নামাজের সময় মুসল্লিরা একে অন্যের সাথে কথা বলতে পারত। প্রফেট নিজে সময়ে সময়ে তাঁর প্রিয় নাতনী উমামাকে কাঁধে করে গণপ্রার্থনায় যেতেন; সেজদার সময় তাকে নামিয়ে রেখে আবার তাকে ঘাড়ে তুলতেন। আর একটি হাদিসে আছে যে তার দুই নাতি, হাসান ও হোসেন, নামাজের সময় তার পিঠে লাফিয়ে উঠত।

কোরানে কোথাও নির্দিষ্টভাবে নেই যে, দিনে পাঁচ বার নামাজ (প্রার্থনা) পড়তে হবে এবং এর কোনো ভালো সাক্ষ্য নেই যে পরবর্তীতে অর্থোডক্স ইমামরা দিনে পাঁচবার নিয়ম করেছেন, তা সুনির্দিষ্টভাবে প্রফেটের জীবদ্দশায় নির্ধারিত হয়নি (Torrey, 1967, P. 135); এ বিষয়ে কোরানের আয়াতের বিশ্লেষণে নিশ্চিতভাবে বলা নেই, দিনে কোন সময়ে পাঁচবার প্রার্থনায় বসতে হবে এবং সূরাসহ কত রাকাত নামাজ (প্রার্থনা) করতে হবে।

বর্তমানে মুসলিমরা যত বার প্রার্থনায় বসেন এবং যে পদ্ধতি অনুসরণ করেন, সে সংখ্যা ও পদ্ধতি প্রফেটের প্রার্থনা-পদ্ধতির সাথে মিলে না। প্রফেট প্রার্থনা পছন্দ করতেন এবং তিনি বিভিন্ন সময়ে প্রার্থনায় বসতেন। 'প্রায়ই দিনে পাঁচ বারের বেশি হতো এবং একই সময়ে হতো না। কোনো বাঁধাধরা নিয়ম ছিল না। জানা যায় যে, খ্রিস্টান সাধুদের মতো, তিনি এবং তাঁর কয়েকজন সাহাবী প্রায় দিনের দুই-তিন অংশ নামাজে অতিবাহিত করতেন অথবা অর্ধেক বা রাত্রের তৃতীয়াংশ।' (৭৩ ঃ ২০)

ইবন ইসহাক এক ঘটনা উল্লেখ করে বলেছেন, যখন প্রফেট মিরাজের সময় পর্দার সম্মুখে দাঁড়ান, তিনি জিজ্ঞাসা করেন মুসলিমদের কতবার প্রার্থনা করতে হবে। কণ্ঠস্বর এর জবাবে বলল, পঞ্চাশ বার দিনে। নিচে ফিরে আসার সময় মুসার সাথে

www.pathagar.com

দেখা হলে তিনি এই সংখ্যা কমিয়ে আনতে বলেন, কারণ এত বার প্রার্থনা করা মুসলিমদের জন্য সম্ভব হবে না। মুসা বারে বারে মোহাম্মদকে নামাজ কমাবার জন্য পাঠান এবং এই বারে তিরিশ, বিশ, দশ তারপর শেষে পাঁচ বার এসে স্থির হয়। মুসা তবুও এই সংখ্যা বেশি মনে করেন। কিন্তু বারবার যাওয়ার কারণে মোহাম্মদ আর ফিরে গিয়ে সংখ্যা কমাতে ইতস্তত বোধ করেন। তাই দিনে পাঁচ বার প্রার্থনার সময় নির্ধারিত হয়।

এই কাহিনীর মর্ম কথা এই নয় যে, মুসলিম পঞ্চাশ বা পাঁচ বার দিনে প্রার্থনা করবে, কিন্তু ঈশ্বরকে ঘনঘন চিন্তা করা তার উচিত (৩৩ ঃ ৪১)– যেমন কোরান বলছে ঈশ্বরকে স্মরণ করো, দাঁড়িয়ে, বসে এবং হেলান দিয়ে (৩ ঃ ১৮৮) এবং হাঁটতে হাঁটতে অথবা ঘোড়ায় চড়েও (২ ঃ ২৪০)।

মুসলিমদের ভারমুক্ত করার জন্য মোহাম্মদ প্রার্থনার সময় কমিয়ে দেন। তার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে মুসলিমরা প্রার্থনা করবে; ভোরের আগে, ভোরের পরে, মধ্যাহ্নের পূর্বে ও পরে, সূর্যাস্তের আগে ও পরে, রাতে এবং আবার মধ্যরাতের পরে এবং বিশেষ করে 'মধ্য প্রার্থনার' সময়ে। 'তোমরা সালাতের প্রতি যত্নবান হবে বিশেষত মধ্যবর্তী সালাতের এবং আল্লাহর উদ্দেশে বিনীতভাবে দাঁড়াবে।' (২ ঃ ২৩৯)। তিনি সকাল ও বিকালের প্রার্থনাকে এক করে দেন এবং সূর্যাস্তের পর ও রাতের প্রার্থনা, ওই ভাবে প্রার্থনা সংখ্যা কমিয়ে দিনে দু'বার করে দেন, যা মুসলিমগণ স্ট্যান্ডার্ড বলে গণ্য করেন। এটাকে কোরানিক ইনজাংশানের ওপর নির্ভর করে যেমন, 'সালাত পালন কর সূর্যাস্তের পরে ও সূর্যোদয়ের পূর্বে' (১৭ ঃ ৮০) [সূর্য হেলিয়া পড়িবার পর হইতে রাত্রির ঘন অন্ধকার পর্যন্ত সালাত কায়েম করিবে এবং কায়েম করিবে ফজরের সালাত। নিশ্চয়ই ফজরের সালাত উপস্থিতির সময়– ১৭ ঃ ৭৮ আল-কুরাআনুল করীম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ। –অনুবাদক।]

নামাজের সময় যে দিকে মুখ করে দাঁড়ানো হয়, সে সম্বন্ধেও সন্দেহ রয়েছে, মুতাজেলারা বিশ্বাস করে মক্কার দিকে ঘুরে দাঁড়ানোর প্রয়োজনটা প্রফেট সাজেস্ট করে ছিলেন তাঁর অনুসারীদের সাধারণ জ্ঞান পরীক্ষা করার জন্য, কারণ কোরান বলছে স্পষ্ট করে 'পূর্ব কিংবা পশ্চিম দিকে দাঁড়ানোর মধ্যে তোমার কোনো পুণ্য নেই' (২ ঃ ১৭২); আবার বলা হয়েছে 'পূর্ব ও পশ্চিম যে দিকে মুখ ফেরাও সেই দিকেই ঈশ্বর রয়েছেন' (২ ঃ ১০৯)।

মোহাম্মদ আরবিতে প্রার্থনা করার জন্য বলেননি, কিন্তু তাঁর অনুসারীদের তাদের নিজের ভাষায় প্রার্থনা করতে অনুমতি দিয়েছেন, এই অনুমতি প্রথম দেয়া হয় সলমন ফার্সিকে (আমীর আলি, ১৯৬৫, পৃ. ১৬৬)।

মুসলিম সুফিরা মক্কার দিকে মুখ করে নিয়মিত প্রার্থনা করার ধারণাকে, নির্ধারিত পাঁচ বার, আরবি ভাষায় মন্ত্র পড়া যা অধিকাংশ মুসলিমদের বিদেশী ভাষা। নামাজের পূর্বে আবশ্যিকভাবে ওজু করা, মাটিতে হাঁটু ঠেকিয়ে সেজদা করা, যান্ত্রিকভাবে বিভিন্ন আসনে ওঠাবসা করা ইত্যাদিকে ধর্মের নামে ভান করা (sanctimony) আর ভণ্ডামি (hypocritical) ছাড়া আর কিছু নয় বলে মনে করেন।

www.pathagar.com

১১.৬ হজ

শোনা যায় মোহাম্মদ মক্কার জাহেলিয়া সময়ে তাঁর উঠতি বয়সে বেশ কয়েকবার কাবাঘরে গেছেন, কিন্তু ৬১০ খ্রিস্টাব্দে প্রথম রিভিলেশন (ওহি) পাওয়ার পর এবং তার পরবর্তী মক্কা-জীবনে ৬২২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কাবাঘর পরিদর্শন বা বড় হজ করার রেকর্ড নেই।

৬২৯ খ্রিস্টাব্দে ফেব্রুয়ারি মাসে, মদিনা থেকে তিন দিনের জন্য মক্কা যাওয়া শর্তে তিনি ছোট হজ (ওমরাহ) করেছেন, কাবাঘরে সাত পাক ঘুরেছেন খালি পায়ে, ভক্তি ভরে নয়, উটের পিঠে চড়ে এবং এই উটের পিঠ থেকে তিনি কখনো নামেননি। তিনি মোয়াজ্জন বিলালকে ডেকে কাবাঘরের ছাদে উঠে আজান দিতে বললেন। বিলালকে ছাদে ওঠানোর উদ্দেশ্য হলো, যে পুণ্য মন্দিরকে মক্কাবাসীরা শ্রদ্ধাভক্তি করে সেই স্থান একজন সাবেক হাবসী ক্রীতদাসের পায়ের তলে। ঐ একই সময়ে যখন একজন হাজী পবিত্র অবস্থায় ইহরাম বেঁধে থাকে, ঠিক সেই অবস্থায় তিনি মায়মুনাকে বিবাহ করে মিলন সম্পন্ন করলেন, যা ঐ সময়ে নির্ধারিত প্রথাবিরুদ্ধ এবং নারী-পুরুষের সঙ্গম অবৈধ।

৬৩০ খ্রিস্টাব্দে যখন তিনি মক্কা এলেন, তিনি প্রথামত কাবাঘরে সাত পাক ঘুরলেন আবার উটের পিঠে চড়ে এবং প্রত্যেক বার হাতের ছড়ি দিয়ে কালো পাথর ছুঁয়ে গেলেন। হিজরি অষ্টম মাসে মক্কা বিজয়ের পর এই পরিদর্শন হয় এবং গণসম্মুখেই হজ উদযাপন করার সুযোগ পান, কিন্তু তিনি তা করলেন না। ৬৩১ খ্রিস্টাব্দেও তিনি বার্ষিক হজে অংশগ্রহণ করেননি, আবু বকরকে পাঠিয়েছিলেন তাঁর পরিবর্তে। যদিও তিনি এখন মক্কানগরীর প্রভু, তিনি পরপর দু'বছর বার্ষিক হজে প্রথামতো অংশগ্রহণ করেননি।

৬৩২ খ্রিস্টাব্দে ৯ মার্চ মোহাম্মদ বিদায় হজ পালন করেন। এই এক হজে তিনি মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রধান হিসাবে অংশগ্রহণ করেন। এই সর্বশেষ হজে প্রফেট যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন তাই মুসলিমদের জন্য প্রথা রূপে নির্ধারিত হয়ে পালন করা বাধ্যতামূলক হলো, তবু এই হজ উপলক্ষে কয়েকটি বিশেষ বিষয় ছাড়া, তিনি পুরনো প্রথার ও নিয়মের কোনো পরিবর্তন করেননি এবং কিভাবে বার্ষিক হজ পালন করতে হবে তার নির্দিষ্ট কোনো বিধি-বিধান কোরানেও রেকর্ড করা হয়নি। উল্লেখ্য যে, এই কারণে বিভিন্ন গোষ্ঠী ও স্কুল, শিয়া সম্প্রদায়সহ, হজ পালনে বিভিন্ন ধরনের প্রথা অনুসরণ করে আসছেন (Aj Wensinck, in SEJ, 1974, P. 123)।

মোহাম্মদ তাঁর সকল আরব অনুসারীদের জন্য একটা সাধারণ ট্র্যাডিশনাল অনুষ্ঠান রূপে অবশ্য পালনীয় করেন এই মর্মে যাতে সব আরবের মধ্যে একতা ও সংহতি বজায় থাকে। তিনি কাবাঘরের সকল মূর্তি ও পুতুল ধ্বংস করে দেন, কিন্তু প্রাচীন প্রতীক রূপে কালোপাথর রেখে দেন এবং প্রায় সমস্ত প্রাচীন প্রথাও চালু রাখেন।

প্রাপ্তবয়স্ক ও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী একজন মুসলিমকে জীবনে একবার হজ পর্ব পালন করা কর্তব্য, তবে শর্ত থাকে যে, তাদের আর্থিক সমর্থ থাকতে হবে, আসা-

www.pathagar.com

যাওয়ার খরচাপাতি ও তার অবর্তমানে পরিবারের সদস্যদের ভরণ-পোষণের জন্য।

প্রফেট যখন এই তীর্থ পালনের ব্যবস্থা করেন, তখন জনৈক ধার্মিক ব্যক্তি সোবাকা ইবন মালিক প্রফেটকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, এই তীর্থ পালন প্রতি বছরের জন্য কিনা। শোনা যায়, এই প্রশ্ন প্রথম বার ও দ্বিতীয় বার এড়িয়ে যান। কিন্তু তৃতীয় বার প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, 'না', কিন্তু যদি আমি বলতাম 'হ্যাঁ' তাহলে তোমাদের জন্য তা পালন করা কর্তব্য হয়ে দাঁড়াত এবং যদি কর্তব্য হতো তাহলে তোমরা তা পালন করতে পারতে না। সুতরাং আমি যা তোমাদের দিই না, তা নিয়ে আমাকে বিরক্ত করো না।'

বলা হয়েছে যে, প্রফেট কোনো অনুষ্ঠানের ওপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করেননি এবং সেসব অনুষ্ঠানের তাৎপর্য অতি অল্পই ছিল। আল-ওয়াকিদ এক হাদিসে উল্লেখ করে বলেছেন যে, আনুষ্ঠানিক ব্যাপারকে প্রফেট অসংশ্লিষ্ট (Irrelevant) বলে ঘোষণা করেন, পাথর ছোড়ার অনুষ্ঠানের কথা কোরানে উল্লেখ নেই, সাফা ও মারওয়ার মধ্যে ছোটাছুটিও প্রফেটের কাছে অপ্রয়োজনীয় বলে মনে হয়েছে এবং এ সমস্ত ব্যাপারে বিধান দ্ব্যর্থবোধক যেমন, 'না করলেও কোনো ক্ষতি নেই' (২ ঃ ১৫৩)।

শতাব্দি ধরে বহু মুক্তচিন্তার মুসলিম এই হজের ব্যাপারে আপত্তি তুলেছেন। বিখ্যাত বেশ কয়েকজন সুফি এটাকে পুরোপুরি অস্বীকার করেছেন। রাবেয়া বসরী (মৃ. ৮০১) কাবা পরিদর্শন করে বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন : 'আমি শুধু ইট আর একটি ভবন দেখছি। এর থেকে আমি কি পুণ্য অর্জন করব?' বায়েজিদ বোস্তামি (মৃ. ৮৭৪) হজে যাবার পূর্ব মুহূর্তে এক বৃদ্ধের সাক্ষাৎ লাভ করেন। সেই বৃদ্ধ ব্যক্তি তাকে বলেছিলেন, 'আমাকে ঘিরে সাত বার চক্কর দাও। কাবাতে চক্কর দেয়া আর আমাকে চক্কর দেয়া একই কথা, সুবিধা হলো তোমার সময় বাঁচবে আর দুর্ভোগ থেকে মুক্তি পাবে'। বায়েজিদ তাই করে বাড়ি ফিরে গেছেন।

এমনকি অর্থডক্স আল-গাজ্জালী (মৃ. ১১১১) মক্কা পরিদর্শনকালে হজ আনুষ্ঠানিকতা এবং হাজীদের কালো পাথর চুম্বনের দৃশ্য, মূর্তি পূজার আনুষ্ঠানিকতার সাথে তুলনা করেন এবং একেশ্বরবাদী ইসলামের জন্য সামঞ্জস্যহীন বলে মনে করেন।

অধুনা হজের অনুষ্ঠান শেষে আল্লাহর নামে অসংখ্য পশু নিধনের ব্যাপারে অনেকে আপত্তি তুলেছেন। লাখ লাখ পশু হত্যা করে তাদের দেহ চুন ভর্তি গর্তে ফেলে দেয়ার মাঝে কোনো পুণ্য অর্জন হয় কিনা, কেউ জানে না। প্রাণী হত্যা আর অপচয় ছাড়া এর অন্য কোনো অর্থ আছে বলে আধুনিক যুক্তিবাদী মুসলিমরা মনে করেন না। এটা অযৌক্তিক ও নিষ্ঠুরতা ছাড়া আর কিছু নয় এবং ব্যাপকভাবে পশু-মাংসের অপচয় যা অন্যভাবে মানুষের খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারত।

যারা এই হজের পুরো ব্যাপারটা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করে তারা আশা করে, যে প্রফেট নিজে যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন : যেমন, এমন একদিন আসবে যখন ইথিওপিয়ানরা কাবাঘরকে ধুলোয় মিশিয়ে দেবে এবং তার আর পুনর্নির্মাণ হবে না, যাতে ইসলাম এক বিধর্মী অনুষ্ঠানের কবল থেকে মুক্তি পেতে পারে।

www.pathagar.com

১১.৭ ঐশী গ্রন্থ

কোরান বলেছে যে, প্রত্যেক যুগে ঈশ্বর স্বর্গীয় গ্রন্থ নাজেল করেছেন (১৩ ঃ ৩৮)। প্রেরিত 'ঐশী গ্রন্থে' 'বিশ্বাস' ইসলাম ধর্মের ছয়টি মৌলিক নীতির একটি। যেসব জাতি এই প্রেরিত ঐশীগ্রন্থ পেয়েছে তাদের বলা হয় 'কেতাবী মানুষ'–আহলে কিতাব People of the Book এবং শেষ বিচারের দিনে প্রত্যেক জাতি নিজেদের ধর্মগ্রন্থ মতে বিচারপ্রাপ্ত হবে।

কোরানে বলা হয়েছে, পূর্বে যেসব কিতাব প্রেরণ করা হয়েছে সেগুলোকে গ্রহণ করতে (৪ ঃ ১৩৫), বিশেষভাবে মুসার পঞ্চ-পুস্তকে (তৌরাত) যেখানে ঈশ্বরের ইচ্ছা বিধৃত এবং দাউদের গীতসংহিতায় (জবুর) আর যিশুখ্রিস্টের গসপেলে (ইঞ্জিল)। কোরানে ১৩০টির বেশি প্যাসেজ আছে, যেখানে তৌরাত, গীতাসংহিতা ও ইঞ্জিলের নাম উল্লেখিত হয়েছে– উল্লেখ করা হয়েছে শ্রদ্ধার সাথে ঈশ্বর প্রেরিত গ্রন্থ বলে (Tisdall, 1911 P. 115)।

মোহাম্মদের পূর্বে আরবরা অন্য জাতির পবিত্র গ্রন্থ গভীরভাবে পাঠ করতে পারত না অথবা তারা বুঝতে পারত না (৬ ঃ ১৫৭) এবং এইভাবে তারা আব্রাহামের ধর্ম সম্বন্ধে অজ্ঞান ছিল। মোহাম্মদের মাধ্যমে ঈশ্বর তাদের কাছে তাদের জন্য কিতাব পাঠালেন আরবি কোরান (১২ ঃ ২), যার দ্বারা তাদের ধর্ম ও তা পালন করার জন্য নির্দেশিত হয় (একই সময়ে মোহাম্মদ তাদের নিজেদের স্থানীয় ভাষায় কোরান পাঠ করার অনুমতি দেন)। কোরানে ঐ সমস্ত বাণীর পুনরাবৃত্তি হয়েছে, যেসব অন্য ধর্ম গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে। এই জন্য আরবদের 'আহলে কিতাব' বলা হয়েছে এবং তাদেরকে ইহুদি ও খ্রিস্টানদের সমমর্যাদা দেয়া হয়েছে।

মোহাম্মদ বলেছেন : কোরানে বিশ্বাস করো, বিশ্বাস করো জবুর, তৌরাত ও ইঞ্জিলে, তবে তোমাদের জন্য 'কোরানই যথেষ্ট'। আলফ্রেড গিওম বলেছেন, কোরানের আয়াতের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ আয়াত আছে (1983 , P. 30), যেখানে মোহাম্মদকে উপদেশ দেয়া হয়েছে এই বলে, যদি তিনি তাঁর কাছে প্রেরিত গ্রন্থ সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ পোষণ করেন তাহলে 'তিনি যেন ঐ সব লোকদের জিজ্ঞাসা করেন যারা তাঁর পূর্বে ঐশী ধর্মগ্রন্থ পড়েছে' (১০ ঃ ৯৫), অর্থাৎ তিনি যেন ইহুদি ও খ্রিস্টানদের জিজ্ঞাসা করেন।

এই উপদেশ অনেক সময় অনুসরণ করা হয়েছে। কথিত আছে যে, দাগেস্তানের বিরুদ্ধে অভিযানকালে বিজয়ী নাদির শাহ (মৃ. ১৭৪৭) কাজভিনে কোরানের একটি আয়াত (৪৮ ঃ ২৯)কে কেন্দ্র করে শিয়া-সুন্নির মধ্যে এক বিরোধে উপস্থিত ছিলেন। যেহেতু ঐ আয়াতে তোরাহ ও ইঞ্জিলের উল্লেখ ছিল, নাদির শাহ ইস্পাহানের ইমাম মির্জা মোহাম্মদকে নির্দেশ দিয়েছিলেন ইহুদি ও খ্রিস্টানদের কাছ থেকে ঐ আয়াতের সঠিক ব্যাখ্যা গ্রহণ করতে। ইহুদি ও খ্রিস্টানদের সাহায্যে সুন্নিদের পক্ষে এক সিদ্ধান্ত দেয়া হয়। আবার তাদের মতামত সম্বন্ধে সত্যতা যাচাই করার জন্য দ্রুজদের পরামর্শ শুধু কোরানের আয়াত সম্বন্ধে নয়, বাইবেল সম্বন্ধেও নেয়া হয় (Goldziher 1971 P. 111)।

কোরান বলে আহলে কেতাবিদের সাথে ঝগড়া বা বিরোধ সৃষ্টি করো না, যদি ভিন্নমত হয় ভদ্রভাবে তাদের সাথে আলোচনা করতে গিয়ে বলা উচিত– "আমাদের কাছে যা প্রেরিত হয়েছে তাতে বিশ্বাস করি এবং তোমাদের কাছে যা প্রেরিত হয়েছে

www.pathagar.com

তাতেও বিশ্বাস করি" (২৯ ঃ ৪৫ - ৪৬) এবং আরও একটি প্যাসেজে আছে যে, যে গ্রন্থে ঈশ্বর মুসলিম ও অমুসলিমদের কাছে প্রেরণ করেছেন সকলই সমভাবে বৈধ এবং আমরা এদের মধ্যে কোনো পার্থক্য করি না (৩ ঃ ৭৮)।

১১.৮ প্রফেটগণ

মুসলিম ধর্মে সমস্ত প্রফেটদের বিশ্বাস করা ছ'টি মৌলিক নীতির একটি। কোরান বলেছে যে, প্রত্যেক জাতির নিকট রসূল বা সংবাদবাহী প্রেরণ করা হয়েছে (১০ ঃ ৪৮) এবং একটি সাধারণ হাদিস অনুযায়ী মোহাম্মদ নিজেই বলেছেন যে ১,২৪০০০ প্রফেট এবং ৩১৩ জন সংবাদবাহী (রসূল) দুনিয়ার মানুষের কাছে পাঠানো হয়েছে।

কোরানে মাত্র ২৭ জন প্রফেটের নাম উল্লেখ আছে (মোহাম্মদ ছাড়া), এদের মধ্যে ওল্ড টেস্টামেন্টে ২২ জন (প্রধান হচ্ছেন– আদম, নোয়াহ, আব্রাহাম ও মোসেস) এবং ৩ জন নিউ টেস্টামেন্টে (যাকারিয়া, তার পুত্র জন দ্য ব্যাপ্টিস্ট এবং জিসাস) অন্য দুজন হচ্ছেন জুলকারনাইন এবং লোকমানকে চিহ্নিত করা যায়নি, তবে মনে করা হয় আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট এবং এসপ (Aesop)। শেষের জনকে ডেভিডের (দাউদ) উজির বলে গণ্য করা হয়। এছাড়া আরও অনেক প্রফেট আছেন, যাদের সম্বন্ধে প্রফেট মোহাম্মদকে বলা হয়নি (৪ ঃ ১৬২)। কোরান বলছে– ঈশ্বর তাদের কাছে কোনো প্রফেট প্রেরণ করেননি যারা নিজেদের ভাষা ব্যবহার করে না। (১৪ ঃ ৪)। ইহুদি ও খ্রিস্টানদের মতো, মোহাম্মদের পূর্বে আরবদের কোনো প্রফেট ছিল না। ঈশ্বর মোহাম্মদকে আরব জাতির জন্য প্রফেট করে পাঠালেন, তাদের গাইড করার জন্য অর্থাৎ বিশ্বাসীদের গাইড করার জন্য, (১৭ ঃ ৯), একটি আরবি বিশ্বাস প্রতিষ্ঠার জন্য (To create an Arab faith) এবং আরব ভাষায় তার ঘোষণা দেয়া হলো।

স্মরণীয় যে, মক্কায় প্রথম দিকে আল্লাহর বাণীই গুরুত্বপূর্ণ ছিল, বহনকারী নয়। তিনি শুধুমাত্র ঘোষক (বশীর) ছিলেন, সরল কথায় একজন সাবধানকারী (নাদির) (২৯ ঃ ৪৯), একজন সংস্কারক ও পবিত্রকরণকারী, উপদেশদাতা ও পরিচালক। তার মিশন আসলে একজন সংবাদবাহকের মিশন (৩ ঃ ১৩৮), আরববাসীদের কাছে আল্লাহর বাণী পৌঁছে দেয়া, যাতে তারা আল্লাহর সেবায় নিযুক্ত হয়।

প্রথমে মোহাম্মদ নবীদের মধ্যে অসাধারণ বলে দাবি করেননি। তিনি জোর দিয়ে বলেছিলেন যে, তিনি কোনো নতুন ডকট্রিন (নীতি) আনয়ন করেননি (৪৬ ঃ ৮), অথবা তাঁর রিভিলেশনে কোনো নতুন জিনিস আছে বলেও দাবি করেননি। কোরানের কথায় : 'তোমার পূর্বেকার প্রফেটদের কাছে যা বলা হয়নি, তোমার কাছেও তা বলা হয়নি (৪১ ঃ ৪৩) এবং আমরা প্রফেটদের মধ্যে কোনো প্রভেদ করি না' (২ ঃ ২৮৫)।

১১.৯ ধর্মীয় সহিষ্ণুতা

ধর্ম প্রচারের প্রথম দিকে মোহাম্মদ অন্যান্য ধর্মের প্রতি অত্যন্ত মহানুভবতা দেখিয়েছিলেন এবং কোনো প্রকার হিংসা বা দ্বেষ প্রকাশ করে তাদের সাথে বাক্য বিনিময় করেননি। একটি হাদিসে তিনি বলেছিলেন অন্য ধর্মকে নস্যাৎ করার অর্থ ঈশ্বরের প্রতি মন্দ আচরণ দেখানো।

www.pathagar.com

ঈশ্বর বিভিন্ন প্রকার মানুষ ও গোত্র সৃষ্টি করেছেন এবং ঈশ্বর যদি চাইতেন তাহলে নিশ্চয়ই তোমাদের একটি জাতিতে পরিণত করতে পারতেন।

কোরান বলে : ঈশ্বর প্রত্যেক জাতির জন্য সঠিক পথ বলে দিয়েছে (৫ ঃ ৫২), কী কর্তব্য পালন করতে হবে তাও বলেছেন (২২ ঃ ৬৬) এবং কীভাবে ঈশ্বরের নাম স্মরণ করতে হবে সে আনুষ্ঠানিকতার পদ্ধতি বাৎলে দিয়েছেন (২২ ঃ ৩৫) এবং তিনি প্রত্যেককে যা দিয়েছেন তাই দিয়েই পরীক্ষা করবেন, বিচার করবেন। (৫ ঃ ৫৩) এবং সকলেরই স্বাধীনভাবে নিজ ধর্ম পালন করা উচিত। একটি আয়াত পরিষ্কারভাবে বলছে : ধর্মে জবরদস্তি নেই (২ ঃ ২৫৭)।

ঈশ্বর বিশ্বাসীদের কাছে সেই একই ধর্ম পাঠিয়েছেন যা তিনি নূহ্, ইব্রাহিম, মুসা ও ঈসার কাছে পাঠিয়েছেন (৪২ ঃ ১১)। ইহুদি হোক, খ্রিস্টান বা সাবিয়েন, যারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করে, শেষ বিচারের দিনে বিশ্বাস করে এবং সৎপথে চলে, তাদের পুরস্কৃত করা হবে (২ ঃ ৫৯)। কোরানের এই সব সুনির্দিষ্ট আয়াত সব ধর্মকে একই কাতারে খাড়া করেছে।

যদিও তিনি মূর্তি পূজা বাতিল করেছেন, মোহাম্মদ তাঁর মিশনের প্রথম দিকে মূর্তিপূজকদের ওপর অত্যাচার করতে বলেননি। মক্কার প্যাগনদের তিনি শুধু বলেছিলেন তোমরা যাকে পূজা করো, আমি কখনো তার পূজা করি না এবং আমি যার পূজা করি. তোমরাও তার পূজা করো না। তোমার ধর্ম তোমার, আমার ধর্ম আমার (১০ ঃ ৬)।

মোহাম্মদের মিশনের এই সময়ে তিনি ছিলেন শান্তির প্রতীক এবং প্রাথমিক ইসলাম সমন্বয় ও সহঅবস্থানের ইসলাম যার প্রকাশ পেয়েছে 'সালাম' সম্বর্ধনার মাঝে। তাঁর বিপক্ষের মানুষদের প্রতি আচরণে তিনি ভদ্র ও শান্তপ্রবণ ছিলেন, কোনো জবরদস্তি করেননি। তিনি কখনো সহিংসতার আশ্রয় নেননি, এমনকি আত্মরক্ষার জন্যও।

পরে এই শিশু-সম্প্রদায়কে অত্যাচার ও অনাচারের হাত থেকে রক্ষা পেতে তিনি তাঁর অনুসারীদের নিজেদের জীবন রক্ষার্থে যুদ্ধ করতে নির্দেশ দেন, কারণ যদি ঈশ্বর মানুষকে অত্যাচারীকে বাধা দিতে না অনুমতি দিতেন, তাহলে তাদের চার্চ, সিনেগগ ও মসজিদ এসমস্তই ধ্বংস হয়ে যেত (২২ ঃ ৪১)।

মক্কার সূরাগুলোতে কোনো স্থানেই বলা হয়নি ধর্ম প্রসারের জন্য অস্ত্রধারণ বাধ্যতামূলক এবং কর্তব্য। এটা সত্য যে, কোনো প্রকারের সহিংসতাকে অস্বীকার করা হয়েছিল মক্কাতে থাকার সময়ে। প্যাগন আরবদের প্রথার বিরুদ্ধে, যেমন রক্তের বদলে রক্ত না নিলে পরিবারের জন্য বা গোত্রের জন্য লজ্জাকর ব্যাপার– মোহাম্মদের আদেশ ছিল এসব অপরাধকে আমলে না এনে, অপরাধীদের মার্জনা করে দেয়া (২৪ ঃ ২২) এবং মন্দ কাজের পরিবর্তে ভালো কাজ করা (২৩ ঃ ৯৮)। ঐসব মানুষের জন্য বেহেশত নির্ধারিত যারা ক্রোধ দমন করে, অন্যকে ক্ষমা করতে পারে (৩ ঃ ১২৮)। কোরানের একটি আয়াতে বলা হয়েছে : যারা মন্দ সম্পর্কে সহনশীলতার সাথে সহ্য করে, পরিবর্তে সৎকর্মে তার প্রতিদান দেয়, তাদেরকে দ্বিগুণভাবে পুরস্কৃত করা হবে (২৮ ঃ ৫৪)।

www.pathagar.com

১১.১০ মানুষ মোহাম্মদ

কোরানে মোহাম্মদ ঘোষণা করেছেন– 'সত্যি, আমি তোমাদের মতোই একজন মানুষ (১৮ ঃ ১১০)। আমি তোমাদের অভিভাবক নই (১০ ঃ ১০৮)। তোমাদের রক্ষকও নই (১৭ ঃ ৫৬) অথবা তোমাদের ওপর খবরদারিও করতে আসিনি (৬ ঃ ১০৪)।

তিনি দাবি করেননি যে, তিনি স্বর্গের সম্পদের অধিকারী বা কোনো গুপ্ত বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞাত (৬ ঃ ৫০), কারণ কেবলমাত্র ঈশ্বরই সব গুপ্তবস্তুর চাবিকাঠি (৬ ঃ ৫৯) এবং শুধু ঈশ্বরই অদৃশ্য বস্তু সম্বন্ধে অবগত। (২৭ ঃ ৬৬)। অনেক রহস্যজনক বিষয় সম্বন্ধে তাকে জানানো হয়নি। তিনি জানেন না কখন সেই বিচারের সময় উপস্থিত হবে কারণ শুধু ঈশ্বরই তা জানেন (৭ ঃ ১৮৬) অথবা আমার জানা নেই তোমাদের কী হবে বা আমার কী হবে (৪৬ ঃ ৮)।

তিনি কখনো অলৌকিক কর্ম (মোজেজা) দেখাতে পারার দাবি করেননি। যারা তাঁর কাছে অস্বাভাবিক কিছু দেখানোর জন্য জেদ করেছিল, তাদের তিনি বলেছেন যে, অলৌকিক কিছু করার ক্ষমতা একমাত্র ঈশ্বরেরই আছে (২৯ ঃ ৪৯)। একমাত্র কোরানই অলৌকিক, যা পাঠানো হয়েছে (২৯ ঃ ৫০)। কোরান সেই অলৌকিককতার চিহ্ন যদি একটা পর্বতের ওপর পতিত হতো, তাহলে পর্বত ভেঙে খান খান হয়ে যেত (৫৯ ঃ ২১)।

একটি পুরনো ট্র্যাডিশন অনুযায়ী, একবার মক্কাবাসীরা দাবি করল যে, আহাম্মদ তার ঐশী মিশন প্রমাণ করার জন্য পর্বতকে সরিয়ে আনবে। জবাবে তিনি বলেন যে একমাত্র ঈশ্বরেরই ক্ষমতা আছে তা করার, কারণ ইসরাইলদের আইন পুস্তক দেয়ার সময় তিনি সিনাই পবর্তকে উত্তোলন করেছিলেন (২ ঃ ৬০); তবুও যদি অবতীর্ণ হয়ে পর্বতকে নড়াতে পারত তাহলেও কাজ হতো না (১৩ ঃ ৩০)। তারপর সাফা পর্বতের দিকে ফিরে মোহাম্মদ আদেশ করলেন তার কাছে আসতে, যখন কোনো কাজ হলো না, তখন তিনি উচ্চারণ করলেন আল্লাহর দয়া, যদি পর্বত আসত তাহলে ভূমিকম্প হতো অথবা আমাদের ওপর পতিত হয়ে সব ধ্বংস করে দিত। আমি বরং পর্বতের কাছে গিয়ে আল্লাহর করুণার জন্য ধন্যবাদ দিয়ে আসি। যদিও মুসলিম মোল্লারা বলেন যে, তাঁর প্রথম ঐশীডাকের পর মোহাম্মদ নিষ্পাপ ছিলেন, কিন্তু কোরান ও হাদিস অন্য কাহিনী বলে, কেউ পাপ বা অপরাধমুক্ত নয় এবং যদি ঈশ্বর মানুষের প্রতি অপরাধের জন্য শাস্তি দিতেন তাহলে পৃথিবীতে কোনো প্রাণীই বেঁচে থাকত না (৩৫ ঃ ৪৫)।

মোহাম্মদও নিষ্পাপ ছিলেন না, কারণ কোরান বলছে, ঈশ্বর তার পূর্বের ও পরবর্তীতে কৃত পাপগুলো ক্ষমা করে দিয়েছেন। (৪৮ ঃ ২)। তার পূর্বের ও পরের পাপগুলো কি ধরনের ছিল, এ প্রশ্ন আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। মনে করা হয় যে তাঁর পূর্বেকার পাপগুলো হতে পারে ওহি আগমনের পূর্বে পৌত্তলিকতার দায়ে পাপকর্ম এবং ওহি পাওয়ার পর তাঁর পাপকর্ম বন্ধ হয়েছিল বলে বিশ্বাস করা হয়। যেমন কোরান বলেছে, 'তোমাকে কি আমরা ভুল করতে দেখিনি এবং তোমাকে গাইড করিনি?' (৯৩ ঃ ৭)। তবুও গাইড করার পরও মানুষ পাপ করেছে এবং পরের পাপগুলো হয়তো যে কোনো অপকর্ম, অজানা ও অলিখিত তিনি হয়তো করেছেন যার জন্য তিনি অপরাধ বোধ করেন।

www.pathagar.com

মানুষ হিসাবে তাঁর ভুলের জন্য মোহাম্মদ অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। অসংখ্য হাদিসে তিনি তাঁর ভুলের জন্য ক্ষমা চেয়েছেন বলে কথিত, "হে প্রভু, আমার অনুতাপ মঞ্জুর করো। আমার অপরাধ (হাওবাতি) ধুয়েমুছে দাও এবং আমার অন্তর থেকে কুমতলব দূর করে দাও। তাঁর অন্য একটি প্রার্থনায় তিনি বলেন : 'তুমি আমার প্রভু, আমি তোমার দাস। আমি আমার পাপ স্বীকার করি। 'পাপকর্মের সচেতনতা তাঁকে সব সময়ে তাড়িত করেছে এবং একটি হাদিসে তিনি বলেছেন– আমি ঈশ্বরের ক্ষমা প্রার্থনা করি দিনে সত্তর বার (Schimmel, 1985, P. 54)।

১১.১১ চরিত্রের পরিবর্তন

অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন প্রফেটের দুটি বিপরীতমুখী ব্যক্তিত্বের দিকে। একটির প্রকাশ ঘটেছিল তার মক্কার জীবনে; অন্যটি আস্তে আস্তে প্রকাশিত হয়েছে যখন তিনি মক্কা থেকে মদিনায় সরে এলেন এবং সেখানে প্রাপ্ত রিভিলেশনের প্রকৃতির মধ্যে তা প্রমাণিত হয়েছে যার আলোচনা পূর্বে করা হয়েছে। যে সময়ের মধ্যে মদিনায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করলেন, তখন প্রফেট মোহাম্মদ বাস্তব জগতের মানুষ। তাঁর চরিত্রের এই পরিবর্তন, কয়েকজন পণ্ডিতদের মতে, সেরকম ছিল না যেমন ছিল মক্কাতে। স্যার উইলিয়াম মুইর (মৃ. ১৯০৫) এ সম্বন্ধে একটি কড়া মন্তব্য করেছেন মোহাম্মদের জীবনচরিতে। তিনি বলেছেন– 'The student of history will trace for himself how the pure and lofty aspirations of Mohammed were first tinged and then debased by half unconscious self-deception'.

এই চারিত্রিক পরিবর্তনের দুটি সম্ভাব্য কারণ দেখানো হয়েছে। প্রথমে, মদিনাতে তাঁর স্ত্রী খাদিজা ছিলেন না রাশ টেনে ধরতে এবং তাঁকে গাইড করতে। তিনি হিজরতের প্রায় দু'বছর পূর্বে মারা যান এবং তাঁর মৃত্যুর সাথে, স্প্রেংগার যেমন বলেছেন, Islam lost in purity and the Koran in dignity' –অর্থাৎ ইসলাম পবিত্রতা খুইয়েছে, কোরান মর্যাদা। আরও বলা হয়েছে যে, মোহাম্মদের ওপর যে আসর হতো, যার কোনো চিকিৎসা হয়নি; ধীরে কিন্তু গতিশীলভাবে, তাঁর মানসিক অবস্থাকে বিপর্যস্ত করেছে যা ক্রমে ক্রমে চরম পর্যায়ে পৌছেছিল মদিনায় বাকি দশ বছরের জীবনে।

খাদিজার জীবদ্দশায় মোহাম্মদ মনোগামী ছিলেন– বলা যায় বাধ্য ছিলেন; কিন্তু খাদিজার মৃত্যুর পরপরই তিনি বহুগামী হয়ে গেলেন, এমনকি বালিকা গমনেও তাঁর বাধেনি। মদিনা গমনের পর তাঁর শনৈ শনৈ নারী প্রবণতা আলোচ্য বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। একই সময়ে তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষা আকাশ ছোঁয়া গতি লাভ করে। এখন তিনি জাগতিক সাফল্যের দিকে যত্নবান হয়ে রাজনীতিকভাবে সুযোগ-সন্ধানী হয়ে ওঠেন। তাঁর ব্যক্তিগত আচরণ ও ধর্মীয় শিক্ষার গুণগত মান হ্রাস পায় সমাজে, প্রভাব-প্রতিপত্তি বাড়ার সাথে।

মক্কাতে মোহাম্মদ ছিলেন অত্যাচারিত সংস্কারক, আর জাগতিক ক্ষমতা ছিল শূন্য, কিন্তু মদিনায় এসে তিনি হলেন রাজনীতিবিদ ও প্রশাসক, সেনাপতি এবং যুদ্ধবাজ, বিচারক এবং আইন প্রণয়নকারী, গোত্র শাসক এবং রাজকুমার, সার্বভৌম

www.pathagar.com

সম্রাট এবং জনগণের অধিকর্তা (Patriarch)। অপ্রতিদ্বন্দ্বী কর্তৃত্ব লাভ করে তিনি সম্পূর্ণরূপে একটি নতুন স্ট্যাটাস লাভ করলেন এবং ব্যক্তি, গোত্র এমনকি সম্পূর্ণ জাতির দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হয়ে গেলেন অর্থাৎ মানুষের জীবন ও মৃত্যুর ক্ষমতা তার হাতে এসে গেল। তার এই একচ্ছত্র ক্ষমতার যথেচ্ছ ব্যবহারের মুখে কারোর বাধা দেবার শক্তি থাকল না।

তিনি সহিষ্ণুতা থেকে ধর্মান্ধতায় সরে এলেন। একজন শান্তিবাহক যিনি তাঁর প্রতিপক্ষের প্রতি সদাচরণ করতেন, তিনি অসহিষ্ণু ও স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠলেন এবং প্রতিপক্ষের প্রতি প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে ওঠেন। ইহুদি ও খ্রিস্টানরা তাঁর নবুয়তকে (Prophethood) অস্বীকার করার তিক্ততাকে পুনর্জীবিত করে তাদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। মক্কাবাসীদের দুরাচরণ তিনি ভুলতে পারেননি, তাই তিনি দলবল নিয়ে মক্কার ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের শান্তিপূর্ণ ক্যারাভান আক্রমণ করে সম্পদ ও পণ্যদ্রব্য লুটপাট করেন। যারা তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করেছিল বা উপহাস করেছিল তাদের বিরুদ্ধে গুপ্তঘাতক নিয়োগ করে হত্যা করার নির্দেশ দেন। তিনি বেশ কয়েকটি সামরিক অভিযান পরিচালনা করেন এবং বিধর্মীদের গণহত্যার আদেশ দেন এবং ইসলাম প্রচারের জন্য যুদ্ধাভিযান প্রেরণ করেন।

মোহাম্মদ একবার বলেছিলেন যে 'ঈশ্বর মানুষকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছেন যাতে তারা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পারে (৪৯ ঃ ১৩) এবং ঈশ্বরের কর্মের মধ্যে একটি হচ্ছে যে, তিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষের মধ্যে ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র্য (৩০ ঃ ২১)। এখন, মদিনাতে আরবিকে আল্লাহ ও ফেরেশতাদের ভাষা বলে স্বীকৃতি দেয়া হলো। তখনই বলা হলো যে হাসরের দিনে পাপীদের মুখ কালো হয়ে যাবে এবং বিশ্বাসীদের মুখ ধবধবে সাদা হবে (৩ ঃ ১০২)। তখন থেকেই আরবরা জাতি হিসাবে অন্য জাতির চেয়ে উৎকৃষ্ট ও শ্রেষ্ঠ জাতি বলে চিহ্নিত হলো (৩ ঃ ১০৬)।

মোহাম্মদের জীবনের শেষের দিকে তাঁর কিছু আগ্রহশীল (zealous) অনুসারী তাঁকে অতি-মানব হিসাবে প্রায় দেবতার মর্যাদায় ভূষিত করল (Glubb, 1979, P. 268)। তাঁর সাথে জড়িত সব কিছুকেই ঈশ্বরের আশীর্বাদপ্রাপ্ত (বারাকা) বলে গণ্য হলো। কেউ কেউ তাঁর গুণগান করতে শুরু করল। ইবন ইসহাক লিখেছেন, যখন মোহাম্মদ থুথু ফেলতেন, তার সাহাবীরা ছুটে গিয়ে তা মুছে নিত এবং গায়ে মাখত (Andrae, 1960, P. 158)। তাঁর সান্নিধ্য পাওয়া কিছু মহিলা প্রফেটের গায়ের ঘাম মুছে নিয়ে পারফিউম হিসাবে ব্যবহার করত। আয়েশাকে বলা হয়েছিল যে, প্রফেট বাহ্য করলে পরিত্যক্ত মল (excrement) মাটি গিলে ফেলত বলে দেখা যেত না।

মোহাম্মদের ধারণা ছিল যে তিনি সকল প্রফেটের চেয়ে উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন এবং তাঁর রিভিলেশন যে অসাধারণ এবং ঈশ্বরের বিশেষ অনুগ্রহপুষ্ট এই দাবি, তাঁর ইন্তেকালের পর তাঁর অনুসারীরা ব্যাপকভাবে প্রচার করে। অন্যান্য ধর্মের সাধু ও সৎব্যক্তিদের ক্ষেত্রে যেমন হয়েছে, তেমনি মোহাম্মদের সাথে জড়িত বস্তু ও স্থান তাঁর মৃত্যুর পর পবিত্রতা লাভ করে। যে সমস্ত স্থানে তিনি গিয়েছিলেন, সেসব স্থান মাজারে পরিণত হয়েছে এবং সেখানে প্রার্থনা করা হয়। যেসব পাথর ও বালুতে তাঁর পদস্পর্শ হয়েছে সেসব সংগ্রহ করে জাদুটোনা করা হয়। তাঁর স্মারক

www.pathagar.com

বস্তুগুলো (relics)কে সংরক্ষিত করা হয়েছে, তাঁর স্যান্ডেল, গায়ের জামা, দাড়ি ও চুলের গুচ্ছ, দাঁত ও নখ এগুলোও সংরক্ষিত।

মোহাম্মদের শারীরিক কাঠামো এবং অবয়ব বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হয়েছে হাদিসে ও পারস্যে, তুরস্কে এবং সিরিয়ার কিছু অঞ্চলে, মিসরে, উত্তর আফ্রিকায়। এসব দেশে প্রফেটের মুখের পেন্টিংও চিত্রিত পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়। তার মুখমণ্ডল শ্মশ্রুমণ্ডিত, তীক্ষ্ণ এক জোড়া চোখ, পাগড়ি ঘেরা মস্তক তার চারদিকে সূর্যচ্ছটা (Halo)। কিন্তু এই চিত্ররেখা কৃচিৎ পাওয়া যায়। কারণ পশু ও মানুষের মূর্তিগড়া নিষিদ্ধ, বিশেষ করে প্রফেটের প্রতিকৃতি অঙ্কন তাঁর মতো পবিত্র ব্যক্তির জন্য অসম্মানজনক (Sacrilegious)। সাধারণত প্রফেটের প্রতিচ্ছবি অঙ্কিত হয়ে তাঁকে দেখানো হয় ঘোমটাবৃত বা তাঁর মুখটা ফাঁকা রেখে। এটা মনে করা হয় যে, কোনো ছবি সম্ভবত তাঁর মুখের সৌন্দর্য দেখাতে পারে না। তাছাড়া যে কোনো প্রতিকৃতিতে তাঁর ব্যক্তিত্ব ও ক্ষমতার প্রতিফলন সম্ভবপর নয়।

মোহাম্মদের নাম অতি শ্রদ্ধা ও ভক্তির সাথে স্মরণ করা হয়। তাঁর নামের পর 'সাল্লাল্লাহি আল্লাহিস সাল্লাম' বা সংক্ষেপে 'সাঃ' ছাড়া উচ্চারণ করা বা লেখা ধর্মীয়ভাবে নিষিদ্ধ (toboo)। অন্যান্য প্রফেটদের নাম ফরমুলা ছাড়া উচ্চারণ করা যায়, যদিও সময় সময় ছোট ফর্মুলা, 'আলাহিস সাল্লাম' বা (আঃ) ব্যবহার করা যায়।

মোহাম্মদের ব্যক্তিত্ব ক্ষুণ্ন হয় এমন কোনো শব্দ উচ্চারণ করা যাবে না। সম্মান না প্রদর্শন করে তাঁর সম্বন্ধে কিছু বলা অপরাধ বলে গণ্য। তাঁর সমালোচনা করা বা সম্মানহানি করা ঈশ্বর অবমাননার চেয়েও গুরুতর অপরাধ। ভারতীয় কবি মোহাম্মদ ইকবাল (মৃ. ১৯৩৮) বলেছেন– তুমি ঈশ্বরকে অস্বীকার করতে পার, কিন্তু মোহাম্মদকে অস্বীকার করতে পার না। মুসলিম বিশ্বের কিছু অংশে বিশেষ করে ভারত উপমহাদেশে ঈশ্বরের সমালোচনা বা তাঁর প্রতি কটুকাটব্যে কেউ প্রতিবাদ করবে না, কিন্তু মোহাম্মদের সমালোচনা করতে গেলে তার জীবন বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা আছে।

১১.১২ সিল অব দ্য প্রফেট

মক্কার প্রচারক ও সাবধানকারী মদিনায় হলেন ধর্মীয় নেতা ও স্বর্গীয় কথক। সেখানে তিনি নিজের কথা এবং প্রফেটের কথা আর অন্য জাতির ধর্মপুস্তকের মাঝে কোনো পার্থক্য রাখলেন না, তিনি এখন আগের সব রিভিলেশনস ও ঐশী বাণীগুলোকে অসম্পূর্ণ ও ভুল বলে দাবি তুললেন এবং তার মাধ্যমে প্রেরিত ইসলাম একমাত্র পরিপূর্ণ ধর্ম এবং প্রত্যেক ধর্মের ওপর জয়যুক্ত করেছেন (৪৮ ঃ ২৮)।

মোহাম্মদ তাঁর আগের সকল প্রফেটগণ কেবলমাত্র তাঁর অগ্রদূত। পূর্বে যেসব প্রফেটের কাছে ঐশীবাণী এসেছিল তাঁদের চেয়ে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বশেষ। তিনি প্রফেটদের মোহর স্বরূপ। তার সাথেই প্রফেট আগমনের ধারা বন্ধ হয়ে গেছে, প্রফেসির দরজাও বন্ধ হয়ে গেছে এবং প্রফেসির জিহ্বা স্তব্ধ হয়ে গেছে।

মক্কার সূরাগুলোতে আল্লাহই সর্বশক্তিমান, তিনি ছাড়া অন্য কেউ নেই। একমাত্র তাঁকেই মান্য করতে হবে। অন্য দিকে মদিনার সূরাগুলোতে জোর দিয়ে বলা হয়েছে মোহাম্মদ হচ্ছেন নতুন সম্প্রদায়ের নেতা এবং নতুন ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা। সংবাদবাহক

www.pathagar.com

মোহাম্মদ যে সংবাদ তিনি গ্রহণ করার জন্য ঈশ্বর কর্তৃক নির্বাচিত হয়েছিলেন, সেই ঐশীবাণীর মতোই তিনি গুরুত্বপ্রাপ্ত হলেন এবং যে আল্লাহর কাছ থেকে সংবাদ আসত প্রায় সেই আল্লাহর মতো হয়ে গেলেন। মোহরে এবং তাবিজে আল্লাহর নামের সাথে মোহাম্মদেরও নাম জুড়ে যুগলবন্দি হয়ে গেল।

আল্লাহর নামের সাথে মোহাম্মদের নাম একদমে উচ্চারিত হতে শুরু করল এবং আল্লাহর সাথে তাঁর প্রফেটের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা কর্তব্য হয়ে গেল। একটি হাদিসে মোহাম্মদ বলেছেন– 'যে আমাকে বিশ্বাস করে না, সে আল্লাহকেও বিশ্বাস করে না' (Kazi and Flynn, 1984, P. 123)। এখন যেহেতু মোহাম্মদ আল্লাহর কর্তৃত্বপ্রাপ্ত সুতরাং আনুগত্য তাঁরই প্রাপ্য। যেমন, কোরান বলেছে– 'যে প্রফেটকে মান্য করে, সে আল্লাহকেও মান্য করে' (৪ ঃ ৮২)।

কোরানের একটি সূরার আয়াতে আছে– 'আল্লাহ ছাড়া কোনো ঈশ্বর নেই' (There is no God but Allah) - ৪৭ ঃ ২১। এই সবল ও দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা ইসলামের নির্যাস (essence) কোরানের চূড়ান্ত সূরার মধ্যে দেখা যায়– 'মোহাম্মদ আল্লাহর রসূল (Apostle) (৪৮ ঃ ২৯)। এই দুই পৃথক আয়াত, যা কোরানের কোথাও একত্রে নেই, একসঙ্গে জুড়ে দিয়ে মুসলিমদের কলেমা তৈরি করা হয়েছে– যা উচ্চারিত না করলে মুসলিম হওয়া যায় না। এই ফর্মুলাকে কলেমা শাহাদাত বলা হয় এবং একজন মুসলিমকে সারা জীবন ধরে বাধ্যতামূলকভাবে এই কলেমা পড়তে হয়। এই কলেমা ইসলাম ধর্মের পাঁচটি মৌলিক নীতির একটি। এই কলেমা এখন পড়তে দরকার হয় এই সত্যতাকে প্রতিষ্ঠা করতে, যে এক আল্লাহ এবং মোহাম্মদ তাঁর প্রেরিত পুরুষ এবং একমাত্র আরব্রিট্রেটর ইহজগত ও পরজগতের সব কিছুর জন্য।

মোহাম্মদের চিরশত্রু আবু সুফিয়ান এই কলেমার দ্বিতীয় অংশটুকু অগ্রাহ্য করেছিলেন। তিনি এই অংশ কোনো দিন উচ্চারণ করেন, কিন্তু মোহাম্মদের মক্কা বিজয়ের পর অনিচ্ছা সত্ত্বে বাধ্য হয়ে করেছিলেন। অনেক রহস্যবাদী আছেন যারা কলেমার প্রথম অংশটি পাঠ করেন। দ্বিতীয় অংশটি বাদ দিয়ে থাকেন।

আজান দেয়ার ব্যাপারে অনুরূপ ঘটনা ঘটেছে। প্রথমে এটা শুধুমাত্র মৌখিকভাবে চিৎকার করে ডাক দিয়ে যাওয়া হতো– গণপ্রার্থনায় এসো। আল্লাহ মহান। আল্লাহ ছাড়া কোনো ঈশ্বর নেই। তারপর একজন আগ্রহশীল (zealous) অনুসারী স্বপ্নে আদিষ্ট হয়ে মোহাম্মদের নাম আল্লাহর সাথে জুড়ে দেয়ার প্রস্তাব দিলে মোহাম্মদ নিজের নাম জুড়ে দিতে অনুমোদন দেন। তারপর 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহ' পরে 'মোহাম্মদুর রাসূল্লাহ' জুড়ে ফর্মুলা তৈরি করা হয়।

মুসলিমগণ যারা আজানের সাথে আল্লাহর নামের পরে মোহাম্মদের নাম জুড়ে দেয়ার জন্য আপত্তি তোলেন, তারা এ নাম জোড়ার জন্য অনুমোদন দেননি (Schimmel, 1975, P. 214)। তাঁরা মনে করেছিলেন এটা ইসলামের স্পিরিটের পরিপন্থী এবং এক ধরনের শিরকের অপরাধ যা মোহাম্মদ নিজেই প্রায়ই নিরুৎসাহিত করতেন।

১১.১৩ মোহাম্মদের পাপহীনতা

মোহাম্মদের ধর্মীয় পদ্ধতির (Cult) উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় ছিল যে একদল অতি

www.pathagar.com

উৎসাহী মুসলিমদের ধারণা জন্মেছিল যে মোহাম্মদের আচরণ ক্রটিহীন এবং সাধারণ মানুষের মনে যে অশুভ ইচ্ছা থাকে এবং নৈতিক অবক্ষয় ঘটে, মোহাম্মদ সেসব ক্রটি থেকে মুক্ত ছিলেন। তিনি ছিলেন অভ্রান্ত এবং পাপহীন (ইস্‌মা)।

কথিত আছে যে, মোহাম্মদ যখন শিশু ছিলেন তখন জিব্রাইল তাঁর ঘুমন্ত অবস্থায় দেহ থেকে অন্তঃকরণ বের করে, আদমের আদি পাপের কারণে মানুষের অন্তরে যে আদি পাপের কালো রক্ত জমা থাকে তা নিংড়ে বের করে দেন। তারপর সেই অন্তঃকরণ (হার্ট) আবার যথাস্থানে লাগিয়ে দেন।

পরে মোহাম্মদকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন যে, তিনি যখন শিশু ছিলেন তখন দু'জন সাদা পোশাকধারী তাঁর সম্মুখে হাজির হয় তারপর মাটিতে ফেলে তাঁর বুক ও পেট চিরে ফেলে গলা থেকে নাভি পর্যন্ত; তারপর তাঁর হৃদযন্ত্র (হার্ট) বের করে ভালো করে ধুয়ে আবার যথাস্থানে লাগিয়ে দেয়। অন্য একটি বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, যখন তিনি চার বছরের শিশু তখন হাঁটতে গিয়ে মাটিতে পড়ে যান। আর একটি ভার্সানে আছে এই সিনাচাকের ব্যাপারটি ঘটে যখন তিনি বয়স্ক মানুষ এবং কাবাতে প্রার্থনারত ছিলেন।

কিছু মোল্লা শ্রেণীর ব্যক্তি এই ঘটনার সূত্র কোরানে খুঁজে পেয়েছেন– 'আমরা কি তোমার অন্তঃকরণ উন্মুক্ত করি নাই এবং তোমার ভারমুক্ত করি নাই' (৯৪ : ১)। 'তোমার ভার' এই শব্দের অর্থ– অর্থাৎ 'উইজকারা'-র অর্থ অনেক পণ্ডিত মিলে করেছেন 'তোমার পাপ' বলে, সিনাচাক করে হৃৎপিণ্ড পরিষ্কার নয় (Birkeland, 1956, P. 41)।

মোহাম্মদের জীবদ্দশায় তাঁর পাপহীনতাকে সম্ভবত পুরোপুরি রূপ দেয়া যায়নি, কারণ মক্কাবাসীরা এবং তাঁর বেশির ভাগ অনুসারীরা এই ধারণাকে উপহাস ও বিদ্রূপ করেছে; কিন্তু এখন এই ধারণা বলতে গেলে সর্বজনীন, কিছু যুক্তবাদী মুসলিম ছাড়া।

১১.১৪ মোহাম্মদের মোজেজা (মিরাকল)

মোহাম্মদ তাঁর জীবনের বাইশ বছর ধরে স্বর্গীয়ভাবে ফেরেশতা ও দেবদূত সান্নিধ্য লাভ করেছেন, তাই তাঁর অনুসারীরা তাঁকে অলৌকিক কর্মকাণ্ডের আধার বলে মনে করত। তাঁর বংশধরদের মধ্যে কথিত আছে, কয়েক জনের দেহে এমন বিশিষ্ট চিহ্ন ছিল যাতে এই নির্দেশ করত যে তাঁদের বংশে একজন মহান প্রফেটের আগমন হবে। বলা হয়, তাঁর মাতা আমিনার কাছে দেবদূত এসে বলেছিল– 'আমিনা, তুমি তোমার গর্ভে আরব জাতির এক প্রভুকে বহন করছ।' আমিনা প্রফেটকে জন্ম দেবার সময় কোনো ব্যথা অনুভব করেননি এবং তার শিশুর জন্ম থেকেই খাৎনা করা ছিল।

তিনি তাঁর পিঠে একটি 'মোহর' চিহ্ন বহন করতেন যা দেখে সাধু বাহিরা তাকে প্রফেটদের মধ্যে বিশিষ্ট মর্যাদা দিয়েছিলেন। যখন হেরা পর্বতে প্রথম ওহি আসার সময় হলো, পবর্ত, পাথর, বৃক্ষ ইত্যাদি তাঁকে আল্লাহর রসূল বলে অভিনন্দন জানায় এবং একটি ষাঁড় ও গাধা তাঁর মহান গন্তব্য সম্বন্ধে সাক্ষ্য দেয় মানুষের মতো কথা বলে। তিনি দেবদূতের সাথে কথাবার্তা বলেন এবং কোরানে আছে যে তিনি কিছু

www.pathagar.com

জিনকে ধর্মান্তরিত করেন (৭২ ঃ ১)।

হিজরতের কিছু পূর্বে তিনি অলৌকিকভাবে মক্কা থেকে জেরুজালেমে যান এবং ফিরে আসেন। বদরের যুদ্ধে স্বর্গ থেকে তিন হাজার ফেরেশতা পাঠানো হয়েছিল তাঁকে সাহায্য করার জন্য। তিনি একটুকরো মাংস ও কয়েকটি বার্লি রুটি দিয়ে অসংখ্য মানুষকে খাইয়েছিলেন। তিনি অলৌকিকভাবে রোগীদের আরোগ্য করে দিতেন এবং ভূতে পাওয়া একটি বালককে সুস্থ করেন। যিশুর যেসব মোজেজার কথা গসপেলে এবং অস্বীকৃত কিতাবে উল্লেখ আছে তার অনেক কিছুই তিনি নিজে দেখিয়েছেন এবং সেসব ঘটনার কথা হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে।

যিশু পানির উপর দিয়ে হেঁটেছেন এবং তাঁর শিষ্যদের বলেছেন যে বিশ্বাস থাকলে তারাও পর্বতকে টলাতে পারে (মথি. ১৭ ঃ ২০)। মোহাম্মদও তাঁর শিষ্যদের বলেছেন, 'যদি জানার মতো আল্লাহকে জানতে পার তাহলে তোমরা সাগরের উপর দিয়ে হেঁটে যেতে পার এবং তোমাদের আদেশে পর্বতও নড়ে যেতে পারে।' এই বক্তব্য থেকে অনুমান করা হয়েছে যে মোহাম্মদ নিজেও এই সব গুহ্য শক্তির অধিকারী ছিলেন। যদিও একটি ঘটনায় দেখা গেছে যে মোহাম্মদ সামা পর্বতকে নড়াতে পারেননি যখন তাঁকে তা করে দেখাতে বলা হয়েছিল, তবুও বিশ্বাস করা হয় যে তিনি সে ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন।

অন্য একটি হাদিসের মতে, যখন অবিশ্বাসীরা তাঁকে মোজেজা দেখাতে বলল, তিনি চাঁদকে দ্বিখণ্ডিত করেন অঙ্গুলী হেলনের দ্বারা এবং পরে আবার খণ্ডিত চন্দ্রকে জুড়ে দেন। এই কাহিনীকে কোরানে দেখানো হয়েছে একটি আয়াতে– 'চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হইল' (৫৪ ঃ ১)। তারপরে বলা হয়েছে যেন সত্যায়িত করা হচ্ছে– যখন মানুষে মোজেজা দেখে তারা বলে– 'এ তো চিরাচরিত জাদু'।

১১.১৫ অবতার মোহাম্মদ

প্রফেট মোহাম্মদ অতিমানব ছিলেন, তাঁর কোনো মানবীয় দোষ-ত্রুটি ছিল না। অভ্রান্ত ও ঈশ্বরের অবতার ছিলেন– এই সব ধারণা ও রহস্যবাদ প্রচারিত করেছে তাঁর অনুসারীরা প্রফেটের মৃত্যুর কিছুদিন পরে। একবার এই রহস্যবাদ শুরু হলে আর থেমে থাকেনি, উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে।

এই মতবাদ উন্নয়নে খ্রিস্টবাদের প্রভাব অনস্বীকার্য। ধর্মবেত্তা ইবন তাই মিয়া (মৃ. ১৩২৮) মুসলিম পণ্ডিতদের একজন, যিনি স্বীকার করেছেন যে জনপ্রিয় মুসলিম রহস্যবাদিতার অনেক সূত্রই খ্রিস্টান প্রথা ও চিন্তাধারায় প্রভাবিত। প্রফেটের চিত্র চিত্রণের ধারণায় উদ্দেশ্য ছিল যে– 'সে ছবি যেন যিশুর ছবির চেয়ে কোনো অংশে অসুন্দর না হয়' (Golziher, 1971 P. 346)।

খ্রিস্টানিটিতে যিশুর যে ব্যক্তিত্বের প্রভাব, মোহাম্মদবাদে (Mohammadanism) প্রফেট মোহাম্মদ-এর ব্যক্তিত্ব তেমনি কেন্দ্রীভূত। যিশুর মতোই প্রফেট ক্রমে ক্রমে জ্ঞানের মহিমায় সমুন্নত (cf I Cor I : 24); সব জান্তা, পাপহীন ও খাঁটি (১ জন ৩ ঃ ৩); অলৌকিক কর্মে দক্ষ, অতিমানব, ঈশ্বরের সাথে বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত এবং সর্বশেষে সর্বশক্তিমানের মতো ব্রহ্মাণ্ডের অতীত (Transcendent)। প্রফেসর

www.pathagar.com

কামরুদ্দিন খানের মতে জনপ্রিয় ইসলামিক চিন্তাধারায় গভীর প্রবণতা রয়েছে যে প্রফেটকে 'ঈশ্বরের অবতাররূপে চিহ্নিত করা, যাতে তাঁর ওপর যিশুর চেয়ে অধিক স্বর্গীয় সত্তারোপ করা যায় (Schimmel, 1985, P. 311), প্রফেসর স্বয়ং এই প্রবণতার পরিতাপ (deplore) করেছেন।

এই ধরনের ইসলামিক ধারণাকে অন্যান্য পণ্ডিত ব্যক্তিদের দ্বারা বাতিল হয়েছে এবং তারা জোরেশোরে এই ঈশ্বরদ্রোহী অধর্মের প্রতিবাদ করেছেন।

অ্যানমেরি শিমেল (Annemarie Schimmel) তাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ কর্মে ইসলামী তাকওয়ার বিবর্তন সম্বন্ধে অনেক তথ্যের অবতারণা করেছেন। এই তথ্যগুলো তিনি সংগ্রহ করেছেন ইসলামী বিশ্বের বিভিন্ন ভাষার মূল উৎস থেকে যেসব উৎসের রচয়িতা হলেন ধর্মবেত্তা, রহস্যবাদী ব্যক্তি, দার্শনিক ও কবি। যদিও প্রফেট মোহাম্মদের সঠিক জন্মতারিখ জানা যায়নি, তবুও একটা তারিখ করে, একাদশ শতাব্দি থেকে তাঁর জন্মদিন (মৌলুদ) পালন করা শুরু হয়েছে; সময় সময় সঙ্গীত, নৃত্য, ব্যানারসহ মোমবাতি জ্বালিয়ে শোভাযাত্রা করে। ১৭১৪ খ্রিস্টাব্দে ওসমানী সাম্রাজ্য থেকে আদেশ জারি করে কাবাঘরেও প্রফেটের জন্মদিন পালন করার নির্দেশ দেয়া হয়।

খ্রিস্টান ক্যারল (গান) অনুযায়ী কবিতা রচনা করে প্রফেটের সম্মানে গুণগান (না'ত) করা হয়, যেমন যিশুর উদ্দেশ্যে প্রার্থনা-গীত (hymn) গাওয়া হয়। অধুনা কিছু কিছু মুসলিম এই উৎসবকে খ্রিস্টানদের যিশু বন্দনার অনুকরণ বলে মনে করেন (Schimmel, 1985, P. 146)। কোরান বলে ঈশ্বর যিশুকে মানব জাতির দয়ার প্রতীক রূপে প্রেরণ করেছেন (১৯ ঃ ২১)। তেমনি আল্লাহ জগতের সকল প্রাণীদের দয়ার প্রতীকরূপে পাঠিয়েছেন (২১ ঃ ১০৭); ঈশ্বর দয়াময় এবং প্রফেট রহমান নামের মূর্ত প্রকাশ।

রহস্যবাদীরা মোহাম্মদ নামের মধ্যে যেসব গুপ্ত অর্থ নিহিত ছিল তার উদ্‌ঘাটন করেছেন। এই জন্য প্রফেটকে 'আহমদ' নামে উল্লেখ করা হয়েছে অর্থাৎ 'প্রশংসিত' (৬১ ঃ ৬) এবং এক হাদিস অনুযায়ী, প্রফেট যেন বলেছেন, "আমি আহমদ তবে 'ম' অক্ষর বাদে।" অতএব তিনি 'আহ্‌দ' অর্থাৎ 'এক'। আর এই 'এক' ঈশ্বরের টাইটেল। আবার 'ম' অক্ষর যেহেতু 'মরণ'-এর প্রথম অক্ষর (মউত), এই 'ম' অক্ষর বাদ দিলে তিনি অমরত্ব লাভ করছেন– অর্থাৎ তিনি মরণশীল নন। প্রফেট আরও ঘোষণা দেন যে, "আমি একজন 'আরব', তবে 'আ' বাদে। সুতরাং তিনি 'রব' অর্থাৎ তিনিই 'প্রভু' যা ঈশ্বরের এক নাম। সুতরাং দেখা যাচ্ছে রহস্যবাদীরা মোহাম্মদের ওপর ঈশ্বরত্ব আরোপ করে, ঈশ্বরের ৯৯ নামের মধ্যে কিছু নাম তাঁকে দিয়ে ঈশ্বরের সমপর্যায়ভুক্ত করা হয়েছে। (Danner, 1988, P. 248)। বলা হয় যে, মরণশীল প্রাণী ঈশ্বরের নৈকট্য লাভ করতে পারে না। কিন্তু মোহাম্মদ ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করতে পারেন। একমাত্র তাঁর মাধ্যমে ঐশ্বরিক জ্ঞান ও স্বর্গীয় দয়া লাভ করা যায়। মোহাম্মদের মধ্যে স্বর্গীয় শক্তি সংযুক্ত এবং তাঁর মাধ্যমে স্বর্গীয় বিধান প্রকাশ পায়। কোনো পণ্ডিত বা পুরোহিত, ধর্মবেত্তা বা সাধু প্রফেটের সাহায্য ছাড়া কিছু করতে পারেন না।

মোহাম্মদের উপস্থিতিতে মুসার সামনে আগুন জ্বলেছে; তাঁর নাম নিয়ে সলেমন জ্বিন বশ করতেন, তার ওষ্ঠদ্বয় যিশুকে মৃত ব্যক্তি বাঁচাতে শিখিয়েছে। 'সত্যিই'

www.pathagar.com

(আরবি : ইন্না = নিশ্চয়ই) কোরান বলছে, "আল্লাহ ও ফেরেশতারা প্রফেটকে আশীর্বাদ করে (৩৩ ঃ ৫৬) মোহাম্মদ আল্লাহর প্রিয়জন। মানুষে আল্লাহর নামে শপথ নেয়, কিন্তু আল্লাহ নিজেই প্রফেটের নামে শপথ নেন– যেমন আল্লাহ যখন বলেন– লাউমরিক অর্থাৎ 'তোমার জীবনের শপথ' (১৫ ঃ ৭২)।

মোহাম্মদকে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করার জন্য খোলা অনুমতি দেয়া হয়েছে এবং আত্মাদের স্বর্গে প্রবেশ করানোর ক্ষমতা তাঁর হাতে ন্যস্ত করা হয়েছে। বাইবেলে যিশু বলেছেন তাঁর শিষ্যদের কাছে– 'আমি তোমাদের স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করার চাবি দেব' (মথি. ১৬ ঃ ১৯)। কোরান বলছে– স্বর্গ ও মর্ত্যের চাবি আল্লাহর হাতে (৩৯ ঃ ৬৩), এবং এই সব চাবি, রহস্যবাদীরা বলেন– 'মোহাম্মদের কাছে অর্পিত হয়েছে। কোরানে চাবির জন্য সিরিয়াক শব্দ 'মিকালিদ' ব্যবহার করা হয়েছে, যা গ্রিক শব্দ 'ক্লেইস' (kleis) থেকে আগত; ঐ একই শব্দ বাইবেলে ব্যবহৃত হয়েছে (Jefery 1938, P. 269)।

প্রফেটের নিত্যতা-তত্ত্বও (doctrine of eternality) তাঁর ধর্মীয়তত্ত্বের অংশ বিশেষ। বলা হয় যে, মোহাম্মদ তাঁর জন্মের পূর্বেও বিরাজ করতেন (Beth mann, 1953, P. 40)। একটি ট্র্যাডিশন অনুযায়ী, মোহাম্মদ বলেছেন– "আদম যখন কাদার মূর্তিতে ছিলেন, তখন আমার অস্তিত্ব ছিল।' মিসরীয় কবি ও মিসটিক ইবন আল-ফরিদ (মৃ. ১২৩৫) লিখেছেন যে, মোহাম্মদ ছিলেন ঈশ্বরের প্রথম প্রকাশ (First Epiphany (manifestation) of the Godhead. (Arberry, 1964, P. 63)। মোহাম্মদের মাধ্যমে ঈশ্বর তাঁর অনন্ত শূন্যতার মধ্য থেকে প্রপঞ্চে বের হয়ে এসেছেন।

কোনো কোনো গোষ্ঠীর (Sect) মধ্যে এই ধারণা জন্মেছে যে স্বর্গীয়ভাবে অবতীর্ণ হয়ে (হুলুল) আল্লাহ মোহাম্মদের রূপ ধরেছেন এবং তাঁর মাধ্যমে কথা বলেছেন, কাজও করেছেন। মোহাম্মদের প্রাক-অস্তিত্বের আকার ঐশী শব্দে (কালাম) মিশে মাংসের আকার ধারণ করেছে এবং ইসলামী রহস্যবাদীদের শিক্ষার তাৎপর্য গসপেলের 'লোগোস'-এর মতো (জন. ১ ঃ ১৪) অর্থাৎ সেই বাক্যই (কালাম = Loges) মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করলেন এবং আমাদের মধ্যে বাস করলেন। ঈশ্বরের যে মহিমা, সেই মহিমা আমরা দেখেছি।

সর্বশক্তিমানের হাকিকা (বাস্তবতা), আক্ল (যুক্তি) এবং রুহ (আত্মা) মোহাম্মদের মধ্যে বাস্তব রূপ গ্রহণ করেছে। এই স্বর্গীয় ত্রি-গুণ সত্তা একটি আদর্শ ব্যক্তির মধ্যে সমন্বিত হয়ে অবতাররূপে প্রকাশিত হয়েছেন, প্রাচীন হেলেনিস্টিক ধারণায় যাকে পারফেক্ট ম্যান (ইনসান-ই-কামিল) বলা হয়। তিনিই আদিম মানব মোহাম্মদ, সুন্দর সজ্জায়-সজ্জিত (জামাল), রাজকীয় (জালাল) এবং পরিপূর্ণ (কামাল)– যার মধ্য দিয়ে আল্লাহর নূর প্রকাশিত।

যিশু বলেছেন– 'আমি পৃথিবীর আলো' (জন, ৮ ঃ ১২)। কোরানের সূরা নূর-এর আয়াত ২৪ ঃ ৩৫– "আল্লাহর জ্যোতির উপমা যেন একটি দীপাধার যার মধ্যে আছে এক প্রদীপ..." –এর ব্যাখ্যায় মিসটিক্ (রহস্যবাদীরা) বলেন যে, উল্লিখিত প্রদীপ হচ্ছে মোহাম্মদের জ্যোতি (নূর-ই-মোহাম্মদী)। মোহাম্মদ বলেছেন– "আল্লাহ যে প্রথম আলো সৃষ্টি করেন তা আমার জ্যোতি (Rodinson, 1976, P. 304) এবং সেই

www.pathagar.com

জ্যোতি থেকেই অন্য সব বস্তু এসেছে।" লোগোস সম্বন্ধে বাইবেলে বলা হয়েছে– যে সব বস্তুই সৃষ্টি করা হয়েছে তিনি ছাড়া তা সম্ভব হতো না (জন, ১ ঃ ৩); তাই, মোহাম্মদ সম্বন্ধেও বলা হয়েছে যে, তাঁর জন্যই এবং তাঁর মাধ্যমেই এই পৃথিবীর সৃষ্টি। একটি হাদিসে আল্লাহ মোহাম্মদকে বলেছেন– 'যদি তুমি না হতে (লাওলাকা), আমি এই পৃথিবী সৃষ্টি করতাম না (Schimmel, 1985, P. 131)।

মোহাম্মদের জ্যোতির মধ্যে থেকে বেরিয়ে এসেছে সবই যা কিছু উপরে আছে এবং যা কিছু নিচে। অর্থাৎ স্বর্গ, ফেরেশতা, পদার্থ, পৃথিবী, মানবজাতি, জ্বিন এবং সমস্ত প্রাণী ও বৃক্ষলতাদি। এই নির্গমনের (emanation) ধারণা (ফায়েজ) এসেছে অজ্ঞেয়বাদ এবং নিও-প্ল্যাটোনিজম থেকে। একজন মুসলিম কবি লিখেছেন যদি ঈশ্বরের কাছে পৌছতে চাও, মোহাম্মদকে ঈশ্বর বলে জানো। (Schimmel, 1985, P. 140) এবং মোহাম্মদ নিজেই বলেছেন এক হাদিসে "যে আমাকে দেখে, সে আল্লাহকে দেখে" (Hughes 1977, P. 613)। যদিও সুফি রহস্যবাদীদের লক্ষ্য স্বর্গীয় জ্যোতির সাথে মিশে যাওয়া, কিছু কিছু মিস্টিক সুফি বলেন যে, মিস্টিক্যাল অভিজ্ঞতার শেষ পর্যায় হচ্ছে নির্বাণ (ফানা) নিজের মধ্যে লয় প্রাপ্তি, ঈশ্বরের জ্যোতির মধ্যে নয়, কিন্তু মোহাম্মদের জ্যোতিতে। বাইবেল অনুযায়ী, যিশুখ্রিস্ট ঈশ্বরের সিংহাসনে বসে আমাদের জন্য সোপারেশ করবেন (রোমান ৮ : ৩৪)। কোরানে দেখা যায় যে মানব জাতির জন্য ফেরেশতারা সোপারেশ করবে। (৪২ ঃ ৩)। কিন্তু রহস্যবাদীদের বিশ্বাস যে মোহাম্মদ আল্লাহর আসনের পাশে বসে থাকবেন কারণ ঈশ্বর নিজেই তাঁকে সেখানে বসিয়েছেন। (Hughes 1977, P. 188)। সেখানে বসে মোহাম্মদ পাপী ও বিশ্বাসীদের জন্য ওকালতি করবেন, যাতে তাদের শাস্তি মওকুফ হয়। মোহাম্মদের সোপারেশ (সাফায়াত) ছাড়া, মানুষ আল্লাহর দয়া বা ক্ষমাপ্রাপ্ত হবে না।

যিশু বলেছেন, 'দেখ, আমি তোমাদের সাথে সর্বদাই রয়েছি এবং শেষ দিন পর্যন্ত *থাকব (মথি.* ২৮ ঃ ২০)। তাঁর মতোই মোহাম্মদ সব সময়েই উপস্থিত এবং লক্ষ্য করছেন (হাজির ওরা নাজির)। মোহাম্মদকে দেখা যায় কসমিক (মহাজাগতিক) শক্তিরূপে, যিনি ব্রহ্মাণ্ডের অতীত (Transcendant) এবং বিশ্বব্যাপী (Immanent)। ঈশ্বর মোহাম্মদকে অর্পণ করেছেন এই বিশেষ প্রতিনিধিত্ব করতে, তাঁর পক্ষে আদেশ দিতে। সংরক্ষণ করতে এবং শাসন করতে।

পৃথিবীর শুরু থেকেই মোহাম্মদের মিশন পূর্ব নির্দেশিত এবং শেষ সময় পর্যন্ত এই মিশন চলতে থাকবে। যিশু যেমন প্রথম ও শেষ (আলফা ও ওমেগা) Rev. 21 : 6; তেমনি মোহাম্মদও প্রথম ও শেষ (আওয়াল ও আখির)। তিনি যেমন পৃথিবী সৃষ্টির পূর্বে ছিলেন, তেমনি পৃথিবী লয় প্রাপ্তির পরও টিকে থাকবেন।

www.pathagar.com

১২

ইসলামের প্রসার

জীবনীকার আল-ওয়াকিদীর মতে, মোহাম্মদ বলেছিলেন বলে কথিত : আরবে দুটি ধর্ম থাকতে পারে না। ইসলাম ছাড়া আরব ভূমিতে আর কোনো ধর্ম থাকবে না।

প্রফেটের মৃত্যুর পূর্বে ধর্মীয় 'শুদ্ধি' অভিযানের যে প্রক্রিয়া মোহাম্মদ আরম্ভ করেছিলেন তা অধিকতর গুরুত্ব লাভ করল। ইহুদি ও খ্রিস্টানদের প্রথমেই আরব ভূমি থেকে বিতাড়িত করা হলো, তাঁর যেসব বিজিত এবং ধর্মদ্রোহী আরব গোত্র বাকি ছিল তাদেরও সাইজ করা হলো। এটা সারা হলে, ইসলামের অগ্রদূত বিদেশী রাজ্যের দিকে ধাবিত হলো। এই রাজ্য বিস্তারের প্রক্রিয়া মুসলিমরা সাফল্যজনকভাবে শেষ করেন প্রথম চার খলিফা আবু বকর, ওমর ও ওসমান এবং আলী আর উমাইয়া রাজবংশের প্রথম কয়েকজন খলিফা।

১২.১ মদিনা খালিফেট (৬৩২ – ৬৬১)

আবু বকর (৬৩২-৩৪) মোহাম্মদের উত্তরাধিকারী রূপে খলিফা নির্বাচিত হন। নির্বাচনের পর তার প্রথম উদ্দেশ্যে হলো ইসলামের পতাকাতলে আরবদের একত্র করা। আরব গোত্রের অনেকেই যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল, যখন মোহাম্মদ বেঁচে ছিলেন, তারা করেছিল যুদ্ধ-বিগ্রহের ফলে মালে-গণিমতের ভাগ পাওয়ার লোভে; আর অনেকেই ছিল যারা প্রাণের ভয়ে এবং তরবারির মুখ থেকে বাঁচতে চেয়েছিল।

আবু বকর যখন খলিফা হলেন তখন অনেক আরব গোত্র মনে করল, এখন আর ধর্মের দিক থেকে কোনো ভয় নেই এবং মোহাম্মদের সাথে যেসব চুক্তি সই হয়েছিল তার শর্ত পালন না করলেও চলবে। তাই তারা চুক্তি ও ইসলাম ধর্ম পরিত্যাগ করে তাদের পূর্ব ধর্মে ফিরে গেল। ইবন ইসহাক লিখছেন– যখন আল্লাহর রসূল মারা গেলেন অধিকাংশ মুসলিম ইসলাম পরিত্যাগ করতে মনস্থ করে, তাই অধিকাংশ মুসলিম ইসলাম ধর্ম ছেড়ে নিজের ধর্মে ফিরে গেল বা অনেকে নতুন প্রফেটরূপে নিজেদের ঘোষণা করল। অনেকে মুসলিম শাসন অমান্য করে গোত্র প্রধানের আনুগত্য গ্রহণ করল এবং কর দিতে অস্বীকার করল। আরবে চতুর্দিকে বিদ্রোহের ঝাণ্ডা উড়তে দেখা গেল, অসন্তুষ্টি ও ধর্মত্যাগের হিড়িক পড়ে গেল (আল বা ইদাবী এবং অন্যেরা ধর্মদ্রোহী গোত্রের একটি লিস্ট তৈরি করেছিলেন)।

ধর্মত্যাগীদের মধ্যে অনেকেই আদিম বেদুইন গোত্রভুক্ত দুর্ধর্ষ ও বিশৃঙ্খলধর্মী

www.pathagar.com

এবং আদিমকাল থেকেই অবিশ্বাসী ও বিশ্বাসঘাতক, হিংস্র শ্রেণীর, যাদের আবাসিক আরবরা বন্যপশুর সাথে তুলনা করত। এদের সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে এমিয়ানাস মার্সেলিনাস বলেছেন : 'আমি তাদের বন্ধু বা শত্রু বলে পেতে চাই না।' তাদের সম্বন্ধে কোরান বলছে– 'কুফরী ও কপটতায় মরুবাসীগণ কঠোরতর' (৯ ঃ ৯৮)।

এই সব দলত্যাগী বিরুদ্ধে খলিফা আবু বকর তাদের দলে ফিরিয়ে আনার জন্য কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন যাকে 'ধর্ম বিরোধী' বা রিদ্দা যুদ্ধ বলা হয়। রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর এই সব বিদ্রোহীকে দমন করা হয় এবং বিক্ষুব্ধ গোত্রদের বশে আনা হয়। এই যুদ্ধের অধিকাংশ অভিযানে খালিদ ইবন ওয়ালিদ শীর্ষ ভূমিকায় ছিলেন।

প্রফেটের জীবদ্দশায় আরবের অধিকাংশ অঞ্চল কখনো মুসলিম ধর্ম গ্রহণ করেনি তারা ছিল প্যাগন, ইহুদি বা খ্রিস্টান। এখন এদের মধ্যে অধিকাংশ ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য হলো বিশেষ করে ৬৩৪ সালে ইয়ামামার রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর। প্রফেটের রাজত্বকালেই ইহুদিদের আরব দেশ থেকে উৎখাত করা হয়েছিল। খ্রিস্টানদেরও বেশির ভাগ বিতাড়িত করা হয় এবং বাকি যারা ছিল তাদের প্রাণের বিনিময়ে ধর্মান্তরিত করা হয়। এই দমননীতির ফলে দু'বছরের মধ্যে সারা আরব ভূমি মুসলিম রাষ্ট্রে পরিণত হয় এবং প্রফেটের ইচ্ছা পূরণ হয় অর্থাৎ আরবে এক ইসলাম ধর্ম ছাড়া অন্য ধর্ম রইল না।

এই ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক ডামাডোলের সময় আবু বকরকে সময় সময় নিষ্ঠুর হতে হয়েছিল, যেমন একজন লুণ্ঠনকারী আল ফুজাকে জ্বলন্ত আগুনে পুড়িয়ে মারা হয় এবং এক ব্যর্থ প্রচেষ্টায় একজন সমকামী Sodomist হাবার ইবন আসওয়াদকে জীবন্ত দগ্ধ করে মারা হয়। ব্যর্থ প্রচেষ্টা বলা হলো এই কারণে যে এই উদাহরণের পরেও সমকামিতা আরবে বন্ধ হয়নি।

একটি বর্ণনায় বলা হয় আবু বকরের স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছিল, কিন্তু একটি হাদিসে আছে যে তিনি বিষক্রিয়ায় মারা যান সম্ভবত তাকে 'শহীদ' মর্যাদা দানের কারণে। তাকে সমাহিত করা হয়, প্রফেটের কবরের পাশে।

ওমর (৬৩৪-৪৪) দ্বিতীয় খলিফারূপে অভিষিক্ত হন। মোহাম্মদের মৃত্যুর চার বৎসর পরে বিজয়ী মুসলিম বাহিনী সাসানিয়ান সাম্রাজ্যের রাজধানী স্টেসিফোন অধিকার করেন এবং ৬৩৬ সালে কাদিশিয়ার যুদ্ধে সাসানিয়ান সাম্রাজ্যের পতন হয়। ঐ একই বছরে হেরাক্লিয়াসকে পরাজিত করে বাইজানটাইনদের কাছ থেকে প্যালেস্টাইন ও সিরিয়ার অধিকাংশ অঞ্চল দখল করে নেন।

প্রথমে ওমরের ইচ্ছা ছিল ধর্মীয় সংহতি। আরবের মুসলিম জনসংখ্যা এবং প্যালেস্টাইন বিজয়ের পর তিনি খ্রিস্টানদের সাথে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল প্যালেস্টাইন দখল করা এবং ৬৩৭ খ্রিঃ তিনি তা করেন।

জেরুজালেম বিজয়ের পর মুসলিমরা এটা প্রমাণ করতে চাইল যে তারা আব্রাহামের দুই ধর্ম–জুদাইজম ও খ্রিস্টানিটি–এই দুই ধর্মের সমতুল্য জেরুজালেম বিজয়ের পর এই স্থান তিন ধর্মের কেন্দ্র স্থান রূপে পরিগণিত (মুসলিম, ইহুদি, খ্রিস্টান) হয়। জেরুজালেম দখলের পর ওমর কিছু সময়ের জন্য তার সেনাবাহিনীকে নতুন কোনো অভিযানে প্রেরণ করলেন না, এতে মনে হলো যে, মুসলিমদের রাজ্য

www.pathagar.com

বিস্তারের ইচ্ছা আর নাই। কিন্তু বিদেশী সেনাবাহিনীর ওপর এইরূপ সহজ বিজয় মুসলিম সেনাবাহিনীকে উৎসাহিত করল আরো নতুন নতুন দেশ বিজয়ের জন্য, তাই ইরাক ও সিরিয়ার বাকি অংশটুকু দখলের পর ৬৪২ খ্রিঃ এই অঞ্চলে পারশিয়ানদের সমস্ত ভূমি দখল করে নিল। ৬৪১ খ্রিঃ আলেকজান্দ্রিয়া দখল সম্ভব হয়েছিল আমর ইবন আল-আস-এর মিসর দখলের পর। আমর ইবন আল-আস পরে মিসরের গভর্নর নিযুক্ত হন এবং ফুসতাত নগরীর পত্তন করেন যা পরবর্তীতে 'কায়রো' নামে পরিচিত।

৬৪৪ খ্রিঃ মদীনায় মসজিদে প্রার্থনা পরিচালনার সময় একজন পার্শিয়ান ক্রীতদাস আবু লালুয়া তাকে হত্যা করে। আবু লালুয়া পরে খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত হয়। ওমরের মৃত্যুতে পারস্যবাসীরা অনেক দিন ধরে উৎসব পালন করেছিল।

৩য় খলিফা ওসমান (৬৪৪-৫৬) উমাইয়া বংশোদ্ভূত ছিলেন। আবু সুফিয়ান তাঁর চাচাতো ভাই। মুহম্মদ এই উমাইয়া গোত্রের সাথে সম্পর্ক দৃঢ় করার জন্য ওসমানের সাথে তাঁর দুই বিধবা কন্যা রোকেয়া ও উম্মে কুলসুমের বিবাহ দেন।

মহানবী বলেছিলেন যে যদি তাঁর তৃতীয় আর একটি কন্যা থাকত তবে তাকেও তিনি ওসমানের হাতে তুলে দিতেন কারণ তিনি ওসমানকে খুবই ভালবাসতেন।

এই দুই স্ত্রীর নিকট থেকে ওসমান কোনো সন্তান পাননি তাই তিনি পরে এক খ্রিস্টান রমণী নাইলার পানি গ্রহণ করেন যিনি তাঁকে একটি কন্যা উপহার দেন।

আবিসিনিয়াতে যারা নির্বাসনে যান তাঁদের মধ্যে ওসমান একজন ছিলেন। ওসমান প্রথমে ইসলামের প্রতি সহানুভূতিশলি ছিলেন না, তাই দেখা গিয়েছিল যে কুবাতে যখন প্রথম মসজিদ তৈরি হয় তখন তিনি প্রফেটকে এই নির্মাণে কোনো সাহায্য করেন নাই। বদরের যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ না করে বসে থাকলেন এই অজুহাতে যে তার স্ত্রী অসুস্থ, তার প্রতিপক্ষরা তাকে এই জন্য ফারার-পলাতক বলে অভিহিত করত। খলিফা পদে অধিষ্ঠিত হলে তিনি হজের অনুষ্ঠানে কিছু পরিবর্তন আনেন। তিনি কোরানের শেষ সম্পাদনা করেন এবং এই সম্পাদনে তিনি যথেষ্ট পরিবর্তন এনেছিলেন বলে তাকে দোষারোপ করা হয়। বলা হয় যে, তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে ARIS কূপে প্রফেটের একটি আংটি ফেলে দেন যা তিনি উত্তরাধিকারী সূত্রে পেয়েছিলেন; সেই পারিবারিক আংটি আর খুঁজে পাওয়া যায়নি।

প্রফেট মোহাম্মদ মারওয়ানের পিতা হাকামকে যে নির্বাসন দণ্ড দিয়েছিলেন ওসমান তা বাতিল করেন এবং হাকামকে মদীনায় ফেরবার জন্য নির্দেশ দেন।

কাব আল-আহবার একজন ইহুদি ছিলেন। ওমরের রাজত্বকালে তিনি মক্কায় আসেন এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। খলিফা ওসমান কাব আল-আহবারকে অনেক দিক দিয়ে সাহায্য করেন। পরবর্তীতে 'কাব' এমন কতকগুলি হাদিস লিখে যান যার মধ্য দিয়ে কিছু ইহুদিতত্ত্ব ইসলামে ঢুকে যায়।

তিনি সন্ন্যাসী আবুদারকে নির্বাসনে পাঠান যিনি প্রফেটের একজন বন্ধু ছিলেন। এ কারণেও তিনি খলিফার সমালোচনা করতেন এবং তাঁরই প্ররোচনায় কাব-আল আহবার নির্যাতিত হয়েছিলেন।

তিনি তার সৎভাই আবদুল্লাহ ইবনে সাদ, যিনি ধর্মে বিশ্বাস করতেন না, তাকে আশ্রয় দান করেন এবং পরবর্তীতে মিসরের গভর্নর পদে তাকে নিযুক্ত করেন। তিনি

www.pathagar.com

তার আর এক ভাই ওয়ালিদ ইবনে ওকবাকে কুফার গভর্নর করেন। ওয়ালিদের পিতা ওকবা মোহাম্মদের সাথে দুর্ব্যবহার করেন এবং একবার তাঁকে গলা টিপে হত্যা করতে চেষ্টা করেন (আমীর আলী, ৯৬৫, পৃ. ২৯৫)।

তিনি তাঁর কাজিন মাবিয়াকে সিরিয়ার গভর্নর পদে অধিষ্ঠিত করেন; এই মাবিয়া আবু সুফিয়ানের পুত্র ছিলেন।

ওসমানের রাজত্বকালে গৃহযুদ্ধের সূচনা হয় এবং বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয় যা পরবর্তীতে মুসলিম ধর্মে একতাকে বিঘ্নিত করে। ৬৫৬ খ্রিঃ একটি বিদ্রোহী দল মদীনায় তারই বাসায় তাকে তরবারির কোপ দিয়ে হত্যা করে। এই সময় তিনি কোরান পড়ছিলেন এবং এই পবিত্র গ্রন্থের একটি পাতা তার রক্তে রঞ্জিত হয়। হত্যাকারীদের মধ্যে আবু বকরের পুত্র মোহাম্মদ অন্যতম।

আলী (৬৫৬-৬৬১) মহম্মদের কাজিন ও জামাতা ওসমানের মৃত্যুর পরে খলিফা হন এবং তিনি রাজধানী মদিনা হতে কুফাতে স্থানান্তরিত করেন। তাঁর প্রতিপক্ষের মধ্যে অন্যতম ছিলেন আয়েশা (প্রফেটের স্ত্রী) যিনি আলীর বিরুদ্ধে উটের যুদ্ধ পরিচালনা করে পরাজিত হন। আলীর আর একজন প্রধান প্রতিপক্ষ ছিলেন সিরিয়ার গভর্নর মাবিয়া। মাবিয়া ওসমানের হত্যায় আলী জড়িত এই সন্দেহে বিদ্রোহী হন এবং ৬৫৭ খ্রিঃ সিফফিনের যুদ্ধে আলী পরাজিত হন এবং তাঁর খেলাফত আরবিট্রেশন দ্বারা স্থগিত রাখা হয়, যদিও তিনি শাসন পরিচালনা করেছিলেন ৬৬১ খ্রিঃ মৃত্যুকাল পর্যন্ত।

আলী যেহেতু Arbitration-এর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন সেই সময় তার সৈন্যদল থেকে একদল বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়– এরা খারিজি নামে পরিচিত। এই খারিজিরা আবার অনেক শাখায় বিভক্ত ছিল এবং বহু বছর ধরে ইসলামী খলিফা রাজ্যে যথেষ্ট সমস্যার সৃষ্টি করে। ৬৬১ খ্রিঃ কুফার এক সমজিদে আলী যখন প্রার্থনারত সেই সময় আবদুর রহমান ইবনে মুলজাম তাকে বিষ মেশানো ছুরি দিয়ে আঘাত করলে তিন দিন পর আলী মারা যান। তাকে কোথায় কবর দেওয়া হয়েছিল জানা যায় না, তবে হাদিস মতে ধরা হয় যে, কুফার একটু দূরে তাঁর কবর হয়েছিল।

৮৫০ খ্রিঃ আব্বাসী খলিফা মুত্তাওয়াক্কেল, আলী ও তার পুত্রদের কবরের ওপর নির্মিত সৌধ ধ্বংস করে দেন।

আলীর পার্টি শিয়া আলীকে প্রথম ইমাম বা নেতা বলে গ্রহণ করে এবং প্রথম ও কেবলমাত্র সত্য খলিফা মনে করে আর তার আগের তিনজন খলিফাকে প্রতারক বলে বিবেচনা করে। ইসলাম ধর্মে শিয়া গোষ্ঠী সুন্নি গোষ্ঠীর সাথে ভিন্ন মত পোষণ করে এবং এই দুই ইসলামী শাখা একে অন্যের সাথে কখনো আপোষ করেনি। কোনো কোনো শিয়া গোষ্ঠী (Sect) আলীকে উচ্চতর মর্যাদা দেয় প্রফেট মোহাম্মদ তুল্য, কখনো কখনো তার চেয়ে বেশি, সত্যি বলতে কি, শিয়া গোষ্ঠী আলীর দেবত্বে (divinity) বিশ্বাস করে (C. Hurt. in SEI. 1974 P. 32)।

আলীর পুত্র হাসান (৬৬১) পঞ্চম খলিফা রূপে বোধ হয় কয়েক মাস মাত্র অধিষ্ঠিত ছিলেন; কিন্তু তিনি অন্য দিকে ব্যস্ত থাকায় খিলাফতে মন ছিল না। তিনি একশত বিবাহ করেন এবং তালাকও দেন, তাই তাকে 'Great Divorcer' বলা

www.pathagar.com

হয়েছে। রাজকার্যে দুর্বল ও অযোগ্য থাকায় তিনি মাত্র ছ'মাস পরে, তার অধিকার, মোটা পেনশনে মাবিয়ার কাছে বিক্রি করে দেন। এর পর মাবিয়া প্রথম উমাইয়া খলিফা রূপে ক্ষমতা গ্রহণ করেন।

আট বছর পর হাসান তার পত্নীদের মধ্য থেকে একজনের দ্বারা বিষ প্রয়োগে প্রাণ ত্যাগ করেন। এই পত্নীর নাম ছিল জাআদা। আলীর দ্বিতীয় পুত্র হোসেন ৬৮০ সালে, প্রথম ইয়াজিদের খিলাফতকালে কারবালা প্রান্তরে নিহত হন। চারজন খলিফা আবুবকর, ওমর, ওসমান ও আলী সুন্নিদের দ্বারা স্বীকৃত সম্মানিত এবং অর্থোডক্স (রাশেদিন) বলে গণ্য। পরবর্তী মুসলিম জেনারেশন এই চার খলিফার সরলতা, পবিত্রতা ও তাত্ত্বিকতার স্মৃতিচারণ করে তাদের পূর্বপুরুষ (সালাফ) বলে স্বীকৃতি দেয়। অধুনা মিসরে কতকগুলো সালাফিয়া আন্দোলন গজিয়ে উঠেছে। সিরিয়া ও ভারতে ও এই আন্দোলনের ঢেউ সমমনাদের ওপর দিয়ে বয়ে গেছে।

কিন্তু আসলে এই চার খলিফা (৫ নংসহ) অসময়ে ফুরিয়ে গেছেন ঘাতকদের হাতে কিংবা বিষক্রিয়ায় এবং তাদের রাজত্বকাল চিহ্নিত হয়েছে আত্মকলহ, গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ও পারিবারিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এবং প্রায় লাগাতার বিরোধে এই সময় থেকে শুরু হয়েছে দু'টি গোষ্ঠীর (শিয়া ও সুন্নি) মধ্যে চরম গোত্র বিরোধ যা ইসলামের ইতিহাসে এখনো পর্যন্ত সমাধান হয়নি, হবে কিনা একমাত্র ভবিষ্যৎই বলতে পারে।

১২.২ উমাইয়া বংশ (৬৬১-৭৫০)

রাজনৈতিকভাবে আলীকে হত্যার পর উমাইয়া খিলাফত, সিরিয়ান আরব দ্বারা সাহায্যপুষ্ট হয়ে দামেস্ক প্রতিষ্ঠা পায়। আবিদ শামস-এর পুত্র উমাইয়ার (আবু সুফিয়ানের দাদা) নামে এই খিলাফতের নাম। প্রথা মতে, হাশিম পরিবারের চির দ্বন্দ্ব। এই হাশিম পরিবারেই প্রফেট মোহাম্মদের জন্ম।

উমাইয়াদের রাজত্বকালে মুসলিম সাম্রাজ্য অপ্রতিহত গতিতে প্রসার লাভ করেছে পূর্ব ও পশ্চিম উভয় দিকে। পূর্ব দিকে মুসলিম বাহিনী আফগানিস্তান (৬৬১) ট্রান্স-অক্সিয়ানা (৭০৯) এবং ভারতে সিন্ধুদেশ (৭১২) দখল করে। পশ্চিম দিকে লিবিয়া (৬৪৩) দখল করে দ্রুতগতিতে উত্তর আফ্রিকা পার হয়ে যায়। প্রথম ওয়ালিদের (মৃত ৭১৫) রাজত্বকালে উত্তর আফ্রিকা বিজয় সম্পূর্ণ হয়ে স্পেন অভিযান শুরু হয়। যদিও ইসলামী রাজ্য পামির থেকে পিরেনিজ পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছিল, উমাইয়া খিলাফতের সময় এই বংশের খলিফারা কিন্তু অ-ইসলামী ভাবধারায় প্রভাবিত ছিল। আবু সুফিয়ানের বংশধর ও আত্মীয়রূপে, প্রফেট ও তাঁর উল্লেখযোগ্য আত্মীয়দের বিরুদ্ধে অন্তর্কলহ বন্ধ রাখেনি, তিক্ত সম্পর্কই বজায় ছিল এবং প্রায়ই মনে হতো তাদের বংশের ওপর প্রফেট মোহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা যে অত্যাচার ও অপদস্থ করেছিলেন, তার বদলা বা প্রতিশোধ গ্রহণ করছে।

উমাইয়া খলিফারা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দক্ষ প্রশাসক ছিলেন না। একমাত্র দ্বিতীয় ওমর (মৃ. ৭২০) ছাড়া তারা প্রথমে ছিলেন আরব, তারপর মুসলিম। কিছু মুসলিম ঐতিহাসিক তাদের মধ্যে অর্থোডক্স খুঁজে পেতে কষ্ট স্বীকার করেছেন, কিন্তু অনেকেই তাদের দায়ী করেছেন ইসলামকে ধর্মনিরপেক্ষ করার জন্য এবং রাষ্ট্রকে ধর্ম থেকে

www.pathagar.com

আলাদা করার জন্য। কথিত যে, তারা ইসলামকে নতুন একটা পথে পরিচালিত করতে প্রচেষ্টা করেন এবং বিশ্বাসে আঘাত হানেন। সাধারণভাবে তারা প্রফেট মোহাম্মদের ওহিতে অল্পই গুরুত্ব দিয়েছেন, তাঁর মতবাদে আস্থা ছিল ক্ষীণ। তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল যে, শিয়া-সুন্নির বিরোধ-মাত্রা তারাই বাড়িয়েছেন। তারা জুমার নামাজের সময় মিম্বর থেকে আলীকে অভিশপ্ত করার প্রথা প্রচলিত করেন এবং তা প্রথম দিকের কয়েক জন খলিফা নিয়মিত পালন করে গেছেন এবং লোকজনদের তা করার জন্য উৎসাহিত করেছেন। তারা আলীর পরিবারের অনেক সদস্যদের প্রতি অত্যাচার করেছেন যার ফলে অনেকে মৃত্যুবরণ করেছেন। এর মধ্যে আলীপুত্র হোসেনও অন্তর্ভুক্ত।

মক্কা ও মদিনার ধর্মীয় গুরুত্ব কমিয়ে দেয়ার জন্য তারা জেরুজালেমকে গৌরবান্বিত করেছেন। এমনকি তারা মদিনা থেকে প্রফেটের মিম্বর ও লাঠি দামেস্ক সরিয়ে আনার চেষ্টা করেছে, কিন্তু কড়া প্রতিবাদের মুখে তার বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি।

মদিনাতে প্রফেট একটা বাজার করেছিলেন জনগণের ব্যবহারের জন্য, নির্দেশ ছিল সেখানে কোনো ভবন নির্মিত হবে না এবং ঐ ভূমির ওপর কোনো করারোপ করা হবে না। এই নির্দেশ অমান্য করে খলিফা মাবিয়া সেখানে দুটি ভবন নির্মাণ করেন এবং খলিফা হিশাম (মৃ. ৭৪৩) তৃতীয় একটি বিরাট ভবন নির্মাণ করেন এবং করারোপও করা হয়।

উমাইয়ারা প্রফেট মোহাম্মদের প্রথম স্ত্রী খাদিজাকে অতি উচ্চে সম্মান দিত। মক্কাতে তার বাড়ি অনেক দিন ধরে অবহেলিত হয়ে পোড়ো পোড়ো হয়ে যায়। এই গৃহটিকে উমাইয়ারা পুনর্নির্মাণ করে উপাসনালয়ে রূপান্তরিত করে। অন্য দিকে যে বাড়িতে প্রফেট জন্মগ্রহণ করেন, তাকে সাধারণ বাসস্থান রূপে ব্যবহার করা হয়েছে। মক্কা ও মদিনাতে তারা অন্যান্য উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন করেছেন, বিশেষ করে প্রাচীন চিহ্নগুলো যা প্রফেটের সাথে জড়িত ছিল সেগুলোকে ধ্বংস করে দিয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হয় আবদুল্লাহ ইবন জুবায়েরের নেতৃত্বে, সেই বিদ্রোহ দমনের সময় মক্কার পুরানো স্মৃতি ও চিহ্ন নিশ্চিত হয়। কাবাঘরেরও ক্ষতি হয়। এই দুই শহরে (মক্কা ও মদিনা) অসংখ্য বাইজানটাইন স্থপতি, রাজমিস্ত্রি, কাঠমিস্ত্রি ও শ্রমিক লাগিয়ে পুনর্নির্মাণের বন্দোবস্ত হয় এবং তারা স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে যায়।

খলিফা ওমর প্রবর্তিত প্রথা যেখানে স্থির হয়েছিল উত্তরাধিকারী নির্বাচন শূরার মাধ্যমে হবে– সে প্রথা খলিফা মাবিয়া বাতিল করে মনোনয়ন প্রথা চালু করেন। এইভাবে উত্তরাধিকারী সূত্রে অর্থাৎ মনোনয়নের মাধ্যমে খিলাফত বংশানুক্রমিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। এই পদ্ধতি পরবর্তী মুসলিম শাসকরা অনুসরণ করে গেছেন।

প্রফেট মোহাম্মদ জুমার নামাজের খুতবা মসজিদের মিম্বরে দাঁড়িয়ে পাঠ করার নিয়ম করেছিলেন। এর বিপরীতে প্রথম দিকের উমাইয়া খলিফারা বসে খুতবা পাঠ করার প্রথা চালু করেন। এছাড়া 'খলিফাত রসূলুল্লাহ' পদবির পরিবর্তে 'খলিফাত আল্লাহ' পদবির পরিবর্তন করেন। এছাড়া তারা আরও সম্মানজনক পদবি ব্যবহার করে সন্তুষ্ট হতেন, যেমন আল্লাহর খলিফা বা এজেন্ট, পৃথিবীর দয়াময় সুলতান, আল্লাহর ছায়া (জিল্লুল্লাহ)। এই সব পদবি ব্যবহারের জন্য ধর্মীয় ব্যক্তিরা নাখোশ

www.pathagar.com

ছিল। এই প্রথা পরবর্তীতে অনেক সময় রাজা-বাদশা-খলিফারা ব্যবহার করেছেন ওসমানী খলিফাদের সময় পর্যন্ত।

উমাইয়া খলিফাদের জীবনধারা ছিল বাইজানটাইন সম্রাটদের মতো। তাঁদের রাজকীয় জীবনযাত্রা শতাব্দি ধরে অনুকরণ করেছিল মুসলিম শাসকরা যেমন— সুলতান, শাহ, আমির, সম্রাট যারা শাসন করেছিল ইরাক, মিসর, মরক্কো, পারস্য, তুরস্ক, ভারত ও অন্যান্য দেশে। অর্থোডক্স মুসলিম ও মোল্লারা উমাইয়া খলিফাদের এই জাগতিক শানশওকতকে ইসলামী ধারণার পরিপন্থী মনে করত।

উমাইয়া খলিফারা তাদের প্রজাদের জোর-জবরদস্তি করে ধর্মান্তর করত না। তাদের ধারণায় ইসলামের অর্থ হলো শাসকের কাছে নতি স্বীকার করা, বিশ্বাসকে গ্রহণ করা নয়। তখন সিরিয়ান আরবদের মধ্যে খ্রিস্টানরা ছিল বেশি শক্তিশালী এবং উমাইয়া খলিফারা তাদের প্রতি নমনীয় ও সহনীয় ভাব ধারণ করত যার জন্য দুইটি প্রধান খ্রিস্টান গোত্র—কালব ও কাইস উমাইয়া রাজতন্ত্রের সাপোর্টার ছিল।

অনেক উমাইয়া খলিফার খ্রিস্টান উপদেষ্টা ছিল এবং তারা খ্রিস্টান কবিদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। কেউ কেউ খ্রিস্টান চার্চের কিছু প্রথা মসজিদ সার্ভিসে আমদানি করেছিলেন। পবিত্র স্থানে গানবাজনার প্রচলন ছিল। মসজিদ সার্ভিস চলাকালে ধূপধুনা জ্বালানো হতো এবং এই প্রথা উমাইয়া রাজত্ব শেষ হয়ে যাওয়ার পর অনেক দিন চলেছিল।

মাবিয়া (৬৬১-৬৮০) উমাইয়া বংশের প্রথম খলিফা। তিনি ছিলেন আবু সুফিয়ান ও হিন্দের পুত্র এবং খলিফা ওসমানের কাজিন। প্রফেট মোহাম্মদের কোরান লেখকদের মধ্যে তিনি একজন এবং প্রফেটের ডিকটেশনে তিনি কোরানের কিছু অংশ লিখেছিলেন। আগেই বলা হয়েছে যে, খলিফা ওসমানের সময় তিনি সিরিয়ার গভর্নর ছিলেন এবং খলিফা আলীর বিরুদ্ধে, ওসমান হত্যার কারণে বিদ্রোহী হন।

পবিত্র কোরানের প্রতি মুসলিমদের শ্রদ্ধার কথা জেনেও তিনি সিফ্ফিনের যুদ্ধে বর্শার আগায় কোরানের পাতা বিদ্ধ করে (৬৫৭) যুদ্ধের মোড় ফিরিয়ে নেবার চেষ্টা করেন। ফলে আলীর সৈন্যরা মাবিয়ার সৈন্যদের আক্রমণ করতে অস্বীকার করে এই কারণে আলী যুদ্ধে হেরে যান এবং তার খিলাফতও চলে যায়।

এরপর মাবিয়া জেরুজালেমে নিজেকে খলিফা হিসাবে ঘোষণা দেন এবং এই উপলক্ষে তিনি গেথসেমেনে (Gethsemane) নামাজ পড়েন যেখানে যিশু শেষ ভোজের পর প্রার্থনা করেছিলেন। তিনি কুমারী মেরির কবরেও প্রার্থনা করেন এবং গলগথাতে পরিদর্শনে যান, যেখানে যিশুকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিল (F. Buhl, in SEI, 1974, P. 290)|

তিনি সিরিয়ান খ্রিস্টানদের ডেকে সেই সব জমি চাষ করতে বলেন যা বেদুইনরা ধ্বংস করে দিয়েছিল। তিনি খ্রিস্টানদের রক্ষা করেন। সাধুদের ভক্তি করেন এবং চার্চ ও কনভেন্টে দান করেন। তিনি এডেসার ক্যাথিড্রাল পুনর্নির্মাণ করেন যা ভূমিকম্পে ধ্বংস হয়েছিল।

মাবিয়ার পর তার পুত্র প্রথম এজিদ খলিফা হন (৫৮০-৮৩), যার রাজত্ব প্রধানত কারবালা হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত। ৬৮০ সালে শরৎকালে আলীর দ্বিতীয় পুত্র হোসেন

www.pathagar.com

এজিদকে অস্বীকার করে তার পরিবারবর্গ ও কিছু অনুসারী সাথে করে কুফাবাসীদের আমন্ত্রণে কুফার পথে রওয়ানা হন তাদের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য। তার এই পরিকল্পনা জানতে পেরে বসরার উমাইয়া গভর্নর ওবাইদুল্লাহ ইবন জিয়াদ একদল সেনাবাহিনী পাঠিয়ে হোসেনের দলকে বাধা দিয়ে আত্মসমর্পণ করতে নির্দেশ দেন।

আত্মসমর্পণ না করে, হোসেনের দল কারবালা প্রান্তরে তাঁবু গাড়ে এবং এখানে ওবাইদুল্লাহ বাহিনীর দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়। এই উমাইয়া বাহিনীর কমান্ডার ছিল ওমর ইবন সাদ। বদরের যুদ্ধে প্রফেটের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে ওমর ইউফ্রেটিস নদীর সাথে হোসেনের দলে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়, ফলে পানিকষ্ট শুরু হয় হোসেনের দলে। এখানে ছয় দিন পর, মহররমের দশম দিবসে, হোসেনসহ তার দলের সকলেই নিহত হন। শিয়াদের ইতিহাসে, ঐতিহাসিক গিবনের ভাষায়, এই লোমহর্ষক ঘটনা শান্ত প্রকৃতির পাঠকদেরও জাগিয়ে তোলে। সত্তরজন লোকের ছিন্ন মস্তকসহ নারী শিশুদের বন্দি করে বসরার গভর্নরের নিকট হাজির করা হয়। হোসেনের শির দামেস্ক পাঠানো হয় জনসম্মুখে প্রদর্শিত হওয়ার জন্য।

পঞ্চম উমাইয়া খলিফা আবদুল মালিক (৬৮৪-৭০৫) মক্কা ও মদিনায় বিদ্রোহীদের সম্মুখীন হন। এদের দমন করার জন্য ইরাকের বিশ্বস্ত গভর্নর হাজ্জাজ ইবন ইউসুফকে খলিফা প্রেরণ করেন। হাজ্জাজ পণ্ডিত মানুষ ছিলেন কিন্তু গোঁড়াবাদীরা তাঁকে পছন্দ করত না। হাজ্জাজ ছিলেন তাকিফ গোত্রের সদস্য; এই গোত্র প্রফেটের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ পোষণ করত অনেক দিন ধরেই। তিনি মক্কা-মদিনার বিদ্রোহীদের কড়া হাতে দমন করেন।

বসরা ও কুফার মধ্যখানে ৭০২ খ্রিঃ হাজ্জাজ ওয়াসিত নামে একটি নতুন শহর প্রতিষ্ঠা করে বসরা ও কুফার ওপর কড়া নজর রাখার জন্য, কারণ এই দুই শহর সব সময়েই গোলযোগ সৃষ্টি করত। এখন ওয়াসিত শহরের সঠিক ঠিকানা পাওয়া যায় না।

আবদুল মালিকের পর তার পুত্র প্রথম ওয়ালিদ (৭০৫-১৫) খলিফা হন। তিনি কখনো আরবি ভাষা শেখার চেষ্টা করেননি, অশুদ্ধ করে বলতেন। তিনি হাজ্জাজকে ইরাকের গভর্নর পদেই বহাল রাখেন মক্কা-মদিনাকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য। ওয়ালিদের নির্মাণ কর্মের প্রতি ঝোঁক ছিল। তিনি দামেস্কর একটি ক্যাথিড্রাল দখল করে তার এক অংশে তার সংস্কার সাধন করেন এবং অন্যদিকে একটি বিরাট মসজিদ নির্মাণ করেন। মক্কাতে কাবাঘরের কাছে তিনি একটি নতুন কূপ খননের আদেশ দেন এবং হাজীদের সেখান থেকে মিঠা পানি পান করার জন্য অনুরোধ করেন। তার মতে জমজমের পানি তিক্ত, লবণাক্ত ও বিস্বাদ ছিল।

হিশাম (৭২৪ - ৪৩) উমাইয়া বংশের দশম খলিফা। তিনি তাঁর এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু সাধু টিফেনাসকে মন্ত্রণাদাতা রূপে গ্রহণ করেন। পরে তাকে এন্টিয়কের বিশপের পদে অধিষ্ঠিত করেন। ইরাকের গভর্নর হিসেবে তিনি খালিদ আল-কাসরিকে নিয়োগ করেন। খালিদ একজন বন্দি গ্রিক রমণীর পুত্র, যিনি কখনো ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হননি। খালিদ তাঁর মায়ের জন্য কুফাতে একটি চার্চ ও কনভেন্ট তৈরি করে দেন, যার জন্য মুসলিমদের কাছে তার জনপ্রিয়তা কমে যায়। খালিদের মৃত্যুর পর এই চার্চ ও কনভেন্ট ধ্বংস করা হয়।

www.pathagar.com

প্রভুভক্ত খালিদ খলিফাকে বলেন, তাঁর অনুমতি পেলে, তিনি কাবাঘর ভেঙ্গে সেই মালপত্র দিয়ে জেরুজালেমে অনুরূপ একটি তৈরি করবেন। কিন্তু তা হয়নি। খালিদ তাঁর মায়ের প্রতি বেশ অনুরক্ত ছিলেন, তাই মায়ের ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেছিলেন খ্রিস্টানিটি অনেক দিক দিয়ে ইসলামের চেয়ে অনেক উচ্চে।

হিশামের মৃত্যুর পর দ্বিতীয় ওয়ালিদ (৭৪৩-৪) তার উপদেষ্টাদের চাপে খালেদের মৃত্যুদণ্ড দেন। ওয়ালিদ নিজে একটি কোরানের আয়াত পছন্দ করতেন না যেখানে বলা আছে, 'প্রত্যেক বিদ্রোহী ও জেদী ব্যক্তি ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে' (১৪ : ১৮)। কোরানের এই পাতাটি ছিঁড়ে বর্শাতে গেঁথে তীর দিয়ে ছিন্ন-ভিন্ন করে দেন এবং বলেন, 'তুমি প্রত্যেক প্রতিপক্ষকে ভর্ৎসনা করো? দেখ, আমি সেই জেদী প্রতিপক্ষ, যখন তুমি তোমার প্রভুর সামনে হাসরের দিনে সম্মুখীন হবে, তখন বলো যে ওয়ালিদ তোমাকে এই ভেবে ছিঁড়ে দিয়েছে (Sale, 1886, P. 52)। তার পূর্বপুরুষ ওসমানের মতো ওয়ালিদ, এর কিছু দিন পরেই কোরান পাঠরতকালে খুন হন।

দ্বিতীয় মারওয়ানের (৭৪৪-৯) সাথে উমাইয়া বংশের শেষ হয়। রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে আব্বাসী নেতাদের দ্বারা তাড়িত হয়ে নীল নদের তীরে যুদ্ধরত অবস্থায় তাঁকে হত্যা করা হয়। তিনি উমাইয়া বংশের চতুর্দশতম খলিফা। এদের মধ্যে দুইজন রাজ্য পরিত্যাগ করেন, দুইজনকে বিষ প্রয়োগে মারা হয় আর দুইজনকে রাজনৈতিকভাবে হত্যা করা হয় (assasinated)।

১২.৩ আব্বাসিয়া বংশ (৭৫০-১২৫৮)

উমাইয়া রাজত্বকালে মুসলিম রাজ্য অতি দ্রুতভাবে সংগঠিত হয় এবং আব্বাসিরা এই রাজ্যকে আরো সুসংহত করে। এই বংশের নামকরণ হয় প্রফেট মোহাম্মদের চাচা আব্বাসের নামে।

আব্বাসিয়াদের প্রথম খলিফা ছিলেন আবুল আব্বাস (৭৫০ - ৫৪), আস-সাফ্ফা উপাধি ধারণ করেন, এর অর্থ 'রক্তপাতকারী' বা 'রক্তপিপাসু'। রাজ্য শুরু করেন 'ক্ষমা ঘোষণা'র মাধ্যমে এবং উমাইয়া বংশের সব রাজপুরুষদের এক ভোজে আমন্ত্রণ জানিয়ে জড়ো করেন এবং ইঙ্গিত দিয়েই সবাইকে হত্যা করেন।

অন্যান্য স্থানে উমাইয়াদের যেসব আত্মীয়-স্বজন ছিল, চিরুনি অভিযান দ্বারা হত্যা করা হয় এবং তাদের দেহ রাস্তার কুকুরদের প্রতি নিক্ষেপ করা হয় তাদের খাদ্য রূপে। শেষে সিরিয়াতে উমাইয়া খলিফাদের কবর খুঁড়ে (দ্বিতীয় ওমর বাদে) হাড়গোড়, পচা দেহ যা ছিল তার উপরে চাবুক মারা হয়। এরপর অবশিষ্টাংশগুলি পুড়িয়ে দিয়ে ছাইগুলো বাতাসে ছড়িয়ে দেয়া হয়।

আব্বাসিদের প্রাথমিক সংগ্রামে, তারা পার্সিয়ানদের যথেষ্ট সাহায্য পায়। আসলে অনেক খলিফাদের পার্সি মাতা ছিল এবং তারা আরবের চেয়ে নিজেদের পার্সি বলতে গর্ব অনুভব করত। আব্বাসি সুশীল সমাজের ভাষা ছিল পার্সিয়ান এবং সাসানিয়া সাম্রাজ্যের অনেক প্রথা আব্বাসি দরবারে চালু হয়েছে। কোনো কোনো খলিফা সাসানিয়ান প্যাটার্নে 'শাহিন শাহ' উপাধি ধারণ করেছে।

উমাইয়াদের মতো আব্বাসিরা খ্রিস্টানদের প্রতি সদয়প্রবণ ছিল না। আব্বাসি

www.pathagar.com

রাজত্বের শুরুতে সাম্রাজের পূর্ব প্রদেশগুলোতে নব্বইটি মঠের স্থাপনা এবং এগারো হাজার চার্চ ছিল– মেসোপটেমিয়া, দক্ষিণ পারস্য এবং সিরিয়াতে। নতুন রাজ্যনীতি অনুসারে এই সব খ্রিস্টান স্থাপনাগুলো বেশির ভাগ ধ্বংস হয়েছিল। দ্বিতীয় আব্বাসি খলিফা মনসুর (৭৫৪-৭৫)-এর রাজত্বকালে ৭৬২ খ্রিস্টাব্দে এই বংশের রাজধানী দামেস্ক থেকে বাগদাদে স্থানান্তরিত করা হয়। বাগদাদ নগরী প্রাচীন পার্সিয়ান রাজধানী স্টেসিফোন (Ctesiphon)-এর ধ্বংসস্তূপের নিকটে। এই বাগদাদ নগরী নতুনভাবে নির্মিত হয়। এই নতুন নগরীর পরিকল্পনা করেছিলেন খলিফার উপদেষ্টা মাশাআল্লাহ, ইনি ইহুদি পণ্ডিত, গাণিতিক ও স্থপতি, এই নগরীর স্থান নির্ধারণ করেন। খলিফার মন্ত্রী খালিদ ইবন বারমাক এই স্থান নির্ধারণে বারমাক সৃষ্টিতত্ত্ব ও জ্যামিতিক নীতি অনুসরণ করেন।

এই মন্ত্রী বারমাক (বারমেসাইড) পরিবারভুক্ত ছিলেন। এদের পূর্বপুরুষ ছিল বুড্ডিস্ট হাই (high) প্রিস্ট। এই পুরোহিতরা অক্সাস নদীর তীরে বলখের মনাস্টারিতে ছিলেন। ৬৬৩ খ্রিস্টাব্দে আরবরা বলখ নগরী দখল করলে এরা ইসলামে দীক্ষিত হন। এই বারমাক পরিবার পরপর চারজন খলিফার অধীনে কাজ করেন এবং এরা তাদের মহানুভবতার জন্য পরিচিত ছিলেন। তাছাড়া জনসেবা, সাহিত্য, শিল্প, দর্শন ও বিজ্ঞানের প্রতি নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন।

তৃতীয় আব্বাসী খলিফা মাহদি (৭৭৫-৮৫) সাফল্যজনকভাবে বাইজানটাইনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভ করে কিছুদিনের জন্য তাদের কাছ থেকে কর আদায় করে সন্ধি করেন। তিনি জোরপূর্বক সিরিয়ার শেষ প্রভাবশালী খ্রিস্টান তানুখ গোত্রকে ধর্মান্তরিত করেন, কেননা এই খ্রিস্টান গোত্রের সাথে কনস্ট্যান্টিনোপলের গোপন যোগসাজশ ছিল।

পঞ্চম আব্বাসী খলিফা হারুন-অর-রশিদকে (৭৮৬-৮০৯) আরব্য রজনী খ্যাত-ক্ষমতায় বসিয়েছিলেন তার গৃহ-গুরু ইয়াহিয়া (জন) ইবন খালিদ। খালিদ বারমাকের পুত্র। বারমাকদের যেমন দ্রুত উন্নতি হয়েছিল তেমনি দ্রুত পতন হয়েছে ৮০৩ খ্রিস্টাব্দে। ইয়াহিয়াকে বন্দিশালায় পাঠানো হয় এবং সেখানে তার মৃত্যু হয় এবং তার পুত্র জাফরকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। তাদের এই দ্রুত পতনের কারণ খ্রিস্টান ও জোরাস্ত্রিনদের প্রতি তাদের নমনীয় মনোভাব এবং ইসলামে দীক্ষা নেয়া সত্ত্বেও তাদের বুড্ডিস্ট প্রীতি ছিল। ৮০৭ খ্রিস্টাব্দে খলিফা ইহুদি ও খ্রিস্টানদের জন্য আইন পাস করে তাদের ভিন্ন ধরনের পোশাক পরতে আদেশ দেন।

হারুনের রাজত্বকালে আব্বাসিদের ক্ষমতা শীর্ষে উঠেছিল। ফ্র্যাঙ্কিস ঐতিহাসিক এজিনহার্ড (Eginhard) (মৃ. ৮৪০)। উল্লেখ করেছেন যে, ৭৮৯ খ্রিস্টাব্দে হারুন ও শার্লমেনের মধ্যে দূত বিনিময় হয়েছিল। এই ঘটনার কথা মুসলিম ইতিহাসে নেই, যদিও পরে উপহার বিনিময়ের কথা বলা হয়েছে।

হারুনের পুত্র মামুন (৮১৩-৩৩) শিক্ষা-ব্যবস্থার পোষক ছিলেন। লাইব্রেরি ও কলেজ প্রতিষ্ঠার সাথে বিখ্যাত জ্ঞানগৃহের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন (House of Wisdom)। তিনি বিজ্ঞান, বিশেষ করে জ্যোতির্বিজ্ঞান ও গণিত শিক্ষার ক্ষেত্রকে উৎসাহিত করেন। তিনি মোতাজেলা ডকট্রিনকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদা দিয়ে আব্বাসি সাম্রাজ্যে 'অগস্টান যুগ'-এর প্রবর্তন করেন। তিনি বিভিন্ন বিষয়ের পণ্ডিতের একটি টিম গঠন করে গ্রিক সাহিত্য

www.pathagar.com

দর্শন ইত্যাদি আরবিতে তরজমা করান এবং মুসলিমদের হেলেনিক আধ্যাত্মিকতার উত্তরাধিকারী হিসাবে প্রতিষ্ঠা করেন (J. H. Kramers, in Arnold and Guillaume, 1965, P. 84)।

মামুনের ছোট ভাই খলিফা মুতাসিম (৮৩৩-৪১) বাগদাদ থেকে ষাট মাইল দক্ষিণে টাইগ্রিস নদীর তীরে সামারা নগরী তৈরি করে সেখানে বাগদাদ থেকে রাজধানী স্থানান্তর করা হয়। এই সামারা নগরী নির্মাণ করেছিল প্যাগন তুর্কিরা যারা খলিফার দরবারে কাজ করত। সামারা আব্বাসি খিলাফতের রাজধানী রূপে ৮৩৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৮৭৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বজায় ছিল। মামুনের মতো মুতাসিমও মোতাজিলা গোষ্ঠীর পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। কথিত আছে যে মুতাসিম যখন মৃত্যুশয্যায় তখন তিনি বলেছিলেন যে তার মৃত্যুর সময় মোমবাতি ও ধূপধুনা জ্বালিয়ে খ্রিস্টানদের মতো প্রার্থনা করতে (J. Pederson, in SEI, 1974, 346)।

মামুনের ভাইপো, খলিফা আল-মোতাওয়াক্কিল (৮৪৭ - ৬১), তার চাচার মোতাজিলার ডিক্রি খারিজ করে দেন। তিনি হারুন-অর-রশিদের নীতি চালু করে খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে কঠোর নীতি প্রবর্তন করেন এবং বাগদাদের চার্চ ও সিনেগগ ভেঙে ফেলেন। তিনি শিয়াদের প্রতিও অত্যাচার শুরু করেন এবং কারবালায় হোসেনের মাজার ধুলোয় মিশিয়ে দেন। তারপর খলিফা নিজেই খুন হয়ে যান।

দশম শতাব্দি থেকে উত্তর আফ্রিকা ও অন্যান্য স্থানে অসন্তুষ্টি ও আন্দোলনের কারণে আব্বাসি রাজ্যের ভাঙন শুরু হয়। এই আন্দোলনের কারণ প্রধানত অর্থনৈতিক ও সামাজিক, যদিও এর মধ্যে জাতীয়তাবাদ মাথা চাড়া দিয়েছিল। এই সব আন্দোলন ও বিশৃংখলার কারণে, খলিফা ফ্রন্টিয়ার প্রদেশগুলোকে অধিক পরিমাণে স্বাধীনতা দিয়ে দেন।

এর মধ্যে আরাবিয়ান পেনিসুলার অধিকাংশ আধা-ইসলামী-গোষ্ঠী কারমাতিদের অধীনে চলে গেল। এই কারমাতিদের সাথে মাজদিয়ান ও মানিকিয়েন্সদের নিকট যোগসূত্র ছিল। তাদের কাছে একটি পুস্তক ছিল, সেই পুস্তকে লেখা ছিল যে তাদের কোনো এক নেতার কাছে যিশুখ্রিস্ট আবির্ভাব হয়ে তাঁকে একটি বিশেষ নিদর্শন দিয়েছেন লোকজনদের দেখাতে। এই কারমাতিগণ দুমার খ্রিস্টান কালব গোত্র ও বাহরাইনের কাইস গোত্রের কাছ থেকে সাহায্য ও নেতৃত্ব পেয়েছে এবং তারা প্রফেট মোহাম্মদ ও ইসলামী শিক্ষার বেশির ভাগ অমান্য করে।

৯৩০ খ্রিস্টাব্দে কারমাতি বাহিনী মক্কা আক্রমণ করে হজের সময় এবং কাবাঘরে হামলা চালায় মনুমেন্টের ওপর মদ ঢেলে দেয়। হাজীরা হারাম শরীফের মধ্যে আশ্রয় নিলে তাদের হত্যা করা হয়; মক্কা শহরের লোকজনসহ মৃত্যুর সংখ্যা দুই হাজারে পৌঁছে। তারপর কারমাতিরা কাবাঘর থেকে কালো পাথর উঠিয়ে নিয়ে মরু প্রান্তরে চলে যায় এবং কথিত যে, তারা সেই কালো পাথর ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দেয়, তারপর টুকরোগুলো বাতাসে ছড়িয়ে দেয়।

৯৫১ খ্রিস্টাব্দে, ২০ বছর পর বিরাট এক অঙ্কের বদলে, তারা কালো পাথরের ছোট ছোট টুকরোগুলোকে আঠা দিয়ে জোড়া দেয়। সেই জোড়া দেয়া পাথর ফেরত দিয়ে বলে, এটা আসল পাথর নয়, যদিও ধার্মিক ব্যক্তিরা সেটাকে আসল বলে

www.pathagar.com

লোকজনকে আশ্বস্ত করেছে (Sale, 1886, P. 91)।

আব্বাসী বংশের শেষের খলিফাদের মধ্যে কয়েকজনকে হত্যা করা হয় কিংবা অন্ধ করে দেয়া হয়। একাদশ শতাব্দির শেষের দিকে খলিফাদের কোনো ক্ষমতা ছিল না, কাঠের পুতুলের মতো অবস্থা হয় এবং তার কর্মক্ষেত্র বাগদাদ শহরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। আব্বাসী সাম্রাজ্যের অধিকাংশ এলাকা স্পেন থেকে পারস্য পর্যন্ত, স্বাধীন মুসলিম বংশ দ্বারা শাসিত হয়, যাদের প্রত্যেকের আলাদা ইতিহাস আছে।

আব্বাসীদের এই পোড়ো সাম্রাজ্য শেষে খতম হয়ে যায় যখন পারস্যের উত্তর-পশ্চিমে আলামুত পর্বত মঙ্গল হালাকু দখল করে নেয়। এই আলামুত পর্বতের দুর্গ ইসমাইলি গোষ্ঠী এসাসিনদের অধীনে ছিল। ১২৫৬ খ্রিস্টাব্দে হালাকু আলামুত দখল করার পর নেমে এসে ১২৫৮ খ্রিস্টাব্দে বাগদাদ আক্রমণ করে দখল করে এবং শেষ খলিফা মুসতাসিমকে হত্যা করে। শুধু খলিফা নয়, চার সপ্তাহ ধরে হালাকুর সেনাদল বাগদাদ শহরে মাসাকার করে– অর্থাৎ গণহত্যা করে রক্তের বন্যা বইয়ে দেয়।

চমৎকার রাজপ্রাসাদ, দর্শনীয় মসজিদ, স্মৃতিসৌধ এবং শিক্ষাক্ষেত্র সমস্ত কিছু ভেঙেচুরে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। সাহিত্য ও শিল্প-সম্পদে বাগদাদ ছিল এথেন্সের মতো পৃথিবীর কেন্দ্রভূমি। সবকিছু পুড়িয়ে, গুঁড়িয়ে; ধুলোয় মিশিয়ে দেয়া হয়। মুসলিম নগরী বাগদাদ এবং এর আশপাশ বিধর্মী মঙ্গলদের রাজ্যে পরিণত হয়।

আব্বাসী খিলাফতের পতনে 'খলিফা' পদবি সম্বন্ধে কিছু অনিশ্চয়তা রয়ে যায়। একটি বর্ণনা মতে, আব্বাসি বংশের শেষ খলিফা তাঁর পদবি দান করেছিলেন তাঁর এক চাচাকে, যিনি কাইরোতে পালিয়ে যান এবং ১৫১৭ খ্রিস্টাব্দে এই লোকের উত্তরাধিকারী এই পদবি বদলি (Transfer) হয়ে যায় অটোম্যান সুলতান প্রথম সেলিমের কাছে।

১২.৪ ফাতেমি বংশ (৯০৮ - ১১৭১)

৯০৮ খ্রিস্টাব্দে আবু মোহাম্মদ ওবায়দুল্লাহ ধর্মীয় নেতা ছিলেন। শিয়া গোষ্ঠীর নেতা। আব্বাসি খলিফা তার প্রতি বিরূপ ছিলেন বলে তিনি তিউনিশিয়ায় পালিয়ে যান। এখানে এসে তার ভাগ্য সুপ্রসন্ন থাকায় বিভিন্ন কারণে তিনি ক্ষমতা লাভ করে ফাতেমি বংশের পত্তন করেন। তিউনিশিয়া থেকে ১০০ মাইল দক্ষিণে মাহদিতে রাজধানী স্থাপন করেন। ওবাইদুল্লাহ দাবি করেন যে তিনি প্রফেট মোহাম্মদের কন্যা ও আলীর স্ত্রী ফাতেমার বংশধর, এই কারণে এই বংশের নাম হয়েছিল ফাতেমি রাজবংশ।

ওবাইদুল্লাহর আব্বাসি প্রতিপক্ষরা ফাঁস করে দেয় যে তিনি আসলে ছিলেন এক ইহুদির নাতি এবং ম্যাগি (জোরাস্ত্রিয়ান) বংশের সাথেও জড়িত। তার ব্যক্তিগত চিকিৎসক ও উপদেষ্টা ছিলেন মিসরীয় ইহুদি, পশ্চিম দেশে আইজাক জুদাউস বলে পরিচিত। আইজাকের লিখিত অনেক ফরমুলা ইসলামী ও পশ্চিমা চিকিৎসাবিদ্যায় যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছে। সেটা সপ্তম শতাব্দির কথা।

ওবাইদুল্লাহর নাতি মুইজ (৯৫৩-৭৫) ৯৭২ খ্রিস্টাব্দে মিসর জয় করেন তারপর করেন প্যালেস্টাইন ও সিরিয়া। দুইজন প্রখ্যাত পুরুষ তার অধীনে কাজ করেছেন একজন ইয়াকুব ইবন কিল্লিস, বাগদাদের ইহুদি পরে মুসলিম হন। তিনি একজন

www.pathagar.com

অর্থনীতিবিশারদ ছিলেন এবং সাম্রাজ্যের সিভিল সার্ভিস ও কর পদ্ধতিকে ঢেলে সাজান যা ফাতেমি বংশের শেষকাল পর্যন্ত চালু ছিল। এই বংশে প্রশাসন আমলাতন্ত্রের উচ্চস্তর পর্যন্ত সব কর্মকর্তা ও কর্মচারী দ্বারা পরিচালিত হতো। অন্যজন ছিলেন একজন সেনাপতি নাম জওহর। ইনি মূলত সাবেক গ্রিক ক্রীতদাস ছিলেন এবং এর যুদ্ধ কৌশলে মিসর বিজয় সম্ভব হয়। জওহর কাইরো নগরীর প্রতিষ্ঠাতা (আল-কাহিরা অর্থাৎ বিজয়ী)। এই শহর পুরনো ফুসতাত শহর থেকে কিছু দূরে। কাইরোতে নতুন রাজধানী প্রতিষ্ঠা করা হয়। কাইরোর সাথে বাইজানটাইনদের বাণিজ্যের কারণে মিসর অল্প সময়েই উন্নতি লাভ করে।

একজন প্রখ্যাত প্রশাসক ছাড়া জওহর ছিলেন বিদ্যানুরাগী। তিনি কাইরোতে জ্ঞানগৃহ (House of Wisdom) নির্মাণ করেন এবং ৯৭০ খ্রিস্টাব্দে আল-আজহার স্কুল ও মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন। আল-আজহার নামকরণ হয় প্রফেটের কন্যা ফাতেমার অপর নাম 'আল-জোহরা' থেকে। পরবর্তীতে এই স্কুল শিয়া পাঠ কেন্দ্র রূপে গড়ে ওঠে। শতাব্দি পরে আল-আজহার পাঠকেন্দ্রকে অর্থোডক্সে রূপান্তরিত করা হয় এবং বর্তমানকাল পর্যন্ত সুন্নি অর্থোডক্সদের ধর্মীয় জীবন গঠনের প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়।

আজিজ (৯৭৬-৯৬) পিতা মুইজের মৃত্যুর পর সিংহাসন আরোহণ করেন এবং একজন খ্রিস্টান রমণীকে বিবাহ করেন। তিনি তার স্ত্রীর দুই ভাইকে আলেক্সান্দ্রিয়া ও জেরুজালেমে বিশপের পদে অধিষ্ঠিত করেন, তার ভিজির বা প্রধানমন্ত্রীও ছিলেন একজন খ্রিস্টান, নাম ছিল ঈসা ইবন নাসতুরিস। মুইজ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত জ্ঞানগৃহকে আরো বৃহৎ ও মর্যাদাশীল করে তোলেন নাসতুরিস।

আজিজের পুত্র হাকিম ৬ষ্ঠ খলিফারূপে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ৯৯৬ খ্রিঃ থেকে ১০২১ খ্রিঃ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তার চারিত্রিক স্ববিরোধিতা ছিল এবং মেজাজের ঠিক থাকত না। কখনো তিনি সদয় মহানুভব প্রশাসক, কখনো অতি কঠোর ও নিষ্ঠুর স্বেচ্ছাচারী। ফহদ বিন ইব্রাহিম নামে এক খ্রিস্টান তার প্রধান সেক্রেটারি ছিলেন এবং তার সামরিক উপদেষ্টা ছিলেন পূর্ব বর্ণিত জওহরের পুত্র হোসেন; ফহদের উপদেশে খলিফা জ্ঞানগৃহের আরো উন্নতি সাধন করেন এবং লাইব্রেরি কক্ষ চল্লিশ করে প্রত্যেক কক্ষ পুস্তক দিয়ে ভরিয়ে দেন।

হঠাৎ মেজাজের বশে উত্তেজিত হয়ে তিনি তার সামরিক উপদেষ্টা হোসেনকে হত্যার আদেশ দেন এবং খ্রিস্টানদের ওপর অত্যাচার শুরু করেন এবং অসংখ্য চার্চ ভেঙে ফেলেন– এমনকি জেরুজালেমের চার্চ পবিত্র সেপালকার ১০০৯ সালে গুঁড়িয়ে দেন। এই কারণে পশ্চিমের খ্রিস্টানরা একে অন্যের নিকট আবেদন জানিয়ে এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে সমবেত হন। শুরু হয় রক্তক্ষয়ী ক্রুসেড।

হাকিমের পরবর্তী কর্মসূচি হলো, তিনি প্রথম খলিফাদের অভিশপ্ত ঘোষণা দিয়ে নিজেকে আল্লাহর ছায়া বলে দাবি করেন এবং একটি নতুন ধর্ম প্রবর্তনের চেষ্টা করেন। পরিশেষে বিক্ষুব্ধ প্রজাদের দ্বারা তিনি খুন হয়ে যান, যদিও প্রচার করা হলো যে তিনি রহস্যজনকভাবে গায়েব হয়ে গেছেন। তার দেবত্বের দাবির সূত্র ধরে লেবাননে তার অনুসারীরা দ্রুজ (Druz) গোষ্ঠীর (Sect) সূত্রপাত করে।

www.pathagar.com

অক্ষম খলিফা মুসতানসির (১০৩৭-৯৪) ওবাইদুল্লাহর প্রপৌত্র ছিলেন। এর সময়ে ফাতেমি সাম্রাজ্য-সীমানা ছিল সমগ্র উত্তর আরবসহ সিসিলি, সিরিয়া এবং পশ্চিম আরাবিয়া। মুসতানসিরের রাজত্বের শেষের দিকে তুর্কিরা সিরিয়া ও প্যালেস্টাইন আক্রমণ করে দামেস্ক ও জেরুজালেম দখল করে নেয় এবং সুদানিজ, বার্বার এবং অন্যান্য বিদ্রোহী গ্রুপ তার রাজ্যে বিশৃঙ্খলা ও সমস্যার সৃষ্টি করে। খলিফা তখন তার একারের (Acre) আর্মেনিয়ান গভর্নর বদর আল জামালির কাছে আবেদন জানান তিনি সৈন্যসামন্ত নিয়ে এসে বিদ্রোহ দমন করে যেন শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন। সাধারণভাবে যা হয় তাই হলো। বিদেশী হিসাবে ক্ষমতায় সাহায্য করতে এসে তারাই ক্ষমতা হাতে তুলে নিল। বদর তার কন্যার পুত্র মালিক আল-ফজল খলিফার পরবর্তী উপদেষ্টা হলেন এবং খলিফা নির্বাচনের দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নিলেন।

এই অবস্থায় শাসনকার্য থেকে খলিফার কর্তৃত্ব শিথিল হয়ে ফাতেমি সাম্রাজ্য আস্তে আস্তে ক্ষয় হতে লাগল। এই সময় শিয়া-সুন্নির বিরোধ মাথা চাড়া দিয়ে উঠল এবং জাতিগত বিরোধ তুর্কি, প্যালেস্টানিয়ান ও ইরাকিদের মধ্যে শুরু হয়ে গেল এবং পশ্চিম দিকে বার্বার, মুরস ও সুদানিজরাও বসে রইল না। কামড়া-কামড়ি লেগে গেল।

এই বংশের পতন ত্বরান্বিত হলো যখন ভিজিরদের ক্ষমতা বেড়ে যায়। এদের খলিফা নিয়ন্ত্রণ করতে পারলেন না, তাদের পদচ্যুত করতে সাহসও হলো না। ভিজিরদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার শেষে কুর্দিশ সেনাপতি সালাহউদ্দিন (পশ্চিমে সালাদিন নামে খ্যাত) বিজয়ীর বেশে বের হয়ে এসে ১১৭১ খ্রিস্টাব্দে শেষ খলিফাকে সরিয়ে নিজেই মিসর দখল করেন এবং আয়ুবিদ বংশের প্রতিষ্ঠা করেন (১১৭১-১২৫৪)। এরপর মিসরে শুরু হয় মামলুক (দাস) বংশ (১২৫৪-১৫১৭), শুরু হয় খলিফার সামরিক দেহরক্ষী দল থেকে। খলিফা সামরিক দেহরক্ষী গঠন করেন তুর্কি ও সিরকাসিয়ান ক্রীতদাসদের দিয়ে আর এরাই এক সময়ে রোমান প্রেটোরিয়ান-কর্তৃত্ব গ্রহণ করে শেষে রাজ্য দখল করে বসে।

মামলুক সুলতানদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন বাইবারস, যিনি ১২৬০ সালে নাজারেথের কাছে আইন জালুত (The Spring of Goliath) যুদ্ধে মঙ্গলদের পরাজিত করে তাদের পশ্চিম দিকের রাজ্য বিস্তার ঠেকিয়ে দেন। মামলুকেরা রাজত্ব করেছে ১৫১৭ খ্রিঃ পর্যন্ত, যখন মিসর অটোমেন তুর্কিরা দখল করে নেয়। এরপর মিসর কালের গহ্বরে তলিয়ে যায়। তবে এই মামলুকেরা মিসরে স্বাধীন সামরিক জাতি হিসাবে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল ১৮১১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত যখন মিসরের মোহাম্মদ আলী পাশা তাদের সমূলে উপড়ে দেন।

১২.৫ ক্রুসেড (১০৯৫-১২৯১)

বিশাল খ্রিস্টান সম্প্রদায় পবিত্র ভূমিতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে তুলনামূলকভাবে ইহুদি ও অন্যান্য প্যাগন প্রতিবেশীদের সাথে সুখে-শান্তিতে বাস করছিল ইসলামের আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত।

যখন জেরুজালেমের আর্কবিশপ সোফ্রোনিয়াস (Sophronius) ৬৩৭ খ্রিস্টাব্দে খলিফা ওমরের কাছে জেরুজালেমকে সমর্পণ করতে বাধ্য হলেন, তাকে বলা হয়েছিল

www.pathagar.com

যে খ্রিস্টানরা তাদের চার্চে স্বাধীনভাবে ধর্ম পালন করতে পারবে। কিন্তু নতুন কোনো চার্চ জেরুজালেমে নির্মাণ করা যাবে না। খ্রিস্টানরা কাউকে তাদের ধর্মে দীক্ষা দিতে পারবে না, চার্চের ওপরে ক্রস প্রদর্শন করতে পারবে না বা তাদের ধর্মের কারণে কোনো গণবিক্ষোভও করতে পারবে না।

এই বাধা-নিষেধগুলো চলে আসছিল ওমরের পরবর্তী খলিফাদের সময়েও। খ্রিস্টানরা, যারা তাদের পবিত্র স্থানে, যেমন জেরুজালেম ও বেথেলহেম, গমন করতে চাইত, তাদের অনুমতি দেয়া হতো অত্যধিক ফি প্রদানের পর। তারা কোনো আইনের আশ্রয় নিতে পারত না, কারণ, আইন তাদের পক্ষে ছিল না। দমন ও ভেদনীতি, তীর্থযাত্রীদের ওপর আক্রমণ, খ্রিস্টান মঠগুলোতে লুটপাট, খ্রিস্টান প্রার্থনালয় ভেঙে দেয়া ইত্যাদি সাধারণ ব্যাপার ছিল মুসলিম আধিপত্যের সময়ে।

দশম শতাব্দি থেকে পরিস্থিতির আরো অবনতি হলো এবং অত্যাচার গেল বেড়ে। ৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে মুসলিমরা রামলেহ, সিজরা এবং আসকালনের চার্চগুলো ধ্বংস করে দেয়। ৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে ফাতেমি খলিফা মুইজ জেরুজালেমের হলি সেপালকার চার্চের এক অংশ পুড়িয়ে দেন। ৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে জেরুজালেমের আর্কবিশপকে বাইজানটাইনের গুপ্তচর অভিযোগে জীবন্ত দগ্ধ করে মারা হয়।

১০০৯ খ্রিস্টাব্দে ফাতেমি খলিফা হাকিম নন-মুসলিমদের ওপর জঘন্য অত্যাচার শুরু করেন। পবিত্র ভূমিতে (জেরুজালেম) তীর্থযাত্রা বন্ধ করে দেন এবং হলি সেপালকার চার্চ ধ্বংস করেন। (এর পুনর্নির্মাণ শুরু হয় ১০২৭ সালে বাইজানটাইন সম্রাট অষ্টম কনস্ট্যান্টাইন কর্তৃক)।

১০৭১ সালে আর্মেনিয়ার মাঞ্জিকার্ট যুদ্ধে সেলজুক সুলতান আরপ্ আরসালান বাইজানটাইন সম্রাট চতুর্থ রোমানাসকে পরাজিত করেন। এই পরাজয় খ্রিস্টানদের কফিনের শেষ পেরেক। এই সময় কনস্ট্যান্টিনোপল দুর্বল হয়ে গেছে; খ্রিস্টানরা অন্য কোনো উপায় না দেখে নিরাপত্তার কারণে পশ্চিম দিকে সাহায্যের জন্য আবেদন জানায়।

পশ্চিম থেকে উত্তর এল ক্রুসেডের (ধর্মযুদ্ধ) আকারে; লাগাতার আটটি যুদ্ধ খ্রিস্টান ও 'পেনিম', ক্রস ও ক্রিসেন্টের পূর্ব ও পশ্চিমে শুরু হয়ে গেল, যে যুদ্ধে বিভিন্ন জাতি, ধর্ম, সংস্কৃতি, সামাজিক ব্যবস্থা ও সভ্যতা জড়িত ছিল।

ক্রুসেড এল তরঙ্গের মতো, সংগঠনে, সজ্জায়, অস্ত্রশস্ত্রে এবং ঐক্যে দুর্বল হয়ে। বিভিন্ন বর্ণধারী (motley) খ্রিস্টান সেনাবাহিনী, যারা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিল না, তাদের দু'হাজার মাইল হাঁটিয়ে এনে ক্লান্ত অবস্থায় তাদের আর সংঘবদ্ধভাবে দাঁড় করানো যায়নি। এই যুদ্ধযাত্রার জোয়ার শেষে ভাটা হয়ে গেছে, কিন্তু জেরুজালেম উদ্ধারের উদ্দেশ্য ছিল প্রধান। ১০৭৬ খ্রিস্টাব্দে সেলজুক তুর্কিরা ফাতেমিদের কাছ থেকে জেরুজালেম নিয়ে শহরের নয়-ছয় করে দেয় এবং এই ধ্বংসলীলায় বহু খ্রিস্টান প্রাণ হারায়। খ্রিস্টানদের প্রতি এই নিষ্ঠুরতা পশ্চিমে যথেষ্ট প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। ১০৯৮ খ্রিস্টাব্দে ফাতেমিরা তুর্কিদের কাছ থেকে জেরুজালেম পুনরুদ্ধার করে। তাদের এই বিজয় ক্ষণস্থায়ী ছিল, কারণ পরের বছর ক্রুসেডাররা জেরুজালেম দখল করে সিরিয়ান কোস্টে বেশ কয়েকটি খ্রিস্টান স্থাপনা বা প্রধান কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে। ১১৮৭ খ্রিস্টাব্দে

www.pathagar.com

মিসরের সালাদিন জেরুজালেম অধিকার করেন। ১২৪৪ সালে এই শহর আবার তুর্কি বাহিনীর দখলে চলে যায়। এইভাবে চলতে থাকল এবং আশপাশের শহরগুলো একার (Acre) থেকে এলেপ্পো (Aleppo) বারবার হাতবদলের পর সর্বশেষে ১২৯১ খ্রিস্টাব্দে ক্রুসেডারদের পবিত্র ভূমি জেরুজালেম থেকে বিতাড়িত করা হয়।

দু'শো বছরের ক্রুসেডের যে সংঘাত তাকে আরো সমস্যা জড়িত করে তোলা হয়েছিল উভয়পক্ষের মিত্র বদলের কারণে। এই ধর্মযুদ্ধে প্রধান দুটি দল হলো খ্রিস্টান ও মুসলিম, এদের মধ্যে ছিল ধর্মীয় পার্থক্য। তেমনি ছিল গোত্র পার্থক্য। উভয় দলে নিজেদের মধ্যে অনৈক্য থাকার জন্য মিত্র স্থাপনের ক্ষেত্রে ধর্মের বাধা ছিল না।

দুই শতাব্দি ধরে যে ক্রুসেড চলেছে, এতে মুসলিম দলে প্রতিদ্বন্দ্বী গোত্র ছিল, কাইরোর ফাতেমি খিলাফত, বাগদাদের আব্বাসি খিলাফত, আইকোনিয়ামের সেলজুক সুলতানাত এবং দামাস্কের। এন্টিয়কের, এলেপ্পের, এডেসার ও ট্রিপোলির এমিরেটগণ। পবিত্র ভূমির কিছু অংশ নিয়ন্ত্রণ করত বাগদাদ, কখনো কখনো কাইরো এবং কখনো কাইরোর কর্তৃত্ব সংরক্ষিত শহরের গেটের বাইরে ছিল না। অধীনস্ত মুসলিম প্রধানদের কেউ কেউ একদিকে যেমন খলিফাদের ঘৃণা করত, অন্য দিকে ক্রুসেডারদেরও ঘৃণা করত এবং কোনো সময়ে তাদের সাথে মিত্রতা গড়েছে বা খ্রিস্টানদের সাহায্যও করেছে।

ওদিকে ক্রুসেডারদের মধ্যে রেষারেষি ও ভেদাভেদ ছিল। যারা পশ্চিম থেকে এসেছিল তাদের ফ্র্যাঙ্ক বলা হতো, এরা ছিল রোমের ল্যাটিন চার্চের সাথে সংযুক্ত; অন্য দিকে পূর্বের মিত্র শক্তি ছিল বাইজানটিয়াম যা সংযুক্ত ছিল গ্রিক অর্থোডক্স চার্চের সাথে। এদের মধ্যে সাময়িকভাবে কোয়ালিশন থাকলেও বহুকাল ধরে এরা অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী এবং ১২০৪ খ্রিস্টাব্দে, যখন মিসরের বিরুদ্ধে চতুর্থ ক্রুসেড চলছিল, ক্রুসেডাররা তখন মিসরকে ছেড়ে কনস্ট্যান্টিনোপলের ওপর আক্রমণ করে বসে।

১২৬০ খ্রিস্টাব্দে মঙ্গল নেতা হালাকু বাগদাদ ধ্বংসের পর দামেস্ক অধিকার করেন, কিন্তু এই সময়েই তাকে দেশ থেকে পারিবারিক বংশগত সমস্যা মিটাবার জন্য ডেকে পাঠানো হয়। তিনি তার প্রধান সেনাপতি কিতবোগাকে চার্জ দিয়ে যান। কিতবোগা এবং তার অধীনে কর্মরত অনেক কর্মকর্তা ও কর্মী ছিলেন নেস্টোরিয়ান খ্রিস্টান। কিন্তু ক্রুসেডাররা নেস্টোরিয়ানকে হেরেটিক (বিধর্মী) মনে করত, তাই তারা মঙ্গলদের কোনো সাহায্য নিতে ইচ্ছুক ছিল না, এর চেয়ে তারা মুর ও তুর্কিদের বন্ধুত্ব কামনা করেছে, এমনকি এসাসিন গোষ্ঠীদের বন্ধু ভেবেছে।

এই সময়কালে, ভিনিস, জেনোয়া, নেপলস্, সিয়েনা (Siena) ও পিসার ধনী মার্চেন্টরা ক্রুসেডারদের একদিকে যেমন অস্ত্রশস্ত্র সাপ্লাই করেছে, অন্য দিকে তেমনি সিরিয়ান ও মিসরীয়দের সাথে বিলাসদ্রব্যের বদলে জরুরি পণ্যদ্রব্য সাপ্লাই করেছে।

ক্রুসেডের কালে ইউরোপে চরম ধর্মীয় প্রপাগাণ্ডা চালানো হয়েছে এবং ইতিহাসে শুধু এই সময়ে সারা কন্টিনেন্ট, অন্তত সাময়িকভাবে; একটা নির্দিষ্ট কর্মের লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল বলে মনে হয়। জনসংখ্যার প্রতি স্তর থেকেই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে, এই প্রচেষ্টায় অংশগ্রহণ করেছে। পোপ থেকে কৃষককুল, ধনী থেকে দরিদ্র, অভিজাত সম্প্রদায় থেকে দাস শ্রেণী, ধর্মবেত্তা থেকে রোমান্টিক, দুঃসাহসী

www.pathagar.com

থেকে উচ্চাকাঙ্ক্ষী এবং একটি ক্ষেত্রে নির্বুদ্ধিতার কারণে শিশুদেরও পাঠানো হয়েছে এই ধর্মযুদ্ধে। (১২১২ সালে ক্রুসেডের সময় যেসব শিশুদের আলেক্সান্দ্রিয়া পাঠানো হয়েছিল তারা আলেক্সান্দ্রিয়ায় পৌঁছালে সেই শিশুদের ক্রীতদাসরূপে বিক্রি করা হয়)।

ক্রুসেডের সময় যেসব রাজা বা সম্রাট অংশ নিয়েছিলেন তাদের মধ্যে ছিলেন ইংল্যান্ডের প্রথম রিচার্ড দ্য লায়ন হার্ট (মৃ. ১১৯৯)। আরবদের কাছে মালিক রিক নামে পরিচিত।

আর ছিলেন প্রথম এডওয়ার্ড (মৃ. ১৩০৭)। ফ্রান্সের ছিলেন অষ্টম লুই (মৃ. ১২২৬) এবং সেন্ট নবম লুই (মৃ. ১২৭০)। সেন্ট নবম লুইকে আরবরা বন্দি করে এবং তিনি বন্দি অবস্থায় বারো বছর ছিলেন। তৃতীয় কনরার্ড (মৃ. ১১৫২), হোহেনস্টফেনের রাজা; 'বারবারোসা' প্রথম ফ্রেডেরিক (মৃ. ১১৯০), হলি রোমান এমপেরর, যিনি এশিয়া মাইনরের একটি নদীতে ডুবে যান এবং দ্বিতীয় ফ্রেডেরিক (মৃ. ১২৫০); হলি রোমান এমপেরর, যিনি পোপের নির্বাসন মাথায় করে ক্রুসেডে যাত্রা করেছিলেন এবং ১২২৯ খ্রিস্টাব্দে সাময়িকভাবে যুদ্ধ ছাড়া জেরুজালেম পুনরুদ্ধার করেন।

ক্রুসডের ধারণা মধ্যযুগে খ্রিস্ট-সাম্রাজ্যে এমন গভীরভাবে দাগ কেটেছিল যে, ইংল্যান্ডের রাজা আর্থার (৬০০) এবং ফ্রান্সের শার্লিমেন (৮০০) যারা ক্রুসেডের বহু পূর্বে গত হয়েছিলেন, মনে হতো তারাও যেন এই যুদ্ধে অংশ নিচ্ছেন।

ক্রুসেড দুই পক্ষের জন্য সামান্যই গৌরব বহন করে। ষড়যন্ত্র, বিশ্বাসঘাতকতা, প্রতারণা, সপক্ষ ভঙ্গ খ্রিস্টান ও মুসলিম উভয় পক্ষেই প্রযোজ্য ছিল। ইংরেজ সংস্কারক জন ওয়াইলিফ (মৃ. ১৩৮৪) মন্তব্য করেছেন যে দু'পক্ষই সমানভাবে অসাধু ছিল। সেরুসিনদের মতো খ্রিস্টানরা ক্রীতদাসদের ব্যবহার করেছে এবং খ্রিস্টান রাজারা হেরেম পুষতেন। উভয় পক্ষেই যেমন বীরত্ব প্রকাশ করেছে তেমনি করেছে বর্বরতা। উভয় লুটপাট করেছে, ধ্বংস করেছে এবং নারী শিশু ও বেসামরিক জনগণকে ম্যাসাকার করেছে। সালাদিন ও রিচার্ড দ্য লায়ন হার্ট ক্রুসেডের দুই পক্ষের নায়ক ছিলেন, এরা যেমন সময় সময় উদারতা ও মহানুভবতা প্রকাশ করেছেন তেমনি সময় সময় নিষ্ঠুরতার চরমে পৌঁছেছেন। কিন্তু উভয় পক্ষ এই দুই নায়কের শুধু গুণগানই করেছে।

ক্রুসেডের সার্বিক ফলাফল ব্যাপক ছিল। ক্রুসেড ইউরোপে ফিউডাল প্রথার অবসান ঘটিয়েছে এবং কৃষকদের বন্ধনমুক্ত করেছে এবং কারিগর ও শিল্পীদের গিল্ড সৃষ্টি করেছে। আর ব্যবসা-বাণিজ্য ও ব্যাংকিং ক্ষেত্রে উন্নয়নের মাধ্যমে ইউরোপে বণিক সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক সুবিধা এনে পূর্ব দিকে বাণিজ্যের দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছে।

এই যুদ্ধের ফলে মুসলিম বিশ্বে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যেমন প্রসার ঘটেছে, পশ্চিম তেমন হয়নি। ম্যাক্স মায়ারহফ (Max Meyerhof) লিখেছেন– ইউরোপে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ওপর ক্রুসেডের তেমন প্রভাব পড়েনি, যেমন পড়েছিল মুসলিম বিশ্বে (Arnold and Guillaume 1915, P. 347)।

ক্রুসেডাররা এবং মুসলিম উভয়ে বাইজানটাইনের সামরিক কৌশল রপ্ত করে। সেই

www.pathagar.com

কৌশল একে অপরের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করেছে। কিন্তু এই যুদ্ধ বাইজানটাইন সাম্রাজ্য সামরিক শক্তি ভেঙে দিয়েছে, যে শক্তি মুসলিম সাম্রাজ্যে বসবাসরত খ্রিস্টানদের প্রাণশক্তি ছিল। রোমান চার্চেরও অবস্থা ভালো ছিল না। কারণ সুদূর ভবিষ্যতে এই সংগ্রামের ফলে পোপের ক্ষমতা হ্রাস পেতে সাহায্য করেছে। তবে এটা সত্য যে ক্রুসেড নাইট টেম্পলার, নাইট হসপিট্যালারস এবং টিউটোনিক সামন্তদের শৌর্য ও বীর্য বাড়িয়ে দিয়েছে। এই সংঘর্ষ থেকে উৎসারিত হয়েছে 'আর্ট অব হেরাল্ডি' ও 'কোটস্ অব আর্মস,' এর ব্যাপক ব্যবহার যা মূলত বন্ধু ও শত্রুর মধ্যে প্রভেদ এনে দিয়েছে।

এই ক্রুসেড খ্রিস্টানে খ্রিস্টানে ও মুসলিমে মুসলিমে যে ভেদাভেদ ছিল তার অতি সামান্যই উপশম করতে পেরেছে। এই দুই ধর্মে যে বিভক্তি ছিল তা রয়েই গেছে; আর খ্রিস্টান ও মুসলিমদের মিলন ঘটাতেও পারেনি। মুসলিম রাজাদের সাথে সমন্বয় ও সমঝোতা করার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। আসিসির (Assisi) সেন্ট ফ্র্যান্সিসকে মিসরের সুলতান ১২২৩ সালে অতি ভদ্রতার সাথে স্বাগত জানান, কিন্তু পাঁচজন ফ্রান্সিসক্যান মিশনারি মরক্কোতে পাঠানো হলে তাদের হত্যা করা হয় এবং আলজিরিয়ার বেজাইয়াতে ধর্মগুরু রেমন্ড লাললিকে জনতা পাথর ছুড়ে মেরে ফেলে।

সর্বোপরি, শতাব্দি ধরে যে ক্রুসেড চলেছিল শুধু রেখে গেছে অবিশ্বাস আর সন্দেহ যা এখনও ইসলাম ও পশ্চিম দেশের মধ্যে বিরাজ করছে।

১২.৬ স্পেন দখল (৭১২ - ১৪৯২)

৭১০ খ্রিস্টাব্দে বার্বার প্রধান তারিক বিশ্বাসঘাতক ভিজিগথ জুলিয়েনের সাহায্যে আফ্রিকা ও ইউরোপের মধ্যে জিব্রাল্টার প্রণালীতে অভিযান চালিয়ে স্পেনে পদার্পণ করেন। তারিকের নাম এখনো এই প্রণালী বহন করছে জবল-উল-তারিক অর্থাৎ জিব্রাল্টার নামে।

এই অভিযানে উদ্দীপ্ত হয়ে মুসা ইবন নূসাইর একটা বড় ধরনের অভিযানের প্রস্তুতি নেন। মুসা তখন দামেস্কর উমাইয়া খলিফার অধীনে উত্তর আফ্রিকার (ইফ্রিকিয়া) গভর্নর ছিলেন। ৭১১ সালে বসন্তকালে তিনি বার্বার দাস তারিক ইবন জিয়াদকে মুক্ত করে তার অধীনে সতের হাজার বার্বার সৈন্য এবং দুই হাজার আরব সেনা পাঠান। এদিকে তার কিছু জাহাজ ঐ প্রণালী পাঠিয়ে দেন আরব সেনাদের সাহায্যে।

তারিক সৈন্যসামন্ত নিয়ে জিব্রাল্টার পর্বতে অবতরণ করলেন এবং দখলদার ভিজিগথ রাজা রডারিককে হত্যা করে প্রথমে কর্ডোভা অধিকার করে পরে দখল নিলেন টলেডোর। কর্ডোভা আরবদের রাজধানী হলো। জিব্রাল্টার-এর উত্তর অঞ্চলের ভ্যান্ডালদেশগুলোকে আন্দালুস (আন্দালুসিয়া) বলা হতো।

আর একটি মুসলিম বাহিনী ভূতপূর্ব খ্রিস্টান কাল্‌ব ও কাইস গোত্রের সেনাদের সহযোগে উত্তর দিকে পিরেনিজ অতিক্রম করে ফ্রান্সের দক্ষিণ কোস্ট আক্রমণ করে। এই অঞ্চলকে এখনো কোত দ্য মোর (মুরিশ কোস্ট) বলা হয়। মুরিশ সেনাবাহিনী ফ্রান্সের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ে প্রায় দখলে এনেছিল, কিন্তু ৭৩২ খ্রিস্টাব্দে পয়টার ও টুরস্-এর মধ্যে চার্লস মার্টেল দ্বারা প্রতিহত হয়ে পরাজিত হয়। এই স্থানটি প্যারিস

www.pathagar.com

থেকে মাত্র দু'শো মাইল দূরত্বে।

পয়টারের (Poitiers) যুদ্ধ বিশ্ব ও আরব ইতিহাসে একটি দৃষ্টান্তমূলক ঘটনা। কিন্তু প্রফেট মোহাম্মদের মৃত্যুর একশো বছর পরে মুসলিম রাজ্যের পশ্চিম দিকের বিস্তৃতির সীমানা নির্ধারণ করে।

এই যুদ্ধে আরবদের জয় হলে, পশ্চিম ইউরোপ ও বিশ্বের ইতিহাস অন্য রকম হতে পারত। গিবনের ধারণায় টেমস্ ও রাইন নদীর উপরে হয়তো আরব নৌবহর ঘুরে বেড়াত এবং অক্সফোর্ড মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে কোরানের ব্যাখ্যা হতো যেখানে 'her pulpil's might demonstrate to a circumcised people the sanetity and truth of the revelation of Mahoment."

ফ্যান্স থেকে বিতাড়িত হয়ে মুসলিমরা স্পেনে আস্তানা তৈরি করল, যদিও আরব ও বার্বারদের অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বিরোধ তিক্ত ছিল। এই অবস্থা চলতে থাকে যতদিন না উমাইয়া শাহজাদা প্রথম আবদুর রহমান (মৃ. ৭৮৮) এখানে এসে পৌঁছান। আবদুর রহমান খলিফা হিশামের দৌহিত্র। উমাইয়া রাজত্ব (৭৫০ খ্রিস্টাব্দে) অবসান হলে আরববাসীদের নির্যাতন থেকে বাঁচার জন্য স্পেনে পালিয়ে আসেন এবং কর্ডোভায় দামেস্কর মতো উমাইয়া বংশের পত্তন করেন। এখানে উমাইয়ারা সরকারকে ন্যায় ও সহিষ্ণুতার আদর্শে গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। এই বংশ (৭৫৬-১০৩১) উন্নতির শীর্ষে ওঠে তৃতীয় আবদুর রহমানের রাজত্বকালে (মৃ. ৯৬১) যার মন্ত্রী ও রাজচিকিৎসক ছিলেন একজন ইহুদি। এই ইহুদির নাম ছিল হাসডে বেন শাপরুত। ইনি সঙ্গীত ও বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

একাদশ শতাব্দির শুরুতে আন্দালুসিয়া বা মুসলিম স্পেন ছোট ছোট রাজ্যে ভেঙে গেল এবং প্রত্যেক স্টেট (বা তাইফা) শাসিত হতো বার্বার আর ভ্যান্ডেল বা স্লাভ দ্বারা। এদের মধ্যে বেশির ভাগ ছিল মুর। আর কিছু ছিল খ্রিস্টান এবং প্রত্যেকে নিজেদের সুবিধামতো একে অন্যের সাথে বন্ধুত্ব গড়েছে। স্থানীয় খ্রিস্টানরা, যারা এই মুরদের সময় নিজের ধর্মপালন করেছে, তাদের মোজারেব (আরবীয়) বলা হতো। এরা ছিল সংমিশ্রিত রক্তের-মিক্সড ব্লাড। এই জাতীয় খ্রিস্টানরা আরবদের মতো পোশাক পরত এবং জীবনধারাও সেইরকম। এরা ছিল মুসলিম ও স্থানীয় স্পেনীয়দের মধ্যে যোগসূত্র। তারা স্পেনীয় মুসলিমদের মতো দুটো ভাষাই বলত। তারা রাষ্ট্রভাষা আরবি পড়তে ও লিখতে পারত। এছাড়া স্পেনীয় ভাষার উন্নয়নের জন্য কিছু ল্যাটিন চর্চাও করত। মোজারেবরা মুসলিম স্পেনে সাংস্কৃতিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে যথেষ্ট অবদান রেখেছে এবং আরবরা ও মুরগণ ও দেশ পরিত্যাগ করলে আরবি বিজ্ঞান এবং শিক্ষা স্পেনে ছড়িয়ে দিয়েছে। এই সময়ের মধ্যে স্পেনীয় অভিজাত পরিবারের কিছু অংশ আরবির ভাবধারায় প্রভাবিত ছিল।

মরক্কো থেকে আফ্রিকান বার্বার কর্তৃক আরও একটি অভিযান চালানো হয়েছিল এবং তারা আল-মোরাবিদ বংশের (১০৮৫-১১৪৭) পত্তন করে এবং এর পরে অ্যাটলাস অঞ্চল থেকে আর একটি অভিযান বার্বারগণ করেছিল যারা আল মোহাদ বংশের ভিত্তি স্থাপন করে (১১৩৩-১২৭০)। এই দুই বংশের সম্মিলিত শক্তি মিলে ক্ষুদ্র (তাইফা) রাষ্ট্রগুলোকে ধ্বংস করে একটি যুক্তরাজ্য গঠন করে। এই উভয় বংশের ধারা

www.pathagar.com

ছিল গোঁড়ামি (অর্থোডক্স), তাই এরা অমুসলিম ও মোজারের প্রতি অসহিষ্ণু ছিল। ১১৪৩ খ্রিস্টাব্দে আলমোহাদ খলিফা আব্দুল মুমিন ইহুদি ও খ্রিস্টানদের যারা ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকার করে, তাদের বিতাড়িত করতে আদেশ দেন, কিন্তু এই সময় ভীষণ গোলযোগ শুরু হলে এই আদেশ বাস্তবায়িত হয়নি।

এই সময়ের গোলযোগের পর স্পেনে সাংস্কৃতিক উন্নয়নের ধারা বলতে গেলে থেমে যায়। তার ওপরে দখলদার শক্তির মধ্যে জাতিগত বিরোধ শুরু হয় এবং বাড়তে থাকে। বার্বার জোয়ানরা আরব রাজনীতি ও সামাজিক নীতির বিরোধিতা করতে আরম্ভ করে। গদিচ্যুত খ্রিস্টান সামন্তরা ফ্রাঙ্কদের সাহায্যে এই গণ্ডগোল মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে এবং আস্তে আস্তে তাদের হারানো রাজ্যের পুনরুদ্ধার শুরু করে।

স্পেনীয়দের নিজস্ব ভূমি পুনরুদ্ধারের প্রক্রিয়া দীর্ঘ ও বাধাগ্রস্ত ছিল, এক ধাক্কায় হয়ে ওঠেনি। ১০৮৫ সালে খ্রিস্টানদের দ্বারা টলেডো দখল স্প্যানিশ ইসলামের পঙ্গুত্ব এনে দেয় যা আইবেরিয়ান ক্রুসেডের প্রথম পদক্ষেপ। তারপর রে ডায়াজ দ্য বিভার নামে এক ডাকাত, সিড নামে বেশি পরিচিত, যিনি কখনো মুর সুলতান, কখনো খ্রিস্টান রাজার অধীনে কাজ করে, পরিশেষে স্পেনের পক্ষে যোগ দেয় এবং ১০৯৪ সালে ভ্যালেন্সিয়া দখল করে কিছুদিনের জন্য খ্রিস্টানদের অধীনে আনেন। সিড সম্ভবত একজন মোজারেব ছিল কিন্তু তাকে জাতে ওঠানো হয় এবং তার বীরত্ব কাহিনী নিয়ে অনেক রোমান্টিক গীতি ও ইতিহাস তৈরি হয়।

স্পেনকে খ্রিস্টানদের দখলে আনতে আরও অনেক কিছু বাকি ছিল। কিন্তু তারপর ধীরে ধীরে সংগঠিত হয়ে খ্রিস্টানরা সারাগোসা (১১১৮), তারপর কর্ডোভা (১২৩৬) এবং সেভিল (১২৪৮) দখল করে। ১৪৯২ খ্রিস্টাব্দে গ্রানাডার এগারোতম সুলতান আবু আবদুল্লাহ মোহাম্মদ (বোয়াবদিল নামে খ্যাত)কে বিতাড়িত করে খ্রিস্টানরা গ্রানাডা উদ্ধার করে স্পেন থেকে সব নন-ক্যাথলিকদের তাড়িয়ে দেয়।

মুসলিমদের স্পেন দখল সম্বন্ধে দুটো অভিমত আছে। কোনো কোনো পণ্ডিত ব্যক্তি বলে থাকেন মুরিশ স্পেন ছিল এমন একটা সময়ে যখন স্পেন অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় শিক্ষা, সংস্কৃতি ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যথেষ্ট উন্নতি সাধন করে। অন্যদের মতে, সাতশো বছরের মুরিশ প্রশাসন স্পেনে, আলহামরার মতো মুরিশ স্থাপত্য আর স্পেনীয় ভাষায় কয়েকটি বিদেশী শব্দের যোগান ছাড়া তেমন কিছু উন্নতি হয়নি। মোট কথা, বলা হয় যে, স্পেনের যে উন্নয়ন তা ইউরোপীয় লোকদের অবদানের অংশ; কিন্তু ইউরোপীয় সংস্কৃতি ও গণতন্ত্রের মুরিশ রাজত্বে তেমন প্রসার লাভ করেনি। যদি মুরিশ আধিপত্য আরো বজায় থাকত তাহলে স্পেনের অর্থনৈতিক অবস্থাও সংস্কৃতির দিক দিয়ে নর্থ আফ্রিকার বর্তমান মুসলিম রাষ্ট্রের মতোই থাকত, আজকের মতো আলোকিত হতো না।

১২.৭ তুর্কি ও তুরস্ক

তুর্কিদের 'তুরানিয়ান' বলা হয়। আরবরা তুর্কিদের প্রথম সাক্ষাৎ পায় এশিয়া মাইনরে। তুর্কিদের সামরিক দক্ষতা এবং অশ্বারোহী হিসাবে ক্ষিপ্রতা খলিফাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং ব্যাপকভাবে তাদের আমদানি শুরু হয়। ১০৪০ সালের মধ্যে তুর্কি

www.pathagar.com

গোত্র 'সেলজুক' হিসাবে খলিফার রাজ্যে প্রবেশ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে আরম্ভ করে। সময়ের সাথে তারা পারস্যের অধিকাংশ অঞ্চল তারপর ইরাক এবং শেষে সিরিয়া ও প্যালেস্টাইন স্থানীয় মুসলিমদের কাছ থেকে জয় করে নেয়। এরপর আইকোনিয়াম (কোনিয়া), আনাতোলিয়ার (এশিয়া মাইনর) পূর্বাংশ বাজানটাইদের থেকে ছিনিয়ে নেয়।

সেলজুকদের জ্ঞাতি ভাই 'অটোম্যান তুর্ক' নতুন শক্তিরূপে দেখা দেয় এবং সেলজুকদের সাথে মিশে যায়। ১২৯৯ খ্রিস্টাব্দে তারা পূর্ব আনাতোলিয়ায় অটোম্যান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে এবং বর্বর আগ্রাসী নীতি অনুসরণ করে। তাদের নিষ্ঠুরতা ও নৃশংসতা মঙ্গলদের সাথে তুলনা করা যায়।

১৩৬২ খ্রিস্টাব্দে সুলতান মুরাদ (রাজত্বকাল ১৩৬২-৮৯) তার অধীনস্ত গ্রিক সামন্তদের বেশ কিছু সংখ্যক খ্রিস্টান যুবক বন্দি রূপে গ্রহণ করেন এবং এই খ্রিস্টান বন্দিদের নিয়ে একটি সেনাদল গঠন করেন। এই সেনা দলের নামকরণ করা হয় 'ইয়েনি শেরি' বা জেনিসারি। এই জেনিসারি পরবর্তীতে তুর্কিসেনা দলের অভিজাত 'কোর' বলে গণ্য হয়।

১৪২০ খ্রিস্টাব্দে জেনিসারিদের ওপর খ্রিস্টান নীতির প্রভাব লক্ষ্য করে, তখনকার সুলতান প্রথম মোহাম্মদ (১৪১৩-২১) কিছু বেকতাসি তরিকার দরবেশ নিযুক্ত করেন জেনিসারিদের 'চ্যাপলেন' হিসাবে সেবাদান করতে। শতাব্দিকাল ধরে জেনিসারি দল যথেষ্ট ক্ষমতার অধিকারী হয় এবং প্রাসাদ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থেকে সুলতানী শাসন পরিবর্তন করে, ক্যুদেতার মাধ্যমে। এই ভাবে তারা ক্ষমতা কুক্ষিগত করে শাসনভার নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে ১৮২৬ খ্রিঃ পর্যন্ত, যখন তাদের নেতাদের হত্যা করে জেনিসারি প্রথার অবসান ঘটানো হয়।

দ্বিতীয় মুরাদের এক দাসীপুত্র দ্বিতীয় মোহাম্মদ উপাধি নিয়ে সিংহাসনে আরোহণ করেন (১৪৫১-৮১)। ১৪৫৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি কনস্ট্যান্টিনোপল দখল করে নেন। একজন হাঙ্গেরিয়ান মাস্টার কর্মকার উরবান বিশেষভাবে ঢালাই করে বৃহদাকার কামান তৈরি করে, যে কামানের ব্যবহার তখন আর কোথাও ছিল না। মোহাম্মদ এই কামানের তোপ দেগে কনস্ট্যান্টিনোপলের দুর্গ ভেঙে দিলে, আক্রমণ চালিয়ে দুর্গ অধিকার করা সহজ হয়ে ওঠে। এতে জেনিসারিদের যথেষ্ট অবদান ছিল। এই জয়ের ফলে শেষ বাইজানটাইন সম্রাট ১১তম কনস্ট্যানটাইন ড্রাগাসেস নিহত হন। বিজয়ী মোহাম্মদ নগরে প্রবেশ করে শহরের গৌরব সেন্ট সোফিয়ায় সরাসরি পদার্পণ করে মোল্লাদের দিয়ে এই চার্চকে মসজিদে পরিণত করেন।

ইতিহাসে নিজের নাম রাখার জন্য মোহাম্মদ খ্রিস্টান ও ইহুদিদের সহানুভূতি আদায়ে গ্রিক অর্থোডক্স চার্চকে পুনরুদ্ধার করে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের ব্যবহার্যে তুলে দেন পাদ্রিদের হাতে এবং ইহুদিদের ধর্মচর্চার জন্য একজন গ্র্যান্ড রাব্বিকে নিয়োগ করেন।

এই রাজকীয় নগরী কনস্ট্যান্টিনোপল দখলের পর মোহাম্মদ রোমান সম্রাটদের মতো কাইজার-ই-রুম (সিজার অব রোম) উপাধি গ্রহণ করেন। তিনি ইতালিয়ান

www.pathagar.com

হিউম্যানিস্ট এবং গ্রিক পণ্ডিতদের রাজসভায় আমন্ত্রণ জানিয়ে তার লাইব্রেরির জন্য গ্রিক ও ল্যাটিন বইপত্র ও পুঁথি পাণ্ডুলিপি জোগাড় করেন; পরে ভিনিস থেকে জেন্টাইল বেলিনিকে ডেকে তার পোর্ট্রেট পেন্ট করতে ও তার প্রাসাদের দেয়ালে ফ্রেসকো আঁকতে আদেশ দেন। তিনি গুলবাহারকে বিবাহ করেন। এই গুলবাহার ফ্রান্সের সম্রাটের কন্যা বলে কথিত এবং পরাজিত রোমান সম্রাট কনস্ট্যান্টাইন ড্রাগেসেসের বধূ হওয়ার জন্য পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু হয়ে গেল মোহাম্মদের বধূ। তিনি মোহাম্মদের পুত্র ও উত্তরাধিকারী দ্বিতীয় বায়েজিদ (১৪৮১-১৫২২)-এর মাতা। গুলবাহার কখনো ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেননি এবং খ্রিস্টান হিসাবেই মারা যান। কথিত আছে মোহাম্মদকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হয়।

প্রথম সেলিম (১৫১২-২০) মোহাম্মদের পৌত্র। তার পিতা দ্বিতীয় বায়েজিদ বিষক্রিয়ায় মারা যান (বরং বলা ভালো যে তাকে বিষ দিয়ে মারা হয়) এবং সেলিমের ভাই, ভাতিজা বা সম্ভাব্য উত্তরাধিকারীদের হত্যা করা হয়। সেলিম তার গ্র্যান্ড ভিজিরদের প্রতি বছর মাথা কেটে দেন। তিনি বুঝতে পারেন যে তুর্কিদের দিয়ে তার দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি হবে না, তাই তিনি তার পূর্বসূরিদের নীতি ত্বরান্বিত করতে তার নগরীতে গ্রিক, আর্মেনিয়ান এবং ইহুদি বিপুল পরিমাণে আমদানি করে তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য করতে দেন। ফলে কিছুদিনের মধ্যে কনস্ট্যান্টিনোপল (ইস্তাম্বুল) আগের মতো সম্পদশালী নগরীতে পরিণত হয়।

১৫১৭ খ্রিস্টাব্দে সেলিম মিসর, হিজাজ, মক্কা ও মদিনা জয় করেন এবং কাইরোতে অবস্থিত শেষ আব্বাসী খলিফার কাছ থেকে খলিফা পদবি গ্রহণ করেন। এই রূপে মুসলিম শক্তি ও খলিফার কর্তৃত্ব ইতিহাসের ধারায় হস্তান্তর হয় মদিনায়; আবার খলিফাদের থেকে সিরিয়ায় উমাইয়াদের কাছে তারপর পার্সিয়ান আব্বাসিদের কাছে তারপর মিসরীয় ফাতেমিদের কাছে এবং পরিশেষে তুরানি (তুর্কি)-দের কাছে।

অটোম্যান সাম্রাজ্য গৌরবের শীর্ষে পৌঁছে প্রথম সোলেমান (১৫২০-৬৬)-এর সময়ে। তিনি প্রথম সেলিমের সন্তান। তার গ্র্যান্ড ভিজির ইব্রাহিম পাশাকে, তার ক্ষমতার কারণে ঈর্শান্বিত হয়ে, সুলতানের পাট রানী রোক্সোলানা হত্যা করান। সুলতানের প্রিয় উপপত্নী ছিল একজন রাশিয়ান ক্রীতদাসী খুর্‌রেম।

সোলেমান হাঙ্গেরি আক্রমণ করে বুদাপেস্ট দখল করেন এবং ভিয়েনা অবরোধ করেন বটে, তবে অধিকার করতে ব্যর্থ হন। খায়রুদ্দিন 'বারবারেসা' এক গ্রিক বিদ্রোহী ভূমধ্যসাগর অঞ্চলে সন্ত্রাসবাদ শুরু করে। সলেমান একে তুলে এনে অটোম্যান এডমিরাল পদে নিয়োগ দেন এবং এর সাহায্যে সমগ্র উত্তর আফ্রিকা, মরক্কো বাদে, জয় করে নেন। ১৫৬৫ খ্রিস্টাব্দে তার এক নৌবহর, মালটা অধিকার করতে গিয়ে বিধ্বস্ত হয়। পরের বছর হাঙ্গেরিতে সিজেটভার শহর অবরোধকালে সলেমনের মৃত্যু হয়। প্রাচীন রীতি মতে, তার দেহ থেকে অন্তঃকরণ ও অভ্যন্তরীণ অন্যান্য অংশ বের করে নিয়ে তার মৃত্যুস্থানে কবর দেয়া হয়। পরে ঐ স্থানেই একটি খ্রিস্টান চার্চ নির্মিত হয়।

অটোম্যান সাম্রাজ্য যখন শীর্ষে তখন সাম্রাজ্যের পরিধির মধ্যে এসেছিল এশিয়া মাইনর, বলকানস, মেসোপোটেমিয়া, হিজাজ, মক্কা-মদিনা, মিসর ও সিরিয়া এবং

www.pathagar.com

মরক্কোর সীমান্ত পর্যন্ত দক্ষিণ আফ্রিকাসহ– মোট কথা সমগ্র আরবি বিশ্ব এসেছিল অটোম্যানদের অধীন।

সোলেমানের মৃত্যুর পর অটোম্যানের বিশালতা কমে গিয়ে আস্তে আস্তে রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়ে। এর পরের সুলতান আরাম-আয়াসে গা-ভাসিয়ে দিয়ে মদ ও মেয়ে মানুষ নিয়ে মেতে ওঠে, ফলে শাসনের রাশ ধরে প্রাসাদের মেয়ে মানুষ ও শুরু হয় হারেম ষড়যন্ত্র, সুলতানের প্রধান স্ত্রী ও তার মায়ের মধ্যে বিরোধ লেগে থাকে প্রাসাদে, গ্র্যান্ড ভিজির ও প্রধান খোজা একে অন্যের শত্রু হয়ে যায়। দরবারে ও প্রাসাদে খুনখারাবি সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় দ্বিতীয় সোলেমানের (১৫৬৬-৭৪) প্রধান বেগম নূরবানু তার সতীনদের সকল সন্তানদের হত্যা করায়, যাতে তার নিজের সন্তান সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হতে পারে। তার এই সন্তানের নাম মুরাদ। পিতার মৃত্যুর পর তৃতীয় মুরাদ উপাধি নিয়ে সুলতান হন। তার প্রধান স্ত্রীর নাম সাফিয়া, ভিনিসিয়ান কন্যা। মুরাদ যখন মারা যান, তখন সাফিয়া তার সতীনদের ১৯ জন পুত্রকে হত্যা করায়। তারপর তার পুত্র তৃতীয় মোহাম্মদ রূপে সুলতান হন। এক সময় সাফিয়া নিজেই মারা পড়ে তার এক সতীনের চক্রান্তে।

সুলতান প্রথম আহমেদের (১৬০৩-১৭) প্রধান ও প্রিয় স্ত্রী ছিল এক গ্রিক কন্যা নাম কোসেম। সুলতানের এক ভাইয়ের আদেশে কোসেমকে গলা টিপে মারা হয়।

এই অবস্থায়ও সুলতানের ক্ষমতা ছিল চূড়ান্ত; তারা যা খুশি তাই করতে পারত। সুলতান ইব্রাহিম (১৬৪০-৪৮) খামখেয়ালী ও বদমেজাজী মানুষ ছিলেন। প্রায় তিনশো উপপত্নীকে ছালায় পুরে বসফোরাস প্রণালীতে ফেলে দিতে আদেশ দেন। সে আদেশ পালিত হয়। তার এই বর্বরতার কোনো কারণ ছিল না এবং কেউ এর প্রতিবাদ করতে সাহসও করেনি। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দি ধরে অটোম্যান সাম্রাজ্যের রাজধানী থেকে আরম্ভ করে সুদূর প্রদেশ পর্যন্ত সর্বত্র শাসনকার্যে অব্যবস্থা ও গোলযোগপূর্ণ ছিল এবং অব্যবস্থার জন্য সাধারণ জনের দুর্ভোগের সীমা ছিল না। এই কারণে, পশ্চিমা শক্তির সাথে সংঘর্ষে তারা পরাজিত হতে লাগল, রাজ্য হারাতে লাগল। আধুনিক কূটনীতিতে অটোম্যানদের কোনো ধারণা না থাকায় পশ্চিমা দেশের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক বজায় রাখা মুশকিল হতো; তাই ১৬৭০ খ্রিস্টাব্দে সুলতান একজন গ্রিক পানাওটিস নিকোশিয়া নামে একজন দোভাষীকে নিয়োগ করে পশ্চিমা দেশের সাথে আলোচনা করার জন্য এবং তারপর থেকেই একজন গ্রিককে দোভাষী হিসাবে রাখতে হয়েছে।

১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দে যখন আন্তর্জাতিক অবস্থায় পশ্চিমা দেশগুলোর সাথে চুক্তিবদ্ধ হওয়া জরুরি বিবেচিত হয় তখন তুর্কি সামরিক বিচার বিভাগীয় প্রধান এই প্রস্তাবকে অগ্রাহ্য করে, কারণ কোরানে বলে যে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের সাথে বন্ধুত্ব করা নীতিবিরুদ্ধ (৬০ ঃ ১ এবং ৫ ঃ ৫৬)। কিন্তু শরিয়া বিশেষজ্ঞরা তার আপত্তিকে পাত্তা না দিয়ে হাদিসের বাণী দেখিয়ে খ্রিস্টানদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়।

উনবিংশ শতাব্দির মাঝামাঝি তুরস্কে শক্তি এতই কমে যায় যে সুলতানকে ইউরোপের 'রুগ্ন মানব' বলে ঘোষণা দেয়া হয়। এই সময়ে তুরস্কের অধীনস্ত অন্যান্য-রাষ্ট্র তাদের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের কথা চিন্তা করতে লাগল। এর মধ্যে বুলগেরিয়া ও

www.pathagar.com

আর্মেনিয়া ছিল অন্যতম।

চতুর্দশ শতাব্দিতে তুর্কিরা বুলগেরিয়া দখল করে এবং পরবর্তী পাঁচ শতাব্দি ধরে বুলগেরিয়ার নাম বলতে গেলে মুছে ফেলা হয়েছিল কিন্তু বুলগেরিয়ার জাতীয়তাবাদ কখনো নিশ্চিহ্ন হয়নি তা শুধু ঘুমিয়ে ছিল এবং বিক্ষিপ্তভাবে সময়ে সময়ে তারা স্বাধীনতা প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছে। স্বাধীনতা সংঘর্ষ আরম্ভ হয় ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে লাগাতারভাবে; কিন্তু তা নিষ্ঠুরভাবে দমন করা হয় যার জন্য সারা ইউরোপে প্রতিরোধের ঝড় ওঠে এবং এই কারণে উইলিয়াম গ্ল্যাডস্টোন এই বর্বরতার নিন্দা করে তার বিখ্যাত প্যামফ্লেট ইস্যু করেন।

১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে আর্মেনিয়ান বিদ্রোহ সুলতান দ্বিতীয় আব্দুল হামিদ কর্তৃক কঠোর হস্তে দমন করা হয় এবং লাখ লাখ আর্মেনিয়ান মারা পড়ে, আর তাদের গ্রাম-বাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। এর বিরুদ্ধেও সারা ইউরোপে প্রতিবাদের বন্যা বয়ে যায় এবং আব্দুল হামিদকে 'মহাহত্যাকারী'—গ্রেট অ্যাসাসিনেটর আখ্যা দেয়া হয়।

১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে মহাযুদ্ধের সময় সম্ভাব্য আর্মেনিয়ান বিদ্রোহ অনুমান করে সুলতান পঞ্চম মোহাম্মদ আর্মেনিয়ায় গণহত্যার আদেশ দেন। ফলে দেড়-মিলিয়ন মানুষকে গুলি করে, জ্বালিয়ে, ডুবিয়ে এবং জোর করে সিরিয়ার মরুভূমিতে নির্বাসন দিয়ে হত্যা করা হয়। সিরিয়ায় মরুভূমিতে নির্বাসিত আর্মেনিয়ান লোকজন পিপাসা ও খাদ্যাভাবে মারা যায়। বাকি যারা ছিল তাদের কুর্দিরা মেরে ফেলে।

প্রথম মহাযুদ্ধের শেষে আনাতোলিয়ার বাইরে যত ভূখণ্ড ছিল তুর্কিদের হাতছাড়া হয়ে যায়। ১৯২২ সালে তুর্কির সুলতানাত শেষ হয় এবং শেষ সুলতান ৬ষ্ঠ মোহাম্মদ একটি ব্রিটিশ যুদ্ধ জাহাজে চড়ে মালটায় পালিয়ে যায়। সুলতানের হারেমে যত ইউরোপীয় মহিলা ছিল তাদের সংগ্রহ করে এক ব্রিটিশ নৌ অফিসারের অধীনে ও হেফাজতে দেয়া হয়। এদের মধ্যে একজন ইংলিশ মহিলা ছিল তাকে তার বাড়ি ওয়ার উইক শায়ারের লিমিংটন স্পা-তে পাঠিয়ে দেয়া হয়।

৬ষ্ঠ মোহাম্মদ মারা যান ১৯২৬ সালে ইতালির সান-মো-তে চরম দারিদ্র্যের মাঝে। এক দাতব্য প্রতিষ্ঠান থেকে কফিন অনুদান নিয়ে তার মৃতদেহ দামেস্কের এক অখ্যাত স্থানে কবরস্থ করা হয় (Esin, 1963, P. 193)। তার ভাই ও উত্তরাধিকারী ২য় আব্দুল মজিদকে খলিফা টাইটেল ধারণ করতে অনুমতি দেয়া হয়, কিন্তু সুলতান নয়। ১৯২৩ সালে যখন তুরস্ক রিপাবলিক সরকার ঘোষিত হয়, খলিফা আবদুল মজিদ দেশ ত্যাগ করে এবং সুইজারল্যান্ড আশ্রয় গ্রহণ করে।

তারপর ১৯২৪ সালে কামাল আতাতুর্ক তুরস্ক সরকারের শাসনভার গ্রহণ করেন এবং তুরস্ককে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলে ঘোষণা দেন। ধর্ম রাষ্ট্র থেকে আলাদা হয়ে যায়। তিনি মুসলিম খিলাফতের অবলুপ্তি ঘটিয়ে তুরস্ককে একটি আধুনিক রাষ্ট্রে পরিণত করেন।

আধুনিক রাষ্ট্রবিদ ও সংস্কারকরূপে কামাল আতাতুর্ক মন্তব্য করেন এই বলে—ইসলামকে রাষ্ট্রে ব্যবহার করে সুলতান-খলিফারা মুসলিম রাজ্যের সর্বনাশ ডেকে এনেছে। তিনি আরব শেখদের অনৈতিক কার্যকলাপ এবং মতলবি বিধান ও থিওরি পালনের মাধ্যমে মুসলিম জাতি যে পেছনে পড়ে আছে তার জন্য তাদের দোষারোপ

www.pathagar.com

করেন (Laffin, '981 P. 131)। তিনি ইসলাম ধর্ম ও মুসলিম সভ্যতাকে বিংশ শতাব্দির আলোকে অসামঞ্জস্য মনে করে এর সংস্কারের যুক্তি তুলে ধরেন। তিনি খেদোক্তি করে বলেন, এককালে খ্রিস্টান ও ইউরোপ মুসলিম দর্শন ও বিজ্ঞানে আলোকিত হয়েছিল কিন্তু মুসলিমরা যদি পরবর্তীতে খ্রিস্টানদের শিক্ষা ও বিজ্ঞান গ্রহণ করে এগিয়ে যেত তাহলে এ দুর্দশা ঘটত না (Kinross, 1964, P. 437)।

তিনি শুক্রবারের পরিবর্তে রোববার বিশ্রামের দিন পরিবর্তন করেন; ইসলামী ক্যালেন্ডার বদলিয়ে পশ্চিমা ক্যালেন্ডার প্রবর্তন করেন। শরিয়া আইনের বদলে ইউরোপীয় সিভিল কোড গ্রহণ করেন আর কনস্ট্যান্টিনোপলের মসজিদকে (যা আগে সেন্ট সোফিয়ার চার্চ ছিল) জাদুঘরে রূপান্তরিত করেন।

আরবি বর্ণমালার পরিবর্তে তিনি ল্যাটিন বর্ণমালার প্রবর্তন করেন এবং আরবি ভাষার বদলে পুরনো তুর্কি ভাষা (তুরানিয়ান) চালু করার জন্য আবেদন করেন। তিনি মোল্লাদের নির্দিষ্ট পোশাক নিরুৎসাহ করেন এবং 'ফেজ' টুপি ব্যবহার উঠিয়ে দেন, (পাগড়ির বদলে এই ফেজ টুপি চালু করেছিলেন ১৮২৬ খ্রিস্টাব্দে ২য় মোহাম্মদ) এবং ইউরোপীয় পোশাক পরতে উৎসাহ জোগান। তাহলে তুর্কিদের অবরুদ্ধ চেতনার পরিবর্তন হবে এবং নিজেদের ইউরোপীয় বলে চিন্তা করতে শিখবে। তিনি ইউরোপীয় স্টাইলে নাম ও উপনাম গ্রহণ করার জন্য উৎসাহ দেন এবং ধর্মীয় বিবাহের পরিবর্তে 'সিভিল ম্যারেজ'-এর বিধান গ্রহণ করেন। পরিশেষে তিনি বহুবিবাহ ও পর্দা প্রথার অবলুপ্তি ঘটিয়ে নারীদের অধিকারের, ভোট প্রদানসহ সুবিধা করে দেন।

১২.৮ মোগলগণ (১৫২৬-১৮৫৭)

ইত্যবসরে ভারতে বেসামরিক গণ্ডগোল জাতিভেদ এবং গোষ্ঠীবিবাদ হিন্দুদের মধ্যে চরম পর্যায়ে পৌঁছুলে, মুসলিমদের পরপর কয়েকবার ভারত আক্রমণ সাফল্য লাভ করে। আরবরা সিন্ধু প্রদেশ জয় করে নেয় বেশ কয়েক শতাব্দি পূর্বে তারপর অন্যান্য জাতি যেমন, আফগান, তুর্কি, পার্সিয়ান এবং মধ্যএশিয়ার ক্ষুদ্র স্বাধীন দেশগুলো ভারত আক্রমণ করে। মধ্যএশিয়া থেকে এসেছিল গজনীর–ঘোর, খিলজি, তুঘলক ও লোদি– এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মুঘলরা, যারা ভারতকে সুসংহত করে রাজ্য গড়ে তুলেছিল যা চার শতাব্দির বেশি সময় টিকে ছিল।

মোঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন বাবুর (১৫২৬-৩০)। তার পিতা ছিলেন মোঙ্গল সম্রাট তৈমুর লং-এর বংশধর, এর মাতা ছিলেন চেঙ্গিস খাঁর বংশধর। পানিপথের প্রথম যুদ্ধে (১৫৫৬) দিল্লির আফগান সম্রাট ইব্রাহীম লোদিকে পরাস্ত করে ভারত দখল করেন। এই যুদ্ধে ভারতে সর্বপ্রথম বাবুর ইউরোপীয় কামান ব্যবহার করেন।

বাবুরের পর তার পুত্র হুমায়ুন (১৯৩০-৫৬) সিংহাসনে আরোহণ করেন, যার রাজ্য সাময়িকভাবে বিঘ্নিত হয়েছিল শেরশাহর দ্বারা; পরে তিনি রাজ্যোদ্ধার করেন। তার মৃত্যুর পর তার পুত্র আকবর দ্য গ্রেট (১৫৫৬-১৬০৫)। তিনি ছিলেন অতি দক্ষ ও মহানুভব সম্রাট। বিদেশে তার সমসাময়িক পারস্যের শাহ আব্বাস দ্য গ্র্যান্ড সোফি, তুরস্কে ছিলেন সলেমন দ্য ম্যাগনিফিশিয়েন্ট, রাশিয়াতে ৪র্থ ইভান দ্য টেরিবল এবং ৫ম চার্লস, দ্য হলি রোমান এমপারর। আর এক মহান সম্রাজ্ঞী ছিলেন ইংল্যান্ডের

www.pathagar.com

এলিজাবেথ। এর সময়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে ভারতে বাণিজ্য করার জন্য সনদপত্র প্রদান করা হয়। অষ্টাদশ শতাব্দির মধ্যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতে বিভিন্ন অংশে ক্ষমতা দখল করে শাসন করতে শুরু করে এবং ১৮৫৮ সালে ইংল্যান্ডেশ্বরী সমগ্র ভারতের সর্বময় কর্তা হয়ে যায়।

অন্যান্য সংস্কারের মধ্যে আকবর ইসলাম ধর্মকে অন্যান্য মহান ধর্মের সাথে মিশিয়ে একটা সার্বজনীন ঈশ্বরের ধর্ম (দীন এলাহী) প্রচলিত করার চেষ্টা করেন। এই পারস্পরিক সমঝোতা ও সহিষ্ণুতার নীতি তাঁকে অমুসলিমদের কাছে প্রিয় পাত্র করে তোলে। দিল্লির পার্সি (জোরাস্ট্রিয়াম)-এর প্রধান পুরোহিত রাজকীয় দরবারে একটা বিশিষ্ট আসন ছিল এবং আকবর নিজে জোরাস্ট্রিয়ান শার্ট ও গার্ডেল পরিধান করেছিলেন।

খ্রিস্টানিতে সম্রাটের সমভাবে আগ্রহ ছিল। তিনি জেস্যুটসদের সঙ্গে লম্বা আলোচনা চালিয়েছিলেন এবং তাদের মধ্যে একজনকে মুরাদের শিক্ষক নিযুক্ত করেন। দক্ষিণ ভারতে দাক্ষিণাত্য বিজয়ের পর আকবর ফতেপুর সিক্রিতে বিজয় চিহ্ন স্বরূপ 'আলাই দরজা' নির্মাণ করেন এবং সেখানে 'মরিয়ম পুত্র যিশু'-র নাম উৎকীর্ণ করেন এবং বলেন, 'এই পৃথিবী একটি সেতু, পার হয়ে যাও, কিন্তু কোনো ভবন তৈরি করো না' "This world is a bridge; pass over but build no house upon it".

আকবরের হিন্দু পত্নী জ্যেষ্ঠ পুত্র জাহাঙ্গীর (১৫০৬-২৭) দিল্লির মসনদে অধিষ্ঠিত হন। তিনি বদমেজাজী ও আয়াসী ছিলেন। তিনি যুদ্ধ করেছেন, আবার অবসর সময় তাঁর হেরেমে অতিবাহিত করেছেন। তিনি সূরা পানে অভ্যস্ত ছিলেন।

একজন নিষ্ঠুর সম্রাট হিসাবে তিনি নির্যাতনের বহু সূক্ষ্ম টেকনিক চালু করেন। যখন তাঁর পুত্র খসরু বিদ্রোহী হয় তখন তিনি খসরুর ৩০০ জন অনুসারীকে জীবন্ত শূলে চড়িয়ে দেন এবং খসরুর দেহে ভারি শিকল চাপিয়ে তাকে ক্রন্দনরত অবস্থায় অনুসারীদের তিলে তিলে মৃত্যু দেখতে বাধ্য করেন। পরে অবশ্য খসরুর দুই চোখ উপড়ে ফেলে অন্ধ করা হয়।

অবিশ্বাস্য হলেও সত্য যে, তার চরিত্রে প্রবল ধার্মিকতাও ছিল। তিনি জেসুট্সদের ফেভার করতেন এবং ক্যাথলিকদের শোভাযাত্রা আগ্রার পথে পথে দেখা যেত। খ্রিস্টানদের পেন্টিং প্রাসাদের দেয়ালে টাঙানো থাকত এবং তার প্রাইভেট প্রার্থনা ঘরে মার্বেল পাথরে ভার্জিন মেরি ও যিশুর ছবি আঁকা ছিল। এতে মোল্লাদের প্রতিক্রিয়া হলেও তিনি আমল দেননি। তিনি দরবারে জেসুটস্ ও মুসলিম ধর্মবেত্তাদের নিয়ে খোলামেলা আলোচনা করেছেন, মোল্লাদের আপত্তি উপেক্ষা করে। এক সময় এটা চিন্তা করা হয়েছিল যে হয়তো তিনি খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করবেন (Rowlinson, 1954 P. 322)।

জাহাঙ্গীরের পর মসনদে এলেন শাহজাহান (১৬২৭-৫৮)। শাহজাহানের মা ছিলেন একজন রাজপুত রাজকুমারী। রাজ্য দখল করে শাহজাহানের প্রথম কাজ ছিল এক ভাইকে শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করা, অন্যটিকে অন্ধ করা এবং বাকি পুরুষ আত্মীয়দের ম্যাসাকার করা। এইভাবে তিনি নিষ্কণ্টক করেন তাঁর রাজ্যকে। একজন গোঁড়া মুসলিম হিসাবে তিনি হিন্দুদের সব মন্দির গুঁড়িয়ে দেন অথবা আগ্রা ও লাহোরে

www.pathagar.com

খ্রিস্টানদের চার্চ ধুলোয় মিশিয়ে তার ভবন নির্মাণ কর্ম শুরু করেন।

শাহজাহান ৩০ বছর রাজত্ব করেছেন, যতদিন না তাঁর পুত্র আওরঙ্গজেব তাকে বন্দি করে গৃহাবদ্ধ করেন। এক অসহিষ্ণু শাসক ছিলেন আওরঙ্গজেব (১৬৫৮-১৭০৭)। তাই পিতার মৃত্যুকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারেননি।

শাহজাহান বন্দি অবস্থায় আট বছর অতিবাহিত করার পরে ১৬৬৬ সালে মারা যান। বন্দি অবস্থায় তিনি আগ্রা দুর্গ থেকে তাজমহল অবলোকন করতেন। এই তাজমহল সম্রাট শাহজাহান তার প্রিয়তম পত্নীর স্মৃতিসৌধরূপে তৈরি করেছিলেন। তার প্রিয়তম পত্নী মমতাজ মহল ১৬৩১ সালে চতুর্দশতম সন্তানের জন্ম দিতে মারা যান।

বন্দি সম্রাটের অসুস্থ অবস্থায় দেখাশোনা করতেন তার কন্যা জাহানারা। জাহানারা ছিলেন উচ্চ প্রতিভাসম্পন্ন মহিলা। তিনি আঠারো বছর ধরে রাজকীয় সিলের (Seal) হেফাজতকারী ছিলেন। তিনি নিজেকে যিশুর শিষ্য বলে অভিহিত করেন এবং তার জন্য একটি অতি সাধারণ কবর ইচ্ছা করেন। তিনি যখন মারা যান, তাঁর ইচ্ছামতো তার কবরের ওপর একমাত্র ঘাস ছাড়া আর কিছুই ছিল না। এই কবরে কোনো সৌধ নির্মিত হয়নি।

পিতাকে সিংহাসনচ্যুত করে আওরঙ্গজেব তাঁর সিংহাসন মজবুত করতে যোগ্য উত্তরাধিকারী বড় ভাই দারাশিকোকে হত্যা করান। অন্যান্য কারণের মধ্যে একটি কারণ ছিল যে, দারাশিকো হিন্দু ধর্মের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। দারাশিকো উপনিষদের ফার্সি ভাষায় অনুবাদ করান এবং ঘোষণা করেন যে উপনিষদ কোরানের চেয়ে প্রাচীন রিভিলেশন। ১৬৫৯ সালে গ্রীষ্মকালে রাজকুমার দারাশিকোকে তার ঘরেই তিনজন ব্যক্তি চেপে ধরে এবং চতুর্থ জন তার গলা কেটে ফেলে। রক্তাক্ত ছিন্ন মস্তক সম্রাট আরঙ্গজেবের কাছে আনা হলে তিনি ভালো করে ধুয়ে ফেলতে বলেন এবং যখন নিশ্চিত হন যে সেটা দারাশিকোর ছিন্ন মস্তক তখন তিনি দাফনের অনুমতি দেন।

আওরঙ্গজেব তার পঞ্চাশ বছর রাজত্বকালে হিন্দুদের ধর্মান্তর নীতি অনুসরণ করেন এবং সেই সাথে তাদের উপাসনালয় গুঁড়িয়ে দেন। মাত্র একটি বছরে (১৬৭৯) তিনি দুশো হিন্দু মন্দির এবং বেনারসে মহাপবিত্র ধর্মস্থান ভেঙে দেন এবং বেনারসের মন্দিরের ধ্বংসস্তূপে মসজিদ নির্মাণ করেন।

মোঘল সাম্রাজ্যের ৬ষ্ঠতম ও শেষ প্রতাপশালী সম্রাট বলে তিনি গণ্য। তিনি সাম্রাজ্যের এমন অবস্থা করেছিলেন যে তাঁর মৃত্যুর অব্যবাহিত পরেই রাজ্যে ভাঙ্গনের সৃষ্টি হয়। সিভিল ওয়ার (গৃহযুদ্ধ) ও বিদ্রোহ দেখা দেয় চারদিকে এবং অব্যাহত থাকে এই বংশের শেষ বাদশা পর্যন্ত। আওরঙ্গজেবের পরবর্তী উত্তরাধিকারীগণ ছিলেন অযোগ্য, যারা দুর্নীতি, ষড়যন্ত্র ও ভ্রাতৃদ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়েন।

আওরঙ্গজেবের জ্যৈষ্ঠপুত্র ১ম বাহাদুর শাহ (মৃ. ১৭১২) সিংহাসনে বসার আগে দুই ভাইকে হত্যা করেন এবং রাজ্যে এমন অবনতি ঘটে যে, তার মৃত্যু হলে শবদেহ দশ সপ্তাহ ধরে পড়ে থাকে– তারপর কবরস্থ করা হয়।

মোঘল সাম্রাজ্যের পতন আগেই শুরু হয়েছে এবং এর পতন দুঃখজনক।

www.pathagar.com

সম্রাটগণ এবং ছোটখাটো মোঘল রাজন্যবর্গ, নবাব, খান ও শেখ এই মোগল-যুদ্ধ চেয়ে চেয়ে দেখেন এবং বাজপাখি দিয়ে শিকার ধরেন। পরবর্তী মোঘলরা মদে চুর হয়ে থাকত, ড্রাগে অভ্যস্ত ছিল এবং অনেকে যৌন রোগের রুগী ছিল। তারা ভণ্ড ফকির, জ্যোতিষী ও গণকদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন এবং রাজদরবার ভাঁড়, তোষামোদকারী, চামচা আর নর্তকীতে পরিপূর্ণ ছিল যার ফলে সুযোগ সন্ধানীরা অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করেছে।

বাহাদুর শাহের পর, তার উত্তরাধিকারী জাহান্দর শাহের (মৃ. ১৭১৩) কাল ছিল লাম্পট্য ও সন্ত্রাসবাদের কাল। ঐতিহাসিকরা বলেন, যখন সম্রাট মারা যান, তখন তিনি এমন দুর্দশার শিকার হন যা কহতব্য নয় (Sharma, 1947, P. 172)।

ফারুক শিয়ার (মৃ. ১৭১৯)-এর পতনের সময় তাঁকে সিংহাসন থেকে টেনে নামানো হয় মুকুটবিহীন ও জুতাবিহীন অবস্থায়, তারপর গালাগালি করে মারধর করা হয়, তারপর বন্দি করে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয় এবং খাবারের সাথে বিষ মিশিয়ে শেষে হত্যা করা হয়।

ফারুক শিয়ারকে অনুসরণ করে, রাফিউদ দারাজাত, নেকুশিয়ার এবং রফি-উল-দৌলা (২য় শাহজাহান) যাঁদের রাজত্বকাল ছিল ১৭১৯ সালে ফেব্রুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত।

মোহাম্মদ শাহের (মৃ. ১৭৪৮) রাজত্বকালে ভাঙন আরও দৃঢ় হয় এবং সেই ভাঙন অবস্থা দ্রুত বেড়ে যায় আহমদ শাহের (মৃ. ১৭৫৪) রাজত্বকালে। এই সম্রাটের একটি হারেম (seraglio) চার স্কোয়ার মাইলব্যাপী, যেখানে তিনি আনন্দ-বিহার করতেন সপ্তাহ ধরে। পরে তাঁকে সিংহাসনচ্যুত করে অন্ধ করা হয় এবং কারারুদ্ধ করা হয়।

তাঁর উত্তরাধিকারী ২য় আলমগীর পাঁচ বছর রাজত্ব করার পর ছুরিকাবিদ্ধ হয়ে মারা যায়। তার শবদেহকে জানালা দিয়ে ছুড়ে ফেলা হয় এবং নগ্ন অবস্থায় যমুনার তীর ধরে টানতে টানতে শেষে তাড়াহুড়ো করে পুঁতে ফেলা হয়।

তার পুত্র ও উত্তরাধিকারী ২য় শাহ আলম (মৃ. ১৮০৬)-কে কারারুদ্ধ করে চাবুক মারা হয় ও পরে অন্ধ করে দেয়া হয়। পরিশেষে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সাহায্য প্রার্থনা করে তাদের হাতে বন্দি হিসাবে তুলে দেয়া হয়। তার পুত্র ২য় আকবরের (মৃ. ১৮৩৭) একইভাবে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ক্রীড়ানক হয়ে ১৮৩৭ সালে মারা যায়। তিনি প্রায় ২৯ বছর কোম্পানির অধীনে নামে মাত্র সম্রাট ছিলেন।

মোঘল বংশের শেষ সম্রাট ছিলেন ২য় বাহাদুর শাহ মোহাম্মদ জাফর (মৃ. ১৮৬২)। তিনি ১৮৫৭ সালে সিংহাসনচ্যুত হয়ে পরবর্তীকাল পর্যন্ত দিল্লিতে ইংরেজদের অধীনে ডেটিন্যু (রাজবন্দি) হিসাবে ভাতাভোগী, নামকা-ওয়াস্তে রাজা ছিলেন। কোনো কাজ না থাকায় তিনি তার কাল কাটাতেন, কবিতা লিখে, গান শোনে এবং ক্যালিগ্র্যাফি চর্চা করে, আশপাশে কি ঘটছে তার কোনো সংবাদ রাখতেন না। তার সব সময়ই অর্থকষ্ট ছিল এবং ইংলিশ কর্তৃপক্ষের নিকট অর্থের জন্য অনবরত পত্র দিতেন কিন্তু কোনো সাড়া পেতেন না। ১৮৫৭ সিপাহি বিদ্রোহের পর বিদ্রোহের সাথে জড়িত থাকার জন্য তাকে রেঙ্গুনে নির্বাসন দেয়া হয় যেখানে তিনি মারা যান।

পরবর্তী ক্ষুদ্র মোঘল বাদশারা গৃহযুদ্ধ সমস্যাকে সমাধান করতে পারেননি, আর

www.pathagar.com

মারাঠা, জাঠ, রোহিলা, শিখ ও রাজপুতদের সাথে যুদ্ধ সামাল দিতে পারেননি। মারাঠাদের আক্রমণ প্রতিহত করার ক্ষমতা ছিল না। তাই তারা রাজকীয় প্রাসাদে ঘোড়া রাখত। প্রাসাদের সিলিং-এ যে মূল্যবান দ্রব্যাদি ও রত্ন ছিল সবই খুলে নেয় এবং তাজমহলকে বাসস্থান রূপে ব্যবহার করে। ইংরেজ কর্তৃপক্ষ, তাদের ক্ষমতা বাড়ার সাথে, অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করেছে এবং জাতীয় ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে আরম্ভ করে যখন লর্ড কার্জন ভারতের ভাইসরয় হয়ে এলেন। লর্ড কার্জন ১৮৯৮ থেকে ১৯০৫ পর্যন্ত শাসন কার্যপরিচালনা করেন এবং তার সময়েই প্রাচীন মনুমেন্ট রক্ষা করা এবং তাজমহলকে পুনরুদ্ধার করে তার সংরক্ষণ করার জন্য নির্দেশ জারি করেন, যা এতকাল অবহেলিত ছিল।

১২.৯ পতনের কারণ

মুসলিম ও নন-মুসলিম ঐতিহাসিকগণ প্রায় সকলে মুসলিম রাষ্ট্রের পতনের কারণ যা দেখিয়েছে তা বলতে গেলে অমিল নেই এবং তা অন্যান্য জাতির পতনের সাথে ঐতিহাসিকভাবে একই প্রকার বলা যায়। মুসলিম বংশ একবার প্রতিষ্ঠিত হলে ক্ষমতা দখল প্রায়ই ঘটেছে উত্তরাধিকার সূত্রে, অন্যায়ভাবে অধিকার করে অথবা প্রাসাদ ষড়যন্ত্র করে। সচরাচর দেখা গেছে প্রতিদ্বন্দ্বীদের সরানো হয়েছে অন্ধ করে অথবা হত্যা করে, ছুরির দ্বারা, বিষ প্রয়োগে বা শূলে চড়িয়ে। এই প্রতিযোগিতায় যারা সাফল্য লাভ করেছে তারা নিজের অবস্থান দৃঢ় করার জন্য গুপ্তহত্যার আশ্রয় নিয়েছে, যতক্ষণ না সে একচ্ছত্র, স্বৈরাচারী ও সীমাহীন কর্তৃত্বের অধিকারসহ, রাজ্যভার হাতে না গ্রহণ করতে পেরেছে।

খলিফা ছিলেন প্রফেটের উত্তরাধিকারী এবং এই কারণে তিনি সকল আইনের ঊর্ধ্বে ছিলেন। অধিকাংশ ক্ষুদ্র শাসকরা মনে করতেন বা বিশ্বাস করতেন যে তারাও শাসন করছেন ঈশ্বরের প্রতিনিধিরূপে। সেখানে কোনো প্রতিষ্ঠিত পোপের মতো মোল্লাতন্ত্র ছিল না তাদের ওপর খবরদারি করার জন্য বরং পালিত ধর্মবেত্তাগণ তাদের দুস্কৃত কর্মকে অনুমোদন দিতেন। এই খলিফা ও বাদশা বা সামন্ত এ ব্যাপারে অপ্রতিহত ক্ষমতা প্রয়োগ করে নিজেদের স্বার্থ রক্ষা করতেন।

মুসলিম ইতিহাসের শুরুতে রাজনৈতিক তত্ত্ব অনুযায়ী শাসকের প্রতি আনুগত্য প্রাপ্য এবং তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র দমন করার কর্তৃত্ব তার হাতে। এইরূপে দেখা গেছে, মুসলিম রাষ্ট্র শাসিত হয়েছে প্রায়ই অত্যাচারী শাসক দ্বারা। সাধারণ মানুষ তাকে শ্রদ্ধা করত না, করত ভয়। প্রাসাদ ষড়যন্ত্রে হেরেমের চতুর ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী মেয়েরা জড়িত থাকত, তাদের সাহায্য করত প্লট পরিকল্পনায়, খোজা প্রহরী ও বিদেশী সভাসদ যারা সাধারণত বেগম বা উপপত্নীদের প্রিয়-পাত্র ছিল। বেশিরভাগ প্রাসাদ ষড়যন্ত্র ও গুপ্ত হত্যার পেছনে কাজ করেছে হেরেমের মেয়ে মানুষ আর তার প্রিয় পাত্র রাজ-প্রহরী ও বিদেশী সভাসদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা।

কোনো প্রকার গণতন্ত্র ছিল না বলে সাধারণ মানুষের তাদের নিজের জন্য, কোনো অধিকার ছিল কিনা, কোনো কিছুতে প্রভাব ফেলতেও পারত না। একটা সুবিন্যস্ত গোয়েন্দা পদ্ধতি রাজ্যে কাজ করত বলে কেউ মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনি,

www.pathagar.com

কোনো অসন্তোষ বা প্রতিবাদ উঠলে তা সমূলে উপড়ে ফেলা হতো, স্তব্ধ করে দেয়া হতো অত্যাচার ও মৃত্যুদণ্ড দিয়ে এবং এই শাস্তির বিরুদ্ধে কোনো আপিল ছিল না। শতাব্দির অভিজ্ঞতা জনসাধারণকে স্বেচ্ছাচারীর নির্যাতন ও শাসনকে মেনে নিতে বাধ্য করেছিল। তাদের এই স্বেচ্ছাচারী শাসনকে না বাধা দিতে পারত, না তেমন ইচ্ছা ছিল। তাদের এই বিশ্বাস তাদেরকে অদৃষ্টবাদী করে দেয়, ভাগ্যই তাদের জীবনযাত্রার পাথেয় ছিল।

আবার অন্যদিকে, ধর্ম যেখানে বহুবিবাহ ও অগুনতি উপপত্নী রাখার অনুমোদন দেয় এবং মৃত্যুর পরেও স্বর্গে যে অনন্ত সুখভোগ ও যৌন বিলাস, সেই কারণে রাজা-বাদশারা অপ্রতিহত কাম-লালসায় ডুবে থাকত। কয়েকজন বাদে, মুসলিম বিশ্বের খলিফা, সুলতান, পাশা এবং আমিরগণ বিলাসী ও অনৈতিক জীবনধারায় অভ্যস্ত ছিলেন। মদের বিরুদ্ধে যে ইসলামী বিধান ছিল, মুসলিম শাসকগণ তার পরোয়া করতেন না।

সীমাহীন দুর্নীতি, রাজকার্যের প্রশাসনে শিথিলতা এবং অর্থনৈতিক কাঠামোতে ধস নামার জন্য রাজনৈতিকভাবে রাজ্য ছিল নড়বড়ে, ফলে বিদেশী শক্তি সুযোগ বুঝে আক্রমণ করেছে এবং মুসলিম রাজ্যকে কবজাও করেছে। বর্তমানেও ইউরোপ ও আমেরিকান মুসলিম রাজ্যের ওপর খবরদারি করে চলেছে।

www.pathagar.com

১৩

বিদেশী প্রভাব

মৌলবাদতত্ত্ব ও আইন পদ্ধতি লিপিবদ্ধ করার পূর্বেই মুসলিম রাজ্য পৃথিবীর অধিকাংশ অঞ্চল দখল করে নেয়। সাংস্কৃতিকভাবে আরবরা অথবা তত্ত্বগতভাবে ইসলাম, আরব থেকে সুসজ্জিত হয়ে আসেনি, তখন তাদের সাংগঠনিক কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না, ছিল না কোনো বিশেষজ্ঞ যা অধিকৃত এলাকাগুলোতে সুশাসন প্রবর্তন করতে পারে।

দ্রুত সামাজ্য বিস্তারের কারণে মরুবাসী আরবদের অন্য দেশে (বিজিত দেশের) সংস্কৃতির সম্মুখীন হতে হয়েছে এবং তারা দেখতে পেল উন্নত সভ্যতার হঠাৎ আলোর ঝলকানি। বিজিত পারস্য রাজ্যের নগরী স্টেসিফোন (ctesiphon)-এর আলো ঝলমলে তারা অভিভূত হলো।

সেই সময় মেসোপটেমিয়া, পারস্য, সিরিয়া, প্যালেস্টাইন ও মিসর ছিল প্রাচীন সভ্যতার কেন্দ্রভূমি এবং প্রত্যেক নগরীর ছিল হাজার হাজার বছরের সভ্যতার ইতিহাস, তখন প্রফেট মোহাম্মদের জন্ম হয়নি। তাদের সমসাময়িক উত্তরাধিকারী সাসানিয়ান, সেলুসিড, টলেমি এবং বাইজানটাইনের ছিল বহু প্রাচীন সামাজিক ও প্রশাসনিক কাঠামো এবং গভীর মূল-সমৃদ্ধ ধর্মীয় ট্র্যাডিশন।

আরবরা যে ট্রাডিশানাল আদর্শ সাথে নিয়ে এসেছিল তা এইসব অতি উন্নত সভ্যতার ওপর কোনো প্রভাব ফেলতে পারেনি বরং যে সমস্যার মধ্যে পড়েছিল তা শুধু কলেমা, নামাজ, রোজা, হজ, যাকাত দিয়ে সমাধানের উপায় ছিল না। প্রফেট মোহাম্মদোত্তরকালে মধ্যপ্রাচ্যে এ সমস্ত প্রাচীন সাংস্কৃতিক কাঠামোতে 'ইসলামিক' আখ্যা দেওয়ার যে প্রবণতা তা ছিল অতিরিক্ত এবং তাকে গভীরভাবে পরীক্ষা ও পুনর্মূল্যায়নের প্রয়োজন। পুনর্মূল্যায়ন না হওয়ায় অনেক প্রাচীন সংস্কৃতি স্বীকৃতি পায়নি, যদিও মুসলিম সংস্কৃতির বীজ বপন সেখানেই করা হয়েছিল এবং পরবর্তীতে তা ফলে-ফুলে প্রসার লাভ করেছে।

স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, এখন যাকে 'ইসলামিক স্টাডিজ' বলা হয়, তার মধ্যে 'ইসলামিক' কতটুকু বিচার্য বিষয়। মুসলিম ঈশ্বরতত্ত্ব ও আইন পদ্ধতি বা জুরিস প্রুডেন্সকে ইসলামিক বলা যেতে পারে, কিন্তু যখন আমরা ইসলামিক বিজ্ঞান নক্ষত্রবিদ্যা বা চিকিৎসাবিদ্যা ও ঔষধ সম্বন্ধীয় কথা বলি তখন আমাদের মনে হয় এর সবই ইসলামের উত্তরকালে বিভিন্ন প্রাচীন সভ্যতার সোর্স থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। মুসলিমদের কয়েকটি কৃতিত্বপূর্ণ কাজ আছে যা মৌলিক। ইসলামের আবির্ভাবে এমন

www.pathagar.com

কিছু নতুনত্ব দেখা যায় না এবং যখন ধর্মীয় বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া হয় তখন প্রায় অন্য বিষয়ে গুরুত্ব কমে যায়। আলফ্রেড গিয়োম বলেন : ইসলামের লিগেসি প্রমাণ করে যেখানে ধর্ম প্রভাব খাটায়, সেখানে অন্য বিষয় নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে (Arnold and Guillaume, 1965, P. v)। প্রফেট মোহাম্মদ ও কোরানের বিধি-নিষেধের কারণে এটা বলা যেতে পারে যে স্থাপত্য বিদ্যায়, সাহিত্যে, সঙ্গীতে এবং শিল্পে মুসলিম বিশ্বে কোনো উন্নয়ন হয়নি ধর্মের কারণে, যা হয়েছে তা শুধু ইসলাম বহির্ভূত উৎসের প্রভাব থেকে।

ধর্মান্তরিত মুসলিম জনগণ আরবি ভাষা শিখেছিল শুধু কোরান পাঠ করার জন্য এবং ইসলামের প্রসারের সাথে আরবি ভাষা বাক্যবিনিময়ের মাধ্যম হয়ে যায় ইসলামী বিশ্বের বিভিন্ন অংশে। নন-আরব ও নন-মুসলিম স্কলারগণ আরবিতে লিখতেন এবং আরবি ভাষাতে নিজেদের স্থানীয় ভাষার বহু শব্দ আরবি ভাষায় গ্রহণ করে নেন, যা এখন মৌলিক আরবি ভাষা বলে গণ্য।

বেশ কিছু সংখ্যক জাতি ও ধর্মমত (creed) ইসলামী তরিকায় (order) তাদের উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে এবং প্রত্যেকে সেই তরিকাকে নিজের মতো সংশোধনও করেছে। ইসলামী কালচারে সমরূপ (uniform) বলে কিছু নেই; বিভিন্ন অঞ্চলে প্রতিষ্ঠান বিভিন্নভাবে গড়ে উঠেছে। তাই বিভিন্ন মুসলিম দেশে দেখা যায় বিভিন্ন কালচার যা স্থানীয় কালচারের সমরূপ, ইসলাম ধর্মমতের সাথে এই কালচারের মিল নেই বরং সেখানে একটা নির্দিষ্ট অঞ্চলে তাদের দেশীয় শিক্ষা, সংস্কৃতির প্রভাব পড়েছে।

দামেস্কে উমাইয়ারা, বাগদাদে আব্বাসিরা, কাইরোতে ফাতেমিদ, ইস্পাহানে সাভাবিদ, দিল্লিতি মোগল এবং ইস্তাম্বুলে অটোম্যান যে কৃষ্টি ও সভ্যতা গড়ে উঠেছে তা আরব বা ইসলামী ধর্ম থেকে গড়ে ওঠেনি, সেখানে প্রতিফলন ঘটেছে প্রাচীন কালচার যা সিরিয়া, মেসোপটেমিয়া, মিসর, ইন্ডিয়া ও বাইজানটাইনে আগে থেকেই ছিল। যেহেতু এই অঞ্চল ইসলাম রাজ্যভুক্ত হয়েছে, তাই আত্মীকরণে সমস্যা দেখা দেয়। বিজয়ী ও বিজিতের মধ্যে যোগাযোগে বিরোধ দেখা দিলে পরে আপোষ রফা হয়। আরবরা একটা নতুন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয় যা আরব মরুর পরিবেশ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাই রাজ্য বিস্তারের কারণে ভিন্ন পরিস্থিতির সাথে আরবদের মেনে নিতে হয় এবং মিশিয়ে দিতে হয় আঞ্চলিক পরিবেশে। এই প্রক্রিয়ায় মিশে যায় বিশ্বজনীন ভাবধারা, যা ঘটনাচক্রে ইসলামী গোঁড়ামির পরিবর্তন এনে বিজিত রাজ্যে আঞ্চলিক ধারা গ্রহণ করতে হয়েছিল, নইলে প্রজা শাসন সম্ভব হতো না। দেশ জয়ের, সাথে সেখানকার মানুষের মন জয়েরও প্রশ্ন উঠেছিল পরিস্থিতির কারণে।

বিজয়ী আরব বিজিত রাজ্যের ভাবধারা মুছে ফেলতে পারেনি এবং প্রজাদের স্থানীয় সামাজিক প্যাটার্ন, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, সাংস্কৃতিক প্রথা এবং প্রচলিত আইন কোনো কিছুকে একেবারে পরিত্যাগ করা হয়নি। আরবরা বিজয়ী রূপে প্রবেশ করেছে বটে, কিন্তু বিজিত রাজ্যের স্থানীয় কৃষ্টি, সভ্যতা, সমাজ ও রাজনীতির কাছে পরাজিত হয়ে।

শুরুতে আরবদের কোনো পেশাতে দক্ষতা ছিল এবং তারা শিল্প ও বিজ্ঞানকে

www.pathagar.com

ঘৃণা করেছে। তারা বিশ্বাস করত কোনো কোনো পেশাতে দক্ষতা ছিল পারিবারিক উত্তরাধিকার সূত্রে সংরক্ষিত। যেমন ইহুদিরা দক্ষ ছিল অর্থ সংক্রান্ত ব্যাপারে, গ্রিকরা ছিল প্রযুক্তিতে, স্থাপত্যে ও শিল্পে এবং খ্রিস্টানদের ছিল আইন, মেডিসিন, শিল্প এবং প্রশাসনে। তাই বিজয়ী আরবরা এই সব সম্প্রদায়ের লোকজনকে তাদের সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কাজ চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছিল।

যারা ইসলামী সভ্যতায় বেশি অবদান রেখেছেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ইবন খালদুন। তিনি আরব ছিলেন না। তিউনিসিয়ার ঐতিহাসিক। মারা যান ১৪০৬ খ্রিস্টাব্দে। বিখ্যাত স্কলার ছিলেন; ধর্ম ও রাজনৈতিক বিষয়ে তার জ্ঞান ছিল প্রগাঢ়। মুসলিম ছাড়া কিছু নন-মুসলিম ও ইসলামী সভ্যতার অবদান রেখেছেন এবং শুরু থেকেই ইসলামী শিল্পে, সাহিত্যে, দর্শনে অমুসলিমদের অবদান তুচ্ছ ছিল না।

ইসলামী জীবনে এবং সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে বিদেশীদের প্রভাব ফেলে দেবার নয়। ভাষাতে, ব্যাকরণে, ইতিহাসে, চরিত্র রচনায়, ভূগোলে, দর্শনে, ধর্মতত্ত্বে, আইনে, যুক্তিতর্কে, জুরিস প্রুডেন্সে, প্রশাসনে, প্রাকৃতিক ইতিহাসে, রসায়নে, পদার্থবিদ্যায়, চক্ষু চিকিৎসাশাস্ত্রে, সার্জারিতে, গণিতবিদ্যায়, নক্ষত্রবিদ্যায়, স্থাপত্যে, সঙ্গীতে, সাহিত্যে এবং শিল্পে বিদেশীদের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

বিস্তৃত বিশাল মুসলিম রাজ্য বিভিন্ন সম্প্রদায়ের স্কলার-পণ্ডিতগণ মিলে যে অবদান বিভিন্ন ক্ষেত্রে রেখে গেছেন, সেই সমন্বিত প্রচেষ্টায় গড়ে উঠেছে ইসলামী সভ্যতা। এই সভ্যতায় আরবদের অবদান অতি সামান্যই।

১৩.১ যুদ্ধবিগ্রহ

প্রাচীন আরবে গৃহপালিত পশু ছিল উট এবং এই উটের উপর চড়ে তীর-ধনুক ব্যবহার করত কিন্তু বহিশ্শত্রুর আক্রমণ থেকে তাদের বন্ধুরূপে রক্ষা করত আরবের বিশাল মরু অঞ্চল। গ্রিক ভূগোলবিশারদ স্ট্র্যাবো লিখেছেন– "আরবরা বেশিরভাগ সময় যানবাহন এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে নিজেদের ব্যস্ত রাখত; তারা যোদ্ধার জাত ছিল না তারা অস্ত্রেরও খুব ভালো ব্যবহার জানত না, অস্ত্রের মধ্যে ছিল তীর, ধনুক, বর্শা, তরবারি আর গুলতি; কিন্তু অধিকাংশ লোকেরা দু'ধারী কুড়াল ব্যবহার করত। আবদুল মোত্তালেব হিমিয়ার গভর্নর আব্রাহাকে আরবে প্রবেশাধিকার দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন যে আরবরা যুদ্ধবিদ্যায় বেশি পারদর্শী নয়।

তারা দক্ষ ছিল ছোটখাটো অতর্কিত আক্রমণে লুটপাট করতে এবং স্থানীয় যুদ্ধে (যেমন বদরের যুদ্ধ এবং ওহুদের যুদ্ধ) তাদের আক্রমণ ছিল বিক্ষিপ্ত, অতর্কিত। কিন্তু ইসলাম যখন আরব পেনিনসুলায় রাজত্ব স্থাপন করল, মুসলিমরা তখন ধীরে ধীরে যুদ্ধবিদ্যায় দক্ষ হয়ে উঠল। সালমান ফারসি মদীনার লোকদের পারস্যের পদ্ধতির পরিখা খনন করে প্রতিরক্ষা করার উপায় দেখিয়ে দেন এবং অগ্নি গোলা নিক্ষেপের কায়দা-কানুন শিখিয়ে দেন। আরবের সামরিক ইতিহাস সম্বন্ধে খুব অল্পই জানা যায়; বাইজানটাইন, সিরিয়া এবং পার্শিয়ান, ইরাক কেমন করে বিজিত হয়েছিল সে যুদ্ধের কথা শুধু মুখে মুখে প্রচারিত হয়েছে, এ সম্বন্ধে কোনো ইতিহাস লিখিত হয়নি এবং বর্তমানে এ সম্বন্ধে যে তথ্য পাওয়া যায় তা বিশ্বাসযোগ্য নয়। কোনো কোনো

www.pathagar.com

ঐতিহাসিক বিশ্বাস করেন যে, ঐ সময়ে যুদ্ধ ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দেওয়ার সামরিক প্রধান অতি অল্পই ছিল।

প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার মতো উপযুক্ত সামরিক সম্ভার ছিল না, ছিল না বড় যুদ্ধ করার অভিজ্ঞতা। আক্রমণ করা ও প্রতিরক্ষা করার Srategy জানা ছিল না। আরো জানা ছিল না দুর্গ অবরোধ করে আক্রমণ পদ্ধতি; তারা নগরীকে Blocked বা অবরোধ করতে পারত কিন্তু দখল করার দক্ষতা আয়ত্ত করতে পারত না।

প্রথম বিদেশী রাজ্য যা আরবরা কব্জা করেছিল মদীনায় খিলাফতের সময় তা ছিল পারশিয়ান ও বাইজানটিন সাম্রাজ্যের প্রদেশগুলো। যে প্রদেশগুলো আরবের বর্ডার সংলগ্ন ছিল এবং যদিও পারস্য ও বাইজানটিয়ান নিজেদের মধ্যে যুদ্ধে বিধ্বস্ত হয়েছিল তবুও আরবদের প্রতিহত করতে পারেনি অভ্যন্তরীণ কারণে, তাছাড়া স্বেচ্ছাচারী জুরাস্ট্রিয়ান পার্সিয়ান এবং খ্রিস্টান বাইজেনটিয়ানদের সাধারণ লোকের সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন ছিল এবং স্থানীয় জনসাধারণ অর্থনৈতিক এবং সামাজিক কারণে উভয় দেশের সম্রাটদের প্রতি বিক্ষুব্ধ ছিল। এই কারণে সাধারণ লোকজনের কাছ থেকে পারস্যের বা বাইজানটাইনের সম্রাট কোনো সাহায্য পায়নি বরং সাধারণ লোকজন বহিরাক্রমণের শত্রুদের স্বাগত জানিয়েছেন। এটাও বলা হয় যে আরবদের প্রাথমিক বিজয়ের কারণ ছিল গেরিলা আক্রমণ, প্রায়ই দেখা গেছে যে, মুসলিমরা ত্বরিত আক্রমণ করেছে ঐসব বিদেশী প্রদেশকে সেখানে থেকে কোনো প্রতিরোধের ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি বরং তারা স্বাগত জানিয়েছে। আর যারা প্রতিরোধ করতে চেষ্টা করেছিল তারা সুসংবদ্ধ হওয়ার পূর্বেই দুর্ধর্ষ আরব জাতি তাদের ওপর আক্রমণ করে বসে, প্রতিআক্রমণের কোনো সময় দেয়নি।

পারসিয়ান, ইরাক এবং পারস্য মুসলিমরা জয় করে নেয় এবং দক্ষিণ দিকের বাইজানটাইন প্রদেশগুলোকে দখলে আনে। বাইজানটাইন এবং পারসিয়ান সেনা দলে সৈনিক এবং অফিসার ক্যাডারভুক্ত ছিল। এর বাইরে থেকে লোকজন সেনা দলে ভর্তি হতে পারত না। অন্যদিকে আরব সেনাদলে জাতিভেদ নির্বিশেষে উপযুক্ত ব্যক্তিদের সেনাদলে ভর্তি করা হয়েছে ফলে মুসলিম আরব সেনাদলে অনেক বিদেশী নন-আরব সেনাপতি ছিলেন যাদের পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল এবং দক্ষতার জন্য জয় করা সহজ হয় এবং নিম্নস্তরের সেনাদলের শিক্ষার ব্যবস্থা বা প্রশিক্ষণের বন্দোবস্ত করা হয়। এছাড়া বহু নন-আরব সেনাদের ভাড়া করা হতো, অনেক লুণ্ঠনকারী এবং ডাকাত আরব সেনা দলে যোগদান করেছে মালেগণিমতের আশায় এবং এই সব লোকদের ব্যবহার করা হয়েছে অদক্ষ আরবদের পরিবর্তে। ঐতিহাসিক মাকরেজি (মৃ. ১৪৪২ খ্রিঃ) বলেছেন যে, ৮৩৫ খ্রিঃ খলিফা মুতাসেম বহু আরব সেনাকে সরিয়ে তুর্কি ভাড়া করা সৈন্য নিয়োগ করেন। ভবিষ্যতে এই তুর্কিরা খলিফার দরবারে খুব প্রভাবশালী হয়ে ওঠে। মুসলিম বিজয়ের সাথে সাথে দেখা গেল যে আরব জেনারেলদের সরিয়ে তাদের ঐ স্থানে নিয়োগ করা হয়েছে পারসিয়ান, গ্রিক, তুর্কি আর্মেনিয়ান, মিসরীয়, মঙ্গোল, বারবার, ভিজিগত ও অন্য বিদেশীদের। পরবর্তীতে দেখা গেছে এইসব বিভিন্ন জাতি মুসলিম বিশ্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের 'আমির' পদ গ্রহণ করে নিজেদের বংশ প্রতিষ্ঠা করেছে। সিরিয়া এবং ইজিপ্টের নাবিকদের নিয়ে মুসলিম রাষ্ট্রের নৌ-বাহিনী সৃষ্টি হয়

www.pathagar.com

কিন্তু এই নৌ-বাহিনী বিশেষ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারেনি যদিও মুসলিমরা এক মাসের মধ্যে সারা পারস্য দেশ জয় করে নেয় এবং এক শতাব্দির মধ্যে তাদের সাম্রাজ্য ইন্ডিয়া থেকে আটলান্টিক পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে পড়ে। কিন্তু বাইজানটাইন মুসলিমরা তখনও দখল করতে পারেনি, তবে মুসলিমদের লক্ষ্য ছিল যে একদিন না একদিন তারা বাইজানটিয়ান নগরী 'কন্‌স্ট্যানটিনোপল' দখল করবে।

৬৭০ খ্রিঃ উমাইয়া খলিফা মাবিয়া দার্দানালিস প্রণালীর মধ্য দিয়ে কনস্টানটিনোপল অবরোধ করার চেষ্টা করেন এবং সাত বৎসর ধরে সেই অবরোধ চলে কিন্তু কৃতকার্য তিনি হতে পারেননি। বহু ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে তার সেনাদলকে ফিরে আসতে হয়। ৭১৬ খ্রিঃ আরেকজন উমাইয়া খলিফা সোলেমান ৮০ হাজার সৈন্যসামন্ত এবং ১৮ শত যুদ্ধ জাহাজ নিয়ে কনস্ট্যান্টিনোপল অবরোধ করেন। তখন বাইজানটাইনের সম্রাট ছিলেন তৃতীয় লিও, কিন্তু বাইজানটাইনদের গোলাগুলির কারণে অবরোধ তুলে নিতে বাধ্য হন বহু ক্ষয়-ক্ষতি স্বীকারের পরে। এর কিছুদিন পরে খলিফা সোলেমান মারা যান।

ঐ সময় বাইজানটিয়ান যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে এভাস, স্লাভস্, বুলগার, মেগিয়ার, সেলুজুক এবং অন্যান্য জাতির সাথে; এই কারণে বাইজানটাইনের প্রতিরক্ষা ক্ষমতা অনেক পরিমাণে হ্রাস পায়। ১২০৪ সালে চতুর্থ ক্রুসেডের সময় ক্রুসেডরা, প্রধানত ফ্রেঞ্চ এবং ভেনিশিয়ানরা কনস্ট্যানটিনোপল আক্রমণ করে লুট করে নগরীতে আগুন লাগিয়ে দেয়। এই ঘটনার পর থেকে পূর্ব দিকে এই খ্রিস্টান সাম্রাজ্যে নৈতিক অবনতি ঘটে এবং এর পর আড়াই শতাব্দি যাবৎ তারা কোনো রকমে রাজ্য চালিয়ে যায়।

মুসলিম সৈন্যবাহিনী কনস্ট্যান্টিনোপল আক্রমণে কখনো নিরুৎসাহী হয়ে পড়েনি। মাবিয়ার প্রথম আক্রমণের পরে সাত শত বছর অতিক্রম হয়েছে। মুসলিম বিশ্বে তখন তুর্কিরা খুব প্রভাবশালী জাতি, তুর্কি সুলতান ২য় মাহমুদ ১৪৫৩ খ্রিঃ কনস্ট্যান্টিনোপল অবরোধ করেন এবং শেষ পর্যন্ত দখল করে নেন।

১৩.২ আরব জাতীয়তাবাদ

প্রফেট মুহম্মদ বলেছিলেন 'সকল জাতি থেকে আরবরা শ্রেষ্ঠ জাতি' (৩ ঃ ১০৬) এবং আরবরা যখন আরো রাজ্য জয় করল তখন খলিফা ওমর ঘোষণা করলেন যে, 'ঈশ্বর আরবদের শ্রেষ্ঠ বিজয়ী করেছেন।' মূলত ইসলামকে বলা হয় আরবদের জন্য বিজয়ের ধর্ম এবং এই বিজয় শুধু আরব জাতির জন্য যারা আরব পেননসুলায় বসবাস করে এবং আরবি ভাষা বলে।

অনেক দিন ধরে মুসলিমরা ভাবত যে তারা শুধু আরব বংশোদ্ভূত এবং পৃথিবীর অভিজাত শ্রেণীর মুসলিম একটা আলাদা জাতি যারা অন্যসব জাতির ওপর কর্তৃত্ব করে। আরবদের কাছে ইসলাম অর্থ আরব নের্তৃত্ব ও কতৃত্ব যেখানে শুধু আরবরাই একচ্ছত্রভাবে রাজত্ব করবে। একজন নন-আরব মুসলিম পরিপূর্ণ মুসলিম বলে গণ্য নয় অথবা একজন নন-মুসলিম পরিপূর্ণ আরব নয়।

পূর্ণ status তাকেই দেওয়া হতো যে ব্যক্তি মুক্ত, ক্রীতদাস নয়, পুরুষ, নারী নয়, আরব, নন-আরব নয়, মুসলিম, নন-মুসলিম নয়। আরবে গোত্রযুদ্ধের সময় যে সমস্ত

www.pathagar.com

বন্দির ধমনিতে আরব রক্ত প্রবাহিত তাদের মুক্ত করে দেওয়া হতো এবং যারা নন-আরব তাদের হত্যা করা হতো, এমনকি আরব ক্রীতদাসকে অল্প মুক্তিপণ দিয়ে মুক্ত করা হতো, কিন্তু নন-আরবদের তা করা হতো না। আরব মুসলিম, আরব-নন মুসলিম, নন-আরব মুসলিম এবং নন-আরব বিধর্মী এদের মধ্যে পার্থক্য করা হতো। কোনো কোনো সময় বিজিত রাজ্যের অভিজাত বংশের ধর্মান্তরিত মুসলিমদের অবৈতনিক সেমি-আরব status দেওয়া হতো এবং কোনো আরব পৃষ্ঠপোষক তাদের মাওয়ালী হিসাবে গ্রহণ করত, এমনকি মাওয়ালীরাও যারা আরবদের সাথে যুদ্ধ করত তারা আরব মুসলিমদের সুবিধা পেত না। নন-আরবদের ধর্মান্তকরণ আরবদের চেষ্টায় হয়েছিল কিন্তু কতকগুলো সমস্যা দেখা দেয় যখন আরব সাম্রাজ্য বিস্তার লাভ করে, আর এই ধর্মান্তকরণ হতো ট্যাক্স থেকে বাঁচবার জন্য। সমস্ত মুসলিমদের আরব ও নন-আরব আয়কর (যাকাত) দিতে হতো। এই যাকাত বাধ্যতামূলক এবং ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে একটি (২৩ ঃ ৪)। 'যাকাত' শব্দটি কোরানে উল্লিখিত হয়েছে যা মুসার Covenent-এর সাথে সম্পর্কযুক্ত (২ ঃ ৮৩) এবং এর কোনো সন্তোষজনক ব্যাখ্যা নেই। এর উৎস হলো আরামাইক এবং ইসলামের পূর্বে ব্যবহৃত হতো বাধ্যতামূলক খ্রিস্টান ও ইহুদি সম্প্রদায়ে দান হিসাবে, (Jeffery 1938, P. 153)। এই ট্যাক্স সাদাকা থেকে আলাদা। সাদাকা দেয়া আরবিদের দান হিসাবে ভলান্টারি দান। বাধ্যতামূলক নয়, তবে দিলে পুণ্য হয়। এই 'সাদাকা' শব্দও আরামাইক এবং ইহুদি ও খ্রিস্টানরা দান হিসাবে (ডোনেশন) দিত। আর একটা অতিরিক্ত কর ছিল যাকে খারাজ বলে, এটাও আরামাইক শব্দ। এই খারাজ দিতে হতো নন-আরব, মুসলিম ও নন-মুসলিমদের।

পরিশেষে, আরও একটি ট্যাক্স ছিল যা বিধর্মীদের দিতে হতো, এর নাম জিজিয়া। এই ট্যাক্সের বিরুদ্ধে আন্দোলন হয়েছে। কিন্তু দিতে হতো। পরে যখন একযোগে সবাই মুসলিম হয়ে যায় তখন ট্যাক্স বন্ধ হয় এবং রাজস্বে বেশ ঘাটতি পড়ে।

এই শ্রেণী বিভাগের জন্য রাজ্যে বেশ অসন্তোষ দেখা দেয় এবং গণআন্দোলন (শুরিয়া) হয় মুসলিম রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে, কোনো কোনো স্থানে সশস্ত্র আন্দোলনও হয়েছে। নন-আরব কনভার্টরা আরবদের সমান স্ট্যাটাস দাবি করে ব্যর্থ হলে তারা তাদের আন্দোলন করে এবং তাদের পুরনো কৃষ্টি ও সভ্যতায় ফিরে যেতে চায়। এই বিচ্ছিন্নবাদীরা মরুর তাঁবুবাসীদের সাথে নিয়ে আন্দোলনে নামে। এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন আবু ওবাইদা (মৃ. ৮৭৫); তিনি কোরানের ভাষ্যকার ও ভাষাবিশারদ ছিলেন। কেউ বলে তিনি নাবিতিয়ান কেউ বলে ইহুদি। ইরাক, প্যালেস্টাইন ও মিসরের আন্দোলনকারীরা তাদের পূর্ব-পুরুষের জাত্যাভিমান এবং কৃতিত্বের কথা আরবদের সাথে তুলনা করে আন্দোলন আরও জোরদার করে তোলে। আন্দোলনের গতিকে জোরদার করে তুলল কিছু এন্টি-আরব দেশপ্রেমী পারস্যবাসী, যারা বলে যে আরবদের চেয়ে বেশি গর্ব করার আছে তাদের পূর্বপুরুষদের জন্য এবং তাদের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের, তাদের শিক্ষা ও সাহিত্যের। পারসিরা আরবদের চেয়ে বেশি রাজ্য বিস্তার করেছে, মহাশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। তারা দাবি করত তাদের অবদানের কথা যা মুসলিম সংস্কৃতি ও সভ্যতাতে রেখে গেছে।

www.pathagar.com

তারা অভিযোগ করে যে আরবদের বংশ তালিকা তৈরি করা, বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে সন্দেহজনক বিবাহের মধ্যে বংশের যোগসূত্র অথবা ক্রীতদাসীর রক্ত মিশ্রিত। তাদের নিজেদের দলিলপত্র প্রমাণ করে যে গর্বিত অভিজাত বেদুইন গোত্র মিশ্র বংশোদ্ভূত এবং আংশিক ইহুদি বংশ। ইরানিরা আরবদের ভেড়ার পাল রক্ষক, উষ্ট্র চালক, মরুবাসী (ফার্সি 'সাহারা-নিশিন' থেকে আসছে 'সেরাসিন' নাম) এবং টিকটিকি ভক্ষক এবং কোরেশদের মধ্যে অধিকাংশ সমকামী (Thaalibi, 1968, P. 25)। তারা বলে আরবরা বন্য, নোংরা ও অসভ্য জাতি এবং যে ভদ্র আচরণ (আদব) শিখেছে তা শুধু পার্সিয়ানদের কাছ থেকে।

শুবিয়া আন্দোলন স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে যে বিভিন্ন ইসলামিক জাতি কখনো এক সম্প্রদায় (উম্মা : আরামাইক) হিসাবে দেখা দেয়নি। কোরান, রোজা ও হজ মুসলিমদের একমাত্র বন্ধন। মুসলিমরা অনেক কারণে বিভিন্নভাবে বিভক্ত। জাতিগত বিভেদ, আঞ্চলিক ইতিহাস, স্থানীয় সামাজিক ভাষা এবং সাংস্কৃতিক বন্ধন ইত্যাদি প্যান-ইসলামিক বন্ধনকে বাধা দেয়।

মুসলিমদের অধিকাংশ নন-আরব এবং তাদের নিজস্ব ট্র্যাডিশন এবং আলাদা জীবনযাত্রা আছে। মাগরিবের লোকজন (লিবিয়া, তিউনিস, আলজিরিয়া, ও মরক্কো) আরব গোত্রভুক্ত নয় এবং বার্বাররাও আরবদের আধিপত্য অনেক দিন থেকে বাধা দিয়ে এসেছে। আফ্রিকার নিগ্রো এবং অন্যান্য সেমিটিক লোকজন কট্টর ন্যাশানালিস্ট নন-আরব। এটা সমভাবে প্রযোজ্য মিসরীয়, পার্সি, আফগান, তুর্ক ও উজবেকদের ক্ষেত্রে। মধ্য এশিয়ায় তাজিকও এদের দলে। ইরাকের কুর্দ, সিরিয়া, তুর্কি ও ইরান, বলা হয় যে, প্রাচীন মেডেস (Medes) থেকে আগত। ভারত উপমহাদেশে এবং ইন্দোনেশিয়ার লোকজনরা প্রধানত হিন্দু, বৌদ্ধরা সর্বপ্রাণবাদী থেকে ধর্মান্তরিত মুসলিম এবং মিশ্র জাতি-গোত্রভুক্ত।

পরিশেষে, মুসলিম রাষ্ট্র নন-মুসলিম মাইনরিটির প্রভাব ইসলামের জন্য সমস্যার সৃষ্টি করেছে। মিসরে প্রায় ১০% জনসংখ্যা খ্রিস্টান কপ্ট, লেবাননে অর্ধেকের বেশি খ্রিস্টান জনসংখ্যা। সিরিয়া ও জর্ডানে খ্রিস্টানরা হচ্ছে ধনী মাইনরিটি।

কোনো কোনো পণ্ডিতদের মতে এই ব্যতিক্রম আরবদের জন্য কোনো সমস্যা নয়। আরবদের ইতিহাসে দেখা যায় তাদের নিজের ইচ্ছায় চলার প্রবণতা আছে। কিছু ব্যতিক্রম থাকলেও আরবরা সব সময়ই আরব জাতির বড়াই করেছে, ধর্মের করেনি, ধর্মীয় গোঁড়ামি আরবে দেখা দেয়নি, দেখা দিয়েছে নন-আরব রাষ্ট্রে। আরবরা মনে করে তারা একটি আলাদা জাতি, তাদের ইতিহাস-গৌরব আলাদা এবং তাদের অনেকেই আরবের অতীত দেখে, ইসলামকে নয়। একজন ইউরোপীয় যেমন ইউরোপের ইতিহাস লিখতে খ্রিস্টানিটিতে উল্লেখ করে না। তেমনি বলা হয়, আরবের ইতিহাস কেউ লিখলে মুসলিম ধর্মকে বাদ দিয়েই লিখবে। সত্যি বলতে কি ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে বাগদাদে এমনি একটি প্রকল্পে হাত দেয়া হয়েছিল (Akhters 1989 P. 84)।

১৩.৩ আন্তঃগোত্র বিবাহ (Miscgenation)

মুসলিমদের আন্তঃগোত্র বা আন্তঃজাতি বিবাহ একটি গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর। আরবরা নন-

www.pathagar.com

আরব রমণীদের স্ত্রীরূপে গ্রহণ করে বিদেশের উপাদানগুলো ধর্মের সাথে মিশিয়ে গুলিয়ে ফেলেছে যার ফলে ইসলামিক সভ্যতায় বিদেশী উপাদানের প্রভাব প্রকট। এই ইন্টারম্যারেজ ইসলামের জন্মলগ্ন থেকেই আরম্ভ হয়েছে। প্রফেট মোহাম্মদ নিজেই বিবাহ করে ঘরে এনেছেন মিশ্র প্যাগন গোত্রের রমণী, ইহুদি স্ত্রী এবং খ্রিস্টান ও ইহুদি উপ-পত্নী।

ইসলামী সাম্রাজ্য পারস্য ও বাইজানটাইনে বিস্তৃত হলে, মুসলিমরা বিয়ে করেছে খ্রিস্টান, ইহুদি ও জোরাস্ত্রিয়ান এবং বুড্ডিস্ট রমণীদের ব্যাপক হারে, কারণ তাদের শিক্ষা ও সংস্কৃতি উঁচুস্তরের ছিল আর বিশেষ কারণ ছিল এই সব রমণীদের অঙ্গ-সৌষ্ঠব ছিল আবেদনমূলক। উচ্চ শ্রেণী মুসলিমদের অনেকেই, খলিফা প্রশাসক এবং ধর্মবেত্তাসহ, নন-আরব মহিলা বিবাহ করেছেন এবং তাদের বংশ তালিকা জটিল হয়েছে, কেননা পুত্র-কন্যা জন্মে নন-আরব ও উপপত্নীদের মাধ্যমে। এই বিবাহে ধর্মান্তরকরণ পূর্বশর্ত ছিল না এবং যদিও কনভারশন হয়ে থাকে, তার অর্থ এই ছিল না যে সে-স্ত্রী তার পূর্ব বিশ্বাস পরিত্যাগ করবে। নামকা ওয়াস্তে কনভারশন হলেও স্ত্রীরা তাদের নিজ নিজ ধর্ম পালন করেছে, কোনো বাধা ছিল না। সুতরাং তলে তলে নন-মুসলিম বিশ্বাস ট্র্যাডিশন ও সাংস্কৃতিক প্রভাব পরিবারে অবশ্যই পড়েছে।

নাইলা বিন্ত আল ফুরা ফিসা তৃতীয় খলিফা ওসমানের স্ত্রী ছিলেন খ্রিস্টান কাল্ব গোত্রের কন্যা। ওসমানকে তরবারির আঘাত থেকে বাঁচাতে গিয়ে তাঁর তিনটি আঙুল কাটা যায় বলে কথিত। তার সম্মুখেই তাঁর স্বামী খলিফা ওসমানকে হত্যা করে বিদ্রোহী মুসলিমরা।

চতুর্থ খলিফা আলীর পুত্র হোসেন বিবাহ করেছিলেন ৩য় ইয়াজদেগার্ডের এক কন্যাকে। ইয়াজদেগার্ড ছিলেন পারস্যের শেষ সাসানিয়ান সম্রাট, ধর্মে জোরাস্ত্রিয়েন। এই জুটির পুত্র জয়নাল আবেদীন শিয়াদের ৪র্থ ইমাম। প্রাচীন পারস্য পরিবারের সাথে শিয়া ইমাম ও নেতাদের বৈবাহিক সূত্র ছিল শুরু থেকেই এবং এই যোগসূত্র অনেক দিন পর্যন্ত ছিল।

দামেস্কর উমাইয়া বংশের অনেক সদস্যের বিবাহ হয়েছে সিরিয়ার খ্রিস্টান রমণীর সাথে এবং অনেকের হয়েছে বাইজানটাইন অভিজাত পরিবারের কন্যাদের সাথে। মদিনার ধার্মিক ব্যক্তিদের প্রতিবাদ ধোপে টিকেনি। প্রথম উমাইয়া খলিফা মাবিয়ার পত্নী ছিলেন মাইসুন বিন্ত বাহ্দাল, কাল্ব গোত্রের খ্রিস্টান রমণী। তিনি তার বাবা ও পরিবারের সকলেই খ্রিস্টান ছিলেন। মাবিয়া দামস্কে একটি চার্চ নির্মাণ করে স্ত্রীকে উপহার দেন। এই মহিলা প্রথম এজিদের মাতা।

উমাইয়ারা তাদের মিশ্র বংশ তালিকা অস্বীকার করেনি। দ্বাদশ খলিফা তৃতীয় এজিদ তার বংশ সম্বন্ধে গর্ব করে বলতেন, আমার পূর্বপুরুষ ছিল পারস্য সম্রাট এবং বাইজানটাইন সম্রাটগণ তুর্কি খানরা উভয়েই আমার পূর্বপুরুষ।

আব্বাসি খলিফাদের মধ্যে অতি অল্পই ছিলেন খাঁটি আরব। এদের বংশসূত্র বের করতে গিয়ে বাগদাদের পণ্ডিত ব্যক্তি ইবন হাবিব (মৃ. ৮৬০) দেখিয়েছেন যে প্রায় সকলেই ছিলেন নন-আরব, বেশির ভাগ পার্সিয়ান প্রায়ই জোরাস্ত্রিয়ান মাতার সন্তান। অনেকেই বিদেশী রক্তের ক্রীতদাসী রমণীদের পুত্র। মাত্র তিন আব্বাসি খলিফা স্বাধীন

www.pathagar.com

রমণীর সন্তান ছিলেন। মনসুর (মৃ. ৭৭৫) পার্সিয়ান ক্রীতদাসীর পুত্র; মামুন (মৃ. ৮৩৩) এক বার্বার রমণীর সন্তান; ওয়াথিক (মৃ. ৮৪৭) মুকদাদির (মৃ. ৯৩২) ছিলেন গ্রিক রমণীদের পুত্র। মুস্তাসিরের (মৃ. ৮৬২), মাতা ছিলেন তুর্কি গৃহপরিচারিকা।

ওবাইদুল্লাহ, ফাতেমি বংশের প্রতিষ্ঠাতা, ছিলেন ইহুদি ও জোরাস্ত্রিয়ান বংশোদ্ভূত বলে কথিত এবং তার পরের খলিফারাও ছিলেন মিশ্র বিবাহের ফসল। পঞ্চম ফাতেমিদ খলিফা আজিজ বিবাহ করেন খ্রিস্টান রমণী যার দুই ভ্রাতাকে জেরেমিয়া ও আরভেনিয়াস জেরুজালেম ও আলেক্সান্দ্রিয়ার বিশপ পদে নিযুক্ত করেন।

স্পেনে মুসলিমরা যে অভিনব সংস্কৃতি গড়ে তুলেছিলেন তা সম্ভব হয়েছিল খ্রিস্টান ও মুসলিমদের মাঝে ঘন ঘন ইন্টার-ম্যারেজের ফলে। মরক্কো এবং স্পেনের দক্ষিণ অংশ বিজয়ী মুসা বিন জুসাইর– তিনি প্যালেস্টাইনের খ্রিস্টান বালী গোত্রোদ্ভূত। মুসার পুত্র আব্দুল আজিজ ভিজিগথ রাজা রর্ডারিকের বিধর্মী স্ত্রী এজিলোনাকে বিবাহ করেন।

তারিকের সাথে সেসব বার্বার জিব্রাল্টার অতিক্রম করে স্পেনে বসবাস করেছে, কথিত যে তারা যথেচ্ছ স্থানীয় লোকজনের কন্যাকে বিবাহ করেছে এবং স্পেনের মূল ভূমি দখলে যেসব সৈন্যরা অংশ নিয়েছিল তারা ছিল খ্রিস্টান কাল্‌ব গোত্রের এবং এরাই কর্ডোভা ও গ্রানাডাতে স্থায়ী বসবাস আরম্ভ করে আর সেভিলে এবং ভেলেন-সিরায় করে কাইস গোত্রের খ্রিস্টান সেনাদল।

বার্বার, আরব ও সিরিয়ার লোকজন দ্বিধাহীনভাবে মেলামেশা করেছে স্থানীয় লোকজনদের সাথে যারা ছিল স্লাভ, ফ্র্যাঙ্ক, ভিজিগথ ও ভ্যান্ডেল এবং শুরু থেকেই উত্তর অঞ্চলের মহিলাদের আরব-বার্বার মধ্যে বেশ চাহিদা ছিল। দশম শতাব্দির মধ্যে স্পেনে মিত্র রক্তের প্রবাহ বয়ে গেছে। আইবেরিয়ান পেনিনসুলা জুড়ে, মুসলিম শাসক শ্রেণী, সামন্ত, স্কলার, ধর্মবেত্তা এবং বুদ্ধিজীবী প্রায় সকলেই মিশ্র-রক্ত-যুক্ত। মোজারেব বা আরবীয় খ্রিস্টান, যারা স্পেনে শিক্ষায়, সংস্কৃতি ও শিল্পে বিশেষ অবদান রেখেছিল তারা প্রায়ই মিশ্র বিবাহের ফসল।

কর্ডোভার মহান উমাইয়া খলিফা ৪র্থ আব্দুর রহমান (মৃ. ৯৬১)-এর লাল চুল ও নীল চক্ষু ছিল। তিনি আরবি ও রোমান ভাষার সুপণ্ডিত ছিলেন এবং উভয় ভাষাই বলতে পারতেন। তিনি ছিলেন আনদালুসিয়ার টিপিক্যাল দো-আঁশলা। তার বাবা ছিলেন অর্ধেক আরব আর মা ছিলেন ফ্র্যাঙ্ক রমণী। তার দাদি ছিলেন প্রিন্সেস ইনিগা প্যামপ্লোনার রাজা ফরচুন গার্সেসের কন্যা। অন্য এক উমাইয়া খলিফা ২য় হিশাম (মৃ. ১০১৩) ছিলেন বাসক্যু রমণীর পুত্র।

তুর্কির অটোমেন লাইন ছিল গ্রিক, আরমোনিয়ান এবং স্লাভ গোত্রের মিশ্র বিবাহের লাইন। এছাড়া ইহুদি ও অন্য জাতের রক্ত ছিল সুলতানদের ধমনীতে। কদাচিৎ দু'একজন ছিল খাঁটি তুর্কি শাসক, ভিজির বা সামন্ত। এসব সপ্তদশ শতাব্দির কথা। অটোমেন প্রধান ওরখান, এই লাইনের দ্বিতীয় সুলতান, বিয়ে করেছিলেন বাইজানটাইন সম্রাট জন ভি প্যালিও লোগাসের কন্যাকে। ১৩৬৬ খ্রিস্টাব্দে ওরখানের উত্তরাধিকারী ১ম মুরাদ বুলগেরিয়ান রাজা ৩য় শিশম্যানের ভগিনীকে বিবাহ করেন। মুরাদের পুত্র ও উত্তরাধিকারী ১ম বায়েজিদ এক খ্রিস্টান রমণী লেডি ডেসপয়নাকে

www.pathagar.com

বিবাহ করেন। ইনি সার্বিয়ার শাসকের ভগিনী ছিলেন। সুলতান মুরাদকে মঙ্গল সম্রাট তৈমুর লং পরাস্ত করে খাঁচায় ভরে নিয়ে যান বলে কথিত। গ্রিক, আর্মেনিয়ান, স্লাভ এবং অন্যান্য বিদেশী পত্নী ও উপপত্নীতে ভরপুর ছিল সুলতানদের হেরেম।

সামন্ত শ্রেণীর ও রাজকীয় সভাসদদেরও বিদেশী পত্নী ও উপপত্নী ছিল। বলা হয় যে, ২৯২ গ্র্যান্ড ভিজিরের মধ্যে অটোমেন সাম্রাজ্যে কেবলমাত্র ৭৮ জন ভিজিরের পিতামাতা ছিল তুর্কি।

ভারতে, মঙ্গল, টার্কিশ, পার্সিয়ান এবং হিন্দুর কন্যা দ্বারা মোগলদের মহান বংশ মিশে গিয়েছিল। ঐ সময়ের মধ্যে ইউরোপীয় ও ইউরোশিয়ান মহিলা মোগল সম্রাটদের ও সামন্ত সভাসদদের হেরেমে (Dover 1937, P. 121)। গায়ের চামড়া সাদা হওয়ার কারণে পশ্চিমা নারীদের বেশি কদর ছিল।

শাহ ইসমাইলের মাতা ছিলেন প্রিন্সেস মার্থা। ইনি কমেনি সম্রাট ও খ্রিস্টান ট্রেবিজন্ড (১২০৪-১৪৬১) বংশের কন্যা। পারস্য সম্রাজ্ঞী হয়ে তার নাম হয় হালিমা আলম শাহ বেগম। শাহ ইসমাইল পারস্যে সাফাবিদ বংশের (১৪৯৯-১৭৩৬) প্রতিষ্ঠাতা।

এই সমস্ত তথ্য থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে উত্তর আফ্রিকা থেকে মধ্য এশিয়া পর্যন্ত মুসলিম বংশের সম্রাট, সুলতান ও রাজপুত্ররা বিবাহ করেছিলেন, স্থানীয় শাসকবৃন্দের মহিলাদের অথবা বিজিত রাজ্যের মহিলাদের স্ত্রী রূপে গ্রহণ করেছেন এবং প্রায়ই ইউরোপীয় মহিলা বেছে নিতেন ফর্সা সন্তান-সন্তনাদি পাওয়ার জন্য।

মধ্যযুগের কাহিনী থেকে মুসলিম ও খ্রিস্টানদের মধ্যে বেশ কয়েকটি প্রেম কাহিনী পাওয়া যায়। এর মধ্যে ত্রয়োদশ শতাব্দিতে একটি উল্লেখযোগ্য কাহিনী হচ্ছে কাউন্ট অকেসিন এবং সুন্দরী সারাসিন বন্দি নিকোলেটের রোমান্স। এইসব ঐতিহাসিক পটভূমিতে উপন্যাস রচিত হয়েছে। ইমামুদ্দিন জঙ্গি সেলজুক আর্মির এক তুর্কি অফিসার; ইনি মেসোপটেমিয়া ও উত্তর সিরিয়াতে ক্ষুদ্ররাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন এবং ক্রুসেডারদের কাছ থেকে এডেসা দখল করে নেন ১১৪৪ খ্রিস্টাব্দে। বলা হয়, ইনি খ্রিস্টান দম্পতির সন্তান। খিলিজ আরসালান (মৃ. ১১৭৮) সেলজুল সুলতান ছিলেন। ইনি উত্তর-পূর্ব আনা তোলিয়ায় দানিশমন্দ বংশে মুখ্য ভূমিকা রেখেছেন। বলা হয় ইনিও খ্রিস্টান ওরিজিন।

ক্রুসেড খ্যাত সুলতান সালাদিনের মাতা ছিলেন খ্রিস্টান মহিলা, কাউন্টেস অব পনথিউ, মিসরের উপকূলে জাহাজ ডুবি হওয়ার কারণে সালাদিনের পিতার ঘরণী হন।

টমাস বেকেট (মৃ. ১১৭০) ক্যান্টাবেরির আর্ক বিশপ যিনি শহীদ হয়েছিলেন তাঁর মাতা ছিলেন একজন সেরাসিন মহিলা, যদিও বলা হয় যে তিনি ছিলেন নর্মান পিতামাতার সন্তান।

১৩.৪ প্রশাসন

জটিল রাষ্ট্র ব্যবস্থাপনায় অল্প অভিজ্ঞ আরবরা নতুন রাষ্ট্রের পুরনো কর্মচারী-কর্মকর্তাদের পদচ্যুত করেনি, অভিজ্ঞ কর্মচারীরা তাদের নিজ নিজ স্থানে বহাল থেকে শিশু মুসলিম রাষ্ট্রের শাসনকার্য চালিয়ে গেছে। দ্বিতীয় খলিফা ওমর চলমান প্রশাসনিক

www.pathagar.com

ব্যবস্থাপনা উপলব্ধি করে তাঁর গভর্নরদের নির্দেশ দেন বাইজানটাইন ও সাসানিয়া শাসন ব্যবস্থা চালু রাখতে এবং বিদ্যমান ব্যবস্থার কোনো পরিবর্তন না করতে (zakaria, 1989 P. 48)।

উমাইয়া খলিফাদের সময়ে হেলেনিস্টিক ও সাসানিয়ান ব্যবস্থার আরো জোরদার হয়, যাতে আরবীয় ব্যবস্থা এর অনুকরণে গড়ে ওঠে। বার্নার্ড লুই বলেছেন : পার্সিয়ান ও বাইজানটাইন রাষ্ট্র যেমন ছিল, আরব রাষ্ট্র তখন তেমন ছিল না (1966 P. 66)।

খিলাফতের সরকারি প্রধান প্রধান অফিসগুলোতে কর্ণধার ছিল ইহুদি ও খ্রিস্টানরা, যারা গ্রিক ও বাইজানটাইন প্রশাসনে কাজ করেছে। দ্বিতীয় ওমর পরে চেষ্টা করেছিলেন সরকারের চাকরি থেকে ইহুদি ও খ্রিস্টানদের সরিয়ে দিতে, কারণ কোরান মুসলিমদের তাদের বিরুদ্ধে সতর্ক থাকতে বলেছে (৫ ঃ ৫৬), কিন্তু এতে এতো গোলযোগ শুরু হয়েছে প্রশাসনে যে খলিফাকে সে আদেশ রহিত করতে হয়।

বেশ কয়েকজন খলিফা খ্রিস্টান সেক্রেটারি ও পরামর্শদাতা নিয়োগ করেছিলেন। সার্জিয়াস (সার্জুন) ইবন মনসুর (মৃ. ৬৮৪) মাবিয়ার প্রধান সেক্রেটারি ও বিশ্বস্ত পরামর্শদাতা ছিলেন এবং পরে আরও তিন খলিফার সেক্রেটারির কাজ করেন। সার্জিয়াসের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র সিরিয়ান ধর্মবেত্তা দামেস্কর জন খলিফাদের দরবারে খ্রিস্টানদের প্রতিনিধিত্ব করেছেন এবং উপদেশও দিয়েছেন। বানু ওয়াহাবের খ্রিস্টান সদস্যরা (এদের মধ্যে কয়েকজন মুসলিম হন) উমাইয়াদের সেক্রেটারি রূপে কাজ করেছেন এবং আব্বাসি খলিফাদেরও উপদেশ দিয়েছেন। যে সময়ে আব্বাসি বংশ রাজ্যভার গ্রহণ করে, অনেক খ্রিস্টান তাদের পদে বহাল ছিল। খলিফা মুতাসিমের সেক্রেটারি ফজল ইবন মারওয়ান খ্রিস্টান ছিলেন, পরে তিনি ইসলামে দীক্ষা নেন। স্টেফেনাস (মৃ. ৯৩৫) খলিফা মোক্তাদিরের সেক্রেটারি ছিলেন।

সাধারণত আব্বাসি খলিফারা পার্সিয়ানদের পছন্দ করত এবং সাসানিয়ান মডেলে রাজকার্যে পরিবর্তন আনে। এতে গোঁড়া মুসলিমরা ইসলামবিরুদ্ধ বলে নিন্দাবাদ করে। খলিফা পার্সিয়ান মডেলে দেওয়ান ব্যবস্থা প্রবর্তন করে অর্থ, ট্যাক্স, পুলিশ ও নৌবহরের স্থাপনা করেছে।

সাসানিয়ান শাসন ব্যবস্থার আদলে আব্বাসিরা উজিরের পদ প্রবর্তন করে। উজির অর্থে প্রধানমন্ত্রী বোঝায়। উজির শব্দ সম্বন্ধে চিন্তা করা হয় যে শব্দটি আরাবিক, কারণ কোরানে উল্লেখ আছে যে আরন মুসার উজির (সাহায্যকারী) (২৫ ঃ ৩৭) ছিলেন। কিন্তু এখন এটা পাহলভি (মধ্য পার্সিয়ান) বলে ধরা হয়। আব্বাসি উজিরদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পরিবার ছিল বার্মা সাইদ—আরাবিয়ান নাইট্স-এ উল্লেখ আছে।

প্রথমে সরকারি ভাষা ছিল দুটা, আরবি ভাষার সাথে সাথে স্থানীয় ভাষাও চালু ছিল। সিরিয়াতে দপ্তরি নথিপত্র দুটি ভাষাতেই ইস্যু হতো– গ্রিক ও আরবিতে; প্যালেস্টাইনে আরামাইক ও আরবি, মিশরে কপটিক ও আরবি; পারসে, পহলভী ও আরবি।

৬৯০ খ্রিস্টাব্দে, আবদুল মালেকের রাজত্বকালে, রাষ্ট্রভাষা আরবি করা হয়। কিন্তু পরবর্তী কয়েক দশক ধরে আরবি ও স্থানীয় ভাষা উভয়ই ব্যবহার করা হয়েছে।

সাম্রাজ্যে সংহতি বজায় রাখার জন্য উমাইয়ারা এবং তদারকি ও নিয়ন্ত্রণ করার পক্ষে বাইজানটাইন প্রকৌশল ভাড়া করে হাইওয়ে রাস্তা ইত্যাদি তৈরি করান। এতে

www.pathagar.com

যোগাযোগের ব্যবস্থা সুপ্রশস্ত হয়। রাস্তাঘাট তৈরি হওয়ার পর ঘোড়ার ডাকের প্রবর্তন খিলাফতের প্রতিটি অঞ্চলে ত্বরিৎ সংবাদ পাঠানোর ব্যবস্থা হয় যাতে প্রদেশের সকল গভর্নরকে রাজ্যের হালচাল সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল করা যায়। এতে কর আদায় করা সহজ হয়ে ওঠে।

ইসলাম-পূর্ব কালে, মেসোপটেমিয়া, সিরিয়া, পারস্য রাজ্যে হিসাব বিভাগ ছিল স্থানীয় ইহুদি বা খ্রিস্টানদের হাতে। সাসানিয়ান রাজত্বকালে অর্থ উপদেষ্টা ছিল সাধারণত খ্রিস্টান, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন ইয়াদেন (৬২০), যিনি ২য় খসরুর প্রধান কোষাধ্যক্ষ ছিলেন। উমাইয়া খলিফারা রাজ্যভার গ্রহণ করার পর তাঁরা প্রচলিত অর্থনৈতিক কাঠামো রেখে দেন, কোনো রকম পরিবর্তন করেননি।

সুদ, অতিরিক্ত মুনাফা বা ঋণের ওপর অতিরিক্ত অর্থ আদায় বন্ধ করা হয় কোরানের বিধান মতে। কোরান বলে : যারা সুদ খায় তারা সেই ব্যক্তির ন্যায় দাঁড়াবে যাকে শয়তান স্পর্শ দ্বারা পাগল করে। এটি এই জন্য যে, তারা বলে– ক্রয়-বিক্রয় তো সুদের মতো। অথচ আল্লাহ্ ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল ও সুদকে হারাম করেছেন। যারা সুদ গ্রহণ করবে তারা চিরকাল অগ্নিবাসী হবে। (২ ঃ ২৭৬)। সুদ বন্ধের কারণে কৃষক এবং ব্যবসাদার যার টাকার দরকার তাদের বাধ্য হয়ে নন-মুসলিম সুদখোরদের কাছে হাত পাততে হয়। এর ফলে অর্থনৈতিক কাঠামো ও লেনদেন পুরোপুরি ইহুদি ও খ্রিস্টানদের হাতে চলে যায়। ব্যাংকিং সিসটেমও তারা নিয়ন্ত্রণ করে শুধু খিলাফতি রাজ্যে নয়, বাইরেও। আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্যে এবং পণ্য আদান-প্রদানে তারা যথেষ্ট সাহায্য করেছে।

বহু বছর ধরে মুসলিম দেশগুলোতে মুদ্রা আদান-প্রদানে নিয়োজিত ছিল গ্রিক, বাইজানটাইন ও রোমান। দক্ষিণ আরাবিয়াতে এথেন্সের মুদ্রা চালু ছিল আরব বিজয়ের পরেও। আলেক্সজান্দ্রিয়ান বণিক ও ভ্রমণকারী এবং পরে সাধু কসমস ইন্ডিকপ্লিয়াসটেস (মৃ. ৫৬০) লিখেছেন যে, রোমান মুদ্রা ছিল আন্তর্জাতিক মূল্যমানের এবং তার সাহায্যে ব্যবসা-বাণিজ্য চলত। তদ্রূপ বাইজানটাইন মুদ্রার কদর ছিল, এমনকি খিলাফত রাজ্যেও এ মুদ্রার গ্রহণযোগ্যতা ছিল।

৬৯০ খ্রিস্টাব্দে খলিফা আবদুল মালেকের রাজত্বকালে দামেস্কে নতুন ধরনের মুদ্রা তৈরি করা হয় পুরাতন মুদ্রার আদলে; বাইজানটাইন দিনারিয়াসের অনুকরণে স্বর্ণ দিনার এবং বাইজানটাইন ড্রাকমার অনুকরণে রৌপ্য দিরহাম, আর বাইজানটাইন ফলিস-এর অনুকরণে তামার কুলুস বা ফিল্স চালু করা হয়।

১৩.৫ স্থাপত্য

হেজাজের আরবদের বিল্ডিং ট্র্যাডিশন ছিল না বললেই চলে, এমনকি কাবাঘর ছিল সরল, সাদাসিধা চৌকো কাঠামো ডিজাইন। যখন ৫৯৪ খ্রিস্টাব্দে এই ঘর আগুন ও বন্যায় ধ্বংস হয়ে যায় তার পর এর পুনর্নির্মাণ করে কপটিক খ্রিস্টান শ্রমিকরা। প্রফেট মোহাম্মদ আলিশান রকমের তৈরি ভবনের বিরুদ্ধে ছিলেন। একবার তিনি বলেছিলেন ভবন নির্মাণের জন্য মুসলিমদের বেশি খরচ করা ঠিক নয় এটা লাভজনক নয় (Hughes 1977 P. 178)। তিনি বিশাল ভবন তৈরি করা এবং বেশি অর্থ খরচ করার পক্ষে ছিলেন

www.pathagar.com

না। তিনি বলেন মুসলিমদের ভবনের পেছনে খরচ ছাড়া অন্য খরচের জন্য পুরস্কার আছে। কারুকার্য খচিত অধিক অর্থব্যয়ে নির্মিত ভবন যেমন অর্থের অপচয় তেমনি সময়েরও। সময় ও অর্থের মূল্য অনেক, এভাবে খরচ করা ঠিক নয়।

তিনি চার্চ এবং অনুরূপ আকারের স্থাপত্য পছন্দ করতেন না। মদিনার কোবায়ও প্রফেটের মসজিদ ছিল আদিম নির্মাণ কাঠামো তৈরি করা হয়েছিল; অমসৃণ পাথর, কাদার শুকনো ইট ও কাদা দিয়ে তৈরি; ছাদ ছিল খেজুর গাছের পাতা, তাতে ঠেকো দেয়া হয় খেজুর গাছের গুঁড়ি দিয়ে। মদিনার মসজিদে তাই ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টির পানি পড়ত আর মেঝে ছিল কাদা-মাটির। ছাদ মেরামত হবে কিনা জিজ্ঞাসা করায় প্রফেট জবাব দেন– 'না'। মসজিদ হবে সাদাসিধা, মোসেসের 'বুথ'-এর মতো। মসজিদ ঘর এই অবস্থায় ছিল তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত।

বর্তমানে মসজিদে গম্বুজ, আর্চ, মিনার মিম্বার, নিশ (niche–ইমামের বসবার স্থান) সব কিছুই আছে যদিও প্রফেটের সময় এগুলো প্রতীক রূপে ছিল। মসজিদ শব্দ আরবি আরামাইক 'মাসজেদা' থেকে আগত (O'Leary, 1927, P. 200) এবং এই মাসজেদাতে খ্রিস্টানরাও প্রার্থনা করেছে।

প্রফেট মোহাম্মদ মদিনার মসজিদে নামাজে নেতৃত্ব দিতেন খেজুর গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে। দাঁড়িয়ে থেকে তিনি ক্লান্ত বোধ করতেন, তখন সাহাবীদের একজন প্রস্তাব দেন 'সিরিয়ার চার্চে যেমন দেখেছি, তেমনি আপনার বসার জন্য একটি মিম্বার তৈরি করে দেব কি? প্রফেট রাজি হন; তখন তাঁর জন্য এক বাইজানটাইন কাঠমিস্ত্রি ডেকে উঁচু মিম্বার (পুলপিট) তৈরি করে দেয়া হয়। মিম্বারে তিনটা সিঁড়ি ছিল, একটি বসার। পরে এক হাদিসের বর্ণনা মতে খ্রিস্টানদের অনুকরণে তৈরি মিম্বার বাতিল করা হয়। মিসরে যখন প্রথম মিম্বার তৈরি হয় তখন এর বিরুদ্ধে হৈচৈ ওঠে। ফলে খলিফার আদেশে তা ভেঙে দেয়া হয়।

মদিনার প্রফেটের মসজিদের উত্তর দিকে একটা খণ্ড কালো পাথর বসানো হয় জেরুজালেমের দিকে লক্ষ্য করে। এটাই ছিল কিবলাব নিদর্শন। প্রথমে জেরুজালেমের দিকে মুখ করে নামাজ পড়া হতো; পরে যখন দিক পরিবর্তন করে কিব্‌লা মক্কার দিকে নির্ধারিত হয় তখন সেই কালো পাথর সরিয়ে মক্কার দক্ষিণ দিকে বসানো হয়। উমাইয়া খলিফা ১ম ওয়ালিদের সময় কালো পাথর সরিয়ে দেয়াল কেটে কুলুঙ্গি (Niche) তৈরি করা হয় যা কিবলাকে নির্দেশ করে। এটাকে গোঁড়া মুসলিমরা আপত্তি করে, কেননা এটাও খ্রিস্টানদের অনুকরণে। বর্তমানে এর নাম হয়েছে 'মিহরাব'।

প্রফেটের সময়ে নামাজের জন্য রাস্তায় হেঁটে নামাজীদের ডাকা হতো। অথবা কোনো ভবনের ছাদে উঠে ডাকা হতো। যেমন কাবাঘরে ছাদে উঠে ডাকা হয়েছিল, মক্কা বিজয়ের সময়। উমাইয়াদের সময় লাইট হাউসের অনুকরণে মিনারেট প্রবর্তন করা হয় আজানের জন্য। একদা এই মিনারা খ্রিস্টান চার্চের অঙ্গ ছিল। এই টাওয়ারে একটা প্রদীপ সারাক্ষণ জ্বালিয়ে রাখা হতো। 'মিনারা' শব্দটি সিরিয়াক শব্দ 'মেনারটা' এবং হিব্রু শব্দ 'মেনোরা' থেকে নেয়া হয়েছে যার অর্থ মোমবাতি।

প্রথম মিনারেট মসজিদে খাড়া করা হয় ৭০৫ খ্রিস্টাব্দে ১ম ওয়ালিদের

www.pathagar.com

রাজত্বকালে। তারপর থেকে এই পদ্ধতি চালু হয়ে এসেছে। মসজিদের দেয়াল থেকে উঁচু মিনার তৈরি করার জন্য প্রথমে মোল্লারা আপত্তি তুলেছিল এবং অনেক স্থানে আন্দোলনও হয় কিন্তু পরে সব থেকে যায়। এখন মিনার সারা দুনিয়ার মসজিদের সাথে গড়ে উঠেছে।

মুসলিম স্থাপত্যে অনেক নতুন নতুন অঙ্গ সংযোজন হয়েছে মুসলিম বিশ্বের বাইরে থেকে আমদানি করে। গম্বুজ প্রথমে দেখা যায় এশিয়া মাইনরে, তারপর বাইজানটাইন তাদের স্থাপত্যে ব্যবহার করে। তারপর মুসলিমরা (strzygowski - 1921 P. 271)

এই সিস্টেম শুরু হয়েছিল প্রাক-ইসলামী পারস্যে। সাসানিয়ান রাজমিস্ত্রিদের কাছ থেকে আরবরা এই প্রযুক্তি কাজে লাগায়। কলামের (স্তম্ভ) মাথায় (Capital) যে কারুকার্য তা আরবরা প্রবর্তন করে প্রাচীন কারিগর দিয়ে।

ঘোড়ার খুরের মতো খিলান (Horse shoe arch) তুর্কিস্তানে বুড্ডিস্ট স্থাপত্যকে কপি করা হয়েছিল। সেমি সার্কুলার ও পয়েন্টেড আর্চ সাসানিয়ান ইরান থেকে সিরিয়ায় তারপর মুসলিমরা এর অনুকরণ করে। স্থাপত্যের অন্যান্য অঙ্গ বুড্ডিস্ট ইন্ডিয়া বা সেন্ট্রাল এশিয়া থেকে আমদানি করা হয়েছে।

মুসলিম নগরীর সাথে যে প্রযুক্তি ব্যবহার হয়েছে তা পূর্বেও ছিল মধ্যপ্রাচ্যে প্রাক-ইসলামী আমলে। যে প্যাটার্ন মেসোপটেমিয়ান, হেলেনিস্টিক, রোমান, সাসানিয়ান সেন্ট্রাল এশিয়া নগরীতে ব্যবহৃত হয়েছে সেসব উত্তরাধিকার হিসাবে চলে এসেছে ইসলামী রাজ্যে। রাজকীয় প্রাসাদ, ভিলা, মন্দির, চার্চ ও বিভিন্ন রকমের প্রাইভেট বিল্ডিং, যেমন ছিল বিজয়ী মুসলিম শাসকরা, তার সবই অনুকরণ করে শহর নগর গড়ে তুলেছে। এমনকি বাজার-হাটও গড়ে উঠেছে সেই প্যাটার্নে।

প্রাসাদ ও ভবন নির্মাণে বাইজানটিয়ান-হেলেনিটিক লিগেসিও প্যাগন প্রতিবেশীদের কাছে যেমন ঋণী, তেমনি খিলাফতের সময়ে যেসব নগর ভবন গড়ে উঠেছে তার জন্য মুসলিম স্থাপত্যবিদ্যা বাইজানটিয়ানদের কাছে ঋণী। ২য় আব্দুর রহমান (মৃ. ৭৯৬) যখন কর্ডোভায় পৃথিবীর মধ্যে সুন্দর মসজিদ তৈরি করার মনস্থ করেন তিনি বাইজানটিয়ান থেকে স্থপতি ডেকে পাঠান বিল্ডিং সুপারভাইস করার জন্য।

জানা যায় যে, বাইজানটাইন স্থাপত্যের কয়েকটি উপাদান বিশেষ করে গম্বুজযুক্ত বিল্ডিং যেমন কনস্ট্যান্টিনোপলের সেন্ট সোফিয়ার চার্চ (খ্রিঃ ৫৩৭), কনস্ট্যান্টিনোপল ১৪৫৩ খ্রিঃ দখল করার কয়েক শতাব্দি পূর্বে মুসলিম বিল্ডিং স্টাইলে সুদূরপ্রসারী প্রভাব রেখে যায়। একজন পরিব্রাজক যিনি চতুর্দশ শতাব্দিতে কনস্ট্যান্টিনোপল দর্শন করেন, তিনি অতি উৎসাহের সাথে বলেছিলেন এই বিল্ডিংকে একমাত্র বাগদাদের প্রাসাদের সাথে তুলনা করা যায়।

উমাইয়ারা প্রথম প্রাচীন পারস্য ও বাইজানটাইন স্থাপত্য শিল্পের সুবিধা কাজে লাগায়। তারা এই বিল্ডিং ট্র্যাডিশন আয়ত্ত করে দামেস্কে তাদের রাজধানী সৌন্দর্যমণ্ডিত করে তারপর অন্য স্থানে যেমন কুসের আমরা ও মাশাত্তা, জেরুজালেমে ডোম অব দ্য রক (Dome of the Rock) তৈরি করে বাইজানটাইন স্থপতি দিয়ে।

www.pathagar.com

উমাইয়াদের কয়েকটি মসজিদ নির্মিত হয় খ্রিস্টান কারিগরের সাহায্যে এবং অলংকৃত করা হয় রুপা ও সোনা দিয়ে যাতে এই মসজিদ একমাত্র তুলনীয় ছিল কনস্ট্যান্টিনোপলে খ্রিস্টান ক্যাথিড্রটলের সাথে।

দামেস্কে বিশাল মসজিদ নির্মাণ করা হয় সেন্ট জন ব্যাপ্টিস্টের বেসিলিকাতে (চার্চ) যার এক অংশ মসজিদের জন্য ব্যবহৃত হয়। এই বেসিলাকা পূর্বে খ্রিস্টানরা তৈরি করেছিল রোমান মন্দিরের ওপর। যে মন্দির তৈরি হয়েছিল প্যাগনদের উপাসনালয়ের ওপর। দামেস্ক মসজিদের অভ্যন্তর, আইল ও ট্র্যান্সেপ্ট ছিল চার্চের মতো এবং মার্বেল মোজাইক দিয়ে কারুকার্য করা ছিল।

আব্বাসিদের সময় বাইজানটাইন স্টাইল আংশিকভাবে পরিবর্তিত করে পার্সিয়ান সাসানিয়ান স্টাইল প্রবর্তন করা হয় এবং এই দুই প্রাচীন স্থাপত্য স্টাইলে আব্বাসিরা তাদের বিল্ডিং ও ভবন, প্রাসাদ ইত্যাদি নির্মাণ করেছে। এই সময় আর অন্য কোনো স্টাইলে বিল্ডিং বা ভবন তৈরি হয়নি যতদিন না ভারতে মোগল ও পরে অটোম্যান তুর্ক নতুন ধারায় প্রাসাদ, মসজিদ ও ভবন তৈরি করেছে।

মোগল স্থাপত্যে ছিল সেন্ট্রাল এশিয়া ও হিন্দুদের মিশ্র স্টাইল। সম্রাট বাবর (মৃ. ১৫৩০) কনস্ট্যান্টিনোপল থেকে আমন্ত্রণ করে আনেন আলবেনিয়ার বিখ্যাত স্থপতির সাগরেদদের তার মসজিদের কাজের জন্য। ড. কালি কিঙ্কর দত্ত মন্তব্য করেন যে, আগ্রার নিকটে আকবরের (মৃ. ১৬০৫) স্মৃতিসৌধ প্রভাবিত হয়েছিল কম্বোডিয়ার খেমার স্থপতি দ্বারা এবং আসলে এটা তাদেরই কাজ।

মোগল বাদশা ভারতে বহু অর্থ ব্যয়ে প্রাসাদ, স্মৃতিসৌধ, মসজিদ মনুমেন্ট তৈরি করে গেছেন, তার মধ্যে তাজমহল অন্যতম। এমনকি ফতেপুর সিক্রির একটি শহর তৈরি করে সেখানে বসতি স্থাপন করা হয়নি। বলা হয় যে, এই নগরী গড়তে যা খরচ হয়েছিল তা তোলা হয় অতিরিক্ত ট্যাক্স আদায় করে। অনেক শ্রমিককে তাদের মজুরির এক অংশ কেটে রাখা হয়।

যে বিশেষজ্ঞ ও কারিগর তাজমহলের প্ল্যানিং ও নির্মাণের জন্য দায়ী ছিল তাদের আনা হয়েছিল কাইরো, বাগদাদ, শিরাজ, সমরকন্দ, বলখ এবং কান্দাহার থেকে। অনেকে মনে করেন যে, এই মহল নির্মাণে ইউরোপিয়ান স্থপতিদের কাজে লাগানো হয়েছিল (Majumdar 1974, P. 597)।

কথিত আছে যে জেরম ভেরেনিও নামে এক ভিনিসিয়ান তাজমহলে মার্বেল পাথর বাছাই করে দেন যাতে রৌদ-তাপে নষ্ট না হয় এবং এই মহল ডিজাইনও তিনি করেছিলেন। কিন্তু কোন অথরিটি এই গল্প বাতিল করে দেন (Rawlinson, 1954, P. 361)। তবে, এ কাহিনী মনে রাখার মতো। মুসলিমরা তাজমহল নির্মাণের কৃতিত্ব কোনো বিদেশী মাস্টার প্লানারকে দিতে রাজি নয়। তবুও রেকর্ড ও ইতিহাস বলে যে তাজমহলের প্রধান ডিজাইনার ও স্থপতি ছিলেন ওস্তাদ ঈসা অর্থাৎ মাস্টার (জসাস)।

ষোড়শ শতাব্দিতে অটোম্যান তুর্কি যখন ক্ষমতার শীর্ষে তখন একজন খ্রিস্টান বিল্ডার অটোম্যান স্টাইলে স্থাপত্য সৃষ্টি করেন। তিনি যে কতগুলি নতুন স্টাইল পত্তন করেন তার বেশির ভাগ নেয়া হয়েছিল সেন্ট্রাল এশিয়া এবং বাইজানটাইন মডেল্ল থেকে। ইনি ছিলেন বিখ্যাত স্থপতি ইউসুফ সিনান দ্য গ্রেট। সিনানের পিতা-মাতা

www.pathagar.com

ছিলেন গ্রিক অর্থোডক্স। তার পিতা ছিলেন কাঠমিস্ত্রি, রাজমিস্ত্রি এবং মাস্টার বিল্ডার। পিতার কাছ থেকেই সিনান স্থপতি টেকনিক আয়ত্ত করেন। অটোম্যান সাম্রাজ্যে নিয়ম মতে এই মেধাবী খ্রিস্টান যুবককে সরকারি চাকরিতে নেয়া হয়। সিনানের প্রতিভা অটোম্যান সুলতানের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং চব্বিশ বছর বয়সে তাকে ড্রাফটসম্যান ও বিল্ডিং-এর কাজে লাগানো হয়।

সিনান অটোমেন ক্লাসিক্যাল স্থাপত্যের জন্য দায়ী। তিনি প্রাসাদ, রাজকীয় লজ, কলেজ, মাদ্রাসা, লাইব্রেরি, হাসপাতাল, জলাধার, গণশৌচাগার, কবরস্থান, ক্যারাভ্যান সরাই, হোস্টেল, ভিক্ষা সদন, শস্যাধার, ঝরনাসহ ২৫০টি প্রকল্প শেষ করেন। এদের মধ্যে অনেক প্রকল্প মুসলিম জগতের উল্লেখযোগ্য অবদান। তার কাজের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল কনস্ট্যান্টিনোপলে সুলতানের মসজিদ; এই মসজিদ সেন্টসোফিয়ার আদলে তৈরি করা হয়। সলেমানের পুত্র ২য় সেলিমের আড্রিয়ানোপলে, বাইজানটাইন চার্চের মডেলে তৈরি মসজিদটিও সিনান কর্তৃক তৈরি হয়েছিল।

সিনানের বিল্ডিং স্টাইল অটোমেন স্থপতিদের প্রেরণা জোগায় এবং পরবর্তীতে যেসব প্রধান ভবন তৈরি বা পুনর্নির্মাণ করা হয়েছিল সেখানে সিনানের স্টাইলের প্রতিফলন ঘটেছে, এমনকি মক্কা ও মদিনার স্থাপত্য শিল্পে।

১৩.৬ পবিত্র নগরী

মদিনার খলিফা ওমর ও ওসমান খ্রিস্টান প্রকৌশলীদের ডেকে কাবাঘরকে বন্যার হাত থেকে বাঁচাবার জন্য খাল ও বাঁধ তৈরি করতে বলেন। হেজাজে চাষাবাদ উন্নয়নের জন্য উমাইয়া খলিফারা গ্রিক প্রকৌশলীদের ডেকে পানি ধরে রাখার জন্য কূপ খনন ও জলাধার তৈরি করান যাতে প্রয়োজনমতো চাষাবাদের জল সরবরাহ করা হয় চাষীদের (O'leary 1927. P. 8)।

সাধারণত উমাইয়ারা পবিত্র নগরী মক্কা ও মদিনাকে অবহেলা করেন। আল-জুহুরি লিখিত একটি ট্র্যাডিশনের দোহাই দিয়ে উমাইয়ারা বলেন যে, প্রফেট মোহাম্মদ মক্কা, মদিনা ও জেরুজালেমকে একইভাবে মূল্যায়ন করতেন, কিন্তু অন্য নগরীর চেয়ে জেরুজালেমকে বেশি শ্রদ্ধা দেখাতেন। দামেস্ক থেকে মক্কা ও মদিনা বেশ দূরে। সেখান থেকে এক দুই পবিত্র নগরীকে নিয়ন্ত্রণ করার চেয়ে পবিত্র নগর জেরুজালেম নিয়ন্ত্রণ করা সহজ ছিল। তাই উমাইয়ারা জেরুজালেমকে মক্কা-মদিনার চেয়ে বেশি মর্যাদা দেন। তাছাড়া প্রথম উমাইয়া খলিফা মাবিয়া এই জেরুজালেম নগরে নিজেকে খলিফা হিসাবে ঘোষণা দেন এবং ৫ম উমাইয়া খলিফা আবদুল মালেক জেরুজালেম শহরকে উন্নয়ন করে ধর্মীয় কেন্দ্র হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে এবং হজের বিকল্প স্থান করতে মনস্থ করেছিলেন।

বলা হয়েছিল যে, জেরুজালেম সেই স্থান মোরিয়া পর্বতের অবস্থান যেখানে ছাপান্ন ফুট লম্বা, বিয়াল্লিশ ফুট চওড়া এবং প্রায় অর্ধচন্দ্র আকারের পবিত্র পাথর (সাখারা) স্থাপিত হয়েছিল আব্রাহামের পুত্রকে কোরবানি দেয়ার জন্য (অন্য একটি ট্র্যাডিশনে আছে যে কোরবানি ঘটনা মোরিয়া পর্বতে ঘটেনি, ঘটেছে মক্কার নিকটবর্তী

www.pathagar.com

পর্বত হাবিবের ওপর)।

আরো বলা হয় যে, এই মোরিয়া পর্বতে প্রফেট দাউদ (ডেভিড) একটি বেদী তৈরি করেন এবং সোলেমান সেই স্থানকে সমতল করে মন্দির নির্মাণ করেন। ঐ স্থানের চূড়ায় পবিত্র স্থানে (হারামআল-শরীফ) দূরবর্তী মসজিদ (আল-আকসা মসজিদ) অবস্থিত। যেখান থেকে প্রফেট মোহাম্মদ মিরাজে যাত্রা করেন। ৬৩৮ খ্রিস্টাব্দে খলিফা ওমর জেরুজালেম জয় করে, জাস্টিনিয়ান যেখানে বাইজানটাইন সেন্ট মেরি চার্চ তৈরি করে তার দক্ষিণ দিকের শেষে ওমর এক কাঠের মসজিদ খাড়া করেন। খলিফা ওমর ভেবেছিলেন যে এই স্থান থেকেই প্রফেট মোহাম্মদ মিরাজে গমন করেন; কিন্তু কেউ নির্দিষ্টভাবে বলতে পারে না আসলে কোন স্থান থেকে প্রফেট মিরাজে যান। আবার এই জেরুজালেমের দিকে মুখ করে মুসলিমরা প্রথমে নামাজ পড়েছিল, মক্কার দিকে নয়। অর্থাৎ মুসলিমদের প্রথম কিবলা ছিল জেরুজালেম। ৬৮০ খ্রিস্টাব্দে খলিফা আবদুর মালেক বাইজানটাইন স্থপতিদের ডেকে সেই পবিত্র পাহাড়ের ওপর একটা ভবন (edifice) নির্মাণ করতে বলেন যা আজকে ডোম অব দ্য রক (Kobat-at-Sakhra) বলে খ্যাত। এই স্থানটিকে প্রথাগতভাবে সলেমানের মন্দির বলা হয়। খলিফা ঘোষণা করেন যে এই নতুন পবিত্র স্থানে সাত বার চক্কর দিলে কাবাঘরের পুণ্য লাভ হবে; তফাৎ এই যে ডোম অব দ্য রক-এ ঘুরতে হয় ক্লক-ওয়াইজ অর্থাৎ বাঁয়ে থেকে ডাইনে আর কাবাতে ঘুরতে হয় অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ, অর্থাৎ ডাইনে থেকে বাঁয়ে। এই একই সময়ে, খলিফা এক সরকারি আদেশে হাজীদের মদিনার প্রফেটের মাজার জিয়ারত নিষিদ্ধ করেন।

গম্বুজ বিশিষ্ট গোল ইমারতটি ছিল অষ্ট কোণ বিশিষ্ট বাইজানটাইন মডেলে যেমন হলি সেপালকার চার্চ। ডোমটি ছিল কাঠের ভেতরের আস্তরণ ছিল গিলটি করা কারুকার্য খচিত এবং বাইরের দিকে সিসা দিয়ে মোড়া। ডোমটি গোড়াতে সোনার পাত-মোড়া ছিল কিন্তু যখন চুরি হয়ে যায়। তখন এলুমিনিয়াম-সোনা দিয়ে আবার চকচকে করে পবিত্র নগরীর উপযুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। প্রায় সমস্ত উপকরণ যেমন– কলাম (স্তম্ভ) এবং কলামের কারুকার্য করা শীর্ষদেশ (Capital) ইত্যাদি সবই বাইজানটাইন ও রোমান বিল্ডিং থেকে নেয়া হয়েছে এবং কোনো কোনো উপাদান এ চিহ্নও রয়ে গেছে।

বিশ্বাস করা হয় যে, ডোম অব দ্য রকে প্রফেট মোহাম্মদের পদচিহ্ন (খ্রিস্টানরা বলে যিশুর পদচিহ্ন) ও দাড়ির কেশও সংরক্ষিত আছে। ডোম কিন্তু মসজিদ নয় এবং এখান থেকে যে প্রফেট মোহাম্মদ মিরাজে গিয়েছিলেন তার চিহ্নও নেই।

ডোম অব দ্য রকের একটু দূরে অবস্থিত ঊর্ধ্বগমনের ডোম (কোবাত-আল মিরাজ) এবং অনেকের মতে এটাই সেই স্থান যেখান থেকে প্রফেট মোহাম্মদকে স্বর্গে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

৭১২ খ্রিস্টাব্দে উমাইয়া খলিফা ওয়ালিদ ওমরের কাঠের মসজিদ ভেঙে ফেলেন এবং বাইজানটাইন স্থপতি ও মাস্টার কারিগর দিয়ে আর একটি মসজিদ গড়ে তোলেন। এই মসজিদ হলো আল-আকসা মসজিদ।

বলা হয় এই মসজিদ সেই স্থানে নির্মিত যে স্থানে প্রফেট মোহাম্মদ ঊর্ধ্বে গমনের জন্য রফরফ বা বোরাকে আরোহণ করেন। এই মসজিদের মিম্বারের পেছনে একটা

www.pathagar.com

পাথর আছে যে পাথর যিশুর উর্ধ্বগমনের চার্চ থেকে আহরিত। এই পাথরে যিশুর পদচিহ্ন আছে, কেননা উর্ধ্বগমনের পূর্বে এই পাথরে যিশু পা রেখেছিলেন। এই মসজিদের ওপরে খলিফা ওয়ালিদ কাঁসার ডোম উপস্থাপিত করেন। এই কাঁসার ডোমটি সরানো হয়েছিল বালবেকের খ্রিস্টান চার্চ থেকে। (বালবেক লেবাননের প্রাচীন নগরী)। এক ভূমিকম্পে এই মসজিদ ধ্বংসপ্রাপ্ত হলে এটা পুনর্নির্মিত হয় ৭৮০ খ্রিস্টাব্দে, রৌপ-ডোম-সহ, আব্বাসি খলিফা মেহদির রাজত্বকালে। উমাইয়ারা যখন দামেস্ক এবং জেরুজালেমকে তিলোত্তমা নগরীতে পরিণত করেছিলেন তখন আরব পেনিনসুলা ছিল অবহেলিত ইসলাম-পূর্ব গোত্র-আরবের রূপ ধারণ করে। প্রফেটের মৃত্যুর ৩০ বছর পর আরাবিয়া উমাইয়া খিলাফতের একটা হতচ্ছেদ্দা প্রদেশে পরিণত হয়, শুধুমাত্র হজের কেন্দ্রভূমি আর কিছু নয়। ৬৮০ সালের মধ্যে মক্কার ধর্মীয় জীবন বলতে গেলে শূন্যের কোঠায় এসে দাঁড়ায়। সব ধরনের আবিলতায় পরিপূর্ণ নগরী, পাপকর্ম ফ্রি-স্টাইলে। তীর্থ যাত্রীদের নৈতিক পরিবেশ পঙ্কিলতায় আবর্তিত। রাস্তায় রাস্তায় বক্তৃতাসহ সান্ধ্যভোজের আয়োজন; এমনকি মসজিদে থেকে কারণ বরির কারবার।

মদিনার অবস্থাও তথৈবচ। প্রফেটের সময় মদিনার যে কদর ছিল উমাইয়াদের সময় এ শহর পূতিগন্ধময় (আল-নাতনা) এবং নোংরা (আল-খাবিতা)।

সহসা এই নগরী দুস্কৃতকারী ভোগ সুখপরায়ণ ব্যক্তিদের লীলাক্ষেত্র হয়েও ওঠে বাইজী, বেশ্যা, ক্রীতদাসী ও তরুণ বালকদের ঘিরে মাতলামো; তাড়ি, গাঁজা ও বেশ্যালয়ের স্বর্গোদ্যান। পৃষ্ঠপোষকদের মধ্যে যারা এই স্বর্গোদ্যানে ঘনঘন আসা-যাওয়া করতেন তারা অনেকেই সাহাবীদের সন্তান ছিলেন।

এই দুই পবিত্র নগরীর দুর্দশা আরও বেড়ে গিয়েছিল মাবিয়া পুত্র ১ম এজিদের সময় এবং ৬৮২ সাল থেকে ৬৯০ সাল পর্যন্ত বেশ কয়েকটি অভিযান চালানো হয়েছে এই দুইটি নগরীর বিরুদ্ধে। মদিনার বিদ্রোহীদের সিরিয়ান সেনাবাহিনী দিয়ে খলিফা বিদ্রোহী সমূলে উপড়ে দেন, নগরী আক্রমণ করে গণহত্যা চালানো হয় আর মদিনার মসজিদকে আস্তাবলে পরিণত করা হয়। কিছু দিনের জন্য এই পবিত্র নগরী বন্য পশুদের বিচরণ ভূমিতে পরিণত হয় (Ameer Ali, 1965, P. 303)।

মক্কা বিদ্রোহও নৃশংসভাবে দমন করা হয়। উমাইয়াদের সিরিয়ান পদাতিক বাহিনী নগরী অবরোধ করে কাবাঘরে আগুনের গোলা নিক্ষেপ করা হয়; এই গোলার একটি কালো পাথরে আঘাত হেনে তিন টুকরো করে দেয়; (Esin, 1983, P. 134)। নিক্ষিপ্ত আগুনের গোলায় কাবাঘরের অধিকাংশ ধ্বংস হয়ে যায়। কাবাঘরের এই বিপজ্জনক অবস্থায় মনে হচ্ছিল যে এখনি হয়তো গোটা কাঠামোটা ধসে যাবে।

আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি অতি কঠোরতার সাথে নরম্যাল করে আনেন হাজ্জাজ বিন ইউসুফ। খলিফা আবদুল মালেক সন্তুষ্ট হয়ে হাজ্জাজকে ইরাকের গভর্নর পদে প্রমোশন দেন। মক্কার বিদ্রোহীদের নেতা ও গভর্নর আবদুল্লাহ ইবন জুবায়েরকে হত্যা করে তার শির নগরীর গেটে প্রদর্শিত হয়।

যখন উমাইয়ারা দুইটি পবিত্র নগরীর উন্নয়নের দিকে দৃষ্টিপাত করল তখন তারা পুরনো ভবনগুলোকে ভেঙে নতুন করে গড়ার কাজে হাত দিল। আসন্ন পুনর্নির্মাণে দুটি নগরীকে এক প্রকার ঢেলে নতুন রূপ দেবার চেষ্টা করে। মক্কা-মদিনার গোত্রদের

www.pathagar.com

নির্মাণ কাজে অভিজ্ঞতা না থাকায় এই দুই নগরীতে বিদেশী শ্রমিক, খ্রিস্টানসহ এনে শহর ভরিয়ে দেয়। মক্কা-মদিনার পবিত্র কাবাঘর ও মদিনার প্রফেটের মসজিদের পুরনো কাঠামো বদলিয়ে নতুনভাবে নির্মিত হয়। কাবাঘরের চারদিকে কয়েকটি কলামের (স্তম্ভ) স্থলে গ্রিসীয় স্থাপত্যের কলাম জুড়ে দেয়া হয়। কোবাতে ইসলামের প্রথম মসজিদ যেখানে প্রফেট নিজে হাত লাগিয়েছিলেন, ভেঙে বড় করা হয়; পরে পুরানো কাঠামো ভেঙে দিয়ে কারুকার্য খচিত নতুন মসজিদ নির্মিত হয়। এইসব মেরামত কাজের জন্য আরবরা অভিযোগ করে এই বলে যে, পবিত্র মসজিদ ভেঙে সেই স্থানে চার্চ তৈরি করা হয়েছে।

খলিফা ১ম ওয়ালিদ মদিনার প্রফেটের মসজিদ ভেঙে দিয়ে পুনর্নির্মাণ করেন। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হলে তা অগ্রাহ্য করা হয়। প্রথমে মসজিদের বহির্দেয়াল ভাঙতে শুরু করলে প্রফেট মোহাম্মদের স্মৃতিসৌধ (মওসোলিয়াম) ধসে যায় এবং যে স্থানে প্রফেট আবুবকর ও ওমরকে কবরস্থ করা হয় তার মাটি বের হয়ে পড়ে। ওমরের কবর ভেঙে যায় এবং অভ্যন্তর দৃশ্যমান হয়। প্রফেটের স্মৃতিসৌধের নির্মাণকর্ম আলীর অনুসারীদের দিয়ে সম্পন্ন করা হয়।

নতুনভাবে প্রফেটের মসজিদ নির্মিত হলে আশপাশের স্থান প্রশস্ত করতে গিয়ে প্রফেট ও তাঁর পরিবারের বাসস্থান মাটির সাথে মিলিয়ে দেয়া হয়, ফাতেমার বাড়ি ভেঙে দেয়া হয় এবং তার খেজুর বাগানের গাছগুলোকে উপড়ে ফেলা হয় এবং সেখানে আর যারা বাস করত তাদের উচ্ছেদ করা হয়। এই নতুন মসজিদের জন্য গ্রিক সম্রাট ২য় জবাস্টিয়িন সোনার বার, কারুকার্য করা রৌপের বাতি এবং চল্লিশটি উটের পিঠে পাথরের খণ্ড বোঝাই করে উপহার স্বরূপ পাঠান। তার সাথে পাঠিয়ে দেন একশো জন কপটিক ও গ্রিক খ্রিস্টান ওস্তাগার কারুকাজ করার জন্য ও মোজাইক করার জন্য অভিজ্ঞ মিস্ত্রি পাঠিয়ে দেন।

মক্কার পুনর্নির্মাণ মদিনার মতো ঢেলে সাজানো হয়। আমিনার বাড়ি যেখানে প্রফেট জন্মগ্রহণ করেন, ভেঙে বড় করা হয় এবং সুসজ্জিত করা হয়। পরে এই ভবন উমাইয়া গভর্নরের আবাসভূমিতে পরিণত করা হয়। মক্কার মহান মসজিদ (মসজিদ আল-হারাম) প্ল্যানিং ও পুনর্নির্মাণের আদেশ হয় যে প্ল্যানিংয়ে গ্যালারি ঝাড়বাতি থাকবে। এখানেও সিরিয়া ও মিসর থেকে খ্রিস্টান স্থপতি আমদানি করা হয় নির্মাণকর্ম সুসম্পন্ন করার জন্য। এই সময়ে বিদেশ থেকে বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি প্রতিনিধি এসে ভিড় জমান বিশেষ করে মুসলিম দেশ উত্তর আফ্রিকা ও মধ্য এশিয়া থেকে প্রতিনিধি আসে এবং তারা মক্কাতে নতুন অফিস প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে কাবাঘরে যে দরজা বসানো হয়েছে তা ১৬৩৩ সালে ইস্তাম্বুল থেকে আনা হয়।

পরবর্তী সময়ে এই দুই পবিত্র নগরীতে গোত্রযুদ্ধ লেগেই ছিল। পবিত্র স্থানগুলো ক্ষতি হয়েছে, সম্পদ লুটপাট হয়েছে এবং যারা এই দুই পবিত্র স্থানের, কাবাঘর ও প্রফেটের মসজিদ, হেফাজতকারীরাই এই লুটপাটে অংশগ্রহণ করেছে। মোট কথা লোভী শাসক ও সরকারি কর্মকর্তারা এ ধরনের নাশকতামূলক কাজে জড়িত ছিল এবং শতাব্দি ধরে অরাজকতা বিরাজ করেছে। ১০২০ খ্রিস্টাব্দে ৬ষ্ঠ ফাতেমিদ খলিফা হাকাম মদিনাতে তার এজেন্ট পাঠিয়েছিলেন প্রফেট মোহাম্মদ, আবু বকর ও ওমরের

www.pathagar.com

দেহ কবর থেকে তুলে মিসরে নিয়ে যেতে, কিন্তু এই উদ্যোগ ব্যর্থ হয়।

১২৫৬ খ্রিস্টাব্দে মদিনায় প্রফেটের মসজিদ ভূমিকম্পে ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তারপর জ্বলন্ত বাতি থেকে আগুন লেগে আরও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল।

১৪৯০ খ্রিস্টাব্দে প্রফেটের স্মৃতিসৌধ এমনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় যে প্রফেটের, আবু বকরের ও ওমরের কবর নিশ্চিহ্ন হয়েছিল এবং পরবর্তীতে আর চিহ্নিত করা সম্ভব হয়নি। ট্রাডিশন মতে জানা যায়, যে কবরগুলো দক্ষিণ দিকের দেয়ালের কাছাকাছি ছিল এবং এখানে নতুনভাবে চিহ্নিত করে নতুন কবর নির্মিত হয় প্রায় সঠিক স্থানে (Esin 1963, P. 160) এবং যখন এই পবিত্র কর্ম প্রক্রিয়াধীন ছিল তখন ঐ স্থানে সশস্ত্র প্রহরী পাহারায় ছিল যাতে বেদুইন ও দস্যুদের প্রতিহত করা যায়।

ওহাবী গোষ্ঠী ১৭৩৫ খ্রিস্টাব্দে পত্তন হয় এবং ১৮০৩ সালে ওহাবীরা এই দুই নগরী দখল করে। তারা অনেক মাজার ধ্বংস করেছে এবং বহু উপহারদ্রব্য সরিয়ে ফেলেছে কারণ তাদের মতে এই সব বস্তু মূর্তিপূজার শামিল। যেহেতু ইসলামের প্রথম দিকে মিনারেট অজানা ছিল তাই ওহাবীরা যেখানে গেছে সেখানকার মিনারেট ভেঙে দিয়েছে (Highes, 1977, P. 662)। মক্কায় হিরা পর্বতের উপরে একটি বিশিষ্ট পবিত্র মাজার ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়। এই মাজার তৈরি করা হয়েছিল সেই গুহার উপর যেখানে প্রফেট মোহাম্মদ প্রথম ওহিপ্রাপ্ত হন। মদিনাতে প্রফেটের মাজারে সব গহনা, স্বর্ণ খুলে নেয়া হয়, পুড়িয়ে দেয়া হয় দামি গেলাফ আর গম্বুজ ভেঙে ফেলা হয়। মদিনার বাইরে বাকি কবরস্থানে, যেখানে প্রফেট মোহাম্মদ ও তার সাহাবীরা জেয়ারত করতে যেতেন, ভেঙে সমান করে দেয়া হয়।

১৮৫০ খ্রিস্টাব্দে অটোমেন তুর্কিরা মদিনার প্রফেটের মসজিদের অনেক পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় মক্কার শেরিফ যুদ্ধে যোগ দেয়ার কারণে সাধারণ মানুষের যে ভোগান্তি হয় তার জন্য প্রতিবাদ জানালে, তুর্কি বিমান বাহিনী শেরীফের প্রাসাদে বোমা মেরে ক্ষতিগ্রস্ত করে। এই বোমাবাজির জন্য কাবাঘরেরও ক্ষতি হয়।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও বিভিন্ন সময়ে শাসন কর্তাদের দুরাচরণের ফলে মক্কা-মদিনার ভবন ও মাজারের সাবেক অবস্থা (Originality) টিকে থাকেনি। এখন যে কাঠামো নিয়ে পবিত্র স্থানগুলি দাঁড়িয়ে আছে, সেগুলো উমাইয়া ও আব্বাসি খলিফাদের নতুন করে গড়া, পরে অটোমেন তুর্কি ও সৌদিরা এসবের পুনর্নির্মাণ করেছে। অতীতের চিহ্ন ক্বচিৎ দেখা যায়।

১৩.৭ শিল্পকলা

প্রফেট সঙ্গীত ও কবিতা অনুমোদন করেননি এবং সাধারণত শিল্পকলাকে নিরুৎসাহিত করেছেন এবং বলেছেন এসব বাজে চর্চা। তিনি বিলাসিতার নিন্দা করেছেন বিশেষ করে সোনা-রুপার গহনা ও সিল্কবস্ত্র পরিধান করা পছন্দ করতেন না। ইসলামী আর্টকে তাই বলা হয় প্রথাবিরুদ্ধ।

কোরান মূর্তিপূজা (আসনাম; একবচনে সানাম) নিষিদ্ধ করেছে (১৪ ঃ ৩৮)। এই নিষিদ্ধকরণের জন্য সব ধরনের মূর্তি বা ভাস্কর প্রতিমূর্তি বা কোনো জীবন্ত প্রাণীর ছবি

www.pathagar.com

আঁকা বারণ। প্রফেট মোহাম্মদ অভিশপ্ত করেছেন তাদের যারা মানুষ বা প্রাণীর ছবি আঁকে বা প্রতিমূর্তি গড়ে। এমনকি শিশুদের জন্য পুতুল খেলাও নিষিদ্ধ; শিশুর হাতে পুতুল দেখলে তা তখনি ভেঙে ফেলা হয়েছে। মুসলিম ধর্মবেত্তারা বলেন, যে কোনো বস্তু যা মানুষের মনকে ধর্ম-বিমুখ করে তাকে সন্দেহের চোখে দেখতে হবে। পারস্যে শিল্পকলা দেখে আরবদের মনে যে মুগ্ধতা এনেছিল অর্থোডক্সের মতে তা শয়তানি কর্ম বলা হয়েছে।

ইসলামী আর্ট ইউরোপীয় বা চীনা আর্ট বলে ধরা হয় না। মধ্যপ্রাচ্যে ইসলামের কালে যে শিল্পকলা গড়ে উঠেছিল তা জ্যামিতিক এবং ফ্লোরাল-পুষ্প সম্বন্ধীয়। এছাড়া টেক্সটাইলে নাম আরবি ফর্মে ইংরেজি ভাষায় পরিচিতি পেয়েছে– যেমন মোসুল থেকে মসলিন, দামাস্কাস থেকে দামেস্ক; বালাদাশিন বাগদাদ থেকে, ফাসতিয়ান ফুসটাত (প্রাচীন কাইরো) থেকে; পার্সিয়ান থেকে টাফেট ও শাল এবং রং ও কাপড় উভয় ব্যবহার করে ট্যাব্বি (এটাও পারস্য থেকে)। এই আরবি শব্দের ব্যবহার থেকে অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি মনে করেন যে, (যা সঠিক নয়) ঐসব কাপড় মুসলিম বিশ্ব থেকে সর্বপ্রথম তৈরি হয়েছে।

পারস্যের সূক্ষ্ম টেক্সটাইল (বিশেষ করে শাল) ও সিরিরা, মিসর ও মধ্য এশিয়া থেকে উৎপাদিত দ্রব্য উন্নত ছিল মুসলিম উত্থানের পূর্ব থেকে। বাইজানটাইন তাঁতিদের দ্বারা বিভিন্ন ধরনের নকশাসহ মূল্যবান কাপড় তৈরি হতো। গাছগাছালি থেকে রং বের করত এবং সোনা ও রুপার সুতা দিয়ে সূচিকর্মও করত। তখন প্রফেট মোহাম্মদের জন্ম হয়নি। কাপড় ও টেক্সটাইল ছাড়া কাঠের আসবাবপত্র, সোফা, তোষক, ডিভান ইত্যাদি তৈরি করত তখনকার কারিগররা। নির্মাণ কাজে বিল্ডিং তৈরি, স্টোর হাউস; ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে টেরিফ, চেক; খাদ্য ও পানীয় যেমন শরবত, কফি, দই, হালওয়া, কাবাব এবং পোলাও এসবেরও চালু ছিল।

এটা সত্য যে শিল্পকলা ক্ষেত্রে দেওয়ার চেয়ে আরবরা অন্যের কাছে ধার করেছে বেশি। ইসলামিক সাম্রাজ্যে বিভিন্ন দেশের মধ্যে অতিদ্রুত ক্র্যাফ্‌ট ও দক্ষতার আদান-প্রদান হয়েছে, এর মধ্যে বিদেশী শিল্পকলার বেশি প্রভাব ফেলে ইসলামিক আর্টকে উন্নত করেছে। কপাটিক ও আবিসিনিয়ান শ্রমিকদের মক্কা ও মদিনাতে, বাইজানটাইন ক্র্যাফটসম্যান উমাইয়াদের জন্য কাজ করেছে, আর্মেনিয়ান রাজমিস্ত্রিদের নিয়োগ করা হয়েছিল মুরিশ স্পেনে এবং স্থপতিদের আনা হয়েছিল মধ্য এশিয়া থেকে। তারা মরক্কো থেকে মোগল ভারতে বিল্ডিং নির্মাণে কাজ করেছে।

এটা প্রতিষ্ঠিত যে ইসলামের অনেক পূর্বে সিরামিক আর্ট ও ক্র্যাফট-এ রঙিন টাইলস ও কলসিসহ হাতির দাঁতের কাজ, কার্পেট তৈরি করা, মোজাইক করা, ফ্রেসকো, বই বাঁধাই, ক্ষুদ্র পেন্টিং-এর কাজ, পাণ্ডুলিপির কাজ এবং কুটির শিল্প এই সমস্ত এন্টিক ও ক্র্যাফটের চরম উৎকর্ষতা প্রকাশ পেয়েছে মিসরে, মেসোপটেমিয়ায়, পারস্যে ও বাইজানটিয়ানে। সাসানিয়ান ও বাইজানটাইন, তাদের রাজত্বকালে এই সব শিল্পকর্ম ধার করেছিল দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপ, উত্তর আফ্রিকা, নিকট প্রাচ্য এবং মধ্য এশিয়া থেকে।

খ্রিঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দি থেকে মধ্যপ্রাচ্যে সব রকমের মেটাল বা ধাতু শিল্পে– যেমন

www.pathagar.com

তামা, ব্রোঞ্জ, রুপা ও সোনার কাজ অতি উন্নত ছিল। মোঘলের বিখ্যাত ধাতুর শিল্প এবং দামেস্কের তরবারি বিশ্বখ্যাত ছিল। তাছাড়া এনামেলের কাজ, মীনার কাজ তৃতীয় খ্রিস্টাব্দে রোন ও দানিয়ুব উপকূল থেকে এসেছিল বাইজানটিয়ানে এবং চরম উৎকর্ষতা লাভ করে।

খ্রিস্টপূর্ব ১ম শতাব্দির মধ্যে কাচের উপরে কারুকর্ম এসেছিল টলেমি আলেকজান্ডার থেকে সেলুসিড দামেস্কে। সিরিয়ানদের অতি সূক্ষ্ম কাচের কাজ যথেষ্ট সুনাম অর্জন করে। বাইজানটাইন শিল্পীরা প্রাকৃতিক আর্ট-চমৎকার নমুনা আঁকতে পারত, জীবন্ত প্রাণীর প্রতিকৃতি থাকার বিরুদ্ধে নিষেধ থাকা সত্ত্বেও উমাইয়ারা বাইজানটাইন শিল্পীদের তাদের ও বাড়িঘরে মানুষ ও জীবজন্তুর ছবি আঁকিয়েছে। মানুষ ও প্রাণী ছাড়া বাইজানটাইন শিল্পীরা জ্যামিতিক আর্টে যথেষ্ট দক্ষ ছিল। ঐতিহাসিক এ.এইচ. ক্রিস্টি লিখেছেন যে, ইসলামী আর্ট আরবদের একমাত্র অবদান ছিল। আরবি বর্ণমালা (আর্নল্ড ও গিয়োম ১৯৯৫ ১১০ পৃষ্ঠা); আরব ছাড়া ক্যালিওগ্রাফিতে খ্রিস্টান শিল্পীদের অবদান ছিল। ক্যালিগ্রাফি স্টাইলে অনেক পাণ্ডুলিপি চিত্রিত করা ছাড়া বিল্ডিং মনুমেন্টে কুফিক স্টাইলে কোরানের আয়াত ও কলেমা উৎকীর্ণ হয়েছে– খ্রিস্টান ক্যালিগ্রাফারদের মধ্যে আকুলার নাম উল্লেখযোগ্য।

১৩.৮ সঙ্গীত

লায়াল (Lyall) বলেছেন, আরবে প্রথম দিকে কোনো স্থানীয় সঙ্গীত প্রথা ছিল না বললেই চলে এবং ইসলামের ব্যাপকভাবে সাম্রাজ্য বিস্তারের পূর্বে অনেক বছর ধরে সঙ্গীতের চর্চা ছিল না। (1930, P. 37) তারা শুধু কয়েকটি আদিম মন্ত্র সুর করে উচ্চারণ করত যাতে শুধু একঘেয়েমি ছিল।

প্রফেট মোহাম্মদ সঙ্গীত অনুমোদন করেননি। ইবন ওমর বর্ণিত একটি হাদিসে (৬৬০ সালের দিকে) বলা হয়েছে, বাঁশির সুর শুনতে পেলে তিনি কানে আঙুল দিতেন। আর একটি হাদিসে আছে যেখানে তিনি আলীকে নির্দেশ দিয়ে বলেছিলেন ঈশ্বর যেমন আমাকে পাঠিয়েছেন, আমিও তোমাকে পাঠিয়েছি সব বাঁশি ও কাঁসি ভেঙে দিতে যেহেতু এটা প্রফেটের শিক্ষার বিপরীতে। তাই সঙ্গীত বাজনা মসজিদে নিষিদ্ধ হয়েছে এবং ধর্মীয় ব্যাপারে এর কোনো ভূমিকা নেই।

কিন্তু প্রফেটের জন্মের আগে থেকে আরবে সঙ্গীত আরব গোত্রের মধ্যে প্রচলিত এবং জীবনে এর গুরুত্ব অনেক। ইসলাম প্রবর্তিত হওয়ার পরেও ঘাসান ও হীরার আরব সাম্রাজ্যে বাইজানটাইন (গ্রিক) ও সাসানিয়ান (পারস্য) থিওরি ও প্র্যাকটিস উভয় ক্ষেত্রে সঙ্গীত অত্যন্ত উন্নত পর্যায়ে ছিল।

সঙ্গীতের আরবি সমশব্দ ছিল 'মুসিকা'। উৎসবে ও ভোজসভায় সিরিয়া থেকে গ্রিক গায়িকা ও মেসোপটেমিয়া থেকে পার্সি গায়িকা আসত আনন্দ দান করত। তারা নিজের ভাষায় গাইত, আরবদের দেখেই শান্তি। আব্বাসী খিলাফতকালে পার্সি বাজনা ও সঙ্গীত খুব জনপ্রিয় ছিল কিন্তু গ্রিক বা গ্রিক গায়িকাদের চাহিদা ছিল বেশি। কথিত আছে যে, একজন দর্শনপ্রার্থী খলিফা মামুনের (মৃ. ৮৩৩) দরবারে এসে দেখে বিশ জন গ্রিক গায়িকা হাতে জলপাই গাছের শাখা ও গলায় ক্রস ঝুলিয়ে মূল্যবান পোশাক

www.pathagar.com

পরে ঘিরে ঘিরে নাচছে, তবে যেহেতু সঙ্গীত নিষিদ্ধ ছিল বলে তারা গান গায়নি।

আরবে সঙ্গীত চর্চা শুরু হলো দর্শন ও আধ্যাত্মিক চর্চার নামে নবম শতাব্দি থেকে যখন গ্রিক সঙ্গীতে বইপত্র আরবিতে অনুবাদ হতে লাগল। পিথাগোরাস (৫০০ খ্রিঃ পূ.), এথেন্সের অ্যারিসটোক্সেনাস (মৃ. ৩০০ খ্রিঃ পূ.), কনস্ট্যান্টিনোপলের থেমিসটিয়াস (মৃ. ৩৮৮ খ্রিঃ) এবং আলেক্সান্দ্রিয়ার সিমপ্লিকিয়াস পর্যন্ত সঙ্গীতের যত ক্লাসিকেল নোটেশন ছিল, অনূদিত হয়ে গেল।

মুসলিম লেখকদের মধ্যে মাসুদী (মৃ. ৯৫৬) সঙ্গীত সম্বন্ধে কয়েকটি পুস্তক রচনা করেন। এই সব পুস্তকে তিনি আরবের প্রাথমিক সঙ্গীতের ধারা ও বিদেশী সঙ্গীত সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। পার্সিয়ান পণ্ডিত ইস্পাহানের আবুল ফজল আল-ইস্পাহানী বলে বেশি পরিচিত, তিনি আরবি সঙ্গীতের সমঝদার ছিলেন এবং তিনি আরব গায়ক, সুরকার ও কবিদের নিয়ে ২১ খণ্ডের বিশ্বকোষ রচনা করে গেছেন। আরব ও পারস্য থেকে যেসব যন্ত্র সঙ্গীত সেই সময় প্রচলিত ছিল তার কিছু নাম ইংরেজি ভাষায়, ইউরোপীয় ভাষায় ধারণ করা হয়েছে যেমন লিউট, রেবেক, গিটার, তাবোর, বান্দোর, ও স্যাকবাদ। এই সব বাদ্যযন্ত্র তৈরি হয়েছিল প্রাচীন মিসর, ব্যাবিলন, গ্রিস ও পারস্যে। তুর্কিস্তানের দার্শনিক আল ফারাবি (মৃ. ৯৫০) আরব সঙ্গীত থিওরির ওপর কাজ করে বিখ্যাত হয়েছেন। তিনি কিবোর্ডসহ একটি বাদ্যযন্ত্র আবিষ্কার করেন। প্রাচীন প্রিমিটিভ হারমোনিয়ামের মতো। এই যন্ত্রের তিনি নাম দেন 'উরঘানাম'– যার গ্রিক নাম ছিল অরগ্যানন। আল-ফারাবির শিক্ষক ছিলেন একজন গ্রিক।

ইসলামী রহস্যবাদে সুফিদের মাধ্যমে সঙ্গীত একটি বিশেষ স্থান দখল করে আছে। সুফিরা এই সঙ্গীত বলতে গেলে খ্রিস্টান সাধুদের কাছ থেকে গ্রহণ করেছেন। সঙ্গীতের সুরের মাধ্যমে আধ্যাত্মিকভাবে লক্ষ্যে পৌঁছানো যায়। সে সম্বন্ধে ভাববাদী সুফিরা নিঃসন্দেহ হয়েছেন। সুফি রহস্যবাদী জুন নুন (মৃ. ৮৫৯) লিখেছেন যে, সঙ্গীতের ওপর স্বর্গীয় প্রভাব আছে এবং যারা শোনে আধ্যাত্মিকভাবে, তারা ঈশ্বরের নৈকট্য লাভ করে। পার্সিয়ান দার্শনিক আল-গাজ্জালী (মৃ. ১১১১) লিখেছেন যে কোরান পাঠের চেয়ে গান করলে মোহান্বিত অবস্থায় (ecstacy) জলদি পৌঁছানো যায় (H. G. Farmer, in Arnold and Guillaume 1965, P. 359)।

১৩.৯ শিক্ষা

প্রাচীন পারস্যবাসী শিক্ষা ও জ্ঞানকে বেশি গুরুত্ব দিত এবং জোরাস্ট্রিয়ান সাধু, ম্যাগিরা জ্ঞানসমৃদ্ধ ছিলেন। মহামতি আলেকজান্ডার পারস্য একামিনিয়ে রাজধানী পার্সিপলিস আগুন লাগিয়ে আংশিক ধ্বংস করেন এবং সেখানকার বিখ্যাত লাইব্রেরির সমস্ত পুস্তকাদি ও পাণ্ডুলিপি সম্পদ পাঁচ হাজার উট ও দশ হাজার গাধা গাড়ি বোঝাই করে ৩৩২ খ্রিস্টপূর্বাব্দে প্রতিষ্ঠিত তার নতুন রাজধানী আলেক্সান্দ্রিয়ায় পাঠিয়ে দেন।

এই পাণ্ডুলিপিগুলো দিয়ে টলেমিরা আলেক্সান্দ্রিয়ার বিখ্যাত লাইব্রেরির প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ এনে দেয় এবং ৪র্থ শতাব্দির (খ্রিঃ) মধ্যে এই লাইব্রেরিতে সাত লক্ষ ভলিউম এবং দুই লক্ষ স্ক্রল ধারণ করতে সক্ষম হয়, যদিও মাঝে মধ্যে আগুন লেগে কিছু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল।

www.pathagar.com

লাইব্রেরিসহ শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছিল টলেমি ও সেলুসিড বা তাদের বিজিত রাজ্যগুলোতে। ইসলামী স্কলার মাকরিজী লিখেছেন যে, ইসলাম-পূর্ব মিসর ও মধ্য প্রাচ্যের অন্যান্য দেশে জ্ঞানের ভাণ্ডার (দারুল হিকমা) বা দারুল ইস্‌ম যেখানে পণ্ডিত ব্যক্তিরা বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দিতেন, এরূপ অনেক একাডেমি পরবর্তীতে খ্রিস্টানদের শিক্ষার কেন্দ্রভূমিতে পরিণত হয়। আলেক্সান্দ্রিয়া, দামেস্কাস, এন্টিয়ক, এলেপ্পোর শিক্ষা কেন্দ্রগুলো বাইজানটাইন সম্রাটের অধীনে পরিচালিত হয়েছে। তখন বাইজানটাইনদের রাজধানী ছিল কনস্ট্যান্টিনোপল। এই কনস্ট্যান্টিনোপলে পরে একটা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় ৪২৫ খ্রিস্টাব্দে। খ্রিস্টান আরবদের মধ্যে সিরিয়ার গোত্র ও ঘাসানের স্কলারগণ এইসব শিক্ষা কেন্দ্র ও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাইজানটাইন পৃষ্ঠপোষকতার সুবিধা গ্রহণ করেছে।

অন্যান্য শহরে– যেমন এডেসা, নিসিবিস এবং সোদুসিয়া নেস্টোরিয়ান খ্রিস্টানদের শিক্ষা কেন্দ্র ছিল। এডেসায় (আধুনিক উরফা) একটা বিখ্যাত নেস্টোনিয়ান কলেজ ছিল যেখানে সিরিয়াক স্টাডিজের বিশেষত্ব ছিল। মেসোপটেমিয়ার আরব গোত্র এবং হিরার লাখমিদ গোত্র সাসানিয়ান শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছে।

টলেমি ও সেলুসিডদের মতো সাসানিয়ানরাও তাদের রাজ্যে শিক্ষা বিস্তারের প্রয়াসী ছিল। এশিয়ায় বলখে তাদের সবচেয়ে প্রাচীন কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়, (বল্‌খ হচ্ছে আধুনিক ওয়াজিরাবাদ)। আরবদের কাছে বল্‌খ 'শহরের মাতা' (উম্মুল বিলাদ) বলে পরিচিত। কথিত আছে, এই বল্‌খে জোরাস্টার খুন হয়েছিলেন।

৩২৮ খ্রিঃপূর্বাব্দে মহামতি আলেজান্দ্রার বেকট্রিয়া প্রদেশ (রাজধানী বল্‌খ) দখল করেন এবং তার মৃত্যুর পর সেলুসিড রাজ্যের অংশ হয়ে যায়। পরে বেকট্রিয়া স্বাধীন হয়েছিল এবং বেকট্রিয়া গ্রিকদের দখলে ছিল (২৯০ খ্রিঃ পূ.- ৯০ খ্রিস্টাব্দে)। তৃতীয় শতাব্দির মাঝামাঝি বল্‌খ জোরাস্ট্রিয়ান, মিথ্‌রাইক, বুড্ডিস্ট, হিন্দু, গ্রিক এবং নেস্টোরিয়ান শিক্ষা কেন্দ্র হয়ে ওঠে। এর প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে তাজিবা, উজবেক এবং খোরাসান পেরিয়ে তুর্কমেন অঞ্চল থেকে উত্তর পারস্য ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে। বলখ্‌ মুসলিমরা দখল করে নেয় ৬৬৩ খ্রিস্টাব্দে।

৫৩১ সালে, মুসলিম বিজয়ের এক শতাব্দি পূর্বে, সাসানিয়ান কিং ১ম খসরুর আমন্ত্রণক্রমে নেস্টোরিয়ানরা পার্সিয়ান উপসাগরের কাছে দক্ষিণ-পশ্চিম পারস্যে জান্দিশাহপুরে একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে। জান্দিশাহপুর প্রাচীন শহর সুসা থেকে বেশি দূরে ছিল না। সুসা ছিল দারাউস-এর রাজধানী। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে কয়েকটি কলেজও প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। ইউনিভার্সিটি লাগোয়া একটি বড় লাইব্রেরি ও অবজারভেটরিও তৈরি করা হয়।

জান্দিশাহপুর থেকে অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি বসরাতে বসবাস শুরু করে যাদের প্রভাব পড়েছিল আরব বেয়াকরণদের ও কোরানের তফসিরকারদের ওপর। ইখওয়ানুস সাফার যুক্তিবাদীদের লেখার ওপরও এদের যথেষ্ট প্রভাব পড়েছিল। পার্সিয়ান স্কলার সিবাওয়ে (মৃ. ৭৯৩) আরবি গ্রামারের নীতির ওপর একটি পুস্তক রচনা করেন যা আরবি ভাষা ও সাহিত্যের ওপর প্রভূত প্রভাব ফেলেছিল।

www.pathagar.com

এই সময় শিক্ষার ক্ষেত্র চারদিকে প্রসারিত হয়। সেই সাথে আলেক্সান্দ্রিয়া লাইব্রেরি থেকে হেলেনিস্টিক ধারণাও ছড়িয়ে পড়ে। অনেকে বলেন খলিফা ওমর মুসলিম রাজ্যে হেলেনিটিক চিন্তাধারার প্রভাবকে রোধ করার জন্য আলেক্সান্দ্রিয়া লাইব্রেরি নষ্ট করে দেয়ার আদেশ দেন। ৬৪১ খ্রিস্টাব্দে, কথিত আছে, খলিফা ওমর বলেছিলেন যদি এ লাইব্রেরিতে এমন জ্ঞান থাকে যা কোরানের সাথে মিলে যায় তাহলে সেটা অতিরিক্ত, আর যদি না মিলে তাহলে মুসলিম বিশ্বাসের বিরুদ্ধ– সুতরাং ঐ গ্রন্থাগার থাকা উচিত নয়। খলিফার নির্দেশ মতে, কথিত আছে, ঐ লাইব্রেরির সব পুস্তকের কিছু জ্বালিয়ে দেয়া হয় আর বাকি যা ছিল ছ'মাস ধরে গণস্নানাগারে জ্বালানি হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

মুসলিম স্কলারগণ, যুক্তি দেখিয়ে, এ কাহিনী অস্বীকার করেন, কিন্তু কোনো কোনো অথরিটি মনে করেন এ কাহিনী সত্য কারণ এই লাইব্রেরির কিছু অংশ ৭২০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে দামেস্কের পথে দেখা গেছে।

আব্বাসি খলিফারা পরবর্তীতে দামেস্কের লাইব্রেরি উঠিয়ে নিয়ে বাগদাদে নিয়ে যান। এখানে খ্রিস্টান স্কলারদের নিয়োজিত করা হয় বাগদাদের লাইব্রেরিকে সাজিয়ে-গুছিয়ে তোলার জন্য। এই লাইব্রেরির পরিচালক ছিলেন ইউহানা ইবন মুসা, দামেস্কের নেস্টোরিয়ান খ্রিস্টান।

৮২০ খ্রিস্টাব্দে খলিফা মামুন বাগদাদে জ্ঞানগৃহের (House of wisdom) পত্তন করেন। সেখানে লেকচার রুম, পড়ার ঘর, বিতর্কের ঘর ও লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে শিক্ষার সমস্ত ক্ষেত্রে সুষ্ঠুভাবে কাজ চালানো হয়। একটি অনুবাদ টিম তৈরি করা হয় গ্রিক দর্শন ও অন্যান্য বিষয় আরবিতে অনুবাদ করার জন্য।

৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে খলিফা মোতায়াক্কিল লাইব্রেরি ও অনুবাদ শাখা সম্প্রসারণ করার সিদ্ধান্ত নেন। মোতায়াক্কিল কট্টর অর্থোডক্স মুসলিম হলেও উপযুক্ত মুসলিম পণ্ডিত না থাকায় বাধ্য হয়ে এ কাজের ভার দেয় হুনায়ুন বিন ইসহাক একজন খ্রিস্টানকে। হুনায়ুন বিন ইসহাক এক বিখ্যাত অনুবাদক ছিলেন এবং আব্বাসি খলিফাদের এই জ্ঞানগৃহে তার অবদান অতুলনীয়।

বাগদাদের এই জ্ঞানগৃহের অনুকরণে কাইরোতে ফাতেমিদ খলিফা মুইজ একটি লাইব্রেরি ও পাঠকক্ষ নির্মাণ করেন। এখানে গ্রিক দর্শন ও বিজ্ঞানকে বেশি প্রাধান্য দেয়া হয় (Watt, 1990-, P. 215)। এই জ্ঞানগৃহকে আরও সম্প্রসারণ করেন মুইজের উত্তরাধিকারী খলিফা আজিজ ও হানিফ।

সালাউদ্দিন যখন ফাতেমিদ খলিফাকে পরাজিত করে মিশর দখল করেন ১১৭১ খ্রিস্টাব্দে, তখন তিনি প্রায় এক মিলিয়ন বই, পাণ্ডুলিপি ও স্ক্রল নষ্ট করে ফেলেন এই কারণে যে এগুলো শিয়া সম্প্রদায়ের নীতি প্রচার করে। সালাউদ্দিন কট্টর সুন্নি ছিলেন। কিছু বিক্রি করে দেয়া, কিছু জ্বালিয়ে দেয়া হয় আর কিছু নীলনদে ফেলে দেয়া হয়।

মধ্যপ্রাচ্যে এই মুসলিম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং এরূপ প্রতিষ্ঠান স্পেনে যা ছিল, সেগুলো প্রধান শিক্ষা কেন্দ্ররূপে শুধু মুসলিম বিশ্বে নয় সারা দুনিয়ার শিক্ষা কেন্দ্র রূপে খ্যাতি লাভ করে। ইউরোপ ও অন্যান্য পশ্চিম দেশ থেকে এই শিক্ষা কেন্দ্রগুলো থেকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা করেছে। কিন্তু এখন আর তেমন জৌলুস নেই। দশম শতাব্দি

www.pathagar.com

থেকে ইউরোপে স্কুল পত্তন হয় এবং মুসলিম শিক্ষা কেন্দ্র থেকে জ্ঞান-বিজ্ঞান আহরণ করার পর শনৈ শনৈ উন্নতি হয়ে বর্তমান পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে।

ইউরোপের শহরগুলো বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে ওঠে বিভিন্ন সময়ে– প্যারিসে (১১৫০), বলগ্না (১২০০), পাদুয়া (১২২২), অক্সফোর্ড (১২৪৯), কেমব্রিজ (১২৮৪) এবং মন্টপেলিয়ার (১২৮৯)।

১৩.১০ অনুবাদকগণ

এটা অনুমান করা মুশকিল কী ধরনের বিদেশী প্রভাব পড়েছিল মুসলিম চিন্তাধারায়। এটা বুঝতে গেলে প্রাচীন জ্ঞান ভাণ্ডার থেকে বিশেষ করে গ্রিক দর্শন ও বিজ্ঞান আরবি ভাষায় অনুবাদকর্মে মনোনিবেশ করতে হয়। এই অনুবাদের মাধ্যমে মুসলিম দর্শন, বিজ্ঞান, চিকিৎসাবিদ্যা এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে মুসলিমরা তাদের অবিস্মরণীয় অবদান রেখে গেছেন।

সাধারণত অধিকাংশ অনুবাদ হয়েছিল গ্রিক দর্শন ও বিজ্ঞান থেকে তারপর ছিল ল্যাটিন ও কপটিক মেটিরিয়েল। অনুবাদ শুরু হয় প্রথমে সিরিয়াতে কারণ প্রায় তৃতীয় শতাব্দি থেকে সিরিয়াক (নিও-আরামাইক ও খ্রিস্টান আরামাইক) পশ্চিম এশিয়ার ভাষা হিসাবে গ্রিক ভাষার স্থলে স্থান করে নেয় (Arnold and Guillaume, 1965, P. 313)।

এই অনুবাদকর্ম শুরু হয় আরবি ভাষা আগমনের তিন শতাব্দি পূর্বে। অনুবাদ হয় সিরিয়া, প্যালেস্টাইন, মিশর ও মেসোপটেমিয়ার মঠগুলোতে এবং পঞ্চম শতাব্দির মাঝামাঝি এই অনুবাদ পূর্বাঞ্চলের চার্চগুলোতে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া জান্দিশাহপুরে ও নেস্টোরিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা উন্নত ধরনের অনুবাদ বিভাগ ছিল।

মুসলিম রাজ্য প্রসারের সাথে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনুবাদের প্রয়োজন পড়ে আরবি ভাষায়, এ কাজ শুরু হয় উমাইয়া খলিফাদের সময়ে এবং আব্বাসীয় খলিফাদের সময়ে এই অনুবাদ কাজ দ্রুতভাবে গড়ে ওঠে।

খলিফারা খ্রিস্টান পণ্ডিতদের বিভিন্ন স্থানে প্রেরণ করেন পুস্তকাদি ও পাণ্ডুলিপি গ্রহণ করতে। মিশরে, আলেক্সান্দ্রিয়ায়, মেসোপটেমিয়ায় হারআন, জেরুজালেমের বস্রা, এলেপ্পোতে, এডেসা, এন্টিয়ক এবং সিরিয়ার অন্যান্য কেন্দ্রে; এমনকি খ্রিস্টান বাইজানটাইন ও গ্রিসে। (Grunebaum, 1961, P. 54) বাইজানটাই সম্রাট তৃতীয় মাইকেল (মৃত. ৮৬৭)-এর সাথে খলিফা মুনতাসির এক সন্ধি করেন। সেখানে বলা হয় যে, বাইজানটাইন সম্রাট গ্রিক পাণ্ডুলিপি বাগদাদে পাঠাবেন। বিভিন্ন স্থান থেকে গাড়ি বোঝাই করে বিদেশী ভাষার বই-পুস্তক দামেস্কে ও বাগদাদে আনা হয় আরবি ভাষায় অনুবাদ করার জন্য। খলিফার এজেন্টরা মুসলিম রাজ্যের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে প্রাচীন সাহিত্য পুঁথি সংগ্রহ করে আনে (আমীর আলী, ১৯৬৫ পৃ. ৩৭১)।

বেশির ভাগ আরবি অনুবাদ করা হয়েছিল সিরিয়ার ভাষা থেকে এবং কিছু সরাসরি গ্রিক ভাষা থেকে। এই অনুবাদকর্মের শিরোনাম শত শত নামে লেখা হয় এবং অনেক পশ্চিমা সাহিত্য আরবি ভাষায় এখন মুসলিমদের আয়ত্তের মধ্যে। প্রাচীন গ্রিক এবং বিদেশী দর্শন ও বিজ্ঞান থেকে যখন আরবিতে অনুবাদ করা হয় তখন আরবরা

www.pathagar.com

বিস্ময় প্রকাশ করে মন্তব্য করেছিল যে, "প্রফেটের আগমনের পূর্বে পৃথিবীতে যথেষ্ট জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রচলন ছিল।" বলা হয় যে, কোনো কোনো খলিফা মূল গ্রিক ও ল্যাটিন পাণ্ডুলিপি থেকে অনুবাদ করে মূলকপি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। যাতে কোনো সাক্ষী না থাকে যে এইগুলি বিদেশী জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুবাদকর্ম।

অনেক গ্রিক, রোমান, আলেক্সান্দ্রিয়ান ও হেলেনিস্টিক উৎস থেকে শত শত বই ও পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করা হয়েছিল এবং আরবিতে অনুবাদ করা হয়। এই অনুবাদকরণের মধ্যে ছিল হোমার (মৃ. ৮৫০ খ্রিঃ পূ.), পিথাগোরাস (মৃ. ৫০০ খ্রিঃ), হিপোক্রাটস, (মৃ. ৩৬০ খ্রিঃ পূ.), প্লেটো, (মৃ. ৩৪৭ খ্রিঃ পূ.) এবং এরিস্টটল (মৃ. ৩২২ খ্রিঃ পূর্বাব্দ)-এর মূল গ্রন্থ থেকে; অনুরূপভাবে বিখ্যাত গাণিতিকদের কাজ যেমন– ইউক্লিড-এর কাজ (মৃ. ২৮৩ খ্রিঃ পূ.), কোনিক্স অব এলোপোনিয়াস (মৃ. ২৮০ খ্রিঃ পূ.), ফিনোর নিউমেটিক্স (মৃ. ২৭০ খ্রিঃ পূর্ব), মেনেলাউসের স্কেরিকস (মৃ. ১০৫ খ্রিঃ পূ.) এবং নিও পিথাগোরিয়েনের গণিত এবং নিকোমেকাসের জ্যামিতি (মৃ. ১২০ খ্রিঃ পূ.)।

জ্যোতিবিদ টলেমির (মৃ. ১৬১ খ্রিঃ পূ.) গ্রিকরা যাকে ম্যাজিস্ট্রি বলত এবং আরবরা যাকে বলত অ্যাল-মাগেস্ট, মুসলিম বিশ্বে বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার ওপর যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছিল। তেমনি ডায়োফেন্টাস (মৃ. ২৯০ খ্রিঃ পূ.)-এর এ্যালজাব্রা।

আবিষ্কারকদের মধ্য থেকে যেসব তথ্য আরবিতে অনুবাদ করা হয় তার মধ্যে ছিল আর্কিমিডিসের তত্ত্ব, আলেক্সান্দ্রিয়ার হেরোর (মৃ. ৭০ খ্রিঃ পূ.) গণিত সর্ম্পর্কে বইপুস্তক আরবিতে অনুবাদ করা হয় এবং এই অনুবাদিত কাজের জন্য মুসলিম রাজ্যে জ্যোতির্বিদ্যার পারদর্শিতা লাভ করেন।

অনুবাদিত লেখকদের মধ্যে চিকিৎসাবিজ্ঞানে উল্লেখযোগ্য ছিলেন ডিওসকোরাইড (মৃ. ৬৫ খ্রিঃ), আর একজন ছিলেন গালেন (মৃ. ২১০ খ্রিঃ) যিনি গ্রিক। গালেন কয়েকজন রোমান সম্রাটের চিকিৎসক রূপে কাজ করেছেন এবং মেডিকেল বিজ্ঞানে তাঁকে অথরিটি বলা হতো। আরবিতে সবচেয়ে বেশি অনুবাদ করা হয় গালেনের কাজ থেকে।

পল অব এজিনা (মৃ. ৬৯০), তার এপিটোমে সার্জারি সম্বন্ধে তখনকার দিনে যা ছিল সবই লিপিবদ্ধ করেছিলেন। সার্জারিতে একটি বিখ্যাত পুস্তক রচনা করেছিলেন কর্ডোভার আবুল কাসিস (মৃ. ১০১৩) পল-এর এপিটোমের ওপর ভিত্তি করে।

অনুবাদ ক্ষেত্রে প্রথম সৈনিক ছিলেন মনোফিজাইট খ্রিস্টান পুরোহিত রেসাইনার সার্জিয়াস (মৃ. ৫৩৬)। তিনি ছিলেন মেসোপটেমিয়ায়। গ্রিক মেডিক্যাল পুঁথিপত্র ও পুস্তকের তিনি সিরিয়াকে অনুবাদ করেন। পরে এর থেকে অনেকগুলো অনুবাদ হয় আরবিতে। অন্যদের মধ্যে ছিলেন বালাদের জেকোবাইট আথানাসিয়াস (মৃ. ৬৯৬)। এডেসার জেকব (মৃ. ৭০৮), তিনি ছিলেন নেস্টোরিয়ান এবং কুফার জর্জ (মৃ. ৭২৪)। জর্জ 'আরবদের বিশপ' ছিলেন যিনি গ্রিক থেকে চিকিৎসাবিদ্যা, নক্ষত্রবিদ্যা ও দর্শন অনুবাদ করেন।

উমাইয়া খলিফা দ্বিতীয় ওমরের সময় বসরার একজন পার্সিয়ান ইহুদি মাসারজাওয়ে (মৃ. ৭২৫) চিকিৎসাবিজ্ঞানের পুস্তক অনুবাদ করেন। এডেসার থিওফিলাস (মৃ. ৭৮৫) একজন খ্রিস্টান পণ্ডিত ও জ্যোতির্বিদ ছিলেন। তিনি অনুবাদ

www.pathagar.com

করেন হোমারের ইলিয়াড ও ওডেসি সিরিয়াক ভাষায়। আব্বাসি খলিফা মেহ্দির খুব কাছের লোক। তার এই অনুবাদ থেকে অনূদিত হয়েছে আরবি ভাষায়। আর একজন নামকরা নেস্টোরিয়ান খ্রিস্টান পণ্ডিত বালাবাক্কি (মৃ. ৮৩৫) অনুবাদ করেছিলেন গ্রিক জ্যামিতি, গণিত, নক্ষত্রবিদ্যা ও প্রকৌশল।

অনুবাদকের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ছিলেন হুনায়েন ইবন ইসহাক (মৃ. ৮৭৪)। তিনি ছিলেন ইবাদ গোত্রের নেস্টোরিয়ান খ্রিস্টান জান্দিশাহপুরের ডাক্তার। তার অনুবাদকর্মের মধ্যে ছিল হিপ্পোক্রেটস্, প্লেটো, গালেন এবং আরো অনেকের মেডিকেল ও বিজ্ঞান বিষয়ক পুস্তকাদি।

হুনায়েনের স্কুলে প্রায় ১০০ জনের মতো ছাত্র ও অনুবাদক ছিল, তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিলেন এহিয়া ইবন বিত্রিক। তিনি অনুবাদ করেন এরিস্টটল, গালেন ও অন্যান্যদের কাজ থেকে। আবদুল মসিহ্ ইবন আবদুল্লাহ ছিলেন জেকোবাইট। তিনি অনুবাদ করেন নিওপ্লেটোনিক দার্শনিক প্লোটিনাসের পুস্তক এবং অন্যান্য তর্কবিদ্যা। ইসহাক ইবন হুনায়েন (হুনায়েনের পুত্র) অনুবাদ করেন অ্যারিস্টটল, ইউক্লিড ও টলেমির আলমাজেস্ট থেকে। হুবায়েশ, হুনায়েনের ভাইপো, অনুবাদ করেন অনেক মেডিকেল পুস্তক থেকে।

একজন সাবিয়েন জ্যোতির্বিদ, গাণিতিক ও ডাক্তার আবিত ইবন কুর্‌রা বিজ্ঞান বিষয়ক পুস্তক থেকে প্রায় ডজন খানেক অনুবাদ করেন। তার পুত্র সিনান ইবন হাবিত পরে বিখ্যাত হয়েছিলেন এক মহান আরব জ্যামিতি বিশেষজ্ঞ হিসাবে।

কুস্তা ইবন লুকা (মৃ. ৯৩২) অনুবাদ করেন গ্রিক ও আলেক্সান্দ্রিয়ান লেখকদের বিজ্ঞান বিষয়ক পুস্তক থেকে।

আবু ইয়াহিয়া আল-মারওয়াজি (মৃ. ৯২০) ছিলেন নেস্টোরিয়ান দার্শনিক ও বৈয়াকরণ। তিনি অনুবাদকদের জন্য আর একটি স্কুল বাগদাদে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যা শতাব্দিকাল ধরে চলে। তার ছাত্র ও উত্তরাধিকারী ছিলেন একজন নেস্টোরিয়ান তর্কবিদ্যাবিদ্ ও বৈয়াকরণ নাম ছিল আবু বিসির মাত্তা। তিনি দার্শনিক আল-ফারাবির বন্ধু; তার ছাত্র ও উত্তরাধিকারী ইয়াহিয়া ইবন আদি ছিলেন জেকোবাইট দার্শনিক ও অ্যারিস্টটলের ভাষ্যকার; তার ছাত্র ও উত্তরাধিকারী হাসান ইবন সুয়ার ছিলেন নেস্টোরিয়ান দার্শনিক ও চিকিৎসক। এইসব অনুবাদক ও পণ্ডিত ব্যক্তিদের নিকট ইসলামী বিশ্ব ঋণী, কারণ দুর্বোধ্য গ্রিক, ল্যাটিন ও কপটিক ভাষা থেকে মূল্যবান বইপুস্তক আরবি ভাষায় এরা অনুবাদ করেছেন। এই সব অনুবাদকরা ছিলেন ভাষাবিদ, বিভিন্ন ভাষার ওপর তাদের দখল ছিল। শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই সব অনুবাদক যে সম্পদ আরবি ভাষায় রূপান্তর করে গেছেন তা দামেস্কাস ও টলেডো পণ্ডিতদের প্রভূত পরিমাণে সাহায্য করেছে। এই সব অনুবাদ না হলে আরবি ভাষা এতটা উন্নতি লাভ করতে পারত না এবং সাহিত্য দর্শন, বিজ্ঞান ও চিকিৎসাবিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করা মুসলিম পণ্ডিতদের জন্য সম্ভব হতো কিনা বলা মুশকিল। এই অনুবাদের কল্যাণে ইসলামিক রেনেসাঁর, আরব বিশ্ব ও মুসলিম বিশ্বে, প্রবর্তনে প্রভূত সাহায্য করেছে।

www.pathagar.com

১৩.১১ সাহিত্য

প্রফেট মোহাম্মদ কবিতা অপছন্দ করতেন এবং তাঁর মৃত্যুর পর ধর্মবেত্তাগণ সেকুলার লেখা বা সাহিত্যের বিরোধিতা করেছেন যার জন্য সাহিত্য রচনার কোনো সুযোগ গড়ে ওঠেনি। যা কিছু লেখা হতো অর্থোডক্স মোল্লাদের তাতে সম্মতি নিয়ে হতো।

কবিতা লেখার ক্ষেত্রে প্রেমের কবিতার প্রচলন ছিল যাকে বলা হতো 'উদরিজ্‌ম' কারণ এ কবিতার উন্নয়ন হয়েছে সিরিয়ার খ্রিস্টান গোত্র বানু উদ্রা। এ ধরনের কবিতা আরবদের মধ্যে বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং তা ছড়িয়ে পড়ে বাগদাদ থেকে স্পেন পর্যন্ত। আর কবিরা প্রেমের কবিতার থিম্‌ গ্রহণ করত ইউসুফ-জোলেখা, পারস্যের দ্বিতীয় খসরু ও সিরিয়ার খ্রিস্টান দুহিতা শিরিন থেকে, কবি আন্তারা (মৃ. ৫৯৫) ও তার মিস্ট্রেস আব্‌লা এবং উধরা গোত্রের কবি জমিল (মৃ. ৭১০) এবং তার প্রিয়া সুন্দরী বুথাইনা থেকে।

উমাইয়া খলিফা মাবিয়া কবিতা ভালোবাসাতেন। তিনি তাঁর পুত্র প্রিন্স এজিদের জন্য কবিতার সংকলন করতে আদেশ দেন, কারণ কবিতা তার পুত্রকে সাহিত্যমনা করবে এবং এর মধ্য দিয়ে তার জীবন সুশৃঙ্খল হবে এবং আদব-কায়দা শিখবে, আর সাহসী হয়ে সাহসিকতার কাজ করতে অনুপ্রেরণা দিবে। এই সংকলন প্রাচীন আরবের প্রথম কবিতা সংকলন যেখানে বিখ্যাত কবিদের কবিতা ঠাঁই পেয়েছিল।

এর পর খলিফা আবদুল মালেক দ্বিতীয় সংকলন তৈরি করতে বলেন, যা অনেক দিন ধরে কবিতার উৎস গ্রন্থ বলে টিকে ছিল। খলিফার রাজকবি ছিলেন তঘলিব গোত্রের একজন খ্রিস্টান কবি, নাম ছিল আখতাল (মৃ. ৭১০)। খলিফা আখতালকে মোটা অংকের টাকা এবং পেনশন দিতে চেয়েছিলেন এই শর্তে যে তাকে মুসলিম হতে হবে। আখতাল বিনয়ের সাথে অস্বীকার করে এই কারণ দেখিয়ে যে তিনি মদ ছাড়তে পারবেন না। খলিফা আর কিছু না বলে ঘোষণা করেন যে আখতাল খলিফার কবি এবং 'আরবের শ্রেষ্ঠ কবি' উপাধি দেন (Nicholson, 1969, P. 242)।

আর একজন কবি ছিলেন তামিম গোত্রের খ্রিস্টান। তারও যথেষ্ট খ্যাতি ছিল এবং দামেস্কের খলিফাদের সভাকবি ছিলেন। তার নাম ফারাজদাক (মৃ. ৭২৯)। তার সমসাময়িক ও প্রতিদ্বন্দ্বী মুসলিম কবি ছিলেন কোলাইব গোত্রের জারির ইবন আতিয়া। ইনি হাজ্জাজের প্রিয় পাত্র ছিলেন। হাজ্জাজ তখন ইরাকের গভর্নর।

যখন আরবিতে গ্রিক ছন্দ অনূদিত হয়ে বের হয় তখন আরব কবিরা এর প্রভাবে গীতি কবিতা লিখতে শুরু করে। গ্রুনেবাম (Grunebaum) লিখেছেন স্মরণ রাখা দরকার যে গ্রিক গীতি কবিতার ওপর আরব কবিদের নির্ভর সুদূরপ্রসারী ছিল (1961, P. 317)

কোদামা ইবন জাফর (মৃ. ৯২২) খ্রিস্টান কবি ছিলেন, পরে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি এরিস্টটলের কাব্যে বিশেষজ্ঞ ছিলেন এবং তিনিই প্রথম আরব সাহিত্য থিওরিতে গ্রিক প্রথা চালু করেন। তিনি কবিতা, কবিতার ছন্দ ও গতি ইত্যাদির ওপর লেখালেখি করে সুনাম অর্জন করেন।

গ্রিক ধারায় প্রভাবিত হয়ে আরব লেখকরা কেচ্ছা-কাহিনী সংগ্রহ করে আলিফ

www.pathagar.com

লাইলা ওয়া লাইল– অ্যারাবিয়ান নাইটস্ রচনা করেন। এই গল্পগুলো প্রথমে পহ্লভী ভাষায় রচিত হয় পরে আরবিতে অনূদিত হয়ে একাদশ শতাব্দিতে সমাপ্ত হয়; সঙ্কলিত হয়ে পুস্তক হিসাবে বর্তমান আকারে রূপ নেয় ১৪০০ খ্রিস্টাব্দে। কাহিনীগুলো দেখে স্পষ্ট মনে হয় এগুলো বৌদ্ধ, ইহুদি ও হেলেনিস্টিক উৎস থেকে ধার করা। (Grunebaum, 1961, P. 294)।

আব্বাসিদের সময়ে কাগজ তৈরি ও কাগজের ব্যবহারের জন্য সৃজনশীল লেখালেখি ও জ্ঞান বিস্তারে প্রসারতা লাভ করে। প্রথমে সাধারণ লেখালেখিতে প্যাপাইরাস ব্যবহার করা হতো, কিন্তু যে সময় কোরান লেখা শুরু হয় তখন প্যাপাইরাসের বদলে গ্রিকে রোমান বিশ্বে, যে চামড়ার কাগজ ব্যবহৃত (পার্চমেন্ট) হতো, সেই পার্চমেন্ট ব্যবহৃত হয়। কোরানে পার্চমেন্টকে 'কিরতাস' বলা হতো। (৬ ঃ ৭) এই কিরতাস শব্দ গ্রিক কার্টেস (Chartes) থেকে এসেছে অর্থ– চামড়ার একটা পাতা (a sheet of parchment)।

কোরানের আয়াত লিখিয়েরা (কাতিব) অন্যান্য বস্তুর সাথে 'পার্চমেন্ট' ব্যবহার করতেন।

৭৫১ খ্রিস্টাব্দে মধ্য এশিয়ায় যুদ্ধের সময় মুসলিম বাহিনী কয়েকজন চীনা কাগজ প্রস্তুতকারীকে বন্দি করে সমরকন্দে এবং আরবরা তাদের কাছ থেকে কাগজ তৈরি করার কৌশল (টেকনিক) শিখে নেয়। পরে ৭৯৪ খ্রিস্টাব্দে বাগদাদে একটি কাগজ কারখানা তৈরি করা হয়, এরপর অন্যান্য কেন্দ্রেও কারখানা গড়ে ওঠে। তারপর আস্তে আস্তে ইউরোপেও কাগজের ব্যবহার ছড়িয়ে পড়লে প্যাপাইরাস বন্ধ হয়ে যায়।

১৩.১২ ইতিহাস লিখন

প্রাচীনকাল থেকে ইতিহাস লিখন পদ্ধতি শুরু হয় পর্বত গাত্রে, বিভিন্ন লিপিতে– যেমন মোসনাদ, তালমুদিক, সাফাইটিক, নাবাতাইয়েন। শতাব্দিকাল ধরে এই সব লিপি থাকেনি, মুছে গেছে বা নষ্ট হয়ে গেছে কিংবা বেদুইনদের দ্বারা ধ্বংস হয়েছে। উনবিংশ শতাব্দির শেষের দিকে কয়েক জন ইউরোপিয়ান পণ্ডিত পর্বত গাত্রের বা টুকরো থেকে লিখনের অর্থ উদ্ধার (dicipher) করার কাজ শুরু করেন ইসলাম-পূর্ব আরবের ইতিহাসের খোঁজে (Philby, 1947, P. 128)।

এই সব বস্তু ইতিহাস স্বীকৃত না হলেও বিভিন্ন কালে বিভিন্ন শাসকের অধীনে তখনকার আরবের অবস্থা কী ছিল তার ধারণা চিত্র পাওয়া যায়। নতুবা ইসলাম-পূর্ব ও পরের ঘটনার বিস্তৃত ইতিহাস গ্রহণ করা হয় এই সব উৎস থেকে যেমন প্রতিবেশী রাষ্ট্রের ঘটনা সূত্র থেকে; ইহুদি, গ্রিক, সিরিয়ান ও রোমান লেখকদের লেখা থেকে; ইসলাম-পূর্ব কবিতা থেকে এবং বিভিন্ন পেশাদার কাহিনীকারদের (কাসাস) ট্রাডিশন থেকে।

মুসলিম লেখকরা প্রফেট-পূর্ব ঘটনার কাহিনী অল্পই ব্যক্ত করেছেন। ইসলাম-পূর্ব ঘটনা লিপিবদ্ধ করতে স্কলারদের নিরুৎসাহ করা হয়েছে এবং ফারিস বলেন যে প্যাগন আরবদের ইতিহাস লিপিবদ্ধ না করার অফিসিয়েল সিদ্ধান্ত আছে (1952, P. Vii)। একটি হাদিসে প্রফেট বলেছেন বলে বলা হয় যে, 'ইসলাম-পূর্ব সব কিছুকেই

www.pathagar.com

ধ্বংস করে দিয়েছে' 'ঐতিহাসিক' (আখবারি) শব্দের অপমানজনক (derogatory) অর্থ ছিল এবং হিশাম আল-কাল্‌বি (মৃ. ৮২০) যিনি প্রফেটপূর্ব আরব সম্বন্ধে যা লিখেছেন মোল্লারা তার বিরুদ্ধাচরণ করেছেন। ফলে ইসলাম-পূর্ব ঘটনার তথ্য যা অর্থোডক্স মুসলিমদের মনোপূত নয় সেগুলোকে নষ্ট করা হয়েছে বা অবহেলা করে নষ্ট হতে সাহায্য করেছে এবং সেইগুলোকে রাখা হযেছে যা পরিবর্তনের পর গ্রহণযোগ্য করা হয়েছে।

ইতিহাস বা জীবন চরিত ইসলামোত্তর যুগে হয়েছে প্রফেটের মৃত্যুর এক শতাব্দি ও তারও বেশি সময়ের পর। এই সময়ের মধ্যে যেসব হাদিস সংগৃহীত হয়েছে তা ছিল খাপছাড়া ও খণ্ড খণ্ড, ফলে মুখে মুখে যা পাওয়া গেছে তা বা সে তথ্যের বিশ্বাসযোগ্যতা খুব কমই ছিল এবং বেশির ভাগই ছিল কোনো বিশিষ্ট গোত্র বা গোষ্ঠীর পক্ষে। পরে যা লিখিত হয়েছে সেগুলো ছিল পূর্ব ভাষ্যের সংশোধিত ভাষ্য দলীয় গোত্রকে সাপোর্ট করে। তাই অনেক ট্রাডিশনের ভাষ্য বা তথ্য পরস্পর বিরোধিতায় দুষ্ট হয়েছে। এই কারণে আসল চিত্র বা ইতিহাস চাপা পড়েছে। অমুসলিম ঐতিহাসিকরা ইসলামের ইতিহাস যা লিখেছেন তাকে রেকর্ডভুক্ত করা হয়নি এবং যেসব কাহিনী গৃহীত হয়েছে সেগুলোকে ইতিহাস সমৃদ্ধ বলা যেতে পারে না।

প্রাচীন কাহিনীকারদের বিবরণ প্রায়ই কেচ্ছা-কাহিনী বা মিথ্‌ও বলা যেতে পারে এবং সেখানে অতিশয়োক্তি বেশি। ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে লেখা। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে দ্বিতীয় খলিফা ওমর তার দেহের গুরুত্বপূর্ণ অংশে ছ'টার বেশি ছিদ্র করেছিলেন এবং সেই সব ছিদ্র ক্ষত দিয়ে ঝরনার মতো পানি বের হয়েছে এবং তিনি পান করেছেন। তবুও তিনি বেঁচে গেছেন ও জনগণের উদ্দেশ্যে নাতিদীর্ঘ বক্তব্যের সাথে তাদের নির্দেশ-উপদেশ দিয়েছেন। এ ধরনের কথাবার্তায় কোনো সামঞ্জস্যতা ছিল না, একটা ঘটনার সাথে অন্য ঘটনার মিল ছিল না এবং পরস্পরবিরোধী তথ্যগুলোর কোনো সমন্বয় করা সম্ভব হয়নি। প্রধান প্রধান ঘটনা ও যুদ্ধগুলোর সঠিক বর্ণনা নেই এমনকি ওমর কখন জেরুজালেম দখল করলেন সে তারিখেরও মিল নেই। তাছাড়া প্রথম দিকের ইতিহাসের পর্যায়ক্রম না থাকায় ঘটনাগুলোর সিকোয়েন্স নির্ধারণ করা যায় না।

প্রফেটের জীবন চরিত্রে এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বের জীবন সম্বন্ধে এবং তার সাহাবীদের সম্বন্ধে যথেষ্ট অসামঞ্জস্যতা রয়েছে। তাই পারস্য, মিসর ও সিরিয়া, মেসোপটেমিয়া, প্যালেস্টাইন বিজয়ের ঘটনায় যথেষ্ট বিশৃঙ্খল অবস্থা দৃষ্ট হয় এবং এ বিশৃঙ্খল অবস্থা (confusion) আরব ঐতিহাসিকদেরও অজানা নয়।

প্রায় নবম শতাব্দি থেকে উল্লেখযোগ্য মুসলিম ঐতিহাসিকদের আগমনে তথ্য সম্বলিত ইতিহাস লেখা শুরু হয়। অনেকে বিশ্ব-ইতিহাস, সৃষ্টিতত্ত্ব থেকে তার মৃত্যু পর্যন্ত, ধারণ করে গেছেন।

ভূগোল সম্বন্ধেও তেমনি, প্রাচীন গ্রিক ও ল্যাটিন লেখকদের কথা, শহর ও শহরবাসীদের কথা, উদ্ভিদ ও প্রাণীদের কথা, পাহাড়-পর্বত, নদী-নালার কথা, অক্ষাংশ-দ্রাঘিমাংশ সম্বলিত ম্যাপসহ, সঠিকভাবে লিখেছেন মুসলিম ভূগোলবিদগণ। উল্লেখযোগ্য যে, এইসব ঐতিহাসিক, ভূগোলবিদরা, যারা আরবি ভাষায় ইতিহাস ও

www.pathagar.com

ভূগোল লিখেছেন, তাঁরা জন্মগতভাবে আরব ছিলেন না।

মক্কা ও মদিনার ইতিহাস ও ট্রাডিশনের বেশির ভাগ লিখেছেন মুহাম্মদ আল-আজরাকি (মৃ. ৮৫৮) তার দাদা কর্তৃক সংগৃহীত তথ্যগুলোকে বিস্তার করেছেন। ইনি ঘাসান খ্রিস্টান প্রিন্সের বংশধর।

আহমদ আল-ইয়াকুবী (মৃ. ৮৯৭) ছিলেন ইতিহাস ও ভূগোলবিদ। তিনি বিশ্ব ইতিহাস লিখেছেন আদম থেকে যিশু পর্যন্ত, সাথে সংযুক্ত ছিল ইসলাম-পূর্ব মিসর, নিনেভ, ব্যাবিলন, ভারত, চীন, গ্রিস, রোম, রাজ-রাজড়াদের লিস্টসহ প্রফেট মোহাম্মদের সময় থেকে ইসলামের ইতিহাস।

আল মাসুদী সম্বন্ধে বেশি কিছু জানা যায় না কিন্তু তাকে 'আরবদের প্লিনি' (Pliny) বলা হয়। তিনি নাম করা পর্যটক ছিলেন, চীন দেশ পর্যন্ত ভ্রমণ করেছেন। অন্যান্যদের মতো তিনি আরবি ভাষায় লিখেছেন, কিন্তু নিজের সম্বন্ধে কিছু লিখে যাননি; সম্ভবত তিনি অ-আরব ছিলেন। ইতিহাস বিশ্বকোষ তিরিশ খণ্ডে লিখে গেছেন তার মধ্যে দু'টি খণ্ড আমাদের হাতে এসেছে।

অ-আরব ঐতিহাসিক, যারা আরবিতে লিখেছেন, তাদের মধ্যে আল-তারাবি (মৃ. ৯২৩) ছিলেন পার্সিয়ান। গিবস তাকে বলতেন 'আরবদের লিভি' এবং বারুনী (মৃ. ১০৫০) ছিলেন আর্মেনিয়ান। বারুনী প্রায় ৪০ বছর ভারতে ছিলেন এবং ভারত সম্বন্ধে তার বর্ণনা বিখ্যাত হয়ে আছে। বারুনী একজন জ্যোতির্বিদও। তিনি একটা যন্ত্র আবিষ্কার করে মুসলিম ক্যালেন্ডারের তারিখ হিসাব করেন, কিন্তু ব্যবহার করেছিলেন বাইজানটাইন মাস যার জন্য তাকে 'বিধর্মী' (infildel) অপবাদ দেয়া হয়।

বিখ্যাত ভূগোলবিদ ইদ্রিসি (মৃ. ১১৪০) সিসিলিতে নরম্যান রাজা দ্বিতীয় রোজারের রাজসভায় কাজ করেছেন। রাজা রোজার তাকে বিশ্বসম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে লিখতে বলেন যা তিনি সম্পূর্ণ করেছিলেন ম্যাপ ও একটি রুপার গ্লোবসহ। ঐতিহাসিক ইয়াকুব ইবন আবদুল্লাহ (মৃ. ১২২৯) শহর ও স্থানের ডিক্সনারি ও গেজেটিয়ারের রচয়িতা ছিলেন। জন্মগতভাবে তিনি ছিলেন আনাতোলিয়ান গ্রিক এবং মুসলিম ভূগোলবিদদের মধ্যে অন্যতম।

ইবনে সাঈদ (মৃ. ১২৭৪) পশ্চিম আফ্রিকান উপকূলে জরিপ করে একটি জরিপ পুস্তক রচনা করেন। তিনি ছিলেন আন্দালুসিয়ান (স্পেন)। ইবন খালিকান (মৃ. ১২৮২) জীবনচরিতের ডিক্সনারি রচনা করেন। তিনি বিখ্যাত বারমিকিডের বেট্রিয়ান পরিবারভুক্ত ছিলেন। ইবন বতুতা (মৃ. ১৩৬৯), যিনি সমস্ত মুসলিম দেশ ভ্রমণ করেন, ছিলেন একজন মরোক্কান। তিনি পরিভ্রমণ করেন আফ্রিকা, সিলোন এবং মালদ্বীপ। ইবন খালদুন (মৃ. ১৪০৬) মুসলিম দার্শনিকদের মধ্যে বিখ্যাত ছিলেন। তিনি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়ের ওপর জোর দিয়ে ইতিহাস রচনা করেছেন। তিনি তিউনিসিয়ার লোক।

১৩.১৩ ওষুধ ও চিকিৎসা

ইসলাম-পূর্ব আরব কবিদের লেখা থেকে জানা যায় যে প্রাচীন আরবরা তাদের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান দিয়ে গাছগাছড়া থেকে ওষুধ তৈরি করে অসুখ-বিসুখের চিকিৎসা

www.pathagar.com

করত; কিছুটা কাটা-ছেঁড়া করতেও পারত, কিন্তু বৈজ্ঞানিকভাবে চিকিৎসার জ্ঞান আরবের বাইরে থেকে অর্জন করেছে। অন্যান্য দেশের মতো খ্রিস্টান আরবগণ রোগীদের ও বৃদ্ধব্যক্তিদের যত্ন নিত ও তাদের কল্যাণের প্রতি নজরও দিত। তীর্থ যাত্রী ও পথিকদের জন্য তারা বিশ্রাম ঘর তৈরি করে গরিব ও দুস্থ ব্যক্তিদের জন্য খাদ্যও পানীয়ের ব্যবস্থা রাখত, তাছাড়া হাসপাতালের ব্যবস্থাও ছিল রোগীদের চিকিৎসার জন্য।

পঞ্চম শতাব্দিতে টাইগ্রিস নদীর তীরে এজিকেলের মঠ তৈরি হয়, সেখানে পাগল ও পরিত্যক্ত সন্তানদের খাওয়া ও থাকার বন্দোবস্ত ছিল এবং সারা মধ্যপ্রাচ্য জুড়ে এর নামডাক ছিল।

মুসলিম রাজ্য বিস্তারের পঞ্চম শতাব্দিতে চিকিৎসাবিদ্যা ও ওষুধে খ্রিস্টানদের একচেটে আধিপত্য ছিল। শোনা গেছে বেশির ভাগ খ্রিস্টান ও কিছু ইহুদি চিকিৎসক মুসলিম দেশগুলোতে এবং তাদের ডিসপেন্সারিতে নেস্টোরিয়ান খ্রিস্টানদের লিখিত মেডিকেল বইপত্র ব্যবহৃত হয়েছে।

৭০৭ খ্রিস্টাব্দে জান্দিশাহপুরে নেস্টোরিয়ানদের হাসপাতালের নমুনা দেখে, উমাইয়া খলিফা প্রথম ওয়ালিদ ইসলামী রাজ্যে সর্বপ্রথম হাসপাতাল তৈরি করেন। তারপর ৮০০ খ্রিস্টাব্দে আব্বাসি খলিফা হারুন-অর-রশীদ, খ্রিস্টান বখত-ইস্যু পরিবারের এক সদস্যের উদ্যোগে, বাগদাদে প্রথম হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন। এর দেখাদেখি দশম শতাব্দির শুরুতে আরও চারটি হাসপাতাল তৈরি হয়।

তখন খিলাফতের অধিকাংশ চিকিৎসক হিপোক্রাফ্ট (৩৫০ খ্রিঃ পূ) ও গ্যালেনের (২১০ খ্রিঃ) স্কুলের পদ্ধতি অনুসরণ করত। এগারো শতাব্দির শেষের দিকে একজন মিসরীয় চিকিৎসক হ্যালি রোডোয়াম দাবি করেন যে তিনি তার পেশাগত বিদ্যায় হিপ্পোক্র্যাটিক পদ্ধতির যাবতীয় টেকনিক অর্জন করেছেন।

সার্জারিতে সরল অপারেশন এবং সিজারিয়েন পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। সেই সময় ইসলামী দেশগুলোতে কাটাছেঁড়ার ব্যাপারে ছুৎমার্গ থাকায় এ বিষয়ে বেশি দূর উন্নতি সম্ভব হয়নি। তারপর এজিনার পলের লিখিত সার্জারি সম্বন্ধে পুস্তক অনূদিত হবার পর এ বিষয়ে কিছুটা উন্নতি হয়।

উমাইয়া ও আব্বাসি খলিফারা তাদের চিকিৎসার জন্য বেশি নির্ভর করতেন খ্রিস্টান চিকিৎসকদের ওপর। আব্বাসি খলিফা মনসুর যখন অসুস্থ হতেন, তিনি তাঁর ব্যক্তিগত চিকিৎসক জার্জিস ইবন গ্যাব্রিয়েলকে (মৃ. ৭৬০) ডেকে পাঠাতেন। জার্জিসকে তিনি বাগদাদের মেডিকেল ফ্যাকাল্টির প্রধান হিসাবে নিযুক্ত করেন। জান্দিশাহপুরের শিক্ষিত জার্জিস বাগদাদে মেডিকেল গবেষণার কাজে যথেষ্ট অবদান রাখেন।

জার্জিস ইবন গ্যাব্রিয়েল খ্রিস্টান পরিবার বখত ইসু সদস্য; এই পরিবার অষ্টম শতাব্দি থেকে এগার শতাব্দি পর্যন্ত সপ্তম জেনারেশন ধরে বিখ্যাত চিকিৎসক সরবরাহ করেছে। তারা রাজসভা চিকিৎসক হিসাবে খলিফা হাদি (মৃ. ৭৮৮) এবং খলিফা হারুন-অর-রশিদ (মৃ. ৮০৯) এবং আরও কতিপয় খলিফার রাজসভায় কাজ করেছেন এবং গরিব ও দুস্থদের জন্য বিনামূল্যে ডিসপেনসারি তৈরি করার দায়িত্ব পালন করেন।

www.pathagar.com

ইউহানা ইবন ম্যাসাওয়ে, একজন নেস্টোরিয়ান চিকিৎসক আব্বাসি দরবারে কাজ করেন। তিনি গ্যালেনের লিগ্যাসিকে বিস্তৃত করেন। তার কাজ পারস্য চিকিৎসক হ্যালি আব্বাস (মৃ. ৯২৮)কে সরাসরি প্রভাবিত করা। তার লিখিত মেডিসিনের ওপর এনসাইক্লোপেডিক সার্ভে ল্যাটিনে অনূদিত হয় এবং পশ্চিমে জনপ্রিয়তা লাভ করে, যতদিন পর্যন্ত না আবু সিনার ক্যানন প্রকাশিত হয়েছিল। আবু সিনাকে 'ইসলামের গ্যালেন' বলা হতো। তিনি মারা যান ১০৩৭ খ্রিস্টাব্দে। ম্যাসাওয়ে চক্ষু-চিকিৎসা সম্বন্ধে আরবি ভাষায় প্রথম পুস্তক রচনা করেন। এই পুস্তক আল-হ্যাজেন (মৃ. ১০৩৮)কে প্রভাবিত করলে তিনি চক্ষু চিকিৎসা সম্বন্ধে এক বিখ্যাত পুস্তক রচনা করেছেন।

বাগদাদের খ্রিস্টান চিকিৎসক, দার্শনিক ও ধর্মবেত্তা ইবন বুতলদান (মৃ. ১০৬৬) গ্যালেনের সমালোচনা করে একটা বিতর্কিত থিসিস লেখেন দেহ তত্ত্ব বিষয়ক কতকগুলো মৌলিক নীতির ওপর। তিনি একটি মূল্যবান পুস্তক রচনা করেন। যেখানে তার সমসাময়িক পণ্ডিত ব্যক্তিদের নাম উল্লেখ করেন যারা বিজ্ঞান, দর্শন ও সাহিত্যে পণ্ডিত ছিলেন।

উল্লেখযোগ্য যে, বিখ্যাত ধর্মবেত্তা আল-গাজ্জালী ইবন বুতলানের মেডিকেল বই পুস্তকগুলোকে বিশ্লেষণ করেন। এই সময়ে ইবন তিলমিদ সাধারণ মেডিকেল প্রাকটিস ও সার্জারির যথেষ্ট উন্নতি সাধন করেন। তিলমিদ (মৃ. ১১৬৫) খ্রিস্টান ছিলেন।

একজন জোকোবাইট খ্রিস্টান আবুল ফারাজ বলেও পরিচিত বহু ভাষাবিদ ছিলেন। তিনি হিব্রু, সিরিয়াক, আরাবিক ও গ্রিক ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন। তার নাম ছিল জর্জিয়াস বার হেব্রাউস (মৃ. ১২৮৬)। তিনি দর্শন, বিজ্ঞান ও চিকিৎসাবিদ্যা সম্বন্ধে মূল্যবান পুস্তক রচনা করেন। এছাড়া তিনি পৃথিবীর ইতিহাসও রচনা করেছেন।

খ্রিস্টান চক্ষু চিকিৎসক আলী ইবন ঈসা (মৃ. ১২৯০) বাগদাদবাসী ছিলেন। তার অন্য নাম ছিল জেসু হালি। চক্ষু চিকিৎসা সম্বন্ধে একটি পুস্তক রচনা করে তিনি বিখ্যাত হন। এই পুস্তকটি হ্যান্ড বুক ছিল ১৭৫০ সাল পর্যন্ত, আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান শুরু না হওয়া পর্যন্ত।

বিশ্বে সেই সৃজনশীল দিনগুলো আর নেই, যদিও ছোটখাটো কিছু হচ্ছে তাও আগেকার উৎস থেকে নকল, মৌলিক কিছু নয়।

১৩.১৪ বিজ্ঞান

ফরাসি লেখক আর্নেস্ট রেনন বলেছেন আরবরা বলতে গেলে গ্রিকদের ছাত্র এবং তথাকথিত আরব বিজ্ঞান হলো গ্রিক বিজ্ঞানের ধারাবাহিকতা ছাড়া অন্য কিছু নয়। কিন্তু আরব বিজ্ঞানের মূল খুঁজতে গেলে গ্রিক নয়, খুঁজতে হয় মেসোপটেমিয়া, চীন ও ইন্ডিয়ায়।

উন্নত গণিত ও জ্যামিতি ব্যাবিলনের হাম্মুরাবির সময় থেকে অজানা নয়। তখন কাল ছিল ১৭৫০ খ্রিঃ পূর্বাব্দ। প্রাচীন ব্যাবিলন মেকানিকস ও হাইড্রলিক্সে উন্নত ছিল, আর সেই সূত্রে সেচ কর্ম খাল প্রকৌশল (Canal Enginering) ও বন্যা নিয়ন্ত্রণে বিশেষজ্ঞ ছিল। তাছাড়া জমি জরিপ এবং প্রাচীন বিশ্বে গ্রহ, নক্ষত্রের চর্চা ছিল উন্নত

www.pathagar.com

ধরনের। আরবে নক্ষত্রদের নাম ছিল অ্যালদেবারেন, অ্যালটাইর, রিগেল ও বেতেলজেউস– এদের চার্ট ব্যাবিলনেই তৈরি হয়।

তেমনি ইসলামী বিশ্বে বিখ্যাত অবজারভেটরি প্রাচীন বিশ্বের মতো। ব্যাবিলিয়নের জিগ্‌গুরাত (Ziggurat), কথিত আছে, মন্দির ও অবজারভেটরি উভয় অর্থেই ব্যবহৃত। গ্রিক অবজারভেটরি রোডেসে তৈরি হয় হিপ্পারকাসের দ্বারা ১৫০ খ্রিঃ পূর্বাব্দে। হিপ্পারকাস নক্ষত্রবিদ্যায় উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার করেছেন।

ইসলাম-পূর্ব অবজারভেটরি ছিল পারস্যের জান্দিশাহ্‌পুরের নেস্টোরিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ঢঙে সিন্দ ইবন আলি (মৃ. ৮৫০) বাগদাদে আর একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। যশস্বী আরব জ্যোতির্বিদ আলবেটেগনিয়াস (Albategnius), (মৃ. ৯১৫) যার নাম কোপারনিকাস তার পুস্তক De Revolutionibus-এ উল্লেখ করেছেন, তিনি ছিলেন উত্তর মেসোপটেমিয়ার নক্ষত্র পূজারী সাবিয়েন সম্প্রদায়ভুক্ত। উজবেক জ্যোতির্বিদ আল-খারাজমি (মৃ. ৯৭৫) যে অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল টেবল রচনা করেছিলেন ইন্ডিয়ার হিন্দু জ্যোতির্বিদদের-অনুকরণে এবং সেখানে যে অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশ চিহ্নিত করা হয় তার বেশিরভাগের সূত্র টলেমি নির্ভর।

তথাকথিত আরব সংখ্যা- চিহ্ন (numeral) বলা হয় ইন্ডিয়া অরিজিন এবং ডেসিম্যাল পদ্ধতি ইত্যাদি চীন দেশ থেকে আহরিত (Needham, 1969 P. 12)। সিরিয়ান বিশপ সার্ভেরাস (৬৮০) ইন্ডিয়ান পদ্ধতির গুণগান করে একটি প্রবন্ধ লিখেন যা আরবদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

এটাও লক্ষণীয় যে আরবরা যা আবিষ্কার করেছে বলে ধরা হয় তারও পূর্ব সূত্র ছিল। যেমন নাবিকদের কম্পাস কোনো একটা দিকে চায়নিজ, কার্থেজিয়ান ও নর্সম্যানদের সম্পৃক্তি ছিল। সূর্যের ও অন্যান্য গ্রহের অলটিচুড মাপার যে যন্ত্র আরবদের আবিষ্কার বলে লোকে মনে করে, অন্যান্যদের সাথে গ্রিকদের সম্পর্ক ছিল। স্থানীয় আবিষ্কারের মধ্যে মেকানিকেল খেলনা, ওয়াটার ক্লক ইত্যাদি আলেক্সান্দ্রিয়ার হিরোককে মূল সূত্র বলা হয় যার কথা জানা যায় থাবিত ইবন কুররা অনুবাদ কর্ম থেকে। ঐতিহাসিকদের মতে, আব্বাসি খলিফা হারুন-অর-রশিদ শার্লামেনের কাছে একটি ওয়াটার ক্লক মুসলিম আবিষ্কার বলে উপহার রূপে পাঠিয়েছিলেন।

রসায়ন ক্ষেত্রে আরবদের যে অবদানের কথা বলা হয় সম্ভবত মিসরীয় (আলেক্সান্দ্রিয়ান) আরজিন। যেমন এলকোহল, এলিক্সির, এলেমাবিক, কারবয়, অ্যালকালি, নাফথা, নেট্রন, অ্যালকেমি, বোরাক্স, ট্যাল্ক এবং বেনজিন ঐতিহাসিকভাবে, প্রথম মুসলিম অ্যালকেমিস্ট ছিলেন খালিদ (মৃ. ৬৮০)। খালিদ ছিলেন ১ম এজিদের পুত্র। খালিদ আলেক্সান্দ্রিয়ার দার্শনিক অ্যালকেমিস্ট স্টিফেনাস-এর (মৃ. ৬৪১) লেখা পুস্তক পড়ে রসায়নে আগ্রহ বাড়ে এবং তিনি সিরিয়ার খ্রিস্টান সাধু মরিনিয়াস রোমানাসের কাছ থেকে অ্যালকেমিক্যাল প্রক্রিয়া সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করেন। এই খ্রিস্টান সাধু নিজেই মিসরের আলোন্দ্রিয়া থেকে আলকেমি সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ করেন।

কয়েকজন আরব দার্শনিক ও অ্যালকেমিস্ট ছিলেন। তাদের মধ্যে অন্যতম

www.pathagar.com

ছিলেন জাবির ইবন হাইনে (মৃ. ৮১৬)। ইনি হাররানের সাবিয়েন ছিলেন এবং সালফারিক এসিড ও হাইড্রোক্লোরিক এবং নাইট্রিক এসিড মিশিয়ে একোয়া রেজিয়া (রয়েল ওয়াটার) আবিষ্কার করেন। এই একোয়া সোনা ও প্লাটিনামকে দ্রবীভূত করতে পারত। এদের মধ্যে নামকরা তিনজন ছিলেন জুন নুন (মৃ. ৮৫৯০), রাজী (মৃ. ৯৪০) এবং আল ফারাবি (মৃ. ৯৫০)।

আরবরা স্পেনে অ্যালকেমি নিয়ে যায় এবং সেখানে উত্তর আফ্রিকা থেকে ম্যাজিক ও অন্যান্য দ্রব্য মিলিয়ে জাদুবিদ্যা উদ্ভাবন করেন। এই জাদু বা গুপ্তবিদ্যার শিক্ষা কেন্দ্র খোলা হয় গ্রানাডা, সেভিল ও কর্ডোভার বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং সেখান থেকে দক্ষিণ দিকের চাহিদা পূরণ করা হয় এবং উত্তর দিকে চাহিদা পূরণের জন্য কেন্দ্র খোলা হয় টলেডো, সালামানকা ও সারাগোসাতে।

মেটালারজি, ড্রাগ, অ্যালকেমি, অ্যাস্ট্রোনমি এবং অন্যান্য বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রে নামকরা লেখক ছিলেন জাবের (মৃ. ১২৯০)। তার ল্যাটিন নাম ছিল জাবিন-ইবন আফলাহ্। আর একজন বিখ্যাত লেখক ছিলেন খাজিনি (মৃ. ১২১০)। তিনি ছিলেন বাইজানটাইন গ্রিক এবং ওজন করা মেসিন সম্বন্ধে পুস্তক রচনা ছাড়া আরও অনেক বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় পুস্তক রচনা করে অনেক সমস্যার সমাধান করেছেন।

১৩.১৫ দর্শন

গ্রিক 'ফিলসোফস' থেকে আরবিতে হয়েছে 'ফিলাসুফ' অর্থাৎ দার্শনিক এবং এই নামের সাথে অনেক গ্রিক দর্শন আরবে ঢুকে গেছে। পিথাগোরাস এবং প্লেটো থেকে রোমান স্টোইক (দার্শনিক জেনোর শিষ্য) পর্যন্ত ইসলামী দর্শনকে সমুন্নত করেছে। গ্রিক দর্শনের কেন্দ্রভূমি ছিল– হেলিনস্টিক স্কুল অব টলেমিজ্, সেলুসিড এবং বাইজানটাইন।

অন্যান্য ফ্যাক্টর থেকেও মুসলিম দর্শনের বিবর্তনকে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছে। অন্যান্য প্রাচীন ধর্মমত, যেমন– বুড্ডিইজম, জোরাস্ত্রিজম, জুদাইজম ও খ্রিস্টানিটি, বিজয়ী মুসলিম নতুন নতুন চিন্তাধারার সংমিশ্রণে পুরানো ও নতুন মিলে একটা খিচুড়ি দর্শন হয়েছে (আর্নল্ড ও গিয়োম ১৯৬৫ পৃ. ২৩৯)।

ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়ে অনেকে পুরনো বিশ্বাস ভুলতে পারেনি যা কালক্রমে ইসলামের সাথে মিশে সংশোধিত হয়ে নতুন ধারণায় পরিণত হয়েছে। ফলে ইসলামাইজেশন কখনো পরিপূর্ণ হয়নি অনেক স্থানে; তাই যখন পরিপূর্ণতা লাভ করেছে তখন দেখা গেছে ইসলামের আর ইসলামিত্ব থাকেনি, নবরূপে উদিত হয়েছে।

আরব থেকে অ-আরবরা কোরান পাঠে বেশি আগ্রহী ছিল এবং তারাই ছিল ধর্মীয় দর্শনের প্রবক্তা। ফলে অ-আরব মুসলিম যারা বেশি চর্চা করত তারাই ব্যাখ্যা দিয়েছে এবং এই ভাবে শরিয়ত সংশোধিত হয়ে স্থানীয় প্রথা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কোরানের বিখ্যাত তফসিরকারদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন কাব আল-আহবার (মৃ. ৬৫৫) ছিলেন ইহুদি; ইকরামা (মৃ. ৭২৩) ছিলেন বার্বার আরজিন; মাকহুল (মৃ. ৭৩১) ছিলেন আফগান; আতা ইবন রাহাব (মৃ. ৭৩২) ছিলেন আফ্রিকান বংশধর এবং এজিদ ইবন আবু রাহিব (মৃ. ৭৪৫) ছিলেন নুবিয়েন।

www.pathagar.com

প্রথমে আরবদের কোনো স্বচ্ছ ধর্মীয় জুরিসপ্রুডেন্স ছিল না এবং ধর্মবেত্তাগণ, (মুতাকালিম বা প্রবক্তা) বিদেশীদের (খ্রিস্টানসহ) সাথে তর্কাতর্কির পর ধর্মীয় আইন কোড উন্নত করতে শুরু করেন। এই রূপে দামেস্কোর জন (মৃ. ৭৪৯) এবং থিওডোরাস আবুকারা (মৃ. ৮৫০), হাররানের মেলচাইট বিশপ এই বিষয়ে যথেষ্ট অবদান রেখেছেন (আমীর আলী, ১৯৬৫, পৃ. ৩৬৫)।

অমুসলিমদের সাথে এই মুখোমুখি বাক্যব্যয়ের কারণে মুসলিম ধর্মবেত্তাগণ তাদের দুর্বলতা কাটিয়ে ধর্মীয় ব্যাপারে তর্ক করার আর্ট শিখে ফেলে এবং অমুসলিমদের শেখানো অস্ত্রে মুসলিম ধর্ম পণ্ডিতরা অমুসলিমদের আক্রমণ করতে থাকে (মাকদিসি ১৯৮১, পৃ. ১০৫)।

মুসলিম চিন্তাবিদদের ইতিহাসে বহু বিখ্যাত পণ্ডিতের নাম জুড়ে আছে, তাদের মধ্যে অনেকেই বহুমাত্রিক ছিলেন অর্থাৎ বিবিধ বিষয়ে পণ্ডিত, যেমন ইতিহাস, ভূগোল, গণিত, নক্ষত্রবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, ভাষাবিদ্যা, সঙ্গীত ও ধর্ম সব ক্ষেত্রেই পণ্ডিত। গ্রিক চিন্তাবিদদের সাহচর্যে এসে তর্কবিদ্যা ও যুক্তিবিদ্যাকে ন্যায়সঙ্গত বিবেচনা করেন এবং যুক্তিবিদ্যাকে ধর্ম ও রহস্যবিদ্যার ওপরে ঠাঁই দিয়ে যুক্তিবাদী হয়ে ওঠেন। এর পর তাঁরা যেসব রচনা করেছেন তা যুক্তিতর্কের ওপরে ভিত্তি করেই করেছেন এবং তা ধর্মবেত্তাদের বক্তব্যের বিপরীতে দাঁড়িয়েছে।

ইসলাম দর্শনের পিতা ছিলেন আল-কিন্দি (মৃ. ৮৬৮), পশ্চিম দেশে আলকিন্দুস বলে পরিচিত। তিনি খ্রিস্টান গোত্র কিন্দা পরিবারের মানুষ, তাই নাম হয়েছিল আল-কিন্দি। আল-কিন্দি একমাত্র দার্শনিক, যিনি খাঁটি আরব রক্তের। আলফ্রেড গিয়োম তার সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেছেন– 'আরবের প্রথম এবং শেষ দার্শনিক' (Arnold and Guillaume 1965, P. 251)। আল-কিন্দি গ্রিক দর্শন ও আরবিতত্ত্বের সংমিশ্রণে এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন করেন এবং গ্রিক দর্শনকে ইসলামী বিশ্বে গ্রহণযোগ্য করে তুলেন। তিনি খলিফা মামুনের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে পরে খলিফা মুতাসিমের এক পুত্রের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হন।

দার্শনিক এবং চিকিৎসক আল-রাজী পার্সিয়ান ছিলেন। পশ্চিমে রাজেস (মৃ. ৯২৫) বলে পরিচিত। পারস্যের রাই শহরে জন্মগ্রহণ করেন এবং বাগদাদে শিক্ষা লাভ করেন। খ্রিস্টান পণ্ডিত হুনায়েন ইবন ইসহাকের এক শিষ্যের সাগরেদ ছিলেন। পরের বছরগুলোতে তিনি মেসোপটেমিয়ার উত্তরে হাররানের গ্রিক স্কুলের সাথে জড়িত ছিলেন এবং সেখানে প্লেটোর 'তিমাউস' (Timaeus) দ্বারা প্রভাবিত হন। যুক্তিবাদের ওপর জোর দিয়ে বলেন, একমাত্র যুক্তিই মানুষকে দিকনির্দেশনা দিতে পারে এবং 'ওহী'কে মিথ্যা প্রমাণিত করে মন্তব্য করে, ধর্ম বিপজ্জনক বস্তু। (Hourani 1991, P. 78)।

মুসলিম দার্শনিকগণ এরিস্টটলের নীতির ওপর বিশ্বাসী ছিলেন। অভিজ্ঞতা লাভ হয় পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ দ্বারা এবং এই দৃষ্টিভঙ্গির মধ্য দিয়ে তারা নিজেদের ধারণাকে বিকাশ করে বিখ্যাত হয়েছেন। তুর্কি দার্শনিক আল-ফারাবি (মৃ. ৯৫০) আমু দরিয়ার নিকট ফারাব শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাগদাদে এসে খ্রিস্টান শিক্ষকদের কাছ থেকে সঙ্গীত, দর্শন ও গ্রিক বিজ্ঞানে জ্ঞান লাভ করেন। প্লেটোনিজম ও নিও-প্লেটনিজিম দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন এবং বিশেষ করে এরিস্টটল দর্শন তাকে

www.pathagar.com

এমনভাবে প্রভাবিত করেছিল যে তিনি নিজেই দ্বিতীয় এরিস্টটল হিসাবে পরিচিতি লাভ করেন।

আর একজন বিখ্যাত মুসলিম দার্শনিক পণ্ডিত আবু সিনা (মৃ. ১০৩৭)। ইনি বুখারায় জন্মগ্রহণ করেন এবং বল্‌খে লেখাপড়া করেন। এই বল্‌খ একদিন ছিল বুড্ডিস্ট ও জোরাস্ট্রিয়ান শিক্ষা কেন্দ্র। তিনি কয়েকটি ক্ষেত্রে, বিশেষ করে চিকিৎসাবিদ্যায় বিশাল অবদান রেখে গেছেন। গ্রিক দর্শনকে তিনি আরো বিস্তৃত করেন, বিশেষ করে এরিস্টটলের ওপর এবং মুসলিম বিশ্বে এই দর্শনের ব্যাপ্তি এনে দেন। এই কারণে তাকে তৃতীয় এরিস্টটল বলা হয়। পশ্চিমে এই বিখ্যাত দার্শনিক 'এভিসিনা' বলে পরিচিত।

আল গাজ্জালি বা আল গ্যাজেল পারস্যের তুস শহরে জন্মগ্রহণ করেন এবং বাগদাদে ১০৯৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত শিক্ষা লাভ করেন। পরে কিছু সময়ের জন্য তিনি লেখাপড়া ছেড়ে সুফিবাদ গ্রহণ করেন, যদিও অর্থোডক্স মুসলিম ছিলেন। তিনি কঠিন ধর্মীয় তত্ত্ববাদী আল-ফারাবি ও আবু সিনার সমালোচনা করেন এবং ধর্মীয় বা ঈশ্বর তত্ত্বকে দর্শনের ওপরে ঠাঁই দেন; পরে তিনি রহস্য কবি রুমী কর্তৃক অভিযুক্ত হন এই বলে যে আল-গাজ্জালীর সত্যিকার অর্থে আধ্যাত্মিকতার অভাব ছিল, যে অধ্যাত্মবাদ তার ছোট ভাই আহম্মদ আল গাজ্জালীর লেখায় প্রকাশ পেয়েছিল, আহম্মদ আল-গাজ্জালী প্রেমতত্ত্বের ওপর রহস্যবাদের পুস্তক রচনা করেছিলেন।

অবশেষে বড় ভাই আল-গাজ্জালীর শিক্ষা পূর্ব দিকের মুসলিম জগতে জয়ী হয় সাধারণ দর্শনের ওপর এবং অর্থোডক্স ইসলাম চেপে বসে; যদিও মুরিশ স্পেনে ইবন বাজ্জা (মৃ. ১১৩৮) বা এভেম্পেস (Avempace)-এর লেখনীর মাধ্যমে সাধারণ দর্শনশাস্ত্র আগের মতোই চলতে থাকে। ইবন বাজ্জা দর্শন ছাড়া, চিকিৎসা, মেটিরিওলজি, গণিত এবং সঙ্গীতে লেখালেখি করে এই সব ক্ষেত্রে যথেষ্ট অবদান রেখেছেন। দার্শনিক আবুবেকার বা ইবন তুফায়েল (মৃ. ১১৮৫) গণিত চিকিৎসাবিদ্যা ও স্বাধীন জীবনের অপর দর্শন সম্বন্ধে নতুন তথ্যের দ্বার উদঘাটন করেন।

আন্দালুসিয়ান দার্শনিক এভেরুশ (আবু রুশদ) (মৃ. ১১৯৮) এরিস্টটলকে 'পার্ফেক্ট ম্যান' 'আদর্শ মানব' বলে আখ্যায়িত করেন। তিনি গ্রিক মাস্টার এরিস্টটলের ওপর অরিজিনাল তফসির লিখেছিলেন এবং তফসিরকার বা ব্যাখ্যাকার আখ্যা লাভ করেন। তিনি এরিস্টোটলিয়ন টার্মে কোরানের ব্যাখ্যা করেন এবং মুসলিম দর্শনের একটি পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করেন যা পরে ধর্মবিরুদ্ধ মতামতের কর্মশালা রূপে দাঁড়ায়। আবু রুশদ কর্ডোভাতে বিচারকের পদ অলংকৃত করেন কিন্তু তার ধর্মবিরুদ্ধ মতামতের জন্য চাকরিচ্যুত হয়ে নির্বাসিত হন। আর্নেস্ট রেনান আবু রুশদকে যুক্তিবাদী মানুষরূপে বর্ণনা করেন এবং তাকে মুক্তচিন্তার জনক বলে আখ্যায়িত করেন।

আল ফারাবি, আবু সিনা ও আবু রুশদ্ এরিস্টটলের শিক্ষার অনুসারী ছিলেন এবং এমন সব মতামত প্রকাশ করেন যা ইসলামের মৌলিক নীতিবিরুদ্ধ। সুতরাং এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই যে অর্থোডক্স ধর্মবিদরা এই সব প্রাচীন মতামত ও শিক্ষা-দীক্ষার (ইলম্ উল কাদিম) ধারণাকে রুখে দাঁড়াবেন। কেননা এই সব শিক্ষা

www.pathagar.com

ও মতামত অমুসলিম সূত্র থেকে আহরিত। তারা গ্রিক দর্শন ও সেকুলার জ্ঞানকে অবিশ্বাস করেছে কারণ তারা বিশ্বাস করত এই শিক্ষা ও মতবাদ ইসলামে গণ্ডগোল সৃষ্টি করে বিভিন্ন গোষ্ঠীতে মুসলিম উম্মাহকে ভাগ করে দিবে।

সাধারণত দর্শনবিদ্যাকে তা মুসলিম হোক আর অমুসলিম– সন্দেহের চোখে দেখা হয়েছে। মুক্তচিন্তা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বার বন্ধ করে দেয়া হয় এবং যেমন খ্রিস্টান রাজ্যে হয়েছিল তেমনি বিরুদ্ধ মতাবলম্বীদের অত্যাচারিত ও নিপীড়িত হয়ে হয়েছে।

ত্রয়োদশ শতাব্দির শেষ দিকে এটা স্পষ্ট হয়ে দেখা দিল মুসলমানরা শিক্ষার যে কোনো ক্ষেত্রে, যেমন বিজ্ঞান, চিকিৎসাবিদ্যা ও দর্শন, সব ধরনের পদক্ষেপ নেয়া থেকে সম্পূর্ণরূপে স্তব্ধ হয়ে গেল মোল্লাদের গায়ের জোরে এবং আস্তে আস্তে শিক্ষা ও জ্ঞানের সূর্য মুসলিম বিশ্ব থেকে অস্তমিত হয়ে পশ্চিমে উদিত হলো; আর মুসলিম-বিশ্ব ডুবে গেল গাঢ় অন্ধকারে। এর জন্য দায়ী আল-গাজ্জালী ও আল-আশারীর একগুঁয়েমি।

১৩.১৬ সুফিবাদ

ইসলামের অঙ্গ হিসাবে সুফিবাদ পশ্চিমে অতি সমঝোতার সাথে স্বীকৃত। সুফিবাদকে মনে করা হয় বিশ্বজনীন একটা বিশ্বাস (universal faith)। উদার শিক্ষানীতি ও সহিষ্ণুতার মতবাদ এই সুফিবাদ।

বিভিন্ন দল, গোষ্ঠী ও তরিকার সংমিশ্রণে এই সুফিগোষ্ঠী সংঘবদ্ধ সর্বেশ্বরবাদে গুপ্ত আধ্যাত্মিক ভাবধারা (mysticism), নির্গমন (emanation), স্বর্গীয়ে জ্যোতিকে আলোকিতকরণ (illumination)-এর মোহান্বিত অবস্থায় সুফিদের অবস্থান যা কট্টর অর্থোডক্সের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। তারা ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক বিবর্তনের কাছে শরিয়া আইনের মূল্য নগণ্যই প্রদান করে। সুফিবাদের প্রথম দিকে সাধকগণ ছিলেন মরমীবাদের স্থলে প্রকৃতপক্ষে সংযমী ও সংসারত্যাগী এবং মানসিকভাবে প্রশান্ত। ব্যক্তি বিশেষের মাঝে সমস্ত অশুভ অকৃত্রিম ও কুচিন্তার ধ্বংস সাধন করা 'ফানা' বা আত্মশুদ্ধির মাঝে। 'ফানা' অর্থাৎ লীন প্রাপ্তি ভারতীয় নির্বাণ পদ্ধতির অনুরূপ। নির্বাণের সাথে পার্থক্য এই যে 'ফানা' বা আত্মশুদ্ধিতে মোক্ষলাভ হয় না; এর পর 'বাকা' স্তর অর্থাৎ সাধক প্রেমিকের আত্মা সৃষ্টিকর্তার আত্মার সাথে বিলীন হয়ে যাওয়া।

সুফি শব্দের উৎস অনেকের মতে গ্রিক শব্দ জ্ঞান (Sophia) থেকে উদ্ভূত, কিন্তু এটা সর্বজন স্বীকৃত যে, 'সুফ' (পশম - wool) থেকে সুফি শব্দের উৎপত্তি। খ্রিস্টান সাধুদের মতো মুসলিম সন্ন্যাসীগণ সংসার ত্যাগ করে পশমের লম্বা কোট পরিধান করেন সিরিয়ান সাধুদের মতো। এই লম্বা কোটকে 'খিরকা' (cloak) বলা হতো। খিরকা বিভিন্ন রঙের কম্বল থেকে তৈরি করা হতো।

প্রফেট মোহাম্মদ স্বাভাবিক কারণেই মুসলিম সমাজ থেকে বৈরাগ্যবাদ নিষিদ্ধ করেছিলেন– জুহুদের (zuhd) বিরোধী ছিলেন। 'লা রাহবানিয়াত ফিল ইসলাম'– কি এই প্রসিদ্ধ হাদিসের অর্থ হচ্ছে, ইসলামে বৈরাগ্যের (manasticism) ঠাঁই নেই।

www.pathagar.com

কোরানের মতে খ্রিস্টানরা বৈরাগ্যবাদ আবিষ্কার করেছিল ঈশ্বরকে খুশি করতে কিন্তু তারা সম্যকরূপে পালন করতে ব্যর্থ হয়েছে। কোরান বলেছে– "কিন্তু বৈরাগ্য, ইহা তো উহারা নিজেরাই আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল, আমি উহাদিগকে ইহার বিধান দিই নাই' (৪৭ : ২৭)। সুফিদের মধ্যে যারা বৈরাগ্য পছন্দ করেন তারা ব্যাখ্যা করেন যে এটি স্বর্গীয় বিধান কিন্তু একে নষ্ট করা হয়েছে।

মনে রাখতে হবে ইসলামসম্মত জুহুদ হলো নফলসহ এবাদতগুলো সম্পাদন করা, জাগতিক বস্তুগুলোর প্রতি কোনো আকর্ষণ না রেখে। কিন্তু নফল এবাদত অত্যধিক বাড়াবাড়ি যেমন– সারা জীবন নামাজে মশগুল থাকা, স্ত্রীর প্রতি কর্তব্যে অবহেলা করে সারারাত নামাজ পড়া, সংসার বিরাগী হয়ে বিয়ে না করা ইত্যাদি ইসলাম কোনোকালে সমর্থন করেনি। খ্রিস্টানদের রাহবানিয়া বা বৈরাগ্য হলো 'সেলিবেসি', বিয়ে না করে কোনো মঠের সাথে যুক্ত থাকা। মংক ও নান-রা বিয়ে করে না কারণ খ্রিস্টধর্ম 'সেলিবেসি'কে প্রাধান্য দিয়েছে অর্থাৎ বিয়ে না করে ধর্ম জীবন পালন করা বেশি পুণ্যের। ইসলাম এ প্রকার সন্ন্যাসবাদ নিষিদ্ধ করেছে। হাদিসে আছে– "বিবাহ আমার সুন্নত, যে আমার সুন্নতকে অবহেলা করিবে, সে আমার দলভুক্ত নহে।' ইসলামের প্রধান সুফিদের অনেকেই বিবাহিত ও সংসারী। অথচ তারা কঠোর সংযমী ও জাহিদ ছিলেন।

প্রফেটের নিষেধ সত্ত্বেও সুফিগণ সঙ্গীত ও বাদ্যযন্ত্রের যথেচ্ছ ব্যবহার করেছেন* এবং কবিতার প্রসারও সুফিদের কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত।

ধর্মীয় অভিজ্ঞতা লাভের জন্য সুফিগণ বিভিন্ন ধরনের কলাকৌশল রপ্ত করেন। এর থেকে মোহান্বিত অবস্থার (ecstasy) উদ্ভব হয়, যাকে 'হাল' বলা হয়। এই রূপ নীরব দরবেশরা (মধ্য এশিয়ার নকসবন্দি তরিকা) তাদের এবাদত নীরবেই প্রতিপালিত হতো, অন্যদিকে চক্রাকারে নৃত্যরত দরবেশ (তুর্কি তরিকা-মাওলানা রুমি প্রবর্তিত); উত্তর আফ্রিকার রিফাই তরিকায় হুলুধ্বনি দিয়ে আল্লাহর জিকির করা; কালান্দার তরিকায় ভবঘুরে দরবেশরা কখনো এক স্থানে অবস্থান করেন না, দূর দেশান্তরে ঘুরে বেড়ায় এবং এই তরিকায় আত্মার শুদ্ধি করে।

বিদেশীদের সাথে সংযোগে সুফিরা কয়েকটি বিদেশী পদ্ধতি আয়ত্ত করেন। এইরূপে এবাদতের সময় নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের কৌশল আয়ত্ত করেন একাদশ শতাব্দির গ্রিসীয় হেসিচাস্ত (Hesychast) সাধুদের কাছ থেকে; বিশেষ করে সিরিয়া ও তুরস্কের সুফিসাধকরা জিকিরের সময় নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের (breathing exercise) ব্যায়াম করেন আর ভারতের মুসলিম রহস্যবাদীদের কাছে থেকে যোগ ব্যায়ামের আসন আয়ত্ত করেন।

ইসলামী রহস্যবাদীদের উদাহরণস্বরূপ সুফিবাদ নাকি ধর্মবিরুদ্ধ। কোনো কোনো পণ্ডিত ব্যক্তি যেমন– এ. সি. বুকে (Bouquet) বলেন যে, সুফিবাদ ইসলাম থেকে সাধারণভাবে উদ্ভব হয়নি কিন্তু এটা বিদেশী ভাব দ্বারা প্রভাবিত এবং সত্যি ইসলামী ডগ্‌মার সাথে সামঞ্জস্য নয়। আর সি জেহনার (Zaehner) লিখেছেন যে সুফিবাদ ইসলামী অর্থডক্সতত্ত্বের বিকৃত রূপ এবং এটা একটা আলাদা ধর্ম বলা যায়। তা সত্ত্বেও, সুফিবাদ ইসলামে একটা স্থায়ী সংযোগ সাধন করে এখনো পর্যন্ত প্রভাব

www.pathagar.com

খাটিয়ে আসছে।

কারণ এই রহস্যবাদী কোনো কোনো ব্যক্তি বা দল ইসলামের আওতায় থেকে শরিয়াবিরুদ্ধ তালে চলছে তাই এদের আইন বহির্ভূত (বিশার) দল বলে এবং এই দলকে 'বিশরিয়া' বলা হয়। বিশরিয়া ভাববাদীদের ধর্মবেত্তারা অনৈসলামিক ভাববাদী বলে চিহ্নিত করেছেন এবং তাদের ডকট্রিনকে 'বাতিল' বলে ঘোষণা করেন।

মূলত বিশারিয়া যারা তারা বিশ্বাস করেন যে কোনো গুরুর সাহায্য ছাড়া এবাদতের দ্বারা সরাসরি আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করা যায়। এদের প্রবক্তা বলেন মানুষ অন্ধকারে মোমবাতি খোঁজে (মোহাম্মদ, কোরান ও শরিয়া), কিন্তু যখন সূর্যের আলো বিকিরণ হয় তখন মোমবাতি নিভিয়ে পাশে রাখা হয়।

'বিশারিয়া' বিদ্রোহীরা কাবাঘরের কালো পাথরকে 'ফালতু' মনে করে, যার ওপর অন্যান্য মুসলিম লেখকগণ প্রশ্ন রেখেছেন। বলা হয় যে, মক্কা শহরের জন্য আরব দেশ পবিত্র এবং প্রফেট মোহাম্মদ বহু পূর্বে মক্কা প্যাগনদের কাছে পবিত্র ছিল কিন্তু প্রফেট মোহাম্মদ মক্কার চেয়ে মদিনাকে গুরুত্ব দিয়েছেন এবং জেরুজালেমকে এই দুটি শহরের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করতেন। মক্কা পবিত্র ছিল কাবাঘরের জন্য, এই কাবাঘর অনেকবার ধ্বংস হয়েছে এবং পুনর্নির্মাণ হয়েছে। সুতরাং আরব পবিত্র ভূমি কিসে? মক্কা পবিত্র নগর আর কাবা পবিত্র ঘর যেখানে কালো পাথর যা প্যাগনরা পূজা করত আর চারপাশ প্রদক্ষিণ করে, প্রার্থনা করত। সেই কালো পাথর এখনো আছে এবং হজের সময় মুসলিম সেই প্যাগন রীতি পালন করছে। কালো পাথরের চারদিকে পাক দিচ্ছে।

ইসলাম মূর্তি পূজার বিরুদ্ধে, কিন্তু বিশরিয়ারা যুক্তি দেখায় যে আসল মূর্তি পূজা হচ্ছে কোনো পুরনো রীতি বা নিয়মকে অনুসরণ করা। ধর্মবিদরা মনে করেন আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক অনুশাসন ইসলামের প্রাণহীন বস্তু, এ যেন বাহরানের দেয়ালে সিংহের মূর্তি পেন্ট করার মতো। পার্সিয়ান সুফি আল হিরি (মৃ. ৯১১) লিখেছেন– 'ফরম্যাল ধর্ম পালন যারা করে তাদের আমি অপছন্দ করি।' 'আনুষ্ঠানিক কর্ম পালনে পবিত্রতা থাকে না, দায়সারা হয়। বলেছেন আল ওয়াসিতি (মৃ. ৯৩২)। ঈশ্বর আল-নিফারি (মৃ. ৯৬৫)কে বলেছিলেন বলে কথিত যে 'জেনে রাখ আমি তোমার কাছ থেকে কোনো সুন্নাহ গ্রহণ করব না।'

সারা ইসলামের ইতিহাসে অনেক সুফি, রহস্যবাদী, সাধু, মুক্ত-চিন্তক শরিয়ার দিকে পিছন করে তাদের নিজস্ব বিবিধ রকমের নিয়ম গ্রহণ করেছেন। শরিয়া বা আইনের বেড়াজাল থেকে মুক্ত হয়ে তারা নিজের ভুবনে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেছেন।

ইসলামে মুতাজিলা, বাতেনী, বেশরিয়া দলের এবং সুফিদের আবির্ভাবের পেছনে মুসলিম যুগে-পূর্বে মধ্যপ্রাচ্যে প্রচলিত মুক্ত-চিন্তক গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের প্রভাব ছিল। সুফিরা দাবি করেন যে তাদের শিক্ষার ধারা প্রফেট মোহাম্মদের মিশনের অনেক পূর্বে অজানা ছিল না। তারা বিশ্বাস করেন তাদের নীতি ও শিক্ষা প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে। উদাহরণস্বরূপ ইদ্রিস নবীর (ইনক) সময়ে এই সন্ন্যাস দর্শনের উৎস পাওয়া যায়; পরে ইলিয়াস (এজাইজা), খিজির (জাশুয়া বা ইউয়াসা-রা আলেকজান্ডারের এক সেনাপতি) জুলকিফি (এজিকেল বা জাকারিয়া জন দ্য ব্যাপ্টিস্টের বাবা) এবং

www.pathagar.com

জিরজিস (সেন্টজর্জ) এই মতবাদ প্রচার করেছেন। অজ্ঞেয়বাদ ও মানিকিয়েন্স এবং রহস্যবাদী নিও-প্লেটনিকগুলো মিলে ইসলামের রহস্যবাদী ও সুফিবাদীদের বিবর্তনে প্রভাবিত করেছে। পিথোগোরিয়ান ও টাইয়ানার এপোলোনিয়াস (৮০ খ্রিস্টাব্দ) এদের লিখিত পুস্তকাদি ম্যাজিক ও অ্যালকেমিক্যাল অপারেশনের উৎস ছিল। এপোলোগিয়াস আরবদের কাছে বেলিনাস বলে পরিচিত।

আমরা মাসুদি, বাগদাদি ও অন্যান্য মুসলিম পণ্ডিতদের কাছ থেকে জানতে পারি যে ইসলামের শুরুতে মুসলিমগণ মার্সিয়েন (মৃ. ১৬৫), ভেলেনটিনাস (মৃ. ১৭৫) এবং অন্যান্য অজ্ঞেয়বাদীদের শিক্ষা-দীক্ষার সাথে পরিচিত ছিলেন এবং শিয়াদের কিছু ডকট্রিন, বিশেষ করে ইসলামীয় অজ্ঞেয়বাদীদের শিক্ষায় প্রভাবিত (আমির আলী ১৯৬৫, পৃ. ৩৪৩)।

নিউপ্লেটোনিক ধারণা, মুসলিম ঈশ্বর তত্ত্ব ও দর্শনতত্ত্বকে প্রবলভাবে প্রভাবিত করেছিল। প্লাটিনাম (মৃ. ২৬৮)কে মর্যাদা দেয়া হয়েছিল 'গ্রিক মাস্টার' বলে (শেখ আল ইউনানী) এবং তার দর্শন ও শিক্ষা এবং সৃষ্টিতত্ত্ব ও ঈশ্বরের ধারণা মুসলিম অতীন্দ্রবাদীদের লেখার বিষয়বস্তু হয়েছিল।

খ্রিস্টানদের ধারণাও বহুল প্রচলিত ছিল। ঐতিহাসিকভাবে সুফিবাদের শুরু হয় ইরাক থেকে; দক্ষিণ ইরাক এবং এর প্রাথমিক উন্নয়ন হয় বসরা ও কুফার মধ্যকার অঞ্চলে আর এই সমস্ত অঞ্চলে খ্রিস্টানদের প্রবল প্রভাব ছিল (Nicholson. 1969 P 473)। ইসলামী রহস্যবাদীতে খ্রিস্টানদের প্রভাব– যেমন খ্রিস্টান সাধুরা যে পদ্ধতি পালন করত তার পুরোপুরি প্রভাব সুফিদের ওপর পড়েছিল।

প্রাথমিক মুসলিমদের মধ্যে যিশু ও তার মাতা মেরির (মরিয়ম) প্রতীক চিহ্ন ও ধ্যানের বস্তু ছিল এবং তাঁদের স্মরণে যে দুটি উৎসব পালিত হতো মুসলিম সুফিগণ প্রথম দিকে সেসব উৎসবে শরিক হতেন। প্রফেসর গিব বলেছেন– মধ্যযুগে মুসলিম বিশ্বে সরকারি উৎসব দিনগুলোতে (official feasts) খ্রিস্টান উৎসবও এক সাথে পালন করা হতো জাঁকজমকের সাথে।

মুসলিম মিস্টিকগণ যিশুকে দরিদ্র, পবিত্র ও পুণ্যবান রূপে মডেল বা আদর্শ রূপে শ্রদ্ধা করতেন 'যিশুকে সাধু ব্যক্তিদের মোহর' রূপে আখ্যায়িত করেন (Seal of the saints)। কোরানে যিশুকে 'রুহুল্লাহ' বলা হয়েছে, এই সূত্রে মুসলিম মিস্টিকদের কাছে যিশুর ব্যক্তিত্ব আরও উচ্চস্তরে স্থাপিত করেছিল।

মুসলিম মিস্টিকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজনের সংক্ষিপ্ত আলোচনা আলোচিত হলো।

হাসান আল বসরী (মৃ. ৭২৮) একজন সন্ন্যাসী ও আরব স্কলার যেমন ছিলেন, তেমনি ছিলেন মুক্ত চিন্তায় বিশ্বাসী। তিনি যিশু সম্বন্ধে বলেছেন– 'আত্মার প্রভু' Lord of the Spirit and word' (Arberry, 1964, P. 59) এবং তার অনুসারীদের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। হাসান আল-বসরীর জনপ্রিয়তা এত বেশি ছিল যে, তার মৃত্যুর সময় সারা বসরায় মানুষ জানাজায় শরিক হয়।

ওয়াসিল ইবন আতা (মৃ. ৭৪৯) হাসান আল বসরীর ছাত্র ছিলেন এবং কোনো এক বুড্ডিস্ট সাধুর (সুমানী) বাসায় যাতায়াত করতেন। সেই বাসায় মানিকিয়েন্স,

www.pathagar.com

জোরাস্ত্রিয়ান ও অজ্ঞেয়বাদীদের (Gnostic) আসর বসত এবং দর্শনতত্ত্ব ও ধর্ম আলোচনা হতো। ওয়াসিল হাসান আল-বসরীর নামে একটি পাঠচক্র রেখে যান যেখানে মুতাজিলিরা যুক্তিবাদ আলোচনা করে ধর্মীয় গোঁড়ামির সমালোচনা করত।

আবদুল্লাহ ইবন মায়মুন (মৃ. ৭৬০) জন্মগতভাবে জোরাস্ত্রিয়ান ছিলেন। তিনি সিরিয়াতে বসবাস করেন এবং অজ্ঞেয়বাদী পলিকেন্সের দ্বারা প্রভাবিত হন। তার অনুসারীরা বাতেনী গোষ্ঠী পত্তন করেন। এই বাতেনী বিদ্যায় গুপ্ত ব্যাখ্যা কোরানে উল্লেখ আছে, যার ব্যাখ্যা সাধারণভাবে করা যায় না, রূপক অর্থে করা হয়- কোরানের ভাষায় যাকে মোতাশাবিহ্ বলা হয়, এটা মোহকামের বিপরীত। মোহকাম সরল ব্যাখ্যা। আবদুল্লাহ ইবন মায়মুনের অনেক ডকট্রিন মিসরীয় ফাতেমীরা গ্রহণ করেছে।

ইব্রাহিম ইবন আদহাম (মৃ. ৭৭৭)-এর কথা লে হান্টের কবিতা আবু বেন আহ হেমে উল্লেখ করা হয়েছে। আবু ইবন আদহেম বলখের প্রিন্স ছিলেন। সিরিয়া যাত্রাকালে তিনি এক খ্রিস্টান ফাদার সাইমেনের সাথে অবস্থান করেন এবং তাঁর কাছ থেকে মোরাকাবা (মেডিটেশন) মারিফাত লাইন অর্জন করেছিলেন (gnosis)।

রাবেয়া আল-বসরী (মৃ. ৮০১), বিখ্যাত মহিলা সুফি সুন্দরী মহিলা ছিলেন বলে কথিত। তিনি বহু জনের কাছ থেকে বিবাহের প্রস্তাব পান এবং তিনি সব প্রস্তাবই প্রত্যাখ্যান করেন এই বলে যে, 'আমি একমাত্র ঈশ্বরের'। প্রফেটকে তিনি ভালোবাসেন কিনা জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, জবাবে তিনি বলেন, 'আমার প্রেম শুধু ঈশ্বরের জন্য আর কারোর জন্য নয়।' তিনি সব পবিত্র অনুষ্ঠানকে অর্থহীন ভাবতেন এবং কাবাঘরকে দেখে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে বলেছিলেন- 'আমি শুধু এর মধ্যে ইট আর পাথর দেখতে পাই। এর থেকে আমি কী লাভ করব?' তার একটি প্রার্থনা ছিল অতুলনীয়। তিনি প্রার্থনায় বলতেন- 'হে ঈশ্বর আমি যদি স্বর্গের লোভে তোমার আরাধনা করি, সে-স্বর্গ থেকে আমাকে বাদ দাও। নরকের ভয়ে যদি আমি তোমাকে ভালোবাসি, নরদাগ্নিতে আমাকে দগ্ধ করো।'

মাআরুফ আল খারকি (মৃ. ৮১৫) খ্রিস্টান পিতামাতার সন্তান, কিন্তু ইসলামে দীক্ষা নেন। যদিও তার বেশির ভাগ বক্তব্য মৌলিকভাবে খ্রিস্টান প্রভাবিত। তিনি যখন মারা যান, ইহুদি, খ্রিস্টান ও মুসলিম সকলেই দাবি করেছিল যে মাআরুফ তাদেরই একজন ছিলেন।

আহমদ ইবন খাবিত (মৃ. ৮২০) খাবিতিয়া গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠাতা। তিনি বিশ্বাস করতেন আল্লাকে ধারণা করা বা জানা যাবে না; সকল প্রচেষ্টা এবং কর্ম সবই মিথ্যা বলে প্রমাণিত হবে, তার দিশা পাওয়া যাবে না। সেই অধরাকে ধরতে হলে মেসিয়ার (মসিহ্) শরণাপন্ন হতে হবে বা খ্রাইস্টকে ধরতে হবে যিনি নিজের প্রাণ ও দেহ মানবতার উদ্দেশ্যে বলি দিয়েছিলেন।

হারিথ আল মুহাসিবি (মৃ. ৮৫৭) ধর্মপালন বিষয়ে তাঁর একটি গ্রন্থে বলেছেন যে মানসিক উন্নতির উদ্দেশ্যে (for edification) ইহুদি ও খ্রিস্টান উৎসের মাধ্যমে আত্মনিয়োগ প্রয়োজন। তার শিষ্যের মধ্যে প্রধান মিস্টিক ছিলেন জুনায়েদ আল-বসরী এবং পরবর্তী মিস্টিকদের মধ্যে তিনি প্রভাব ফেলেছিলেন পারস্য দার্শনিক আল-গাজ্জালীর ওপর।

www.pathagar.com

জুন নুন (মৃ. ৮৫৯) ছিলেন মিসরীয় সাধু। মিস্টিক এবং রসায়নবিদ। তিনি হারমেটিকতত্ত্ব ও হেলেনিস্টক বিজ্ঞানে পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন এবং কথিত আছে যে তিনি প্রাচীন মিসরের হেরোগ্লিফিক (দুর্বোধ্য লিপি) পড়তে বা বুঝতে পারতেন। তিনি নসিস (gnosis)-এর ধারণার অর্থাৎ (মুক্তির জন্য জ্ঞানের প্রয়োজন, বিশ্বাস নয়।) প্রবক্তা ছিলেন এবং ইসলামিক থিওজফির (ঈশ্বর সম্বন্ধে জ্ঞান) জনক বলে পরিচিত ছিলেন।

হাল্লাজ (মৃ. ৯৯২) জোরাস্ট্রিয়ান পুরোহিতের নাতি ছিলেন। তার পিতা ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি জেরুজালেমে খ্রিস্টান বসতিতে বাস করতেন যেখানে মাজদিনিয়েন সম্প্রদায় বাস করত। সরকার সন্দেহ করত যে হাল্লাজের কারমাতিদের সাথে যোগাযোগ আছে। তিনি বলতেন কাবাঘর ধ্বংস করে দেয়া দরকার এবং তীর্থযাত্রীরা নিজের ঘরে তীর্থ পালন করুক। এতে বেশি পুণ্য আছে। তিনি শেখাতেন যে যিশুর মধ্যে দেবত্বের সন্ধান পাওয়া যায়। হাল্লাজের ডকট্রিন খ্রিস্টানিটির ওপর নির্ভরশীল এবং অনেকে তাকে খ্রিস্টানই ভাবতেন। প্রফেটের চেয়ে সাধু-সন্ন্যাসীদের মূল্য তিনি বেশি দিতেন এবং প্রফেট মোহাম্মদকে যোগ্য মর্যাদা দিতেন না; তাই ধর্মদ্রোহিতার অপরাধে তাকে অপরাধী করা হয়। তাছাড়া 'তিনিই সত্য' এই ঘোষণা দেওয়াতে তার অপরাধ আরও বেড়ে যায় এবং এই অপরাধে তাকে কষাঘাতে মেরে ফেলা হয়, যদিও তিনি ক্রুসিফিকেশনের জন্য অনুরোধ করেছিলেন।

আবু সৈয়দ (মৃ. ১০৪৯) একজন ফার্সি সুফি ছিলেন। তিনি লিখেছিলেন : 'আমাদের পবিত্র ধর্ম শেষ হবে না যতদিন পর্যন্ত মসজিদগুলো ধ্বংসে পরিণত হয় এবং ধর্ম বিশ্বাস উচ্ছেদ হয়। তিনি ধর্ম পালনের মাঝে বন্ধন খুঁজে পান এবং শরিয়া ফালতু জিনিস আর কাবা পাথর ঘর ছাড়া আর কিছু নয়। তিনি জীবনে হজ করেননি; তিনি বলতেন, যদি তিনি ইচ্ছা করেন কাবা এসে মাথার চারদিকে ঘুরবে। তিনি তার শিষ্যদের গান ও নাচ করতে উৎসাহ দিতেন এবং তাদের বারণ করতেন আজানের সময় নাচগান বন্ধ না করতে।

ওমর খৈয়াম (মৃ. ১১২৩) পারস্যে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি গাণিতিক, জ্যোতির্বিদ ও চারপদী কবিতার রচয়িতা ছিলেন। তার রুবাই ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে এডওয়ার্ড ফিটজারেল্ড ইংরেজিতে অনুবাদ করেন। পারস্যে নিশাপুরে জন্ম হলেও তিনি প্রথম দিকে কয়েক বছর বলখে বাস করেন এবং নিশাপুরে তার কবর হয়। তিনি তার রুবাই-এ ঘন ঘন সুরা ও সাকির কথা উল্লেখ করেন যাকে কেউ রহস্যপূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করেন, আবার কেউ সরল ব্যাখ্যাও দিয়েছেন যেখানে আধ্যাত্মিকতার লেশমাত্র ছিল না।

সানাই (মৃ. ১১৩১) পার্সিয়ান কবি ও মরালিস্ট ছিলেন। পারস্যের অন্যান্য কবিদের মতো তিনি ছিলেন মিস্টিক কবি এবং সুফিবাদে প্রভাবিত। তিনি সন্ন্যাস ও ভাববাদের মহাকাব্য রচনা করেন এবং যিশুকে উচ্চ মর্যাদায় তুলে ধরেন এবং তার সম্বন্ধে সচিত্র কাহিনী অঙ্কিত করেন।

ইবন আরাবি (মৃ. ১২৪০) কবি ও সুফি ছিলেন। তিনি সেই সময়কার বিখ্যাত থিওজফিস্ট বলে পরিচিত ছিলেন। তিনি তাঈ-এর খ্রিস্টান গোত্রের প্রাক-ইসলামী

www.pathagar.com

যুগের হাতিম তাঈ-এর বংশধর বলে দাবি করেন। তিনি নব্য প্লেটোবাদ ও সন্ন্যাসবাদ কর্তৃক প্রভাবিত এবং প্রফেট যিশু ও মোহাম্মদ উভয়ের জন্য কলেমা (লোগোস) আখ্যা বর্জন করেন। তিনি উদার চিত্তের মানুষ ছিলেন এবং গর্ব করে বলতেন যে তিনি ইহুদিদের সাথে সিনেগগে, খ্রিস্টানদের সাথে চার্চে এবং মুসলিমদের সাথে মসজিদে সমভাবে প্রার্থনা করতে পারেন, তিনি গোঁড়াবাদী দ্বারা অভিশপ্ত (execreated) হন এবং তার সমস্ত রচনা পুড়িয়ে ফেলা হয়।

রুমি (মৃ. ১২৭৩) পারস্যের মহান সুফি ছিলেন। কুনিয়ায় (প্রাচীন আইকোনিয়াম) তার জন্ম যেখানে গ্রিক ও খ্রিস্টান ট্র্যাডিশন বেশ প্রচলিত ছিল এবং সেখানকার বাসিন্দারা গ্রিক ভাষা বলত। রাজধানীর অদূরে খ্রিস্টানদের মঠের বসতি এবং সেখানকার খ্রিস্টান শিক্ষা-দীক্ষা তার ওপর বেশ প্রভাব ফেলেছিল। তার বিখ্যাত রচনা 'মসনবী' পারসে 'কোরান' বলে খ্যাতি লাভ করে। অন্যান্য সুফি কবিদের মতো তিনি খ্রিস্টানদের প্রতি নমনীয় ছিলেন।

হাফিজ (মৃ. ১২৮৯) বিখ্যাত পার্সিয়ান গীতি কবি ও সুফি ছিলেন। ওমর খৈয়ামের মতো তিনি সুরা-সাকিকে প্রতীক রূপে তার কবিতায় ব্যবহার করেছেন। অন্যান্য সুফি কবিদের মতো খ্রিস্টানদের প্রতি তার ঝোঁক ছিল। তার রুবাই-এর মধ্যে একটি ছিল-

যেখানে দরবেশ পাগড়ি মাথে/ দিন রাত আল্লাহ আল্লাহ ডাকে/ যেখানে প্রার্থনার জন্য চার্চের ঘন্টা বাজে/ এবং যেখানে যিশুর ক্রস বিরাজে।

'Where the turbaned anchorite /Chanteth Allah day and night/Church bell rings the call to prayer/ And the Cross of Christ is there' (Nicholson, 1963 P. 88)

www.pathagar.com

১৪
ইসলামের সমালোচকগণ

ইসলাম কোনো দিনই সমালোচনা চায়নি, তবু প্রফেট মোহাম্মদের মিশন শুরুর দিন থেকেই ইসলামের বিরুদ্ধে আরবে মানুষের অভাব হয়নি। এখানে অবশ্য পশ্চিমা সমালোচকদের কথা বলা হয়েছে, যার শুরু হয়েছিল মধ্যযুগ থেকে যখন সমালোচনার ভাষা ছিল তীব্র।

আধুনিক পণ্ডিত ব্যক্তিদের মন্তব্য– আধুনিকতার সাথে যদিও ভাষার ব্যবহার নম্র ও সহনীয়, কিন্তু আক্রমণটা সুগার কোটেট। সতর্কতার সাথে পাঠ করলে দেখা যাবে শব্দ চয়নের মুসাবিদা ভদ্র হলেও প্রশংসার মাঝেও তীব্র তির্যক আক্রমণ সহজেই ধরা যায়। ইসলামের প্রশস্তি গেয়ে গেলেও তার সাথে জুদাইজম ও খ্রিস্টানিটির তুলনামূলক বিশ্লেষণে দেখানো হয় যে ইসলাম জুদাইজমের অংশ বিশেষ এবং তোরাহভিত্তিক।

পশ্চিমা সমালোচকগণ বুদ্ধিইজম, হিন্দুইজম প্যাগানিজম ও এনিমিজমকে সহিষ্ণুতার সাথে বিচার করলেও, যখন তারা ইসলামকে বিচার করতে যায় তখন ওয়াটের ভাষায়– They are prone to see only the worst in Islam and its Prophet অর্থাৎ ইসলাম ও তার প্রফেটের খারাপ দিকটাই চোখে পড়ে।

মুসলিমরা এই ইসলামবিরোধী আক্রমণকে এক কথায় বাতিল করে দেয় এই বলে যে, ইহুদি ও খ্রিস্টানদের বিদ্বেষ ও ঘৃণা এই সব সমালোচনার উৎস। কারণ প্রায় তেরশো বছর ধরে মুসলিমরা খ্রিস্টান বিশ্বকে শাসন করেছে এবং ক্রুসেডের পর থেকে মুসলিমরা খ্রিস্টানদের সব ধরনের আক্রমণকে সন্তোষজনকভাবে প্রতিহত করেছে। মুসলিমদের মতে, ইসলামের বিগত রাজ্য বিস্তার ও বিজয়ের জন্য ঈর্ষান্বিত হয়ে এখন বিরূপ সমালোচনা করছে কারণ মুসলিমরা এখন বিজ্ঞান ও ক্ষমতার দিক থেকে অনেক পেছনে পড়ে আছে।

অতীতে মুসলিমরা কী ছিল এবং কতটা সাফল্য অর্জন করেছিল বর্তমান প্রেক্ষাপটে তা আলোচ্য বিষয় নয়। বর্তমানে পশ্চিমা পণ্ডিতরা মনে করেন অতীতে মুসলিমরা যেসব মহাসমরে বিজয়ী হয়ে, আর বর্তমানে যে তেল-সম্পদের অধিকারী সেটা কথা নয়, কথা হচ্ছে, বর্তমানে তাদের মনে যে অবিশ্বাসের দানা বেঁধেছে তা থেকে উত্তরণের উপায় না খুঁজে অতিমাত্রায় গোঁড়ামি (fanatical) ও অস্থিরতায় ভুগছে। এমনকি সহানুভূতিশীল স্কলার ও পণ্ডিত ব্যক্তিরা প্রফেট মোহাম্মদের সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে সমস্যায় পড়ছেন তিনি স্বর্গীয় দূত গ্যাব্রিয়েলের দ্বারা পরিচালিত কিনা

www.pathagar.com

অথবা কোরানের বাণী গ্যাব্রিয়েল বাহিত কিনা।

বর্তমান পরিস্থিতিতে ইসলাম ও পশ্চিমের মধ্যে শুধু ভুল বোঝাবুঝি নয়, কেউ কাউকে এতটুকু বুঝবার চেষ্টা করছে না। দুই-এর মধ্যে সমঝোতার যে চেষ্টা সেটা লক্ষ্য পৌঁছবার চেষ্টা নয়, লাগাতার ঠাণ্ডা যুদ্ধের মাঝে সহঅবস্থান ছাড়া আর কিছুই নয়। সমালোচনার কয়েকটি প্রধান বিষয় তুলে ধরলে বোঝা যাবে পশ্চিমা সমালোচকরা কোন দিকে টারগেট করে মুসলিমদের মনে আরো বিষ ছড়াবার প্রয়াস পাচ্ছে।

১৪.১ প্রফেট ভণ্ড

পশ্চিমাদের কাছে প্রধান টারগেট হলো প্রফেট মোহাম্মদ নিজে। কোনো মহান ব্যক্তিত্বকে ইতিহাসে এমন আক্রমণ করে ইতিহাস লিখিত হয়নি, যেমন পশ্চিমা পণ্ডিতগণ প্রফেট মোহাম্মদকে নিয়ে লিখেছেন।

এটা অবশ্য সত্য যে তাঁর উচ্চ প্রশংসা করে অনেকেই লিখেছেন এবং পশ্চিমা লেখক কম নেই– এদের মধ্যে যার নাম প্রথমে করা যেতে পারে তিনি হলেন টমাস কারলাইল, যিনি বারে বারে এসব মন্তব্য বাতিল করেছেন যারা প্রফেটকে প্রতারক বা ফ্রড বলেছেন। কারলাইলের মতে, প্রফেট মোহাম্মদ একাধারে কবি, প্রফেট ও সংস্কারক ছিলেন। তিনি যদি আন্তরিক ও অকৃত্রিম না হতেন তাহলে তাঁর অনুসারীদের মধ্যে এতো দার্শনিক, মিস্টিক ও পণ্ডিত ব্যক্তি তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করত না।

অন্যান্য সমর্থনকারীদের মতে, প্রফেট মোহাম্মদের প্রাথমিক মিশন যা তিনি মক্কাতে আরম্ভ করেছিলেন, তখন তাঁর আন্তরিকতায় কোনো সন্দেহ ছিল না। প্রথমে তিনি অদম্য উৎসাহ নিয়ে আরবের সমাজের সংস্কার করার চেষ্টা করেন এবং তাঁর বিশ্বাস ছিল তিনি তা পারবেন। স্বর্গীয় বাণীর মাধ্যমে তিনি যে অনুপ্রেরণা পান তার ঘোষণা দিতে গিয়ে তিনি বিধর্মীদের উপহাস ও সমালোচনার পাত্র হয়েছিলেন।

তিনি ছিলেন মানুষের মহান নেতা, মিত্র ও বন্ধুর প্রতি তিনি ছিলেন বিশ্বাসী। তিনি তাঁর অনুসারীদের অনুপ্রাণিত করেন আনুগত্যে এবং সদা সদয় ছিলেন তাদের কল্যাণ কামনায়। তিনি রাষ্ট্র পরিচালনায় ছিলেন দক্ষ ও ক্ষমাশীল এবং শত্রুদের প্রতি উদার। সর্বোপরি তাঁর নৈতিক চরিত্র ছিল প্রবল, এই কারণে তিনি আরবদের মূর্তিপূজা থেকে সরিয়ে এনে একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী করে তুলতে সমর্থ হন এবং বিভিন্ন যুদ্ধবাজ গোত্রদের ঐক্যবদ্ধ করেন।

কিন্তু তিনি যে প্রতারক (imposter) ছিলেন এ কথা একেবারে উড়িয়ে দেয়া যায় না। বহুবিবাহের প্রতি তাঁর অতিরিক্ত ঝোঁক ছিল। তাঁকে বিচার করতে হবে তখনকার প্রচলিত অবস্থায়, তাঁর মিশন ও বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠিত করতে এবং অরাজকতা, গোত্র যুদ্ধের অবসান ঘটাতে তাঁর অবদান অতুলনীয়।

ভল্টেয়ার (মৃ. ১৭৭৮) বলেছেন যে, ইসলাম ধর্মে নতুন কিছুই নেই শুধু দাবি করা হয় যে মোহাম্মদ আল্লাহর প্রফেট। অন্যান্য যা কিছু সবই ধার করা। এডওয়ার্ড গিবন সংক্ষিপ্ত আকারে বলেছেন ইসলাম ধর্ম শাশ্বত সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং একটি প্রয়োজনীয় সত্যের সাথে বৈপরীত্যসূচক– a necessary fiction : বলা হয়েছে

www.pathagar.com

ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কোনো ঈশ্বর নেই এবং মোহাম্মদ তাঁর প্রেরিত পুরুষ। গিবন লিখেছেন, একজন সন্দেহ করতে পারে যে প্রফেট তাঁর শিষ্যদের বিশ্বাস প্রবণতায় গোপনে মৃদু্য হাস্য করতেন—Secretly smiled at the credulity of his proselyes'।

'বর্তমান সমালোচকগণ প্রফেট মোহাম্মদের আদর্শগত ভার্সান সম্বন্ধে প্রশ্ন উত্থাপন করেন। যারা একটু সহানুভূতিশীল, তাদের মধ্যে কয়েকজন দ্বিধাহীনভাবে প্রফেটকে সমর্থন করেন, তারাও মুসলিমদের উচ্চ প্রশংসার সব গ্রহণ করতে ইতস্তত করেন। তারা মনে করেন যে প্রফেট মোহাম্মদের বিশ্বাস ও তাঁর বাস্তবের মধ্যে যে পার্থক্য তাকে একত্র করা মুশকিল হয়ে দাঁড়ায়। মানুষ হিসাবে প্রফেটের দুর্বলতা ছিল এবং এই দুর্বলতা চাপা দিতে গিয়ে তিনি ইচ্ছাকৃত সত্যের অপলাপ সময়ে সময়ে করেছেন।

এই মন্তব্যের জন্য সাক্ষ্য দিতে ইহুদি ও খ্রিস্টানদের দরকার হবে না, বরং খোদ আরবদের মধ্যে, বিশেষ করে মক্কাতে তাঁর নিকট পরিবারের লোকজন এ সম্বন্ধে বলেছে কোরানের আয়াতে ও হাদিসে ও তাঁর জীবন চরিত্রে উল্লেখিত হয়েছে।

কথিত আছে, প্রফেট মোহাম্মদ সেই গুণের অধিকারী ছিলেন, আরবরা যাকে বলত হিলম, চাতুর্য, যে চাতুর্যকে তিনি ব্যবহার করেছেন তাঁর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যে পৌঁছুতে (Rodinson, 1976 P. 221)। ছলনায় তাঁর সমকক্ষ কেউ ছিল না, যখন যেমনটি দরকার তিনি তাই করেছেন। আবার যখন দরকার রূঢ় হয়েছেন। তাঁর মহানুভবতা বা উদারতা ছিল রাজনৈতিক কারণে; দয়া দেখানো দরকার হলে তিনি কাজ হাসিলের জন্য তাই করেছেন, অন্য দিকে তিনি ছিলেন বাস্তববাদী ও প্রতিহিংসাপরায়ণ এবং যে কোনো প্রতিবাদীকে তিনি নির্দয়ভাবে দমন করতেন।

মুসলিম কৈফিয়তদাতারা (apologist) বলে থাকেন প্রফেট মোহাম্মদকে বিচার করতে হবে তাঁর কালের সাথে; কিন্তু সমালোচকরা বলে যে পৃথিবীর অন্যান্য ধর্মীয় নেতারা যেমন বুদ্ধদেব, জোরাস্ত্রার, কনফুসিয়াস, গুরু নানক এবং অন্যান্যদের যে কোনো মান (Standard) দিয়ে বিচার করুন, তারা তো এমন ছিলেন না। প্রফেট মোহাম্মদকে বলা হয়েছে উচ্চাকাঙ্ক্ষী, যে কোনো আরব শেখের মতো সুবিধাবাদী এবং বাস্তববাদী, যদিও বন্য-বেদুইন ও আরবদের তাঁর পতাকাতলে জড়ো করেছিলেন মালেগণিমতের হিস্যা ও বিচারহীন অনন্ত স্বর্গসুখ ও হুরের আশা দিয়ে।

অমুসলিম পশ্চিমা স্কলারগণ একমত যে, কোরান প্রফেট মোহাম্মদের নিজস্ব রচিত গ্রন্থ, এতে স্বর্গীয় রঙ ছড়ানো হয়েছে মানুষের পবিত্র গ্রহণযোগ্য বস্তু হিসাবে। মক্কায় প্রফেট মোহাম্মদের সমসাময়িক যারা ছিলেন তাদের অনেকেই এই মত পোষণ করেন যে, কোরানের বাণী তাঁরই বাণী, মানুষকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য 'ওহী'র কথা ও জিব্রাইলের কথা বলা হয়েছিল, যা তিনি নিজেও অসত্য বলে জানতেন। তাঁর তোরাহ ও কোরান উভয়ই লোক ঠকানো বস্তু। "উহারা বলিয়াছিল 'দুইটিই জাদু, একে অপরকে সমর্থন করে (২৮-৪৮)।" নিকট প্রাচ্যে শতাব্দি ধরে মানুষের মনে এই পুস্তক সম্বন্ধে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছিল। ফ্রেডেরিক-২ (মৃ. ১২৫০) বলেছিলেন যে, পৃথিবীতে তিনজন মহাপ্রতারক মুসলিম বিশ্বে দেখা দিয়েছে মোসেস, যিসাস ও মোহাম্মদ। এলয়স স্প্রেংগার (Aloys sprenger)-এর মতে প্রফেট মোহাম্মদ ছিলেন একজন

www.pathagar.com

চিত্তবিকারগ্রস্ত ব্যক্তি। (Schimmel, 1985 P. 248)।

প্রফেটের মানসিক অবস্থা প্রথম দিকে কিরূপ ছিল তা অনেকভাবে ব্যক্ত করেছেন। গুস্তাভ ওয়েল দেখাতে চেয়েছেন যে প্রফেট মোহাম্মদের মৃগীরোগ ছিল। এলয়স স্প্রেংগার বলতে চেয়েছেন মৃগী রোগ ছাড়া তাঁর মাঝে মাঝে খিঁচুনি স্বভাব (hysteried nature) ছিল। থিওডোর নলডেক বিশ্বাস করতেন যে তাঁর মোহান্বিত অবস্থায় প্রফেটের ব্যামোও ছিল, ডি. এস. মারগোলিয়থের মতে, প্রফেট মোহাম্মদের যে মাঝে মাঝে অদৃশ্য শক্তিতে ভর হতো তা অনেক সময় ইচ্ছা প্রসূত (artificially produced)। ডি. বি। ম্যাকডোনাল্ডও বিশ্বাস করতেন যে, এসব রোগ নামে মাত্র ছিল যার মাধ্যমে তিনি ঐশীবাণী শুনতে পেতেন।

১৪.২ অতিমাত্রায় গোঁড়ামি

পশ্চিমা পণ্ডিতদের লেখায় প্রকাশ পেয়েছে যে প্রফেট মোহাম্মদ তাঁর অনুসারীদের অনুপ্রাণিত করতেন ধর্মের জন্য প্রাণ পর্যন্ত বিলিয়ে দিতে অর্থাৎ গোঁড়ামির চরম করতে এবং যারা ধর্ম পরিত্যাগ করে তাদের প্রতি ভয়ানকভাবে অসহিষ্ণু হতে। ইসলামের জন্য এবং তাঁর নিজের প্রফেট হুডের ব্যাপারে তিনি কোনো আপোষ করতেন না। এমনকি সন্ধির শর্ত ও বন্ধুত্বের এবং পারিবারিক বন্ধনের প্রতি তাঁর কোনো আগ্রহ ছিল না।

তাই তাঁর অনুসারীরা ধর্ম ও প্রফেটের জন্য চরম ফ্যানাটিক ভাব দেখিয়েছে। যদি প্রফেট চাইতেন তাঁর শিষ্যরা তাদের বাবা ও ভাইদের খুন করতেও দ্বিধা করত না। হিশাম আল-কালবি লিখেছেন যে, আবদুল্লাহ ইবন ওবেইর পুত্র প্রফেটের অনুমতি চেয়েছিল তার নিজের বাবাকে খুন করে তার কাছে মাথা এনে দিতে, কিন্তু যেহেতু আবদুল্লাহ মদিনার প্রভাবশালী ব্যক্তি বিধায় প্রফেট সে অনুমতি দেননি আবদুল্লাহর পুত্রকে। এই রকম চরম গোঁড়ামি দেখানো হয়েছিল ইহুদি মার্চেন্ট ইবন সুনাইনার হত্যাকাণ্ডে।

যখন প্রফেট মোহাম্মদ তাঁর শত্রু বিনাশের হুকুম দিতেন তখন লোকজন সে কাজ করে মৃত ব্যক্তিদের মাথা এনে হাজির করত প্রমাণ স্বরূপ। মুসলিম হত্যাকারীদের মধ্যে মানুষের মাথা কেটে আনা একটা সাধারণ ব্যাপার দাঁড়িয়েছিল। ৬৮০ সালে কারবালায় হোসেনের মাথা কেটে এনে এজিদের সামনে আনা হয়েছিল এটা ঐতিহাসিকভাবে সত্য।

কোনো উদ্দেশ্যকে সম্পাদন করতে প্রফেট মোহাম্মদ তাঁর শিষ্যদের খুন-খারাবি করতে, দরকার হলে অনুপ্রাণিত করতেন। তিনি ব্যাখ্যা করতেন আল্লাহর ইচ্ছাকে পূর্ণ করতে যে কোনো পন্থা অবলম্বন করতে দ্বিধা করা উচিত নয়। তিনি অবিশ্বাসীদের প্রতি লাগাতার জিহাদ করার জন্য ওকালতি করেছেন; মুসলিমদের বলেছেন, শিক্ষা দিয়েছেন যে কোনো একজন বিধর্মী হত্যা করলে হত্যাকারী বেহেশত পাবে। অনুমোদন দিয়েছেন সমালোচক ও উপহাস করে এমন ব্যক্তিকে খুন করতে, মার্চেন্ট ক্যারাভানদের আক্রমণ করে লুটপাট করতে; অরক্ষিত শহর আক্রমণ করে ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে সম্পদ দখল করতে; এর জন্য মারগোলিয়থ বলেছেন– তিনি ছিলেন– 'a

www.pathagar.com

captain of banditti'—লুণ্ঠনকারীদের সর্দার।

সমালোচকরা বলেন, এ ধরনের ব্যবহার যে কোনো ওজর-আপত্তির বাইরে কারণ এ আচরণের কোনো কৈফিয়ৎ নেই। ভলটেয়ার বলেছেন এ ধরনের আচরণকে কেউ সমর্থন করবে না, যদি সে অন্ধ আবেগে ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন না হয়।

প্রফেট মোহাম্মদের এই হত্যা-নীতি বহুদিন ধরে তাঁর অনুসারীরা নির্মমভাবে ধর্মীয় কর্ম বলে চালিয়েছিল। খালিদ ইবন ওয়ালিদ রক্তপিপাসু বিজয়ী সেনাপতি হলেও তাকে সম্মানিত করা হয় 'আল্লাহর তরবারি' Sword of Allah বলে (সাইফ আল্লাহ)।

৬৩৩ সালে খালিদ দক্ষিণ ইরাকে ওলাইসের যুদ্ধে (হিরা ও বসরার মধ্যে) জোরাস্ত্রিয়ান পার্সিয়ানদের পরাজিত করে এক আদেশ জারি করেন এই বলে যে যুদ্ধ বন্দিদের হত্যা করা হবে না। দু'দিন ধরে তার সেনা সব বন্দি ও পলাতক সেনা ঘেরাও করে একটা শুকনো নদীর বুকে জড়ো করে। পরে তাদের সকলকে নদীর বুকে হত্যা করে রক্তের বন্যা বইয়ে দেয়া হয়। তারপর থেকে সেই নদীর নাম হয় রক্তের নদী। এতে খলিফা আবু বকর সন্তোষ প্রকাশ করেন। খালিদ নিজে যুদ্ধে বন্দি সেনাপতির শিরশ্ছেদ করেন এবং তার কন্যার পাণি গ্রহণ করে উৎসব সম্পাদন করেন। আল্লাহ ও রসূলের নামে এই লোমহর্ষক হত্যার ঘটনা ইবন ইসহাক, ইবন হিশাম, আল ওয়াকিদী ও অন্যান্য মুসলিম জীবন চরিতকার ও ঐতিহাসিকগণ তাদের গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

১৪.৩ রাজনৈতিক হত্যা

মুসলিম ঐতিহাসিকদের গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে প্রফেট মোহাম্মদের সময়ে ইহুদিদের হত্যা বিশেষ করে বানু কোরাইজার ঘটনা ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য। শুধু রাজনৈতিক কারণে নয়, ব্যক্তিগত কারণে যারা প্রফেটকে মান্য করেনি বা উপহাস করেছে তাদেরকেও মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, উমাইয়া মারওয়ান কন্যা কবি আসমা যে ব্যঙ্গ কবিতা লিখেছিল, আল ওয়াকিদির বর্ণনা মতে প্রফেটের নির্দেশে ওমাইর নামে এক অন্ধ ব্যক্তি ছুরিকাঘাতে খুন করে যখন আসমা ঘুমিয়ে ছিল তার সন্তানদের নিয়ে। তখন ৬২৪ সালের জানুয়ারি মাস। আসমার মৃত্যুর সংবাদ শুনে প্রফেট খুশি হন এবং ওমাইরকে 'চক্ষুমান ওমর' উপাধি দেন এবং বলেন, 'তুমি আল্লাহ ও রসূলের জন্য ভালো কাজ করেছ' (Rodinson 1976, p. 171)।

৬২৪ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে আমর গোত্রের আবু আফাক নামে ইহুদিবৃদ্ধ ব্যক্তি ইসলামের নামে কিছু বিরক্তিকর কবিতা লিখেছিল। কয়েকজন মুসলিম প্রফেটের কাছে অভিযোগ করে। ইবন হিশামের মতে প্রফেট সেই ব্যক্তির মৃত্যু কামনা করলে আমর গোত্রের এক ধর্মান্তরিত মুসলিম আবু আফাককে ঘুমন্ত অবস্থায় খুন করে।

আর একজন ভিকটিম হচ্ছে কাব ইবন আশরাফ। আশরাফ তাঈ গোত্রের একজন কবি, তার মা ছিলেন ইহুদি নাদির গোত্রের মহিলা। মক্কার লোকদের সাথে কাব-এর খাতির ছিল তাই বদর যুদ্ধে নিহত কয়েকজন মক্কাবাসীর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে কবিতা লিখেছিলেন। ইবন ইসহাকের মতে, প্রফেটের ইচ্ছানুযায়ী তার

www.pathagar.com

একজন অনুসারী প্রফেটকে বলে যে, সে কা'বকে মরতে পারবে, তবে মিথ্যার আশ্রয় নিতে হবে, ছলনা করতে হবে। এতে প্রফেট কোনো আপত্তি করেননি (Ridinson 1976, P. 176)। সুতরাং ৬২৪ সালে জুলাই মাসে যখন কা'ব তার নতুন বৌর সাথে ছিল তখন সেই অনুসারী ছলনা করে কা'বকে বাইরে ডেকে আনে এবং তরবারির কোপে দেহ থেকে মস্তক বিচ্ছিন্ন করে এবং ছিন্ন মস্তক প্রফেটের পায়ে এনে রাখে।

ইবন ইসহাক বলেন– কাবের মৃত্যুর পর প্রফেট ইহুদিদের ওপর বিরক্তি প্রকাশ করে শিষ্যদের কাছে বলেন– 'তোমাদের ক্ষমতার মধ্যে যে কোনো ইহুদিকে পেলে হত্যা করো।' এতে মুহাইসা নামে এক মুসলিম সুনাইনা নামে এক ইহুদি সওদাগরকে হত্যা করে যদিও সেই ইহুদি তার নিজের গোত্রের মানুষ ছিল। যখন সুনাইনার ভাই মুহাইসার বিরুদ্ধে গোত্রের মানুষকে হত্যা করার জন্য অভিযোগ করে তখন মুহাইসা বলেছিল, আমাকে যিনি হত্যা করতে বলেছিলেন, তিনি যদি তোমাকেও হত্যা করতে বলেন, আমি তা-ই করবো (Andrae 1960, P. 149)।

আর একটি ঘটনায়, একজন মক্কার কবি আবু আজ্‌জা বদরের যুদ্ধে বন্দি হয়, কিন্তু প্রফেট তাকে এই শর্তে ছেড়ে দেন যে, সে মুসলিমদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরবে না। আজ্‌জা মক্কায় ফিরে এসে মরু গোত্রদের প্রফেটের দলে যোগ না দেয়ার জন্য কবিতা লেখে; পরে ওহোদের যুদ্ধে আজ্‌জা ধরা পড়লে, সে বলে যে, যুদ্ধে কোনো অস্ত্র মুসলিমদের বিরুদ্ধে সে ধারণ করেনি। কিন্তু প্রফেটের ইশারায় তাকে মেরে ফেলা হয়।

ঐ যুদ্ধেই (ওহোদ) মাবিয়া ইবন মুঘিরা নামে এক মক্কান যুদ্ধের পর পেছনে পড়ে যায় মক্কার সেনাবাহিনী চলে যাওয়ার পর। এরপর মাবিয়া ইবন মুঘিরা গোপনে মদিনায়, প্রফেটের জামাতা ওসমানের সাথে দেখা করতে আসে এবং প্রফেটের কাছ থেকে তিন দিনের শান্তি-চুক্তি করে নিতে সক্ষম হয়। কিন্তু প্রফেট মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য তাকে ক্ষমা করতে পারেননি এবং যখন মুঘিরা মক্কার উদ্দেশ্যে যাত্রা করে তখন প্রফেট তার পেছনে কিছু লোক পাঠিয়ে হত্যা করান।

এর কিছুদিন পর লিহিয়ান গোত্র প্রধান সোফিয়ান ইবন খালিদ অন্য গোত্রের সাথে মিশে ওহোদের বিজয় মিছিলে যোগ দেয়। প্রফেট মোহাম্মদ এই সংবাদ শুনে আবদুল্লাহ্ ইবন ওনাইজকে পাঠান তাকে খুন করতে। তাকে নির্দেশ দেয়া হয় তার বিশ্বাস অর্জন করতে, দরকার হলে প্রফেটকে সে গালাগালি করতে পারে (Rodinson, 1974, P. 189)। সোফিয়ান আবদুল্লাহর ব্যবহারে সন্তুষ্ট হয়ে তাকে নিজের তাঁবুতে আমন্ত্রণ জানায়। পরে এক সময় আবদুল্লাহ্ সোফিয়ানকে খুন করে মাথা কেটে নেয় এবং ছিন্ন মস্তক প্রফেটকে এনে দেয় যখন তিনি মসজিদে ছিলেন, পুরস্কার স্বরূপ প্রফেট আবদুল্লাহকে নিজের লাঠি উপহার দেন (Muir 1912, P. 276)।

জীবনচরিতকার ইবন ইসহাস, ইবন হিশাম ও আল-ওয়াকিদী বর্ণনা করেন যে, ৬২৬ সালে প্রফেট একজন পেশাদার খুনি মক্কার আমর ইবন উমাইয়াকে নিযুক্ত করেন তার প্রধান শত্রু আবু সুফিয়ানকে হত্যা করার জন্য (Glubb 1979, P. 220)। আমর তার অভিযানে ব্যর্থ হয়, কিন্তু তিনজন মক্কীকে খুন করে চতুর্থজনকে ধরে এনে প্রফেটের কাছে হাজির করে। প্রফেট এই কাজের জন্য প্রশংসা করেন।

আল-ওয়াকিদী বর্ণনা করেন যে, নাদির গোত্রপ্রধান বয়স্ক ইহুদি আবু রাফি,

www.pathagar.com

প্রফেটের নির্দেশমতো সিরিয়ায় না গিয়ে, খায়বারের ইহুদি সম্প্রদায়ের সাথে রয়ে যায়। প্রফেট তার মৃত্যুর আদেশ দেন এবং ৬২৭ সালে ডিসেম্বর মাসে পাঁচ জনের একটি দল প্রতারণা করে তার বাসায় ঢোকে এবং সেই বৃদ্ধ ইহুদিকে খুন করে যখন সে ঘুমিয়ে ছিল। খুনিরা ফিরে এলে প্রফেট তাদের প্রশংসা করেন কিন্তু খায়বারের ইহুদিদের নিয়ে প্রফেট একটু বিচলিত হন, কেননা ওমাইর ইবন রাজিন তখন গোত্র প্রধান ছিলেন। ৬২৮ খ্রিঃ জানুয়ারি মাসে, প্রফেট একটা ডেলিগেশন খায়বারে পাঠান। এই ডেলিগেশনের প্রধান ছিলেন যোদ্ধা-কবি আবদুল্লাহ ইবন রাবাহা। এই ডেলিগেশন ওমাইরকে মদিনায় আমন্ত্রণ জানান এই আশ্বাস দিয়ে যে তাকে খায়বারের শাসক বলে ঘোষণা দেয়া হবে। মদিনা ডেলিগেশনে বিশজন বাছাই করা খুনি ছিল। আবদুল্লাহ ইবন ওনাইজ তাদের মধ্যে একজন। রাস্তার মাঝে মদিনা ডেলিগেশন অতর্কিতে ওমাইর পার্টির ওপর চড়াও হয়ে ইহুদিদের খুন করে। মুসলিম ডেলিগেশন ইহুদিদের খুন করে মদিনায় গিয়ে প্রফেটকে সুসংবাদ দেয়। প্রফেট মোহাম্মদ তখন আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করেন এই বলে যে শত্রুদের কাছ থেকে তিনি নিস্কৃতি পেলেন (Muir, 1912, P. 349)।

৬৩০ সালে যখন প্রফেট মোহাম্মদ মক্কা বিজয় করেন তখন তিনি কয়েকজন নির্বাচিত লোককে খুন করার আদেশ দেন। কিছু প্রতাপশালী পরিবারের সদস্য ও যারা ইসলাম গ্রহণ করে তাদের বাদ দিয়ে বাকি সকলকে হত্যা করার নির্দেশ দেয়া হয়।

ভিকটিমদের মধ্যে দু'জন গায়িকা ছিল, যারা প্রফেটকে ব্যঙ্গ করে গান গেয়েছিল। ইবন ইসহাক এক গায়িকার নাম বলেছেন ফারতানা, অন্যজনের নাম জানা যায়নি। কয়েকজন হাওয়ারিস্‌কেও হত্যা করা হয় যারা প্রফেটকে অপমানিত করেছিল যখন তিনি প্রথমে মিশন আরম্ভ করেন। এদের মধ্যে দুইজন কয়েকজন হাওয়ারিস্‌ ইসলাম গ্রহণ করে কিন্তু মক্কায় ফিরে এসে তারা আপন ধর্মে ফিরে যায়।

প্রফেট তার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এই ভাবে নির্দেশ দিয়ে গেছেন। উদাহরণস্বরূপ আইহালা ইবন কাব-এর ঘটনা ধরা যায়। আইহালাকে প্রফেটের মৃত্যুর একদিন আগে হত্যা করা হয়।

কয়েকজন পশ্চিমা স্কলার বলেছেন যে, প্রফেট তার জীবদ্দশায় যে রাজনৈতিক সন্ত্রাসের উদাহরণ রেখে গেছেন শতাব্দিকাল ধরে বর্তমান সময় পর্যন্ত সেই নীতি অনুসরণ করা হচ্ছে। 'এসাসিন' শব্দটি আসছে হাসান সাব্বা– সেই আলামুতের বৃদ্ধ ব্যক্তির গোষ্ঠীর নাম থেকে যারা গুপ্ত হত্যায় অনেক প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের হত্যা করেছে, নিজামুল মুলুক তাদের একজন।

উচ্চাকাঙ্ক্ষী শাসকদের জন্য গুপ্তহত্যা সহজ পথ। যার মাধ্যমে শত্রু নিধন করে ক্ষমতার রাস্তা পরিষ্কার করা হয়। এই পন্থায় অতি তাড়াতাড়ি বিরোধের অবসান হয়, প্রতিদ্বন্দ্বীকে স্তব্ধ করা হয়, ভয় দেখানো হয়, শত্রু নিধন হয়। সেই পথ মুসলিমরা এখনো অনুসরণ করতে কুণ্ঠিত হয় না, বিশেষ করে যারা ধর্মীয় গোষ্ঠী।

১৪.৪ অভিযান

মদিনায় স্থিতু হওয়ার দশ বছরের পর প্রফেট মোহাম্মদ ও তাঁর দল সওদাগরদের

www.pathagar.com

ক্যারাভান আক্রমণ করে ধনসম্পদ লুণ্ঠন শুরু করেন এবং নিজে কয়েকটি আক্রমণে নেতৃত্বও দেন। পশ্চিমা পণ্ডিতেরা প্রফেটের জীবনের এই অংশ বেশ ফলাও করে তুলে ধরেছেন।

সাধারণত এই সব অভিযানের (রাজিয়া বা খাজওয়া), বন্দি নারী ও শিশু, উট ও অন্যান্য দ্রব্যাদি তার দলের লোকজনদের মধ্যে ভাগ করে দেয়া হতো। আর পুরুষ বন্দিদের জবরদস্তি ধর্মান্তরিত করা হতো বা ক্রীতদাসে পরিণত করা হতো, নির্বাসনে পাঠানো হতো বা মেরে ফেলা হতো।

প্রফেট মোহাম্মদ কিভাবে বন্দিদের প্রতি ব্যবহার করতেন তা প্রাথমিক ঐতিহাসিকগণ বর্ণনা করে গেছেন এবং বন্দিদের হত্যা করার পর তিনি যা বলতেন তা শুনে তার সাহাবীরাও চমকে উঠত। প্রায়ই প্রফেটের সম্মুখেই বন্দিদের হত্যা করা হতো এবং তিনি বলতেন আল্লাহ তাঁর রসূল ও কোরানকে অস্বীকার করার জন্যই এই শাস্তি। ৬২৪ খ্রিঃ মক্কানদের বিরুদ্ধে বদরের যুদ্ধের পর বন্দিদের অবস্থা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এই ভাবেই হয়েছিল।

তাঁর প্রধান শত্রুদের মধ্যে একজন আবু জাহেলের ছিন্ন মস্তক যখন তাঁর পদতলে এনে ফেলা হয়, প্রফেট আল্লাহকে ধন্যবাদ দেন এবং তাঁর বিজয়ের উল্লাস প্রকাশ করেন। আবু জাহেল ৬২৪ খ্রিঃ বদরের যুদ্ধে মারা যান। তাঁর মন্তব্য ছিল, 'আরবের বাছাই করা উৎকৃষ্ট একটি উটের চাইতে এটা আমার কাছে গ্রহণযোগ্য।' একজন বন্দি নওফেল ইবন খোওয়ালিদকে বেঁধে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তখন আলী তাকে চিনতে পারেন। একবার প্রার্থনার সময় প্রফেট এই লোকটির মৃত্যু কামনা করেন এবং আলীর কানে এই প্রার্থনার শব্দ পৌঁছে অর্থাৎ তিনি পাশ দিয়ে যাবার সময় শুনতে পান। তাই আলী নওফেলকে দেখা মাত্র তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে হত্যা করেন। এ সংবাদ শুনে প্রফেট চিৎকার করে 'আল্লাহ মহান' উচ্চারণ করেন এবং বলেন 'এটা আমার প্রার্থনার উত্তর' (Muir, 1912, P. 227)।

আর একজন ভিকটিম হচ্ছেন কোরেশ গোত্রের গল্পকার নাদির বিন হারিথ। হারিথ এক সময় হিরাতে লাখমিদ রাজার দরবারে বাস করতেন। নাদির স্বভাবত গর্ব করতেন নিজের গল্পের সাথে প্রাচীন কিংবদন্তি নায়ক পারস্য দেশের রুস্তম ও ইসফানদারের সাথে যেসব কাহিনীর কথা কোরানে উল্লেখ আছে। তার এই গর্বিত আচরণের জন্য প্রফেট মোহাম্মদ তার সম্বন্ধে বলেছিলেন, এই লোকটির জন্য এক লজ্জাজনক শাস্তি অপেক্ষা করছে (৩১ : ৫)। নাদিরকে প্রফেটের সম্মুখে উপস্থিত করা হলে তার চোখ দিয়ে যেন আগুন ঝরে পড়ে। নাদির তার পাশের বন্দিকে বিড়বিড় করে বলেছিলেন– 'মৃত্যু সম্মুখে'। এর পর প্রফেটের নির্দেশে সাথে সাথে আলী তার মাথা কেটে ফেলেন।

আরও একজন বন্দির নাম ছিল ওক্‌বা ইবন আবু মুয়াইত। নিজেকে মৃত্যুর সম্মুখে দেখে ওক্‌বা ক্ষুব্ধ হয়ে বলেছিলেন, আমার ছোট কন্যাটি অনাথ হয়ে যাচ্ছে, তার ভার কে নিবে? প্রফেট মোহাম্মদ জবাবে বলেছিলেন– নরকের আগুন। তারপর আবার বলেন, আল্লাহকে ধন্যবাদ যে তোমার মৃত্যু আমার চক্ষু জুড়াবে।

প্রফেট মোহাম্মদ সঙ্কল্প করেছিলেন বদরের যুদ্ধবন্দিদের সকলকেই হত্যা

www.pathagar.com

করবেন, কিন্তু তাঁর সাহাবীগণ এই হত্যাকাণ্ড দেখে বিচলিত হন এবং মন্তব্য করেন এ হত্যাকাণ্ডে কোরেশ গোত্রের সাথে মুসলিমদের সম্পর্ক বেশি তিক্ত হবে এবং সব সময়েই যুদ্ধবিগ্রহ লেগে থাকবে। হয়তো এমনও হতে পারে কোরেশদের হাতে কোনো সময় পরাজিত হলে মুসলিম বন্দিদের দশা এমনই হবে। এই ভবিষ্যদ্বাণীতে প্রফেট কিছুটা নমনীয় হয়ে মুক্তিপণের বিনিময়ে বন্দিদের মুক্তির ব্যবস্থা করেন।

ইতিহাসবিদগণ বর্ণিত তাঁর অনেকগুলো 'plundering forays' ছাড়া, প্রফেট মোহাম্মদ ২৭টি বড় অভিযান সংঘটিত করেছিলেন এবং ৮৫টি অন্য ছোটখাটো পর্যায়ে অভিযান পরিচালনা করেন। এই অভিযানের প্রায় অনেকগুলো লাভজনক ছিল– আশাতীত যুদ্ধলব্ধ সম্পদ আহরিত হয় এবং প্রায় সমস্ত সম্পদ ধর্মীয় তাৎপর্যে ব্যবহৃত হয়।

অনেক সময় এই সব প্রাথমিক অভিযানগুলো পরে শত্রু ও বিধর্মীদের বিরুদ্ধে জেহাদের রূপ ধারণ করেছিল।

১৪.৫ মালে-গণিমত

কোরানে মুসলিমদের 'rich booty' শপথ করা হয়েছে (৪৮ : ২০) এবং এই শপথ বাস্তবায়িত হতে শুরু করে যখন প্রফেট মোহাম্মদ মদিনায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে মার্চেন্ট ক্যারাভানের ওপর অভিযান আরম্ভ করেন।

এই শপথ পরিপূর্ণ হতে থাকে যখন তিনি অন্য আরব গোত্রদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন– যেমন প্যাগন, ইহুদি ও খ্রিস্টান যারা তাঁকে প্রতিহত করতে চেষ্টা করে এবং যাদের জমি-জায়গা ও সম্পদ বাজেয়াপ্ত হয়। তাঁর সমস্ত অনুসারীগণ সেই যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদের বখরা পেয়েছে, যার মধ্যে উট, ছাগল, ভেড়া এবং প্রায় পুরুষ ও নারী ক্রীতদাস শামিল ছিল। ১/৫ অংশ পেতেন প্রফেট নিজে (৮ : ৪২)।

কিন্তু প্রফেটের মৃত্যুর পর এই শপথ পরিপূর্ণ হয়েছিল যখন বিদেশীদের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু হয়।

বলা হয় যে, যখন আরবরা পারস্যের শীতকালীন রাজধানী স্টেসিফোন (মেদিয়ান) ৬৩৭ সালে মার্চ মাসে অধিকার করে তখন তারা যে সৌন্দর্য ও সম্পদ দেখেছিল তখন চোখ কপালে উঠে যায় এবং আল্লাকে ধন্যবাদ জানায় এই বলে যে, এতদিনে শপথ পরিপূর্ণ হলো এবং ভাবল স্বর্গ তো পৃথিবীতেই।

চারদিকে সোনা-রুপার অলঙ্কার, দামি দামি বড় বড় চুন্নি, পান্না, পাথর এবং অন্যান্য মূল্যবান অমূল্য দ্রব্য আরবদের মাথা ঘুরিয়ে দেয়। কর্পূর, মিশক এবং মূল্যবান মশলাপাতির বস্তায় স্টোর রুম পরিপূর্ণ এবং প্রত্যেক কামরা ও বারান্দা পাফিউমের সুগন্ধে মৌ মৌ।

প্রত্যেক ঘরে কার্পেট পাতা যা তারা কখনো দেখেনি; একটা বড় ঘরের প্রবেশপথের সম্মুখে কার্পেট টাঙানো যেখানে বাগানের নকশা এবং এর জমিন নকশা করা হয়েছে সোনা, রুপার সুতো দিয়ে তার ওপর এমারেল্ড বসানো। ছোট নদী মুক্তা দিয়ে তৈরি, রুবি দিয়ে গাছ ও ফুল আঁকা– যেন স্বর্গের পরিবেশ। যেহেতু লব্ধ সম্পদগুলো নির্দিষ্ট অংশে ভাগ হবে, তাই এই মহামূল্য কার্পেটকে খণ্ড খণ্ড করা হয়

www.pathagar.com

যাতে সকলের ভাগে এক খণ্ড করে পড়ে, অন্যান্য দ্রব্যের সাথে।

প্রাথমিক বিজয়গুলোর বাহ্যত উদ্দেশ্য ছিল ইসলাম প্রচার করা; কিন্তু বিজয়ীরা শীঘ্র দেখতে পেল যে এই সমস্ত সম্পদ খোদা প্রদত্ত এবং এই ঈশ্বর প্রদত্ত ঐশ্বর্যের জন্য অভিযান ও আগ্রাসনের প্রয়োজন, যার অপরিমিত সুযোগ রয়েছে। বিজয়ীরা অনুভব করল যে আল্লাহ তাদের জন্য দুনিয়া জুড়ে সম্পদ ভাণ্ডার সঞ্চিত করে রেখেছে এখন শুধু অভিযান চালিয়ে সে সম্পদ দখল করা। প্রথম উদ্দেশ্য হলো অর্থনৈতিক; তারপর সাম্রাজ্য, কর আদায়, সম্পদ ও ক্রীতদাস।

প্রত্যেক বিজয়ের পর পাওয়া গেল সুন্দরী যুবতী নারী, যাদের মধ্যে অনেকে উচ্চবংশীয় তারা বিজয়ীদের সম্পূর্ণ অধিকারে। ৭৪৫ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় মারওয়ানের সময় কাস্পিয়ান অঞ্চল বিজয়ের পর সুন্দরী সারকেসিয়ান (circassion) রমণী পাওয়া গেল। খলিফা তার হারেমের জন্য ছয় শত এমনি যুবতীদের যোগাড় করতে আদেশ করলেন। খলিফা আল মোতোয়াকিলের চার হাজার উপপত্নী ছিল। প্রত্যেকের অবস্থান অনুযায়ী যেমন প্রিন্স, জেনারেল এবং অন্যরা তাদের পদমর্যাদানুসারে রমণী বাছাই করলেন। সাধারণ সৈনিকদেরও এই সব কোমল ও নরম দেহী মানুষের বন্টন থেকে বঞ্চিত করা হলো না।

খ্রিস্টান লেখক আল-কিন্দি (মৃ. ৯১৫) তার পুস্তক 'Apology'তে যুদ্ধ বিজয়ের পর এসবের বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন।

সাম্রাজ্য বিস্তার প্রক্রিয়ায় খলিফারা অঢেল সম্পদ আহরণ করেছেন। আরব ঐতিহাসিকগণ খলিফাদের সম্পদের বর্ণনা দিতে দিশাহারা হতেন এমনকি তাদের অধীনে প্রধান অমাত্য ও সেনাপতিদের সম্পদের অবস্থাও তেমনি। এছাড়া ছোট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আঙুল ফুলে কলা গাছ। প্রত্যেক অভিযানে প্রত্যেক অশ্বারোহী আহৃত সম্পদ থেকে ব্যাপকভাবে সোনা-রুপা নিয়ে যেত।

হিসাব করে দেখা গেছে, প্রত্যেকে তাদের জীবনযাপন করেছে শত শত পুরুষ ও নারী ক্রীতদাসের মালিক রূপে। বিশাল আকারের জমি, উৎকৃষ্ট ঘোড়ার স্টেবল্, উট, গরু-ছাগল-ভেড়ার পাল। ছালা ভরা সোনা-রুপা ও মূল্যবান পাথর মালিক হিসাবে। এক হিসাব অনুসারে বলা হয়– পৃথিবীর ইতিহাসে এমন সম্পদের চমক আর কোথাও দেখা যায়নি।

উমাইয়াদের সময় থেকে খলিফা ও দরবারি মানুষরা প্রভূত আরাম-আয়েসে বাস করেছেন। তারা তাদের জন্য বিশাল প্রাসাদ গড়েছেন। সুদৃশ্য স্থাপত্য ও পেনটিং-এ বৃক্ষ, প্রাণী ও নারীমূর্তির প্রতিরূপ অঙ্কন করিয়েছেন। তারা তাদের সপ্তাহ কাটিয়েছে হান্টিং-হাউসে যেখানে মদ্যপানের পার্টি হয়েছে, অসংখ্য ক্রীতদাস ও বাইজীর দ্বারা মনোরঞ্জন করেছেন এবং এই লাইফ-স্টাইল শুধু দামেস্ক ও আলেকজান্দ্রিয়ায় ছিল না, বাগদাদ ও বসরায় ছিল; ছিল না শুধু মক্কা ও মদিনা শহরে।

১৪.৬ বিজয় ও কনভারশন

প্রথম জীবনে প্রফেট মোহাম্মদ প্যালেস্টাইন ও সিরিয়ার বাণিজ্য যাত্রায় খ্রিস্টানদের সার্বজনীন সম্পর্ক দেখে অভিভূত হয়েছিলেন। যদিও প্রথমে তিনি ইসলামকে মূলত

www.pathagar.com

'আরব ধর্ম' রূপে ভাবতেন কিন্তু তার প্রভাব-প্রতিপত্তি বাড়ার সাথে তিনি বিশ্বাস করেছিলেন যে ইসলামকে ব্যাপকভাবে বিস্তৃত করার সুযোগ রয়েছে এবং শেষে তিনি কোরানে পরবর্তী সূরাতে বলেছিলেন যে আল্লাহ তাঁকে পাঠিয়েছেন 'ইসলাম ধর্মকে সকল ধর্মের ওপর বিজয়ী করতে' (৯ : ৩৩)।

তাঁকে প্রফেট হিসাবে অস্বীকার করায় তিনি খ্রিস্টান ও ইহুদিদের ওপর অসহিষ্ণুতার ভাব ব্যক্ত করেন এবং মক্কার বিরুদ্ধবাদীদের স্তব্ধ করে তিনি আরব থেকে অন্যান্য ধর্ম উচ্ছেদ করতে প্রয়াসী হন। ইহুদিদের উন্নত শহরগুলোকে যেমন, কাইনুকা, নাদির, কোরাইজা, খাইবার, একের পর এক দখল করতে থাকেন। ইহুদিদের উচ্ছেদের পর তিনি দৃষ্টি দেন খ্রিস্টানদের দিকে এবং তাঁর জীবনের শেষ দিকে, তিনি পরিকল্পনা করেন আরবের বর্ডার অঞ্চল দিয়ে অভিযান চালাবার জন্য কিন্তু জ্বর তাকে পৃথিবী থেকে তুলে নিয়ে যায়।

প্রফেট মোহাম্মদ যে পরিকল্পনা করেছিলেন, তাঁর মৃত্যুর পর খলিফা আবু বকর ও ওমর তার বাস্তবায়নে রূপ দেয়ার চেষ্টা করেন। তৃতীয় খলিফা ওসমানের রাজত্বের শেষ দিকে, আরবে বসবাসরত সকল ইহুদি ও খ্রিস্টানদের জবরদস্তি মুসলমান করা হয় বা হত্যা করা হয় যাতে, যেমন প্রফেট মোহাম্মদ মৃত্যুশয্যায় দাবি করেছিলেন, অন্য কোনো দ্বিতীয় ধর্ম আরব পুণ্য ভূমিতে থাকবে না।

আরবের বাইরের দেশগুলি বিজয়ের পর সেই একই প্যাটার্ন অনুসরণ করা হয়। প্যালেস্টাইন, মেসোপটেমিয়া এবং সিরিয়ায় খ্রিস্টান রাজ্য ঘাসান, লাখমিদ ও তাঘলিব দখল করা হয় এবং সকলেই মুসলিম হয় কিংবা প্রাণ হারায়। মধ্যপ্রাচ্যে অনেক উন্নয়নশীল খ্রিস্টান সম্প্রদায় এবং আশপাশে যারা ছিল সকলেই এই ভাবে নির্মূল হয়।

সাসানিয়ান ও বাইজাইনটাইন প্রদেশগুলো যে দ্রুততার সাথে মুসলিম দখলে আসতে লাগল এতেই বিজয়ীরা উৎসাহিত হলো আরও আক্রমণ ও জয়ের জন্য। তাই তারা দৃষ্টি দিল অন্য দিকে। যে বেগ বিজয়ীদের মধ্যে সৃষ্টি হলো তাকে থামানো গেল না, অন্য এলাকার দিকে অভিযানের পরিকল্পনা শুরু হলো।

প্রায় মুসলিম ঐতিহাসিক দাবি করেন যে মুসলিম বিজয় জবরদস্তি কনভার্সনে জড়িত ছিল না। এই নতুন ধর্ম বুঝতে সরল ছিল এবং নীতিও খুব সহজ, কারণ এ ধর্ম সাম্য-বিশ্বাসী এবং বিজিত লোকেরা যে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলে অনেক সুবিধা ও সুযোগ আছে। এই কনভার্সান জবরদস্তি নয়, স্বতঃস্ফূর্ত ও শান্তিপূর্ণ ছিল। অন্য পণ্ডিতদের মতে, বাস্তব ঘটনা অন্যরূপ। স্বতঃস্ফূর্ত কনর্ভাসন কদাচিৎ ঘটেছে, কিন্তু বেশির ভাগ মানুষ যারা নিজের ধর্মে অটল থাকতে চেয়েছে তাদের সম্মুখে বহু বাধা সৃষ্টি করা হয়েছে যাতে তাদের প্রাণের ভয়ে ইসলাম গ্রহণ করা ছাড়া আর অন্য পথ ছিল না। মৃত্যুপথই অন্য পথ ছিল।

মুসলিম শাসকরা বিধর্মীদের পেছনে লেগে থাকত, তাদের প্রতি অত্যাচার ও হয়রানি করত ইসলাম গ্রহণ করতে। কনভার্সন শুধু প্রথম জেনারেশনে হতো তারপর আর দরকার হতো না কারণ যদি একবার জবরদস্তি মুসলিম হয়, তার বংশধররা মুসলিম থাকত, ঈমান ঠিক না থাকলেও ধর্ম অব্যাহত থাকত।

www.pathagar.com

বিজয়ের পর মুসলিম সেনারা নির্মমভাবে রাজ্যদখল করেছে এবং ইসলামের প্রসার হয়েছে তারপর জবরদস্তি দীক্ষা নিয়েছে নতুন ধর্মে বিজিত দেশবাসীগণ, তাছাড়া গত্যন্তর ছিল না। উত্তর আফ্রিকা, মধ্যএশিয়া ও ইন্ডিয়ার বিশাল অংশ এইভাবে দখল হয়ে, কনভার্সন হয়েছে। যেখানে মুসলিম দখলদার রূপে গেছে 'process of religious cleansing'.

পারস্যে প্রাচীন জোরাস্ত্রার ধর্ম মুছে গেছে। মধ্যএশিয়ায় বুদ্ধবাদ, খ্রিস্টানিটি ও অন্য প্রাচীন বিশ্বাস পাশাপাশি বহুদিন বাস করার পর, ইসলাম যখন এলো তখন এসব ধর্ম আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল। পূর্বদিকে সিন্ধু দেশে এবং পরবর্তীতে ভারতের অন্য অংশে ভারতীয়রা নতুন ধর্মে যেভাবে দীক্ষা নিতে বাধ্য হলো হিন্দুরা আজও সে দৃশ্য ভোলেনি।

উত্তর আফ্রিকাতে সেই একই প্রক্রিয়া চলেছে, যদিও দুই শতাব্দির অধিককাল উপকূল এলাকায় মুসলিম বিজয় সীমিত ছিল। টলেমিক যুগের পর আলেক্সজন্দ্রিয়া ছিল খ্রিস্টানদের নগরী, আসলে উত্তর আফ্রিকার সমস্ত অঞ্চল মিসরের কূল থেকে মোরিতানিয়া (মরক্কো) পর্যন্ত বাইজানটাইনদের কবলে ছিল।

উত্তর আফ্রিকার অনেক শহরে খ্রিস্টান গভর্নর ছিল এবং বিশাল খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের যোগাযোগ ছিল রোম, আলেক্সজন্দ্রিয়া ও কনস্ট্যান্টিনোপলের চার্চের সাথে। সিরেনাইকা (লিবিয়া) সাইনেসিয়াসের (মৃ. ৪১৩) সাথে যোগাযোগ রেখেছিল। সাইনেসিয়া টলেমাইসের (Ptolemais) বিশপ ছিলেন। কার্থেজ (টিউনিসিয়া) 'ছোট রোম' নামে অভিহিত ছিল যেখানে তারতুলিয়ান (মৃ. ৩০) এবং সেন্ট সাইপ্রিয়ান (মৃ. ২৫৮) উভয়ের বাসস্থান ছিল এবং কাজও করেছেন। নিউমিডিয়ার হিপ্পো (আলজেরিয়া তখন ছিল নিউমিডিয়া) সেন্ট আগাস্টাইনের (মৃ. ৪৩০) সহযোগী ছিলেন। মুসলিম দখলের সাথে উত্তর আফ্রিকার চার্চগুলো হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল। খ্রিস্টানিটি বিলুপ্ত হলো; সমস্ত অঞ্চল ইসলামীকরণ হলো এবং সেখানকার প্রাচীন ধর্ম সব মুছে ফেলা হলো।

এশিয়া মাইনর (আধুনিক তুরস্ক) প্রখ্যাত সাধু ও ধর্মবিদদের শুধু পূর্বাঞ্চলীয় চার্চের জন্য নয়, সারা খ্রিস্টানডম জুড়ে– জন্য গর্ব করতে পারে। যেমন সেন্ট জন দ্য ডিভাইন (মৃ. ১০০)-এর পাটমস ও ইফেসাসের সাথে যোগাযোগ ছিল; পলিকার্প (মৃ. ১৫৫) ছিলেন স্মার্নার (ইজমির) সাথে; সেন্ট জর্জ (৩০০) ছিলেন প্যাফলাগোনিয়ার সাথে; থিওডোর অব মপসিউএসটিয়া (মৃ. ৪২৯) ছিলেন সাইলেসিয়ার সাথে এবং সেন্ট বাসিল দ্য গ্রেট (মৃ. ৩৭৯), গ্রেগরি অব নাজিয়ানসাস (মৃ. ৩৯০) এবং গ্রেগরি অব নাইসা (মৃ. ৩৯৫) ছিলেন কাপ্পোডোসিয়ার সাথে।

ঐ অঞ্চলে দশ আর্কবিশপ্রিক ছিল, ৪৫ মেট্রোপলিটানেট এবং ৩৭০৩-র বেশি ছিল বিশপ্রিক এবং শতাব্দি ধরে খ্রিস্টানদের ইতিহাস চলে আসছিল। কিন্তু অটোম্যান সেলজুকদের আগমনের পর ক্বচিৎ দু'একটি ছাড়া আর কিছুই থাকেনি।

১৪.৭ জিহাদ

'জিহাদ' শব্দের অর্থ প্রচেষ্টা আল্লাহর কারণে (৪ ঃ ৩৯); কোরানের বেশ কয়েকটি

www.pathagar.com

স্থানে উল্লেখিত হয়েছে। সাধারণভাবে ব্যাখ্যা করা হয় বিধর্মীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অর্থাৎ ধর্মযুদ্ধ। যারা জিহাদ করে তাদের মুজাহিদ বলা হয় এবং তার ধর্ম হচ্ছে অবিশ্বাসীদের মুসলমান করা বা তাদের ধ্বংস করে ইসলাম বিস্তার করা।

প্রফেট বলেছেন, মুসলিম ঈশ্বরের কারণে কখনো যুদ্ধ বন্ধ করবে না। মুসলমানদের বদ্ধমূল ধারণা যে তরবারি হচ্ছে বিশ্বাসের প্রতীকী অস্ত্র যা ইসলামের জন্য সব সময়েই খোলা থাকবে এবং অনেক শতাব্দি ধরে জিহাদ মুসলমানদের ধর্মীয় কর্তব্য বলে মনে করা হয়েছে।

বিশ্বাস করা হয় যে জিহাদে মারা গেলে সে ব্যক্তি 'শহীদ' হয় এবং সরাসরি বেহেস্তবাসী হয়ে যায়! মনে করা হয় এই বেহেস্তেরও তার সর্বসুখ উপভোগের লোভ দেখিয়ে হয়তো সরল মানুষকে এই জিহাদের পথে টানা হয়েছিল যার জন্য সামান্য ছুতো ধরে মুসলিমরা অমুসলিমদের বিরুদ্ধে আগ্রাসন চালিয়েছিল।

অনেক মহলে জিহাদকে মনে করা হয় সারা দুনিয়ার মানুষ ইসলামভুক্ত করার এক অনন্ত প্রয়াস। এই ইসলামীকরণকে মনে রেখে আধুনিক জিহাদি প্রবক্তাগণ পুরনো ধারণাকে পুনর্জাগরিত করছেন এবং বলছেন যে সত্যিকারের মুসলিমদের জন্য পৃথিবীতে দু'টি ক্যাম্প বা শিবির বিরাজ করছে। একটি হচ্ছে দারুল ইসলাম অন্যটি হলো দারুল হাবার অর্থাৎ এক অংশ মুসলিমদের বাসভূমি, অন্য অংশ অমুসলিমদের, যেমন ইউরোপ ও আমেরিকা। খ্রিস্টানডম হচ্ছে বিরোধের জন্য উৎকৃষ্টভূমি। এই বিরোধ ভূমি সব সময়ের জন্য যুদ্ধক্ষেত্র রূপে পরিগণিত হবে যতদিন না এটাকে দারুল ইসলামে পরিণত না করা হয় (D. B. Macdonald in SEI, 1974 P. 69)।

পশ্চিমা গণতন্ত্র বিলুপ্ত (effete) বলে মনে হয়, যেখানে কোনো নীতির নির্দেশ নেই। স্বাধীনতা ও সহিষ্ণুতা রূপকথায় তারা অন্ধ, তারা ইসলামের আপোষহীন কর্তৃত্বের কাছে সহজে ভিকটিম হয়ে যাবে। পশ্চিমারা আজকে এমন আত্মস্থ যে তারা ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক অবস্থান থেকে সরে গেছে। তাদের এখন অতি সহজেই ইসলামের পক্ষপুটে আনা যায়, সেই উদ্দেশেই এই আধুনিক জিহাদ।

মুসলিমরা ইউরোপ ও আমেরিকাতে অতি অল্প স্থানে মজবুত হয়ে গেড়ে বসেছে এবং মনে করে যে এইসব স্থানে সুসংহতভাবে তাদের কার্যক্রম চালিয়ে আরো ভেতরে ঢুকতে পারবে। একবার পশ্চিম দেশগুলো ইসলামীকরণ হলে, অন্যান্য বিধর্মী দেশগুলো পাকা ফলের মতো টুপটুপ করে ইসলামের কোলে আশ্রয় নিবে। পশ্চিমা দেশ বিজিত হলে, প্রফেটের বাণী সারা পৃথিবীতে অগ্নিশিখার মতো ধাবিত হবে।

আজকাল বিধর্মী পশ্চিমা দেশে যেসব মুসলিম বাস করে, বলা হয়, তাদের ধর্ম পালন ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে স্বাধীনতা আছে, কোনো বাধা নেই। প্রচার ও ব্যক্তিগত সংযোগে প্রফেটের বাণী প্রচার করা প্রয়োজন। মাইনরিটি সম্প্রদায় হিসাবে বিশেষ-সুযোগ-সুবিধার জন্য দাবি জানাতে হবে। সরকারে, ব্যবসা-বাণিজ্যে, মিডিয়ায়, আইনি পেশাতে, চিকিৎসাবিদ্যায়, বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও টিচিং পেশায় বিশেষ স্থান অধিকার করতে হবে। সুযোগমতো মুসলিম সম্প্রদায়ের উপস্থিতি ও দাবি-দাওয়াকে জোরালো ভাষায় ও বক্তৃতায় তুলে ধরতে হবে।

ইসলামে নির্ধারিত পদ্ধতিতে অর্থাৎ বহু বিবাহের মাঝে জনসংখ্যার বৃদ্ধি করতে

www.pathagar.com

হবে এবং বৈধ ও অবৈধভাবে যত পারা যায় মুসলিমদের পশ্চিমা দেশে অভিবাসন করাতে হবে। স্থানীয় ও কেন্দ্রীয় লেভেলে বাস্তবে বেশি করে মুসলিম প্রতিনিধি প্রেরণ করতে হবে এবং স্থানীয় ও কেন্দ্রিক অটোনমির জন্য চেষ্টা চালাতে হবে। যখন ব্যালেন্স ও পাওয়ার এদিক ওদিক হবে মাইনরিটি থাকলেও সরকারে অংশীদারিত্ব পেলে নীতি নির্ধারণ ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কাজে তখন কর্তৃত্ব খাটানো যাবে। তখন তারা ইসলামী মৌলবাদ বাধাহীনভাবে দেশে প্রতিপালন করতে পারবে- যেমন স্কুলে ও অফিসের কাজে নামাজের সময় পাওয়া যাবে এবং শিক্ষা কারিকুলামে ইসলামী আদর্শ এবং লিগ্যাল কোডে শরিয়া আইন যুক্ত করতে হবে।

মুসলিমদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে ইসলামী ও খ্রিস্টানিটি সম্পূর্ণ আলাদা ধর্ম। ইতিহাস থেকে প্রমাণিত হয় যে এই দুই জাতির মধ্যে কখনো সমঝোতা হবে না। দুই জাতিকে এক করার জন্য বা সহঅবস্থানের জন্য কখনও চিন্তা করা উচিত নয়, সমঝোতা বা কম্প্রোমাইজও সম্ভব নয়। যদি কোনো সুবিধা দেয়া হয় তাহলে তা হোস্ট কান্ট্রি দিবে।

অন্তত যতদিন তেলের গতি (ফ্লো) সচল থাকবে, মুসলিম ওয়েল স্টেটগুলোকে অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টি করতে হবে, যাতে বিদেশী শক্তি তাদের দেশে বাসরত মুসলিমদের ওপর কোনো হয়রানি না করে। ইসলামের জিহাদের মাধ্যমে জয় সুনিশ্চিত, তখন সারা দুনিয়ায় থাকবে অবিভাজ্য মুসলিম সম্প্রদায়।

অনেকে মনে করেন মুসলিমদের এক সম্প্রদায় এক পৃথিবী একটি অবাস্তব কল্পনা, স্বপ্ন-পাইপড্রিম। তাদের ধারণায়, সারা দুনিয়ায় মুসলিম সম্প্রদায় হলেও তারা সুখে বাস করতে পারবে না, কেননা শিয়া-সুন্নির মধ্যে নিজের দেশে এখনো মারকাট চলছে, তাছাড়া আহমাদিয়া ও বাহাই তো আছেই। এটা চিন্তা করা অবাস্তব যে, কিছু কনভারশন অর্থ এই নয় যে, বুদ্ধ, হিন্দু, শিখ ও ইহুদি এবং অন্যান্য বিধর্মী গ্রুপ যেমন নাস্তিক, হিউম্যানিস্ট, অজ্ঞেয়বাদী, ও মার্ক্সিস্ট সকলেই যে মুসলিম হয়ে যাবে তা সুদূর পরাহত, আর খ্রিস্টান বিশ্ব ভাঙ খেয়ে বসে থাকবে না যে ভেড়ার মতো সুড়সুড় করে ইসলামের গোয়ালে ঢুকে যাবে।

পৃথিবীটাকে দারুল ইসলামে ও দারুল হারাবে দুই শিবিরে ভাগ করা আধুনিক যুগে প্রলাপ উক্তি ছাড়া আর কিছু নয়- it makes no sense at all. মুসলিম সংস্কারকগণ পুরনো শরিয়া আইনকে সংশোধন করে একটা তৃতীয় পথ স্বীকার করে- যাকে বলা হয় আপোষের পৃথিবী (দারুল সুলহ্)। এই ভিত্তি হলো সন্ধি, যেটা মানতে হবে ঐ সব মুসলিমদের যারা অমুসলিম দেশে বাস করে। সাধারণত তাদের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে, যে দেশে বাস করবে সেদেশের আইন-কানুন মেনে চলবে, একজন ভালো নাগরিক হিসাবে শান্তি, শৃংখলা রক্ষা করে চলবে।

জিহাদের ধারণাকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে বর্তমান যুগের প্রেক্ষিতে। মিলিট্যান্ট বা উগ্র জিহাদ যুক্তিযুক্ত ছিল ইসলামের প্রথম যুগে, যখন ইসলাম ধর্ম প্রচারের প্রক্রিয়া চলছিল এবং বিরোধী দলকে ঠেকাতে হয়েছিল। আজকাল জিহাদ সমাজ সংস্কারের অর্থে ব্যবহৃত করতে হবে, সামাজিক অপকর্মের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে, আর নিজের নফ্‌সের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে হবে, যাকে বড় জিহাদ বলা হয়। সারা

www.pathagar.com

দুনিয়াটাকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করার জন্য সামরিক সংঘর্ষের কোনো কথা এখন অবাস্তব, আর খাটেও না। এখন যদি ঐ পুরনো ধারণায় কেউ জিহাদের ডাক ডাকে যে কোনো ছুতোকে কেন্দ্র করে তাহলে সে বা সে দেশ, উপহাসের পাত্র হবে মাত্র, আর এই জন্য এসব ডাকের গোঁড়া উপড়ে ফেলতে হবে।

১৪.৮ প্যাক্স ইসলামিকা

অমুসলিমদের প্রতি মুসলিমদের দৃষ্টিভঙ্গি বিভিন্ন শাসকের অধীনে বিভিন্ন রূপ ধারণ করেছে। কোনো কোনো শাসকের ন্যায়পরায়ণতা দৃষ্টান্তমূলক, কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রে গোঁড়া মৌলবাদী যা ন্যায়বান শাসকদের নিষ্প্রভ করে দেয়। উমাইয়া খলিফা দ্বিতীয় ওমরের ননমুসলিমদের বিরুদ্ধে কড়া আইন-কানুন, আব্বাসি খলিফা আল-মুতওয়াক্কিলের সময় আরো কড়কাড়ি হয়েছে এবং একটা স্ট্যান্ডার্ড পলিসি খলিফারা পালন করে এসেছেন। প্যান ইসলামের অধীনে, কেবলমাত্র মুসলিমকে পূর্ণ নাগরিকত্ব দেয়া হয়েছে এবং এর খুব কম সাক্ষ্যই আছে, যেখানে মুসলিম শাসকরা অমুসলিমদের প্রতি সহিষ্ণু ছিল।

থিওরি অনুযায়ী মূর্তিপূজক ও নাস্তিক যারা মুসলিম রাষ্ট্রে বাস করত (দারুল ইসলাম) তাদের হয়তো ধর্মান্তর করতে হতো কিংবা ক্রীতদাসরূপে বিক্রীত হতে হতো, কিংবা তরবারির নিচে ঘাড় পেতে দিতে হতো। যদিও এই ধরনের আচরণ সাধারণত ঘটত না, তবে এটা সত্য যে রাষ্ট্রের কাছ থেকে তাদের কোনো নিরাপত্তা ছিল না এবং আইনে তারা, বলতে গেলে, ব্যক্তি হিসাবে গণ্য হতো না। তাই, প্রায় এই অবস্থায়, বাঁচার জন্য, সকলেই ইসলামে দীক্ষা নিত।

অমুসলিম 'আহলে কিতাব' যেমন ইহুদি ও খ্রিস্টান, যদিও তাদের জবরদস্তি মুসলিম করা হতো না, তবু হরেক রকম অসুবিধায় তাদের পড়তে হতো। এ ধরনের নন-মুসলিম মাইনরিটিদের জিম্মি শ্রেণীভুক্ত করা হতো এবং জীবনে নিরাপত্তা ও সংরক্ষিত স্বাধীনতা ছিল। বিনিময়ে তাদের জিজিয়া কর দিতে হতো; তারা ছিল দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক। এই বৈষম্য নীতির কারণে অনেকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হতো।

জিম্মিরা তাদের নির্দিষ্ট এলাকার মধ্যে বসবাস করত এবং তাদের ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক জীবনের উন্নয়ন করার কোনো স্কোপ বা রাস্তা ছিল না। তাদের সরকারি কোনো উচ্চপদে নিয়োগের সম্ভাবনা ছিল না, যদিও অনেক ইহুদি ও খ্রিস্টানকে সরকারি নিম্ন পদে নেয়া হতো এবং অনেকে অন্য দিক দিয়ে বেশ উন্নতি করে ফেলত; কারণ এই সম্প্রদায় লেখাপড়ার দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখত এবং শিক্ষিত হওয়ার কারণে সরকারি কাজের জন্য অপরিহার্য হয়ে উঠত।

জিম্মিদের থাকতে হতো এমন স্থানে যা সাধারণত লোকচক্ষুর অগোচরে। তাদের ভালো পাকা দালান বা প্রাসাদ তৈরি করতে দেয়া হতো না কিংবা বেশি স্টাইলের সাথে জীবনযাপন করতে দেয়া হতো না যদিও অনেকে তা পারত; কারণ এতে মুসলিমদের অপমান করা হবে। কোনো কোনো শাসকের অধীনে তাদের নির্দিষ্ট পোশাক পরিধান করতে হতো, যাতে মুসলিমদের সাথে তাদের তফাৎটা বোঝা যায়। অবিশ্বাসীরা মুসলিম রমণী বিবাহ করতে পারত না। এটা কোরানিক বিধান (৬০ :

www.pathagar.com

১০), কিন্তু মুসলিমদের অমুসলিম মেয়ে বিয়ে করতে বাধা ছিল না। শরিয়া আইন প্রায়ই জিম্মিদের অসুবিধার সৃষ্টি করত। অমুসলিমদের সাক্ষ্য মুসলিমদের বিরুদ্ধে আদালতে গ্রাহ্য হতো না।

ধর্মীয় বৈষম্য ছিল কড়াকড়ি। খ্রিস্টানদের বেলায়, যদিও ধর্মীয় স্কুল ও চার্চ যা ছিল সেগুলো ধ্বংস করা হয়নি, চার্চ বা ধর্মীয় স্কুল নতুন করে প্রতিষ্ঠা করার নিয়ম ছিল না বা যা ছিল তা সংস্কার করারও অনুমতি মিলত না। কোনো কোনো সময়ে চার্চকে মসজিদে পরিণত করা হতো। ধর্মীয় অনুষ্ঠানে কড়াকড়ি ছিল যেমন বড় উৎসবে চার্চ প্রসেশন, চার্চ ঘণ্টা বাজানো বা জনসম্মুখে ক্রস প্রদর্শন নিষিদ্ধ ছিল। খ্রিস্টানদের ধর্ম প্রচার নিষিদ্ধ ছিল, ধর্মীয় পত্র-পত্রিকা বিলি করা বা প্রচার নিষিদ্ধ ছিল। ইসলাম ও প্রফেট মোহাম্মদের বিরুদ্ধে সমালোচনা অপরাধ বলে স্বীকৃত হতো। কোনো কোনো ক্ষেত্রে, যেমন তঘলিব খ্রিস্টানরা– তাদের সন্তানদের ব্যাপ্টাইজ করার অনুমতি ছিল না।

বেশির ভাগ মুসলিম দেশে নীতি ছিল অ-মুসলিমদের প্রতি চরম বৈষম্য বা শরিয়া আইন প্রচলন করা সকলের জন্য, সে মুসিলম হোক বা আর অন্য কিছু। সৌদি আরাবিয়া প্যাক্স ইসলামিক কড়াকড়িভাবে প্রয়োগ করে তার বিশাল অ-মুসলিম শ্রমিকদের জন্য কোনো উপাসনালয় তৈরি করতে অনুমতি দেয়নি– আর এতে নাকি সারা মুসলিম বিশ্বের নিঃশব্দ অনুমতি ছিল। কিন্তু মসজিদে মিনারেট নির্মাণের জন্য খ্রিস্টান ওয়েস্টের প্রধান প্রধান শহরে বিশাল অঙ্কের অনুদান দিয়ে থাকে সৌদি আরব।

বর্তমানকালেও ইসলামী রাষ্ট্রে জবরদস্তি ধর্মান্তকর চলছে যেমন মালয়েশিয়ার সাবা রাজ্যে ১৯৭০ দশকে হাজার হাজার অমুসলিমকে জোর করে মুসলিম করা হয়েছে। পাকিস্তান ও ইন্দোনেশিয়ার সরকার তাদের রাজ্যের প্রত্যন্ত অঞ্চলে এনিমিস্ট ও প্যাগন সাবজেকটদের ধর্মান্তরিত করেছে। সুদান সরকার-নীতি অনুযায়ী হিসাব করে খ্রিস্টান ও এনিমিস্ট সাবজেকটদের গণহত্যা শুরু করে তাদের সাফ করে দিচ্ছে প্রায় এক দশক ধরে। তবুও কোনো মুসলিম অর্গানেইজেশন থেকে এ সবের বিরুদ্ধে টু শব্দ নেই, কোনো প্রতিবাদ নেই অথবা আন্তর্জাতিক আইন ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য কোনো উচ্চবাচ্য নেই। কেউ কানাঘুষাও করে না।

মুসলিম দেশগুলো ক্রমান্বয়ে তাদের মাঝে খ্রিস্টানদের অবস্থান দুর্বিষহ করে তুলছে। এই সব কর্মকাণ্ড ১৯৮৫ সালে লাহোরে প্রথম মুসলিম কনফারেন্সে যে নীতি গ্রহণ করা হয় পরবর্তীতে জার্মানি, সুইজারল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া ও অন্যান্য স্থানে অনুষ্ঠিত মুসলিম কনফারেন্সে গৃহীত নীতির প্রতিধ্বনি। এই সব কনফারেন্সের ঘোষিত নীতি ছিল যে মধ্যপ্রাচ্যের সরকারগুলো তাদের নন-মুসলিম সাবজেক্টদের জন্য কোনো সুযোগ-সুবিধা দেবে না, কিন্তু ক্রমে ক্রমে বর্তমানে যে শর্তে তারা বসবাস করছে সেগুলোকে আরো সঙ্কুচিত করবে যাতে আস্তে আস্তে তারা দেশ ছেড়ে দেয় এবং সারা মধ্যপ্রাচ্য ইসলামীকরণ হয়ে যাবে। এই প্রক্রিয়ায় ইহুদিরা নির্মূল হবে এবং খ্রিস্টান ও নন-খ্রিস্টান মাইনরিটি যারা আছে তাদের চাপ দিয়ে মুসলিম বানাতে হবে কিংবা সরিয়ে দেয়া হবে। তাদের চার্চ ও ভজনালয় কিনে নেয়া হবে কিংবা জোর করে দখল করতে হবে (Hiskett 1993, P. 245)।

www.pathagar.com

১৪.৯ কাফের

কোরানে (২ ঃ ৩৭) অবিশ্বাসীদের কাফের বলা হয়, কারণ সে প্রফেট মোহাম্মদের বাণীর দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নেয়, পরিণামে সে সত্য ধর্মে বিশ্বাসী হয় না। 'কাফের' শব্দ সকল অবিশ্বাসীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এমনকি যারা মিথ্যা বিশ্বাস করে এবং সন্দেহবাদী তারাও কাফের। তাদের পাপ হচ্ছে অস্বীকৃতি এবং ঈশ্বরদ্রোহী (blasphemy); তাদের সাথে যোগাযোগ করলে অপরিচ্ছন্নতা (নাজাসা) আসবে, তাই যে কোনো উপায়ে তাদের পরিহার করো।

কাফেরদের মধ্যে বস্তুবাদীরাও (দাহরি) আছে। বস্তুবাদীরা নাস্তিক, যারা বলে ঈশ্বর প্রথম সৃষ্টি নয় (not first cause) এবং তার অস্তিত্বে বিশ্বাস করা ভুল। পলিথেইস্ট (ওয়াসান) বহুঈশ্বরে বিশ্বাস করে, তাই কাফের; যেহেতু সে মূর্তি (ওয়াসান) পূজা করে তাই কাফের এবং নাস্তিকের মতোই তাকে ঘৃণা করতে হবে।

এই সব লোকের উপস্থিতি সহ্য করা উচিত নয় এবং এদের বিরুদ্ধে কোরানে নির্দিষ্ট আছে– "যখন তুমি কাফেরের দেখা পাও, তার মাথা কেটে ফেলো, যতক্ষণ পর্যন্ত না তাদের সম্পূর্ণ রূপে পরাস্ত না করো" (৪৭ ঃ ৪)। "তোমরা তাদের হত্যা করছ না, হত্যা করছে আল্লাহ" (৮ : ১৭)। একটা অতিরিক্ত কথা জুড়ে দেয়া হয়েছে 'তরবারি আয়াতে' (verses of the sword) যেখানে মুসলিমদের বলা হয়েছে, 'খুঁজে বার করো, ওঁৎ পেতে বসে থাক, অবরোধ করো, ধরো এবং হত্যা করো কাফেরদের যেখানেই তাদের পাও, যদি না তারা মুসলিম হয় (৯ : ৫)। এই ধরনের কাফিরদের নরকের গভীরতম অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হবে।

তাহলে কেতাবিরা যেমন জোরাস্ত্রার, ইহুদি, খ্রিস্টান যারা মোহাম্মদকে শেষ ও শ্রেষ্ঠ নবী বলে মান্য করে না এবং যারা কোরান অস্বীকার করে তারাও কাফের পর্যায়ভুক্ত।

বলা হয় যে, জোরাস্ত্রিয়ানরা এক সময়ে সত্যিকার রিভিলেশন পেয়েছিল যা তারা এখন হারিয়ে ফেলেছে। তারা এখন জেন্দ ধর্ম অনুসরণ করে (জেন্দ আবেস্ত, তাদের বিকৃত পুস্তক)। তারা বিশ্বাস করে দু'টি অনন্ত নীতিতে– প্রিন্সিপল। একটা অন্ধকার, অন্যটা আলো। তাই এই দ্বিত্ববাদের কারণে তারা দোষী (জিনদিক)। কোরান স্পষ্টভাবে বলে যে, আল্লাহ নিজেই এনেছেন অন্ধকার ও আলো উভয়কেই (৬ :১ এবং অতুলনীয় ইসাইরা ৪৫ : ৭)

ইহুদিরা আব্রাহামের ধর্মকে বুঝতে ব্যর্থ হয়েছে এবং তার মূল শিক্ষা থেকে সরে গিয়ে নিজেদের পথ বেছে নিয়েছে, সত্যিকার ডকট্রিনকে ভ্রূকুটি করে, যে সত্য প্রফেট মোহাম্মদ আনয়ন করে কোরানে বিধৃত করেছেন। ইহুদিরা কঠিন অন্তঃকরণের লোক, তারা প্রফেট মোহাম্মদের মেসেজ দেখতে অস্বীকার করেছে এবং ইসলামে দীক্ষা নিতে অনীহা প্রকাশ করেছে। সুতরাং তারাও কাফেরদের মধ্যে গণ্য।

খ্রিস্টানরা বিশ্বাস করে যে ঈশ্বর সরাসরি নেমে এসে (হুলুল) যিশুকে ভর করে অবতার হয়েছেন। এটা শিরকভুক্ত এবং ঘৃণ্য। অথবা ঈশ্বরের একত্বের সাথে যিশুকে যোগ করে তাকে ঐশী গুণে গুণান্বিত করা হয়েছে। এইরূপে খ্রিস্টানরা মুশরিক এবং জোরাস্ত্রার ও ইহুদিদের মতো তারাও নরকে যাবে। সুতরাং যারা মুশরিক, তারা

www.pathagar.com

কাফির গোত্রভুক্ত।

কাফির শুধু সেইসব অমুসলিম নয়, যারা প্রফেটের আগে ও পরে এসেছে, তাঁর বাণী শুনেছে বা জেনেছে কিন্তু গ্রহণ করেনি, বাতিল করেছে, কিন্তু প্রত্যেক ব্যক্তি যে পূর্বে বাস করেছে, কিন্তু কোরানিক রিভিলিশন সম্বন্ধে জানার কোনো সুযোগ হয়নি সে-ও এই গোত্রভুক্ত। এই সব লোকেরা নারকী।

বিভিন্ন শ্রেণীর মুসলমানরাও এই কাফেরের জালে আটকে যায়। একজন নিকট সাহাবী আবদুল্লাহ ইবন ওমর বর্ণনা করেছেন যে প্রফেট মোহাম্মদ একবার ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, তার মৃত্যুর পর ফিতনা ফিরকা বেড়ে যাবে এবং কখনও এর দ্বার বন্ধ হবে না। ইহুদিরা যেমন ৭১ ফেরকায় বিভক্ত এবং খ্রিস্টানরা ৭২ ফেরকায় বিভক্ত, তাই তিনি বলেন যে তার সম্প্রদায় ৭৩ ফেরকায় বিভক্ত হবে এবং মুসলিম ফেরকাধারীরা সব দোজখে যাবে, শুধু একটি ছাড়া (নাজিলা) অর্থাৎ যারা সত্য ধর্ম পালন করেছে। লোকেরা যখন জিজ্ঞাসা করল কোন ফিরকা বেহেস্ত যাবে? প্রফেট জবাব দেন– আমার সাহাবী ও আমার ধর্ম যারা পালন করেছে।

অর্থডক্স মুসলিম গোষ্ঠীর সদস্যদের কাছে, অন্যান্য মুসলিম গোষ্ঠীর লোকজন কাফের দলভুক্ত। উদাহরণস্বরূপ, শিয়াদের মতে, সব সুন্নি কাফের (H. M. T. Ahmed, 1989 P. 7)। অনেক মুসলিমদের কাছে আহমদিরা ঘৃণ্য, তেমনি অধ-মুসলিম বাহাইরা, যদিও তারা প্রগ্রেসিভ জাতি।

এই বিষয়ের জটিলতার কারণে, কে কাফের আর কে নয় এটা নির্ধারণ করা মুশকিল। আল্লাহ এক (ওয়াহিদ) এবং সত্যিকারের মুসলিম হচ্ছে, যে এক আল্লাহয় বিশ্বাস করে (মুত্তায়াহিদ)। কিন্তু আল্লাহর একত্বকে স্পষ্ট করে ডিফাইন করতে হবে। এইরূপে একটি অস্তিত্বের একত্বে (ওয়াজ্দাত আল-উজুদ), যদি ব্যাখ্যা করা হয় যে প্রত্যেক বস্তুই ঈশ্বর, তাহলে সর্বেশ্বরের প্রশ্ন আসে এবং এটা একটা হেরেসি, বিরুদ্ধ বিশ্বাস। এমনি অনেক ফাঁক-ফুঁক বের হয়ে আসতে পারে তাদের জন্য যারা ঈশ্বরতত্ত্ব সম্বন্ধে বেশি ওয়াকিফহাল নয়।

যে মুসলিম ভান করে ইসলামে বিশ্বাস করে কিন্তু গোপনে মোহাম্মদকে উপহাস বা অস্বীকার করে সে মোনাফেক এবং দ্বান্দ্বিক নীতির জন্য (রিয়া) অপরাধী আল্লাহর কাছে, সুতরাং তারা লজ্জাজনকভাবে নরকে নিক্ষিপ্ত হবে।

কাফেরের আর একটি ঘৃণ্য অংশ হলো হেরেসি। অর্থাৎ যারা নতুন কিছু উদ্ভব করে (মুরতাদি)। ইসলামী ডকট্রিনে নতুন সংযোগ (বিদ্যা) করা বা অনুসরণ করা। যেমন, খারেজী, রাফেজী। আর এক প্রকার হলো যারা দ্বিতীয় ব্যাখ্যা করে ডিভিয়েটর (মুলহিদ); যে সত্য শিক্ষা ছেড়ে নিজের মতো কোরানের ব্যাখ্যা করে– এই সব পথভ্রষ্ট সংস্কারকগণ যারা নতুন নতুন আইডিয়া ও মতবাদ বের করেন যা গৃহীত ডকট্রিনের বিপরীত এবং বিশ্বাসীদের বিভ্রান্তি করে তারা দোজখী হবে এবং চিরকাল আগুনে জ্বলবে।

নিকৃষ্ট ধরনের কাফের হচ্ছে ধর্ম-ত্যাগী (মুরতাদ)। যে মুসলিম আপন ধর্ম পরিত্যাগ করে এবং তার ত্যাগে সে সত্য ধর্মের অপমান করে। ধর্মত্যাগ (ইরতিদাদ) বিশেষভাবে অপমানকর কেননা সে ব্যক্তি ইসলামের আশীর্বাদ গ্রহণ করে পরে তাকে

www.pathagar.com

ত্যাগ করল। এটা প্রফেটের জন্য অপমানকর এবং সারা মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য কলঙ্কজনক।

বোখারী তার হাদিস গ্রন্থে বর্ণনা করছেন একটি ঘটনা– যেখানে প্রফেট মোহাম্মদ এক দল উট চোর ও ধর্মত্যাগীদের শাস্তি দিচ্ছেন তাদের হাত-পা কেটে ও চোখ উপড়ে ফেলে, তারপর তাদের মরুভূমিতে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়া হলো। (Hughes, 1977 P. 64)। ৪র্থ খলিফা আলী কয়েকজন ধর্মত্যাগীকে জীবন্ত দগ্ধ করে শাস্তি দিয়েছেন।

ধর্মত্যাগীদের জন্য কোরানে শাস্তির কোনো উল্লেখ নেই, কিন্তু অনুমান করে তর্ক করা হয় যে, যেহেতু কোরান স্পষ্ট নির্ধারণ করছে যে কাফেরদের শাস্তি মৃত্যু, নিশ্চয় ধর্মত্যাগের জন্য তাদের সেই শাস্তি হওয়া উচিত, যদি না সেই দোষী ব্যক্তি তওবা করে ফিরে না আসে। ইসলামী প্রশাসকগণ সাধারণত খুব কড়াভাবে ধর্মত্যাগীদের সাথে ব্যবহার করে এবং তার শাস্তি বিভিন্ন রকমের হয় যেমন, সিভিল অধিকার হারায়, নির্বাসন বা সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত, বন্দি, নির্যাতন বা মৃত্যু।

১৪.১০ ইনকুইজিশন (অনুসন্ধান)

প্রফেট মোহাম্মদ মোনাফেক ও কুৎসাকারীদের বিরুদ্ধে ভীষণ কঠোর ছিলেন এবং তিনি নিজে ঐ সব ব্যক্তির প্রাণদণ্ডের আদেশ দেন যারা তাঁর বিরুদ্ধে ছিল।

৭৪৩ খ্রিস্টাব্দে আব্বাসী খলিফা মেহদি ইবন মনসুর একটি ডিপার্টমেন্ট প্রতিষ্ঠা করেন। এই বিভাগের প্রধান ছিলেন এক মন্ত্রী। তার কর্তব্য ছিল মানুষকে জিজ্ঞাসাবাদ করে মুরতাদী (heresy) ও ধর্মত্যাগীদের খুঁজে বের করে ধর্মত্যাগী ও কাফেরদের শাস্তি দেয়া। প্রথম বছরেই এই অনুসন্ধান অফিসে (মিহনা) অনেক অপরাধী ধরা পড়ে এবং তাদের মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়।

৪৩৩ সালে খলিফা মামুন মোতাজিলার পৃষ্ঠপোষক (এদের ডকট্রিন হলো যে কোরান অনন্ত নয়, সৃষ্ট)। এই 'মিহনা' অফিস লোকজনদের খুঁজে বের করত যারা মোতাজিলা নীতিবিরোধী। ইমাম হানবলকে ধরে আনা হয়েছিল, কারণ তিনি মোতাজিলা নীতিতে একমত ছিলেন না, সেই জন্য তাকে খলিফার নির্দেশে কোড়া মারা হয় ও বন্দি করে রাখা হয়।

এই প্রথায় কার্যক্রম বন্ধ হয় খলিফা আল-মুতাওয়াক্কিলের সময় ৮৫০ সালে। খলিফা মুতাওাক্কিল খ্রিস্টান ও ইহুদিদের ভীষণ অত্যাচার করেন, কারণ এই সব ধর্ম বাহুল্য– সুপার-ফ্লুয়াস। কিন্তু এই অনুসন্ধান অফিসের ধারণটা খুব কার্যকর ছিল তাই এই সরকারি অফিসটি বন্ধ করে তার একটা ছায়া অফিস সারা খিলাফত ধরে চলতে থাকল এবং এর চার্জে ছিল একজন গোঁড়া ধর্মবিদ (অর্থোডক্স থিওলজিয়ন)। এই অফিসের কাজ ছিল মুক্তচিন্তার লোকজনদের ধরে এনে শাস্তি দেয়া এবং এই সংক্রান্ত লিফলেট, প্রচারপত্র, পুস্তিকা বিলি বন্ধ ও নিষিদ্ধ করা এবং সেন্সর করা।

শতাব্দি ধরে হাজার হাজার লোকের তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে, অত্যাচার করা হয়েছে এবং শাস্তি দেয়া হয়েছে, যেমন খ্রিস্টান স্পেনে ইনকুইজিটররা মানুষের ওপর অত্যাচার করত; কারণ ঐ সব লোকদের প্রফেট, কোরান এবং ইসলাম

www.pathagar.com

ধর্মের ধারণা প্রশ্নবোধক, আর তাদের সিদ্ধান্ত ক্ষমার অযোগ্য।

ইসলামের সাথে ভিন্ন মত পোষণকারী মহান ব্যক্তিদের পূর্ণ কাহিনী এখনো ইসলামের ইতিহাসে অলিখিত রয়ে গেছে; এখানে শুধু কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে যারা এই ইনকুইজিশনের ভিকটিম ছিলেন মুসলিম রাজত্বকালে। সরকারি ও বেসরকারিভাবে যারা ভিকটিম ছিলেন তারা হলেন :

ধর্মবিদ জাআদর ইবন দিরহাম ৭৩৭ সালে ওয়াসিতে মৃত্যুবরণ করেন ওমাইয়া খলিফা হিশামের আদেশে কারণ তিনি মোতাজিলা ডকট্রিন 'কোরান সৃষ্ট' এই ধারণার প্রচার করেন। দামেস্কের দার্শনিক ঘাইলানকে ৭৪৩ সালে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয় মুক্তচিন্তা প্রকাশের জন্য। ধর্মবিদ জাহাম ইবন সাফওয়ানকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয় ৭৪৬ খ্রিস্টাব্দে তার থিওরির জন্য যে, মানুষ আল্লাহর হাতের পুতুলমাত্র এবং স্বর্গ ও নরকের একদিন বিলুপ্তি ঘটবে কেননা এসব চিরন্তন নয়।

ইবন আল মুকাফা মোহাম্মদের সমালোচনা করে একটা পুস্তক লিখেছিলেন এবং দাবি করেছিলেন যে তিনি কোরানের স্টাইল নকল করতে পারেন। ৭৫৪ খ্রিস্টাব্দে তার এক একটা অঙ্গ কেটে ফেলে জ্বলন্ত আগুনে নিক্ষেপ করা হয়, তারপর তার গলাটা আগুনে ফেলা হয়। বেচারা অন্ধ কবি বাশার ইবন বারদকে ৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে বাতিহা জলাভূমিতে নিক্ষেপ করা হয়, কারণ তিনি ইসলামে দ্বিত্ববাদ আমদানি করেছিলেন এই অভিযোগ। দ্বিত্ববাদ মূলত জোরাস্ত্রারের নীতি।

ফায়াদ ইবন আলী, মিমিয়া বা মোহাম্মদিয়া গোষ্ঠীর প্রধানকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয় ৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে, কেননা তিনি মোহাম্মদের অবতারত্ব প্রচার করেছিলেন, এই ধারণায় যে তিনি যিশুখ্রিস্টের মতো ঈশ্বরের অংশ ছিলেন। মনসুর আল-হাল্লাজকে ৯২২ সালে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয় তার হেরেসির জন্য কেননা তিনি বলেছিলেন যে তিনি ও আল্লাহ অভিন্ন। তার সাথে আল্লাহর আধ্যাত্মিক মিলন হয়েছে।

শিয়া রহস্যবাদী শালমাযানীর মৃত্যুদণ্ড হয় ৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে কারণ তিনি বলেছিলেন মুসা ও মোহাম্মদ উভয়েই প্রতারক (ইমপস্টার) কেননা, মুসাকে আরন (হারুন) যে মিশন দিয়েছিলেন, তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন এবং মোহাম্মদকে আলী যে মিশন দিয়েছিলেন তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন।

শিহাবুদ্দিন ইয়াহিয়া সুহরাওয়ার্দিকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয় ১১৯১ খ্রিস্টাব্দে ধর্মত্যাগের জন্য (apostasy) সালাহুদ্দিনের আদেশে। পরে তাঁকে শহীদের দর্জা দেয়া হয় এবং খেতাব দেয়া হয় 'আল-মাকতুল'– অর্থাৎ শহীদ। তিনি শিক্ষা দিয়েছিলেন যে, সব জীবন্ত বস্তুর মাঝে সত্য বিদ্যমান এবং আল্লাহকে প্রমাণ করেছিলেন প্রতীকী আলোর মধ্যে (on the symbolism of light). আবদুল ফুতুহ, পার্সিয়ান কাল্পনিক কবি ও লেখক যিনি সর্বেশ্বরবাদ প্রকাশ করেন, তাই হেরেসির জন্য দোষী সাব্যস্ত হয়ে ১১৯১ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন।

ফজলুল্লাহ পারস্যের খোরাসানের আসতারাবাদের নিবাসী। তিনি দাবি করেন যে আল্লাহ আদমের কাছে আরবির ৯টা অক্ষর প্রকাশ করেন, আব্রাহামের কাছে ১৪টি এবং মোহাম্মদের কাছে ২৮টি এবং মোহাম্মদের কাছে আরো চারটি অক্ষর (letters) বানান পদ্ধতিসহ প্রকাশ করে মোট ৩২টি অক্ষর পূরণ করেন। ১৩৯৮ খ্রিস্টাব্দে এঁকে

www.pathagar.com

মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। তর্ক কবি ইমামুদ্দিন নেসিমিকে ১৪১৭ সালে এলেপ্পোতে চাবুক মেরে হত্যা করা হয়। কারণ, তিনি দাবি করেন অক্ষরের রহস্য সম্বন্ধে তিনি 'ওহি' পেয়েছেন।

মোহাম্মদ সাঈদ সারমাদ মুসলিম হবার পূর্বে একজন রাব্বী ছিলেন। তিনি একজন নামকরা পার্সি কবি ও চিন্তাবিদ ছিলেন। তিনি পদার্থ (matter)-র বাস্তবতা অস্বীকার করেন। তাকে মেরে ফেলা হয় ১৬৬১ খ্রিস্টাব্দে, মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেবের নির্দেশে। তার কবর দিল্লিতে আছে, বহু লোক মাজার দর্শনে যায়।

মির্জা আলী মোহাম্মদ 'বাব' নামে পরিচিত। 'বাব' অর্থ গেট, ফটক। তিনি 'বাবীইজম'-এর প্রতিষ্ঠাতা এবং বাহাই-ইজম্-এর পূর্বসূরি। তিনি নিজেকে প্রফেট বলে ঘোষণা দেন, ফলে তবরিজ পাবলিক স্কোয়ারে ১৮৫০ সালে গুলি করে মারা হয়। তার অনুসারীদের নারী-পুরুষ ও ছেলেদের খুঁজে বের করে নির্দয়ভাবে মারা হয়।

মোহাম্মদ মাহমুদ তাহা-কে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয় ১৯৮৫ সুদানে, কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন কোরানের মদিনা অংশ এখন আর প্রযোজ্য নয়।

ভারতে আহমদিয়া সম্প্রদায়ের ওপর অত্যাচার শুরু হয়েছে বিংশ শতাব্দির শুরু থেকেই এবং লাগামহীনভাবেই পাকিস্তানে চলছে এবং এমন অসহিষ্ণুতা আর অন্য কোনো মুসলিম দেশে দেখতে পাওয়া যায় না। কানাডিয়ান স্কলার Dr. W. C Smith, যিনি মুসলিম সম্বন্ধে ভারত উপমহাদেশে একটি স্ট্যাডি করেছেন, বলেছেন, তাদের চরম উগ্রতা আহমদী সম্বন্ধে প্রকাশ পেয়েছে (Ahmed, 1989 P. 100)।

মৃত্যুর তিন মাস পূর্বে ১৯৮৯ ফ্রেরুয়ারি মাসে ইরানের ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লা খোমেনী, নভেল লেখক সলমন রুশদীর জন্য মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করেছেন; সে ঘোষণা এখনো বলবৎ আছে, কারণ তার বিরুদ্ধে চার্জ হলো ধর্মদ্রোহিতা। উল্লেখ্য যে, কয়েকজন মুসলিম ধর্মনেতা, কায়রোর আল-আজহার-এর গ্র্যান্ড মসজিদের ইমামসহ, আয়াতুল্লাহর এই ঘোষণার সমালোচনা করেছেন।

১৪.১১ শাস্তি

প্রাক-ইসলামী আরবে ক্রাইম ও সিভিল অপরাধের জন্য প্রতিশোধের (কিসাস)-এর ব্যবস্থা ছিল। একই সময়ে শাস্তি এমনকি খুন ও ব্যভিচারের জন্য জরিমানা (দিয়া) দিয়ে মুক্তি পাওয়া যেত– টাকা ছাড়াও দিতে হতো উট, ভেড়া, ছাগল বা অন্য কোনো স্বীকৃত ক্ষতিপূরণ।

ইসলামী আইনে শারীরিক ক্ষতির জন্য শাস্তি হচ্ছে প্রতিশোধ বস্তুর বদলে। ইহুদিদের নীতির মতো (Exod. 21 ; 24) : জীবনের জন্য জীবন, চোখের জন্য চোখ, নাকের জন্য নাক, কানের জন্য কান (৫ : ৪৯)। ইসলামের কড়া শরিয়া আইনে, শাস্তি (হদ্দ) খুব কঠিন, প্রায়ই কোরানের সাপোর্টে এবং প্রায় কঠিনভাবে প্রয়োগ করা হয়।

মদ পান করার জন্য ৮০ ঘা চাবুক নির্ধারিত আছে, যদিও এর পিছনে কোরানের সাপোর্ট নেই।

চুরি ও ছোটখাটো ডাকাতির জন্য, সে নারী হোক আর পুরুষ, দক্ষিণ হস্ত কাটা যায় (৫ : ৪২)। প্রাথমিক মুহাদ্দিসরা বলেছেন যে, মোহাম্মদ নিজে একজন মেয়ে

www.pathagar.com

চোরের হাত কেটে নিয়েছিলেন। যখন তাঁর একজন সাহাবী মেয়ের জন্য ওকালতি করলেন, তিনি বললেন : আল্লাহ যা নির্ধারণ করেছেন তুমি কি তার সংশোধন করতে চাও? আমার কন্যা ফাতেমা যদি চুরি করত আমি তারও হাত কেটে দিতাম।

যারা বড় রাস্তার ওপর ডাকাতি করে এবং খুন করে, তাদের নির্বাসিত কিংবা মৃত্যুদণ্ড তরবারি দ্বারা বা ক্রুশবিদ্ধ করে। (সালাব) (৫ : ৩৭) ধর্মীয় অপরাধ অবিশ্বাস থেকে ভান করা বিশ্বাস পর্যন্ত অর্থাৎ মোনাফেক। যারা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে ও মোহাম্মদের বিরুদ্ধাচরণ করে তাদের শাস্তি হলো বিপরীত হাত ও পা কেটে ফেলা বা মৃত্যুদণ্ড বা খোঁড়া করে দেয়া বা ক্রুশবিদ্ধ করা। ধর্মত্যাগের জন্য শাস্তি হলো মৃত্যু (যদিও কোরানে নেই)।

যৌন অপরাধের জন্য শাস্তির রকমফের আছে। আবুবকর একজন সমকামীকে (সডোমিস্ট) জীবন্ত আগুনে নিক্ষেপ করেছিলেন। কিন্তু অপরাধ ছিল ব্যাপক, যার জন্য ধরা পড়ত, শাস্তিও হতো।

বেশ্যা ও বেশ্যাবাজদের ১০০ ঘা চাবুক মারা হতো (28 : 2)। নারী-পুরুষকে ব্যভিচারের জন্য ১০০ ঘা চাবুক মারা হতো।

ব্যভিচার মারাত্মক অপরাধ ছিল; ৮০ ঘা চাবুক মারা হতো তাদের জন্য যারা ব্যভিচারের অভিযোগ এনে প্রমাণ করতে পারত না (২৪ ঃ ৪)। এই আইন করা হয় আয়েশার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনার জন্য।

ব্যভিচারের জন্য পাথর মেরে হত্যা করার কথা কোরানে একবার লেখা ছিল এবং একের অধিক বার মোহাম্মদ নিজে ব্যভিচারের জন্য দোষী নর-নারীকে শাস্তি দিয়েছিলেন। মোহাম্মদের মৃত্যুর পর আয়েশা বলেছিলেন যে তিনি কোরানে এই শাস্তির কথা জানতেন; কিন্তু পরে পাথর মারার শাস্তির বদলে ১০০ ঘা বেতের শাস্তির উল্লেখ করা হয়েছে (২৪ ঃ ২)।

কোরানে না থাকা সত্ত্বেও খলিফা ওমর নিজে ব্যভিচারে দোষী নারীকে পাথর মেরে হত্যার নির্দেশ দেন। হাদিসে অবশ্য উভয়কে পাথর মেরে হত্যার কথা আছে।

যারা শরিয়া আইন কড়াকড়ি মানেন তারা এখনও হাদিস ও কোরানের বিধান চালু করতে বলেন কিংবা ট্রাডিশনাল শাস্তির বিধান মেনে চলেন এবং কয়েকটি ইসলামী দেশে হাত কাটা আইন ও পাথর মেরে হত্যার আইন মাঝে মাঝে পালন করা হয়। আধুনিককালে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো সৌদি আরবে এক রাজকন্যা মিশাকে ও তার প্রেমিককে পাথর মেরে হত্যা করা হয় ১৯৭০ সালে।

১৪.১২ দাসত্ব

দাস দখল ও দাস ব্যবসা বহু প্রাচীন ব্যবসা। আরবেও ছিল। বাইবেল বলে যে, যখন মিদিয়ানাইটদের ক্যারাভান (উত্তর হিজাজ) জোসেফকে উদ্ধার করে গর্ত থেকে, যার মধ্যে তার ভাইরা ফেলে দিয়েছিল, তখন তারা যোসেফকে ইজিপ্টে গিয়ে বিক্রি করে দেয় (Gen. ৩৭ : ৩৬)।

মুসলিম বিজয়ের উদ্দেশ্য ছিল দাস সংগ্রহ করা। ধৃত দাসদের মধ্যে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল, তাদের শরীর থেকে ক্রীতদাসের গন্ধ মিলিয়ে যায়নি। কারণ বর্ধিত

www.pathagar.com

রাষ্ট্রে তাদের সেবার দরকার ছিল। বিজিত দেশ থেকে অধিক সংখ্যক দাস পাঠানো হতো মুসলিম দেশে। ৭১২ সালে একটা ছোট অভিযানের পর ৬০,০০০ হাজার দাস কুফাতে পাঠানো হয়েছিল সিন্ধু দেশ থেকে।

খিলাফতে কোনো এক কর্মকর্তার প্রায় ১ হাজার দাস-দাসী ছিল। কোনো কোনো বাড়িতে দাসদের প্রতি অমানুষিক অত্যাচার করা হতো এবং সাধারণত তাদের ভাগ্য ছিল মন্দ। তাদের সম্পত্তি মনে করা হলো এবং তাদের শহরে ও গ্রামে শ্রমিক হিসাবে খাটানো হতো, কিন্তু কোনো বেতন ছিল না। বিশ্বাসীদের কাছে মেয়ে বন্দি থাকত যা তাদের দক্ষিণ হস্ত অধিকার করতে পারে (২৩ : ৫) এবং এসব দাসীর সাথে মালিকের সহবাস করার অধিকার থাকত, যদিও তারা অন্যের সাথে বিবাহিত ছিল।

পরবর্তী শতকে অনেক দাসীপুত্র মুক্ত হয়ে অতি উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হতে পেরেছিল। স্লেভ ডাইনেস্টি-দাস বংশ ছিল মিসরের মামলুকরা। ভারতেও দাস রাজবংশ ছিল। এসব দাস প্রায়ই কৃষ্ণাঙ্গ ছিল না, যেমন টার্ক, সার্কাসিয়ান এবং জর্জিয়ান। তারা যোসেফ (ইউসুফ)কে পিতৃপুরুষ ভাবে, কারণ যোসেফকে ফেরাউন মুক্ত করে দেয় এবং ইসমাইল আব্রাহামের উপপত্নী হাগারের সন্তান।

আবিসিনিয়ান দাস বিলালকে মুক্ত করে প্রথম মোয়াজ্জিনের পদে নিয়োগ করা হয়। প্রফেট মোহাম্মদের কাছে কোনো জাতি ও বর্ণের পার্থক্য ছিল না। কিন্তু মধ্যপ্রাচ্যে বর্ণ বৈষম্য সাধারণ ব্যাপার। কালো দাস-দাসীদের নিচু চোখে দেখা হয় এবং ব্যক্তিগতভাবে তাদের অপছন্দ করা হয়। প্রত্যেক বছর হাজার হাজার কালো বালকদের খোজা করে, যাদের হারেম আছে সেখানে বিক্রি করা হয়। এটা লাভজনক ব্যবসা, কারণ প্রত্যেক ধনী মুসলিম পরিবারে হারেম পাহারার জন্য এদের ক্রয় করা হয় উচ্চ দামে। ৯১৭ খ্রিস্টাব্দে আব্বাসি খলিফা মুক্তাদিরের সময় বাইজানটাইন সম্রাট সপ্তম কনস্ট্যানটাইন এক দূত পাঠিয়েছিলেন বাগদাদে, সেই দূত লিখেছেন– দু' হাজার কালো খোজা (ইউনাক) শুধু খলিফার দরবারের কাজে নিযুক্ত ছিল।

তুলনামূলকভাবে এখনও ট্রপিক্যাল আফ্রিকায় ক্রীতদাসের বিশাল 'পুল' আছে সেখান থেকে আমেরিকা ও অন্যান্য দেশে পাঠানো হয়। এই ব্যবসায়ে আরবরা মনোপলি বজায় রেখেছে।

দাস ব্যবসা ও তার সরবরাহ কয়েকটি পূর্ব দেশীয় শহরে এখনও চলছে, যদিও এর বিরুদ্ধে আন্দোলন চলছে, গ্রেট ব্রিটেনের নেতৃত্বে– অবশ্য একটু কমেছে; উনবিংশ শতাব্দির শেষের দিকে প্রত্যেক বছরে মিসর, আরাবিয়া, টার্কিতে যে পরিমাণ জাহাজ আসত তার সংখ্যা কমে ১৫ হাজার থেকে আট হাজার নেমে এসেছে। এই সব জাহাজ-বোঝাই দাস আসত গৃহভৃত্যের কাজের জন্য।

১৪.১৩ নারী

পশ্চিমা সমালোচকগণ মনে করেন নারীদের সম্বন্ধে মুসলিমদের ধারণা ইসলামের অন্যান্য বিষয়ের চেয়ে নিকৃষ্ট। তার উদাহরণ ও শিক্ষার মধ্য দিয়ে প্রফেট মোহাম্মদ মেয়েদেরকে সমাজে এমন কোনো আসন দেননি, যে কারণে মেয়েরা নিজেদের মানুষ বলে মনে করতে পারে।

www.pathagar.com

কতিপয় রাব্বানিকাল অথরিটির মতে, প্রফেট মোহাম্মদ পুরুষকে চারটি স্ত্রী রাখতে অনুমতি দিয়েছেন, তবে কথা থাকে যে প্রত্যেক স্ত্রীকে সমানভাবে দেখতে হবে। ঐ একই সময়ে, মানুষের স্বভাব সম্বন্ধে কোরানে পরিষ্কারভাবে বলছে– "আর তোমরা যতই ইচ্ছা করো না কেন, তোমাদের স্ত্রীদের প্রতি সমান ব্যবহার করিতে কখনও পারিবে না" (৪ : ১২৯)। সেইজন্য কোরান বলেছে : 'সুতরাং, যদি তোমরা মনে করো যে তোমাদের স্ত্রীদের প্রতি সমান ব্যবহার করতে পারবে না, তাহলে এক বিবাহ করা উচিত (৪ : ৩)।'

কয়েকজন পণ্ডিতদের মতে, এই দুই আয়াত এক বিবাহের জন্য পরিষ্কার নির্দেশ দিচ্ছে। কিন্তু মুসলিমরা সাধারণত এই আয়াত উপেক্ষা করেই, পাকাপাকিভাবেই চারজন স্ত্রী রাখার পক্ষে বিশ্বজুড়ে নিয়ম করে ফেলেছে। এছাড়া অনেকে এমনভাবে কোরানের ব্যাখ্যা করেছেন যে, যার চারজন স্ত্রী নেই, সে একসাথে চার স্ত্রী রাখতে পারবে, সমান চোখে দেখুন আর না দেখুন। এখানে মেয়েদের স্ট্যাটাস শার্ট-প্যান্টের মতো। পুরনো হলে ছেড়ে দিয়ে নতুন গ্রহণ করো।

প্রফেট মোহাম্মদ নিজে অন্তত বিবাহ করেছিলেন এগারো বার, চারটের অধিক স্ত্রী ছিল একই সাথে। বহুবিবাহ ইসলামে বহুল পরিচিত এবং পক্ষে বলা বা ওকালতি করার জন্য মোল্লা-মুফতির অভাব নেই কারণ তারাও এক স্ত্রী নিয়ে থাকতে পারেন না। আরো কারণ হলো যে প্রথায় প্রফেট নিজে বহুবিবাহ করেছিলেন, সুতরাং এটা করা সুন্নতও বটে।

স্ত্রী বদলানো যায় তালাকের (divroce) দ্বারা, যদিও হাদিস মতে বলা হয়েছে– 'বৈধ জিনিসের মধ্যে আল্লাহ তালাককে ঘৃণা করেন। বলা হয় যে মোহাম্মদ নিজে তার স্ত্রীদের মধ্যে দু'জনকে তালাক দিয়েছিলেন এবং অন্যদের তালাকের হুমকি দেন। প্রফেটের নাতি হাসান একসাথে চার জন স্ত্রী বিয়ে করেন এই ভাবে তিনি একশোবার বিবাহ করেন আর তালাক দেন, কিন্তু রাখেন চার জন।

চার জন বৈধ স্ত্রী ছাড়া, একজন মুসলিম অসংখ্য মেয়ে-মানুষ বা উপপত্নী রাখতে পারে (সারারি, বহুবচনে সুরিয়া), যারা ক্রীতদাসী (৪ : ৩), যুদ্ধলব্ধ বন্দি বা ক্রীত বা উপঢৌকন হিসাবে প্রাপ্ত বা দাস পরিবারের মেয়ে, কুমারী বা বিধবা বা তালাকী।

মুসলিম আইনে তালাকের জন্য কোনো কারণ লাগে না, স্বামীর মুখের কথাই যথেষ্ট। দু'জন সাক্ষীর সামনে শুধু বলতে হয় 'তোমাকে তালাক দিলাম'। ব্যস ল্যাঠা চুকে গেল। আজকাল বেশির ভাগ মুসলিম দেশে, তালাকের আইন সহজ করা হয়েছে এবং মেয়েরাও স্বাধীনভাবে স্বামীদের তালাক দিতে পারে মামলার মাধ্যমে, সবখানে ফরম্যালিটি বেশি এবং সময়ও লাগে, বিশেষ করে পশ্চিমা দেশে।

বহুবিবাহ তারাই করে, যারা একের অধিক মেয়ে-মানুষ, সমান চোখে দেখে; কিন্তু অসুবিধা হলো, একজন পুরুষকে চারজনের দাবি মেটানো বড় মুশকিল হয়ে ওঠে, তাই প্রায় অভুক্ত মেয়েরা অন্য উপায় খোঁজে এবং অনেক ক্ষেত্রে আরব্য উপন্যাসের মতো পরিবারের অবস্থা হয়। হারুন অর রশীদের পুত্র খলিফা মামুনের শত শত উপপত্নী ছিল এবং কথিত আছে সমপরিমাণ বৃদ্ধারমণী ও খোজা (ইউনাক) এই সব উপপত্নীর খবরদারি করত।

www.pathagar.com

বাহান্ন বছর বয়সে প্রফেট মোহাম্মদ আয়েশাকে বিবাহ করেন যখন তাঁর বয়স নয় বছর, অর্থাৎ বাল্যবিবাহ। এটা অবশ্য সাধারণ ব্যাপার ছিল প্রত্যেক দেশে। হিন্দুদের মধ্যেও গৌরীদানের বন্দোবস্ত ছিল। এই বাল্যবিবাহ প্রফেট মোহাম্মদের শতাব্দি পূর্বে পূর্ব ও পশ্চিম দেশে প্রচলিত ছিল।

প্রফেট, বলা হয়, সাময়িক বিবাহের অনুমতি দেন যুদ্ধের সময় যাকে 'মুতা' বিবাহ বলা হয়, এই ব্যবস্থা কোরানে সিদ্ধ আছে যেখানে বলা হয় 'অন্য নারীকে অর্থ ব্যয়ে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করিতে চাহিলে সে চাওয়া তোমাদের জন্য বৈধ করা হইল, অবৈধ যৌন সম্পর্কের জন্য নহে। তাহাদের মধ্যে যাহাদিগকে তোমরা সম্ভোগ করিয়াছ তাহাদের নির্ধারিত মোহর অর্পণ করিবে। মোহর নির্ধারণের পর কোনো বিষয়ে পরস্পর রাজি হইলে তাহাতে তোমাদের কোনো দোষ নেই।' (৪ : ২৪)

সাময়িক বিবাহ (Muta-pleasure), অর্থ প্রদান করে চুক্তি, কয়েক দিন, কয়েক মাস, ইসলামী দেশে সাধারণ ব্যাপার, যদিও মুসলিম সমালোচকগণ একে 'বৈধ বেশ্যাগিরি' বলেছেন (সুন্নিরা এ বিবাহ রদ করেছে)। ইরানে এই ব্যবস্থা বিংশ শতাব্দির মাঝামাঝি চালু ছিল। ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে লিখতে গিয়ে আলফ্রেড গিয়োম বলেছেন, শিয়া পারস্যে অধুনা (আজকাল) দালালরা উপযুক্ত স্থানে অপেক্ষা করে ভিজিটরদের পাকড়াও করে 'স্ত্রী'-র বন্দোবস্ত করে দেয় বিদেশে যত দিন তার দরকার। এর জন্য পেমেন্ট করতে হয় (1983 P. 104)।

প্রফেট মোহাম্মদ তীব্রভাবে (drastically) মেয়েদের স্বাধীনতা খর্ব করেছেন, যে স্বাধীনতা মেয়েরা প্রাক-ইসলামীকালে আরবে ভোগ করত। মুসলিম সমাজে এখন নারীদের বন্দি জীবন ঘরের মধ্যে ও বাইরে বোরখা মোড়া আপাদমস্তক। এই সব নারী নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে শেষের দিকে অবতীর্ণ সূরাতে রেফারেন্স আছে এবং বিশ্বাস করা হয় যে তার বৃদ্ধ বয়সে তরুণী স্ত্রীদের কন্ট্রোল করার জন্য এই ব্যবস্থা চালু হয়েছে। এখন এই নিয়ম মুসলিম পরিবারে বাধ্য-বাধ্যকতার ব্যাপার।

কোরানিক বিধান অর্থ এই যে মেয়েদের ঘরের মধ্যে থাকতে হবে, আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে মানতে হবে এবং নামাজ পড়তে হবে। (৩৩ : ৩৩) কোনো বেগানা লোক মেয়েদের সাথে কোনো বাক্যালাপ করতে পারবে, যদি সামনে পর্দা বা পার্টিশন না থাকে (হিজাব) (৩৩ : ৫৩)। মেয়েদের কোনো পুরুষের মনে বেপর্দা অবস্থায় দেখা করা বা কথা বলা নিষিদ্ধ, এমনি ঘরের মানুষ হলেও মাহরম পুরুষ ছাড়া অর্থাৎ অতি নিকট আত্মীয় ছাড়া (৩৩ : ৫৫ ও ২৪ : ৩১)। তাদের কোনো পুরুষের সাথে, যারা কুদৃষ্টি নিয়ে তাকায়, তাদের সাথে কোনো বাক্যালাপ করা চলবে না। এখানে শুধু নবী পত্নীগণের কথা বলা হচ্ছে। আয়াতে বলা হচ্ছে– "হে নবী পত্নীগণ, তোমরা অন্য নারীদের মতো নহ, যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় করো তবে পরপুরুষের সহিত কোমল কণ্ঠে এমনভাবে কথা বলিও না, যাহাতে অন্তরে যাহার ব্যাধি আছে, সে প্রলুব্ধ হয় এবং তোমরা ন্যায়সঙ্গত কথা বলিবে। (৩৩ : ৩২)। যখন তারা ঘরের বাইরে পাবলিক স্থানে যাবে তারা ইসলাম-পূর্ব কালের মতো সাজ-সজ্জা করবে না, কিন্তু যেন তাহাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের উপর টানিয়া দেয়।" (৩৩ : ৫৯)। এই আয়াতকে বিভিন্ন স্কুল বিভিন্ন ব্যাখ্যা করেছে এই অর্থে যে, তাঁরা বাইরের চাদর দিয়ে কপাল, চুল বা

www.pathagar.com

চোখে বা মুখ বা মাথা বা সমস্ত শরীর মাথা থেকে পা পর্যন্ত ঢেকে রাখবে।

মেয়েরা বিশেষভাবেই একটা নির্দিষ্ট স্থানে নিজেদের সংরক্ষিত করবে বা হারেমে থাকবে; আর এখানে স্ত্রীগণ ও উপপত্নীগণ এক সাথে থাকবে কোনো পুরুষের প্রবেশ নিষেধ। ইসলামের যখন সুদিন তখন এই সব হেরেমে বাদশা সুলতানদের শত শত মেয়েরা ভর্তি থাকত, আবার নতুন দেশ জয় করলে আরো ফ্রেশ মেয়ে মানুষের ভিড় জমত।

কোরানে অন্যান্য ধর্মের ধর্ম-পুস্তকের মতো নারীর চেয়ে পুরুষ শ্রেষ্ঠ এবং তাদের ওপর (৪ : ৩৮) পুরুষের কর্তৃত্ব। মেয়েরা ছোটবেলায় পিতাকে মান্য করবে, বিয়ের পর স্বামী, যারা স্বামীকে মানবে না, তাদের ধমক দিবে, শয্যা ত্যাগ করবে, তারপর প্রহার করবে (৪ : ৮)। একজন পুরুষ যেমনভাবে ইচ্ছা তার স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করতে পারে, কারণ কোরান বলছে, স্ত্রী শস্যক্ষেত্র এবং যেমন ইচ্ছা তেমনি করে সেক্ষেত্রে প্রবেশ করতে পারবে (২ : ২২৩)। মেয়েদের জীবন এমন বিড়ম্বিত যে, একটা প্রবাদ আছে– "যে তার কন্যাকে সমাধির সাথে বিবাহ দেয় সে উৎকৃষ্ট বর লাভ করে," – He who weds his daughter to the grave has found the best of bridegrooms."

কোরান ও হাদিসের সূত্র ধরে, ধর্মীয় জুরিস্টগণ আরও কলঙ্ক লেপে দিয়েছেন মেয়েদের কপালে। শরিয়া কোর্টে মেয়েদের সাক্ষ্য দিতে হয় দুইটা, পুরুষের একটা। মেয়েদের ডাক্তারি বা আইন পড়ে ঐ পেশাতে যেতে নেই অথবা কোনো ব্যবসাতে নিজেকে জড়াতে নেই; তাদের মসজিদে নামাজ পড়তে নিরুৎসাহ করা হয়। কারণ তাদের দেখে পুরুষরা বিচলিত হতে পারে।

একে সমর্থন করতে গিয়ে মুসলিম প্রবক্তারা বলেন, পশ্চিমের নারীরা অনেক আইনি অক্ষমতা (legal disabilities) থেকে ভোগে বিশেষ করে সম্পত্তি ব্যাপারে যা মুসলিম নারীদের অজানা। তেমনি তাদের স্বাধীনতা। পশ্চিমে নারীদের স্বাধীনতা বেশিদিন হয়নি, এখনো তার পুরোপুরি বিকাশ ঘটেনি এবং এখানে কোনো যুক্তি নেই তাদের এ বিষয়ে আত্মতুষ্টি লাভ করা। প্রফেট মোহাম্মদ বহুবিবাহ ও উপপত্নীর ব্যবস্থা করেছেন জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য যা ইসলামের প্রসারতাকে সাহায্য করবে।

ঘোমটা হচ্ছে মেয়েদের পোশাকের একটা অংশ যা প্রায় সারা মধ্যপ্রাচ্যে দেখা যায় এবং ইসলাম এর জন্য আইন প্রণয়ন করে চালু রাখার জন্য; এটার সামাজিকভাবে প্রয়োজনীয়তা ছিল। মুসলিম বিশ্বের অনেকাংশে যেমন ইন্দোনেশিয়া, কৃষ্ণ আমেরিকা ও কুর্দিস্তানে কখনও ঘোমটা দেখেনি এবং সেখানে এ সম্বন্ধে কোনো দাবি উত্থাপিত হয়নি।

আজকাল স্বাধীনতার জন্য নারী আন্দোলন অনেক মুসলিম দেশে বেশ দানা বেঁধেছে এবং বর্তমান সামাজিক প্রেক্ষিতে ও অন্যান্য সার্বিক অবস্থান বিচার করে, মনে হয় মুসলিম নারী একদিন নিজেদের অবস্থা এই আধুনিক বিশ্বে পরিবর্তন করে নিজেদের স্বকীয়তা বজায় রাখবে।

১৪.১৪ অদৃষ্টবাদ, নিয়তিবাদ

কোরান বলে সব জিনিস এই পৃথিবীতে আল্লাহর ডিক্রিতে (কাদার) ঘটছে (৫৪ : ৪৯) আল্লাহের এই ডিক্রি কতটা সচল তার বিচারে শতাব্দি ধরে চুলচেরা বিচার হয়ে

www.pathagar.com

আসছে দু'টি দলের মধ্যে এবং মুসলিম দর্শনে বিচার্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে মানুষের মুক্তচিন্তা আছে কী না।

একটা স্কুল আছে কাদেরিয়া বলে। তাদের বক্তব্য হলো, যদি মানুষের মুক্তচিন্তা না থাকত তাহলে তার সমস্ত কর্ম আল্লাহর ক্ষমতার মধ্য দিয়ে পরিসমাপ্ত ঘটবে। তাহলে মানুষ তার কোনো কাজের জন্য দায়ী থাকবে না এবং ঈশ্বরের কোনো অধিকার থাকবে না তার কাজের বিচার করে শাস্তি দেয়া। কাদেরিয়ারা বলে যে, ডিক্রি দেওয়ার সময়, ন্যায়বান ও দয়াবান আল্লাহতালা যথেষ্ট পরীক্ষা চেয়েছেন মানুষের মুক্তিচিন্তা অপারেট করা। প্রত্যেক মানুষকে দেয়া হয়েছে বিচার-বুদ্ধি, কোনটা ভালো কোনটা মন্দ বিচার করার জন্য এবং এ ক্ষমতাও দেওয়া হয়েছে কোনটা সঠিক আর কোনটা ভুল।

এই ডকট্রিন প্রচার করে মাবাদ আল জোহনী (মৃ. ৬৭০)। ইনি জোরাস্ট্রিয়ান পুরোহিত ছিলেন, পরে ইসলাম গ্রহণ করেন। তার এই ডকট্রিন গ্রহণ করেন দু'জন সুফি রহস্যবাদী– একজন বসরার হাসান (মৃ. ৭২৮); অন্যজন ওয়াসিল ইবন আতা (মৃ. ৭৪৯) এবং এই ডকট্রিন ওয়াসিল ইবন আতার কাছ থেকে মোতাজিলিরা গ্রহণ করেছিল।

এর বিপরীত ডকট্রিন প্রাচীন ইসলাম-পূর্ব আরবের ধারণা থেকে উদ্ভূত। সেই কনসেপ্টের নাম ছিল মানাইয়া। 'মানাইয়া'-র অর্থ হলো ভাগ্যের ক্ষমতা, যাকে অতিক্রম করা যায় না। ভাগ্যে যা নির্ধারিত আছে তা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হবে। গোঁড়া মুসলিম স্কুলের প্রবক্তা বলে থাকেন সব কিছু পূর্ব নির্ধারিত। মুসলিম চিন্তাবিদ জাবারিয়ার বক্তব্য হলো আল্লাহ যা কপালে লিখে দিয়েছেন বা নির্ধারণ করে দিয়েছেন, সে মতে প্রতিটি ক্ষেত্রে তা ঘটবে, এর ব্যতিক্রম হওয়ার উপায় নেই। সব কিছু পূর্ব নির্ধারিত এবং অপরিবর্তনীয়। জাবারিয়ারা মনে করেন সব জিনিস বাধ্যতার মধ্যে (জবর) এবং আল্লাহর যা নির্ধারণ করেছেন সেই মতে কাজ করা। পূর্ব নির্ধারিত জাবারিয়ার যে ধারণা তা থেকেই অদৃষ্টবাদ বা নিয়তিবাদ ডকট্রিনের উদ্ভব যা মুসলিম ধর্মের ৬ নং আর্টিকেলে অবস্থান নিয়েছে।

এ ধারণাই বলে দেয় যে, অদৃষ্ট (তকদির) বা ভাগ্য (কিসমত), প্রত্যেক মানুষের, সম্প্রদায়ের, জাতির আল্লাহতায়ালা আগেই নির্ধারণ করেছেন যা অপরিবর্তনীয়। এই ধারণা ব্যাপকভাবে মুসলিমদের মনে-মগজে ঢুকে গেছে এবং জনপ্রিয় প্রবচনে পরিণত হয়েছে– "What is not distined cannot be; what is destined cannot but be.' - অর্থাৎ ভাগ্যে যা নাই তা হবে না; ভাগ্যে যা আছে তা কেউ রুখতে পারে না, হবেই।' আবার, 'কপালে যা আছে তাকে ফেলতে পার না, আর যা নাই তা অপ্রত্যাশিতভাবে আসে না', 'যদি তোমার ভাগ্যে খাদ্য থাকে, রুটি তোমার কাছে আসবে, যদি না থাকে তাকে খুঁজে হতাশ হবে।'

অদৃষ্টবাদের ডকট্রিনকে ক্লাসিক্যাল ফরম দিয়েছে ধর্মবিদ আবুল হাসান আলি আল আশারি (মৃ. ৯৩৪) যার নিয়তিবাদকে অনেক মুসলিম চিন্তাবিদ সমালোচনা করেছেন।

চরম ফরমে আল্লাহকে চিত্রিত করা হয়নি মহান প্রকৃতি পুরুষরূপে, বরং নির্মমভাবে ও রুদ্ররূপে, এই রূপে তার যে ৯৯ সুন্দর নাম আছে, আমরা তার মধ্য

www.pathagar.com

থেকে এই নামগুলো দেখতে পাই, যেমন, আল-মুজিল (ধ্বংসকারী), আল জার (উৎপীড়ক), আল মুমিত (হত্যাকারী), আল-ফাতাহ্ (সিদ্ধান্তদাতা), আল-কাবিদ (স্থগিতকারী), আল-মুনতাকিম (প্রতিহিংসা গ্রহণকারী), আল-মানি (বঞ্চনাকারী), আল-মুদহিল (অপমানকারী), আল-খাফিদ (মর্যাদাহানিকারী)।

একটি মুসলিম প্রার্থনা (Supplication) আছে- আল্লাহর নিকট থেকে আমরা আশ্রয় চাই তাঁর কৌশল থেকে (Stratagern)। কোরান বলছে : মানুষে কৌশল করে, আল্লাহও কৌশল করেন, কিন্তু সকল কৌশলকারীদের থেকে আল্লাহ্ উৎকৃষ্ট ষড়যন্ত্রকারী (best plotter) (৮ : ৩০) এই দুনিয়ার জীবনটা কেবলমাত্র একটা খেলা, সময় ক্ষেপণের জন্য (৫৭ : ১৯)। তাই বিজ্ঞলোকদের কাজ হলো নিয়তির হাতে নিজেকে সমর্পণ করা, যা মুসলিমদের কর্তব্য; কারণ ইসলাম অর্থই সমর্পণ।

আল্লাহর সিদ্ধান্ত তার ইচ্ছামতো এবং স্বেচ্ছাচারী কারণ আল্লাহ কোরানে বলছেন, আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা তাকে তাঁর অনুগ্রহ দান করেন। (৫ : ৫৯)। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা মাফ করেন, যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন (৩ : ১২৪) এবং তিনি যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন, আর যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন (৫ : ৪০)। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা বিপথগামী করেন, যাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন। (১৪ : ৪) এবং যেহেতু সব কিছুই আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে, তিনি তাকে সৎপথে আনয়ন করেন না যে বিপথগামী হয় এবং যারা এই ভাবে বিপথগামী হয় তাদের সাহায্য করার কেউ থাকে না। (১৬ : ৩৯)।

বিশ্বাস ও অবিশ্বাস এবং বিশ্বস্ততা ও অবিশ্বস্ততা সব কিছুরই তিনি নির্ধারণ করেন। আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত ঈমান আনা কারো সাধ্য নয়" (10 : 100), 'তোমরা ইচ্ছা করিবে না, যদি না আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন (৭৬ : ৩০)। 'আল্লাহ্ যাকে আলো দান না করেন, কোনো সময়েই সে আলো পায় না' (২৪ : ৪০)। 'আল্লাহ্ তার অন্তঃকরণ তালাবদ্ধ করেছেন, কানে গালা ঢেলে দিয়েছেন, চোখের সামনে পর্দা টেনে দিয়েছেন, যে ইচ্ছা করে ভুল করে' (৪৫ : ২২)।

কোরান বারে বারে পরিষ্কার করে বলেছে, ভাগ্য সম্বন্ধে আল্লাহর চূড়ান্ত নির্দেশ। আল্লাহ্ যা নির্ধারণ করেছেন, তাছাড়া আমাদের অন্য কিছু ঘটতে পারে না (৯ : ৫১)। প্রত্যেক মানুষের সময় নির্ধারণ করা আছে বা বরাদ্দ আছে এবং সেই সময় যখন আগত হয় (আজল), তখন আত্মা তাকে ছেড়ে চলে যায় (৬৩ : ১১)। আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোনো মানুষ মরতে পারে না এবং কেতাব মতে সেইটুকু সময়ের জন্য তার জীবন নির্ধারিত (৩ : ১৩৯)। তেমনি প্রত্যেক জাতির জন্য একটা সময় নির্ধারণ করা আছে এবং যখন সে-সময় উপস্থিত হয় তার পতন কেউ রুখতে পারে না (৭ : ৩২)।

মৃত্যুর পর, আমাদের নিয়তিও পূর্ব-নির্ধারিত। ট্র্যাডিশনে বর্ণিত আছে যে আল্লাহ যখন মানব জাতি সৃষ্টি করেছিলেন তিনি একটুকরা কাদা হাতে নিয়ে দুই খণ্ড করেন। এক খণ্ড স্বর্গে নিক্ষেপ করে বলেন, 'এগুলো বেহেস্তের জন্য যা আমি ইচ্ছা করি এবং অন্য খণ্ডটি অনন্ত প্রজ্বলিত অগ্নিতে নিক্ষেপ করে বলেন, এগুলো জাহান্নামের জন্য এবং আমি কেয়ার করি না। এটা কোরানে কনফার্ম করা হয়েছে- 'মানুষের মধ্যে পার্থক্য করে একদল আল্লাহর ডান হস্তের (৫৬ : ২৬) যারা স্বর্গে যাবে এবং আর এক দল লোক তাঁর বাম হস্তের (৫৬ : ৪০) তারা অভিশপ্ত (ever damned)।

www.pathagar.com

১৪.১৫ শেষ বিচারের দিন

কখন পৃথিবী শেষ হয়ে আসছে, তার জবাবে মুসলিমদের পরামর্শ দেয়া হয়েছে– 'একমাত্র আল্লাহই এ সম্বন্ধে জানেন, কে বলবে?' (৩৩ : ৬৩)। একই সময়ে এটা স্মরণ রাখা উচিত যে, দুনিয়া যে কোনো সময় শেষ হতে পারে– 'সেই সময় অতি নিকটে, হাতের কাছে' (৩৩ : ৬৩) এবং 'সময় সমাগত' (২১:১)।

প্রফেট মোহাম্মদ নিজে বিশ্বাস করতেন যে, সেই সময় (সাআহ্) বা দিন (ইয়ম) বেশি দূরে নয় যখন পৃথিবী শেষ হয়ে যাবে। তিনি যখন দেখলেন দুই জন লোক তাদের ঘর-বাড়ি মেরামত করছে তিনি মন্তব্য করেন, 'আমি মনে করি এই মেরামতের কাজ শেষ হবে না।' অনেকে এর অর্থ করেছেন যে তাদের প্রচেষ্টা শেষ বিচারের দিন গ্রাস করবে।

মুসলিম ট্র্যাডিশন মতে, কিয়ামতের আগে কতকগুলি চিহ্ন দেখা যাবে। যখন দুনিয়া শেষ হয়ে আসবে, আল্লাহ্ পৃথিবীটাকে মানুষের ইচ্ছার ওপর ছেড়ে দিবেন। তখন সকলেই অবিশ্বাসী হবে, ঈমান হারাবে, নৈতিক চরিত্র থাকবে না, মানুষ দিন দিন অধার্মিক হয়ে যাবে।

কোরান যেহেতু আল্লাহর কাছ থেকে এসেছে, এটা তাঁর কাছেই ফিরে যাবে, পবিত্র পুস্তকের আস্তে আস্তে আয়াতগুলো মুছে যাবে, পাতাগুলো সাদা হয়ে যাবে, কিছুই থাকবে না। ইবন মাজার (মৃ. ৮৮৬) এক স্থানে উল্লেখ করেছে, মানুষের অন্তঃকরণ থেকে কোরান মুছে যাবে এবং ঐ পুস্তকের জ্ঞান ও লিখিত সূরা, আয়াত সব পরিষ্কার ভাবে পৃথিবী থেকে মিলিয়ে যাবে।

মোহাম্মদের এক ভবিষ্যদ্বাণী মতে (Sale, 1886, P 90), ইথিপিয়নরা কাবা ধ্বংস করে দিবে এবং আর কখনো পুনর্নির্মাণ হবে না। আরবরা আবার লাত ও উজ্জাকে পূজা করতে শুরু করবে এবং তাদের পূর্ব প্যাগন ধর্মে ফিরে যাবে। একটি হাদিসে মোহাম্মদ বলেছেন– 'পৃথিবী ধ্বংস হবে না যত দিন না দাউসের নারীরা পাছা দুলিয়ে জুল খালাসার মূর্তি ঘিরে নাচতে শুরু করবে, যেমন তারা প্রাক-ইসলাম যুগে করত (Faris, 1952, P. 32)।

বাইবেলে বলা হয়েছে, পৃথিবীর শেষ সময়ে এক ভয়ঙ্কর জন্তু বের হবে এবং ড্রাগনের মতো কথা বলবে (Rev. 13 ; 11), তেমনি কোরানও একটা জন্তুর কথা বলেছে (দাব্বা) যা পৃথিবীর শেষ দিনে আবির্ভাব হবে (২৭ : ৮৪) এবং মানুষের সাথে তিন দিন ধরে কথা-বার্তা বলবে। তারপর যিশু-শত্রু (এন্টি-খ্রাইস্ট) আসবে এবং সব লণ্ডভণ্ড করে দিবে যত দিন না যিশুখ্রিস্ট ফিরে আসেন এবং এন্টি-খ্রাইস্টকে পরাজিত করে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করবেন। যিশুর এই দ্বিতীয় আগমনই হবে কেয়ামতের শেষ চিহ্ন।

১৪.১৬ নরক

মৃত্যুর পর প্রত্যেক মানুষ কবরের মধ্যে শোবে এবং দুই জন কালো ফেরেস্তা মনকির ও নকির এসে তার ঈমান সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করবে। ঈমানদার ব্যক্তিরা সে প্রশ্নের সঠিক জবাব দিবে, কিন্তু বে-ঈমানদার যারা তার কি বলতে হবে জানবে না, আর ভুল-ভাল

www.pathagar.com

জবাব দিবে, তখন তাদের পেটানো হবে। জবানবন্দির পর, ঐ ব্যক্তি গভীর নিদ্রা মগ্ন হবে। পৃথিবী যখন শেষ হয়ে আসবে তখন একটা বিরাট চিৎকার (সাইহা) হবে এবং ব্রজধ্বনি (সাখা) হবে। পাহাড়গুলো ভেঙে ধুলোয় পরিণত হবে, সাগরের পানি ফুটে উঠবে, ইস্রাফিল, মৃত্যুর দূত, শিঙা ফুঁকবে (২৭ : ৮৯)। সূর্য অন্ধকার হয়ে আসবে, তারাগুলো পতিত হবে এবং আকাশ গুটিয়ে যাবে।

কিয়ামত (রিসারেকশন) সমাগত; সব মৃত লোক খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে যাবে এবং ভীত হয়ে বিচারালয়ে দৌড়ে যাবে। মুসলিম বিশ্বাস মতে যিশু এই ট্রাইব্যুনালে পৌরহিত্য করবেন (Kazi and Flynn, 1984, P. 53) এবং পৃথিবীতে যারা বাস করেছে, বিচার করে তাদের ভাগ্য নির্ধারণ করা হবে।

বিচারের পর প্রত্যেককে একটা ব্রিজ (সিরাত) পার হতে হবে, যে ব্রিজ চুলের মতো সরু এবং তরবারির চেয়েও তীক্ষ্ণ। 'সিরাত' কথাটা এবং এর ধারণা জোরাস্ত্রিয়ানদের কাছ থেকে নেয়া হয়েছে (Tisdall, 1911, P. 252)। সাতটা নরক আছে, আগুন গনগন করছে, তার সাতটা গেট (১৫-৪)– এই গেট নির্দিষ্ট টাইপ, পাপীদের জন্য। কোরান সাতটা নরকের সম্বন্ধে কিছুই বলে না, কিন্তু তফসিরকারগণ এই সব বর্ণনা দিয়েছেন। আর জাহান্নাম কথাটা আসছে হিব্রু শব্দ 'জেহিন্নম' থেকে এবং ৭টা নরকের ধারণা এসেছে ইহুদি গ্রন্থ তালমুদ থেকে।

প্রত্যেকেই নরকে যাবে, কেননা কোরান বলছে– 'তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যে নরকের নিচে যাবে না। এটা আল্লাহ্‌র সিদ্ধান্ত। (১৯ : ৭২)। ভালো মুসলিম পুল পার হয়ে যাবে, কিন্তু শেষ মাথায় পৌঁছানোর পর সে নরকের উপরের দিকে পতিত হবে এবং সেখানে কিছু দিন নরক ভোগের পর পবিত্র হয়ে পাপমুক্ত হবে।

খ্রিস্টান ও ইহুদিরা জোরাস্ত্রিয়ানদের অনুসরণ করে তাদের মতে পুলের অধিক পার হলে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ নরকে পড়বে। যেহেতু তারা আহলে কিতাব, সুতরাং তারা পুড়বে না, তবে আগুনের আঁচ পাবে এবং তারা দুঃখ করবে কেন আমরা ইসলাম গ্রহণ করলাম না।

পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম দোজখগুলো আরও ভয়ঙ্কর। এগুলো বিধর্মী : মূর্তিপূজক, মোনাফেক, ধর্মত্যাগীদের জন্য, আর যারা প্রফেটের বিরুদ্ধে গিয়ে তাঁকে উপহাস করেছে। তারা পরিবারবর্গসহ যাবে– ছোট বালিকা যে নরকের জন্য নির্ধারিত ছিল, কারণ তার বাবা ওকবা মোহাম্মদের বিরোধিতা করেছিল। এই সব লোকে পুল সিরাতে পা দিয়ে কয়েক পা যাওয়ার পর পড়ে যাবে গভীর গর্তে যেখানে গনগনে আগুন জ্বলছে এবং এখানে তারা চিরকালের জন্য নরক ভোগ করবে (২ : ৩৭)।

সবচেয়ে নিচের গর্তে পড়ে আগুনে পুড়বে তারা যারা প্রফেটের ব্যক্তিগত শত্রু। যেমন– আবু লাহাব ও তার স্ত্রী, আবু জাহেল এবং ইহুদি, যেমন জাবির। আর একজন ইহুদি, কোজমান যে প্রফেটের সাথে ওহোদের যুদ্ধে মারা যায়। সে দেশের জন্য ও দশের জন্য লড়াই করে মৃত্যুবরণ করে। সে নরকের আগুনের শিশু।

প্রফেট তাঁর, নিজের পূর্ব-পুরুষদের নরকবাসী করেছেন যারা প্রাক-ইসলামী যুগে বাস করেছে এবং ইসলাম গ্রহণ করেনি। তারা বিধর্মী, মূর্তিপূজক হিসাবে মারা গেছে তাই নরকবাসী। তাঁর মাতা আমিনা, যিনি ইসলামের ৩০ বছর আগে মারা গেছেন,

www.pathagar.com

তিনিও নরকে। তাঁর দাদা আবদুল মোতালেব ও চাচা আবু তালিব যারা তাঁকে পেলেছেন, পুষেছেন, আশ্রয় দিয়েছেন, তারাও নরকে অত্যাচারিত হবেন, তারা বিশ্বাসী ছিলেন না ও ইসলামও গ্রহণ করেননি।

কোরানে একটি আয়াত আছে (৯ : ১১৪) মোহাম্মদের কাছে অবতীর্ণ হয়েছিল, যেখানে তাকে বারণ করা হয়েছে, যে কোনো আত্মীয় বিধর্মী হয়ে মারা যায়, যদিও নিকট আত্মীয়, তবুও তার জন্য দোয়া-মাগফেরাত করতে নেই 'তারা নরকবাসী'।

১৪.১৭ স্বর্গ

ক্ষণকালের বিরতির পর সত্যিকারের মুসলিমগণ কোন বাধা ছাড়া পুল পার হয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে। যেমন দোজখে আছে, তেমনি বেহেস্তে সাতটা অঞ্চল আছে এবং জান্নাতবাসীদের পুরস্কার সম্বন্ধে কোরানে ডজন খানের বেশি স্থানে বর্ণিত আছে। মোহাম্মদ তাঁর অনুসারীদের কাছে শপথ করেছেন : 'আমি তোমাদের পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ বস্তু দিয়েছি, পরলোকেও পাবে।'

কোরানের মতে বেহেস্তবাসীদের পুরস্কার হচ্ছে, পুরুষদের জন্য কিশোর বালক (ওয়ালদান) তাদের খেদমতে থাকবে, প্রস্ফুটিত বালক, মুক্তার মতো। যার মধ্যে তুমি আনন্দ পাবে এবং পাবে বিশাল রাজ্য। কোরানের ভাষায় : 'তাহাদিগকে পরিবেশন করিবে চির কিশোরগণ, যখন তুমি উহাদিগকে দেখিবে তখন মনে করিবে উহারা বিক্ষিপ্ত মুক্তা। তুমি যখন সেথায় দেখিবে, দেখিতে পাইবে ভোগ-বিলাসের উপকরণ এবং বিশাল রাজ্য' (৭৬ : ১৯ - ২০)।

সৌভাগ্যবানগণ হুরীদের মুখোমুখি শুয়ে থাকবে, নীলচক্ষু বিশিষ্ট পবিত্র (৫৬ : ২২) কুমারী উন্নত বক্ষ (৭৪ : ৩৩), যাদের কোনো মানুষ বা জিন স্পর্শ করেনি এবং তুমি সেই হুরীর সাথে মিলিত হবে। গিলমান (বালক)দের মতো হুরীরা চির যৌবনা, সুন্দর, সব সময়েই তোমার সেবায় নিযুক্ত।

তফসিরকার স্বর্গের বর্ণনা যা দিয়েছেন তা অভূতপূর্ব, অপার্থিব এবং সেখানকার আনন্দ এবং প্লেজার অতুলনীয়। বিশ্বাসী স্ত্রীরা এবং সত্যিকারের মুসলিম নারীরাও বেহেস্তবাসী হবে (৪৩ : ৭০), কিন্তু তাদের জন্য কোনো যুবক সঙ্গী থাকবে না।

জেহাদীরা যারা ধর্ম যুদ্ধ করেছে ও শত্রু নিধন করেছে বা ইসলাম প্রসারের জন্য কোনো ভালো কাজ করেছে (৯ : ১১২) বা যে বিধর্মীদের হত্যা করেছে, তাদের জন্য বিচারের দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে না, মৃত্যুর সাথে সাথে তাদের নিয়ে যাওয়া হবে বিশেষ সংরক্ষিত স্থানে জান্নাতের মধ্যে। গিবন বলেছেন– পৃথিবীর সৌন্দর্য ও সম্পদ ভোগ, বেহেস্তের আনন্দের কাছে কিছুই নয়, সেখানে শহীদদের জন্য আলাদা ভোগের বন্দোবস্ত আছে।

বেহেস্তের এই লোভের লালসায় দলে দলে জেহাদে যোগ দিয়েছে এবং শহীদ দরজা পেয়েছে বহু কাফিরকে হত্যা করে, কিন্তু তাদের আত্মা এখন কোথায় আছে, কে জানে, কারণ শেষ বিচারের আগে বেহেস্তের দরজা খুলবে কিনা সন্দেহ। বিচারের দিনের পূর্বে সরাসরি বেহেস্তে যাওয়ার কথা কোরানে নির্দিষ্টভাবে বলা নেই; শুধু মুখের কথা।

www.pathagar.com

ইসলামের প্রথম শহীদ ১৬ বছরের বালক ওমর ইবন হুবাব। ছেলেটি এক মুঠে খেজুর খাচ্ছিল। বদরের যুদ্ধের সময় প্রফেট শহীদের বেহেস্তের নিশ্চয়তা দিলে বালকটি লাফিয়ে উঠে বলে, 'খেজুর চিবানোর চেয়ে বেহেস্তের মেওয়া খাওয়া ভালো, এই বলে খেজুর পাশে রেখে তরবারি হাতে যুদ্ধে ছুটে গেল এবং মারা পড়ল।

বর্ণিত আছে সিমফিনের যুদ্ধে (৬৫৭ খ্রি.) একজন সিনিয়র নাগরিক ৮০ বছরের বৃদ্ধ একজন মানুষকে যুদ্ধে শহীদ হতে দেখল তারপর সে কল্পনা করল বেহেস্তের দরজা খুলে গেল এবং একজন নীল-নয়না তন্বী যুবতী স্বল্পবাসে বের হয়ে এসে সেই শহীদ ব্যক্তিকে আলিঙ্গন করে নিয়ে গেল। এই দৃশ্য দেখে তার আর তর সইল না। ঐ ভাগ্য পাওয়ার আশায় সে অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে যুদ্ধ ক্ষেত্রে ছুটে গেল এবং শীঘ্রই কাটা পড়ে। সে তন্বী যুবতীর আলিঙ্গন পেয়েছিল কিনা আল্লাহ জানে।

কোরানে বেহেস্তের যে ছবি ও দৃশ্য অঙ্কিত হয়েছে, বলা হয় যে, এটা কোনো স্বর্গীয় ভিশন নয়, নিছক যৌন ক্রিয়ার স্বপ্ন। তন্বী হুরী, কিশোর গিলমান আর হত্যাকারীর সমন্বয়ে যে স্বর্গের ধারণা মোহাম্মদ দিয়েছেন, তা সুস্থ মস্তিষ্কের কল্পনা নয়; মানুষের কাছে, বিশেষ করে ইহুদি ও খ্রিস্টানদের সমালোচনার বস্তু।

www.pathagar.com

১৫

ইসলামের উভয়-সঙ্কট

শতাব্দির প্রথম দিকে ইসলাম ও পশ্চিমা যোগাযোগে এটাই প্রমাণিত হয়েছিল যে মুসলিমরা নিঃসন্দেহে পশ্চিমা দেশবাসীর চেয়ে অধিক উন্নত ছিল। তাদের বিস্ময়ের দিনগুলো এমন পর্যায়ে ছিল যে তারা সে সময়ের পৃথিবীর অর্ধেকের মালিক ছিল; তারা সব কিছুরই উর্ধ্বে ছিল, কি শিক্ষায়, বিজ্ঞান, সংস্কৃতি ও চারুকলায় সকলের শ্রেষ্ঠ ছিল। অন্যান্য বিষয়েও মুসলিমদের সমতুল্য কেউ ছিল না। তারা ইউরোপের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে বিশাল অংশের অধিপতি ছিল এবং পশ্চিমাদের শিক্ষা গুরু ছিল।

তখন পশ্চিমা লোকজন অনুন্নত ছিল, সভ্যতার আঁচ তখনো গায়ে লাগেনি, সামাজিক ব্যবহারে অনভ্যস্ত ছিল, আতিথেয়তার নিয়মকানুন সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে অনভিজ্ঞ। পরিবার সম্বন্ধে, সন্তানদের সম্বন্ধে প্রায় উদাসীন, ধর্ম সম্বন্ধে অশ্রদ্ধা। পশ্চিমারা ছিল রুক্ষ, অভব্য, আচার ব্যবহারে অশিষ্ট। এক কথায় বলতে গেলে বলতে হয়- "They were among the most stupid, rude and brutish of the nation of mankind."

কিন্তু ইয়োরোপিয়ান শিক্ষা নিতে বা শিখতে শ্লথ ছিল না এবং ঐ শতাব্দিগুলোর মধ্যে যখন ইসলাম গৌরবের উচ্চ শিখরে তখন তারা মাত্র শিক্ষা ও সভ্যতার স্বাদ পেতে শুরু করেছে।

১৫.১ ইউরোপীয় জাতি

প্রথমে ইউরোপীয় জাতি শুরু করে ব্যবসা। তাদের কোনো দিগ্বিজয়ের আকাঙ্ক্ষা ছিল না এবং খ্রিস্টানিটিতে ধর্মান্তরও আরম্ভ করেনি। মুসলিমদের সাথে তাদের প্রথম সংঘর্ষ হয় ক্রুসেডের সময় যখন পবিত্র ভূমি প্রবেশ নিয়ে গোলযোগ বাধে, যদিও বলা হয় যে ১১৮২ খ্রিস্টাব্দে ফ্র্যাঙ্কিশ নাইটের মধ্যে একজন রেনাল্ড অব শাটিলন একদল সৈন্য নিয়ে মদিনা আক্রমণ করতে যান। তিনি মদিনা বন্দর ইয়েনবো অবতরণ করে মদিনাভিমুখে যাত্রা করলে সালাহুদ্দিনের ভাইপো কর্তৃক বিতাড়িত হন।

ভূমধ্যসাগরের তীরে মুসলিম রাষ্ট্র উন্নতি লাভ করে যখন তাদের সেই অঞ্চলে কর্তৃত্ব ছিল। মরক্কো থেকে ত্রিপোলিটানিয়া (লিবিয়া) পর্যন্ত বার্বার উপকূল এবং মিসরের সুলতানরা বিদেশী জাহাজের পণ্যের ওপর অতিরিক্ত কর বসাত তার পর তাদের পণ্যদ্রব্য ঐ সব অঞ্চল থেকে ছাড় পেত।

www.pathagar.com

পঞ্চদশ শতাব্দির শেষ থেকে ইউরোপিয়ান শক্তিগুলো মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। ১৪৯২ সালে স্পেন থেকে মুরস্‌দের বিতাড়ন করা হলো। এটা হলো জানুয়ারি মাসে। ঐ বছর অক্টোবর মাসে কলম্বাস নতুন পৃথিবী আবিষ্কার করলেন। এর সাথে একটা নতুন চ্যাপ্টার পশ্চিম দেশের ইতিহাসে শুরু হলো। ১৪৯৮ সালে ভাস্কোদা-গামা কেপ অব গুড হোপ হয়ে ভারতের রাস্তা আবিষ্কার করলেন– এই রূপে ভারতের ও দূর প্রাচ্যের সাথে বাণিজ্যে একটি বিকল্প রাস্তা বের হলো।

এখন ইউরোপিয়ানরা তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য পূর্বাঞ্চলীয় দেশের সাথে বর্ধিত করল এবং তাদের কর্তৃত্ব সেখানে ফলাতে শুরু করল—প্রায়ই জলদস্যুদের সহায়তায়। স্পেনের মতো পর্তুগিজরা জাহাজ তৈরি স্পেনের সাথে ব্যবসার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমে বাণিজ্য শুরু করল। তারা ভূমধ্যসাগরের জলদস্যুদের সাথে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে সময় সময় মিসরের শাসকদের কর দেয়া বন্ধ করল।

ষোড়শ শতাব্দির মধ্যে ইউরোপীয়রা পারস্য উপসাগরে ঢুকে পড়ল এবং মাস্কাট অধিকার করে হোরমুজের পাশে কয়েকটি দুর্গ গড়ে তুলল। এর সাথে লোহিত সাগরের তীরেও দুর্গ নির্মাণ করে তাদের ট্রেডিং স্থাপনা গার্ড দেয়া আরম্ভ করল। পরে তারা বাইরে শত্রুদের আক্রমণ প্রতিহত করতে সমর্থ হলো। ১৫১৫ খ্রিস্টাব্দে, পর্তুগিজ ভারতের ভাইসরয়, আলফেন্সো আলবুকার্ক পরিকল্পনা করলেন কিন্তু মক্কা আক্রমণ করতে সমর্থ হননি এবং ১৫১৭ সালে লোপো সোরেস ডি আলবারগারিয়া শুধু হুমকি দিলেন কিন্তু জেদ্দা আক্রমণ করলেন না।

কয়েক দশক পরে তুর্কিরা বল্কান ও পশ্চিম ইউরোপ দখল করে এগিয়ে যেতে অস্ট্রিয়ার ডন জন সুলতান দ্বিতীয় সেলিমের তুর্কি নৌবহর ধ্বংস করে দেন ১৫৭১ খ্রিস্টাব্দে লিওপান্টোর যুদ্ধে। পরে জন সোবেস্কি ভিয়েনার ফটকের কাছে তুর্কি সেনাদের পরাজিত করেন (১৬৮৩)। ছোটখাটো সংঘর্ষ ও বড় যুদ্ধ চলতে থাকল মুসলিম সৈন্য ও ইউরোপীয় সেনাদের মধ্যে এখানে-সেখানে, যাতে আস্তে আস্তে তুর্কি অঞ্চল হাতছাড়া হতে থাকে।

যখন নেপোলিয়ান বোনাপার্টে অটোম্যান মধ্যপ্রাচ্য আক্রমণ করে ১৭৯৮ সালে মিসর আক্রমণ করেন, তখন দেখেন যে ধর্মীয় প্রভাব শিক্ষা ব্যবস্থার অনেক ক্ষতি করে ফেলেছে। সেখানে উপযুক্ত আরবি ভাষা জানা লোক খুঁজে পেলেন না যার হাতে স্থানীয় শাসনভার দেয়া যায়। বাধ্য হয়ে তিনি তুর্ক, আলবেনিয়া ও অন্য বিদেশী দিয়ে তার পোস্টগুলো ফিল আপ করলেন। তিনি তাঁর সাথে বৈজ্ঞানিক, ইঞ্জিনিয়ার, আর্কোলজিস্ট ও স্কলার এবং আরবি টাইপের প্রিন্টিং মেশিনও আনেন– এতে প্রিন্টিং প্রেস দিয়ে তিনি ঘোষণাপত্র প্রকাশ করেন এবং কাজে লাগিয়ে দেন।

ইউরোপীয়রা আসার পর বাণিজ্যপথ এবং শিপিং লাইনের নিরাপত্তা বেড়ে যায়– বিশেষ করে ফরাসি আসার পর এবং বোম্বে উপকূলে জলদস্যুদের উৎপাত বন্ধ হওয়ার পর। তখন ১৮৩০ সাল। কিন্তু ফরাসি ইঞ্জিনিয়ার ফার্দিনান্দ ডি লেসেপস্‌ ১৮৬৯ সালে সুয়েজ খাল তৈরি করার পর ভূমধ্যসাগরের মুসলিম ভূমিগুলোর গুরুত্ব বেড়ে যায়।

তারপর থেকে পূর্বাঞ্চলীয় এলাকায় ইউরোপীয়দের বাণিজ্য তৎপরতা আরো বেড়ে যায় এবং বাণিজ্য কেন্দ্র থেকে এসব দেশে রাজ্য বিস্তারের স্বপ্ন দেখতেও আরম্ভ

www.pathagar.com

করে। মুসলিম সাম্রাজ্যে নৈতিক চরিত্রের অবনতি, প্রশাসনিক দুর্নীতি এবং সামরিক দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ইউরোপীয় ডিসিপ্লিন্ড সেনাদলের হয়ে আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত মুসলিম রাজ্যগুলো দখল করতে খুব বেগ পেতে হয়নি।

উনবিংশ শতাব্দির মাঝামাঝি, ব্রিটেন, ফরাসি, স্পেন, পর্তুগাল, হল্যান্ড ও রাশিয়া জয় করেছিল, কলোনি তৈরি করেছিল, দখল করেছিল, কর্তৃত্বে রেখেছিল (Put up protection) বা অন্যভাবে শাসন করেছে মুসলিম বিশ্বের দেশগুলোকে। শুধু সৌদি আরব, তুরস্ক, ইরান ও আফগানিস্তান– এই গুটি কয়েক মুসলিম দেশ টিম টিম করে তাদের নিজস্ব শাসন কোনো প্রকারে বজায় রেখেছিল– কারণ এগুলো পশ্চিমা জাতির উদ্দেশ্যে 'নিউট্রাল রাজার রাজ্য' হিসাবে টিকে ছিল।

যখন ইসলামী বিশ্বে ইউরোপীয়দের ঢল নামল মনে হলো যেন মুসলিম জাতি পৃথিবীর ইতিহাসের অগ্রস্রোত থেকে সরে পিছনে স্থির হয়ে গেল। পৃথিবীর যেখানে যেখানে মুসলিম রাজ্য ছিল সব যেন নেতিয়ে পড়ল। জার্মান দার্শনিক জি.ডাব্লিউ.এফ. হেগেন (মৃ. ১৮৩১) এতদূর পর্যন্ত লিখেছেন যে, ইসলাম ইতিহাস থেকে অনেক আগেই হারিয়ে গেছে এবং প্রাচ্য দেশীয় আরামে বিশ্রাম নিচ্ছে। ক্ষমতার শীর্ষে থাকার সময় ইসলাম যা নেবার অন্যদের কাছ থেকে নিয়েছে এবং যখন আর কিছু পায়নি, তখন আর কিছু না পেরে এখন প্রায় পাঁচ শতাব্দিকাল ধরে ঘুমে ঘুমাচ্ছে। এর গৌরবের সময় এসেছিল আর চলে গেছে এবং মধ্যযুগ থেকে ইসলামের আর সাড়াশব্দ নেই।

ইসলাম ধর্ম তার আধ্যাত্মিক শক্তি হারিয়ে ফেলেছে। কোরান বলছে, ইসলাম আল্লাহর মনোনীত ধর্ম (সিবগা)। এখন ইসলাম মনে হয় মানুষের বহিরাবরণ মাত্র; রুটিন বিষয়– নামাজ, রোজা, হজ, জাকাতে সীমাবদ্ধ, আর 'ওয়াইন' ও 'সোয়াইন' এই দুটো বস্তু হারাম।

বহির্জগতে মুসলিম যেন মরা জাতি, কেতাব বন্ধ করে বসে আছে। আর তাদের ইচ্ছা নেই বইটা খুলে পড়তে। অনেক দিন আগে থেকে তারা প্রফেটের শিক্ষা ভুলে গেছে। তিনি বলেছেন, জ্ঞান আহরণ করতে চীন পর্যন্ত যাও। ইসলামের বুদ্ধিমত্তায় খিঁচ (rigor mortis) ধরে গেছে। ফরাসি লেখক আর্নেস্ট রেনন বলেছেন– ওরিয়েন্ট ও আফ্রিকাতে 'বিশ্বাসী'দের মস্তকে 'লৌহবলয়' লেগে গেছে, তাদের মস্তকে নতুন কোনো ধারণা বা আইডিয়া ঢুকছে না।

পশ্চিমের পর্যটক, প্রত্নতত্ত্ববিদ ইত্যাদি আরবের প্রত্যন্ত অঞ্চলে নিজেদের জীবন বিপন্ন করে চলে যাচ্ছে এবং তারা উদ্ধার করছে হারিয়ে যাওয়া সব প্রস্তরলিপি যা হাজার বছর ধরে ভুলে গেছে মানুষে। আর এই সব লিপি উদ্ধার করে প্রাক-ইসলামী যুগে অতীতের সাথে আরবের বর্তমান অবস্থা তুলনা করছে।

আরবি পুস্তক প্রথমে ইউরোপে ছাপা হয় এবং মুসলিম দেশগুলোতে বিলি করা হয়। তার মধ্য দিয়ে মানুষ জানতে পারছে, বিগত দিনগুলোতে আরব কত উন্নত ছিল। অর্ধ-বিস্মৃত আরবি ক্লাসিক, পুনআবির্ভাব হয়ে নতুনভাবে সম্পাদিত হচ্ছে ইউরোপিয়ান স্কলার দ্বারা এবং এই এডিশনে আরবের প্রাথমিক লেখাগুলো নতুন আলোপ্রাপ্ত হচ্ছে।...

www.pathagar.com

মুসলিম স্কলার নতুন স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিড় জমাচ্ছে এবং আরব ইতিহাস ও সাহিত্য সম্বন্ধে পশ্চিমা-স্কলার লিখিত পুস্তকগুলো অধ্যয়ন করছে কিংবা আরবি ভাষায় লিখিত অনুবাদ পড়ার সুযোগ পাচ্ছে। যারা পারছে, তারা ইউরোপে যাচ্ছে উচ্চ শিক্ষার জন্য, ইঞ্জিনিয়ারিং ও প্রযুক্তি বিদ্যায় জ্ঞান লাভ করার জন্য। আরব লেখকগণ সংবাদপত্র ও সাময়িকী বের করে তাদের মতামত প্রকাশ করছে, সংবাদ সরবরাহ করছে এবং প্রাচীন বিশ্বাস ও প্র্যাকটিস সম্বন্ধে প্রশ্ন করছে মুক্ত চিন্তা নিয়ে।

দখলকৃত ভূমিতে ইউরোপীয় শক্তি সরকারি প্রশাসনে ওয়েস্টার্ন প্রথায় নতুন পরিবর্তন আনছে। তার বিচার পদ্ধতিকে আধুনিকীকরণ করছে এবং অনেক মুসলিম সেই পরিবর্তিত সিস্টেম চালু রাখছে। রাজনৈতিকভাবে, নতুন নতুন আইডিয়া যেমন-গণতন্ত্র, কনস্টিটিউশনাল সরকার নির্বাচনের মাধ্যমে প্রবর্তিত হচ্ছে। বলতে গেলে, ইসলাম পুনর্জাগরণ হচ্ছে এই সব নতুন সিস্টেমের কারণে। তাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের পেছনে ইউরোপিয়ান উৎসাহ বিশেষ ভূমিকা রেখেছে।

ইন্ডিয়া ১৮৫৭ সালে সিপাহি বিদ্রোহের পর মোগল সাম্রাজ্যের পতন দেখেছে। তারপর ব্রিটিশ ভারতের শাসনভার হাতে তুলে নিয়েছে। ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত শাসন করেছে। মালয়েশিয়া দখল করেছিল পরপর পর্তুগিজরা (১৫১১), ডাচরা, (১৬৪১) এবং ব্রিটিশরা ১৮২৪ সালে। এ দেশ স্বাধীন হয় ১৯৬৩ সালে। ইন্দোনেশিয়ায় ১৯৪৫ পর্যন্ত ডাচরা শাসন করছে। ব্রুনেই (বোর্নিও) ১৯৪৩ পর্যন্ত ব্রিটিশ প্রটেকটরেট ছিল।

উত্তর আফ্রিকা, মোরিতানিয়া, মরক্কো, আলজেরিয়া, তিউনিশিয়া এবং লিবিয়া স্বাধীনতা পেয়েছিল ১৯৫২ থেকে ১৯৬২ সালের মধ্যে; সিরিয়া ও লেবানন স্বাধীন হয় ১৯৪৬ সালে; মিশর ১৯৩৬ পর্যন্ত ব্রিটিশ প্রটেকটরেটে ছিল; ইরাক ছিল ১৯৩২ পর্যন্ত, জর্ডন ১৯৪৬ পর্যন্ত; প্যালেস্টাইন ১৯৪৮ পর্যন্ত।

মধ্য ও পূর্ব আফ্রিকায়, মালি, চাদ, সেনেগাল, গাম্বিয়া, নিজার এবং গিনিয়া ১৯৬০ সাল পর্যন্ত ফরাসির অধীনে ছিল। সুদান ছিল ব্রিটিশদের অধীনে ১৯৫৬ পর্যন্ত তারপর স্বাধীন হয়েছে। এডেন (দক্ষিণ ইয়েমেন) ছিল ব্রিটিশ ক্রাউন কলোনি ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত। সোমালিয়া উনবিংশ শতাব্দির শেষে ব্রিটিশ, ফরাসি ও ইতালির মধ্যে ভাগ হয়ে যায়; সোমালিয়া স্বাধীন হয় ১৯৬০ সালে। পারস্য উপসাগরের সব ছোট ছোট রাজ্য ব্রিটিশ প্রটেকটোরেট; কুয়েত স্বাধীন হলো ১৯৬১ সালে; তারপর বাহরাইন, কাতার ও অন্যান্য রাজ্য।

১৮৮১ সালের মধ্যে রাশিয়া দখল করে নেয় মধ্য এশিয়ায় তুর্কিস্তানের সমস্ত অঞ্চল। এরপর বিভক্ত হয় খানেট-এ, যেমন কাজাকাস্তান, কিরঘিজিয়া, তাজাকিস্তান, তুর্কমেনিস্তান ও উজবেকিস্তান এই সব খানেট স্বাধীন হয় ১৯৯০-এ।

১৫.২ মৌলবাদী

মুসলিম দেশগুলোর ওপর ওয়েস্টের বিস্তৃত প্রভাব মোলবাদী ইসলামের মধ্যে প্রবল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করল। এই প্রতিক্রিয়ার পুরোভাগে ছিলেন মুসলিম মোল্লারা, ইমাম, আয়াতুল্লাহ, উলেমা আর মুফতি। তারা ওয়েস্টার্ন আইডিয়াকে প্রতিহত করতে চাইল কারণ এগুলো পরিবর্তনের দ্বার খুলে দিচ্ছে এবং মুসলিমদের মনে নতুন এক প্রকার

www.pathagar.com

বিদেশী ধারণা দিচ্ছে, যা তারা বুঝতে ও নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না। ওয়েস্টের এই ক্ষমতা ইসলামে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছে যা তাদের জীবনযাত্রার প্রতি হুমকি স্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আধুনিকীকরণ, ধর্মনিরপেক্ষতা ও উদার আন্দোলনকে মোল্লারা ও গোঁড়াবাদীরা নাস্তিকতার উল্টো দিক মনে করে। এরা শুধু অধার্মিক নয়, ধর্মবিরুদ্ধ। ওয়েস্টার্ন জীবনযাত্রার কতকগুলো বিষয়কে মোল্লারা শয়তানি কারবার মনে করে, কারণ, এসব আন্দোলন শতাব্দিকাল ধরে গ্রথিত ইসলামী ধারাকে উৎখাত করতে চাচ্ছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, তারা মেয়েদের উৎসাহিত করছে স্বাধীনতা আদায় করতে যা ইসলামী আইনে অনুমতি দেয় না। অন্য দিকে ওয়েস্ট সিভিল স্বাধীনতার ওকালতি করে, যা মুসলিম কর্তৃত্বকে দুর্বল করবে এবং গণতন্ত্রকে উৎসাহ দিচ্ছে, যা মুসলিম সরকারের ক্ষতি করবে। ইসলামে স্বৈরাচারী শাসন চিরকাল চলে আসছে এবং গ্রহণীয় কারণ এটা ট্র্যাডিশনের মূলধারাকে মজবুত করে।

ইসলামের মূলনীতি সম্বন্ধে কোনো তদন্ত বা এর সত্যতা সম্বন্ধে প্রশ্ন তোলা যাবে না, কারণ ইসলামের মৌল আদর্শকে মুখ বুজে মেনে নিতে হবে, ট্যাফুঁ চলবে না। কোরানে আধুনিককালের সব সমস্যার সমাধান আছে এবং প্রত্যেক অবস্থায় কোরানের গাইডনেস যথেষ্ট এবং যেহেতু আল্লাহর বাণী আক্ষরিকভাবে অবতীর্ণ। সেই রূপ আক্ষরিকভাবে এর ব্যাখ্যা করতে হবে, কোনো সংস্কারকদের অন্য প্রকার ব্যাখ্যা চলবে না।

মৌলবাদীরা জিদ ধরেছেন, শরিয়তে যেসব আইন-কানুন বিধৃত আছে তার পুনর্বহাল একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে, শরিয়া আইনের কোনো কিছু পরিবর্তন চলবে না এবং একেই বর্তমান যুগের সাথে মিলিয়ে চলতে হবে, দরকার হলে 'ফতোয়া' তো আছেই। আর প্রতিষ্ঠা করতে হবে শরিয়া আদালত যার মাধ্যমে শরিয়া আইন প্রয়োগ করা হয় এবং সেই আদিকালের বাসি শাস্তিগুলো ইমপোজ করা হয়।

এই সব মোল্লা-আয়াতুল্লাহর দল ইসলামের সেই স্বর্ণ-যুগের স্বপ্নে বিভোর হয়ে আছেন, 'নস্টালজিয়ায়' বাগদাদ, কাইরো আর কর্ডোভার ঢেঁকুর তুলছেন। তাছাড়া মদিনার সেই চার খলিফার 'most Purest and perfect' শাসন, সেই বিজয়ের দিনগুলো যখন ইসলাম-গৌরব সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছিল।

মুসলিম গোঁড়াবাদীদের যে গোঁড়ামি তার নড়ন-চড়ন হবে না এবং তাদের সন্দেহ ও ভয়ের কারণে তারা এখন জঙ্গিভাবাপন্ন, একটা যুদ্ধংদেহি ভাব। র‍্যাডিকাল অ্যাক্টিভিস্টরা বিশ্বাস করে বোমা মেরে আচমকা আক্রমণ করে ভয় দেখালেই কাজ হয়ে যাবে। গুপ্ত-হত্যা, জিম্মি-বন্দি করলেই বোধ হয় কেল্লা ফতে হয়ে যাবে। সত্যি বলতে কি, আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদে ইসলামী মৌলবাদীরা বিশ্বাস করে তারা বিশ্বজুড়ে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে সপ্তম শতাব্দিতে ফিরে যাবার চেষ্টা করছে (তাহেরি, ১৯৮৭; HMT আহমদ, ১৯৮৯); তারা বিশ্বাস করে এই সন্ত্রাসবাদ অনন্তকাল জিহাদের শামিল। এই 'ডকট্রিন অব আন-এনডিং জিহাদ' মৌলবাদীদের তরণী একদিন তীরে ভিড়িয়ে দিবে। এই চরমপন্থীরা সেই দিনের আশায় বসে আছে কখন তাদের 'ইসলামিক নুক্লিয়ার বোম' আবিষ্কৃত হবে এবং সারা বিশ্ব জয় করে বিশ্ববাসীদের খাৎনা করে ছাড়বে।

www.pathagar.com

১৫.৩ সংস্কারকগণ

সংস্কারের যারা প্রবক্তা তারা বলেন, মৌলবাদীদের ধারণা আলোকিত মুসলিম চিন্তাবিদ্‌দের যুক্তিযুক্ত ধারণার অনেক পিছে। মৌলবাদীদের বিজয়-অর্থ স্বেচ্ছাচারী সরকার, দমনকারী মোল্লা, যারা এতদিন অজ্ঞ, অশিক্ষিত, সরল ও ধার্মিক জনগণকে ঠকিয়েছে, তাদের দানে, উপঢৌকনে, খেলাতে সম্পদের পাহাড় গড়েছে।

পিছনে তাকিয়ে গৌরবের দিনগুলির গিলিত চর্বণ করে শরীরে পুষ্টি জোগায় না, গোবর-ঘাসি হয়ে যায়। এটা তো হারিয়ে গেছে, ফিরে পাওয়ার জো আছে কি? সে রামও নেই, অযোধ্যাও নেই। এটা মায়া ভ্রান্তি এই ক্রান্তি কালে; সে তো সোনার হরিণ যাকে ধরা যায় না, ছোঁয়াও যায় না। ইসলামের কোনো দিন স্বর্ণ-যুগ ছিল না। শুরু থেকেই (প্রফেটের মৃত্যুর পর) ইসলাম শত ফিরকায় ছিন্নভিন্ন। মুসলিম রাষ্ট্রগুলো সব সময়েই ভায়োলেন্সে পরিপূর্ণ এবং ইসলামী সাম্রাজ্য একটা না একটার সাথে ইতিহাস জুড়ে, যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে।

ইসলামে এখনো ঐক্য নেই, কেবলমাত্র, সম্ভবত ইসরাইলের ব্যাপারে একমত (তবু ও কয়েক মুসলিম দেশ তার সাথে বৈদেশিক সূত্র গড়েছে); একমত এই কারণে যে ইসলামী বিশ্বের অন্তরে ওয়েস্ট, ইসরাইলের মাধ্যমে জেঁকে বসেছে। 'জিওনিজমের' বিরুদ্ধে যে জেহাদ, মিসর, জর্ডান, সিরিয়া ও ইরাকের যৌথ শক্তি আরম্ভ করেছিল তা ছয় দিনের যুদ্ধে (৫-১০ জুন ১৯৬৭) লজ্জাজনক পরাজয়ে পরিণত হয়েছে, ইসরাইলের হাতে মার খেয়ে। 'ইসলামিক নুক্লিয়ার বোম' তৈরি করে ইসলামের হৃত গৌরব পুনরুদ্ধার করা পাগলের প্রলাপ ছাড়া আর কী হতে পারে। এ যেন ঢাল নেই, তলোয়ার নেই নিধিরাম সর্দার।

বাস্তব কথা হচ্ছে, কোরান ও শরিয়া আইন কড়াকড়িভাবে পালন করে একেবারে পিউরিটান হয়ে যাওয়া, আজকের দুনিয়ায়, মুসলিমদের পরবর্তী জীবনযাত্রায় সেই সপ্তম শতাব্দির বেদুইন জীবনযাত্রা চিন্তা করাও যেন স্বপ্নাতীত। এর অর্থ এই হবে যে, এতদিন যে-সব সেক্যুলার মিউজিক ও খেলাধুলা ও অন্যান্য উপকরণকে বিসর্জন দেওয়া; এর অর্থ হবে যে, ছবি-সম্বলিত, বই-পুস্তক, মেগাজিন, পোস্টার এবং সবার ওপরে ফটোগ্রাফি, সিনেমা, টেলিভিশন সবই নিষিদ্ধ হয়ে যাবে। কোরানের আইন কড়াকড়িভাবে প্রয়োগের অর্থ হবে, মেয়েদের ঘরে আবদ্ধ রাখা, সেই ক্রীতদাস-দাসী ও একাধিক উপপত্নী, জনসম্মুখে কোড়া মারা পদ্ধতির পুনঃপ্রবর্তন, শরীরের অঙ্গচ্ছেদ, শিরশ্ছেদ, ক্রুসিফিকেশন, পাথর মেরে হত্যা এবং বিধর্মীদের যেখানে পাও কতল করা। এই সমস্ত এবং আরো অনেক 'প্রহিবিশন ও অবলিগেশন' কোরান বা শরিয়া আইন দাবি করবে।

বর্তমান যুগে আমাদেরকে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে মৌলবাদী আক্ষরিক ইন্টারপ্রিটেশের সম্মুখীন হতে হবে। যত মৌলবাদিত্বের দিকে আমরা ঝুঁকে পড়ব, ততই আমাদের আধুনিক জীবনযাত্রা অবাস্তব হয়ে অচল হবে এবং এই দুই মেরুতে বাস করা ইসলামকে বর্তমান যুগে একটা সমঝোতায় আসতে হবে যুগোপযোগী হয়ে, নিছক গোঁড়ামি করে ইসলামের নামে অশান্তি সৃষ্টি করা ইসলামের মর্মকথা নয়।

উদারপন্থীরা বলেন, জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে বেঁচে থাকার পূর্ব শর্ত হয় যুগের

www.pathagar.com

সাথে মানিয়ে চলা– 'অ্যাডাপশন ও কম্প্রোমাইজ'। মুসলিমদের জানতে হবে এই নিয়ম পৃথিবীতে অনেকেই মেনে নিয়েছে। ওয়েস্টার্ন প্রভাবের মাধ্যমে বর্তমানে অনেক পরিবর্তন হয়েছে– যে প্রভাবকে বাদ দিয়ে চলা যায় না। ইসলামী বিশ্ব সাধারণ সমস্যা ভাগ করে নিয়েছে বাকি মানব জাতির সাথে এবং ওয়েস্টের সাথে যোগ দিয়ে আগামী শতাব্দির পৃথিবী যে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হবে তাকে মোকাবেলা করতে হবে।

সংস্কারকগণ মনে করেন, যে ওয়েস্টার্নাইজেশনকে অগ্রাহ্য করা বোকামি ও অসাধুও বটে, যখন প্রতিনিয়ত ইসলামী বিশ্বের লোকজন আজকে নির্ভর করেছে ওয়েস্টের প্রডাক্ট, মালামাল, আবিষ্কৃত বস্তু, এচিভমেন্ট ইত্যাদির ওপর, তাদের জীবনযাত্রা, ব্যবসা-বাণিজ্য, বিনোদন, আরাম-আয়াস, তাদের প্রতিরক্ষা, নিরাপত্তা, যোগাযোগ স্বাস্থ্য ও কল্যাণ পরিচালন ও পালনের জন্য।

ওয়েস্টের সাথে যোগাযোগের পর ইসলাম রেনেসাঁর অভিজ্ঞতা লাভ করেছে, কিন্তু এখন একটি রিফরমেশনের দরকার। যারা বহির্জগত থেকে এই সংস্কারের আপত্তি করে সংস্কারকরা বলেন যে, তাদের জন্য ওয়েস্টের গাইডেন্স দরকার নেই, এই সংস্কারের অন্বেষণে। শতাব্দি ধরে মুসলিম চিন্তাবিদরা ইসলামের ব্যবহারিক জীবনের রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় প্রতিটি ক্ষেত্রে চুলচেরা বিচার করে দেখেছে এবং অনেকে আজও দেখছে মৌলবাদীদের দাঁত খিঁচুনির প্রতিরোধ।

যারা কোরানের কাঠামোর বাইরে সংস্কারের আপত্তি ওঠায়, সংস্কারকগণ যুক্তি দেন যে, কোরানের, অন্যান্য ধর্ম পুস্তকের মতো, একটা ছাড়া বহু তাৎপর্য আছে, যেমন মেটাফোরিক্যাল, মেটাফিজিক্যাল, এলিগোরিক্যাল, সিম্বলিক এবং মুসলিমদের এগিয়ে চলা উচিত কোরানের অনেক উদার ও মডারেট অর্থ যুগের সাথে সমন্বিত করে খুঁজে বের করা; আক্ষরিক অনুবাদ ও অর্থকে একপাশে সরিয়ে রেখে।

ধর্মীয় ও স্বৈরাচারী রাজ্য চিন্তাশীল মুসলিমদের জন্য আর গ্রহণীয় নয়। এখন অত্যন্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে রাষ্ট্রকে ধর্ম থেকে আলাদা করা নতুবা ইসলাম আবার সেই গোঁড়া মৌলবাদীদের মৃত-হস্তের ষড়যন্ত্রের পুতুল হয়ে যাবে, আর মুসলিম জীবনের তাজা গোলাপটি মরুভূমির তপ্ত বাতাসে শুকিয়ে শক্ত হয়ে বিকৃত রঙ ধারণ করবে।

www.pathagar.com

কোরেশের বংশ

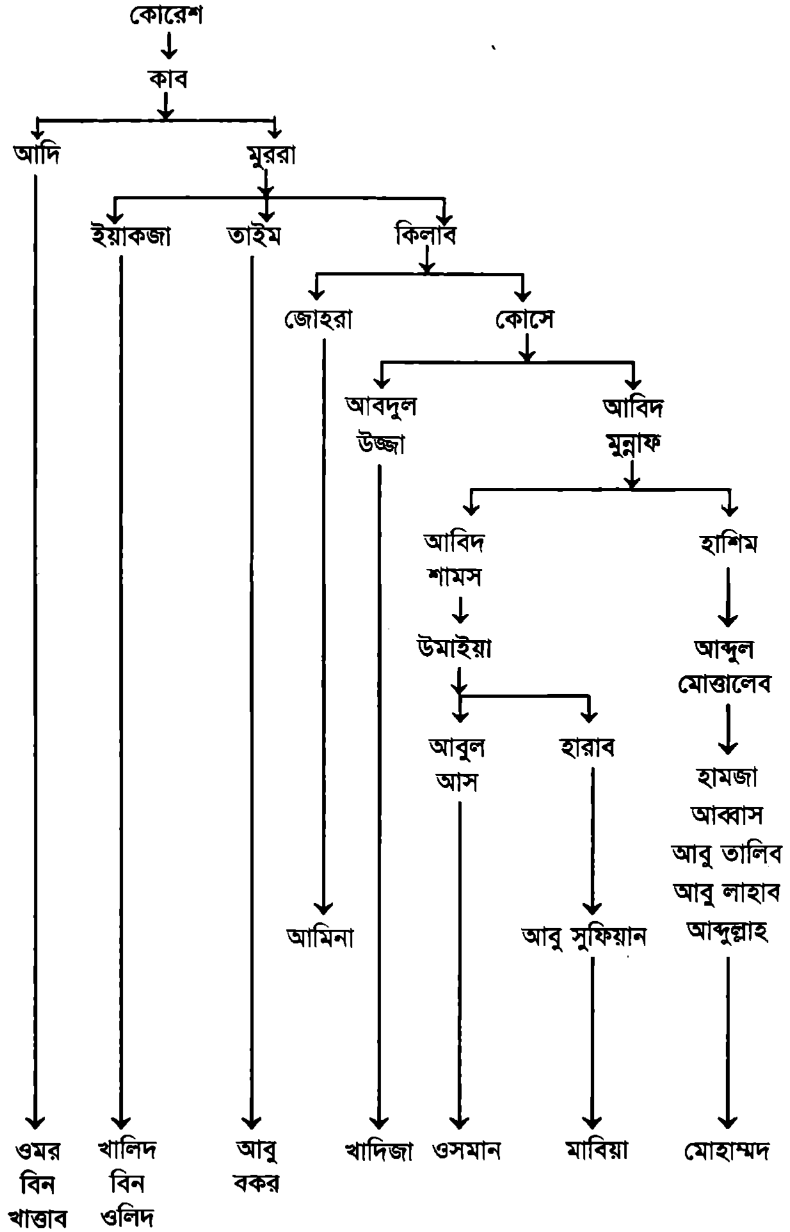

www.pathagar.com

BIBLIOGRAPHY
(গ্রন্থপঞ্জি)

Abbott, Nabia. 1939, *The Rise of the North Arabic Script in its Kuranic Development*, Chicago University Press

Abbott, Nabia. 1985, *Aishah the Beloved of Mohammed*, London : Saqi Books (orig. pub. Chicago University Press, 1942)

Abdel-Jalil, Jean, 1950, *Marie et l' Islam*, Paris : Beauchesne

Addison, J. T. 1942, *The Christian Approach to the Moslem*, New York : Scribners

Ahmad, Hasrat Mirza Tahir, 1989, *Murder in the Name of Allah*, Cambridge : Lutter-worth Press

Ahmad, Maqbul. 1969, *Indo-Arab Relations, An Account of India's Relations with the Arab World from Ancient up to Modern Times*, New Delhi : Taj Printers

Ahmed, Leila, 1992, *Women and Gender in Islam*, New Haven : Yale University Press

Ahrens, Karl, 1935, *Muhammad and Religionsstifter*, Leipzig : Griebus

Ajijola, Alhaj A. D. 1975, *The Myth of the Cross*, Lahore : Islamic Publications

Akhtar, Shabbir, 1989, *Be Careful with Muhammad*! London : Bellew

Ali, M. 1921, *Muhammad and Christ*, Lahore : Lahore Printers.

Ameer Ali, Syed. 1965, *The Spirit of Islam*, London : Methuen (orig. pub. London : Christophers. 1922)

Andrae, Tor, 1955, Les Origines de l'Islam et le Christisme, Paris : Adrien Maisonneuve

Andrae, Tor. 1960, *Mohammed : The Man and His Faith*, New York : Harper

Arberry, A. J. 1956, *Sufism : An Account of the Mystics of Islam*, London : Allen & Unwin

Arberry, A. J. 1964, *Aspects of Islamic Civilization*, London : Allen & Unwin

Archer, John Clark. 1924, *Mystical Elements in Mohammed*, New Haven : Yale University Press

www.pathagar.com

Armstrong, Karen, 1991, *Muhammad : A Western Attempt to Understand Islam*, London : Gollancz

Arnaldez, Roger, 1980, *Jesus, fils de Marie, prophete de l' Islam*, Paris : Desclee

Arnold, J. M. 1874, *Islam and Christianity*, London : Longmans

Arnold, Thomas, and Guillaume, Alfred, eds. 1965, *The Legacy of Islam*, Oxford University Press

Ascher, A. 1979, *The Mutual Effects of the Islamic and Judeo-Christian Worlds*, New York : Brooklyn College Press

Ayoub, Mahmoud, 1989, Roots of Muslim-Christian Conflict, *The Muslim World*, 79, 31

Bakhtiar, Laleh, 1976, Sufi : Expressions of the Mystic Orient, London : Thames and Hudson

Baljon, J. M. S., 1961, *Modern Muslim Koran Interpretation*, 1880-1960. Leiden : Brill

Balyuzi, H. M., 1976, *Muhammad and the Course of Islam*, Oxford University Press

Bat Ye'or, 1985, *The Dhimmi : Jews and Christians Under Islam. Rutherford*, NJ : Dickinson University Press

Beck, Edmund, 1946, *Das Christliche Monchtum im Koran*, Helsinki : Oriental Society

Backer, C. H., 1909, *Christianity and Islam*, London : Norwood

Backingham, C. F., 1984, *Between Islam and Christendom. Travellers, Facts and Legends in the Middle Ages and Renaissance*, London : Variorum Reprints

Bell, Richard. 1937, 1939, *The Qur'an*, 2 vols, Edinbugh University Press

Bell, Richard, 1953, *Introduction to the Qur'an*, Edinborgh University Press

Bell, Richard, 1968, *The Origin of Islam in Its Christian Environment*, 2nd end. London : Macmillan (orig. pub. 1926)

Bethmann, Erich, 1953, *Bridge to Islam*, London : Allen & Unwin

Birkeland, Harris, 1955, *Old Muslim Opposition Against Interpretation of the Koran*, Oslo : Kommisjon Hos Jacob Dybwad

Birkeland, Harris, 1956, *The Lord Giveth : Studies on Primitive Islam*, Oslo : Aschehong Blunt, Wilfrid Scawen, and Bluent, Lady Anne. 1903, *The Seven Golden Odes of Pagan Arabia also Known as the Moallakat*, London : Blunt

Bormans, Maurice, 1981, *Orientations pour un dialogue entre chretiens et musulmans*, Paris : Cerf

Bouhdiba, Abdelwahab, 1985, *Sexuality in Islam*, London : Routledge & Kegan Paul Bouquet, A. C. 1951. Comparative Religion.

www.pathagar.com

Harmondsworth : Penguin

Brandon, S. G. F., ed. 1970, *A Dictionary of Comparative Religion*, London : Weiden-feld & Nicolson

Bravmann, M. M., 1972, *The Spiritual Background of Early Islam : Studies in Ancient Arab Concepts*, Leiden : Brill

Brown, John P., 1968, *The Dervishes, or Oriental Spiritualism*, London : Frank Cass (orig. pub. 1868)

Browne, Edward Granville, 1921, *Arabian Medicine*, Cambridge University Press

Browne, Edward Granville, 1957, *Literary History of Persia*, Cambridge University Press (orig. pub. London : Fisher Unwin, 1909)

Browne, Laurence, 1933, *The Eclipse of Christianity in Asia*, Cambridge University Press

Budge, E. A. W., 1932, *The Queen of Sheba and Her Only Son Menyelek*, Oxford University Press

Buhl, Frants, 1961, *Das Leben Muhammads*, Heidelberg University Press

Bulliet, R., 1979, *Conversion to Islam in the Medieval Period*, Cambridge, Mass. : Harvard University Press

Burckhardt, John Lewis, 1829, *Travels in Arabia*, Cambridge University Press

Burke, O. Michael, 1976, *Among the dervishes*, London : Octagon Press

Burton, John, 1977, *The Collection of the Qur'an*, Cambridge University Press

Caetani, Leone, 1905, *Annali dell' Islam*, Milan : Hoepli

Cash, W. Wilson, 1937, *Christendom and Islam*, New York : Harper

Chapman, Colin, 1993, *Cross and Crescent*, Leicester : Inter-Varsity Press

Cleveland, William, 1985, *Islam Against the West*, Austin : Texas University Press

Cook, Michael, 1981, *Early Muslim Dogma*, Cambridge University Press

Cook, Michael, 1983, *Muhammad*, Oxford University Press

Corbin, Henry, 1978, *The Man of Light in Iranian Sufism*, Colorado and London : Shambhala

Cragg, Kenneth, 1984, *Muhammad and the Christian*, London : Darton, Longman & Todd

Cragg, Kenneth, 1985, *Jesus and the Muslim : An Exploration*, London : Allen & Unwin

Cresswell, K. A. C., 1969, *Early Muslim Architecture*, 2nd edn. Oxford University Press

www.pathagar.com

Crone, Patricia, 1987, *Meccan Trade and the Rise of Islam*, Oxford : Blackwell, Princeton University Press

Crone, Patricia, and Cook, Michael. 1977, *Hagarism : The Making of the Islamic World*, Cambridge University Press

Crone, Patricia, and Hinds, Martin. 1987, *God's Caliph : Religious Authority and the First Centuries of Islam*, Cambridge University Press

Cutler, Allan Harris, and Cutler, Helen Elmquist. 1976, *The Jew as Ally of the Muslim : Medieval Roots of Anti-Semitism. Indianapolis*, Notre Dame University Press

Daniel, Norman, 1960, *Islam and the West : The Making of an Image*, Edinburgh University Press

Daniel, Norman, 1975, *The Arabs and Medieval Europe*, London : Longmans

Danner, Victor, 1988, *The Islamic Tradition : An Introduction*, Amity, NY : Amity House

Dawood, N.J. (trans). 1990, *The Koran, with a Parallel Arabic Text*, London : Penguin Dennett, D. 1950. Conversion and the Poll-Tax in Early Islam. Cambridge, Mass. : Harvard University Press

Dermenghem, Emile, 1958, *Muhammad and the Islamic Tradition*, New York : Harper. London : Longmans

Diringer, David, 1947, *The Alphabet : A Key to the History of Mankind*, London : Hutchinson

Donner, E. McGraw, 1981, *The Early Islamic Conquests*, Princeton University Press

Doughty, Charles Montagu, 1888, *Travels in Arabia Deserta*, Combridge University Press (reprinted 1924)

Dover, Cedric, 1937, *Half-Caste. London : Secker & Warburg*

Dunlop, D. M. 1971, *Arab Civilization to AD 1500*, London : Hutchinson

Duri, Abdal Aziz, 1983, *The Rise of Historical Writing Among the Arabs*, Princeton University Press

Esin, Emel, 1963, *Mecca the Blessed, Medina the Radiant. London : Elek Faris*, Nabih Amin (trans). 1952. *The Book of Idols, being a Translation from the Arabic of the Kitab al-Asnam*, by Hisham al-Kalbi. Princeton University Press

Freely, John, 1987, *Istambul*, New York : Norton

Frieling, Rudolf, 1978, *Christianity and Islam*, Edinburgh : Floris Books

Fyzee, A. A. A., 1949, *Outlines of Muhammadan Art*, Oxford University Press

Gabus, Jean-Paul, *Ali Merad, and Youakim Moubarac*, 1982, *Islam et Christianisme en dialogue*, Paris : Cerf

www.pathagar.com

Geagea, Nilo, 1984, *Mary of the Koran : A Meeting Point Between Christianity and Islam*, New York : Philosophical Library

Geiger, Rabbi Abraham, 1970, *Judaism and Islam : What did Muhammad take from Judaism*? New York : Ktav (orig. pub. as Was hat Mohammed aus dem Judenthum aufgenommen? Bonn, 1833; English trans. Madras, 1898)

Gellner, Ernest, 1981, *Muslim Society*, Cambridge University Press

Gerholm, Tomas, and Lithman, Yngve Georg, eds. 1989, *The New Islamic Presence in Europe*, London : Mansell

Gibb, H. A. R., 1969, *Mohammedanism : A Historical Survey*, 2nd edn. Oxford University Press

Gibb, H. A. R., 1974, *Arabic Literature*, 2nd edn, Oxford University Press

Gibb, H. A. R., and Kramers, J. H., 1974, *Shorter Encyclopedia of Islam*, Leiden : Brill

Gilsenan, Michael, 1973, *Saints and Sufis in Modern Egypt*, Oxford University Press

Glick, Thomas F., 1980, Islamic and Christian Spain in the Early Middle Ages, Princeton University Press

Glubb, John Bagot, (Glubb Pasha). 1979. *The Life and Times of Muhammad*, London : Hodder & Stoughton

Glueck, Nelson, 1966, *Deities and Dolphins : The Story of the Nabataeans*, London : Cassell

Goldziher, Ignaz, 1967, 1971, *Muslim Studies*, ed. S. M. Stern. 2 vols. London : Allen & Unwin

Goldziher, Ignaz, 1981, *Introduction to Islamic Theology and Law*, Princeton University Press

Griffiths, Sidney, 1988, *The monks of Palestine and the growth of Christian literature in Arabia*, The Muslim World, 78, 1-28

Grunebaum, Gustav von. 1961, *Medieval Islam*, Chicago University Press

Grunebaum, Gustav von. 1976, *Islam and Medieval Hellenism : Social and Cultural Perspectives*, London : Variorum Reprints

Guillaume, Alfred, 1955, *The Life of Muhammad : A Translation of Ibn Ishaq's Sirat Rasul Allah*, Oxford University Press

Guillaume, Alfred, 1960, *New Light on the Life of Muhammad*, Manchester University Press

Guillaume, Alfred, 1983, *Islam. Rev. edn.* Harmondsworth : Penguin (orig. pub. 1956)

Guthrie, A., and Bishop, E. F. 1951, *The Paraclete, Almunhamanna and Ahmad*, The Muslim World, 41, 251-6

Hamidullah, Muhammad, 1974, *Muhammad Rasulallah* : Concise

www.pathagar.com

Life and Work of Founder of Islam, London: Apex

Hamidullah, Muhammad, 1981, *The Battlefields of the Prophet Muhammad*, London : Apex.

Hammdond, Philip, 1970, *The Nabataeans : Their History*, Culture and Archaeology. Gothenburg : Paul Astroms

Hasluck, Frederick, 1929, *Christianity and Islam under the Sultans*, 2 vols. Oxford University Press

Hassan, Ahmad al-, and Hill, Donald R. 1987, *Islamic Technology : An Illustrated History*, Cambridge : UNESCO

Hawting, G. R., 1986, *The First Dynasty of Islam : The Umayyad Caliphate*, AD 661-750. London : Croom Helm

Hayek, Michel, 1959, *Le Christ de l'Islam*, Paris : Giraud

Hiro, Dilip, 1988, *Islamic Fundamentalism*, London : Paladin

Hirschfeld, Hartwig, 1902, *New Researches into the Composition and Exegesis of the Koran*, London : Murray

Hiskett, Mervyn, 1993, *Some to Mecca Turn to Pray*, London : Claridge Press

Hitti, P. K., 1951, *History of the Arabs*, London : Macmillan

Hitti. P. K., 1973, *Capital Cities of Arab Islam*, Minneapolis : Minnesota University Press

Hodgkin, E. C., 1966, *The Arabs*, Oxford University Press

Hoffmann, Helmut, 1961, *The Religions of Tibet*, London : Allen & Unwin

Hoodbhoy, Pervez, 1992, *Islam and Science : Religious Orthodoxy and the Battle for Rationality*, London : Zed Books

Horovitz, Josef, 1925, *Jewish proper names and derivations in the Koran*, Hebrew Union College Annual, ii, Cincinnati

Hourani, Albett, 1947, *Minorities in the Arab World*, Oxford University Press

Hourani, Albert, 1991, *A History of the Arab Peoples*, London : Faber

Hourani, Albert, 1991, *Islam in European thought*, Cambridge University Press

Hughes, Thomas Patrick, 1977, *A Dictionary of Islam*, New Delhi : Cosmo Publications (orig. pub. London: Allen, 1885)

Ibn Hajar, *See Sprenger*, 1856-88

Ibn Ishaq, *See Guillaume*, 1955

Jeffery, Arthur, 1937, *Materials for the History of the Text of the Qur'an*, Leiden : Brill

Jeffery, Arthdur, 1938, *The Foreign Vocabulary of the Qur'an*, Baroda : Oriental Institute

Jeffery. Arthur, 1952, *The Qur'an as Scripture*, New York : Moore

Johnson, Paul, 1979, *Civilizations of the Holy Land*, London :

www.pathagar.com

Weidenfeld & Nicolson

Jomier, Jacques, 1969, *Bible and Koran*, New York : Desclier

Jones, L. Bevan, 1920, *The Paraclete or Mohammed*, The Muslim World, 10, 112-25

Joseph, J., 1961, *The Nestorians and their Muslim Neighbours*, Princeton University Press

Jurgi, Edward Jabra, 1938, *Illumination in Islamic Mysticism*, Princeton University Press

Juynboll, G. H. A., ed., 1982, *Papers on Islamic History. Studies on the First Centuries of Islamic Society*, Carbondale : Southern Illinois University Press

Juynboll, G. H. A., 1983, *Muslim Tradition*, Cambridge University Press

Kalbi, *Hisham al-see Faris*, 1952

Kamal, Ahmad-Bey, 1902, *Les idoles arabes et les divinites egyptiennes*, Paris : Giraud Kateregga, Badru D. and Shenk, David W. 1981, *Islam and Christianity*, Grand Rapids, Mich. : Eerdmans

Katsch, A. I. 1954, *Judaism and Islam : Biblical and Talmudic Backgrounds of the Koran and its Commentaries*, New York : Weiser

Kazi, A. K. and Flynn, J. G., trans, 1984, *Muslim Sects and Divisions*, by Muhammad al-Shahrastani. London : Routledge & Kegan Raul

Kennedy, Hugh, 1986, *The Prophet and the Age of the Caliphates*, London : Longmans

Kepel, Gilleds, 1994, *The Revenge of God. The Resurgence of Islam, Christianity and Judaism in the Modern World*, London : Polity Press

Kinross, Lord, 1964, *Ataturk : The Rebirth of a Nation*, London : Weidenfeld & Nicolson

Kister, M. J., 1980, *Studies in Jahiliyya and Early Islam*, London : Variorum Reprints

Kritzeck, James, ed., 1964, *Anthology of Islamic Literature*, Harmondsworth : Penguin Laffin, John, 1981, *The Dagger of Islam*, London : Sphere

Lalaguna, Juan, 1990, *A Traveller's History of Spain*, Moreton-in Marsh : Windrush Press

Lammens, Henri, 1914, *The cradle of Islam* (*Le berceau de l'Islam*). Rome and Paris : Colonna

Ledit, Charles J., 1956, *Mahomet, Israel et le Christ*, Paris : La Colombe

Leroy, Jules, 1963, *Monks and Monasteries of the Near East*, London : Harrap

Leslie, E. A., 1936, *Old Testament Religion in the Light of its Canaanite Background*, New York : Scribners

www.pathagar.com

Leszynsky, R., 1910, *Die Juden in Arabien zur Zeit Mohammads*, Berlin : Baradorf

Levonion, L., 1940, *Studies in the Relationship Between Islam and Christianity, Psychological and Historical*, New York : Stechert

Lewis, Bernard, 1966, *The Arabs in History*, 4th edn. London : Hutchinson

Lewis, Bernard, 1971, *Race and Colour in Islam*, Princeton University Press

Lewis, Bernard, 1983, *The Jews of Islam*, Princeton University Press (and London : Routledge & Kegan Paul, 1984)

Lings, Martin, 1971, *A Sufi Saint of the Twentieth Century*, London : Allen & Unwin

Lings, Martin, 1983, *Muhammad : His Life Based on the Earliest Sources*, London : Allen & Unwin

Lyall, Charles James, 1930, *Translations of Ancient Arabic Poetry*, London : Williams & Norgate

McAuliffe, Jane Dammen, 1981, Chosen of all women : Mary and Fatima in Quranic exegesis, *Islamochristiana*, 7, 19-28

McAuliffe, Jane Dammen, 1991, *Quranic Christians : An Analysis of Classical and Modern Exegesis*, Cambridge University Press

McCurry, Don M., ed., 1979, *The Gospel and Islam : A Compendium*, Monrovia, Cal. : Marc

Macdonald, Duncan B., 1909, *The Religious Life and Attitude in Islam*, Chicago University Press

Majumdar, R. C., 1948, *An Advanced History of India*, London : Macmillan

Makdisi, George, 1981, *The Rise of Colleges : Institutions of Learning in Islam and the West*, Edinburgh University Press

Mango, Cyril, 1988, *Byzantium : The Empire of the New Rome*, London : Weidenfeld & Nicolson

Margoliouth, David S., 1924, *The Relations Between Arabs and Israelites Prior to the Rise of Islam*, London : Schweich Lectures

Margoliouth, David S., 1926, *The Early Development of Mohammedanism*, London : Murray

Matt, Daniel Chanan, 1983, *Zohar : The Book of Enlightenment*, London, SPCK

Mernissi, F., 1975, Beyond the Veil. Cambridge, Mass, : Harvard University Press

Michaud, Henri, 1960, *Jesus selon le Coran*, Neuchatel : Delachaux

Miller, J., Innes, 1969, *The Spice Trade of the Roman Empire*, Oxford University Press

Minai, Naila, 1981, *Women in Islam*, New York : Seaview Books

www.pathagar.com

Mingana, A., 1927, *Syriac influence on the style of the Kur'an*, Rylands Bulletin, Manchester

Montgomery, James A., 1934, *Arabia and the Bible*, Oxford University Press. Philadelphia : University of Pennsylvania Press

Moubarac, Father Y., 1958, *Abraham dans le Coran*, Paris : Niclaus

Moucarry, Chawkat Georges, 1988, *Islam and Christianity at the Crossroads*, Tring : Lion

Muir, Sir William, 1878, *The Coran : Its Composition and Teaching, and the Testimony it Bears to the Holy Scriptures*, Edinburgh University Press

Muir, Sir William, 1882, *The Apology of Al Kindy*, Cambridge University Press

Muir, Sir William, 1912, *The Life of Mohammed, from Original Sources*, Rev. edn. Edinburgh : John Grant (orig. pub. 1858-61)

Muir, Sir William, 1924, *The Caliphate : Its Rise*, Decline and Fall. Edinburgh; John Grant

Musallam, Basim, 1983, *Sex and Society in Islam*, Cambridge University Press

Naipaul, V. S., 1981, *Among the Believers : An Islamic Journey*, London : Andre Deutsch

Nasr, Seyyed Hossein, 1978, *Science and Civilization in Islam*, 2nd edn. Cambridge : Islamic Texts Society

Nazir Ali, Michael, 1987, *Frontiers in Muslim-Christian Encounter*, Oxford : Regnum Books

Needham, Joseph, 1959, *Science and Civilization in China*, Vol. III. Cambridge Universtiy Press

Newby, Gordon, 1988, *A History of the Jews of Arabia*, Columbia : South Carolina University Press

Nicholson, Reynold A., 1923, *The Idea of Personality in Sufism*, Cambridge University Press

Nicholson, Reynold A., 1963, *The Mystics of Islam*, 2nd edn. London : Routledge & Kegan Paul

Nicholson, Reynold Ad., 1967, *Studies in Islamic Mysticism*, Cambridge University Press

Nichlson, Reynold A., 1969, *A Literary History of the Arabs*, 2nd edn. Cambridge Universtiy Press

Nizam, Ashraf F., 1981, *Namaz : The Yoga of Islam*, Bombay : Taraporevala

Noldeke, Theodor, 1858, *Hatte Muhammed Christliche Lehrer*? Zeitschrift der deutschen Morgenlandischen Gesellschaft, xii

Noldeke, Theodor, 1860, *History of the Qoran*, Gottingen University Press

www.pathagar.com

O'Leary, De Lacy, 1922, *Arabic Thought and its Place in History*, London : Longmans

O'Leary, De Lacy, 1927, *Arabia Before Muhammad*, New York : Dutton, London : Kegan Paul, Trench, Trubner

Parrinder, Geoffery, 1976, *Mysticism in the World's Religions*, London : Sheldon Press

Parrinder, Geoffrey, 1979, *Jesus in the Qur'an*, London : Sheldon Press

Parrinder, Geoffrey, 1983, *An Illustrated History of the World's Religions*, London : Newnes

Parshall, Phil, 1990, *The Cross and the Crescent*, Amsterdam : Scripture Press

Patton, Walter, M., 1897, *Ahmad ibn Hanbal and the Mihna*, Leiden : Brill

Peters, F. E., 1968, *Aristotle and the Arabs : The Aristotlian Tradition in Islam*, New York : Harper

Petersen, Erling Ladewig, 1974, *Ali and Muawiya in Early Arabic Tradition*, Copenhagen : Odense

Petrushevsky, I. P., 1988, *Islam and Iran*, London : Athlone Press

Philby, H. St John B., 1947, *The Background of Islam : Being a Sketch of Arabian History in Pre-Islamic Times*, Alexandria : Whitehead Morris

Phillips, Wendell, 1955, *Qataban and Sheba*, New York : Harcourt, Brace

Pinault, David, 1987, *Images of Christ in Arabic Literature. Die Welt des Islams*, 17, 103-25

Pipes, Daniel, 1981, *Slave Soldiers and Islam*, New Haven : Yale University Press

Rahman, Fazlur, 1966, *Islam*, London : Weidenfeld & Nicolson

Rahman, Fazlur, 1980, *Major Themes of the Qur'an*, Minneapolis : Bibliotheca Islamica

Rawlinson, H. G., 1954, *India : A Short Cultural History*, London : Cresset Press

Rice, Cyprian, 1964, *The Persian Sufis*, London : Allen & Unwin

Rice, D. Talbot, 1971, *Islamic Painting : A Survey*, Edinburgh University Press

Ringgren, H., 1955, *Studies in Arabian Fatalism*, Uppsala University Press

Rivoira, G. T., 1919, *Moslem Architecture : Its Origin and Development*, Oxford University Press

Robson, J., 1929, *Christ in Islam*, London : Murray

Rodinson, Maxime, 1976, *Mohammed, trans. Anne Carter*, Harmondsworth : Penguin

www.pathagar.com

Rodwell, J. M., trans, 1915, *The Koran*, London : Dent

Ronan, Colin A., 1984, *Cambridge Illustrated History of the World's Science*, Cambridge Univrsity Press

Rosenthal, F., 1952, *A History of Muslim Historiography*, Lieden : Brill

Rousseau, Richard W., ed., 1985, *Christianity and Islam : The Struggling Dialogue*, Montrose, Pa. : Ridge Row Press

Rudolph, W., 1922, *Die Abhangigkeit des Qorans vom Judenthum und Christenthum*, Stuttgart : Kahn

Ruthven, Malise, 1984, *Islam in the World*, Harmondsworth : Penguin

Ruthven, Malise, 1990, *A Satanic Affair : Salman Rushdie and the Rage of Islam*, London : Chatto & Windus

Ryckmans, G., 1951, *Les Religions arabes preislamiques*, Louvain : Museum Library

Said, Edward W., 1985, *Orientalism : Western Conceptions of the Orient*, Harmonds-worth : Penguin

Sale, George, trans, 1886, *The Koran : With a Preliminary Discourse and Explanatory Notes*, London : Orlando Hodgson

Schacht, Joseph, 1964, *Introduction to Islamic Law*, Oxford University Press

Schacht, Joseph, and Bosworth, C. E., eds, 1974, *The Legacy of Islam*, 2nd ed, Oxford University Press

Schedl, Claus, 1978, *Muhammad und Jesu*, Vienna : Herder

Schimmel, Annemarie, 1975, *Mystdical Dimensions of Islam*, Chapel Hill : University of north Carolina Press

Schimmel, Annemarie, and Falaturi, Abdoljavad, eds. 1979, *We Believe in One God : The Experience of God in Christianity and Islam*, London : Burns & Oates. New York : Seabury

Schoy, C., 1924, *The Geopraphy of the Muslims of the Middle Ages*, New York : American Geographical Society

Schuon, Frithjof, 1976, *Islam and the Perennial Philosophy*, London: Eyre & Spottis-woode

Searle, M. S., 1978, *Quran and Bible*, London : Croom Helm

Seguy, Marie-Rose, 1977, *The Miraculous Journey of Mahomet*, New York : Braziller

SEI: 1974, (*Shorter Encyclopedia of Islam*, ed. H. A. R. Gibb and J. H. Kramers) Leiden : Brill

Shafaat, Ahmad, 1981, *The Gospel According to Islam*, New York : Vantage Press

Shahid, I., 1977, *Pre-Islamic Arabia, in The Cambridge History of Islam*, Vol. 1A. Cambridge University Press

Shahid, I., 1984, *Rome and the Arabs*, Washington DC : American

www.pathagar.com

University Press

Shahrastani, Al-see Kazi and Flynn, 1984

Sharma, S. R., 1947, *The Making of Modern India*, Bombay : Signet Press

Sivan, Emmanuel, 1985, *Radical Islam : Medieval Theory and Modern Politics*, New Haven : Yale University Press

Smart, Ninian, 1977, *Background to the Long Search*, London : BBC

Smith, H. P., 1897, *The Bible and Islam*, New York : Franklin

Smith, Jane I., 1975, *An Historical and Semantic Study of the Term 'Islam' as Seen in a Sequence of the Quran Commentaries*, Missoula, Mont. : Scholars Press

Smith, Margaret, 1972, *Readings from the Mystics of Islam*, London : Luzac

Smith, Wilfred Cantwell, 1975, *Islam in Modern History*, Oxford Universtiy Press

Smith, W. Robertson, 1966, *Kinship and Marriage in Early Arabia*, Oosterhout : Anthropological Publications. Netherlands (orig. . pub. Cambridge University Press, 1907)

Southern, R. W. 1962, *Western Views of Islam in the Middle Ages*, Cambridge, Mass. : Harvard University Press

Spencer, S., 1963, *Mysticism in World Religion*, Harmondsworth : Penguin

Sprenger, Aloys, 1851, *The Life of Muhammad from Original Sources*, Allahabad : Presbyterian Mission Press

Sprenger, Aloys, ed., 1856-88, *A Biographical Dictionary of Persons who knew Mohammed*, by Ibn Hajar al-Asqalani, 4 vols., Calcutta University Press

Strzygowski, J., 1923, *Origin of Christian Church Art*, Oxford Universtiy Press

Sugana, G. M., 1968, *The Life and Times of Mohammed*, London : Hamlyn

Suhrawardy, Abdulla, ed. 1905, *The Sayings of Muhammad*, London : Constable Swartz, Merlin L., ed. 1981, *Studies on Islam*, Oxford University Press

Sweetman, J. Windrew, 1985, *Islam and Christian Theology*, Birmingham : Selly Oak College (abridged edn, ed. J. S. Moon, of 4 vols. pub. London : Lutterworth Press, 1945-67)

Taheri, Amir, 1987, *Holy Terror. The Inside Story of Islamic Terrorism*, London : Hutchinson

Tannahill, Reay, 1980, *Sex in History*, London : Hamish Hamilton

Tarn, W. W., and Griffith, G. T. 1952, *Hellenistic Civilization*, London : Longmans

www.pathagar.com

Thaalibi, Ismail al-. 1968, *Lata' if al-Ma'arif, The Book of Curious and Entertaining Information*, ed. C. E. Bosworth. Edinburgh University Press

Tisdall, William St Clair, 1911, *The Original Sources of the Qur'an*, London : SPCK

Torrey, Charles Cutler, 1892, *The Commercial-Theological Terms in the Koran*, Leiden : Brill

Torrey, Charles Cutler, 1967, *The Jewish Foundations of Islam*, 2nd edn, New York : Ktav

Trimingham, J. Spencer, 1979, *Christianity Among the Arabs in Pre-Islamic Times*, London : Longmans

Tritton, Arthur Stanley, 1930, *The Caliphs and their Non-Muslim Subjects*, London : Murray

Ullendorff, E., 1968, *Ethiopia and the Bible*, London : Dent

Vryonis, Speros, 1971, *The Decline of Medieval Hellenism in Asia Minor and the Process of Islamization from the Eleventh through the Fifteenth Century*, Berkeley : University of California Press

Wagtendonk, K., 1968, *Fasting in the Qur'an*, Leiden : Brill

Walker, Benjamin, 1989, *Gnosticism : Its History and Influence*, London : Crucible

Walker, Benjamin, 1995, *Hindu World*, 3rd edn., New Delhi : HarperCollins (orig. pub. London : Allen & Unwin, 1968)

Walzer, Richard., 1962, *Greek into Arabic : Essays on Islamic Philosophy*, Oxford : Cassirer

Wansbrough, John, 1977, *Quranic Studies*, Oxford University Press

Wansbrough, John., 1978, *The Sectarian Milieu : Content and Composition of Islamic Salvation History*, Oxford University Press

Watt, W. Montgomery, 1953, *Muhammad at Mecca*, Oxford University Press

Watt, W. Montgomery, 1956, *Muhammad at Medina*, Oxford University Press

Watt, W. Montgomer., 1961, *Muhammad : Prophet and Statesman*, Oxford University Press

Watt, W. Montgomery, 1970, *Bell's Introduction to the Qur'an*, Edinburgh Universtiy Press

Watt, W. Montgomery, 1990, *The Majesty that was Islam : The Islamic World 600-1100*, London : Sidgwick & Jackson

Weil, Gustav, 1943, *Mohammed der prophet*, Stuttgart, Heinz

Wellhausen, Julius, 1885, *Muhammad in Medina*, Berlin : Ebering

Wellhausen, Julius, 1927, *Reste arabischen Heidentums*, Berlin : Ebering (ori. pub. 1887)

Wensinck, Arent Jan. 1927, *Handbook of Early Muhammadan*

www.pathagar.com

Tradition, Leiden : Brill

Wensinck, Arent Jan. 1982, *Muhammad and the Jews of Medina*, Berlin : Adiyok

West, M. L., 1971, *Early Greek Philosophy and the Orient*, Oxford University Press

Westermarck, Edward, 1933, *Pagan Survivals in Mohammedan Civilization*, London : Macmillan

Widengren, Geo, 1955, *Muhammad the Apostle of God and His Ascension*, Uppsala : Lundequistska

Williams, John Alden, 1961, *Islam*, New York : Braziller

Wiseman, D. J., ed., 1973, *People of Old Testament Times*, Oxford University Press

Wismer, Don., 1977, *The Islamic Jesus : An Annotated Bibliography of Sources in English and French*, New York : Garland Publishing

Wright, T., 1855, *Early Christianity in Arabia*, London : Wright

Yusuf Ali, Abdullah, trans, 1991, *The Holy Qur'an*, New Delhi : Kitab Bhavan

Zaehner, R. C., ed 1971, *The Concise Encyclopedia of Living Faiths*, London : Hutch-inson

Zakaria, Rafiq, 1989, *The Struggle Within Islam*, Harmondsworth : Penguin

Zwemer, Samuel M., 1912, *The Moslem Christ*, Edinburgh : Oliphant

Zwemer, Samuel M., 1925, *The Law of Apostasy in Islam*, London : Longmans

Zwettler, Michael, 1975, *The Oral Tradition of Classical Arabic Poetry*, Columbus : Ohio State University Press

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ISBN 984 458 489 2
9 789844 584891